অর্থ আনুগত্য নয়। যাহারা সংবাদপত্র-সেবী, তাঁহারা শিক্ষিত এবং দেশের স্বার্থ

প্রধানত এজন্য দায়ী; কারণ কয়লার সরবরাহের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করিবার ... উপর। এ সম্বন্ধে

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ৭ই শ্রাবণ, ১৩৫০ সাল। Saturday, 24th July. [৩৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙলার খাদ্য সমস্যা

বাঙলার উভয় পরিষদে খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধীয় বিতর্কের অবসান হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিবেশনও স্থগিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ভোটের ফলে কোন পক্ষের জয় হইল কিম্বা কোন পক্ষের পরাজয় ঘটিল ইহা লইয়া কোলাহল করিবার সময় আমাদের নাই। কারণ দেশের সম্মুখে সমস্যা তদপেক্ষা বড়। বর্তমান খাদ্য সমস্যা সমাধানের কোন পাকা পথ এই বিতর্ক হইতে পাওয়া গেল কিনা ইহাই প্রথম বিবেচ্য। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে তেমন আশার কারণ আমাদের মনে জাগে নাই। খাদ্য সচিব সুরাবর্দী বলিয়াছেন বটে যে, বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যের দরে যে পাগলামি দেখা যাইতেছে ইহার কোনই কারণ নাই; কিন্তু কারণ না থাকিলেও কার্যের ফল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভোগ করিতে হইতেছে। ইহার প্রতীকার কোথায়? মিঃ সুরাবর্দী স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙলা দেশে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়াছে। বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে, তিনি ইহা সরাসরি স্বীকার না করিলেও দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা যে সৃষ্ট হইয়াছে একথা স্বীকার করিয়াছেন এবং দুর্ভিক্ষকালীন সাহায্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতেছে যে, এই অবস্থা দূর করিতে হইলে টাকা পয়সার তত প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন খাদ্যাভাব দূর করা। মিঃ সুরাবর্দীও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, খাদ্যদ্রব্য আমদানী করার জন্য যথেষ্ট রকম গাড়ির অভাবই পুনরায় সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এই অসুবিধা দূর যদি না হয়, তবে বাঙলা দেশের অবস্থা কি হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ সুরাবর্দী বলেন যে, তবে আমরা ভীষণ সংকটে পতিত হইব। বাঙলা দেশের বর্তমান সঙ্কটের সম্বন্ধে ভারত সরকারের উদাসীনতারই ইহা পরিচায়ক। কেন্দ্রে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইহার একমাত্র প্রতীকার হইতে পারে। বাঙলা দেশের এই সমস্যা যে যুদ্ধ সমস্যার চেয়ে কম নয়, ভারত গভর্নমেণ্টের কর্ণধারগণ এ সত্য যথেষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না; ইহা উপলব্ধি করাইবার মত জনমতের চাপ তাঁহাদের উপর পড়া দরকার এবং তজ্জন্য করিতে বাঙলা দেশের সকল দল এই সমস্যা সমাধানের উপর সমবেত শক্তি প্রয়োগ করেন, ইহা প্রয়োজন। দলগত স্বার্থকে ত্যাগ করিয়া এই দুর্দিনে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার কর্তব্যকে যদি আমরা বড় করিয়া না দেখিতে পারি, তবে আমাদের সব বাদ-বিতর্ক সবই বৃথা। এইখানে সরকারী কর্মনীতি এবং ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতার কথা আসিয়া পড়ে। অন্তত দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের এই ক্ষেত্রে সর্বজনীন স্বার্থকে ভিত্তি করিয়া সকল দলের সহযোগিতার শক্তিতে একটা বলিষ্ঠ নীতি গড়িয়া উঠিলে তাহা যেমন অন্য স্বার্থকে গৌণ করাইবার পক্ষে অধিকতর কার্যকর হয়, সেইরূপ জনসাধারণের মধ্যে আস্থার ভাবও বাড়ে। এইদিক হইতে শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয় এতৎসম্পর্কে বাঙলা দেশের সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটি গঠন করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন করি। কারণ সহযোগিতা একটা মুখের কথা রাখাই যথেষ্ট নয়, একটা ব্যবস্থার ভিতর দিয়া সেই সহযোগিতা যাহাতে কার্যকর হইতে পারে, এরূপ নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। দেশের সর্বত্র আজ অন্নাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে, এখন দলগত স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া কাজ করিবার সময় নাই। মানবতার দিক হইতে এই সত্যকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কথাটা শুনিতে অনেকের কাছে অপ্রিয় হইলেও ইহা বাস্তব সত্য।

খাদ্য সঙ্কটে ভারত সচিব

একটা ঐতিহাসিক জনশ্রুতি আছে যে, রোম নগরী যখন আগুনে ভস্ম হইতেছিল,

তেমান খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে কমন্স সভায় যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে সেই জনশ্রুতির কথাই আমাদের মনে পড়িতেছে। পার্লামেণ্টের জনৈক শ্রমিক সদস্যের একটি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন, কৃষকেরা বাজারে খাদ্যশস্য ছাড়িতে চাহিতেছে না, আর পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে লোকে বেশি করিয়া খাইতেছে। সুতরাং ভারত সচিবের উক্তি অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যশস্যের অভাবের জন্য খাদ্যাভাব ঘটে নাই কিম্বা লোকে খাইতে পাইতেছে না ইহাও সত্য নয়। খাদ্যশস্য যথেষ্ট আছে, লোকেও বেশি বেশি খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই যুদ্ধের বাজারে অন্য যাহারই সর্বনাশের আশঙ্কা ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষে পৌষ মাস দেখা দিয়াছে। ইহা চার্চিল পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডলের মহিমা বলিতে হইবে। মিঃ আমেরীর উক্তি হইতে বুঝা যায়, জগতের লোককে সেই মহিমা উপলব্ধি করানোই তাঁহার মুখ্য প্রয়োজন ; ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থার বিচার, তাঁহার কাছে বড় নয়। এ দেশের বাস্তব অবস্থা কতটা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুইটি ঘটনা হইতে সে পরিচয় মিলিবে। ঢাকার ১৫ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ—

> "গতকল্য অপরাহ্নে ভিক্টোরিয়া পার্কে এ আর পি ডিপোর সম্মুখে একটি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থানে আবর্জনা ফেলিবার পাত্র হইতে ভিক্ষুকেরা প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্য খুঁটিয়া খায়। একটি ভিক্ষুক রমণী অপর একটি ভিক্ষুক রমণীর সংগৃহীত খাদ্য ছিনাইয়া লওয়ায় শেষোক্ত ভিক্ষুক রমণী পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকটির মাথায় একটি লৌহপাত্র দ্বারা আঘাত করে। ফলে তার ক্ষতস্থান হইতে ভীষণভাবে রক্ত পড়িতে থাকে এবং রক্তপাতের ফলে সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই বীভৎস দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। অতঃপর তাহাদের উভয়কেই প্রাথমিক শুশ্রূষার জন্য হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।"

বরিশালের অন্তর্গত ভোলার ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ—

> "অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জিলা ম্যাজিস্ট্রেট অদ্য এখানে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার চোখের সম্মুখেই তিনজন হতভাগ্য তাহাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ইহারা খাদ্যের সংস্থানে সহরে আসিয়াছিল। শত শত ক্ষুধার্ত নরনারী বৃদ্ধ যুবক ও শিশু প্রত্যহ সহরে আসিয়া ভিড় করিতেছে।
>
> তাহাদের হৃদয়বিদারক কঙ্কালসার চেহারা দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না।"

দেশের এই অবস্থায় ভারত সচিব কৃষকদের গোলাভরা ধান মজুত দেখিতেছেন এবং ভারতের অধিবাসীদের ভোজনোল্লাস ... কর্ণধারগণ কিরূপ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন এই উক্তিতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া গেল। এই শ্রেণীর লোকের সদিচ্ছায় আমরা স্বাধীনতা পাইব বা মানুষের অধিকার লাভ করিব, এমন বিশ্বাস এখনও যাঁহারা অন্তরে অন্তরে পোষণ করেন, তাঁহাদের জন্য আমাদের দুঃখ হয়। আজ কিছুদিন হইল, দেখিতে পাইতেছি, বিলাত এবং ভারতবর্ষের ব্রিটিশ মিশনারীগণ ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থাজনিত সমস্যার সমাধানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা উপদেশ বাণী প্রচার করিতেছেন ; ইঁহাদের প্রতি আমাদের এই নিবেদন যে, আমাদিগকে বুঝাইবার কিছুই নাই। কংগ্রেস সহযোগিতার সূত্রেই সব দাবী করিয়াছে, তাঁহারা আগে এ সম্বন্ধে তাঁহাদেরই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করুন।

পুলিশ ও জনসাধারণ

শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্তমজুমদার এবং শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তারের ব্যাপার লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চে আদালত অবমাননার দুইটি মামলা আনীত হয়। মামলা দুইটি ফাঁসিয়া গিয়াছে, পাঠকবর্গ ইহা অবগত আছেন। আইনের সূক্ষ্ম পরিভাষার কথা তুলিয়া হাইকোর্টের সে সিদ্ধান্তের আমরা সমালোচনা করিতে চাই না। শ্রীযুক্ত দত্তমজুমদারের গ্রেপ্তার সম্পর্কে বিচারপতি মিঃ খোন্দকার যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমরা শুধু সেই সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা বলিব। বিচারপতি মিঃ খোন্দকার বলেন, "মিঃ দত্তমজুমদার পলাইবার মত দাগী অপরাধী নহেন। তিনি একজন শিক্ষিত এবং সামাজিক পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি একজন ব্যারিষ্টার, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের তিনি একজন সদস্য। ইনস্পেক্টর তাঁহার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণই অযৌক্তিক। বিচারপতি খোন্দকার আরও বলেন, শোনা যায় যে, পুলিশ যে দেশের লোকের ভৃত্য, তাঁহাদের হর্তাকর্তা বিধাতা নয়, এ দেশের পুলিশ তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। একথা সত্যই। ব্যক্তিগতভাবে জনসাধারণের প্রতি পুলিশ কর্মচারীর দুর্ব্যবহার এদেশে বিরল ব্যাপার নয়। শান্তি এবং আইন রক্ষার ক্ষমতা যাহাদের হাতে রহিয়াছে, ইহাতে সেই সব পুলিশের গৌরব বাড়ে না। এইরূপ আচরণ আদালতের গোচরীভূত হইলে সর্বদা ভর্ৎসনা লাভের যোগ্য।" বিচারপতি খোন্দকারের এই কঠোর মন্তব্যের পর অন্য কিছু বলা দরকার হয় না। প্রকৃতপক্ষে, পরাধীন এদেশে যাহারা দেশসেবক এবং কর্মী, পুলিশ অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে দাগী জঘন্য শ্রেণীর অপরাধীদের মতই দেখিয়া থাকে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যকার বিচার সে ক্ষেত্রে করে না ; কিম্বা তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং পদমর্যাদার দিকেও তাকায় না। হাইকোর্টের বাড়ির মধ্যে শ্রীযুক্ত দত্তমজুমদারের উপরই যখন এইরূপ আচরণ সম্ভব হইতে পারে, তখন অন্যত্র আচরণ কেমন হওয়া সম্ভব, অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

শান্তিবাদী মিঃ নরম্যান এঞ্জেল এখন আমেরিকায় গিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহিমা কীর্তনে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ এবং গ্রেট ব্রিটেনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষ এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে দুই শত বৎসরের সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের ফলে উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ প্রীতি স্থাপিত হইবে বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করেন। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছত্রছায়াতলে থাকিবে, মিঃ এঞ্জেলের সেই পক্ষেই ওকালতি। আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, গ্রেট ব্রিটেন ভারতবাসীদিগের মানুষের অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছে কি? ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের দুইশত বৎসরের সম্পর্ক ; কিন্তু সেই সম্পর্কের ফলে ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সহিত গ্রেট ব্রিটেন কতটা পরিচয় লাভ করিয়াছে কিম্বা তদুপযোগী শ্রদ্ধার পরিচয় সে দিয়াছে। মিঃ ফরস্টার ইংলণ্ডের একজন বড় লেখক। তিনি লিখিয়াছেন, "দুই শত বৎসরকাল ভারতবাসীদের সম্পর্কে গিয়াও আমরা ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সম্বন্ধে কিছুই জানি না।" ইহার কারণটা কি? কারণ আর কিছুই নয়, ভারতবাসীরা পরাধীন এবং পরাধীন জাতির কোন গুণই সবল এবং স্বাধীন জাতির চোখে সহজে পড়ে না ; পরাধীন জাতি যে তাহাদের চেয়ে হীন, এই বদ্ধ সংস্কারই স্বাধীন এবং প্রবল জাতির বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ভারতবাসীরা যতদিন পরাধীন থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতবাসীদের যোগ্যতা এবং অধিকার সম্পর্কিত যত যুক্তি সবই এইভাবে প্রবল জাতিসমূহের কাছে

উপেক্ষার বিষয় কিম্বা বড় জোর কৃপা-দৃষ্টিতে বিবেচনার বিষয় হইয়া থাকিবে এবং প্রবলের নীতির পক্ষে একটা কৃত্রিম যৌক্তিকতা তাহাদের অন্তরের অবচেতন স্তর হইতে কল্পিত হইয়া উঠিবে। ভারত-বাসীদের প্রতি সহানুভূতি এবং ঔদার্য যতকিছু হইবে তাহাকেই আশ্রয় করিয়া। সাম্রাজ্যবাদীদের এই মনস্তত্ত্বেরই পরিচয় আমরা মার্কিনদের মধ্যেও পাইতেছি। সম্প্রতি ভারতের ব্রিটিশ নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ইহাদের একজন বলিয়াছেন,—'যুদ্ধে বিজয় লাভ করিবার পর ভারতীয় প্রশ্নের সমাধান হইবে। প্রাচ্যদেশে ব্রিটিশ মহিমা সর্বাধিক নিম্ন-স্তরে পতিত হইবার অবস্থাও যে স্বয়ংসিদ্ধ ভারতীয় নেতাদের হাতে ভারত শাসনের ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে বাধ্য করিতে পারে নাই, ইহাতে ব্রিটিশ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গণতান্ত্রি-কতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় নেতাদের বোঝা উচিত যে, ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টের প্রস্তাব স্বীকার করিলেই তাহার অন্তর্নিহিত আন্তরিকতার পরীক্ষা হইতে পারে, তাহা অগ্রাহ্য করিলে নয়।" এই সব উপদেষ্টা মনে করেন যে বুদ্ধিশুদ্ধি তাঁহাদেরই একচেটিয়া। ভারতবর্ষের লোকেরা শিষ্যরূপে তাঁহাদের পদসেবা করিবার জনাই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহা-দের এমন মনোবৃত্তি থাকিতে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য কখনই মিলন হইবে না। দুর্বলের সঙ্গে প্রবলের সত্যকার মিলন হওয়া কখনই সম্ভব নয়। স্বাধীন ভারতই স্বাধীন ইংরেজ কিম্বা মার্কিনের সঙ্গে বন্ধুতার সূত্রে মিলিতে পারে। সদিচ্ছা বা অনুগ্রহের সূত্রে মিলন ক্রীতদাসেরই জীবন বহন ছাড়া অন্য কিছু নয়; সুতরাং ভারত-বর্ষের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন না করিয়া যাহারা এই ধরণের উপদেশ দ্বারা আমাদের প্রতি বন্ধুতা দেখাইতে আসেন, আমরা তাঁহাদিগকে প্রীতির চোখে না দেখিয়া দূর হইতেই নমস্কার করি।

ভারতে সংবাদপত্র সেবা

সেদিন বোম্বাই শহরে সম্পাদক সম্মেলনের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক অধি-বেশন হইয়া গেল। এই অধিবেশনে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রচার বিভাগের সচিব স্যার সুলতান আহম্মদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারত গভর্নমেণ্টের কার্যে সংবাদপত্র সেবীদের সহযোগিতা কামনা করেন। ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সহযোগিতা করার অর্থ আনুগত্য নয়। যাঁহারা সংবাদপত্র-সেবী, তাঁহারা শিক্ষিত এবং দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। ভারত গভর্নমেণ্টের কর্তারা যদি তাঁহাদিগকে নিজেদের হুকুম মানিয়া চলিতে বাধ্য করিতে যান তবে সেক্ষেত্রে সংবাদপত্রসেবী-দের পক্ষে সহযোগিতা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সংবাদপত্র সম্পর্কে ভারত মূলকভাবেই চলিতেছে। সম্মেলনের সভা-সরকারের নীতি এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা-পতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন বেশ খোলাখুলি-ভাবেই এ কথাটা বলিয়াছেন। ভারত সরকারের প্রচার বিভাগ কিভাবে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতেছে তিনি তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে তিনি বলিয়াছেন যে, একদিকে বৈদেশিক প্রচার-কার্যে ভারতীয় নেতাদের কুৎসা কীর্তন করা হইতেছে, অন্য দিকে বিদেশ হইতে আগত ভারতের পক্ষে অনুকূল মত সংবাদ সব চাপিয়া রাখা হইতেছে। স্যার সুলতান সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার প্রয়োজনীতার পক্ষে অনেক বড় বড় কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অধীনে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের কার্য যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক লুই ফিসারের লেখা এবং বক্তৃতা ভারতে প্রকাশ নিষিদ্ধ করিবার মূলে কোন যুক্তি আছে কি? তাঁহার লেখা ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে বলিয়াই উহা নিষিদ্ধ হয় নাই কি? স্বাধীনতাকামী ভারতের জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় সংবাদপত্র-সমূহ ভারত সরকারের এমন নীতি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারে না এবং এ সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব পরি-বর্তিত না হইলে সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারী প্রচার বিভাগের সহযোগিতাও সম্ভব নহে।

কয়লার অভাব

আমরা আগাগোড়াই বলিতেছি যে, দেশ-ব্যাপী অভাবজনিত সমস্যা সমাধানে গভর্নমেণ্টের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নাই। ইহা যেন খামখেয়ালীর উপর চলিতেছে। কিছুদিন হইল কলিকাতা শহরে কয়লা দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্য যোগাড় করিতে পারিলেও ইন্ধন জুটিতেছে না। অথচ কলিকাতার অদূরেই ঐ কয়লার খনিসমূহ রহিয়াছে এবং কয়লারও অভাব নাই। সুতরাং কয়লার এই সমস্যা অভাবজনিত সমস্যা নয়, সর-বরাহের সমস্যা এবং ভারত গভর্নমেণ্টই প্রধানত এজন্য দায়ী; কারণ কয়লার সরবরাহের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করিবার ভার তাঁহাদের উপর। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের এই ঔদাসীন্যের ফলে খাদ্য সমস্যার জটিলতা তো বৃদ্ধি পাইতেছেই, সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র সমস্যাও সমধিক জটিল আকার ধারণ করিতেছে। বঙ্গীয় মিল-ওয়ালা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত এম এল সা সম্প্রতি এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, কয়লার অভাবে বাঙলা দেশের কাপড়ের কলগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে, এমন আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীও উহা স্বীকার করিতেছেন। অভাব যেখানে সত্য, সেখানে অভাবজনিত সমস্যার অর্থ বুঝা যায়; কিন্তু অভাবের কারণ যেখানে নাই, সেখানেও অভাব সৃষ্টি—এদেশের শাসকদের অবলম্বিত নীতির এমনই প্রভাব। এজন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া অন্য কি উপায় আছে?

দেশোদ্ধারের ব্রত

স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার সমর মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যরূপে বিলাতে আছেন। তিনি দেশোদ্ধারের নূতন ব্রত লইয়া ভারতে আসিতেছেন। সেদিন তিনি বলিয়া-যে, ভারতে আসিয়া বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় করণের ভিত্তিতে ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধান করিতে চেষ্টা করিবেন এবং সেজন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ-নীতিক দলের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। স্যার রামস্বামীর এমন সদিচ্ছার জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করা যায়, কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, বড়লাটের শাসন পরিষদ তাঁহার মত কয়েকজন ভারতীয়ের দ্বারা সৌষ্ঠবান্বিত হইলেই ভারতবাসীরা এমন কি কৃতার্থতা লাভ করিবে বুঝা যায় না। ভারতবাসীরা তাঁহাদের শ্রেণীর রাজনীতিকদের গোটাকত বড় চাকুরী জোটাইবার জন্য লালায়িত নয়। তাহারা দেশবাসীর হাতে প্রকৃত অধিকার চায়। স্যার রামস্বামী ইহা অবগত আছেন এবং তিনি ইহাও জানেন যে, বড়লাটের শাসন পরিষদের সবগুলি পদ ভারতবাসী-দের হাতে দিয়া ভারতীয় সমস্যা সমাধানের এই যে চেষ্টা ইহা ইতঃপূর্বে করা হইয়াছে; কিন্তু ভারতের জনমত তাহা সমর্থন করে নাই। স্যার রামস্বামী ইহা জানিয়া রাখুন যে, কংগ্রেস নেতাদিগকে মুক্তির বিনিময়ে ভারতবাসীরা আজও সে প্রস্তাব তেমনই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়।

বাঁকাস্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

(৬)

যাহাদের সকলকে একদিন পর ভাবিয়াছিলাম আজ আবার তাহাদের এমনই আপনার বলিয়া মনে হইতে লাগিল যে তখনি দেখিবার জন্য সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিচিত্র মানুষের মন! একদিন যাহাকে ভাল লাগে না আর একদিন তাহাকেই দেখিবার জন্য অন্তর কেন এমন করিয়া উঠে, তাহা আজও ভাবিয়া পাই না। মাটকথা দেশে ফিরিবার জন্য তখন আমার মন এরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেখানে গিয়া আমার কি অবস্থা হইবে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই। কিন্তু গাড়ি যখন দেশের নিকটবর্তী হইতে লাগিল তখন সমস্ত কথা একে একে মনে পড়িয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম জ্যাঠাইমার কাছে কি মুখে গিয়া দাঁড়াইব, এতদিনে টাকা চুরির কথা নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে; হয়ত আমাকে দেখিয়া সকলে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে। খেঁদী [illegible] হইতে শুরু করিয়া মধু কমল পর্যন্ত [illegible] কাহারো কানে যাইতে বাকী নাই। তাহাদের কাছেই বা কি করিয়া মুখ দেখাইব? তাহার উপর টেস্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষারও আর তিনদিন মাত্র বাকী—হেড মাস্টারমশাইকে ও জ্যাঠামশাইকেই বা কি বলিব? মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল, একবার ইচ্ছাও হইল গাড়ি হইতে নামিয়া পড়ি। কিন্তু পারিলাম না। কিসের একটা দুর্দম আকর্ষণ আমাকে অমোঘবলে সেই পল্লীর দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

এই কয়দিনে জীবনে যে বিচিত্র রসের আস্বাদন পাইয়াছিলাম, হউক তাহা দুঃখের, হউক তাহা ছিন্নভিন্ন জীবনের হতাশা ও ব্যথা বেদনার কাহিনী তবু আজ মনে হইতে লাগিল সেই বহু দূরে ফেলিয়া আসা দিনগুলিই আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের ভাঙাচোরা পথে প্রদীপের মত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে।

যাহা হউক, সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। চৌধুরীদের দীঘি ও বাগানের কাছে আসিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইলাম, যেন কাহাকে দেখিবার আশায় আমার মন সহসা আকুল হইয়া উঠিল। আমি চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া আবার হাঁটিতে শুরু করিলাম। যে পথে কতবার চলিয়াছি, সেই পথ আজ নূতন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তাহার ধারে ধারে কত স্মৃতি, কত আনন্দ, কত বিস্ময়!

মাঠ পার হইয়া একটা বাঁক ফিরিতেই জ্যাঠামশায়ের বাড়ির ভাঙা পাঁচীলটা নজরে পড়িল; ধড়াস করিয়া উঠিল বুকের ভিতরটা! এইবার সত্যই মনে হইতে লাগিল কেন ফিরিয়া আসিলাম, বেশ ত ছিলাম সেই অপরিচিত দেশে।

'আরে আলোদা যে'—বলিয়া ভুতি ও পাঁচী ছুটিতে ছুটিতে আমার কাছে আসিয়া পড়িল। খেঁদীর পর পাঁচী ও তাহার পর ভুতি! পাঁচী বলিল, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে আলোদা, বাবা তোমার জন্যে চারিদিকে কত খোঁজাখুঁজি করলেন।

ভুতি ইতিমধ্যেই চেঁচাইতে চেঁচাইতে বাড়ির দিকে ছুটিয়াছিল, 'ও মা আলোদা এসেছে, দেখবে এসো' বলিয়া।

আমি সেই ফাঁকে পাঁচীকে বাড়ি সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল আমার চৌর্য অপবাদটা তাহাদের কাহার মনে কতখানি আঘাত দিয়াছে তাহা জানিয়া লওয়া। পাঁচী নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, বোধ হয় বছর বারো হবে। সে প্রথমেই বলিল, জানো আলোদা দিদির বিয়ে হয়ে গেছে?

খেঁদীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া একটু আশ্চর্য বোধ করিলাম, তাই তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিলাম, কবে?

সে আপনার মনের আনন্দে বলিয়া চলিল, এক মাস হলো। দিদি শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। তারপর জামাইবাবু এসেছিল আমাদের সকলকে এক একটা ক'রে টাকা দিয়ে গেছে ইত্যাদি।

আমি সেকথা চাপা দিয়া আসল কথাটার দিকে তাহার মন টানিয়া নেওয়ার চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, হ্যাঁরে পাঁচী, আমি চলে যাবার পর আর কিছু হয়নি বাড়িতে?

ওঃ—হ্যাঁ—তোমায় বলতে ভুলে গেছি আলোদা, তুমি চলে যাবার পরদিনই একটা চোর এসেছিল আমাদের বাড়ি। বলিয়া সে বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে তাকাইল।

'চোর!' আমিও ততোধিক বিস্ময়ের ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিল, হাঁ, চোরটা মার বিছানার নীচ থেকে তিরিশটা টাকা আর রান্নাঘর থেকে একটা বড় জলের ঘড়া নিয়ে পালিয়েছে।

আমি আরো বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি ক'রে জানলি যে, চোর টাকা আর ঘড়া চুরি করেছে?

সে বলিল, বা-রে, মা যে চোরটাকে দেখেছে পালাতে!

কণ্ঠে ব্যাকুলতা আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রকম!

কি রকম আবার! জলের ঘড়াটা ছিল রান্নাঘরে, কখন যে ঘরের চাবী ভেঙে চুপি চুপি চোর ঢুকেছে আমরা কেউ টের পাইনি, তারপর হঠাৎ কিসের শব্দ হতেই মার ঘুম ভেঙে যায়—তারপর মা যেই চোর বলে চেঁচিয়ে উঠেছে, অমনি ছুট্! মা জানলা দিয়ে নিজে চোখে চোরটাকে দেখেছে।

পাঁচীর মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া আমার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল! আমার মনে হইতে লাগিল পাঁচী যেন এক বিরাট পাষাণভার আমার বুক হইতে নামাইয়া দিল।

ইতিমধ্যে আমরা একেবারে বাড়ির দরজায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। জ্যাঠাইমা ও খেঁদী আমাকে দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি সেই দিকেই আসিতেছিলেন। আমি তাহাদের সম্মুখে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম তারপর কোন কথা না বলিয়া জ্যাঠাইমার পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিলাম তিনি কোনও আশীর্বাদ না করিয়াই বলিলেন, ধন্যি ছেলে বাবা, তোমাদের সাতগুষ্টির পায়ে নমস্কার! এত বড় ছেলে তুই, লেখাপড়া শিখেছিস্ অথচ কোথায় যে গিয়ে রইলি একটা চিঠি লিখে খবর পর্যন্ত দিতে নেই?

খেঁদী মায়ের মুখের উপর ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি থামো দিকি মা, মানুষটা বাড়িতে পা দিতে না দিতেই তুমি শুরু করলে! ওর কি হয়েছিল না হয়েছিল আগে শোনো?

মায়ের মুখের উপর এই প্রথম আমি খেঁদীকে কথা কহিতে শুনিলাম। বিবাহ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বালিকাত্ব ঘুচিয়া গিয়া তাহারা কেমন ভারিক্কি হইয়া পড়ে! বেশ লাগিল। আমার খেঁদীকে চিরকাল তাহাকে মায়ের নিকট হইতে বকুনি খাইতে দেখিয়াছি অথচ আজ তাহার বাক্‌বিক্রম দেখিয়া মনটা সত্যই তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিল।

মেয়ের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া মুহূর্তে জ্যাঠাইমার চোখ দুটো আরো বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি একবার আমার মুখের দিকে আর একবার খেঁদীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, দ্যাখ খেঁদী ছোটর মুখে বড় কথা শোভা পায় না—কালকের মেয়ে, গলা টিপলে দুধ ওঠে, তুই কিনা এসেছিস্ আমায় শেখাতে কখন কাকে কি বলতে হয়? জানিস্, আমি বলে তাই এখনো চুপ ক'রে আছি অন্য জেঠাই হ'লে আজ আর ওকে বাড়ির চৌকাঠ ডিঙ্গতে দিতো না। এই বলিতে বলিতে তিনি সবেগে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন তারপর আপন মনে গজগজ করিয়া কি সব বলিতে লাগিলেন আমি তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।

ভুতি ও পাঁচী সেখানে আর দাঁড়াইল না জ্যাঠাইমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। তখন ঈষৎ হাসি মুখে টানিয়া আনিয়া খেঁদী আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, আলোদা ভাই, মার কথায় যেন রাগ করো না—দিনরাত খেটে খেটে

ওর আর মাথার ঠিক নেই—তাছাড়া বয়েসও ত বাড়ছে দিন দিন......

আমি কোন কথা না বলিয়া ঘরে গেলাম।

যে ঘরে আমি থাকিতাম সেইটা এখন খেঁদীর হইয়াছে। দেখিলাম। ঘরটা ঠিক তেমনিই আছে শুধু খেঁদীর বিবাহের তোরঙ্গ বাক্স প্রভৃতি দুই একটা জিনিস আমারই তক্তাপোষের তলায় রহিয়াছে। খেঁদী আমাকে জামা কাপড় ছাড়িতে বলিয়া হাতমুখ ধুইবার জন্য এক ঘটি জল আনিয়া দিল এবং হাতমুখ ধোয়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা রেকাবীতে করিয়া মুড়ি, খান চারেক বড় বাতাসা ও এক গ্লাস জল আনিয়া বলিল, একটু জল খেয়ে নাও আলোদা।

আমি যতক্ষণ খাইতে লাগিলাম সে ততক্ষণ আমার কাছে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। সে কত কথা, যেন ফুরায় না—এতদিন কোথায় ছিলাম, কি করিয়াছি, কোথায় খাইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাবিয়াছিলাম যাহা কোনদিন কাহাকেও বলিব না, সে এমন সস্নেহে ভুলাইয়া আমার নিকট হইতে তাহা বাহির করিয়া লইল যে, আমি তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। খাইতে খাইতে আমার মন কোথায় যে চলিয়া গিয়াছিল জানি না হঠাৎ এক সময় হুঁস হইতে দেখি খেঁদী চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে। তারপর সহসা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল, আলোদা একটা কথা সত্যি ক'রে বলবে?

সেই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, খেঁদীর কাছে কিছু গোপন করিতে পারি ইহা যেন আমার কল্পনারও অতীত ছিল। তাই সাগ্রহে বলিলাম, কি বল?

খেঁদীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। সে বলিল, আচ্ছা তুমি এখান থেকে কেন পালিয়ে গেলে, কেন পড়াশুনা নষ্ট ক'রে এই রকম কষ্ট ভোগ করতে গেলে? কি তোমার মনের ইচ্ছে বলো—আমার কাছে গোপন করো না, লক্ষ্মীটি?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ইহার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না।

খেঁদী খপ্ করিয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, বলো, আমার কাছে আজ তোমায় বলতেই হবে, লক্ষ্মী ভাইটী?

তাহার সেই ব্যাকুলতাভরা চোখ দুটার দিকে চাহিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া গেলাম। তারপর ধীরে ধীরে আমার একটা হাত তাহার হাতের উপর রাখিয়া বলিলাম জানি না!

খেঁদী আর কিছু বলিল না, তেমনিভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, যেন কিসের গভীর চিন্তায় মগ্ন!

এমন সময় জ্যাঠাইমার তীব্র কণ্ঠস্বর আসিয়া আমাদের সচকিত করিয়া তুলিল। তিনি কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কি বলিতেছিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইটুকু কানে গেল—লোকের বাড়ির সন্ধ্যে দেওয়া হয়েছে কখন আর আমার মেয়ের গল্প ফুরোয় না—যে সব অলক্ষ্মীপণা দু' চোক্ষে দেখতে পারি না—আমার ভাগ্যে জুটেছে সব!

—মা বকছে অলোদা, এখনো সন্ধ্যে দেওয়া হয়নি, আমি যাই। বলিতে বলিতে সে ক্ষিপ্রপদে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার শঙ্খ তখন সবে একটা দুইটা করিয়া বাজিতে শুরু করিয়াছে। বহুদূর হইতে যে দুই তিনটা মিলিত ধ্বনি আসিতেছিল, আমি কান পাতিয়া তাহা শুনিতেছিলাম।

হঠাৎ ঘরে কাহার পায়ের শব্দ হইল। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম সরলা ঝি ঘরে আলো দিতে আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই সে ভর্ৎসনা-ভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কি ছেলে তুমি দাদাবাবু, বাড়ি থেকে যদি চলে যাবে জানো ত একবার কাউকে বলে যেতে পারলে না,—আর কাউকে বলে যেতে যদি লজ্জাই হয়েছিল ত সরলা ত মরেনি তাকে বলে গেলেই পারতে? বাবা, কি কাণ্ড, বাড়িশুদ্ধ লোক ভেবে খুন। মা ত তিনদিন পর্যন্ত মুখে কুটটা পর্যন্ত কাটেনি—এক গেলাস জলও কেউ খাওয়াতে পারলে না, বলে, ওর মা থাকলে সে কি আজ মুখে খাবার তুলতে পারতো? ছোটবৌ যে মরবার সময় ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। এইসব বলে এমনভাবে কাঁদতে আমি আর কোনদিন মাকে দেখিনি।

আর বাবু, কত পয়সা খরচ ক'রে একে ওকে তাকে চারিদিকে পাঠালে তোমায় খুঁজতে। শেষে নিজেও দশবারোদিন ঘরে ঘরে ঘুরে এসে শেষে ভীষণ জ্বরে পড়লো। বলি কোথায় গিয়েছিলে শুনি?

আমি তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বিস্মিতকণ্ঠে শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ সরলা, জ্যাঠাইমা আমার জন্যে কেঁদেছিল

সরলা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, কাঁদবে না, তোমার মত ত ওরা আর তোমাকে পর ভাবে না? বলে বনের পশুপক্ষী একটা বাড়ি থেকে গেলে লোকে চুপ করে থাকতে পারে না, তা আপনার জন? কথায় বলে—রক্তের সম্পর্ক!

সরলা আরো কত কি কথা বলিয়া চলিল কিন্তু আমার কানে তাহার একটি বর্ণও ঢুকিল না, শুধু বার বার তাহার একটি কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল, সত্যই কি জ্যাঠাইমা আমার জন্য কাঁদিয়াছেন! ইহা ভাবিতে ভাবিতে কখন আমার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল জানি না, হঠাৎ আবার সরলার প্রশ্নে সচকিত হইয়া উঠিলাম। বলি, আমি যে এত বকে মলুম, তা কি তোমার কানে ঢুকলো না—কোথায় গিয়েছিলে শুনি?

বলিলাম, জানি না।

আচ্ছা, বলতে হবে না। 'বলি যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর'! আমি কোথায় দুটো ভালো কথা জিগ্গেস করতে এলুম না আমার ওপর রাগ! কোন হারামজাদি আর তোমায় কোন কথা জিগ্গেস করে।

এই বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল। আমি হাঁ বা না কিছুই বলিতে পারিলাম না। আমার তখন এক অদ্ভুত অবস্থা। জাগ্রত থাকিয়া যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম জ্যাঠাইমাকে। তিনি কাঁদিতেছেন আমার জন্য—একটা মাদুরে তিনি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন, বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, সকলে তাহাকে খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে, আর তিনি বলিতেছেন 'আমি কোন প্রাণে মুখে জল দেবো, বাছা আমার হয়ত না খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে......ওর মা নেই, ছোটবৌ যে ওকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে!...

ভাবিতেছিলাম আরো কত কি! একবার ইহাও মনে হইল, তবে কি জ্যাঠাইমাকে আমি ভুল বুঝিয়াছি।

এমন সময় ভিতর হইতে জ্যাঠাইমারই গলার আওয়াজ পাইয়া আমার সে স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তিনি বলিতেছিলেন, বলি শুনছ, তোমার আদরের ভাইপো যে চোদ্দপুরুষের মাথা কিনে ফিরে এসেছে—যাও তাকে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করগে?

জ্যাঠামশায় বাড়িতে ছিলেন না, বুঝিলাম তিনি ফিরিয়াছেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তিনি আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইতে গিয়াই আমি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলাম। কান্না দেখিয়া কিনা বলিতে পারি না, তিনি বেশী কিছু আমায় বলিলেন না। শুধু বলিলেন, এ বছরটা মিছিমিছি নষ্ট করলি, আবার একটা বছর পড়তে হবে। তারপর আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে রোগা হয়ে গেছিস্ কেন, অসুখবিসুখ কিছু এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন, অসুখবিসুখ কিছু করেছিল?

আমি ঘার নাড়িয়া জানাইলাম সেরূপ কিছুই করে নাই।

তিনি আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ একবার দরজার কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তুই যদি একটা খবর দিতিস্ তাহ'লে আর আমার অনর্থক এতগুলো টাকা খরচ হ'তো না। এই বলিয়া আমার নিকট হইতে কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

জ্যাঠামশায় চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভুতো আসিয়া ঘরে ঢুকিল। যেন সে এতক্ষণ পিতার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় নিকটে কোথায় লুকাইয়াছিল। সে আসিয়া একেবারে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কোথায় ছিলি ভাই আলো, এতদিন [illegible], খুব দিনকতক ঘুরে এলি, বেশ আছিস্ তুই মাইরি! তুই যদি যাবার সময় আমায় একটু বলিস্ তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে চলে যেতুম। হ্যাঁরে, খেঁদী বলছিল তুই নাকি এতদিন কলকাতায় ছিলি? সত্যি? মাইরি বলছি, আমার ভারী ইচ্ছে করে কলকাতায় থাকতে, এমন সুন্দর জায়গা আর কোথাও নেই। রাস্তাগুলো কেমন বাঁধানো—ধুলো নেই, কাদা নেই, ধোয়ামোছা একেবারে খট্‌খট্ করছে। কোথাও বনজঙ্গল নেই, পচা পুকুর নেই, কেবল বড় বড় বাড়ি একেবারে মালার মত গাঁথা—আর আলোগুলো কি সুন্দর!

তারপর সে নিজেই স্কুলের কথা পাড়িল, কতগুলি ছেলে এ বছরে 'টেস্টে এলাউ' হইয়াছে বলিল এবং মধু যে ফার্স্ট হইতে পারে নাই তাহা বলিতে বলিতে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আমি এতক্ষণ ভুতোর কথা শুনিয়া মনে মনে বেশ কৌতুক উপভোগ করিতেছিলাম কিন্তু স্কুলের কথা উঠিতেই আমার মন কেমন খারাপ হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল তাহারা সকলে পরীক্ষা দিবে, পাশ করিবে আর আমি পারিব না। আর তিনদিন পরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা! আমি নীরবে ভুতোর মুখের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম, ভুতো কিন্তু তখনো নিজের উৎসাহে বলিয়া চলিয়াছে—জানিস্ আলো আমাদের 'সিট্' পড়েছে দ্বারভাঙ্গা 'বিল্ডিংয়ে'। তুই দেখেছিস সে বাড়িটা? হ্যাঁরে সেটা নাকি খুব উঁচু, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মাথা ঘোরে? আমরা একঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকবো, হেডমাস্টারমশায় বলেছেন!

হেডমাস্টারের নাম শুনিয়াই আমার মনটা 'ছ্যাঁৎ' করিয়া উঠিল। তিনি কি আমার সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন তাহাদের কাছে। একবার মনে হইল ভুতোকে জিজ্ঞাসা করি কিন্তু পারিলাম না, সঙ্কোচ বোধ হইল।

ভুতো কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিল না। শুধু আপনার আনন্দে আপনি বলিয়া চলিল, কবে তাহারা কলিকাতায় যাইবে, সেখানে তাহাদের দেশের কোন্ লোকের মেস্ আছে, সেখানে গিয়া তাহারা সকলে একত্রে থাকিবে। শুধু মধু আর কমল তাহাদের সঙ্গে যাইবে না। তাহারা স্বতন্ত্র থাকিবে। মধুর মামারা খুব বড়লোক, কলিকাতায় তাহাদের বাড়ি আছে—মধু ও কমল কাল সেখানে চলিয়া গিয়াছে।

এক নিঃশ্বাসে কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপ-বিহীন বাক্য বলিতে বলিতে হঠাৎ এক সময় আমার মুখের দিকে চাহিয়া ভুতো থামিয়া গেল। বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছিল সে কথা-গুলি আমার ভাল লাগিতেছি না। তাই কতকটা যেন আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য আবার বলিল, ভাই আলো তুই যদি এবার এক্‌জামিন দিতিস্ তাহ'লে বেশ হ'তো—আমরা দুজনে একসঙ্গে কলকাতায় যেতুম। তোর কথা মনে হলে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে যায় ভাই—কেন তুই এবছরটা মিছিমিছি নষ্ট করলি এমন করে? এই বলিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল যেন কোন প্রত্যুত্তরের আশায়।

ইহার জবাবে কি বলিবার আছে তাহা আমি নিজেই জানিতাম না। তাই চুপ করিয়া রহিলাম। আমি যে তাহাদের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে পারিব না, একমাত্র সেই চিন্তাই যেন আমার সমস্ত অন্তরকে কম্পিত করিতে লাগিল। শুধু মধু ও কমল পরীক্ষা দিবার জন্য ইতি-মধ্যে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বুকের স্পন্দন যেন দ্রুততর হইয়া উঠিল!

ভুতোও কি কথা বলিয়া এই নীরবতা ভঙ্গ করিবে তাহা বোধকরি খুঁজিয়া পাইতেছিল না তাই আমারই মত সেও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, জানিস্ আলো, হেড-মাস্টারমশায় তোকে 'টেস্টে' এলাউ ক'রে দিয়েছিলেন, যদি তুই এসে পড়িস্ এই আশায়—

যেন বারুদে অগ্নিসংযোগ হইল। দপ্ করিয়া মনটা জ্বলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ভুতোকে কি বলিতে যাইতেছিলাম তারপর মনে পড়িয়া গেল এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর হঠাৎ এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিলে ভুতো কি ভাবিবে, তাই অন্তরের সমস্ত ব্যাকুলতা যথাসম্ভব দমন করিয়া বলিলাম, তারপর কি হ'লো?

তারপর আর কি হবে, তুই এলি না দেখে হেডমাস্টার খুব মুষড়ে পড়লেন।

এমন সময় জ্যাঠাইমা দরজার কাছে আসিয়া ভুতোকে বলিলেন মুখপোড়া এখনো বসে আড্ডা মারছিস, আর তিনদিন পরে এক্‌জামিন—একঘণ্টা রাত হয়ে গেল সেদিকে হুঁস নেই।

ভুতো আর কোন কথা না বলিয়া একরকম ছুটিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন আমার দিকে আরো দুই-পা আগাইয়া আসিয়া জ্যাঠাইমা বলিলেন, বলি নিজেও কিছু করলি না, আবার যারা করছে তাদেরও মাথাটা কি এমনি ক'রে খেতে হবে? দেখছিস্ যে আর তিনদিন পরে পরীক্ষা, কোন্ আক্কেলে তুই ওর সঙ্গে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিস্? বলি, পাঁচ বছরের খোকাটি নস্ যে কিছু বুঝিস্ না—তবে সব জেনেশুনে মানুষ যদি একাজ করে, তবেই দু'কথা বলতে হয়! আর হক্‌কথা বললেই লোকে মনে করবে, জ্যাঠাই দু'চোক্ষে দেখতে পারে না—এইভাবে আপন মনে বিলাপ করিতে করিতে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ভুতোকে আমি ডাকি নাই, সে নিজেই আসিয়াছিল এবং একটির বেশী কথাও তাহার সহিত আমি কহি নাই তবুও জ্যাঠাইমা যখন অকারণে আমায় ভর্ৎসনা করিলেন আমি তখন তাহার কোন জবাব দিতে পারিলাম না। মুখ বুজিয়া সবই সহ্য করিলাম। শুধু একাকী সেই নির্জন ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কেন ফিরিয়া আসিলাম, কিসের আকর্ষণে? সেই ঘর, তাহার ভাঙ্গা দেওয়াল, তাহার মলিন বিবর্ণ জিনিষপত্তর—সব যেন জ্যাঠাইমার কথার প্রতি-ধ্বনি তুলিয়া একসঙ্গে আমার গলা টিপিয়া ধরিতে লাগিল। আমি বাহিরের দিকে চাহিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। শুধু সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল।

এমন সময় বাহিরে কে ডাকিল, কালীচরণ বাড়ি আছো হে?

আরে, এ যে হেডমাস্টারের কণ্ঠস্বর! আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম।

জ্যাঠামশায়কে আর একবার ডাকিতেই তিনি বাহিরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর হেডমাস্টারমশায়কে দেখিয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আপনি, মাস্টার-মশাই—এই রাত্রে অন্ধকারে একলা বেরিয়েছেন কি মনে করে—কারুর অসুখবিসুখ করেছে কি—তা ওষুধ নিতে আর কাউকে পাঠালেই পারতেন—আপনি বুড়োমানুষ এতটা পথ কষ্ট ক'রে আসতে গেলেন কেন?

হেডমাস্টারমশায় বলিলেন, কষ্ট আর কি বাবা, লণ্ঠনটা হাতে থাকলে যেতে আসতে আমার বিশেষ কষ্ট হয় না—তা তুমি ব্যস্ত হয়ো না কালীচরণ, অসুখবিসুখ কারো করেনি বাড়ির খবর নারায়ণের কৃপায় সব একরকম চলছে।

জ্যাঠামশায় প্রশ্ন করলেন, তবে, এই রাত্রে কি মনে করে?

তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, হ্যাঁ হে শুনলাম তোমার ভাইপো নাকি ফিরে এসেছে? তাই তার সঙ্গে একবার দেখা করতে এলাম। শশধরের ছেলে বললে সে নাকি তাকে পথে আসতে দেখেছে!

—তা এই অন্ধকারে আপনি না এসে কাউকে দিয়ে একটু খবর পাঠালেই ত হ'তো মাস্টারমশাই ও নিজে গিয়ে দেখা করে আসতো?

—না, না, তার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার—ডাক দেখি তাকে শিগ্‌গির একবার এখানে!

আচ্ছা, আপনি ঘরের ভেতরে এসে বসুন, আমি তাকে ডেকে আনছি। এই বলিয়া জ্যাঠামশায় হেডমাস্টারমশায়কে ঘরে বসাইয়া আমাকে ডাকিতে আসিলেন। আমার বুকের ভিতরটায় কে যেন তখন হাতুড়ি পিটাইতেছিল। ঘাড় হেঁট করিয়া আমি ফাঁসীর আসামীর মত জ্যাঠামশায়ের পিছনে পিছনে গিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইলাম। জ্যাঠামশায় আমায় ইঙ্গিত করিলেন তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য।

আমি তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেই তিনি একেবারে আমায় বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর সস্নেহে পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, আমি জানতুম, ও ঠিক ফিরে আসবে—আলোক আমার তেমন ছেলে নয়—বুঝলে কালীচরণ? এই বলিয়া তিনি হি হি করিয়া ছোট ছেলের মত হাসিয়া উঠিলেন।

ইহা দেখিয়া জ্যাঠামশায় একটু অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বার দুই তিন ঢোক গিলিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি জানতেন মাস্টারমশায়?

নিশ্চয়ই। আমার মন বরাবর জানতো যে, আলোক কখনো এক্‌জামিন না দিয়ে থাক্‌তে পারে না—যেখানেই থাক, অন্তত এক্‌জামিনের আগে ও বাড়িতে আসবেই।

জ্যাঠামশায় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি বলিলেন, কোন্ এক্‌জামিনের কথা আপনি বলছেন মাস্টারমশায়?

কেন, এই ম্যাট্রিক পরীক্ষার কথা। তিনি প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

তা কি ক'রে সম্ভব, আর তিনদিন মাত্র বাকী। এই বলিয়া জ্যাঠামশায় বিস্মিত দৃষ্টিতে হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকাইতেই তা আমাকেই ত বললে পারতেন টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ও পরীক্ষার 'এডমিট্ কার্ড' বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন।

জ্যাঠামশায় তাঁহার হাত হইতে সেইগুলি লইয়া বলিলেন, মাস্টারমশায় আপনি তাহ'লে ওর হয়ে নিজে 'ফি' জমা দিয়েছিলেন?

আর একবার ছোট ছেলের মত হাসিয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, আমার মন জান্‌তো ও যেখানেই থাক 'এক্‌জামিন' কখনো কামাই করবে না।

জ্যাঠামশায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, তা আমাকেই বললে পারতেন টাকা জমা দেবার জন্যে—আপনি যখন জানতেন ও আসবেই। আমি মনে করলুম ওর কোন পাত্তাই নেই—মিছিমিছি টাকাগুলো নষ্ট করে লাভ কি?

আরে লাভলোকসান পরে হবে কালীচরণ—ওসব হিসেব এখন থাক্। এই বলিয়া তিনি যেন অন্তরের আনন্দ চাপিতে চাপিতে আমার হেঁটমুখটি তাঁহার মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, এই ক'দিন বেশ ভাল ক'রে পড়েছিস্ ত?

আমি হাসিব, কি নাচিব, কি কাঁদিব কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছিলাম না। তাই শুধু ঘাড় নাড়িলাম। কিন্তু ঘাড় কোন দিকে নড়িল তাহা দেখিবার পূর্বেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমি জানি তোর সব ভাল ক'রে পড়া আছে—তা এখন কি করছিলি তোর পড়া ত আমি শুনতে পাইনি?

আমি ইহার কি জবাব দিব ভাবিতেছিলাম এমন সময় তিনি নিজেই আবার বলিলেন, আচ্ছা কাল সকালে উঠেই আমার কাছে পড়তে যাবি—এ তিনটে দিন একটু ভালো ক'রে বই দেখে নিলেই চলবে। এই বলিয়া হ্যারিকেন

([illegible] ৬৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি

শ্রীরমানাথ রায়

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩নং শ্লোকটি আপাতদৃষ্টিতে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করে না বলিয়াই মনে হয়। শ্লোকটি এই:—

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহ কিং করিষ্যতি॥"

অর্থঃ—"জ্ঞানবান পুরুষও আপন প্রকৃতির অনুরূপ কর্মই করিয়া থাকেন, সকল প্রাণী স্ব স্ব প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তদনুরূপেই কর্মচেষ্টা করিতে বাধ্য হয়, এই প্রকৃতিকে রোধ করিতে চেষ্টা করা নিষ্ফল।" গীতার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই ইন্দ্রিয় দমন, আত্মসংযম এবং মনকে নিগ্রহ করিবার কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। ব্যাপারটা কঠিন, কিন্তু তাহা হইলেও গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চঞ্চল মনকে বশীভূত করা যায়। শুধু তাই নয়, তার পরই বলিলেনঃ—"অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।" অসংযতচিত্ত পুরুষের পক্ষে যোগ দুর্লভ ইহা আমার মত। এইরূপ কত বাক্যই উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। তাহা হইলে "প্রকৃতিকে রোধ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল," সকল প্রাণীই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে বাধ্য, এমন কি জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কার্যই করিয়া থাকেন। এইরূপ বলিবার অর্থ কি? স্থূলদৃষ্টিতে স্ববিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান এই বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিতে হইলে বিশেষ বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। (ক) প্রথমে দেখিতে হইবে শ্লোকটি কি উদ্দেশ্যে, কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপোষকরূপে এবং গীতার কোন্ অধ্যায়ে কি বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। (খ) আরো দেখিতে হইবে "প্রকৃতি" অর্থ কি— এবং জ্ঞানবান বলিলেই বা কি বুঝা যায়। (গ) তারপর "নিগ্রহ" শব্দের যথার্থ অর্থও নির্ণয় করিতে হইবে। শ্লোকটি তৃতীয় অধ্যায়ের। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই যখন অর্জুন প্রশ্ন করিলেন, "তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব?" তদুত্তরে ভগবান বলিলেন,—প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন কর্ম করিতে বাধ্য; কারণ, কর্ম না করিয়া মানুষ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্মকৃৎ" কর্মের প্রকারান্তর থাকিতে পারে কিন্তু সকলেই কর্ম করিয়া থাকে। এমন কি জীবন-ধারণের জন্য অর্থ উপার্জনাদি কর্ম অবশ্যম্ভাবী। কর্ম একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরীর রক্ষাও করিতে পারিবে না,—"শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ কর্মনঃ।" আর যাঁহারা কেবলমাত্র ধ্যান-ধারণা করেন তাঁহারাও একেবারে কর্ম করেন না তাহা নহে—কারণ, ধ্যান-ধারণাও কর্মই, তাহা ছাড়া শরীর ধারণের জন্য যে আহারাদি করেন তাহাও কি কর্ম নয়? অতএব কর্ম সকলকেই করিতে হয়—ইহা সত্য। তাহা হইলে দেখা গেল, কর্ম যে অবশ্য করণীয় ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তার পর দেখা যাউক "প্রকৃতি" বলিলে এখানে কি বুঝিব? প্রত্যেক জীব নিজ নিজ কর্মানুযায়ী প্রারব্ধ ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; এই প্রারব্ধকেই জীবের স্বভাব বা প্রকৃতি বলা হয়। সকলের পূর্বজন্মকৃত কর্ম একরূপ না হওয়াতে তাঁহাদের প্রারব্ধ বা স্বভাবও এক হয় না, গুণানুযায়ী এই স্বভাব বা প্রকৃতি ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তাই মানুষের মধ্যে কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক কেহ বা তামসিক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যে যেরূপ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার কার্যও তদনুরূপই হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি সাত্ত্বিক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কাজেই তাঁহার আচরণ বা আচরিত কর্মসমূহও তদ্রূপই হইবে। জ্ঞানী বা সাত্ত্বিক প্রকৃতি লোকের কর্মে বা আচরণে সাত্ত্বিক গুণ পরিলক্ষিত হইবে; কাজেই "জ্ঞানীও" আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করিয়া থাকেন বলিলে তাহা যে সকল রকম ন্যায় অন্যায় বিচাররহিত উচ্ছৃঙ্খল কর্ম নহে, বিশেষভাবেই বোঝা যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 'জ্ঞানী'ও আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করিয়া থাকেন বলাতে, তাহা সত্য, ন্যায়, নীতি সংযমহীন হইবে, মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু গীতার কোন কোন ব্যাখ্যাকারগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করাকে উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করিয়া 'জ্ঞানী' শব্দের সহজ ও স্বাভাবিক অর্থ ছাড়িয়া নানাভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে 'জ্ঞানী' অর্থে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে—জ্ঞানের ফলে এখনো যাঁহার চরিত্রে পূর্ণতা লাভ হয় নাই। কাজেই জ্ঞানী শব্দ এখানে 'প্রকৃত জ্ঞানী' অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যথার্থ জ্ঞানী উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারেন না, অথচ প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করা অর্থ তাঁহাদের নিকট উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কিছুই নহে; কাজেই তাঁহারা জ্ঞানীর অর্থ ঐরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, জ্ঞানীর প্রকৃতি জ্ঞানীরই উপযুক্ত হইবে এবং তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা দোষে দুষ্ট হইতে পারে না; তাহা হইলে জ্ঞানী শব্দের ঐরূপ অর্থ তাঁহাদের করিতে হইত না। তাছাড়া জ্ঞানী শব্দের পর "অপি" "ও" থাকাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে—জ্ঞানী শব্দ এখানে কেবলমাত্র আক্ষরিক বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হয় নাই; তাহা হইলে "অপি" "ও" পরে বসাইয়া কথাটার উপর জোর দিবার কোনই অর্থ হয় না। অতএব "জ্ঞানীও" আপন প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম করিয়া থাকেন বলাতে কোনই দোষ হয় নাই। তারপর আছে "সকল প্রাণীই প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম করিতে বাধ্য" তাহাও ঠিক; কারণ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—কর্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। কর্ম করাই মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি তবে সেই কর্ম করার ধারা সকলের একরূপ নহে। কর্ম করা সাধারণভাবে সকলের স্বভাব বা প্রকৃতি হইলেও সেই স্বভাব বা প্রকৃতি সকলের একরূপ নহে। কোথাও সত্ত্ব, কোথাও রজঃ আবার কোথাও বা তমঃগুণের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। যে প্রকৃতিতে যে গুণের প্রাধান্য বেশী, তাহার কর্মে বা আচরণে তাহাই প্রকাশ পাইবে। অতএব "সকল প্রাণীই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করিতে বাধ্য" বলিলে তাহাতে যে সকলেই অন্যায় কর্ম করিবে, এইরূপ মনে করিবার কোন হেতুই নাই। তবে যাহারা তামসিক প্রকৃতির, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিবে ঠিকই; কারণ তামসিক স্বভাব বা প্রকৃতি অনুযায়ী তাহাদের কর্মের ধারা ঐরূপ হইতে বাধ্য। তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়াইল, তামসিক প্রকৃতি ব্যক্তি যখন অন্যায় কর্ম করিবে, তখন কি তাহা রোধ করিবার চেষ্টা করা হইবে না? এক কথায় "হ্যাঁ" "না" বলিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যাইবে না। কথাটা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। "কথাটি" ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—কিন্তু এক্ষণে কিজন্য বলিয়াছেন, কেন বলিয়াছেন—স্থান, কাল, পাত্র বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। অর্জুন ক্ষত্রিয় — যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। ক্ষত্রিয় অন্যায়ের শাস্তা বা শাসনকর্তা—ন্যায়ের পালনকর্তা এই ক্ষাত্রধর্ম — আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের পক্ষেই সমভাবে প্রযুজ্য, কিন্তু অর্জুন ন্যায় যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের মৃত্যু কল্পনা করিয়া চঞ্চলচিত্ত — বিপদগ্রস্ত। মোহ আসিয়া তাঁহার বুদ্ধি আবদ্ধ করিয়াছে—

কর্তব্য অকর্তব্য নির্ণয় অসমর্থ হইয়া আপন স্বধর্ম—ক্ষাত্রিয়ধর্ম পালনে অসম্মত। যুদ্ধ করিতে এই যে অসম্মতি ইহা তাঁহার স্বভাবগত প্রকৃতিগত ক্ষাত্রধর্ম নহে। সাময়িক অবসাদ মাত্র। কাজেই সাময়িক অবসাদ বা মোহ দ্বারা তিনি তাঁহার "প্রকৃতি" ক্ষাত্রিয়ধর্ম রোধ করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কৃতকার্য হইবে না—ইহাই ভগবানের "নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" কথার অর্থ। তাই তিনি অন্যত্র বলিলেন—"হে অর্জুন! তুমি যুদ্ধ করিবে না বলিতেছ, কিন্তু তুমি যুদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। কারণ তুমি ক্ষাত্র-প্রকৃতি লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ। তোমার এই সাময়িক মোহ বা অবসাদ স্থায়ী হইবে না—কাজেই যুদ্ধ করিবে না বলিয়া তোমার ক্ষাত্র প্রকৃতিকে রোধ করিবার যে চেষ্টা তাহা ব্যর্থ হইবে। কারণ তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে।" অর্জুন সাময়িক মোহে অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করিতে যাইতেছেন বলিয়াই ভগবান তাঁহাকে ঐ কথা বলিলেন। আর বাস্তবিকই তাই। ভগবানের কথায় অর্জুন স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন বলিয়াই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা না হইলে এই ভীষণ যুদ্ধে যখন একে একে আত্মীয়স্বজন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, তখন এইরূপ অবসাদ আসিয়া মাঝে মাঝে বিঘ্ন ঘটাইতে পারিত। এমন কি প্রাণপ্রিয় অভিমন্যুর মৃত্যুতে তিনি শোক প্রকাশ করিলেও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার ক্ষত্রিয়-স্বভাবই তাঁহাকে তখন দ্বিগুণতর বেগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি যদি তামসিক প্রকৃতির লোক হইতেন এবং তাঁহার কর্ম-মূলে বৃহত্তর প্রেরণা না থাকিত, তাহা হইলে পুত্রের মৃত্যু তাঁহাকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া ফেলিত—আর যুদ্ধ করিতে পারিতেন না। শুধু তাই নয়—অন্যত্র যখন অর্জুন মনকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া নালিশ করিলেন, তখনও ভগবান বলিলেন—"হাঁ কঠিন বটে, কিন্তু চেষ্টা ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহা সম্ভব।" এখানে অর্জুন যে দৈবী সম্পদের অধিকারী হইয়া মনকে দমন করিতে সমর্থ—তাহাই বলিলেন। তাঁহার বক্তব্য হইল—"হে অর্জুন! তুম যদি মনে করিয়া থাক তোমার যে স্বাভাবিক প্রকৃতি—যদ্দ্বারা তুমি তোমার মনকে দমন করিতে সক্ষম, তাহা সাময়িক বা আগন্তুক কোন কারণ দ্বারা রোধ করিতে সমর্থ হইবে, তবে তাহা ভুল জানিও। কারণ "ত্বং দৈবীং অভিজাতোহসি তুমি দৈবী সম্পদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ" এই দৈবী সম্পদের মধ্যে একটি হইল "ইন্দ্রিয় দমন", কাজেই অর্জুন ইন্দ্রিয় দমনে সমর্থ "প্রকৃতি" লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব অর্জুন যদি এইরূপে প্রকৃতিকে অর্থাৎ যে প্রকৃতি ইন্দ্রিয় দমনে সমর্থ তাহাকে রোধ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা নিষ্ফল হইবেই। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই কথা। অতএব কি অর্থে এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহাই সর্বপ্রথম বিচার্য। উপরে এ সম্বন্ধে যে বিচার করা হইয়াছে, সেই দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে কথাটা যে ঠিকই হইয়াছে, তাহা বোধহয় অস্বীকার করা চলে না। তার পরই প্রশ্ন দাঁড়াইবে—কথাটা কি তবে সর্ব-জনীন নহে—কেবল ব্যক্তিগতভাবে অর্জুনকেই বলা হইয়াছে? না, তাহা নহে; আমরাও তা বলি না। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও ইহা সর্বজনীন—সকলের জন্য—সর্বকালের জন্যই। সে কিরূপ, এখন দেখা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যে কথাবার্তা, তাহা গুরু-শিষ্যের মধ্যে কথা-বার্তা, এ কথাটা আগে বুঝিতে হইবে। গুরু হওয়ার উপযুক্ত তিনিই, যিনি শিষ্যের জন্ম, কর্ম এবং প্রকৃতি অবগত হইতে সমর্থ। কাজেই, সর্বজ্ঞ গুরু যখন শিষ্যকে কোন কার্য করিতে নিষেধ করিয়া বলেন, "তুমি এইরূপ করিতে চেষ্টা করিও না—করিলেও কৃতকার্য হইবে না," তখন শিষ্যের যথার্থ শক্তি-সামর্থ প্রকৃতি জানেন বলিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকেন,—এর অর্থ, শিষ্যকে প্রবৃত্তির অনুকূলে গা ভাসাইয়া দিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইতে বলা নহে। শিষ্য যখন তাহার শক্তির বাহিরে প্রকৃতির প্রতিকূলভাবে কিছু করিতে চেষ্টা করেন, তখনই গুরু তাঁহাকে তাহা করিতে নিষেধ করিয়া ঐরূপ চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে, তাহা বলিয়া দেন। কাজেই, শক্তিমান গুরু কর্তৃক শিষ্যের অধিকার অনুযায়ী এইরূপ উপদেশে অসংযমকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে মনে করিলে একান্তই ভুল করা হইবে এবং তদ্রূপ মনে করিলে গীতার পূর্বাপর বহু বাক্যের সহিত ইহার বিরোধ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু আমরা যে অর্থে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলাম, তদ্রূপভাবে গ্রহণ করিলে এই বাক্যের সঙ্গে অন্যান্য "বিধি" বাক্যের কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনা নাই। এখানে একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাউক। অনধিকারী শিষ্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি মনস্থ করিয়াছি ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিব—স্ত্রী-পুত্র সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব।" সর্বজ্ঞ গুরু দেখিলেন, শিষ্য এই কঠোর ব্রত পালন করিতে অধিকারী নহে; তাই তিনি বলিলেন, "এখন তোমার এইরূপ কঠোর ব্রত সাধন করার সামর্থ হয় নাই—চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য হইবে না।" এই কথা শুনিয়া কেহ যদি মনে করেন, শিষ্য পবিত্র ব্রহ্মচর্যব্রতপরায়ণ হইয়া, সর্বপ্রকার মোহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসী হইতে চাহিল, আর গুরু কি-না তাহাকে বারণ করিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া প্রবৃত্তির পথেই চলিতে বলিলেন! এইরূপ যুক্তি যেমন যথার্থ সত্য নহে, কারণ গুরুর নিষেধের অর্থ যেমন শিষ্যের সামর্থ অনুযায়ী উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নহে—"নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?" বাক্যের অর্থও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। অনধিকারী উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী চলিবার চেষ্টা করিলে বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। গৃহীর পক্ষে যাহা বিধি, সন্ন্যাসীর পক্ষে তাহা নিষেধ। আবার সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহা বিধি, গৃহীর পক্ষে তাহা নিষেধ। রোগীর পক্ষে যে খাদ্য নিষেধ, সুস্থকায় ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিধি। বালকের পক্ষে যাহা নিষেধ, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিধি। কাজেই, এই বিধি-নিষেধ অধিকারী নির্ণয় সমর্থ শক্তি-মান গুরুর নির্দেশ, ইহা বুঝিলেই—"নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" বাক্যের রহস্য বুঝা যাইবে, আমরা মনে করি।

বাঁকা স্রোত

(৬৪২ পৃষ্ঠার পর)

লণ্ঠনটা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, আচ্ছা কালীচরণ তবে এখন আসি।

আমি আর একবার হেডমাস্টারমশায়কে নমস্কার করিলাম। ইচ্ছা করিল তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদি!

হেডমাস্টারমশায় চলিয়া যাইতেই জ্যাঠা-মশায় ক্ষিপ্রপদে জ্যাঠাইমাকে ডাকিতে ডাকিতে রান্নাঘরের দিকে চলিলেন—ওগো, শুনচো, আলোও এবার একজামিন দেবে!

কে বললে? বলিতে বলিতে তিনি একেবারে রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জ্যাঠামশায় তখন সেই কাগজ দুইটি তাঁহার সামনে ধরিয়া বলিলেন, এই দ্যাখো, মাস্টার-মশায় নিজে টাকা জমা দিয়েছেন ওর হ'য়ে।

কঠিন দৃষ্টিতে একবার তাঁহার হাতের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন ছাতাকেও কি এইরকম কাগজ দিয়েছে?

জ্যাঠামশায় সাগ্রহে বলিলেন, হাঁ, একেবারে এক—এই দ্যাখো—

দেখে আমার কি চারটে হাত বেরুবে, তুমি দ্যাখো। এই বলিয়া তিনি সবেগে রান্না-ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বিনা প্রয়োজনেই ভাতের হাঁড়িতে কাঠি দিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

চাঁদ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবিশ্রান্ত লিখে চল্‌বার পর হঠাৎ এক সময়ে সামনের জানালাটা হাত বাড়িয়ে খুলে ফেল্‌লে নিলীমা। এক ঝলক হাওয়া। কালো আকাশটা রঙ্গমঞ্চের যবনিকার মত ঝুলে আছে! আলো নেই। সামনের ফুল বাগানটা কালো হয়ে ঘুমুচ্ছে। জানালার কাছে বেঁকে আছে কী একটা গাছের পত্রবিরল শুকনো একটা ডাল।

কলমটা রেখে দিলে। ভালো লাগছে না নিলীমার। এই কঠিন অন্ধকার অপসারিত ক'রে এখন যদি পরম দাক্ষিণ্যের জ্যোৎস্নার প্লাবন ব'য়ে যেত এখানে, তাহ'লে ভারী সুন্দর হ'তো। ফুল বাগানটা স্বপ্নে জেগে উঠত আর নিলীমা লেখবার টেবিলটা একধারে ফেলে রেখে উন্মুক্ত জানালায় এসে বসত। চুলগুলি এলিয়ে দিত, আঁচলটাকে লুটিয়ে পড়তে দিত, আর ডানহাতটার ওপর মাথাটা একটু কাৎ ক'রে রেখে সারা শরীরটাকে শিথিল আলস্যে ভরিয়ে দিত!

কিন্তু আলো নেই। আকাশটা কালো। বোধহয় কোন কৃষ্ণপক্ষের রাত। টেবিল থেকে লেখবার সরঞ্জাম একটু সরিয়ে দিয়ে সুমিতর চিঠিটা আবার চোখের সামনে মেলে ধরলে নিলীমা। আর একবার চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলে সে।

সুচরিতাসু,

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে অকস্মাৎ এই চিঠিটা পেয়ে তুমি খুবই আশ্চর্য হবে হয়ত। তিন বৎসর,—ভেবে দেখ্‌লে সময়টা দীর্ঘই বটে, কিন্তু সত্যি বল্‌ছি কেমন ক'রে যে এই সময়টা আমার এখানে কেটে গেল, ভেবেই পাই না। একটা অফিস থেকে আর একটা অফিস, এমনি ক'রে ক'রে সারাটা দাক্ষিণাত্য আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে এলো। তিনটা বৎসর যেন শুধু ট্রেন বদল করতে করতেই গেল কেটে।

যাক্, শুনে সুখী হবে, সম্প্রতি ট্রেন-বদলের পালা বোধহয় শেষ হ'ল। বোম্বের একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হ'য়েছি আমি। অফিসের পাশের ফ্ল্যাটেই আমার চেম্বার। অফিসে আমার কাজ, চেম্বারে আমার বিশ্রাম।

আমার ঘরের একটা দেয়াল একেবারে কাঁচেরই বল্‌তে পারো। আর তার কাঁচের পাল্লাটা সরিয়ে দিলেই সেটা একটা বিরাট জানালায় রূপান্তরিত হয়ে গেল! জানালার ধারে একটা কৌচে আমি বসি। সামনে ছোট্ট একটা লেখবার টেবিল। কোন সময় লেখবার কিছু থাক্‌লে লিখি আর নয়ত পাইপ টানি আর ভাবি। হ্যাঁ, ভাবি বই কি। একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, টাকাগুলো কিভাবে খাটালে আয়তনে বেড়ে যায়, কিভাবে ব্যয়টা কমালে আয়টা বেশী হয়, এ'সব যথেষ্ট ভাবতে হয় বই কি।

আজ, এখন, একটা বেশ মজা হ'য়েছে। রাত প্রায় বারোটা,—ঘুমটা হঠাৎ গেল ভেঙে। চেয়ে দেখি, শুয়ে আছি জানালার ধারে সেই কৌচটাতেই। আর জানালাটাও রয়েছে খোলা। আকাশটা আলোয় আলো,—অবারিত জ্যোৎস্নার প্লাবন!

তোমায় মনে পড়ছে।...তিন বৎসর আগে দেখা একটা ছবি। তোমারই ঘরের জানালায় ব'সেছিলে। শুক্লা সন্ধ্যার রাত। চুলগুলি এলিয়ে দিয়েছ, আঁচলটা লুটাচ্ছে পায়ের তলায়, ডান হাতের ওপর মাথাটা একটু হেলিয়ে তুমি চুপ ক'রে চেয়ে আছ আকাশে। নিজেকে ভুলে গিয়েছিলে তুমি তখন। দেখতে পাওনি, তুমি কী সুন্দর, তুমি কী অপরূপ! তুমি নিজেই জান্‌তে না, তোমার দু'গাছি চুড়ি পরা হাত দুখানি কী চমৎকার, তোমার কালো চুলের অরণ্য কী গভীর আর কী রহস্যময়! আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়েছিলাম। ব'সেছিলাম তোমার পাশে। তুমি ত বাধা দেওনি। নিশ্চুপে আমার একখানা হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ব'লেছিলে,—"মিতা!"

আমি উত্তর দিতে পারিনি। তুমি হয়ত মৃদু একটু হেসেছিলে মুক্তোর মত দাঁত-গুলি একটু ঝিল্‌মিলিয়ে উঠেছিল, তারপর ব'লেছিলে, "রাগ ক'রো না সুমিত, আজ থেকে তুমি হলে আমার "মিতা"!

আমার মনে আছে। আমি উচ্ছ্বসিত সমুদ্র দেখেছি। দেখেছি অন্তহীন রহস্য-গভীর জ্যোতির্নীল মহাসাগরের রূপ! আর দেখেছি ব'লেই একদিন তোমার নাম দিয়েছিলাম, "নীল!" তুমি উচ্ছ্বসিত হেসে উঠেছিলে এর উত্তরে, মনে আছে।

তুমি রাগ ক'রো না, আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে। তোমাদের বাসার ছোট্ট ফুল বাগানটায় আমরা বেড়াতাম। আচ্ছা, সেই অপরাজিতার মণ্ডপটা এখনও আছে ত? মনে আছে, একদিন ওর তলায় দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ আমার মাথায় ঝরে পড়ল একটা ফুল। তুমি হেসে ব'লেছিলে, "অপরাজিতা তোমায় ভালবাসে, তাই ত ঝ'রে পড়ল তোমার ওপর!" কথাটা শুনে খুবই হেসেছিলাম সেদিন। আজ জিজ্ঞাসা করি, যদি সেই অপরাজিতার মণ্ডপের তলায় গিয়ে দাঁড়াই, তাহ'লে আমার ওপর এখন আর একটি ফুলও কি ঝ'রে পড়বে না? ইতি তোমার "মিতা"

চিঠি শুদ্ধ হাতখানা টেবিলের ওপর নেমে এলো। এ পাশে ওপাশে দরকারী খাতাপত্রগুলো ছড়িয়ে আছে। বিগত অধিবেশনের যে রিপোর্টটা লেখা হ'চ্ছিল প্রবাসী সেক্রেটারী মিঃ চৌধুরীর উদ্দেশে, সেটা এখনো শেষ হয়নি। মিস্ লতিকা রায় এক মাসের ছুটি চেয়েছেন তাঁর বিবাহের জন্য। তাঁর মঞ্জুর পত্র ছোট লেখবার প্যাডটার প্রথম পৃষ্ঠায় অর্দ্ধ-সমাপ্ত হ'য়ে আছে। মিঃ ও মিসেস নাগ ম্যানেজিং কমিটি থেকে অবসর নিতে চান, সে খবরটাও কাগজে কলমে প্রেসিডেণ্টকে জানাতে হবে। স্কুল থেকে এবার বোধ হয় দুটি ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাবে, সে খবরটাও সঠিক জানা হ'ল না। স্কুলের সংগে কিছু কিছু কলেজের ক্লাশ খোলবার চেষ্টা চলছে, তা নিয়ে অনেক লেখালেখি—অনেক পরিশ্রম সম্পূর্ণ বাকী। ওঃ, নীলিমার আজ অনেক কাজ! —অনেক কাজ।

মিত, এই বিরাট কাজের ফাঁকে একবার তোমায় দেখে আস্‌তে ইচ্ছা করছে। তুমি শুয়ে আছ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাথার চুলগুলি ঝক্‌ঝক্ করে উঠেছে, তোমার বুকের মাঝে নরম জ্যোৎস্না খেলা করছে,—তোমার মোটা মোটা আঙ্গুলের ফাঁকে চুরুটটা আপনা আপনি নিভে যাচ্ছে, আর তুমি চুপ-চাপ চেয়ে আছ।

না, আজ আর নীলিমা কোন কাজই করবে না। টেবিলটা সরিয়ে রেখে জানালায় গিয়ে বস্‌বে। হ'লোই-বা এখন আকাশটা কালোয় কালো। একদিন যে এখানেই উচ্ছ্বসিত আলোর ঢেউ উঠেছিল, সেটাই কি পরম সত্য নয়?

"ঠক্-ঠক্—ঠক্-ঠক,"—রুদ্ধ দরজায় করাঘাত বেজে উঠল।

"কে রে?"

"আমি গো দিদিমণি, দরজা খুলুন!"

"ও, ঝি? কী বল্‌ছিস্"—দরজাটা খুলে দিলে।

"এই দেখুন গো দিদিমণি কে এসেছে!"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক অল্প বয়সী

মেয়ে, মাথায় ছোট্ট একটু ঘোমটা। নীলিমা খানিকক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে। তারপরে সহাস্যে ব'লে উঠল, "আরে, তুমি, কমলা! তোমাকে যে চেনাই যায় না। বিয়ে হলো কবে তোমার? ভালো আছ ত? ঘরে এসো।"

কমলা ধীর পায়ে ঘরে এলো। কমলা ওর পুরানো ছাত্রী। পায়ে হাত দিয়ে তার নীলিমাদি'কে প্রণাম করলে। এলাহাবাদে সম্প্রতি বিয়ে হ'য়েছে তার। বাদশাহী মন্ডীতে তারা থাকে। শ্বশুর-শাশুড়ী খুবই ভালোবাসেন তাকে। ছোট একটি দেওর আছে তার, সে'ত বৌদি বলতে একেবারে অজ্ঞান। কলকাতায় বাপের বাড়ি এসেছে সে সবে পাঁচদিন। সিঁথিতে জ্বল্ জ্বল্ করছে তার সিঁদুর, সেই স্বল্পভাষী লাজুক কমলাকে যেন এখন চেনাই যায় না!

খানিক পরে মেয়েটি চলে গেল। নীলিমা ফিরে এলো তার ঘরে।...শুনছ মিতা, একটি মেয়ে এসেছিল আমার কাছে। মাথায় তার ঘোমটা, সিঁথিতে তার সিঁদুর, হাতে তার শাঁখা। আমি তাকে বলেছি,—"কমলা, আর যাই করো নিজেকে বিসর্জন দিও না,—নিজেকে শিক্ষায়-দীক্ষায় ব্যক্তিত্বে উত্তরোত্তর দৃঢ় ক'রে তোলো।" কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি ওকে ভুল বলেছি। না, না, দরকার নেই। কি হবে শুধু এই নিরন্ধ্র গ্রন্থরাজ্যের মধ্য দিয়ে পাদচারণা ক'রে? তার চেয়ে ওরা বিয়ে করুক। ওদের যেন কারুর ছুটির জন্য মঞ্জুরপত্র লিখ্‌তে না হয়, কোন সেক্রেটারীকে যেন রিপোর্ট না পাঠাতে হয়, কোন প্রেসিডেন্টকে যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লিখতে না হয়,—তার চেয়ে ওরা বিয়ে করুক।

ফোনটা ঝন্‌ঝন্ ক'রে বেজে উঠল। মিস লতিকা রায়। তার ছুটির মঞ্জুর-পত্র এখনো পান নি তিনি আজ ছয়-ছয়টা দিন ঘোরাঘুরি করেও। কালই তাকে রওনা হতে হবে নাকি দার্জিলিঙ্, সেখানেই বিয়ে হবে ওঁদের। নীলিমাদি যেন দয়া ক'রে ওকাজটা আজ রাত্রেই শেষ করে রাখেন। কাল সকালেই তিনি আসবেন নীলিমাদি'র কাছে।

ও'দরজা দিয়ে ঝি আবার এলো। হাতে একটা ক্ষুদ্র কাগজ। সেক্রেটারী-বাবুর বাসা থেকে চাকর দিয়ে গেল কাগজের টুকরোটা এইমাত্র। নীলিমা হাতে নিলে। সেক্রেটারী মিঃ চৌধুরী আজ কলকাতায় ফিরেছেন। অনেকদিন স্কুলের খবরাখবর পান না তিনি। কাল যেন মিস্ নীলিমাদেবী ম্যানেজিং কমিটির গত অধিবেশনের রিপোর্টটা দয়া ক'রে অতি অবশ্য দাখিল করেন।

সর্বনাশ, এরই মধ্যে! এখনও যে অনেক কাজ বাকী! টেবিলের আলোটা আরও উজ্জ্বল করে দিয়ে নীলিমা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়্‌ল। আজ তাকে সব কাজ শেষ করতে হবেই। সামনেই কী একটা চিঠি খোলা প'ড়ে আছে। আঃ, কী জঞ্জাল,—টেবিলটা যদি একটুকালও গুছানো অবস্থায় থাকে! কতো সব দরকারী কাগজ-পত্র এখানে। ক্ষিপ্রহস্তে লেখ্‌বার প্যাডটা টেনে নিয়ে মিস্ লতিকা রায়ের ছুটির মঞ্জুর-পত্র লিখতে বসল নীলিমা।

হাতের কাজগুলো যখন শেষ হ'ল, তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। নীলিমা মুখ তুল্‌লে। হাতটা আড়ষ্ট আর শক্ত হয়ে গেছে,—ঠিক যেন একটা যন্ত্র!

রাত নয়টা,—আকাশটা কালো। টেবিলের এক পাশে সুমিতর চিঠিটা প'ড়ে আছে। ওঁকে একটা উত্তর দিতে হবে, অন্তত দেওয়া উচিত।

শুনছ মিতা, ভারী ক্লান্ত লাগছে নিজেকে এখন। ভারী ক্লান্ত। একটা দিনের কথা মনে পড়ছে আমার। 'এম-এ'-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছি বলে তুমি এসেছিলে অভিনন্দন জানাতে। সেদিন কি তিথি ছিল মনে নেই। আমার এই ঘরখানাতেই তুমি এসেছিলে। বলেছিলে একটি অতি সাধারণ কথা,-নর যা' চিরকাল নারীকে বলে এসেছে। আর তারি উত্তরে ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাশ আমি অনর্গল হেসে উঠেছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে সেদিন ভয়ানক হাস্যকর ঠেকেছিল। তোমায় বোধহয় একটু তিরস্কারও করেছিলাম। আর তারই পরে তুমি অকস্মাৎ সরে গেলে আমার কাছ থেকে।

আকাশটা এখনও কালো। টেবিলে লেখবার প্যাড্‌টা খোলা। লিখ্‌বে নাকি এখন একখানা চিঠি সুমিতকে? পরে হয়ত সময়ই হবে না। হাতটা কেমন আড়ষ্ট আর শক্ত হয়ে আছে,—একটা বিকল যন্ত্রের মত। এ যন্ত্র থেকে কি উত্তর বেরুবে এখন? তার চেয়ে চিঠিটা সে মনে মনে ভেবে রাখুক, কাল সকালে সময় করে তাড়াতাড়ি লিখে দিলেই চলবে। কিন্তু কী লিখ্‌বে সে?

মিতা, তোমার সংবাদ পেলাম। জানতে চেয়েছ, আজ তুমি যদি আমার বাগানটার সেই অপরাজিতার মন্ডপের তলায় এসে দাঁড়াও, একটি ফুলও তোমার ওপর ঝরে পড়্‌বে কিনা। চুপি চুপি জানিয়ে রাখি,—পড়বে।...সেদিন কোন কাজে একটা হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। এমারজেন্সী ঘরে হঠাৎ একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়ে গেল। একটা লোক, গাড়ি চাপা পড়েছে বুঝি,—তাকে ঘিরে অনেকগুলি ডাক্তার। "আর সেই আহত লোকটি অসহ্য বেদনায় নীল হয়ে গেছে।...তুমি আমার নাম দিয়েছ, 'নীল', ঠিকই নাম তুমি আমার দিয়েছ মিতা, আমি নীল, নীল আমি!...

"ঠক্-ঠক্—ঠক্-ঠক্,"—দরজায় আবার শব্দ।

নীলিমা এবার একটু বিরক্ত হ'ল। দরজাটা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কী, ঝি, কি বলছিস?"

"বলি, তুমি খাওয়া-দাওয়া আজ করবে না দিদিমণি? নতুন ঠাকুরটা সেই থেকে খালি গজ গজ করছে।"

একটু থামলে নীলিমা, তারপরে বললে, "চল্, যাচ্ছি। আর দেখ্ ঝি, ঝণ্টুটাকে দিয়ে ঐ জানালার পাশে টেবিলটা সরিয়ে রেখে ক্যাম্পখাটটা পাতিয়ে রাখ্ ত। আমি আজ ওখানে শোব।"

"আচ্ছা, সে আমি রাখছি, তুমি এখন যাও ত, কিছু মুখে দিয়ে এসো।"

নীলিমা একটু দাঁড়ালো, তারপরে নীচে নেমে এলো খাবার ঘরে। এই ঘরটা একেবারে রাস্তার ধারে। কলকাতার গতি-স্পন্দন বেশ স্পষ্ট অনুভব করা যায় এখান থেকে। ট্রাম আর বাস আর মোটর, সর্বক্ষণ একটা একঘেয়ে শব্দ রাস্তাটায়।...আশ্চর্য, এখন কি পাশের কোন বাড়িতে কেউ গান গাইছে? কেমন একটা গানের সুর ভেসে আসছে না? নীলিমা কান পাতলে। ঐ আবার একটা ট্রাম এলো বুঝি রাস্তায়,—তারই ঘর্ ঘর্ শব্দ। নীলিমা উৎকর্ণ হয়ে রইল। ট্রামটা চলে গেল, রাস্তাটা নীরব। পাশের বাড়ির গানটা স্পষ্ট হয়ে এবার ভেসে এলো। কে যেন গাইছে গুরুদেবের সেই বিখ্যাত গানটাঃ—

"কী বেদনা মোর জানো, সে কি জানো,
ওগো মিতা মোর অনেক দূরের মিতা!
আমার ভবনদ্বারে রোপণ করিলে যারে,
সজল হাওয়ার করুণ পরশে
সে' মালতী বিকশিতা,
ওগো সে-কি তুমি জনো?
তুমি যার সুর.........।"

আর শোনা গেল না। একটা ট্রাম না বাস এসে পড়ল বুঝি আবার। তারই প্রচন্ড আর্তনাদ, আর কিছু নয়।

খাওয়ার পরে ধীর পায়ে ওপরে এলো নীলিমা। ওর ঘরটার কাছে দাঁড়িয়ে ঝি যেন কার সঙ্গে কথা কইছে। নীলিমা এগিয়ে এলো।

"কে-রে, ঝি?"

"এই যে দিদিমণি। চিনতে পারছ না, আমাদের সেই ঠাকুর, দেশ থেকে ফিরে এসেছে।"

"ও, কবে এলে ঠাকুর? ভালো আছ ত?"

ঠাকুর প্রণামে নুয়ে এলো, বললে, "হ্যাঁ, দিদিমণি।"

পুরানো পাচক ব্রাহ্মণ। সংগে ফুটফুটে একটি ছোট্ট ছেলে। তার দিকে তাকিয়ে নীলিমা বলে উঠল,—"এটি কে ঠাকুর?"

"ওটি দিদিমণি, আমার ছেলে। দেশ থেকে এসেছে আমার সংগে। আবার পরশু দিনই ওর কাকার সংগে ফিরে যাবে।"

সুন্দর ছেলেটি, নীলিমার বেশ লাগল।

"তোমার নাম কি খোকা?"

খোকন লজ্জায় নুয়ে পড়ে, কি যে বলে বোঝা যায় না। নীলিমা হঠাৎ ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলে। "লেবেঞ্চুস নেবে খোকা, লেবেঞ্চুস? ছবি দেখবে, ছবি?"

অল্পক্ষণ। তারপরেই অবাধ্য খোকা বশ হয়। ঠাকুর আর ঝি দরজা থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে,—নীলিমার কোল ঘেঁসে খোকা বসেছে একহাতে তার এক বাক্স লজেন্স—আর নীলিমা দেখাচ্ছে তাকে ছবি। একটা ফাইল বের করেছে নীলিমা—তার মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর ছবি। খোকা উৎসুকে দুটি চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে তাদের ওপর।

"এটা কি, এটা?"—একটা ছবি খোকার খুব ভালো লেগে গেল হঠাৎ।

"এটা?"—নীলিমা ছবিটা ভালো করে মেলে ধরলে।

ম্যাডোনার ছবি। কবে যে নীলিমা এটা কি ভেবে ফাইলে রেখে দিয়েছিল, কে জানে? ...হঠাৎ খোকাকে ঠেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। ফাইলটা রেখে দিলে। তারপরে খোকাকে এগিয়ে দিলে তার বাপের কাছে।

জানালার ধারে ঝি বিছানা করে রেখে দিয়েছে। ওপাশে টেবিলটা রাখা হয়েছে সরিয়ে—সেই টেবিলটা। একরাশ বইখাতা-পত্র তার ওপর। ওঃ, সুমিতর চিঠিটা লেখা হল না এখনো, উত্তর ত দেওয়া হল না তাকে। আর কবে সময় হয়ে উঠবে কে জানে। এখনই লিখবে নাকি সে চিঠিটা?—নীলিমা দরজার কাছে এলো।

"ঠাকুর?"

"কি দিদিমণি?"

"তোমার যাবার পথে কি কোন ডাকবাক্স পড়বে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আর একটু বসো না, ঠাকুর, তোমায় একখানা চিঠি লিখে দিয়ে দিচ্ছি।—বেশ জরুরী চিঠি।"

"বেশ ত দিদিমণি, আমি আর একটু বসছি।"

"হ্যাঁ, একটু বসো। চিঠিটা তোমার কাছেই দিয়ে দেই, কালকের ডাকেই চিঠিটা চলে যাক।"

"আচ্ছা।"

নীলিমা ফিরে এলো টেবিলে। আকাশটা কালো।...তুমি কি এখানে আবার একবারটি আসতে পারো না, মিতা? তাহলে কিন্তু বেশ হয়। অনেক—অনেক কথা বলার আছে তোমাকে।

"রিং-রিং-রিং-রিং!"—টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

"হ্যালো! কে?"

স্কুল-বোর্ডিং থেকে মেট্রন মিসেস্ চপলার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। নীলিমা রিসিভারটা ঠিক করে ধরলে,—"ওঃ, আপনি? কি খবর?......কি বলছেন?...সুখবর?......এবারে আমাদের শিপ্রা সেন থার্ড স্ট্যান্ড করেছে? হ্যাঁ, আমিও কানা-ঘুসো শুনেছিলাম বটে।.....আর অলকা মিত্র?......ফিফ্‌থ?"......অথচ দেখুন ক্লাসে অলকাই বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছে। ......যাক্, সুখবর নিশ্চয়ই। খবরটা প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন? ভালই করেছেন।......ভালকথা, সেক্রেটারী আজ কলকাতায় ফিরেছেন, খবর পেলাম।......কি বলছেন?......শিপ্রার বাবা রায় বাহাদুর মিঃ সেন আমায় এর জন্য অভিনন্দন জানাবেন?......স্পেশ্যাল টি-পার্টি? তাই নাকি?......যাক্, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। শুভরাত্রি!......"

শিপ্রা সেন আর অলকা মিত্র। নীলিমার সম্পূর্ণ নিজের হাতে-গড়া দুটি ছাত্রী। ওরা মেধাবী, উজ্জ্বল ওদের ভবিষ্যৎ,—দেশ ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। নীলিমা যখন এমনি করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে স্ট্যান্ড করত, তখন একদিন মেধাবী নীলিমার কাছ থেকেও দেশ অনেক কিছু আশা করেছিল।

নীলিমা শিক্ষয়িত্রী। দেশের, ভবিষ্যৎ বলতে গেলে ওদেরই হাতে। ওদের হাত দিয়ে বেরুবে শত সহস্র অলকা মিত্র আর শিপ্রা সেন। নীলিমাকে তাই হতে হবে দৃঢ়, হতে হবে কর্মকঠোর, হতে হবে নিয়মানুবর্তী, হতে হবে যন্ত্রের মত শক্ত।

"দিদিমণি?"

"কে? ও, ঠাকুর? তুমি যাওনি এখনো? ওহো, এখনও ত চিঠিটা লিখে দিলাম না তোমায়। একটু দাঁড়াও, পাঁচ মিনিট। আমি এখখুনি লিখে দিচ্ছি।"

নীলিমা প্যাডটা টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি চিঠি লিখতে বসল। সুমিতকে আজ একটা উত্তর না দিলে আর হয়ত সময় করে দেওয়াই হবে না। নীলিমাকে হতে হবে নিয়মানুবর্তী। লিখলো,— ......"সুমিত, তোমার চিঠি পেলাম। একটা সুখবর তোমায় জানাই,—আড়াই বছর হতে চললো আমি প্রধান শিক্ষয়িত্রী হয়েছি। শুধু তাই নয়, 'বি-টি'ও নেওয়া গেছে সম্প্রতি এবং এতেও ফার্স্ট ক্লাশ। এর ওপর হয়ত কর্তৃপক্ষ আমাকে ইউরোপও পাঠাতে পারেন সুউচ্চ একটা ডিপ্লোমার জন্য। স্কুলের সংগে কলেজও খোলার কথা হচ্ছে কি না।

তুমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়েছ, তোমাকে অভিনন্দন জানাই। আমার হাতে সময় বড়ো কম। আমাদের বাড়িটার সামান্য একটু পরিবর্তন করা গেছে—গেল বছর বাবা মারা যাবার পর। হ্যাঁ, বাবা আর বছর মারা গেছেন এবং তারই ফলে এখন ব্যাঙ্কের একটা মোটা অ্যাকাউন্ট জমে আছে আমার জন্য।

আমার স্কুল থেকে এবার দুটি মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্ট্যান্ড' করেছে। ইতিপূর্বে এ স্কুলে এ ব্যাপার আর ঘটে নি। সকলে বলছে কৃতিত্বটা নাকি আমার। তোমার কি মনে হয়?......যাই হোক্, বেশ ভালো লাগছে আমার এই জীবনটাকে। প্রচুর উৎসাহ পাচ্ছি। এর পরে হয়ত আমায় আরও ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। অনেকগুলো পার্টির আভাষ পাচ্ছি। তাই তাড়াতাড়ি তোমায় উত্তর দিয়ে দিলাম। কিছু মনে করো না, বড় ব্যস্ত। ইতি—নীলিমা।

চিঠিটা একটা খামে পুরে ঠিকানা লিখলে, তারপরে তুলে দিলে ঠাকুরের হাতে। নীলিমা আজকাল বড় ব্যস্ত। দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এলো জানালার ধারে ক্যাম্পখাটের ওপর পাতা বিছানার কাছে।

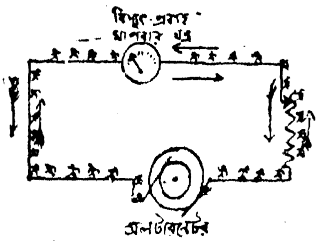
আকাশটা কালো। রাত কত কে জানে। নীলিমা এখনই শুয়ে পড়বে। কাল আবার অনেক কাজ। সেক্রেটারীবাবুর বাড়িতে যেতে হবে একবার, তারপরে মিঃ ও মিসেস্ নাগের বাড়ি, তারপরে প্রেসিডেন্ট, আর তারপরে স্কুল। ওঃ, মরবারও ফুরসুৎ নেই যে! নীলিমা বড়ো ব্যস্ত।......

শেষ রাতে হঠাৎ চাঁদ উঠল। কালো আকাশের যবনিকা উঠে গেছে। চাঁদ এলো নীলিমার জানালায়—নীলিমার ঘরে। সামনের ফুলবাগানটা স্বপ্নিল। আর নীলিমা ঘুমিয়ে আছে তার বিছানায়, জানালার পাশে। চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে, আঁচলটা শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে, আর ডান হাতখানার ওপর মাথাটা একটু কাৎ হয়ে পড়েছে, সারা শরীরটা শিথিল আলস্যে ভরিয়ে দিয়ে চাঁদের দিকে ঘুমন্ত মুখখানি ফেরানো। চুপিচুপি চাঁদ উঠল, সরে গেল, হেসে পড়ল, ডুবে গেল, নীলিমা টের পেলো না।

বেতারে সুর মেলান

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

বেতারে সুর মেলান—কথাটা কেমন যেন খট্‌কা লাগে। তারই নেই তার আবার সুর। কিন্তু সুর মেলানটা শুধু তারের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে কেন? যে কোন দুটো জিনিস যখন একই তালে কাজ করতে থাকে তখনই বলি দুটো জিনিসের সুর মিলেছে—এটা দুটো তারের কাঁপুনিও হতে পারে, দুটো দোলনার দোলনও হতে পারে। সুর



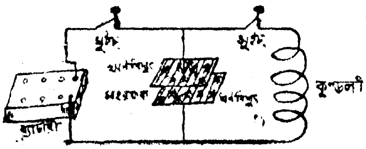
ইলেকট্রনরা যাতায়াত করছে

রেজিস্‌টেন্স

মেলানটা বেতার বিজ্ঞানে একটা খুব বড় কথা, কিন্তু ব্যাপারটা খুব শক্ত মোটেই নয়। এটাই এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা যাক।

আমরা অনেকে জানি বেহালা, এস্‌রাজ, সেতার ইত্যাদি যন্ত্রের সুর কি করে মেলান হয়। কোন নির্দিষ্ট সুর বাজাবার জন্য আমরা কি করি? কোন তারকে লম্বায় ঠিক রেখে তার কানটা মোচড় দিই অর্থাৎ তারটিকে টান করি বা আলগা করি যতক্ষণ না ঠিক সুর আমাদের কানে লাগে। কোন দুটো তারকে যদি এক সুরে বাঁধা যায় আর একটার ওপর দিয়ে ছড়ি টেনে যদি সুর বা শব্দ বার করা যায় অপরটিও কাঁপতে থাকবে। ব্যাপারটা হল এই যে, প্রথম তারটি থেকে যে শব্দের ঢেউএর সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো দ্বিতীয় তারটিতে এসে লাগছে আর একই সুরে দুটো তার বাঁধা আছে বলে, তারটি একবার নাড়া খেলেই, ঐ শব্দের ঢেউএর সঙ্গে 'পা ফেলে ফেলে' (in unison) কাঁপতে থাকবে। প্রথম তারটি থেকে ছড়ি সরিয়ে নিলেই দ্বিতীয় তারটির কাঁপুনি বন্ধ হয় না—সেটা আগের মতই কাঁপতে থাকে, তবে কাঁপুনিটা আস্তে আস্তে কমে এসে ক্রমে একেবারে থেমে যায়। দ্বিতীয় তারের এই যে কাঁপুনি একে আমরা দরদী কাঁপুনি (Sympathetic vibration) বলতে পারি।

এইবার আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। গাছের ডাল থেকে আমরা যে দোলনা ঝোলাই সেটাকে যদি একবার দুলিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে দোলনাটার দোলন পরিমাণ ক্রমে কমে আসবে বটে, কিন্তু পুরা একবার দুলতে যে সময় লাগে সেটা সমানই থাকবে। দোলনাটা যদি মিনিটে ১০ বার দোলে, তাহলে থেমে আসবার আগে পর্যন্ত ওই দোলনা মিনিটে ১০ বারই দুলবে। পুরা একবার দুলতে যে সময় লাগে তাকে বলি দোলন-কাল (period of oscillation)। এই দোলন-কাল বাড়াতে বা কমাতে গেলে দোলনার যে দড়ি আছে তাকে লম্বা করতে হয় বা খাটো করতে হয়। ঝোলানোর দড়ি যত লম্বা হবে দোলনকাল হবে তত বেশী, দড়ি যত ছোট হবে দোলনকালও হবে তত কম। দোলনাটাকে একটু ঠেলে দিয়ে ছেড়ে দিলে দোলনাটা যে নিজের দোলন-প্রিয়তার জন্যই দুলতে থাকে—এ দোলন শুধু নির্ভর করে দোলনার ঝোলান দড়ির দৈর্ঘ্যের ওপর—এইরকম দোলনকে বলা যেতে পারে স্বাভাবিক দোলন (Natural oscillation)। এ ছাড়া আর এক রকমের দোলন আছে যাকে বলি চাহিত দোলন (Forced oscillation)। এ দোলন হল এই রকম—দোলনাটাকে আমরা ছেড়ে না দিয়ে যদি হাতে ধরে রেখে নিজেদের ইচ্ছামত দোলাই ইচ্ছা করলে দ্রুতও দোলাতে পারি ইচ্ছা করলে ধীরে ধীরে দোলাতে পারি।



দোলনার স্বাভাবিক দোলন যে ক্রমে কমে আসে তার কারণ হল বাতাসের বাধা, দড়ির ঘষা। মনে করা যাক্ একটা দোলনা এই রকম নিজের মনে দুলছে আর একটা ছোট্ট ছেলেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে দোলনাটা যখন ফিরে এসে আবার চলতে শুরু করবে ঠিক সেই সময় খুব একটুখানি ধাক্কা দোলনাটাতে দিয়ে দিও। ছেলেটা যদি ঠিক তাই করে, দেখা যাবে খুব সামান্য শক্তি দিয়েই এই দোলনার দোলনটা অবিরাম চলতে থাকবে—দোলার পরিমাণ একটুও কমবে না। এই দোলনটাই যদি আমরা চাহিত দোলন করি, আমরা পরিশ্রম করব বেশি অথচ সেই তুলনায় কাজ পাব অল্প। কোন জিনিসের স্বাভাবিক দোলন-প্রিয়তার সুযোগ নিয়ে যৎসামান্য শক্তি ব্যয়ে যে অবিরাম দোলন সৃষ্টি করা হয় একেই ইংরেজীতে বলা হয় resonance। ছেলেটি তালে তালে যে ধাক্কা দিচ্ছে তাতেই সে দোলনার দোলনের সঙ্গে নিজের হাতের ধাক্কার সুর মিলিয়েছে—তাল হারালেই মুস্কিল, দোলনা হয়ত থেমে যাবে। বেতার বিজ্ঞানে এই Resonance জিনিসটা বিশেষ দরকারী।

দোলনা সম্বন্ধে যা কিছু বলা হল এ সব কিছুই বৈদ্যুতিক কাঁপুনির



বেলায় খাটে। বৈদ্যুতিক কাঁপুনি দেখা না যেতে পারে বটে তবে তাদের স্বভাবও সব ঠিক এইরকমই। বৈদ্যুতিক কাঁপুনিতে natural oscillation, forced vibration, resonance এ সবই আছে, তবে বেতার বিজ্ঞানে বৈদ্যুতিক কাঁপুনির সুর মেলান হয় বৈদ্যুতিক চলতি-পথের (electrical circuit) অদল-বদল করে।

একটা অল্‌টারনেটর আর resistance যদি ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে ওই ভাবে যোগ করা হয় তবে ওই resistance-এর ভেতর দিয়ে ইলেক্‌ট্রনগুলো ছুটোছুটি করে একবার একদিকে তারপরই উল্টা দিকে যাতায়াত করবে। অল্‌টারনেটরের যেমন কাঁপুনি সেইভাবেই প্রবাহটা উল্‌ট্-পাল্‌ট্ করবে। বাড়িতে আলো জ্বালানের জন্য যে এ, সি (A. C.) ব্যবহার করা হয় তার দিক্-পরিবর্তন বা কাঁপুনি হ'ল সেকেণ্ডে সাধারণত ৫০ বার। এই যে কাঁপুনি এটা কি ভাবের কাঁপুনি? এই কাঁপুনি নির্ধারিত হয়েছে অল্‌টারনেটরের কাঁপুনি দিয়ে। অল্‌টারনেটরের প্রবাহক বল যেভাবে কাঁপছে তারই ইঙ্গিতে বিদ্যুৎ প্রবাহটা কাঁপছে—এ কাঁপুনি হচ্ছে আগের উদাহরণ অনুযায়ী forced vibration.

কিন্তু আর এক রকমের যাতায়াতি প্রবাহের সৃষ্টি করা যায় যার কাঁপুনি forced vibration নয়—এটা হচ্ছে

বৈদ্যুতিক স্বাভাবিক দোলন (Natural eletrical oscillation)। ছবিতে যেভাবে দেখান হয়েছে এইরকমভাবে যদি একটা বৈদ্যুতিক সংরক্ষক, একটা তারের কুণ্ডলী আর একটা ব্যাটারি যোগ করা যায়, আমরা অনায়াসে এই সংরক্ষক ও কুণ্ডলীর মধ্যে যাতায়াতি বিদ্যুৎ-প্রবাহ পেতে পারি। বেলুনে যেমন বাতাস ভরে রাখা যায়, সংরক্ষকেও তেমনি বিদ্যুৎ জমা রাখা হয়। charging সুইচ্‌টা 'অন' করলেই সংরক্ষকের একটা ফলকে বসবে ইলেকট্রন-দের আড্ডা, অর্থাৎ তাতে জমা হবে ঋণ-বিদ্যুৎ, আর একটা ফলকে বসবে প্রোটন-দের আড্ডা বা সেই ফলকে জমা হবে ধন-বিদ্যুৎ। এই চার্জ করা শেষ হয়ে গেলে ব্যাটারি নেওয়া হ'ল খুলে। এখন দুটো ফলকের ওপর ইলেকট্রনরা ও প্রোটনরা ছট্‌ফট্ করছে মেলবার জন্য, কিন্তু পথ নেই, discharge করাবার সুইচ্‌টা আছে খোলা। যেই discharge সুইচ্‌টা 'অন' করা হ'ল, আনন্দের উচ্ছ্বাসে ইলেকট্রনরা ছুটতে থাকবে ধন-বিদ্যুতের কাছে; যত-গুলো ইলেকট্রনের আসবার দরকার হুজুগে পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশী ইলেকট্রন চলে আসে এই প্রোটনদের আড্ডায়। এই অতিরিক্ত ইলেকট্রন চলে আসার ফলে পজেটিভ্ ফলকটি পরিণত হয় নেগেটিভ্ ফলকে। এবার বাড়তি ইলেকট্রনদের ফিরে যাবার পালা, কিন্তু এবারও হুজুগে পড়ে যতগুলো ইলেকট্রন যাবার কথা তার চেয়ে বেশী চলে যায়—সংখ্যায় কিন্তু তারা প্রথমবারের চেয়ে কম; এইভাবে ইলেকট্রনরা বার বার হুটোপাটি করে এঁকে বেঁকে তারের কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে থাকে, তবে সংখ্যায় তারা ক্রমেই কমে আসে এবং শেষে একেবারে থেমে যায়। এইরকম ইলকট্রনদের চলাচল বা বৈদ্যুতিক দোলন হ'ল স্বাভাবিক বৈদ্যুতিক দোলন (Natural electrical oscillation).

সুর বদলানর নিয়ম আছে। তারের কাঁপুনির বেলায় তারের দৈর্ঘ্য বদলে বা তারের টান জোর-আলগা করে তার সুর বদলান হয়। সংরক্ষক-কুণ্ডলী দিয়ে এই যে বৈদ্যুতিক সারকিট তৈরি করা হয়েছে, এই সারকিটের বৈদ্যুতিক কাঁপুনিও কমান বাড়ান যায়—সেটা নির্ভর করে শুধু চলতি পথের গুণাগুণের উপর। বিদ্যুৎ-সংরক্ষকের এবং তার-কুণ্ডলীর ছোট বড়র উপর। তার কুণ্ডলী যত বড় হবে, বিদ্যুৎ-প্রবাহকে সে তত মন্থর করে দেবে, আবার বিদ্যুৎ-সংরক্ষকের আকার হবে যত বড়, অর্থাৎ তার ধারণাশক্তি (capacity) যত বেশী হবে, বিদ্যুৎ জমা করে রাখবার ক্ষমতা হবে তার তত বেশী, তাই সেও বিদ্যুৎ-প্রবাহকে চেষ্টা করবে আস্তে চালাতে। তার কুণ্ডলী ও বিদ্যুৎ-সংরক্ষক হবে যত ছোট, বিদ্যুৎ-দোলন বা কাঁপুনিও হবে তত দ্রুত। বেতারে কাঁপুনি আরম্ভ হয় সেকেণ্ডে ১০,০০০ থেকে সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ বার। ঠিক মনোমত সংরক্ষক এবং কুণ্ডলী ব্যবহার করে এইরকমের কাঁপুনি তৈরি করা মোটেই শক্ত নয়।

বেতারের কাঁপুনির সৃষ্টি করবার উপরোক্ত উপায় ছাড়া আরও দু' একটা উপায় আছে। সাধারণত অলটারনেটর থেকে সেকেণ্ডে ৫০ থেকে ৬০ বার কাঁপুনিই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এমন অলটারনেটরও তৈরি করা হয়েছে যার থেকে কাঁপুনি সেকেণ্ডে ১০০,০০০ থেকে ২০০,০০০ পর্যন্ত পাওয়া যায়। এ-সব কাঁপুনি হ'ল, আমরা আগেই বলেছি, forced oscillations. এদের দোলন বা কাঁপুনি বদলাতে গেলে অলটারনেটরের speed বেশী-কম করতে হয়। এ ছাড়া Poulsen Arc এবং Armstrong's Regenerative circuit দিয়েও বেতারের কাঁপুনি তৈরি করা চলে।

এবার আর একটা 'সারকিট' নেওয়া যাক। একটা অলটারনেটরের সঙ্গে একটা তারের কুণ্ডলী (গ) যোগ করা হয়েছে। এই কুণ্ডলীর পাশেই রাখা হয়েছে একটা বৈদ্যুতিক চলতি পথ—এতে আছে আর একটা তারের কুণ্ডলী (ঘ), আর একটা বৈদ্যুতিক সংরক্ষক (খ)। 'গ' কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে যাতায়াতি প্রবাহ যাবার সময় একটা চৌম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে, আর এই ক্ষেত্র 'ঘ' কুণ্ডলীর উপর পড়ে প্রবাহক-বলের সৃষ্টি করবে। এই প্রবাহকবলের দোলন হবে অলটারনেটরের দোলনের সঙ্গে সমান। দ্বিতীয় 'সারকিটে' বেষ্টনীর সঙ্গে যোগ করা আছে একটা বৈদ্যুতিক সংরক্ষক। ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াবে? সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, এই দ্বিতীয় সারকিটেও যাতায়াতি বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলতে থাকবে আর এর কাঁপুনি নির্ধারিত হবে সংরক্ষক এবং কুণ্ডলীর পরিমাপ দিয়ে। দ্বিতীয় সারকিটের এই দোলনকে ধাক্কা দেবে প্রথম 'সারকিট' থেকে অলটারনেটরের জন্য যে প্রবাহক-বল দ্বিতীয় সারকিটে হাজির হচ্ছে সেইটা। সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় সারকিটের natural oscillation নিশ্চয়ই প্রথম সারকিটের forced oscillation-এর সমান হওয়া দরকার তা না হ'লেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হতে পারে। ঠিক তাই। দ্বিতীয় সারকিটের natural vibration বদলে বদলে যত প্রথম সার-কিটের oscillation-এর কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে, দ্বিতীয় সারকিটে তত বেশী যাতায়াতি প্রবাহ চলতে থাকবে। যখন দুটি সারকিটের দোলন সমান হবে, তখনই দ্বিতীয় সারকিটে সবচেয়ে বেশী বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাওয়া যাবে। একেই বলা হয় electrical resonance বা বৈদ্যুতিক সুর মেলান।

একটা জিনিস বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, সব বৈদ্যুতিক কাঁপুনিই বেতার ঢেউয়ের সৃষ্টি করে না—যা সামান্য বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের সৃষ্টি করে তাতে বেতার-বিজ্ঞানের কাজ একেবারে অচল। যাতায়াতি বৈদ্যুতিক প্রবাহের কাঁপুনি খুব বেশী হলেই তবে বেশ দূরে পাড়ি মারতে পারে এমন বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এই বেতার-ঢেউ আকাশ-তার থেকে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল গতিতে ইথারে আলোড়ন করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে-সব সারকিটের কথা বললাম তাতে তারের বেষ্টনী এবং দুই বা ততোধিক ধাতু-ফলকের বৈদ্যুতিক সংরক্ষকের কথাই বলেছি। কার্যত বেতার-বিজ্ঞানে সংরক্ষকের কাজ করে আকাশ-তারও। একটা আকাশ-তার টানালে, সেই টানান তার হয় সংরক্ষকের একটা ফলক, আর পৃথিবীর মাটিকে করে আর একটা ফলক। এইরকম সংরক্ষকের সঙ্গে কোন তারের কুণ্ডলী যোগ করে বেতার ঢেউয়ের সৃষ্টি করা হয়। কোন সারকিটে খুব দ্রুত দোলনের বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি করে এই আকাশ-তারের সারকিটকে ঐ দোলনের সঙ্গে এক সুরে সুর মেলান হয়। খুব কম শক্তি ব্যয়েই এতে এই আকাশ-তারের সারকিটে বৈদ্যুতিক দোলন একটানা রাখা যায়, তার ফলে এই আকাশ-তার থেকে ছড়িয়ে পড়ে বহুদূরদেশের যাত্রী সব বেতার-ঢেউ।

গ্রাহকযন্ত্রের আকাশ-তারের সারকিটেও এইরকম সুর মেলাতে হয়। সুর মেলান হলেই গ্রাহকযন্ত্রের আকাশ-তারে সবচেয়ে বেশী বৈদ্যুতিক শক্তি ধরা যাবে—বেতার-ঢেউ গ্রাহকযন্ত্রের আকাশ-তারে লাগলে খানিকটা বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি করে ঐ আকাশ-তারের সারকিটে আর সুর মেলান থাকলেই এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয় সবচেয়ে বেশী।

গ্রাহকযন্ত্রের আকাশ-তারের খানিকটা ধারণাশক্তি বা capacity আছে, এর সঙ্গে এমন বেষ্টনী বা কুণ্ডলী ব্যবহার করা হয় যাতে করে সেই সারকিটের স্বাভাবিক দোলন যে কাঁপুনি ধরতে হবে তার সঙ্গে সমান হয়ে যায়। সাধারণত এই আকাশ-তারের capacity-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় আর একটা সংরক্ষক যার capacity কমান-বাড়ান যায়। সংরক্ষকটির capacity কমান-বাড়ানই তাহলে সুর মেলানর কাজ

(শেষাংশ ৬৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'সই বেদনা'

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র লস্কর

তার আসিয়াছে, সস্ত্রীক দিব্যেন্দুবাবু আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। পাড়াগাঁয়ের ছোট একটুখানি বাড়ি হঠাৎ সে তার-বার্তায় আগাগোড়া নড়িয়া উঠিয়াছে। বাহির বাড়ির উঠানটায় বাঁশের চাঁছা-ছোলা জমিয়া হাঁটা-চলার পথ প্রায় বন্ধ করিয়া আনিয়াছে, অবিরত বৃষ্টিতে আর গরুর পায়-পায় উত্তরের বারান্দাটায় একটা নরককুণ্ড প্রস্তুত। রান্নাঘরে দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টির চোয়ানি যে না পড়ে, তাও নয়। চারিদিকের এই ইচ্ছাকৃত অপরিচ্ছন্নতায় বাড়ির নিরুপায় বাসিন্দা ছাড়া বাহিরের কাহাকেও আসিতে বলা চলে না। কিন্তু না বলিলেও যাহারা আসিতেছে তাহারা কোনমতেই এখানে থাকিতে পারে না, অন্তত বাড়ির একতমা কর্ত্রীর ইহাই মত এবং তাহা কর্তার কাছেও বহুবার মন্তব্যের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণবাবুর মুখ হইতে একটিও মতামত বাহির হয় নাই, শুধু দা'-কাটা তামাকের বিলীয়মান ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়া। বাড়ির একমাত্র চাকর মতি গামছা দু'ভাঁজ করিয়া মাথায় দিয়া টিপি টিপি বৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়াছে ভাবিতে ভাবিতে নিজের ঘরে যাইতেছিল। পূর্ণবাবু হুঁকা রাখিয়া গম্ভীর-মুখে হাঁক দিলেন,—ওরে—

মতিলাল চাকুরিতে পাকা হইয়াছে। সুতরাং দুই এক ডাকে সাড়া না দিলেও চলে। সে নির্বিকারে গন্তব্য শেষ করিয়া উত্তর দিল—আজ্ঞে—

অগত্যা পূর্ণবাবু একাই গোলাঘরের পাশের ছোট ঘরটাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিলাল অনেকক্ষণ পরে সেই ঘরে ঢুকিয়া হঠাৎ মাথার গামছা কোমরে জড়াইয়া কর্মী সাজিয়া বসিল এবং মনিবকে লইয়া বহুক্ষণ জিনিসপত্র টানাধাক্কা করিয়া যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন সূর্য দেখা না গেলেও বেলা যে পড়িয়া আসিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

* * *

অখ্যাত দিব্যেন্দু চৌধুরী যখন স্বল্প-খ্যাত কোন এক কলেজে বি-এ পড়িত, তখন তার অতি গরীব বাপ-মা একবার গোকুলদীঘি বেড়াইতে আসিয়া অবজ্ঞাত আত্মীয়তার সূত্রে পূর্ণবাবুর অতিথি হইয়াছিলেন। তারপর কেমন করিয়া এই বাড়ির একমাত্র কন্যা বনানীকে পছন্দ করিয়া বসিলেন এবং তার পরের মাসে পত্রের মত হওয়ায় বিবাহ হইয়া গিয়াছিল তাহা কাহিনীতে অবান্তর। পাড়ার বয়সিনীরা মত প্রকাশ করিলেন—এত সুখ গরীবের মেয়ের সইলে হয়। কথাটা সত্য, অতএব সুখের চাপে বনানী আয়ুর রেখা পার হইল। দিব্যেন্দুর কোলে মাথা রাখিয়া হয়ত স্বর্গেই রওয়ানা দিল, পূর্ণবাবু গিয়া আর কন্যার নাগাল পাইলেন না। সে সব অনেক দিনের কথা। যাহারা ভুলিবার তাহারা ভুলিয়াছে, কেহ বা ভুলিতে না পারাটাই পরম শান্তি মনে করিয়া আছে। তখনো দিব্যেন্দু কলেজের কাজে হাত পাকাইয়া প্রফেসর চৌধুরী হয় নাই।

* * *

বনানী তখন সবারই মনে ধূলিধূসর হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু এই ছোট্ট তার-বার্তাটিতে আজ আবার পূর্ণবাবুর মনে পুরানো পাতার অবলুপ্ত ইতিগাথা দুরন্ত বেদনায় জাগিয়া উঠিল। খাইতে বসিয়া খাওয়া হয় নাই, তামাক নিজেই পুড়িয়া নিজেই নিভিয়াছে। প্রত্যহের অভ্যাস খাওয়ার পর মহাভারত পড়া,—তাহাতেও বাধা আসিয়াছে। অন্যমনে শোবার ঘরে ঢুকিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বিছানার উপর গৃহিণী উপুড় হইয়া শুইয়া আছেন, ঘুমাইয়া পড়েন নাই—সাড়াও দিলেন না। পূর্ণবাবু ফিরিয়া যাইবার সময় রান্নাঘরের ভিতরটা নজরে পড়িল। সেখানে কাহার বাড়াভাতে দুইটি বিড়াল চোখ বুজিয়া পরম নিশ্চিন্তে আহার করিতেছে।

তিনি বাহিরের ঘরে আসিতেই ভাড়াটিয়া গাড়ি হইতে দিব্যেন্দু চৌধুরী এবং তাহার মাস কয়েকের নূতন স্ত্রী নামিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলো লইল।

—এসো বাবা, এসো মা, তোমরা ভাল আছো তো?

দিব্যেন্দু উত্তর দিল—হাাঁ, মা কোথায়?

গৃহিণী কথাবার্তা শুনিয়া বড়ঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দিব্যেন্দু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভিতরে ঢুকিল। অনেক চেষ্টায়ও কোন আশীর্বাদ করিতে না পারিয়া গৃহিণী একান্তে মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিলেন। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নামটি কি মা?

চোখের জলের ইতিহাসটা তাহারও জানা ছিল, ধরাগলায় উত্তর দিল—বনানী—!

ইহার পর আর কাহারও চোখ শুষ্ক থাকিবার কথা নহে। গৃহিণী দুই হাতে তাহাকে আরও নিবিড় স্নেহের আবরণে ঢাকিয়া কহিলেন,—ছি মা, এসেই কাঁদতে নেই, চলো।

পরিচয়ের পালাটা কোন প্রকারে শেষ হইয়া অতঃপরের পালা শুরু হইল। দিব্যেন্দু চৌধুরীর স্ত্রীর নাম হিমানী; অবশ্য আর একটা পোষাকি নামও আছে, তাহা সাধারণ্যে পরিব্যক্ত নয়। অবস্থা বাঁচাইবার জন্য তখনকার মত সে নামটা বদলাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। দোষটা দিব্যেন্দুর, যদিও কারণটা অতি সামান্য।

এ বাড়িতে হিমানী সহজ হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া প্রফেসর ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমাকে এ বাড়িতে দেখলে হঠাৎ ভুল হয় বনানী। কথাটা সামান্য, ইচ্ছা করিলেই উড়াইয়া দেওয়া যায়; কিন্তু ঐ নামে ডাকটা? হিমানী রুক্ষ্ম হইয়া উঠিল। তীক্ষ্মকণ্ঠে উত্তর দিল—কি মনে হয় আমাকে?

—মানে, নামটা আর বাড়িটার সঙ্গে তোমার বেশ খাপ খেয়েছে।

—তার মানে?

—মানে কিছু নেই, অমনি—

আসিয়া-পড়া ঝড়টাকে এড়াইয়া যাইবার বৃথা প্রয়াসে দিব্যেন্দু ঝরণা-কলম খুলিয়া পত্র লেখা আরম্ভ করিয়া দিল। অন্যদিন এইভাবেই কাজ চলিয়াছে, কিন্তু আজ অবস্থাটা অন্যরূপ। একে তো বিবাহের ক্ষোভ মিলায় নাই—হিমানীর মনের অতলে; সতীন যদিও মৃত, তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া হারানো যায় না, আবার পরাজয় মানিয়া খুশি করাও অসম্ভব, তদুপরি স্বামীর মুখে তাহার নামের সঙ্গে হিমানীর তুলনা! হিমানীর বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিল। তবে কী? একটা রুক্ষ্ম জবাব দিতে গিয়া তখনই নরম সুরে কহিল—দেখ, দিদিকে যে তুমি ভুলতে পারোনি, তা আমি জানি; কিন্তু এ বাড়ির সবাই যেমন মনে রেখেছেন, তুমিও যে তেমনি রেখেছো এ আজ নতুন করে জানলাম।

—কেন, এখানে আসছি জেনেও তা আন্দাজ করতে পারোনি?—লিখিতে লিখিতে দিব্যেন্দু কহিল।

—কতকটা পেরেছিলাম। কিন্তু বাঙলা দেশের শতকরার মধ্যে যে তুমিও একজন —তাই শুধু ধারণা করতে পারিনি।

—তোমার মত বুদ্ধিমতির পক্ষে সেটা অগোরব!—ধৈর্য আর মনের গভীর সত্য দিব্যেন্দুর মুখে চোখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর বলিবার কথা আছে কী! স্বামীর মনের অন্দর-বাহির তো সত্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়াই আছে। চোখ চাহিলেই দেখা যায়। মনের সত্যকে স্পষ্টতর করিয়া নিজেকে অপমানিত করিয়া লাভ কোথায়? হিমানীর চোখে জল আসিতেছিল, হয়তো দিব্যেন্দু মুখ তুলিলেই তার ধৈর্যের মাত্রা শেষ হইয়া যাইত। সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একটু পরই যখন চা লইয়া আসিল, তখন মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে, এই সেই হিমানী। দিব্যেন্দুর অনর্থক লেখা বন্ধ হইয়াছে, কহিল—Beauty clings to the brow as yet—

হিমানী কহিল—কার, বনানীর?

দিব্যেন্দুর হাসিটুকু এক কথায়ই নিভিয়া গেল। পাশের ঘর হইতে পূর্ণবাবু গৃহিণীকে বলিতেছেন—ওগো, ওকে আর ও নামটা ধ'রে ডেকো না—

হিমানীর পায়ের তলা হইতে মাটির স্তরগুলো যেন সরিয়া যাইতেছে, দিব্যেন্দু চা রাখিয়া হঠাৎ বাহিরে চলিয়া গেল। গৃহিণীর উত্তরটা তখন হিমানীর দুই কানে গরম সীসা ঢালিয়া দিতেছে—ঠিকই বলেছ, পর কি কখনো আপন হয়?

এই ব্যাপারের পর আর এখানে থাকা চলে না। কিন্তু যে কয়েকদিন থাকা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তার আগে চলিয়া যাওয়ার কোন অজুহাত সৃষ্টি করিতে দিব্যেন্দু পারিল না, হিমানীরও শিক্ষিত ভদ্রতায় আঘাত করিল। কাজেই, ভিতরের হিসাবে গোঁজামিল থাকিলেও বাহিরের ব্যবহারে বিচ্যুতি দেখান চলিবে না।

দুপুর বেলায় দিব্যেন্দু পড়াশুনা করে, হিমানী কোন দিন নতুন মা'কে বই পড়িয়া শোনায়, কোনদিন বা পূর্ণবাবুকে বই শুনাইয়া বা অন্য দশটা কথা কহিয়া এই দীর্ঘ অকাজের সময়টা কাটাইয়া দেয়। সেদিন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু রৌদ্র নাই। গৃহিণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া হিমানী পূর্ণবাবুর ঘরে গিয়া আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে। পূর্ণবাবু কহিলেন,—তাহলে মা, তুমি ছুটিছাটার সময় লিখো, আমি তোমাকে আনিয়ে নেবো।

—তাহলে বেশ হয়, এখানে এসে দু'দিন বেড়িয়ে যেতে পারি। শহরের গোলমালে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠি, তখন পালাতে পারলে তো আমি বেঁচে যাই বাবা!

পূর্ণবাবু হাসিয়া কহিলেন—বেশ তো, চেনাশুনো তো হ'লই, এখন থেকে, এঃ—

তামাকটা গল্পের ফাঁকে পুড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি উঠিবার উদ্যম করিতেই হিমানী তাঁহাকে বাধা দিল। কিছুক্ষণ পরে কলিকা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—দেখুন তো, পেরেছি কি না?

পারে নাই, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিয়াও পূর্ণবাবু কহিলেন—বেশ হয়েছে মা, চমৎকার হয়েছে! দু'দিনের জন্য এসে কি মায়ায়ই ফেল্‌লি মা!

হিমানী কহিল—মেয়ের মায়া কাটিয়ে ফেলেছেন নাকি বাবা?

পাতানো বাপ-মেয়েতে যখন নিরর্থক আদর-আহ্লাদ চলিয়াছে, তারই ফাঁকে কর্ত্রী আর মতিলালের আলাপের দু'এক টুকরা এ-ঘরের স্নেহ-পরিবেশের মধ্যেও ভাসিয়া আসিতেছিল। মতিলাল শুধু চাকরই নয়, কর্তামার বিশ্রম্ভ-আলাপের শ্রোতা এবং সাথী। গৃহিণী বলিতেছেন,—পরকে কখনো আপনার করিয়া ভালবাসিতে নাই। হাতের কাছে উদাহরণ হিমানী। সেদিন দিব্যেন্দুর সহিত তাহার বিতর্কের সারভাগ মতিলাল সবিস্তারে শুনিতেছিল এবং নেহাৎ চাকর বলিয়াই সেই অমূল্য উপদেশগুলি ভবিষ্যতের দুর্ঘটনার জন্য সঞ্চয় করিতেছিল নিঃশব্দে। একবার সামান্য সশব্দে কহিল—'আপনাদের ভদ্দর লোকদের রকমই আলাদা কর্তা-মা। আমরা ছোটলোকরা একটা ছেড়ে তিনটে বিয়ে করি, কিন্তুক এক বৌ নিয়ে আর এক শ্বউর বাড়ি উঠতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!'

গৃহিণী ভর পাইয়া কহিলেন—তবেই তো বলছি রে বাবা, কথায় বলে সতীন! তা মেয়েরই হোক্ আর যারই হোক্। ও আমার মেয়েটার শত্রু তো? ভাগ্যি একটা ছেলে-পুলে নেই অভাগীর, নইলে ও তো বিষ দিয়ে মেরে ফেলতো এদ্দিন।

বিষ খাওয়াইয়া সতীনপুত্রকে মারিবার গল্প দুই-একটা জানা ছিল। তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া গল্পে রস জমিয়া উঠিল। এ-ঘরে পিতা নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন, হিমানীও নির্বাক। অসম্পর্কের পিতাপুত্রীর অভিনয় যথার্থই অভিনয় হইয়া রহিল।

হিমানী মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিল, রাত্রেই যেমন করিয়া হোক্ যাওয়ার দিনটা স্থির করিয়া ফেলিবে। অজুহাত ইচ্ছা থাকিলেই সৃষ্টি করা যায়, না-হয় ব্যাপারটা একটু রূঢ়ই হইল; কিন্তু এভাবে আর না। আচরণের মাধুর্যে, ব্যবহারের মিষ্টতায় হিমানী অনেকের উদাহরণ। আজ তাহার মার্জিত বুদ্ধি এই মিথ্যা অভিনয়ের বেদনায় কালো হইয়া উঠিয়াছে। দিব্যেন্দুর শ্বশুরবাড়ি, তাই বলিয়া হিমানীর কি? কিন্তু পূর্ণবাবু? স্বর্গস্থা কন্যার শোক-ক্লিষ্ট পিতা? না, তিনিও তো কর্ত্রীর ব্যবহারটা লুকাইবার জন্যই এত স্নেহের অভিনয় করিতে পারেন। তবে ক্ষমা করিবার কি আছে? বিরুদ্ধ চিন্তায় বর্ষামেদুর বিকালবেলাটা একটা ব্যথার মত তাহার মনে চাপিয়া রহিল।

রাত্রে হিমানী খাইল না। দিব্যেন্দু আসিলে সে কহিল—কোলকাতায় ফিরবে কবে?

—খোলার তো এখনো একমাস বাকী—

—সবটা ছুটি এখানে কাটাবার কথা ছিলো না বোধ হয়—হিমানী কহিল। দিব্যেন্দু একটু হাসিল।

—তা ছিলো না,—

হিমানী স্বামীর নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া জ্বলিয়া গেল, কহিল—তুমি হাস্‌তে পারছো? তা বেশ। তোমার যেতে ইচ্ছে না হয় আমাকে রেখে এসো—

—অর্থাৎ, আমি আর এখানে না আসি কেমন?

—কেন?—

—মানে, তোমাকে রেখে এখানে আবার এসে উঠার কোন অর্থ হয় না—

—তা না হোক, কাল নয়তো পরশু আমি যাবই—বলিয়া হিমানী উঠিয়া বসিল। এইবার দিব্যেন্দুর বিরক্ত হওয়ার কথা; তথাপি যথাসম্ভব বিরক্তি চাপা দিয়া কহিল—তোমার হয়েছে কি? এখানে এমন কী একটা ভয়ানক অসুবিধে হচ্ছে তা তো বুঝিনে?

প্রত্যেকটি কথা ভিতরের রাগ মাখিয়া বাহির হইতেছিল।

হিমানী কহিল, তোমার সব কথার উত্তর দেওয়ার অর্থ ঝগড়া করা, ও আমি পারিনে। এখানে আগেও কোন দিন আসিনি—পরেও আসবো না, বেশীদিন থাকতে গেলে হয়তো মতের অমিল হবে। আমিও একটা মানুষ।

—নও, তা বলিনে। কিন্তু একটা জেদ বহাল রাখতে গিয়ে অনর্থক চলে যাওয়ার অভদ্রতাকে প্রশ্রয় দিতে পারবো না, তুমি হলেও না।

দিব্যেন্দু শুইয়া পড়িল। গভীর রাত্রে জাগিয়া উঠিয়া বুঝিতে পারিল—হিমানী চৌকির নিকটে দেয়ালে ঠেস দিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে।

পরদিন বাড়ির সকলেই জানিতে পারিল, হিমানীর হৃদযন্ত্রের চলাটা বেসামাল হইয়া উঠিয়াছে, কেবল দিব্যেন্দু বুঝিল বনানীর শেষ-স্মৃতির জায়গাটুকুও নীলামে উঠিয়াছে। সে যাওয়ার জোড়জোড় করিতে লাগিল। দুপুর পর্যন্ত হিমানী উঠে নাই। পূর্ণবাবু তখন ঘরে আসিয়া মাথার কাছে বসিলেন। ঘুমায় নাই তাহা হিমানীকে দেখিয়াই বোঝা যায়; সে তাঁহার দিকে পাশ ফিরিতেই পূর্ণবাবু কহিলেন তোমাদের যাওয়ার দিনটা পরশু ঠিক করে দিলাম। দিব্যেন্দুকেও দেখছি, তোমারও শরীরটা কেমন যেন হয়েছে।

বহুপ্রচারিত অসুখটা এই স্নেহকাতর মানুষটাকে ফাঁকি দিতে পারে নাই—মনে করিয়া হিমানী লজ্জায় মিশিয়া গেল। পূর্ণবাবু তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—তোমাকে ডেকে এনে অপমান করার দুঃখ আমার যাবে না মা, কিন্তু সব চেয়ে বড় ব্যথা আমি পাবো যদি আমাকে তুমি ভুল বুঝে থাক।

হিমানীর সমস্ত অভিমান বনানীর বাবার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। তাহার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল—কিছু বলিয়া এখনই একটা ক্ষমা চাহিয়া লয়; কিন্তু হঠাৎ সে যেন ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে। পূর্ণবাবু কহিতে লাগিলেন—বনানী গেছে তার বদলে যে আমরা তোমাকে পেতে চাইনে, এ সত্য কথাটা প্রকাশেই শুধু লজ্জা নয়, ভাবে ইঙ্গিতে বোঝানো আরো গ্লানিকর। এ থেকে তোমরা আমাদের মুক্তি দিয়ে যাবে।

বড় বড় জলের ফোঁটায় হিমানীর বালিশ ভিজিতে লাগিল। পূর্ণবাবু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—দুঃখের ব্যাপারে দুঃখই হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের ব্যথার অনর্থক বোঝা তোমারও দুদিনের জন্যে বইতে হোল—এজন্য আমি বড় লজ্জিত। এই বুড়োকে তুমি সমস্ত মন দিয়ে ক্ষমা করে যাও মা।

কন্যাহারা পিতার হয়তো আরো কিছু বলিবার ছিলো, হয়তো ছিলো না—এমনি সময় গৃহিণী একবাটি দুধ লইয়া আসিয়া দেখা দিলেন। ম্লান হাসিয়া পূর্ণবাবু কহিলেন—ওর কি অসুখ করেছে যে তুমি দুধ পথ্য করাতে এসেছো? ও ভাতই খাবে। ওঠ দেখি মা?—

এ অবস্থায় উঠা সহজও নয়, শোভনও নয়। হিমানী মুখ না তুলিয়াই কহিল—না বাবা, বড্ড মাথা ধরেছে। গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন—ওই শোন, আমি চোখে পেত্যক্ষ দেখছি অসুখ, উনি এলেন ভাত খাওয়াতে। এখন সব দেখি, আমার মেয়ে আমি বুঝিনে!

বৃদ্ধ লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেলেন। হৃদয়ের এই মিথ্যাচারে তাহার একটু আগের আবেদন-নিবেদন সব ভাসিয়া গিয়াছে।

কালের পর পরশু। কতটুকুই বা সময়। দশটায় গাড়ি। সকাল হইতে মতিলালের ছোট ভাই গঞ্জের ফেরতা গাড়ির জন্য রাস্তায় মোতায়েন হইয়াছে। প্রায় ন'টায় আধমরা একজোড়া ঘোড়ায় টানা গাড়ি আনিয়া হাজির করিল।

জিনিসপত্র তুলিয়া দিয়া নিবোদ্দু উঠিয়াছে। বনানী সত্যই আজ বিদায় লইতেছে মনে করিয়া পূর্ণবাবুর বুকটা হু হু করিয়া উঠিল। হিমানী মাকে প্রণাম করিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি মনে প্রাণে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন—একটা অনুরোধ মা এ বাড়ির প্রীতি অপ্রীতি যেন এ বাড়ি ছাড়ার পর আর মনে করো না।

ওসব কথার উত্তরের প্রত্যাশা নাই। একটু পরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—আহা, মেয়েটি যেন আমার বনানীর ছায়া।

পূর্ণবাবু কহিলেন—সেইজন্যেই এ বাড়িতে থাকতে পারলো না বোধ হয়।

নৃত্য চঞ্চল বিদ্যুতের গতি শব্দমুখরতায় দিকদেশ কাঁপাইয়া তুলিল। কর্ত্রীর কথাটা আর কানে গেল না।

বেতারে সুর মেলান

(৬৪৯ পৃষ্ঠার পর)

করে থাকে। বলা বাহুল্য, অন্য বেতার-ঢেউয়ের নানারকম কাঁপুনিও গ্রাহকযন্ত্রের আকাশ-তারে এসে লাগে এবং খানিকটা যাতায়াতি বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে; তবে এই যে সুর মেলান, এতেই বোঝা যাচ্ছে, ঠিক যে কাঁপুনিটা বা যে ঢেউ-দৈর্ঘ্যটা আমরা চাই সেটাই সুর মেলান হলে, সবচেয়ে বেশী বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি করবে এবং 'চাই-না' এমন সব বেতার-ঢেউকে চেপে দেবে।

বেতার গ্রাহকযন্ত্রে লণ্ডন, পরমুহূর্তেই আবার বার্লিন, আবার এক সেকেণ্ড বাদেই যে টোকিও ধরা যায় সামান্য একটা মুণ্ডিমত (knob) ঘুরিয়ে, সেটা হল সুর মেলান ছাড়া আর কিছুই নয়। 'knob' ঘুরিয়ে আমরা সংরক্ষকের capacity বদলাই, যাতে করে সারকিটের স্বাভাবিক দোলন লণ্ডন, বার্লিন বা টোকিও থেকে প্রেরিত বেতার-ঢেউয়ের কাঁপুনির সঙ্গে সমান হয়। 'Superhet' বলে যে গ্রাহক-যন্ত্রের আজকাল খুব চলন, তার সুর মেলান অবশ্য একটু অন্য রকমের—তবে তাতেও সারকিটের গুণাগুণ বদলে সুর মেলান হয়।

আষাঢ়ে

আশা দেবী

আষাঢ়ে অঝোর ঝরে আঁখি বিরহীর,—
স্বপনে জাগিয়া রহে গোপন প্রেয়সী;
পুঞ্জব্যথা উচ্ছ্বসিত-হয়ে অশ্রুনীর—
খুঁজি' ফিরে, কোথা আজি রহিলে উর্বশী!

বিরহের দাবানলে দগ্ধ হিয়া তার;
প্রতীক্ষায় ব্যাকুলিত শত বিভাবরী
কেটে যায়, নিরাশার তলে বারেবার,
আশার দেউটী জ্বলে-শূন্যতারে ভরি।

মায়ার মূরতি প্রিয়া, দূরে থেকে হায়—
কল্পনার উপবনে ভোর গোধূলিতে
শুধু কি সঞ্চারি' যাবে? মিলন আশায়
জ্বলিবে অনল তব প্রেমিকের চিতে?

চঞ্চলা প্রেয়সী, ওগো স্মরণে-নয়নে,
বিরহীর অশ্রুজলে বিনিদ্র শয়নে।......

দুর্বলতার কারণ কোথায়?

আপনাদের এ গ্রামটি ব্রাহ্মণ প্রধান; এজন্য এখানে আসতে একটু সংকোচ বোধ হচ্ছিল; কারণ, সমাজে যারা অবজ্ঞাত এবং উপেক্ষিত তাদের সংগেই আমার মন অসংশয়ে আস্বস্তি পায় বেশী। কিছুদিন পূর্বে মহাপ্রাণ দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র আমার সহপাঠী এবং একান্ত বন্ধু এই মহকুমার কাশীনগরের শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় যখন আমার কলিকাতার বাসায় গিয়ে আমাকে এ অঞ্চলে আনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তখন আমি সাহস পাইনি। কিন্তু পরম আশ্বাস পেয়েছি, আপনাদের অনুগ্রহে। আপনারা আমাকে যে দয়া দেখিয়েছেন, তার তুলনা নেই; এমন আদরযত্ন পাবার আমি যোগ্য নই। এতে আপনাদের প্রকৃতির ঔদার্য এবং মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া গেল; এতে শ্রদ্ধায় আমার মাথা অবনত হয়ে পড়ছে। আপনারা এখানে যে প্রশ্নটি উপস্থিত করেছেন, তা বড়ই জটিল এবং এদেশের অধ্যাত্ম সাধনার গূঢ় তত্ত্বের অনুভবের মধ্যে তার সমাধান নিহিত রয়েছে। আপনাদের ভিতর একজন বলেছেন যে, ভগবানকে পতিভাবে উপাসনা করা তিনি পছন্দ করেন না। তিনি এর রহস্য কি জানতে চেয়েছেন। অল্প কথায় এ রহস্য ভাঙ্গা খুবই কঠিন; কারণ সত্যই এ রহস্য, অর্থাৎ সাধন-রাজ্যের নিত্য গোপন বস্তু। পথটি যে মধুরে বনাশ্রিত এবং মধুরে যা', গোপনীয়তা তাতে চিরন্তনরূপেই বিদ্যমান থাকে। অব্যক্ত সে রস থেকেই যায়, ব্যক্ত হয়ে নিঃশেষ হয় না, সীমার মধ্যে এনে তাকে ছেদ কাটবার উপায় নেই। এ সম্বন্ধে বাইরের কয়টা কথা বলবার চেষ্টা মাত্র করবো। সাধারণত 'পতি' এই শব্দটির অর্থ আমরা আমাদের সমাজের নরনারীর সম্পর্কগত সংস্কার নিয়েই বিচার করে থাকি। এজন্যই পতিরূপে সাধনার মধ্যে মেয়েলী ধরণের দুর্বলতা থাকবে বলেই আমাদের মনে হয়; অধ্যাত্ম সাধনার ভিতর দিয়ে ভগবানকে পতিরূপে অনুভূতির মধ্যে কিন্তু সত্যকার এ দুর্বলতা থাকে না। দেখুন, আমাদের এই প্রাকৃতিক জগতেই পতিত্বভাবকে আশ্রয়জনিত এ দুর্বলতা প্রতিফলিত হয়, কোথায়? পতির কাছে নিশ্চয়ই নয়। পতিকে পাওয়াতেই সেখানে সম্পূর্ণ সবলতা। দুর্বলতা সামাজিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অন্যের কাছেই ধরা পড়ে। কিন্তু ভগবানকে যেখানে পতিত্বের মধ্যে অনুভূতি সেখানে অন্য বা ভিন্ন জ্ঞান আর থাকে না। সর্বত্রই তিনি ফুটে উঠেন; সুতরাং দুর্বলতার ক্ষেত্রই সে অখণ্ড পতিত্ব অনুভূতির আশ্রয়ে একেবারে বিলীন হয়ে যায় এবং চিত্ত সর্বাংশে স্বচ্ছন্দতা ও সবলতা লাভ করে। ভাগবত 'পতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরে' এ সত্যটি বুঝিয়েছেন। ভাগবতের ঋষি বলেন, পতি কে? 'সমন্ততঃ পাতি' যিনি সর্বাবস্থায় সকলভাবে, সকল উপাধিগত ভেদের ভিতরে অনাহত থেকে অভয়ত্ব আমার অন্তরে অনুস্যূত রাখেন, তিনিই পতি। এ অবস্থায় বাইরের সাজ-পোষাক বা আবরণ আর কোন সংশয় উপস্থিত করে না। আত্মীয়তার স্পর্শ বা বিভঙ্গী সর্বত্র উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ে। যেখানে আত্মীয়তা এমন আন্তরিক, সেখানে দুর্বলতা থাকতে পারে না। আমরা দুর্বল হই কখন, যেখানে পরবোধ, সেখানেই সবলতা, যেখানে পর-বোধ থাকে না, সেখানে ত্যাগের স্বাচ্ছন্দ্য আমার অন্তরে উন্মুক্ত—বিতর্ক বা বিচারের দ্বার আর তাহা বাধাপ্রাপ্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে পৌরুষ বলতে আমরা ব্যবহারিক হিসাবে যে বলের কথা বলি, তারও ভিত্তি রয়েছে আত্মীয়তারই সেই অনুভূতির মধ্যে। আত্মীয়তার স্পর্শ পেলে আমাদের চিত্তের দৈন্য দূর হয় এবং আমরা বীর্যে প্রতিষ্ঠিত হই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র যে তত্ত্ব অনুস্যূত হয়ে তাকে সঞ্জীবিত রেখেছে, সাধকের চিত্ত ভগবৎ-প্রেমে পরিস্ফুরিত হয়ে যখন তাকে স্পর্শ করে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করে পায়, তখন ব্যক্তি অহংকার তাঁর ভেঙে যাবেই এবং একান্ত আত্মনিবেদন তাঁর মধ্যে সত্য হবেই। এ অবস্থা দুর্বল অবস্থা নয়; কারণ, আমাদের হৃদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রসকে একান্ত করে পাচ্ছে না, কেবল খণ্ড খণ্ড করে ধরতে চাচ্ছে, তার অভাব মিটছে না—"কার্পণ্য দোষোপহত-স্বভাবঃ" এর জন্যেই তো দুর্বলতা; যদি চিত্ত ভরে' বিশ্বের অন্তর্নিহিত ব্যাপ্ত রসকে চিত্তরূপে অর্থাৎ একান্ত অনুভবের ভিতর দিয়ে আমরা আয়ত্ত করতে পারি, তবে আমরা অনপেক্ষ হয়ে পড়ি। তখন আমাদের বল হয় বুকভরা—প্রাণ হয় একেবারে তাজা এবং এ জীবন তখন পরম রসায়নে স্পন্দিত হয়ে উঠে—ভয় বা ভাবনা একেবারে ঘুচে যায়। এখন কথা হচ্ছে এই যে, ভগবানের সংগে এই সম্পর্কের সম্বন্ধে আমরা সচরাচর যে সব কথা ব্যবহার করি, সে সবই অনেক ক্ষেত্রেই একান্ত ফাঁকা; তার মধ্যে অনেক জায়গাতেই গভীরতা থাকে না; পর্যাপ্ত ত্যাগের বলে আমাদের মন সেখানে পুষ্ট নয়; আমরা ব্যবহারিক সংস্কার নিয়েই সে সব কথা বলে থাকি। এমন ধরণের ফাঁকা কথায় প্রাণ তাজা হয় না; সুতরাং কাজের বেলায় সে সব টিকে না; অন্তরে ফাঁকিবাজী মুক্ত হয়ে পড়ে। সাধনার অন্তর্নিহিত সত্যকে ধরতে পারিনে ব'লেই বিশেষ সাধনতত্ত্বকে আমরা দুর্বলতা বলে মনে করি। এখন প্রশ্ন উঠবে এই যে, এ সাধনা যদি এমনই গূঢ় হয় এবং সমাজ-জীবনে এর ফলে মিথ্যাচারজনিত দুর্বলতাই একান্ত হয়ে উঠে তবে একে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে কি না। আদর্শ কোনটিই বা আমরা সকলে গ্রহণ করতে পারি? তবু আদর্শ আদর্শই থেকে যায়। সূর্যকে আমরা অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেও সূর্যের সত্যতা আমাদের কাছে অপভ্রংশিত হয় না। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটা সত্য নিত্য এইভাবে অনপভ্রংশিত অবস্থায় রয়েছে, সেটি হল এই যে, মানুষ স্বল্পে সন্তুষ্ট হতে পারে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত রসকে সে অখণ্ডভাবে উপলব্ধি করতে চায়। যতদিন পর্যন্ত সে তাতে সমর্থ না হবে, ততদিন পর্যন্ত জ্বালা, তৃষ্ণা, দুঃখ তার থাকবেই। অভাবের থেকে ভাবের রাজ্যে প্রধাবিত হবার একান্ত এই যে বেগ, এ মানুষের স্বভাবের অন্তর্নিহিত রয়েছে। এ তার স্বরূপতত্ত্ব, এ থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। এই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সে যে অনুভূতির রাজ্যে, সেখানেই পতি রস-মাধুর্যে দীপ্ত হয়ে রয়েছেন। বিশ্বের যিনি জনিতা এবং বিধাতা, উপনিষদের ঋষিদের মতে বন্ধু হয়ে সাধককে রভস-আলিংগনে একান্ত করে নিয়েছেন। এদেশের বৈষ্ণব সাধকগণ এ অবস্থাকে প্রেমের সমুন্নতি সীমা বলেছেন। সুতরাং মানবাত্মার এ চিরন্তন আকৃতিকে অস্বীকার করা চলে না; মানবকে পরম পুরুষার্থতা লাভ করতে হলে সেখানে যেতেই হবে। তবে এ কথা সত্য যে, কাপুরুষ বা ভীরুদের পক্ষে কাজ নয় সে রাজ্যে যাওয়া। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ভীরুতাকে অতিক্রম করে কি ভাবে সে রাজ্যে যাওয়া যায়, সে পথ নির্দেশ করেছে। বেদের মধ্যে ঋষভ, পতি প্রভৃতি উক্তির ভিতর দিয়ে যে পরম সত্যকে নির্দেশিত

করা হয়েছে, বৈষ্ণব সাধকগণ সকলের অনুভূতির মধ্যে তাকে সহজ এবং সরল করে নিয়ে এসেছেন। খাঁটি করে তাঁদের পথ ধরলে আর দুর্বলতার মধ্যে পড়বার ভয় নেই; কিন্তু জীবনে যাদের পক্ষে প্রেম বা ভালোবাসা এক ফোঁটা সত্য হয়ে নেই, তাঁরা যদি সেই পরম পুরুষার্থ পেয়েছে বলে কথায় কথায় মায়াকান্না কাঁদে, তবে ফাঁদেই তাঁদের পড়তে হবে। মহাপ্রভুর লীলাকে আশ্রয় করলে, প্রেম সত্য হবেই এবং পরম পুরুষার্থ লাভের পথও প্রশস্ত হবে। মনকে গভীর ছন্দে ডুবিয়ে বিশ্ব-জগতে যে রস ছড়িয়ে রয়েছে বহুরূপে, বহুবর্ণে, সেই রসের সঙ্গে মনকে যুক্ত করবার মত কৌশল এ সাধনপথে রয়েছে। বাইরের ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন; তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, বেদ এবং উপনিষদের অন্তর্নিহিত সত্যকে চিত্তে মূর্ত করে অর্থাৎ আমাদের অনুভূতির সকল ধারা কাণায় কাণায় পূর্ণ করে অসংশয়িতভাবে উপলব্ধি করবার সে পথ। সে পথ ধরে এগিয়ে গেলে আমরা মনোবৃত্তির বিক্ষেপের ভিতর দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে যে রস খুঁজে ব্যর্থতা লাভ করছি, তাকে অখণ্ডভাবে দেখে ছুঁয়ে বুঝে পেয়ে আমরা পরম শান্তি বা নিবৃত্তি লাভ করতে পারি। বেদান্ত যাঁকে মনোবুদ্ধির অতীত বলেছেন, মহাপ্রভু তাঁকেই মানুষের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষতার পরমবলে পাবার সূত্রে উন্মুক্ত করে দিলেন। এ সাধনার পথে অনুমানের অবসর নেই, স্বর্গলোক চন্দ্রলোকের বা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার বাধাও নেই। প্রেতে বিভীষিকার যে পরম প্রশ্ন মানুষের মধ্যে নিত্য রয়েছে, কঠোপনিষদে নচিকেতার মুখে আমরা যার কথা শুনতে পাই, মহাপ্রভুর কৃপায় এদেশের বৈষ্ণব সাধকগণ সে বিচিকিৎসার সম্যক সমাধান করতে পেরেছেন। সত্যকে ধরে ছুঁয়ে বুঝে পেয়ে একান্ত অভিস্পর্শে সে সত্য-স্বরূপের দ্বারা তাঁরা আলিঙ্গিত হয়ে সকল পরোক্ষতার গ্লানি হ'তে মানুষকে অপরিম্লান মহিমায় এবং অভয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কত বাড়িয়েছেন তাঁরা মানুষকে। তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই মানুষের দেহে পরম সত্যকে আয়ত্ত করে মানুষ সকল বন্ধনের ওপরে চলে যেতে পারে। এমন রাজ্যে মানুষ গিয়ে উঠতে পারে, যেখানে কেবল আনন্দ, আর সে আনন্দ একেবারে মূর্ত ধরা, জীবন্ত অর্থাৎ লীলাময় এবং মাধুর্যময়। আমার জীবনের স্থায়ী যোগ গূঢ়ভাবে রয়েছে যে আনন্দের সঙ্গে; যাকে পেলে আমার নিত্য জীবন লাভ হয়। এই জীবনের জন্যেই তো যত সব। আনন্দময় সেই জীবন দেবতাকে নিত্য করে পাবার জন্যেই আমরা ছুটোছুটি করছি। বহুমুখীন কাম আমাদের দুর্বলতার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে; আমাদের দরকার যে কাম আমাদের বাড়ায় সেই 'ব্রজপুর বনিতানাং বর্ধয়ন কাম দেবম্'। সে পতিকে পেলে আমাদের তবে স্বস্তি—ইতরত্যে মিথ্যে ভয়ং। এদেশের ঋষিরা বলেছেন, অন্য সব জায়গায় রয়েছে ভয়। বৈষ্ণব সাধনা জীবন দেবতার সেই অভয়ত্বকে এ জগতে উন্মুক্ত করেছে। সে জীবন দেবতার স্বরূপ কি, সে দেবতার আপ্যায়নের ধারা কি, আমার শুষ্ক জীবনে কোন্ ভঙ্গীতে তিনি রসসঞ্চার করেছেন, বৈষ্ণব সাধকগণ অতি সূক্ষ্ম এবং অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে প্রগাঢ় সে সব ভাব-রাজ্যের বস্তুকে ভাষার রাজ্যে নিয়ে এসেছেন। সত্যকে তাঁরা একেবারে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং চিত্তের অনুগতি ভিন্ন প্রত্যক্ষতা সম্ভব নয়। তাঁদের পতিত্বের সাধনা চিত্তের এই অবাধ একান্ত অনুগতি বা অনুকূল্যেরই সাধনা। সে সাধনায় বিরোধ, দ্বন্দ্ব বিলীন হয়ে গিয়ে মন সরল এবং সহজ রসের একটা ধারা পায়; আর সেই জোরের ভর পেয়ে মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। দরকার মনকে একটু ভিজিয়ে নেওয়া—ডুবিয়ে নেওয়া। একবার যদি এই কাজটা হয়, তবে মনের কল আপনিই সে পথে চলবে, এমনই রয়েছে কায়দা। মানুষ যদি সে রসের একবার খোঁজ পায়, তবে এখানকার পরাপেক্ষার গ্লানি আর বইবে না। সারঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর যদি পারিজাত ফুল পায়, তবে কি আর অন্য ফুলের খোঁজে সে ফিরে? বৈষ্ণব সাধকেরা দেখালেন, সে পারিজাত স্বর্গে নেই, সে নন্দন-কানন মানুষের মধ্যেই রয়েছে। তুমি একবার নিজের অহংকারকে তলিয়ে দাও, অহংকার তলাতে কিছুতেই পারবে না, যদি কামনা থাকে; আর কামনা কিছুতেই যাবে না, যদি চিত্ত ভরে বিত্ত না পাও। চিত্ত ভরা বিত্ত যিনি, তিনিই পতি। তাঁরা এই পতির চিদানন্দ ঘন মূর্তি অর্থাৎ দেশ-কাল-পাত্রে অপরিচ্ছিন্ন মূর্তি বা নিত্য রসময় বিগ্রহ দেখিয়ে দিলেন। না দেখলে মন ফিরে না, ঘুরে না, মনকে যত যুক্তিবুদ্ধিই দেওয়া যাক্ না কেন, সে কামনার স্তরেই থাকে এবং ধর্মের নামে হয় যত কাম্য কর্ম। জগতে হানাহানি, কাটাকাটি—যে পশুবৃত্তির হিংস্রতা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ পথে তা দূর হবে না; কারণ, কামনার তোড়েই এ আবর্ত উঠছে। এ আবর্ত তুলছে পশুর পিপাসাতে। এমন পাশব হিংস্রতাকেই আমরা ব্যবহারিক সংস্কারে বল, এই বড় আখ্যা দিচ্ছি, একেই বলছি পৌরুষ; কিন্তু এ বল প্রকৃত বলও নয়, কিংবা পৌরুষও নয়। এর মূলে রয়েছে দুর্বলতা এবং নিদারুণ ভীরুতা। ভীরু চিত্তের এই বিক্ষোভকে এদেশের সাধকেরা সভ্যতা বলেন নি। ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে বলেছেন, আমি সকলের মধ্যে অবস্থান করছি। এ সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করে, ত্যাগের আনন্দ যারাই সত্য করে পেয়েছে, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে সভ্য হয়েছে। সুতরাং সভ্যতা যদি মানুষের আদর্শ হয়, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত সত্যকে বুকে একান্ত করে পেয়ে সেবার স্বচ্ছন্দতা লাভের আকর্ষণও তার মধ্যে থাকবেই। এ একটা গড়াপেটা আদর্শ নয়, মানুষের অন্তরের অখণ্ড বুভুক্ষাকে আশ্রয় করে এই অভীপ্সা জাগছে এবং এ পেলে আর দুর্বলতা থাকবে না। বৈষ্ণব সাধকেরা দুর্বলতার পথ দেখান নাই; তাঁরা দুর্বলতা ছেড়ে মনুষ্যত্ব লাভ করবার বা পুরুষার্থ পাবার পথই দেখিয়েছেন। তাঁদের নির্দেশিত সাধন-পন্থা ধরলে তবে আমরা এ সত্য উপলব্ধি করবো; বাইরে দাঁড়িয়ে বিচার কেবল ভাষার কসরৎ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বল, বীর্য, পৌরুষ বলতে আমরা হিংস্র-জীবনে দৈন্যগত বিক্ষোভের সংস্কার নিয়েই সাধারণতঃ সে বিচার করে থাকি। অন্তত দশজন মানুষকে আত্মীয়তার আকর্ষণে টেনে বুকে করবার মত তাপও যদি আমাদের মধ্যে জাগে, তবে এ বিচার করবো না। কিন্তু সে তাপ কোথায়? হৃদয় বড় না হলে সে তাপ জাগে না। তাপ জিনিসটা স্পর্শের একান্ততার অভাবকে উদ্দীপ্ত করে এবং মাত্রা-স্পর্শের রাজ্যে কোন স্পর্শই আমাদের তাপ মিটাবার মত একান্ত হতে পারে না। স্পর্শকে চিরমাত্র করে পাবার জন্যে যে একান্ত তাপ, প্রিয়কে বুকে একেবারে জুড়ে রাখবার জন্যে যে তাপ সেই তাপকে আশ্রয় করেই ভগবানকে পতিভাবে উপাসনা সত্য হয়ে উঠে। সে তাপে মাত্রা-স্পর্শের মাপ ভেঙ্গে যায়—দেশ-কাল এবং পাত্রগত ব্যবধান দূর হয়ে নিরুপাধিক একমাত্র আনন্দময় দেবতার লীলাই সর্বত্র অদীন হাসির ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। বহু ভাব, বহু ভাষা তখন স্থায়ীভাবে এ জীবনকে মহাবীর্যে প্রভাবান্বিত করে। আত্মনিবেদন হয় অমোঘ, ক্ষুদ্র স্বার্থের বেদনা বহন করে মোঘভোগের ছলনা তখন কেটে যায়।

সুতরাং বৈষ্ণব সাধনার মূলীভূত ঐ যে পরম তত্ত্ব যাঁরা বলেন, তাতে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছে, তাঁদের বিচার ঠিক হচ্ছে না সংস্কারবদ্ধ সে বিচার বরং সে সাধনাকে না ধরতে পেরেই আমরা দুর্বল হয়ে পড়ে আছি, এই কথাই বলতে হয়। বৈষ্ণব

(শেষাংশ ৬৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাজাজীর মতিভ্রম

রেজাউল করীম, এম-এ-বি-এল

আমরা রাজাজীকে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ-সেবক বলিয়া জানিতাম। কিন্তু সম্প্রতি তিনি যে পথ ধরিয়া চলিতেছেন তাহাতে তাঁহাকে কংগ্রেসদ্রোহী বলিতে কোনও সংকোচ হয় না। একথা বলিনা যে কংগ্রেসে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্থান নাই! যথেষ্টই আছে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি-স্বাধীনতারও ত একটা সীমা আছে। কংগ্রেসকে ধ্বংস করিবার অধিকার কোন কংগ্রেস সেবক পাইতে পারেন না। কংগ্রেসের চিরপোষিত ও চিরপরীক্ষিত আদর্শগুলিকে আক্রমণ করিবার পূর্বে শতবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে—ইহার দ্বারা কংগ্রেসের কোন ক্ষতি করা হইতেছে কিনা। কংগ্রেসের আদর্শকে পদদলিত করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক মতবাদকে প্রশ্রয় দিবার জন্য কংগ্রেস তাহার কোন সেবককে, অতীতে তাঁহার যত বড়ই দান থাকুক না কেন, অধিকার দিতে পারে না। কোন দেশেরই সংগ্রামমূলক প্রতিষ্ঠান এই অধিকার তাহার সদস্যদেরকে দেয় না। কিন্তু শ্রীযুক্ত রাজাগোপালজ এই অধিকার চাহিয়া বসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের মৌলিক আদর্শের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন। রাজাজী তাঁহার বর্তমান আচরণ দ্বারা কংগ্রেসের কোন উপকার করিতেছেন না। ইহার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যারও কোন মীমাংসা হইবে না। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য কংগ্রেস যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পথ অদ্যাবধি কেহ দেখাইতে পারেন নাই। একদিকে সাম্প্রদায়িকতা ও অন্য দিকে প্রতিক্রিয়াশীলতা এই দুই সর্বনাশকর ব্যাধিকে কংগ্রেস অহরহ বিনষ্ট করিতে চাহিতেছে। কিন্তু রাজাজী এই দুইটিকেই জাতীয়তা ও স্বাধীনতার উর্ধ্বে স্থান দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। যাহারা এতদিন কংগ্রেসের প্রত্যেকটি কাজে বাধা দিয়া আসিতেছিল, আজ তাহারাই রাজাজীকে বরমাল্য প্রদান করিতেছে। মুসলিম লীগের দাবী স্বীকার করিলে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় ও জাতীয় রূপ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না, কেবল সেইটুকু বাদ দিয়া কংগ্রেস লীগের আর সমুদয় দাবীই একরূপ স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু রাজাজী ইহাতেই সন্তুষ্ট নহেন। তিনি আরও অগ্রসর হইয়া কংগ্রেসের পঞ্চান্ন বৎসরের গৌরবময় ইতিহাসকেই অস্বীকার করিতে উপদেশ দিতেছেন। কংগ্রেসকে তাহার মহিমাময় আসন হইতে কোথায় লইয়া যাইতেছেন তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন না। ব্রিটেনের সহিত আমাদের রাজনৈতিক বিরোধের সুমীমাংসা না হইলে কংগ্রেস কোনওক্রমেই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু রাজাজী এই উচ্চাদর্শের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া কংগ্রেসকে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। এইভাবেই তিনি কংগ্রেসকে প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত এক পর্যায়ভুক্ত করিতে চাহিতেছেন। এরূপ কংগ্রেস-দ্রোহিতা ক্ষমার অযোগ্য। অন্যান্য কংগ্রেস-ত্যাগীর মত তিনি মূল কাটিয়া দিয়া কংগ্রেসকে শূন্যের উপর দাঁড় করাইতে চান। কিন্তু আনন্দের বিষয় কংগ্রেস তাঁহার এ ধাপ্পায় বিভ্রান্ত হয় নাই।

দুইটি "শ্লোগান" তুলিয়া রাজাজী কংগ্রেসদ্রোহিতা আরম্ভ করিয়াছেন।ঃ—(১) পাকিস্থান মানিয়া লও. (২) ক্রিপস্ প্রস্তাব অনুসারে জাতীয় গবর্নমেণ্ট গঠন কর। তিনি বলেন, মুসলিম লীগের দাবী স্বীকার না করিলে ব্রিটিশ সরকার যখন আমাদের কথা শুনিবেন না, তখন যতই ক্ষতিকর হউক, লীগের খেয়ালের স্বপ্ন পাকিস্থান মানিয়া লও। দ্বিতীয়ত বৈদেশিক শত্রু যখন ভারতের দ্বারে হানা দিতেছে, তখন অন্যকথা বাদ দিয়া দেশের সমবেত শক্তি লইয়া দেশরক্ষার জন্য প্রদেশে প্রদেশে জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠন করা যাক। সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন ও প্রগতিবিরোধী ব্যক্তি ব্যতীত কেহই রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করিবে না,—করিতে পারে না। কেন পাকিস্থান মানিয়া লইব? লীগ চায় বলিয়াই কি মানিয়া লইতে হইবে? ইহার অনিষ্টকারিতা, ইহার অসুবিধা, ইহার প্রতিক্রিয়াশীলতা এসব কিছুই লক্ষ্য করিতে হইবে না? কেবলমাত্র মিঃ জিন্নার খেয়াল মিটাইবার জন্য একটা সাংঘাতিক পরিকল্পনাকে মানিয়া লইতে যাইব? স্বাধীনতার প্রেরণায় যিনি কোনদিন উদ্বুদ্ধ হন নাই, যাঁহার কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নাই, ভারত-বৈরী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত যাঁহার দহরম-মহরম খুব বেশী, তিনি চাহিতেছেন বলিয়াই কি পাকিস্থান মানিয়া লইতে হইবে? মুসলিম স্বার্থের নামে যিনি বৈদেশিক প্রভুত্বকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন, তিনি যাহাই হ'ন—স্বাধীনতাকামীদের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব নাই। কংগ্রেসের অর্ধশতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের পশ্চাতে আছে ত্যাগ নিষ্ঠা ও প্রাণবলিদানের হাজার হাজার স্মৃতি। আজ সেসব বিস্মৃত হইয়া কংগ্রেস কোন যুক্তিতে ত্যাগবিরাগী ও ভোগীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? বিবেকে বাধিবে না? লক্ষ লক্ষ ত্যাগী বীর স্বেচ্ছাসেবক—যাহারা কংগ্রেসের মহান ব্রত অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে এই আশায় যে পরবর্তী সেবকগণ তেমনি সাহসে তেমনি উৎসাহে বাকীটুকু সমাপ্ত করিবে তাহাদের অমর আত্মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজাজী কি শেষ পর্যন্ত এই হলাহল সৃষ্টি করিলেন? রাজাজী যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু আমরা কংগ্রেসের দীনাতিদীন সেবক-গণ তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিব না. কোথায় তিনি সংগ্রামের উগ্রতর পরিকল্পনা প্রদান করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি কংগ্রেসকে প্রগতিবিরোধীদের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে উপদেশ দিতেছেন। মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবী মানিয়া লইলেই কি সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে? জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দাবী ও আদর্শ কি কর্তব্যের মধ্যে নয়? লীগের দাবীকে ত তাহারা কোন দিন সমগ্র মুসলমানের দাবী বলিয়া স্বীকার করে না। তাহাদের কথা কি রাজাজী একবারও চিন্তা করিয়া দেখিবেন না? লীগের দাবী মত পাকিস্থান স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে All India National Congress নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের নাম সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করিয়া "হিন্দু কংগ্রেস" এই নাম রাখিতে হইবে। এবং মহাসভার সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ কংগ্রেসের অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতে হইবে। রাজাজীর দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রথমটির মতই অদ্ভুত ও অকল্পনীয়। বর্তমান অবস্থায় ব্রিটেন যখন সত্যিকার ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে চাহে না, তখন সে বিষয়ে বিবেচনা করা কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। অসহযোগ যুগের নোচেঞ্জার এমন-ভাবে "প্রোচেঞ্জার" হইয়া পড়িবেন তাহা কল্পনা করিতে কষ্ট হয়। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবার আগ্রহ তাঁহাকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে তিনি ভারতের তথা জাতির মর্যাদা ও সম্মানবোধকে ক্ষণিক সুবিধার মোহে পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

রাজাজী স্বীয় মত সমর্থন করিবার জন্য যেসব যুক্তি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বাচালতা ও বাগাড়ম্বর ব্যতীত

কিছুই নহে। তিনি বলেন যে, অখণ্ড ভারতে পরাধীন হইয়া থাকা অপেক্ষা দ্বিখণ্ডিত ভারতে স্বাধীন হইয়া থাকা সহস্র গুণে ভাল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভারতের অখণ্ডতা কি আমাদের পরাধীনতার কারণ? অপরের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া যাহারা পৃথক নির্বাচন আদায় করিয়াছে, তাহারাই সেইভাবে প্ররোচিত হইয়া পাকিস্থান দাবী করিতেছে। পৃথক নির্বাচন যেমন আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে পদেপদে বাধা দিয়াছে পাকিস্থানও তাহাই করিবে। পাকিস্থান ভারতকে স্বাধীনতার পথে আগাইয়া দিবে না। দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া স্বাধীনতার ভিত্তিকে বিচূর্ণ করিয়া দিবে। অখণ্ড ভারতে দেশবাসীর সমর্থনে যে স্বাধীনতা পাওয়া যাইতেছে না দ্বিখণ্ডিত হইলে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে, রাজাজী তাহা দেখাইয়া দেন নাই। লীগের কতিপয় আপকেওয়াস্তে নেতা যাঁহারা এতাবৎ সযত্নে ত্যাগ ও সংগ্রামের পথ পরিহার করিয়া আসিয়াছেন, রাজাজী কি আশা করেন তাঁহারা স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পরিবেন? মিঃ জিন্না প্রমুখ নেতাগণ কি স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পাকিস্থানের দাবী করিতেছেন? না, কখনই নহে। দীর্ঘ কয়েক যুগ হইতে যে ভেদনীতি বৃটিশ সরকারের মৌলিক নীতি হইয়া গিয়াছে, এই দাবী তাহারই পরিণত রূপ। ইহা কি রাজাজী ভুলিয়া গিয়াছেন? তিনি এতদিন যে ভেদনীতির কথা উল্লেখ করিতেন তবে কি তাহা ধাপ্পাবাজী মাত্র? লীগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এত আকুলিবিকুলি কেন? লীগের সহিত স্বাধীনতার কি সংশ্রব? লীগ ত একটা প্রতিক্রিয়াশীল দলের বিলাস নিকেতন মাত্র। ইহার পাকিস্থান পরিকল্পনা বহু হাত দিয়া বহু পালিশ পাইয়া বহু রূপ ধরিয়া অবশেষে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার সহিত ভারতের কোটি কোটি জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির কোন সংশ্রব নাই। পাকিস্থান স্বীকার করিলে কংগ্রেসের কোন আদর্শ সফল হইবে না। কতক লোকের খামখেয়াল মিটাইবার জন্য তাহা স্বীকার করিতে রাজাজীর কেন এত আগ্রহ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু রাজাজীকে সুপথ দেখান অসম্ভব। তিনি আপনার পথ ধরিয়া চলিলেন। তাই কংগ্রেসের নেতা হইয়াও তিনি মিঃ জিন্নার সহিত গায়ে পড়িয়া আপোষের কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। যে জিন্না কংগ্রেসের নেতাদের মিলনের আবেদনকে ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাঁহার সহিত হঠাৎ আলোচনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? পাকিস্থান দাবী করার পর মিঃ জিন্নার সহিত আপোষ আলোচনার পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই রুদ্ধদ্বার মুক্ত করার দায়িত্ব জিন্না সাহেবের নিজের। অন্য কাহারও নহে। জিন্না সাহেবের সহযোগিতা, পরামর্শ আনুকলা · দয়ার উপর ভারতের ভাগ্যকে ছাড়িয়া দিলে চিরদাস হইয়া থাকিতে হইবে তাঁহার আদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীনতা অসম্ভব। কেবলমাত্র অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের কথা কল্পনা করা যায়। কংগ্রেসকে ধ্বংস ক এবং দেশ হইতে সমস্ত প্রকার প্রগতিমূলক প্রতিষ্ঠানকে অবশ ও দুর্বল করিয়া দেওয় যাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা তাঁহা সহিত গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে গি রাজাজী নিজের প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি পরিচয় দিয়াছেন। কংগ্রেসের হইয় মহাত্মাজী যে আদর্শ প্রচার করিয়াছে তাহার প্রভাব সহ্য করিতে না পারি রাজাজী আবোলতাবোল বকিতে আর করিয়াছেন। তিনি যে পথই ধর কংগ্রেসকে অত সহজে বিভ্রান্ত করিতে পারিবেন না। তাঁহার বুঝা উচিত কংগ্রেস নেতৃত্ব কাঁচা হাতের উপর নাই। রাজাজ যদি না বুঝিয়া ভুল করিয়া থাকেন, তাহ হইলে শীঘ্র না হয় পরেও তিনি ভু বুঝিতে পারিবেন। এবং তখন অনুতপ্ত হইয়া এখনকার প্রত্যেকটি কথা প্রত্যাহা করিবেন আর যদি সজ্ঞানে ভুল করি থাকেন তবে অতি শীঘ্রই প্রতিক্রিয়াশীলদে দলে ভিড়িয়া যাইবেন। জাতি তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না।

দুর্ব্বলতার কারণ কোথায়?

(৬৫৪ পৃষ্ঠার পর)

সাধনার ভিত্তি ত্যাগের উপরে, ভোগের উপরে নয়; পক্ষান্তরে আমরা ধর্মের নামে এখনও কার্যত ভোগকেই খুঁজছি, চিত্রগুপ্তের খাতায় আমাদের পুণ্যের জমাটা ঠিক ঠিক লেখা হইবে কিনা এজন্যে পাঁজী পুঁথির বিচারেই আমরা বেশী ব্যস্ত। স্বর্গে আমার জন্যে মিঠাই মণ্ডা খাওয়ার জোগাড় করে রাখবার দিকেই আমাদের গতিগতি, আমাদের দেবতার দুয়ারে ধর্ণা দিবার মূলে অনেক জায়গাতেই থাকে আরাম, আয়েস বা ভোগের প্রবৃত্তি। এজন্যেই এ জাতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম জীবনে প্রেমকে প্রত্যক্ষভাবে ভিত্তি করেছে এবং কোন পরোক্ষতা রাখেনি। এ পথ নিত্যবলেরই পথ। জীবনে প্রেম যতখানি সত্য হবে, আমাদের মধ্যে নির্ভীকতাও ততখানি নিত্য হবে, ভবিষ্যতের বিচার দূর হয়ে যাবে; কারণ ভবিষ্যতের বিচারের সঙ্গে স্বার্থ বা ভোগের কামনাই জড়িত রয়েছে। ভবিষ্যতের হিসাব যেখানে বড় হয়েছে, সেখানে বল বা পৌরুষ সত্য হতে পারে কি করে? উদ্বেগই সেখানে চিত্ত জুড়ে থাকবে। বৈষ্ণবের গতিভাবে সাধনার গতি গিয়েছে—যতো ন ভয়মণুমপি' যাঁকে পেলে অনুমাত্র ভয় থাকে, না, তাঁকে অভিস্পর্শে পাওয়াতে—সেখানে সে স্পর্শ ছাড়া অন্য কোন অনুভূতিই নেই, সেখানে পরবোধের ভীতি থাকে না। সেখানে হৃদয় জুড়ে আত্মীয়তা, সুতরাং বুক জোড়া বল। ভালবাসার অব্যবহিত আস্বাদিত যেখানে প্রত্যয়-প্রবাহে পরিপুষ্টি লাভ করে, তুষ্টিকে অনপেক্ষ শক্তি দিয়েছে। এ সাধনার ধারাটিকে আমি আপনাদের সেই দিক থেকে দেখতে অনুরোধ করছি। এই জাতির দুর্বলতার কারণ জড়িয়ে রয়েছে আমাদের অন্তরে, বাইরে ততটা নয়। অন্তরে যদি সত্যকার প্রেমের স্পর্শ আমরা পাই, তবে সে বলে বাইরের বাঁধন এলিয়ে পড়বেই। অন্যদিকে অন্তরকে স্বার্থের হিসাবে জীর্ণ করে আমরা বাইরে কোন বলকেই সত্য করে তুলতে পারবো না। আমাদের সে ফাঁকা কসরৎ প্রথমকার একটু আঘাতেই একেবারে কচুর পাতার মত এলিয়ে পড়বে; তাকে বিচারের জোরে খাড়া করা সম্ভব হবে না। বৈষ্ণব সাধনার অন্তর্নিহিত পরম সত্যই আমাদের এ দৈন্য থেকে উদ্ধার করতে পারে; শুধু আমাদের সমস্যা এ জগতের সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব এব সেই পথ ধরেই। বৈষ্ণবের এ সাধনা আমরা যেন দুর্বলের সাধনা বলে মনে না করি, পরম শক্তির নিতান্ত প্রতিষ্ঠা রয়েছে এই রসানুভূতির মধ্যে। সে শক্তি চণ্ডল নখ দ্রংষ্টার আঘাতে অন্যেকে আঘাত করে না কারণ, আপনার সম্বন্ধে ভয় বলে কোন বস্তু সেখানে নেই, সে শক্তি ঔদার্যের মহিমায় সকলকে আপনার করে নেয়। এই ধর্মের আশ্রয়ই বিশ্বের একমাত্র বল ও ভরসা এব এইখানেই মানব-সভ্যতার সকল সম্ভাবনার সার্থকতা রয়েছে। *

---

* যশোহর জেলার অন্তর্গত জয়নগরে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা হইতে অনুলিখিত

পুস্তক পরিচয়

লাল চীন—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস প্রণীত। প্রকাশক—পর্যটক প্রকাশনী ভবন, ১৫৬ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

বিশ্বাস মহাশয়ের লেখার সহিত বাঙলাদেশের পাঠকপাঠিকাগণ সুপরিচিত। তাঁহার লাল চীন পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। চীনা সাম্যবাদীদের রোমাঞ্চকর আত্মত্যাগের জ্বলন্ত কাহিনীসমূহে লাল চীনে উজ্জ্বল এবং অনুরঞ্জিত হইয়াছে। নিপীড়িত মানবের মর্মবেদনার একটা দুরন্ত জ্বালায় এই পুস্তকখানা চিত্তকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। জাপানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে রত চীনা জাতির অন্তর-পরিচয় পাইতে হইলে এই পুস্তকখানা সকলেরই পাঠ করা উচিত। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

বাঙলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা—শ্রীবিশ্বনাথ নিয়োগী প্রণীত। ভারতী সাহিত্য মন্দির, ১১৯এ, গড়পার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

গ্রন্থকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক। বাঙলাদেশে দৈনিক সংবাদপত্র পরিচালনা এবং তৎসম্পর্কিত জ্ঞানলাভের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পুস্তক নাই। বিশ্বনাথবাবু বাঙলা সাহিত্যের সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানা পাঠ করিলে পাঠকপাঠিকাগণ সংবাদপত্র কিভাবে পরিচালিত হয়, ইহাসম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা শিক্ষানবিশ, তাঁহারাও এই পুস্তকখানার দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাইবেন। লেখক সাংবাদিকতা সম্বন্ধে এই পুস্তকখানা প্রকাশ করিয়া সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন, কারণ, এক্ষেত্রে তিনিই পথ-প্রদর্শক।

শ্রীশ্রীমথুরা মাহাত্ম্যম্—শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী সংকলিতম্, শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সম্পাদিত এবং শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস ভাগবতভূষণ, ২৭নং আহিরীটোলা লেন, নিখিল বৈষ্ণব সম্মিলনী কর্তৃক প্রকাশিত।

কুমিল্লা কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী এম-এ, বেদান্ততীর্থ মহাশয় একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকের এই পূর্বপরিচয় অনেকেই অবগত নহেন। এখন তিনি সাধক, ত্যাগী, অকিঞ্চন বৈষ্ণব। বর্তমানে তিনি শ্রীহরিদাস দাস এই নামে আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনায় তাঁহার অবদানের তুলনা নাই। শ্রীপাদ রূপ, সনাতন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণের অনেক লুপ্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইনি বাঙালী সমাজের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানা শ্রীব্রজভূমির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ। গ্রন্থকার শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বিভিন্ন পুরাণ হইতে বৃন্দাবনভূমির মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুধীসমাজে এই গ্রন্থের সমাদর হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীরাধা—শ্রীসাহাজী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকালীপদ বসাক, কুমারখালি, নদীয়া। মূল্য চারি আনা মাত্র।

গ্রন্থকার সাহাজী বাঙলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। ইঁহার অনেক গ্রন্থ বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। সুপণ্ডিত সাহাজী মহাশয়ের 'শ্রীরাধা' পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার সংক্ষেপের মধ্যে 'শ্রীরাধার' রসতত্ত্ব-মাধুর্য এই গ্রন্থে বিভিন্ন পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া অপূর্ব নিপুণতার সহিত পাঠকসমাজে পরিবেশন করিয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার চন্দ্রিকা—শ্রীতারকেশ্বর শাস্ত্রী প্রণীত। বাগেরহাট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণদাকান্ত রায় চৌধুরী এম-এ কর্তৃক প্রকাশিত। ঠিকানা — শ্রীতারকেশ্বর শাস্ত্রী, চাঁপাতলা গ্রাম, শাংদিয়া পোঃ, খুলনা।

গ্রন্থকার একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সমাজে কৃত আচার-অনুষ্ঠানাবলী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। হরিভক্তিবিলাস অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানা লিখিত এবং গ্রন্থাংশ সংকলন-প্রধান। বৈষ্ণবাচার প্রতিপালনের বিধি-বিধান সম্পর্কে সহজবোধ্য এবং দুর্লভ পুস্তক বাঙলাদেশে বড় বেশী নাই। গ্রন্থকার সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানা উপক্রমণিকা, কীর্তন প্রকরণ, নিত্য কৃত্যাবলী, নৈমিত্তিক কৃত্য, বৈষ্ণব তত্ত্ব, পরিশিষ্ট—এই কয়েকটি অংশে বিভক্ত। উপক্রমণিকায় বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী কয়েকটি স্তোত্র দেওয়া হইয়াছে। কীর্তন প্রকরণে, কীর্তন যেস্থলে পূজার্চনাদির অঙ্গস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলি দেওয়া হইয়াছে। নৈমিত্তিক কৃত্যাংশে বৈষ্ণবদের নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বিধিবিধানসমূহ বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব তত্ত্বাংশে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত সাধনাসঞ্জাত অনুভবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অংশে দীক্ষা, উপাস্য, মন্ত্রনির্ণয়, মন্ত্রগ্রহণ বা দান, জপবিধান, সদাচার, অপরাধ—এই বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে মুদ্রাকরণ এবং বৈষ্ণবের কয়েকটি সাধনার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। মোটের উপর এই গ্রন্থখানা ঘরে থাকিলে বৈষ্ণবাচার এবং বিধিবিধান সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করিতে সকলেই সমর্থ হইবেন। ১৯৭ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে অথচ মূল্য মাত্র দেড় টাকা। ছাপা, কাগজ সবই সুন্দর।

আশ্চর্য রাস-প্রবন্ধ :—শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত। শ্রীহরিদাস দাস প্রণীত। শ্রীহরিদাস দাস, নবদ্বীপ, পোড়াঘাট, নদীয়া হইতে প্রকাশিত।

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীতে মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া প্রবোধানন্দ এই নামে অভিহিত হন। আলোচ্য গ্রন্থখানা তাঁহারই রচিত। বৈষ্ণব সাধনার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রসতত্ত্ব গ্রন্থখানার ভিতর দিয়া ছন্দোবন্ধে এবং সুমধুর ও সুললিত বাক্যবিন্যাসে এবং সর্বোপরি অন্তর্দৃষ্টিময় প্রগাঢ় বর্ণনার চমৎকারিত্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সুপণ্ডিত এবং পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস মহাশয় এই গ্রন্থখানা প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব জগতের পরম উপকার সাধন করিয়াছে। তাঁহার অনুবাদ মূলানুগ এবং সহজ, সরল ও সুমধুর হইয়াছে। যাঁহারা মূল শ্লোকের রস সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না, অনুবাদের সাহায্যে তাঁহারাও গ্রন্থের রস আস্বাদ করিতে পারিবেন। মধুর রস সাধনায় উচ্চাধিকারী সমাজে এমন গ্রন্থের সর্বত্র সমাদর হইবে।

পল্লীসংগঠন পরিকল্পনা : শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত প্রণীত। বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেট, জলপাইগুড়ী হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

গ্রন্থকার বাঙলাদেশের অনেকের নিকট সুপরিচিত। তিনি উত্তর বঙ্গের একজন বিশিষ্ট জমিদার এবং কিছুদিন বাঙলা দেশের গভর্নমেণ্টে তিনি মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে তিনি পল্লী-উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। পল্লীউন্নয়ন সম্বন্ধে বাঙলা সরকারের প্রচেষ্টার সমালোচনা করিয়া তিনি আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"উহা যে অচিরে সুফলপ্রসূ হইতে পারিবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই কার্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, রাজকোষে এই বাবদে ব্যয় নির্বাহার্থ সেই পরিমাণ ব্যয়সংস্থান কস্মিনকালে ঘটিয়া উঠিবে কি না কে জানে?" এরূপ ক্ষেত্রে উপায় কি? গ্রন্থকার বলেন, "গভর্নমেণ্টের উপর এই কার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে না। দেশের জমিদার, মহাজন, বিত্তশালী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান সকল লোককেই সাধ্যানুসারে স্বীয় কর্তব্যবোধে এই কার্যের গুরুদায়িত্বের যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।" অবশ্য এই ধরণের কথা শুনিতে বেশ ভালই মনে হয়; কিন্তু গবর্নমেণ্টের চেষ্টা ছাড়া এই কার্য যে সার্থক হইতে পারে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। কোন দেশে তাহা হইয়াছে বলিয়াও নজীর পাওয়া যায় না। তবে কথা এই যে, পল্লীউন্নয়নের প্রেরণা যদি দেশের সকলের মনে প্রবল হইয়া উঠে তবে এসম্বন্ধে গবর্নমেণ্টের মনোভাবও চাপে পড়িয়া পরিবর্তিত হয়। আলোচ্য পুস্তিকাখানা দেশবাসীর অন্তরে সেই কর্তব্যবোধকে প্ররোচিত করিবে, এই হিসাবেই আমরা গ্রন্থকারকে তাঁহার পরিকল্পনার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি। পুস্তিকাখানা পল্লীর উন্নয়ন সাধনের জন্য গ্রন্থকারের দীর্ঘকালের চিন্তার পরিচয় প্রদান করে। এদেশের বিত্তশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বস্তুও দুর্লভ। প্রকৃত কাজের জন্য আন্তরিকতার অভাব যে কত, সে কথা না বলাই ভাল। গ্রন্থকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী যেটুকু কাজ হয়, তাহাই দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে।

রঙ্গজগৎ

ভক্ত সুরদাস শ্রীরঞ্জিৎ মুভিটোন কোম্পানীর ছবি। কাহিনী: গুণবন্ত রায় আচার্য; পরিচালনা: চতুর্ভোজ এ দোসী; আলোক-চিত্র: প্যাটেল্; শব্দগ্রহণ: ত্রিবেদী; সংগীত-পরিচালনা: জ্ঞান দত্ত; ভূমিকায়: সাইগল; খুরসীদ্, মণিকা দেশাই, নগেন্দ্র প্রভৃতি।

রঞ্জিতের বহু-বিজ্ঞাপিত চিত্র 'ভক্ত সুরদাস' সম্প্রতি কলিকাতার 'জ্যোতি' চিত্রগৃহে মুক্তি-লাভ করেছে। ইতিপূর্বে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 'ভক্ত সুরদাস' প্রদর্শিত হয়েছে এবং মধুর সংগীতের জন্য জন-প্রিয়তাও অর্জন করেছে। বাঙালী দর্শক-সমাজের কাছে ভক্ত সুরদাসের আরেকটি বিশেষ আবেদন আছে। বাঙলার জনপ্রিয় সুকণ্ঠ চিত্র-নট (অবশ্য অবাঙালী) সায়গল বাঙলার বাইরে গিয়ে সর্বপ্রথম 'ভক্ত সুরদাসে'ই নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সুতরাং নেহাৎ ঔৎসুক্যের বশবর্তী হয়ে হলেও যে বাঙালী দর্শক-সমাজ এই চিত্রখানি দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমাবেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভারতীয় সাহিত্যে 'ভক্ত সুরদাসে'র প্রেম-কাহিনী চির প্রসিদ্ধ। সুরদাসের কাহিনী নিয়ে নাটক আছে—আবার রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতাও আছে। সুপরিচিত কাহিনীটির চিত্ররূপ দিয়ে রঞ্জিৎ মুভিটোন দুঃসাহসের কাজ করেছেন বলা চলে। প্রধানত ধর্ম-অধ্যুষিত মধ্যযুগীয় ভারতের এই কাহিনীটি ধর্মাসক্ত দর্শক সমাজের কাছে কিরূপ আবেদন করে জানি না—তবে আমাদের বিংশতি শতাব্দীর বিজ্ঞান-পরিপুষ্ট মনের কাছে 'ভক্ত সুরদাসে'র অন্তর্নিহিত ভক্তিরস সেরূপ সুধার সঞ্চার করতে পারে না। চিন্তামণি ও বিল্ব-মঙ্গলের (ইনিই পরে সুরদাস হয়েছিলেন) আমাদের তৃপ্তি দিতে পারেনি। তাই ছবির বাকী অংশ কাহিনীর দুর্বলতার জন্যই আমাদের তৃপ্তি দিতে পারেনি। তাই ছবির প্রথমাংশ ভাল লাগলেও দ্বিতীয়াংশ একঘেয়ে ঠেকে। বিশেষত বিরামের পর পর্দায় নারদ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অলৌকিক স্বর্গবাসীদের আমদানীর ফলে, ঘটনাটি আমাদের স্বাভাবিক অবিশ্বাসের উদ্রেক করে। প্রথমাংশে সুরদাসের যে মানবীয় রূপটি আমরা দেখতে পাই, দ্বিতীয়াংশে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয়, এই অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশের ফলে কাহিনীটি শেষপর্যন্ত জমাট বেঁধে উঠতে পারে নি। তাই ছবি শেষ হয়ে গেলেও মনের উপর স্থায়ী রেখাপাত হয় না। চিন্তা-মণির প্রেমে বিল্বমঙ্গল এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি একদিন বৃষ্টির রাতে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে দড়ি মনে করে সাপের লেজ বেয়ে চিন্তামণির ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। চিত্রে এই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি দেখানো হয়েছে, বটে—তবে বাস্তবতার স্পর্শ না থাকায় দৃশ্যটি আশানুরূপ জমে নি।

রঞ্জিৎ মুভিটোন্ চিত্রখানি নির্মান করতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করেছেন। পরিচালক চতুর্ভোজ দোসী স্থানে স্থানে পরিচালনা-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। অভিনয়ে সায়গল আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি—খুরসিদ্ তাঁর চেয়ে বেশী ভাল অভিনয় করেছেন। সায়গলের সুমধুর কণ্ঠ-সংগীতের প্রশংসা অবশ্য না করে পারা যায় না। মধুর কণ্ঠে খুরসিদ্ যে গান কয়খানি করেছেন, তার তুলনা মেলা মুস্কিল। বাঙলার বাইরে গিয়ে সায়গলের চিরাচরিত অভিনয়-পদ্ধতির কোন উৎকর্ষ হয়েছে বলে মনে হয় না। সংগীত পরিচালনায় জ্ঞান দত্ত অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মোট-কথা 'ভক্ত সুরদাস' যে একখানি সংগীত-মুখর বাণী-চিত্র হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আলোক-চিত্র ও শব্দ গ্রহণে রঞ্জিৎ মুভিটোনের পূর্ব সুনাম অক্ষুন্ন আছে।

গ্লোবে 'নটীর পূজা'

২৮শে জুন, সোমবার ও ২৯শে জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় বাঙলা দেশের বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গতদের সাহায্যকল্পে গ্লোব রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটিকা 'নটীর পূজা' অভিনীত হয়ে গেছে। এই অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ও শিল্পীবৃন্দ যে তাঁদের গ্রীষ্মের ছুটি চিরাচরিত প্রথায় অলস-ভাবে না কাটিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত দেশবাসীদের সেবায় অগ্রসর হয়েছেন, সেজন্য আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনয়ে শান্তি-নিকেতনের শিল্পীবৃন্দের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন কলিকাতার আর্টিস্টস্ এ্যাসো-সিয়েসন্।

প্রায় চার বৎসর পরে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ে কলিকাতাবাসীরা যে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েছিলেন, পরিপূর্ণ প্রেক্ষা-গৃহ দেখে সে কথা বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। কলিকাতায় 'নটীর পূজা'র অভিনয় হয়েছিল প্রায় ১৬ বৎসর পূর্বে। ১৩৩৩ সালে কলিকাতায় সর্বপ্রথম শান্তি নিকেতনের শিল্পীদের দ্বারা 'নটীর পূজা' অভিনীত হয়ে-ছিল। সে অভিনয়ে কবি স্বয়ং অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই নাটিকাটি পুনরায় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্র-নাথের উপস্থিতিতে অভিনীত হয়েছিল। এই অভিনয়ে যাঁরা যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই গ্লোব রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যে 'নটীর পূজা' নাটিকাখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই নাটিকাটির সর্বমানবিক আবেদনই বোধ হয় এর প্রধান সম্পদ। কবির বেশীর ভাগ নাটকের মধ্যে যে জটিল প্রতীক্-বাদ বা রূপকের দর্শন মেলে, এ নাটিকাটির মধ্যে তার কোন অস্তিত্ব নেই কাজেই 'নটীর পূজা'র অন্তর্নিহিত রস সর্বজন-গ্রাহ্য। এই নাটিকাখানিতে ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য একটি রাজ-নর্তকীর অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী সহজ সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে। নাটিকা-খানিতে প্রধান প্রেরণা জুগিয়েছে বুদ্ধদেব প্রচারিত সত্য প্রেম অহিংসার মূলমন্ত্র। বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী পিতৃশত্রু মহারাজ অজাত-শত্রুর রাজপুরীর বৌদ্ধধর্মানুরক্তা একটি নটীর আত্ম-ত্যাগের কাহিনীই 'নটীর পূজা'র প্রাণ-স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বিকাশেরও একটি ধারা 'নটীর পূজা'র মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। কবির জীবনকে বৌদ্ধ-ধর্মের সাম্য মৈত্রী ও অহিংসার বাণী কিরূপ প্রভাবান্বিত করেছিল, 'নটীর পূজা' তার আংশিক প্রমাণ। ভারতীয় উপনিষদ্ ও ভগবান বুদ্ধের বাণী কবির জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর কোন কিছুই সেরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাই 'নটীর পূজা'র চরিত্র-সৃষ্টি এত জীবন্ত—কবির আত্মিক সহানুভূতির রঙে রঙীন। এই সহানুভূতির আরও প্রমাণ আমরা পাই যখন দেখি যে, 'অবদান শতক' থেকে গৃহীত 'নটীর পূজা'র কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা ও কাহিনী'র 'পূজারিণী' কবিতাটিও রচনা করেছিলেন।

গ্লোব রঙ্গমঞ্চে 'নটীর পূজা'র অভিনয় অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছিল। শিল্পীদের নৃত্যগীত এবং অভিনয়ে দর্শক-সমাজ প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে ছিলেন। অভিনয়ে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় নটীর ভূমিকায় শ্রীযুক্তা নন্দিতা কৃপালনীর। কবির এই দৌহিত্রীর অভিনয়-ক্ষমতার আরও প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে পেয়েছি। ইতিপূর্বে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের প্রধান ভূমিকায় যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা সবাই তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের খবর রাখেন। ছোটবেলা থেকে কবির স্নেহ-ছায়ায় পরিপুষ্ট হবার ফলে তিনি রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবার বিশেষ সুযোগ লাভ করে-ছিলেন, তাঁর এ পরিচয়ের কথা তাঁর অভিনয়ে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। নটী শ্রীমতীর ভূমিকাটিকে তিনি সুষ্ঠু সুন্দর অভিনয়ে প্রাণবান করে তুলেছিলেন। নৃত্যগীতে মুখর তাঁর অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। সুকণ্ঠে উচ্চারিত তাঁর বুদ্ধ-স্তোত্রম্ শ্রোতামাত্রকেই বিমুগ্ধ করেছিল। স্তূপ-বেদী-মূলে তাঁর শেষ নৃত্যটিও পরম উপভোগ্য হয়েছিল। বিম্বিসার-মহিষী লোকেশ্বরীর স্বামী পুত্রের প্রতি ভালবাসা ও বৌদ্ধ ধর্মানুরাগের মধ্যে যে সংঘর্ষ সেটা ফুটিয়ে তোলার জন্য সুজাতা মুখোপাধ্যায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সহজাত রাজকীয় ঔদ্ধত্যে গর্বিতা রাজকুমারী রত্নাবলীর ভূমিকায় প্রিয়দর্শনা কণিকা মুখোপাধ্যায় সুঅভিনয় করেছেন। তাঁর বাচন-পদ্ধতি আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। বাসবী ও মালতীর ভূমিকায় যথাক্রমে সুচিত্রা ও তারা মুখোপাধ্যায় ভাল অভিনয় করেছিলেন। খাঁটি শান্তিনিকেতনী পদ্ধতিতে গীত রবীন্দ্র সংগীতগুলো আমাদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছিল। দৃশ্য-সজ্জা ও পোষাক পরিচ্ছদের পরিকল্পনারও যথেষ্ট সুরুচিসম্মত শালীনতা ও সারল্য লক্ষিত হয়েছিল। এই অভিনয়টি সর্বাঙ্গ-সুন্দর সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনার জন্য সুপরিচিত সংগীত শিল্পী শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

খেলাধূলা

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা শেষ হইয়াছে। আই এফ এ শীল্ডের বিভিন্ন রাউণ্ডের খেলাই বর্তমানে কলিকাতা ময়দানে ক্রীড়ামোদিগণকে আনন্দ দান করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রথম ডিভিসনের লীগ চ্যাম্পিয়ান কে হইয়াছে তাহা আই এফ এ পরিচালক-মণ্ডলী হইতে ঘোষিত হয় নাই। খেলার ফলাফল যাহা হইয়াছে তাহাতে মোহন-বাগান দলকেই চ্যাম্পিয়ান বলা উচিত, কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দল শেষ খেলায় কাস্টমস দলের নিকট পরাজিত হইয়াও কাস্টমস দলের খেলোয়াড় ফিণ্ডলের খেলিবার যোগ্যতা আছে কি না এই বিষয় প্রতিবাদ জানানর ফলেই মোহনবাগান দলকে চ্যাম্পিয়ান বলিয়া প্রচার করা সম্ভব হইতেছে না। কারণ এই প্রতিবাদ সম্পর্কে আই এফ-এর কর্তৃপক্ষগণ কোনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। বুধবার অর্থাৎ ২১শে জুলাই এই বিষয় আলোচনা হইবে। আলোচনার ফলে যদি প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয়, কাস্টমস দলের সহিত ইস্টবেঙ্গল দলকে পুনরায় খেলিবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ঐ খেলায় যদি ইস্টবেঙ্গল দল বিজয়ী হয়, ফল হইবে এই যে, মোহনবাগান দলকে পুনরায় চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের জন্য ইস্টবেঙ্গল দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। কিন্তু যদি উক্ত খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়, তবে মোহনবাগান দলই চ্যাম্পিয়ান হইবে। লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই। এই ঘটনাটি সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণকে বিশেষভাবেই উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। ১৭ই জুলাই লীগের সকল খেলা শেষ হইয়াছে অথচ তাহার ফলাফল ২১শে তারিখ পর্যন্ত প্রচারিত হইতেছে না দেখিয়া অনেকেই পরিচালকগণ সম্পর্কে নানারূপ কটূক্তি করিতেছেন। এই সকল কটূক্তি আমরা কোন দিনই সমর্থন করি না, তবে আই এফ-এর কর্তৃপক্ষগণ ১৫ই জুলাই প্রতিবাদপত্র পাইয়া ১৬ই জুলাইতেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পারিতেন। ক্রীড়ামোদিগণকে এইরূপভাবে দীর্ঘ দিন ধরিয়া উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখিবার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত দীর্ঘ দিন পরে হওয়া কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে।

মোহনবাগান দলের কৃতিত্ব

প্রতিবাদের ফল যাহাই হউক না কেন মোহনবাগান দল যেরূপ খেলোয়াড়গণের সাহায্যে লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। এই বৎসর এই দলটি একরূপে তরুণ খেলোয়াড়দের লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। অধিকাংশ খেলোয়াড়ই বাঙালী। যে কয়েকজন অ-বাঙালী খেলোয়াড় খেলিয়াছেন তাঁহাদের সকলেই মোহনবাগান ক্লাবের সভ্য এবং মোহনবাগান দলেরই জুনিয়র দলে খেলার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। নামজাদা খেলোয়াড় বলিয়া ইঁহাদের দলভুক্ত করা হয় নাই। সুতরাং এইরূপ একটি দল খ্যাতনামা অভিজ্ঞ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত বিশিষ্ট দল সমূহের সহিত সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, ইহা এই দলের পরিচালকগণ পর্যন্ত কল্পনা করিতে পারেন নাই। লীগের সূচনায় বিভিন্ন দলের সহিত খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইলে দলের সাফল্যের কোনই আশা জাগে না। কিন্তু লীগ প্রতিযোগিতার প্রথমার্ধের সকল খেলা শেষ হইলে দেখা যায়, মোহন-বাগান দল লীগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং একটি মাত্র খেলায় পরাজিত হইয়াছে। প্রথমার্ধের ১২টি খেলায় বিরুদ্ধ দলসমূহ মোট ৫টি গোল করিতে পারিয়াছে। এই ফলাফল মোহনবাগান দলের সমর্থকগণকে উৎসাহিত করে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হইলে দেখা যায় মোহনবাগান দলের রক্ষণভাগ চীনের প্রাচীরের ন্যায় সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া চলিয়াছে। ইহার পরেই লীগের শীর্ষস্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গল দলের সহিত ইহাদের তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করিয়া প্রথম পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ খেলাটি পর্যন্ত দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া পয়েণ্ট সংগ্রহ করে ও লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করে। ১২টি খেলায় মাত্র একটি গোল তাহাদের বিরুদ্ধে হয়। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দল মোহনবাগান দলের নিকট পরাজিত হইবার পর হইতেই নিম্নস্তরের ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। দলের খেলোয়াড়-গণ এইরূপ নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন যে, শেষ খেলায় তালিকার সর্বনিম্ন স্থান অধিকারী কাস্টমস দলের নিকট ৩—২ গোলে পরাজয় স্বীকার করেন। মোহনবাগান দল দুইটি পয়েণ্টে অগ্রগামী হইয়া তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

বাঙালী খেলোয়াড়গণের গৌরব

মোহনবাগান দলের সাফল্য বাঙালী খেলোয়াড়গণেরই গৌরব বৃদ্ধি করিল। কারণ, এই দল যে কয়েকজন খেলোয়াড়ের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার জন্য সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই বাঙালী। এই দলের অধিনায়ক তরুণ খেলোয়াড় অনিল দে রক্ষণভাগে প্রত্যেক খেলায় দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া দলের সকল খেলোয়াড়কে উৎসাহিত করিয়াছেন। কেবল রক্ষণ-কার্যে কেন আক্রমণ সূচনায় সহায়তা করিয়াছেন। তিনি এই বৎসর সকল খেলায় যেরূপ শ্রম-স্বীকার করিয়াছেন, এইরূপ-ভাবে কোন বৎসরই তাঁহাকে খেলিতে দেখা যায় নাই। ইহার পরেই ব্যাক শৈলেন মান্নার নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাকে এই বৎসরের শ্রেষ্ঠ ব্যাক বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। ইনি ধীর-মস্তিষ্ক তরুণ খেলোয়াড় এস দাসের সহায়তায় যে রক্ষণ-প্রাচীর রচনা করিয়াছিলেন, তাহা দুর্ভেদ্য হইয়া পড়িয়াছিল। গোলরক্ষক রাম ভট্টাচার্যের তৎপরতাও প্রশংসনীয়। আক্রমণ-ভাগে নিমু বসু, অমল মজুমদার, এ রায়-চৌধুরী, ভুপাল দাসের একনিষ্ঠতা দৃঢ়তা তৎপরতা দলকে জয়লাভে বিশেষ-ভাবেই সাহায্য করিয়াছে। অধিকাংশ তরুণ বাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠন করিলে ও তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিলে দলের খ্যাতি ও গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, তাহাও এইবার প্রমাণিত হইল। অবাঙালী খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়গণ দ্বারা দল পুষ্ট করিবার নীতি ইহার পরে অনেক বিশিষ্ট ক্লাবের পরিচালকগণ অনুসরণ করিবেন না বলিয়া মনে হয়।

নিম্নে প্রথম ডিভিসনের শেষ লীগ তালিকা প্রদত্ত হইল:—

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	২৪	১৬	৭	১	৩৫	৬	৩৯
ইস্টবেঙ্গল	২৪	১৬	৫	৩	৫৩	১৭	৩৭
ভবানীপুর	২৪	১৪	৬	৪	৪৬	১৭	৩৪
বি এণ্ড এ আর	২৪	১০	৯	৫	২৯	২৬	২৯
মহঃ স্পোর্টিং	২৪	১০	৮	৬	৩১	১৬	২৮
কালীঘাট	২৪	৮	৯	৭	২৬	২৭	২৫
ক্যালকাটা	২৪	৯	৬	৯	৩৪	৩৬	২৪
স্পোর্টিং ইউঃ	২৪	৮	৬	১০	৩১	২৬	২২
পুলিশ	২৪	৬	৯	৯	৩১	৩৪	২১
এরিয়ান্স	২৪	৬	৩	১৫	২৬	৩৯	১৫
রেঞ্জার্স	২৪	৫	৪	১৫	২৬	৫৬	১৪
কাস্টমস	২৪	৫	৩	১৬	২০	৫৫	১৩
ডালহৌসী	২৪	২	৭	১৫	১৬	৫১	১১

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৩ই জুলাই

সিসিলিতে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কর্তৃক রাগুসো ও অগাস্টা অধিকৃত হইয়াছে।

মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গত ৮ই আগস্ট তারিখের প্রস্তাব বিনাসর্তে প্রত্যাহার করিয়াছেন।

১৪ই জুলাই

মিত্রপক্ষীয় বাহিনী সিসিলির এক-দশমাংশ পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহারা বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীন না হইয়াই ক্রমে দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে।

বাঙলা প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক চলিতেছিল, তিন দিন পর অদ্য রাত্রি ১১ ঘটিকায় তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং বিরোধী পক্ষ হইতে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে গবর্নমেণ্টের কার্যের নিন্দাসূচক যে প্রস্তাব প্রথম দিন উত্থাপন করা হইয়াছিল, পরিষদে এই দিন তাহা ৮৮—১৩৪ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। বিরোধী পক্ষের তরফ হইতে উত্থাপিত অপর ৮টি প্রস্তাবের মধ্যে আর একটি মাত্র প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট গৃহীত হয়; উক্ত প্রস্তাব ৮৮—১৩৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। এই দিন পরিষদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শেষ হয়।

শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জির পক্ষ হইতে আদালত অবমাননার যে মামলা করা হয়, অদ্য কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মিঃ খোন্দকার ও বিচারপতি শ্রীযুক্ত মিত্র উহার রায় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জির মামলা সম্পর্কে বিচারপতিত্রয় সর্বসম্মতিক্রমে আদালত অবমাননা হয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের মামলা সম্পর্কে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ খোন্দকার আদালত অবমাননা হয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর বিচারপতি মিঃ মিত্র আদালত অবমাননা হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভোলার এক সংবাদে প্রকাশ, শত শত ক্ষুধার্ত নরনারী শহরে আসিয়া ভিড় করিতেছে। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভোলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার চোখের সম্মুখেই তিনজন হতভাগ্য তাহাদের শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তাহারা খাদ্যের সন্ধানে শহরে আসিয়াছিল।

বগুড়া জেলায় খাদ্যাভাবে কয়েকজনের মৃত্যু হওয়ায় বগুড়া বার এসোসিয়েশনের এক সভায় বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১৫ই জুলাই

কমন্স সভায় মিঃ আমেরী জানান যে, ১৯৪২ সালের ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনীর বৃটিশ অফিসারসহ মোট ৫২৮৬ জন ভারতীয় নিহত, ৯১৬৮ জন আহত এবং ৮৬২৪৯ জন নিখোঁজ হইয়াছে।

লণ্ডনে "ভারতীয় স্বাধীনতা স্বীকৃতি পরিষদ" কর্তৃক সাংবাদিকদের সম্মানার্থে প্রদত্ত এক ভোজ-সভায় বক্তৃতা করিয়া বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ার দাবী জানান।

বাঙলা প্রদেশের যে সকল অঞ্চলে আর্থিক দুর্গতি অত্যন্ত বেশী, সেই সকল অঞ্চলে ভাতের মণ্ডের রন্ধনশালা খোলা সম্বন্ধে সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী কার্য আরম্ভ হইয়াছে। চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ একশত রন্ধনশালা খোলা হইয়াছে। অন্যান্য দুর্গত অঞ্চলে আরও কতকগুলি রন্ধনশালা খোলার প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। ভাত, ডাল ও তরি-তরকারী একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া এই সকল রন্ধনশালায় মণ্ড প্রস্তুত হইতেছে; আর সেই মণ্ড দরিদ্র জনসাধারণকে তাহাদের সাধ্যানুযায়ী মূল্যে লইয়া বিতরণ করা হইতেছে।

১৬ই জুলাই

মস্কোর এক বিশেষ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, লালফৌজ জার্মান ঘাঁটি ওরেল অভিমুখে এক নূতন বিরাট যুগ্ম আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে এবং ঐ শহরের উত্তরে ও পূর্বে বিস্তৃত এলাকায় জার্মান রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়াছে। গত তিন দিন ধরিয়া এই আক্রমণ চলিতেছে এবং ইতিমধ্যেই লালফৌজ অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে। যে সময় ওরেল-কুরস্ক—বিয়েলগরোদ স্ফীতিমুখে জার্মান আক্রমণ শিথিল হইয়া যাইতেছিল, সেই সময় সোভিয়েট এই গ্রীষ্মকালীন অভিযান আরম্ভ করে। ওরেল অঞ্চলে ফন ক্লুগের আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিয়া লালফৌজ উত্তর ও পূর্ব হইতে আঘাত করে।

সিসিলিতে মিত্র বাহিনী কর্তৃক নিম্নোক্ত শহরগুলিও অধিকৃত হইয়াছে:—কানিকাত্তিনী-বাসসে, ভিজিনী, ভিওরিয়া, নিসেমি, কাম্পোবেলো, পালমা, ডিনডেসিয়ার, সর্টিনো, মদিকা, কমিসো, বিসকারী, রিয়েসি ও কানিকাত্তি। সিসিলিতে বন্দী এক্সিস সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ১৮ সহস্র হইয়াছে। জার্মানরা অগাস্টার নিকটে খানিকটা প্রবেশ করিয়াছে এবং সেখানে সাময়িকভাবে সামুদ্রিক বিমান ঘাঁটি পুনরায় দখল করিয়াছে।

মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা নিউগিনির মুবো পুনরধিকার করিয়াছে। ঐ অঞ্চলে জাপানীদের সংহত প্রতিরোধের অবসান ঘটিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে এক বে-সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভারতবর্ষের অচল অবস্থা নিরসনের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হউক।

১৭ই জুলাই

মিত্র বাহিনী কাতানিয়া সমতলক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছে। স্করদিয়া, লেন্টেনি, প্রামিচেল, কাস্তাগিরোন সিসিলির এই চারিটি শহর মিত্রপক্ষের হস্তগত হইয়াছে। জেনারেল আইসেন হাওয়ার জেনারেল স্যার হ্যারল্ড আলেকজেণ্ডারকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসহ সিসিলিতে সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন।

মস্কো হইতে রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ওরেল রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী তিনদিনে ৩৫ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাতের জন্য কুন্নুর যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অশোককুমার বসু ও দুই কন্যাও শ্রীযুক্তা বসুর সঙ্গে গিয়াছেন।

১৮ই জুলাই

মার্কিন বাহিনী দক্ষিণ সিসিলির প্রধান নগরী আগ্রিজেণ্টো অধিকার করিয়াছে।

তমলুক মহকুমার ময়না থানার অধীন গড়চাংড়া গ্রামের একই পরিবারের একটি স্ত্রীলোক ও শিশু সহ নয়জন লোক নিহত হইয়াছে। বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব কংগ্রেসপন্থী মন্ত্রী মিঃ এম ওয়াই শরিফ কংগ্রেসের সদস্য পদ হইতে ইস্তফা দিয়াছেন।

১৯ই জুলাই

আসানসোলের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ১৪ই তারিখ সন্ধ্যাবেলা হইতে আসানসোলে প্রবল বারি বর্ষণ হইতেছে। ফলে সমস্ত নালা ও পুষ্করিণী প্লাবিত হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনদিনব্যাপী আলোচনার অবসান হইয়াছে এবং গতকল্য খাদ্য-সংকট সম্বন্ধে সরকারী অবস্থার সমালোচনা করিয়া সরকারী কংগ্রেসী দল কাউন্সিলে যে প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন, এই দিন বিনা ভোটে উহা বাতিল হইয়া যায় এবং ব্যবস্থাপক সভার বর্ষাকালীন অধিবেশন শেষ হয়।

রাজা নরেন্দ্রনাথের কন্যা এবং নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের ভূতপূর্ব সভানেত্রী শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহরু, সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও একহাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়, এম এল এ প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সিসিলিতে অষ্টম বাহিনী কাতানিয়ার তিন মাইলের মধ্যে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। বন্দী এক্সিস সৈন্যের সংখ্যা বর্তমানে ৩৫ হাজার হইয়াছে। মার্কিন সৈন্যেরা উত্তরে সিসিলির মধ্যভাগ অভিমুখে এবং দক্ষিণ তীর ধরিয়া আরও উত্তর-পশ্চিমে অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে।

মিত্রপক্ষীয় বিমান রোমের উপর প্রচণ্ডভাবে বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

ওরেল রণাঙ্গনে সোভিয়েট আক্রমণের ৬ষ্ঠ দিনে সোভিয়েট বাহিনী ওরেলের ১৫ মাইল পূর্বে, কুড়ি মাইল উত্তরে এবং ৩৫।৪০ মাইল দক্ষিণে আসিয়া পড়িয়াছে।

কলম্বোর সংবাদে প্রকাশ, অদ্য ভোরবেলা প্রতিপক্ষের একটি বিমান সিংহলের পূর্ব উপকূলের নিকটবর্তী হয়। বিমান আক্রমণের হুঁসিয়ারী হয় এবং বিমানধ্বংসী কামানশ্রেণী তৎপর হইয়া উঠে। বোমা বর্ষণের এবং কোন দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

১০ম বর্ষ ২৫শ সংখ্যা হইতে—৩৭ সংখ্যা পর্যন্ত ১৯৪৩ খৃঃ

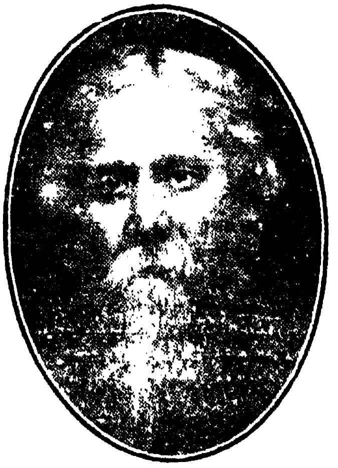
দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৫০ সাল। Saturday, 7th August. [৩৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

২২শে শ্রাবণ জাতি বিস্মৃত হইতে পারে না। শ্রাবণের এমনই মেঘ-মেদুর দিনে রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারাইয়াছি। এই দিবস রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব দিবস। আমাদের দেশের সাধকদের মতে যাঁহারা কবি, যাঁহারা মনীষী, এই তিরোভাবের ভিতর দিয়াই তাঁহাদের বিজয়। মর্ত্য দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা নিত্য ব্যাপ্ত এবং সত্যকার অমৃতের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথও আজ অমৃতলোকের অধিকারী। তাঁহার অবদানরাজির ভিতরে অমৃতময় সেই জীবনরসের আপ্যায়ন আমরা এবং আমাদের সঙ্গে সমগ্র বিশ্ববাসী অনপেক্ষভাবে অনন্তকাল লাভ করিতে সমর্থ হইব। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহামানবের স্মৃতি মানবের মানসমন্দিরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহারা কোন স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার অপেক্ষা রাখেন না; কিন্তু জাতি হিসাবে আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে। মহতের সেবার পথেই ব্যক্তি এবং জাতি উন্নতিলাভ করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহৎ-জীবনের অনুধ্যানের নিতান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। আমরা পতিত, আমরা দুর্গত, আমরা পরাধীন; রবীন্দ্রনাথের বীণা পতিতের বেদনায় অগ্নিময়ী মন্ত্রে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। দুর্গত জনগণের তাপে তাঁহার সমগ্র জীবন আত্মাবদানের কল্যাণময় সাধনায় উৎসর্গীকৃত ছিল; পরাধীন এই দেশের স্বাধীনতার বাণী বিশ্ববাসীকে তিনি উদ্দৃপ্ত ভাষায় শুনাইয়াছেন। অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বজ্রাগ্নি বিকীর্ণ করিয়াছেন। আজ তাঁহাকে বন্দনা করিতে হইবে, তবেই



আমরা জাতীয় জীবনের দুর্যোগের মধ্যে হৃদয়ে নূতন উদ্দীপনা লাভ করিব। ২২শে শ্রাবণের এই কর্তব্য আমরা যেন বিস্মৃত না হই। আমরা যেন বিস্মৃত না হই—জাতির কল্যাণব্রতে কবির অবদান এবং সেই কল্যাণব্রতের প্রতীক, কবির সাধনতীর্থ তাঁহার বিশ্বভারতীকে। আমরা যদি বিশ্বভারতীকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য সর্বপ্রকারে ব্রতী হই এবং এ-দেশের ধনী তাঁহার ধন দ্বারা ও কর্মী তাঁহার কর্ম বলে, মনীষী তাঁহাদের মনীষার দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিতে চেষ্টা করেন তবেই কবির প্রতি আমাদের সত্যকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে।

দেশের দুর্দশা

"কলিকাতার ন্যায় শহরে অনাহারে লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে দেখা যাইতেছে এবং রাস্তার ফুটপাতে মৃতদেহসমূহ পতিত অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছে। দলে দলে নরনারী শিশুসন্তানসহ অস্থিচর্মসার দেহ লইয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় একমুষ্টি অন্নের জন্য আর্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে। শহরের আবর্জনার আধারগুলি ঘিরিয়া ক্ষুধার্ত-নরনারী অন্নের সন্ধান করিতেছে। কলিকাতা শহরের অবস্থাই যখন এইরূপ, তখন মফঃস্বলের লোকের যে কি দুর্দশা—সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে"—মারোয়াড়ী সাহায্য সমিতি সম্প্রতি একটি আবেদনে এই কথা বলিতেছেন। মিস্ মেয়ো তাঁহার বহুনিন্দিত 'মাদার ইণ্ডিয়া' পুস্তকে কলিকাতা শহরের রাস্তায় মুমূর্ষু পশুর দেহ পতিত থাকে — এই বলিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন যে

এই সব মুমূর্ষু পশুগুলিকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হয় না অথচ সহৃদয় ব্যক্তিদিগকে এ-দৃশ্য দেখিতে হয়। তিনি বলেন, জগতের কোন সভ্যদেশের রাজপথে এ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কলিকাতার রাজপথে কিভাবে মানুষের মৃতদেহ দিনের পর দিন পড়িয়া থাকে, এই দৃশ্য আজ যদি তিনি দেখিতেন, তবে কি বলিতেন জানি না। সত্যই সভ্যদেশে এ-দৃশ্য অন্য কোথাও দেখা যাইবে না। আমাদের নৈতিক দুর্দশা কতটা ঘটিয়াছে, ইহাই তাহার পরিচয়। ধনীর শহর কলিকাতা, শিক্ষিতের শহর কলিকাতা, বাঙলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থান এই কলিকাতা। এখানে আজও মানুষ অন্নাভাবে মরিতেছে, অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য দরিদ্রের এখানে আশ্রয়টুকু পর্যন্ত নাই, তাহাদের শুশ্রূষার বিশেষ কোন বিধান নাই—একটা জাতির চরম নৈতিক অধঃপতন না ঘটিলে মানবতার প্রতি এমন নির্মম উপেক্ষা সম্ভব হইতে পারে না। অবস্থার তীব্র প্রতিক্রিয়া তবে আকাশ বাতাসকে তপ্ত করিয়াই তুলিত। সুখের বিষয় এই যে, এই নিদারুণ অবস্থার প্রতিকারের জন্য ইতিমধ্যে শহরে একটা সাড়া জাগিয়াছে। হিন্দু মহাসভা, মারোয়াড়ী সেবা সমিতি নিরন্নের অন্ন সংস্থানের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহায্য সমিতির পক্ষ হইতে এই সেবাকার্যে অগ্রসর হইবার জন্য শহরের যুবকদিগকে স্বেচ্ছাসেবকের ব্রত গ্রহণের নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন। নিরন্নের এই সেবাকার্যে মহিলাগণও ব্রতী হইয়াছেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মিগণ শহরের পল্লীতে পল্লীতে আর্তনারীদের ক্লেশ প্রশমনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই কয়েকটি মহিলা সমিতির চেষ্টায় একশত শিশুর খাদ্য সরবরাহের জন্য তিনটি সত্র খোলা হইয়াছে। শহরের সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক; সুতরাং ব্যাপকভাবে ইহার সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। সেজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন এবং অনেক কর্মীও আবশ্যক। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সম্প্রতি এই সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, শহরবাসী বিপন্ন জনগণের অন্নদানকার্যের জন্য বঙ্গীয় সাহায্য সমিতি প্রায় তিন লক্ষ টাকা সাহায্য পাইয়াছেন। মারোয়াড়ী সেবা সমিতিও প্রায় ঐ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বুভুক্ষিতের অন্ন সংস্থান করিবার সদুদ্দেশ্যে যাঁহারা আজ এইভাবে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, সমগ্র জাতির তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু শুধু এইভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চেষ্টায় দেশের ব্যাপক অন্ন সমস্যার প্রতিকার সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কলিকাতার সমস্যাই একমাত্র সমস্যা নয়, মফঃস্বলের দুর্দশা আরও ভীষণ। সাধারণভাবে খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস করিবার ব্যবস্থা ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে না। সে কর্তব্য গভর্নমেণ্টের উপর; কিন্তু ভারত সরকারের হইতে এ-পর্যন্ত বাঙলার দুর্দশা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট কোন আশা ভরসা আমরা পাইতেছি না। বাঙলার খাদ্যাভাব নিরাকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক মাস পূর্বে ভারত গভর্নমেণ্ট বাঙলাদেশ এবং পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশে খাদ্যশস্যের বিকিকিনি অবাধ করিয়া দিয়াছিলেন; ১লা আগস্ট হইতে সেই বিধান প্রত্যাহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন প্রদেশ এই সুযোগে পুনরায় বাঙলা দেশে খাদ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করিতে শুরু করিয়াছে। এদিকে লাভখোরদের ইহাতে সুবিধা হইয়াছে। বাঙলার খাদ্যসচিব ইহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া সম্প্রতি একটি ইস্তাহারে বলিয়াছেন যে, তিনি চাউলের দর সত্বরই বাঁধিয়া দিবেন এবং সে দর বর্তমান বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম হইবে। খাদ্যসচিব আশু ধানের ভরসা করিয়াছেন; কিন্তু বাঙলাদেশের সর্বত্র খাদ্যশস্যের যেরূপ ঘাটতি, তাহাতে আশু ধানের দ্বারা এই অভাব সামান্যই পূরণ করিবার সম্ভাবনা আছে। বাঙলাদেশের বাহির হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা ব্যতীত এ অবস্থার প্রতিকার সম্ভব নহে। ফাঁকা কথায় এ সমস্যার সমাধান হইবে না। বুভুক্ষিতের মুখে অন্ন সংস্থানের এ সমস্যায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন অন্ন সরবরাহের উপযুক্ত ব্যাপক এবং কার্যকর পরিকল্পনা। বাঙলা দেশের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে তেমন পরিকল্পনা অবলম্বনের কোন পরিচয়ই আমরা পাইতেছি না। যে-সব প্রদেশে খাদ্যদ্রব্য বাড়তি আছে, সেই সব প্রদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিয়া বাঙলা দেশের অভাব মিটাইবার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিতে পারেন নাই। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত অধিকারের মর্যাদা সে ক্ষেত্রে ভারত সরকারের কাছে বড় হইয়া দাঁড়াইতেছে; প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সত্যকারের মর্যাদা যদি তাঁহারা স্বীকার করিতেন, তবে অবশ্য এ যুক্তি খাটিত; কিন্তু ভারতব্যাপী অর্ডিন্যান্স শাসন অবলম্বনের ক্ষেত্রে সে মর্যাদার প্রশ্ন কেন্দ্রীয় শাসনের কর্তাদের কাহারও মনের কোণে কোন দিন যে দেখা দেয়, ইহা তো মনে হয় না।

লিনলিথগোর বিদায় বাণী

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদিগকে সম্বোধন করিয়া লর্ড লিনলিথগো সেদিন বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতাকে তাঁহার বিদায়-বাণী বলা যাইতে পারে। লর্ড লিনলিথগোর এই বক্তৃতায় নূতনত্ব কিছুই নাই; ভারতবর্ষের রাজনীতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে সকল দায়িত্ব হইতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে মুক্ত করিয়া একান্ত অযৌক্তিকভাবে এই দেশের লোকের উপর সেই দায়িত্ব তিনি চাপাইয়াছেন। এবং এ দেশের লোকদের সাম্প্রদায়িক দুর্বুদ্ধি, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এবং দেশের স্বার্থকে বড় করিয়া না দেখিবার নানা অভিযোগ তুলিয়া ইহারা যে স্বাধীনতা লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য, স্পষ্ট কথায় না হইলেও পরোক্ষভাবে জগতের লোকের মনে সেইরূপ একটা ধারণা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা তাঁহার বক্তৃতার ভিতর হইতে পাওয়া যায়; ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের আন্তরিকতা সম্পর্কে লর্ড লিনলিথগো যত মধুর কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও সে বস্তু চাপা পড়ে না, কারণ এ সত্য বহুরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবাসীদের দিক হইতে এ সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি কিছুই করা হয় নাই। সেরূপ চেষ্টা কংগ্রেস হইতে হইয়াছে, উদারনীতিক দলের তরফ হইতে হইয়াছে এবং স্বাধীনতার ভিত্তিতে ভারতের সকল দলের দাবীর মধ্যে ঐক্যও রহিয়াছে; কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টই সে পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। এখনও ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে একপ সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করিতে তাঁহারা অস্বীকৃত। কংগ্রেসকে বাদ দিয়া তাঁহারা এ কাজটা করিতে চাহেন; অথচ কংগ্রেস ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিমূলক এবং অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ব্যাকুল হইয়া আছেন; এ সম্বন্ধে তাঁহাদের আগ্রহের অভাবের জন্য নয়, বরং অত্যধিক আগ্রহের জনাই ভারতবাসীদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি হইতেছে অর্থাৎ ভারতবাসীরা স্বাধীনতার মূল্য জানে না, বুঝে না; তাহাদের অযোগ্যতাই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকারের পক্ষে অন্তরায় ঘটাইতেছে। লর্ড লিনলিথগো তাঁহার বক্তৃতায় মামুলী সুরে আমেরী-চার্চিলী বুলিই আওড়াইয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, এবং ভারতবাসীদের সকল শুভবুদ্ধিকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই বক্তৃতাকে ভারতের আত্মমর্যাদার প্রতি তাঁহার বিদায়কালীন আঘাত বলা যাইতে পারে।

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রশ্ন

রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির পরিবর্তন দাবী করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। শ্রীযুত যোশীর এতৎ-সম্পর্কিত সংশোধন প্রস্তাবের মর্ম এইরূপ ছিল যে, রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণের সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদের কতিপয় সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করা হউক। ভারত গবর্নমেণ্ট সেই কমিটি এবং প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টসমূহের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কাজ করুন। ভারত গবর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ হইতে এ সম্পর্কে কমিটি নিযুক্ত করার প্রস্তাবে তাঁহার বিশেষ আপত্তি আছে; কারণ, রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কিত এই সব ব্যাপারের সমগ্র দায়িত্ব প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের উপরে রহিয়াছে। ভারত সরকার তাঁহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করা হয়, ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মহিমা ব্যক্ত করাই বোধ হয়, এক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রসচিবের উদ্দেশ্য এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীদের মর্যাদা বাড়াইয়া তিনি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের নীতি সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের অসহায়ত্ব কতখানি, বাঙলার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রীস্বরূপে মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কিছুদিন পূর্বে সম্যকরূপে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভারত-সরকারের স্বৈরচারিতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, স্যার রেজিন্যাল্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল তাহাই, প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ক্ষমতার স্বীকৃতি তাঁহাদের নীতির মূলগত উদ্দেশ্য নহে। ভারতের প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থাকে জগতের কাছে চাপা দেওয়ার জন্যই এই সব চেষ্টা; কিন্তু ভারতের শাসন-নীতি সম্পর্কে যাঁহাদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এই ধরণের ধাপ্পা-বাজীতে প্রবঞ্চিত হইবেন না।

শিক্ষকদের দুরবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত ছাত্রদের এক সভায় মৌলবী ফজলুল হক সেদিন ছাত্রদের সমস্যা সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। দেশের প্রয়োজনীয় কাজ চালু রাখিবার জন্য বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মচারীদের অন্ন সংস্থান করা গভর্নমেণ্টের যেমন কর্তব্য, অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক; কারণ ছাত্রেরাই দেশের সকল আশা এবং ভরসার স্থল। আজ যদি অন্নের দায়ে ছাত্রেরা লেখাপড়া চালাইতে সমর্থ না হয়, তবে দুইদিন পরে সমগ্র সমাজের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে। দেশের সকল রকম উন্নতি প্রতিহত হইবে। এইজন্যই প্রত্যেক দেশের সরকারই যুদ্ধের মত এইরূপ গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যেও ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সেদিকে কোনরূপ অন্তরায় না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের প্রতি সরকারের কর্তব্যের কথাও আসিয়া পড়ে। এদেশের শিক্ষকগণের অনেকেই সামান্য বেতন পাইয়া থাকেন। বর্তমানের এই খাদ্যসঙ্কটে তাঁহারা সর্বাধিক বিপন্ন হইয়াছেন। ইঁহাদের এই দুরবস্থার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সেদিন 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক দিবস' প্রতিপালিত হয়। এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এই মর্মে প্রস্তাব করা হয় যে, গভর্নমেণ্ট ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করুন এবং শিক্ষকদিগকে অত্যাবশ্যক কর্মে লিপ্ত সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করিয়া গভর্নমেণ্ট তাঁহাদিগকে দুর্মূল্যজনিত বিশেষ ভাতা এবং খাদ্যদ্রব্য ও স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহের ব্যবস্থা করুন। আমরা আশা করি গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি অনতিবিলম্বে এই দিকে আকৃষ্ট হইবে।

বন্যাপীড়িতদের সাহায্য—

দামোদর বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমানে ব্যাপক অঞ্চল এবং মুর্শিদাবাদ ও ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার ও মেদিনীপুরের কতক স্থানে ও বীরভূমের পূর্ব অঞ্চলে যে বন্যা ঘটিয়াছে—ক্রমে তার ভীষণতার কথা জানা যাইতেছে। বর্দ্ধমানের সংবাদে প্রকাশ, বন্যার ফলে গবাদি জন্তুর মৃতদেহসমূহ ভাসিয়া যাইতেছে। সেই সঙ্গে মানুষের শব-দেহও দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে এবং অনশনে লোকের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ধান্য, বীজ, তরিতরকারি সব নষ্ট হইয়াছে। চাউলের মূল্য মণ-করা ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে ৩৫৲ টাকায় উঠিয়াছে; এই দুর্মূল্যে দিয়াও যথেষ্ট চাউল মিলিতেছে না। রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু মহাসভা, মারোয়াড়ী সেবা সমিতি দুর্গত জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য সেবা-কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। দুর্ভাগ্য এই দেশের উপর বিধাতার এই অভিশাপের একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে, আমরা দেশের স্বার্থ এবং জাতির স্বার্থ আজও বড় বলিয়া বুঝি নাই। ব্যক্তিগত হীন স্বার্থই আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের অনেক-খানিই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন এ সম্বন্ধে আমরা সচেতন না হইব এবং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থও যে বৃহত্তের স্বার্থের উপর নির্ভর করিতেছে—এই সত্যকে বাস্তবক্ষেত্রে স্বীকার না করিব ততদিন পর্যন্ত আমাদিগকে দেবতার এই রোষ সহ্য করিতেই হইবে। হীন স্বার্থের প্রবৃত্তিতে যেখানে প্রতিবেশপ্রভাব কলুষিত, সেখানে বিধাতার কল্যাণ-স্পর্শ থাকে না।

কথার মাহাত্ম্য—

মুসোলিনীর পতন হইয়াছে। ফ্যাসিস্ট-বাদের পর নাৎসীবাদও ধ্বংস হইবে এবং জগতে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নবযুগের নূতন সূর্যোদয় ঘটিবে। সম্মিলিত পক্ষের রাষ্ট্রনীতিকগণ এই সুসমাচার প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। গত ২৫শে জুলাই মার্কিন রাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ হেনরী ওয়ালেস একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ফ্যাসিস্ট এবং নাৎসী দস্যুদিগকে দমন করিয়াই তাঁহারা নিরস্ত হইবেন না। সাম্রাজ্য-বাদের কবল হইতেও তাঁহারা জগতের জাতিসমূহকে উদ্ধার করিবেন। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট গত ২৯শে জুলাই এক বেতার বক্তৃতাতে বলিয়াছেন যে, নাৎসী, ফ্যাসিস্ট এবং জাপানীদের প্রভুত্বপর শাসন হইতে ঐ সব শক্তির অধীনস্থ দেশসমূহকে তাঁহারা মুক্তি দিবেন এবং সেই সব দেশে বক্তৃতার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, জীবিকার্জনের স্বাধীনতা এবং ভীতিপূর্ণ জীবনের স্থলে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন। একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই উক্তির যুক্তিতে ফাঁক রহিয়াছে। চার্চিল সাহেবের চিন্তা শুধু ইউরোপের নাৎসী এবং ফ্যাসিস্টদের শাসিত দেশসমূহের জন্য; মিঃ রুজভেল্টের দৃষ্টি অবশ্য তাঁহার অপেক্ষা একটু উদার এবং এশিয়ায় জাপানীদের দ্বারা শাসিত দেশসমূহের দিকেও সম্প্রসারিত; কিন্তু সম্মিলিত পক্ষের গণতান্ত্রিক বন্ধুদের শাসনে যেসব দেশ অধীন রহিয়াছে, সে সব দেশের সম্বন্ধে মিঃ রুজভেল্ট নীরব। ভারত-বর্ষ এবং ব্রিটিশ শাসিত অপরাপর প্রদেশের স্বাধীনতার সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। রাজনৈতিক সৌজন্যের দায়ই এক্ষেত্রে হয়ত তাঁহার কাছে বড় হইয়াছে কিংবা নিজেদের স্বার্থগত দুর্বলতার জন্যই এক্ষেত্রে খোলা-খুলি সব কথা বলা মিঃ রুজভেল্টের পক্ষে সম্ভব হয় নাই; কিন্তু এমন সতর্ক উক্তি আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহাদের আন্তরিকতায় শিথিলতারই পরিচয় প্রদান করে।



রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

- শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী -

প্রথম অভিজ্ঞতা

এতদিন পরেও আজ আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে একদিন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যা-বেলায় শান্তিনিকেতন আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনকার দিনে বোলপুরে রেল-স্টেশনটি ছোট ছিল; স্টেশনের বাহিরে বটগাছের তলে কয়েকখানা গরুরগাড়ি থাকিত; তারি একখানি গাড়ি চড়িয়া শান্তিনিকেতনের দিকে রওনা হইলাম। যখন আশ্রমে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন অনেকক্ষণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কোথায় নামিলাম, কোন ঘরে গিয়া বসিলাম, কাদের সঙ্গে প্রথম কথা বলিলাম, সে কথা আজ আর মনে পড়ে না। কিছুক্ষণ পরেই খাবার ডাক পড়িল। এখন যেখানে লাইব্রেরী তার উত্তর দিকে বড় একখানি কেরাসিন টিনের ঘর ছিল। তখনকার দিনে সেটি ছিল খাবার ঘর, আর এখন যেখানে আফিস-বাড়ি, তারি খানিকটা অংশ ছিল রান্নাঘর। এই টিনের ঘরে লম্বা করিয়া চটের আসন পাতা, শালপাতা আর গেলাস-বাটি সাজানো—এই রকম পাঁচ ছয়টি সুদীর্ঘ শ্রেণী। খাবারের আয়োজনের মধ্যে খিচুরি ও পায়েসের ব্যবস্থা ছিল মনে পড়ে। প্রথম সূচনা নেহাৎ মন্দ লাগিল না।

তারপরে কে যেন আমাকে শোবার জন্য 'বীথিকা' ঘরে লইয়া গেল। সেবার বোধকরি 'বীথিকা-গৃহ' নূতন তৈরি হইয়াছে। বিছানায় গিয়া শুইলাম। সন্ধ্যাবেলা একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, নূতন-ছাওয়া চালের খড়ের সিক্ত গন্ধ পাইলাম। এই উদ্ভিজ্জ স্নিগ্ধ সুবাসেই শান্তিনিকেতনের আমার প্রথম যথার্থ অভিজ্ঞতা। তারপরে তো কত বছর কাটিয়া গিয়াছে, কত নূতন নূতন



বটগাছের নীচে গোরুরগাড়ী স্টেশন

অভিজ্ঞতার স্তর জীবনের উপর জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যখনই খড়ের চালের সিক্ত সুগন্ধ পাই, আমার সেই প্রথম রাত্রিটির কথা মনে পড়িয়া যায়। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না, যখন জাগিলাম দেখি অনেক বেলা। অন্য ছেলেরা অনেক-ক্ষণ উঠিয়া গিয়াছে, আমাকে নূতন ছেলে বলিয়া বোধ করি জাগাইয়া দেয় নাই। সেই প্রথম দিনের আলোয় শান্তিনিকেতনের সঙ্গে পরিচয়—যেখানে জীবনের সতেরো বছরকাল কাটিবে, সেখানকার সেই প্রথম প্রভাত।

বাহিরে আসিয়া সবচেয়ে বিস্ময়ের লাগিল—ব্যাপারখানা কি! ছেলেরা মাঠের মধ্যে ইতস্তত আসন পাতিয়া বসিয়া কেন? ইহার অনুরূপ তো কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! প্রশ্নের ছেলে আমি মনে কৌতূহল ছিল, কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তির সাহস যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। তারপর দেখিলাম, ছেলের দল এক জায়গায় সমবেত হইয়া সমস্বরে কি যেন আবৃত্তি করিয়া গেল। একটা সংস্কৃত মন্ত্র বলিয়া মনে হইল। এই পর্ব সমাধা হইলে সকলে সারিবন্দীভাবে জলযোগের জন্য রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

এতদিন পরে সব কথা অবিকল মনে থাকিবার নয়। কত কথা ভুলিয়া গিয়াছি, হয়তো দশটা ঘটনা মিলিয়া একটা ঘটনায় পরিণত হইয়াছে; কত ঘটনার মেল-বন্ধন ভাঙিয়া নূতন পর্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে; আবার পরের ঘটনা আগের উপরে আরোপিত হইয়াছে।

ইহার পরে মনে পড়ে—আমাকে ক্লাসে ভর্তি করিয়া দিবার কথা। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে একই ছেলে শিক্ষার তারতম্য অনুসারে এক এক বিষয় উচ্চতর নিম্নতর শ্রেণীতে পড়িতে পাইত। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসকে যদি প্রথম শ্রেণী বলা যায়, তবে দশম শ্রেণী নিম্নতম। কোন ছেলে বাংলা, ইংরাজিতে হয়তো ৭ম শ্রেণীতে পড়ে, গণিতে সে ৮ম শ্রেণীভুক্ত। বছর শেষে সব বিষয়ে যাহাতে সে ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযুক্ত হইতে পারে, সেদিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন।

কাল্পনিক দৃষ্টান্ত খাড়া করিয়া লাভ কি—আমি নিজেই এইরূপ বিচিত্র শ্রেণীর একজন ছাত্র ছিলাম।

গণিতে আমি বরাবর এক শ্রেণী নীচে পড়িতাম। বছর শেষে আমাকে সব বিষয়ে সমান পারদর্শী করিয়া তুলিতে কর্তৃপক্ষের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু গণিতে শূন্য-বাদ প্রচার করিবার জন্যই যাহার জন্ম কর্তৃপক্ষের তাড়না তাহার কি করিবে? ফলে এই হইত যে, বছর শেষে গণিতে আমাকে 'ডবল' প্রমোশন দিয়া অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমান করিয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা হইত। দু'-একদিন সেই নূতন ক্লাসে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া গণিতে নীচের ধাপে ফিরিয়া আসিতাম। ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই নিশ্চিন্ত হইতেন।

একবার এই রকম একটা ডবল প্রমোশনের কথা আমার বেশ মনে আছে। এই ডবল প্রমোশন ব্যাপারে আমার আর একজন সঙ্গী

ছিল। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, কোন বিষয়েই যে আমার অনন্যসাধারণত্ব নাই, ইহা তাহাই মাত্র প্রমাণ করে। এখন আমরা তো দুটিতে নূতন ক্লাসে গুটি গুটি গিয়া একটেরে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলাম। শরৎবাবু ছিলেন শিক্ষক; আমাদের গণিত বিদ্যার খ্যাতি অজ্ঞাত ছিল না, পাছে তাঁহার চোখে পড়িয়া যাই, সেই ভয়ে একটু আড়ালেই বসিয়াছিলাম। শরৎবাবু ব্ল্যাক-বোর্ডে একটি অঙ্ক লিখিয়া দিলেন, তাতে 'হন্দর' কথাটি ছিল। এখন আমরা দুজনে ইতিপূর্বে কখনো 'হন্দর' শব্দ শুনি নাই। প্রথম শ্রবণে শব্দটা হাস্যকর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একে অঙ্কের ক্লাস তার উপরে শরৎবাবুর 'কাল-বৈশাখীর' মেঘের মত গাম্ভীর্য ও শিলাবর্ষণের খ্যাতি, কাজেই হাসিবার মতো আমাদের ঠিক মনের অবস্থা ছিল না—আমরা সর্বজ্ঞের গম্ভীরতা মুখে টানিয়া আনিয়া খাতার পাতায় আঁকজোক কাটিতে লাগিলাম।

সঙ্গী আমাকে শুধাইল, 'হন্দর' মানে কি রে?

আমি বলিলাম—ওটা বোধ হয় লেখার ভুল। হাঙ্গর হবে।

সে বলিল—জিজ্ঞাসা কর্ না।

আমি বলিলাম—চুপ কর্। অন্তত একটা দিনও ডবল প্রমোশন ভোগ করতে দে।

অগত্যা চুপ করিয়া থাকিবার পরামর্শই গৃহীত হইল। কিন্তু এত বিদ্যা কি অধিকক্ষণ চাপা থাকিতে পারে! কিছু-ক্ষণের মধ্যেই শরৎবাবু আমাদের সম্যক পরিচয় লাভ করিলেন এবং পত্রপাঠ নীচের ক্লাসে পাঠাইয়া দিলেন। আসিবার পূর্বে বুঝিলাম শরৎবাবুর সম্বন্ধে যে-সব খ্যাতি আছে, তাহা অত্যন্ত পীড়াদায়কভাবে সত্য।

এখন, গণিত সম্বন্ধে অজ্ঞতা কবলে করায় লোকের সন্দেহ হইতে পারে ম্যাট্রিকুলেশনের ঘাঁটি পার হইলাম কি উপায়ে! বলা বাহুল্য, জ্যামিতির সাহায্য না পাইলে ইহা কখনই সম্ভব হইত না। জ্যামিতি এমন মুখস্থ করিয়াছিলাম যে, প্রথম হইতে শেষ আবার শেষ হইতে প্রথম পর্যন্ত অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিতাম। লোকে বলিত, জ্যামিতি বুঝিয়া লইলে নাকি মুখস্থ করিবার আর প্রয়োজন হয় না। হয়তো তাই। কিন্তু ও রকম বিপজ্জনক এক্সপেরিমেণ্ট করিবার সাহস আমাদের ছিল না।



উপাসনা

এ সব তো অনেক পরের ঘটনা। প্রথম দিন আমার যখন শ্রেণী নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠিল, কে একজন যেন বলিলেন—একে গুরুদেবের ক্লাসে নিয়ে যাও। গুরুদেব বলিতে যে রবীন্দ্রনাথকে বুঝায় তাহা জানিতাম না। আর সত্য কথা বলিতে কি, তখন রবীন্দ্রনাথের নামই শুনি নাই—এমন কি তাঁহার কোন কবিতাও পড়ি নাই।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের দোতালায় থাকিতেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম, আমার বয়সের কয়েকটি ছেলে আর মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ। তখনো তাঁহার চুল দাড়ি সব পাকে নাই; কাঁচা-পাকায় মেশানো, কাঁচার ভাগই বোধ করি বেশী। পরণে পায়জামা ও গায়ে পাঞ্জাবী, তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন। আগের সূত্র অবলম্বন করিয়া অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। তিনি একজন ছাত্রকে বলিলেন—আচ্ছা, ইংরিজিতে বলতো—সবির একটি গাধা আছে।

সবি ক্লাসের অপর একটি ছেলের নাম। ছাত্রটি নির্বিকারচিত্তে বলিয়া গেল—Sabi is an ass. আমরা কেহ হাসিলাম না. কারণ গাধা' থাকায় ও গাধা হওয়ার ভেদ সেই বয়সে বোধ করি আমাদের মনে স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, দেখলি সবি, তোকে গাধা বানিয়ে দিলে? ইহাতেও সবি হাসিল না। বোধ করি পদবৃদ্ধির লোপ হওয়াতে সে কিছু ক্ষুণ্ণই হইল।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রথম-তম স্মৃতি। ঘটনাটি অতি তুচ্ছ কিন্তু এই তুচ্ছ সূত্রটিকেই অবলম্বন করিয়া বছরের পর বছর রবীন্দ্রনাথের কত স্মৃতি জমিয়া উঠিয়াছে। ফলে এই ঘটনাটি যেন আমার কাছে রবীন্দ্র-চরিত্রের অন্যতম প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। লঘুতম কথাবার্তা হইতে মোচড় দিয়া তাহার রস আদায় করিবার ক্ষমতা, অভাবনীয়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহার রসসৃষ্টির শক্তি শিশু-মনের সঙ্গে সমসুরে নিজেকে অনায়াসে স্থাপন—এ সমস্তই রবীন্দ্র-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষাদান যাঁহার ব্যবসা তেমন লোক হইলে এই ঘটনায় না জানি কি অনাসৃষ্টি করিয়া বসিত। কিন্তু শিক্ষাদান যাঁহার পক্ষে সহজাত, তিনি কি অনায়াসে সমস্ত ঘটনাটির উপরে শুভ্র কাশ কুসুমের মতো একটি হাসির হিল্লোল বুলাইয়া দিয়া ইংরেজি তর্জমার আবহাওয়া হইতে তাহাকে একে-বারে রূপকথার অনির্বচনীয়তা দান করিলেন।

প্রাচীন শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এখন সর্বজনজ্ঞাত। কিন্তু সে ইতিহাস এমনই চিত্তাকর্ষক যে তাহার পুনরুক্তিতে দোষ নাই। এখন যে ভূখণ্ড জুড়িয়া বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এক সময়ে তাহা জনশূন্য তরুশূন্য নির্জন প্রান্তরমাত্র ছিল। কথিত আছে যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই মাঠ অতিক্রম করিয়া যাইবার সময়ে এই স্থানটির দ্বারা আকৃষ্ট হন। রায়পুরের সিংহ জমিদারেরা মহর্ষির ভক্ত ছিলেন। এই পরিবারের শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহর্ষির একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন—ই'হার কথা জীবন-স্মৃতিতে আছে। বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুর যাইবার পাকা সড়ক আছে—এই সড়ক ধরিয়া রায়পুর গেলে পথে শান্তি-নিকেতনের মাঠ পড়িবার কথা নয়। তবে মহর্ষির পথে এই মাঠ পড়িল কেমন করিয়া? আমার বিশ্বাস, কোন একবার পশ্চিম হইতে ফিরিবার সময়ে মহর্ষি আমদপুর স্টেশনে নামিয়া রায়পুর যাইতেছিলেন। শিউড়ি হইতে বোলপুর যাইবার যে সড়ক আছে, আমদপুর স্টেশনে নামিয়া তাহা ধরিয়া বোলপুর হইয়া রায়পুর যাওয়া যায়। এখন এই পথ ধরিয়া চলিলে পথে শান্তি-নিকেতনের মাঠ অতিক্রম করিতে হয়। সে ৮০

যাই হোক, এখানকার অবারিত অনন্ত শূন্য প্রান্তর মহর্ষির বড়ই ভালো লাগিয়া যায়। মাঠটি একেবারে রিক্ত ছিল না—ইহারই একান্তে ছিল দুটি ছাতিম তরু; এই বৃক্ষ-যুগলই প্রান্তরটির আদিমতম অধিবাসী। এই মাঠ রায়পুরের জমিদারীর অন্তর্গত। মহর্ষি রায়পুরের বাবুদের কাছ হইতে ছাতিম তরুদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া কয়েক বিঘা জমি কিনিয়া লইলেন। এইখানে তাঁহার ধ্যানের আসন পাতিবেন—ইহাই তাঁহার সংকল্প।

মহর্ষির চরিত্রে অনেকগুলি বিশিষ্ট গুণ ছিল—ধ্যানপরায়ণতা ও প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ তাহাদের অন্যতম। দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র এই দুটি পৈত্রিক গুণের সবচেয়ে বেশি অধিকারী হইয়াছেন। একাধারে ধ্যানী ও প্রকৃতি-রসিক না হইলে কোন ব্যক্তির এই নির্জন প্রান্তর ভালো লাগিবার কথা নয়। মহর্ষির অন্তরে যে অনন্ত বিরাজ করিতেছিলেন, এই অবারিত মাঠে সেই বিরাটের আকাশ-ভরা সিংহাসন যেন স্থাপিত দেখিতে পাইলেন। ছাতিম তলায় তিনি ধ্যানের আসন পাতিলেন। ছাতিম গাছ দুটির পূব দিকে একটি দোতালা পাকা বাড়ি তৈরি হইল—ইহাই শান্তিনিকেতনের আদিম নিবাস।



ছাতিমতলা

এই মাঠ তরুশূন্য হইলেও এখানে যেমন দুটি ছাতিম গাছ ছিল, তেমনি ইহা জনশূন্য হইয়াও একেবারে বিজন ছিল না—এখানে একদল ডাকাতের বাস ছিল। ডাকাতি করিবার এমন উপযুক্ত স্থান আর কোথায় পাওয়া যাইবে! শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকে একটি জলাশয় আছে, তারি ধারে ভুবনডাঙা গ্রাম। ডাকাতেরা এই গ্রামের অধিবাসী। শুনিয়াছি যে, ডাকাতেরা মহর্ষির প্রভাবে এই ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য গ্রহণ করে। এই ডাকাত দলের সর্দারকে ছোটবেলায় আমরা শান্তিনিকেতনের পরিচারকরূপে দেখিয়াছি। লম্বা একহারা ছিপছিপে চেহারার গোঁফ-দাড়ি কামানো, চুল-পাকা, রং কালো স্বল্পভাষী লোকটি। সে নাকি লাঠি ও তরবারি খেলায় ওস্তাদ ছিল, আর 'রণ-পা' চড়িয়া এক রাত্রিতে নাকি বর্ধমান গিয়া ডাকাতি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ভোর রাত্রিতে নিজের বাড়িতে ভালো মানুষটির মতো ঘুমাইয়া থাকিত।

আমি শান্তিনিকেতনের রীতিমত ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, স্মৃতিকথা মাত্র লিখিব। স্মৃতির ঝুলিতে হাত ঢুকাইয়া দিব, কি যে উঠিয়া আসিবে, তাহা আমার নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে না—যদি কেহ কৌতূহলী পাঠক থাকেন, তবে তাঁহাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তবু প্রাচীন শান্তিনিকেতন পল্লীর একটা আভাস এখানে দিবার চেষ্টা করিব, স্মৃতি-গ্রন্থের পক্ষে হয়তো তাহা অপ্রাসঙ্গিক—কিন্তু ত্রিশ বছরেরও বেশি আগে এখানকার কি চেহারা ছিল, তাহা কৌতূহলজনক মনে হইতে পারে। বিশেষত, দ্রুত বিবর্তনশীল এই প্রতিষ্ঠানের পূর্বরূপ একেবারে বিস্মৃত হইবার মতো হইয়াছে। হঠাৎ ত্রিশ বছর পরে কেহ এখানে গেলে পূর্বতন পল্লীকে কিছুতেই আর চিনিতে পারিবে না—কাজেই এই উপলক্ষে আগের চেহারাটা এক জায়গায় অঙ্কিত হইয়া থাক্।

শান্তিনিকেতনের আদিম দোতালাটিকে কেন্দ্র বলিয়া ধরিলে ইহার উত্তরে লাল কাঁকরের পথের দুই দিকে দুই সারি আমলকি গাছ—এই আমলকি বীথি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে একটি ফটক, কিন্তু তাহাতে কোন কালে কপাট ছিল না। ইহারই পূব দিকে উপাসনার জন্য একটি মন্দির। শ্বেতপাথরের মেঝে, টালির ছাদ, লোহার ফ্রেমে নানা রঙের কাচের চৌকা দেয়ালের কাজ করিতেছে; চারিদিকে টগর, কৃষ্ণচূড়ার গাছ। মন্দিরের পূবে একটা অর্ধখনিত পুকুর, বেলে মাটি বলিয়া জল ওঠে নাই, বর্ষাকালে বৃষ্টির জল জমে মাত্র। এই পুকুর-খোঁড়া মাটি তুলিয়া পূবে দিকে একটা স্তূপ—আমরা সেটাকে পাহাড় বলিতাম। এই পাহাড়ের উপরে কালক্রমে বট, আমলকির গাছ জমিয়া জংলা হইয়া গিয়াছে। বটগাছটার তলায় ছোটবেলায় শ্বেতপাথরের একটা বেদী দেখিয়াছি। মহর্ষি নাকি প্রাতঃকালে এখানে বসিয়া সূর্যোদয় সম্মুখে করিয়া উপাসনা করিতেন। ছাতিম তলার বেদী সূর্যাস্তমুখী। প্রচ্ছন্ন কবি না হইলে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে তাল রাখিয়া নিজের অধ্যাত্ম জীবনকে কে আর গড়িয়া তুলিতে পারে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পিতার যোগ্য পুত্র বটে।

শান্তিনিকেতনের পাকা বাড়ির দক্ষিণে আর একটি লাল পথ—দুদিকে আমবাগান। এই পথ যেখানে শেষ হইয়াছে—সেখানেও একটি কপাটহীন ফটক—এই দুই ফটকের শ্বেতপাথরের ফলকে ব্রাহ্ম ধর্মের মূল মন্ত্রগুলি সানুবাদ লিখিত। এখানে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আর একটি কাঁকরের লাল পথ—তার দক্ষিণ দিকে বনস্পতি শালের শ্রেণী। এই শালগাছের ছায়ায় ছাত্রদের বাসের জন্য খড়ের লম্বা লম্বা ঘরগুলি। এই পথটির পূর্বপ্রান্ত বোলপুর-শিউড়ি সড়কে আসিয়া মিশিয়াছে। সেখানে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আমলকি গাছের মধ্যে আর একটা ছোট কোঠা-বাড়ি। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে বাস করিবার জন্য ইহা গড়িয়া লইয়াছিলেন। এই পথের পশ্চিমপ্রান্ত মাঠের মধ্যে গিয়া শেষ হইয়াছে—সেখানে আর একটা ছোট কোঠা-বাড়ি ছিল—তাহা একাধারে লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরি। তাহারই পাশে আশ্রমের পাকশালা। আশ্রমের কিছু দক্ষিণে পূর্বোক্ত জলাশয়ের উত্তর তীরে কয়েকখানি টালির ঘর লইয়া ছোট একটি বাড়ি—ইহাকে নীচু বাঙলা বলিত। জলাশয়ের দক্ষিণ তীরে ভুবনডাঙা গ্রাম—গ্রামের কোলাহল জলাশয়ের উপর দিয়া স্নিগ্ধতর, মৃদুতর হইয়া এই বাঙলা বাড়িতে আসিয়া পৌঁছায়।

ক্রমশ

বাঁকা স্রোত

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

১০

আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আবার আশ্রয়হীন হইলাম। তবে পূর্বের চেয়ে এবার আমার গৌরব বর্ধিত হইয়াছিল। এতদিন শুধু দরিদ্র ছিলাম, এবার তাহার সহিত দুশ্চারিত্রতার অপবাদ যুক্ত হইল। আরো কি আছে বরাতে—চিন্তা করিতে করিতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইলাম বহুক্ষণ। তারপর দুপুর পর্যন্ত আমি একেবারে শ্যামবাজারের এক চিত্রগৃহের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইলাম।

তখন নির্বাকচিত্রের যুগ! ঘরের দেওয়ালে একটি যুবকের ছবি দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। যুবকের মুখে চোখে একটা ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব! সে ছুটিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে একদল লোক লাঠি লইয়া তাড়া করিয়াছে।

ছবিটির দিকে তাকাইয়া মনে হইল, হয়ত সে আমারই মত হতভাগা—কোন দোষ করে নাই, অথচ অবস্থাবিপাকে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। কে জানে, ইহা হইলেও হইতে পারে। যুবকটির জন্য মনে কেমন অনুকম্পা জাগিল। চিত্রগৃহের বারান্দার কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে আরো যেসব ছবি টাঙানো ছিল, তাহা দেখিবার জন্য তখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম।

প্রত্যেক ছবির নীচে ইংরেজীতে দুইটি করিয়া লাইন লেখা ছিল, আমি তাহা পড়িয়া দেখিতে-ছিলাম। এমন সময় পিছন হইতে কে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। চাহিয়া দেখি কমল এবং তাহারই পাশে মধু দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। তাহারা দুপুরের শোতে বায়স্কোপ দেখিতে আসিয়াছিল সেখানে। আমি প্রথমটা একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, তারপর সে ভাবটিকে সঙ্গে সঙ্গে চাপা দিয়া বলিলাম, ছাড়্ ভাই কমল, বড় গরম!

কমল হাসিতে হাসিতে বলিল, হ্যাঁ আমি ছেড়ে দিই, আর তুমি পালাও! কতদিন ধরে আমরা তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—কোথায় পালিয়ে-ছিলি রে, চাকরি-বাকরী ছেড়ে? তোর জ্যাঠা এসে কত খোঁজাখুঁজি করে চলে গেলেন, ভুতো কত ছুটোছুটি করলে, কিন্তু কোন পাত্তাই কেউ পেলে না! এতদিন কোথায় ডুব মেরে-ছিলি? তুই দেখ্‌ছি একটা আস্ত পাগল, তোর এই পালানো অভ্যেসটা এখনো গেল না! তোর জ্যাঠা আমাদের বলে গেছেন খবর পেলেই যেন তাঁকে জানাই টেলিগ্রাফ করে। এইবার চোর ধরা পড়েছে, তাঁকে খবর পাঠাই? এই বলিয়া কমল হাসিয়া উঠিল। আর মধুও তাহার সঙ্গে যোগ দিল। তাহাদের এই বলিষ্ঠ ও প্রাণময় হাসি দেখিয়া আমার মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিলাম, ছাড়্ ভাই কমল, সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না!

সে আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, এখন তো ভালো লাগবেই না, আর আমরা যে তোকে খুঁজে খুঁজে কলকাতার শহর শেষ করে ফেললুম, তার মজুরি দেবে কে?

বলিলাম, কে তোদের খুঁজতে বলেছিল?

আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কমল বলিল, কেউ বলেনি, আমারই ঘাড়ে ভূত চেপেছিল তাই তোমায় খুঁজতে গিয়েছিলুম, হয়েছে? এই বলিয়া কমল চুপ করিতেই মধু বলিল, নারে আলোক তোকে-ও 'গুল্' দিচ্ছে, বিশ্বাস করিস্‌নি ওর কথা। কলকাতার শহর, চারিদিকে গাড়ি-ঘোড়া, মানুষের বিপদ ঘটতে কতক্ষণ! তাই আমরা আগে হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিয়ে তারপর পুলিসের থানা কটায় অনুসন্ধান করেছিলুম।

বলিলাম, তারপর?

মধু বলিল, তারপর আর কি—যা বোঝবার তাই বুঝলুম—আবার আগের রোগ ধরেছে! আচ্ছা আলোক, তুই পালাস্ কেন ভাই? এর জন্যে তোকেই তো কত কষ্ট ভোগ করতে হয়। তুই কি বুঝিস্ না যে আজকালকার বাজারে মানুষ একটা চাকরী পায় না, আর তুই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিলি?

বলিলাম, থাম্, তোর মুখে এই সব উপদেশ শুনলে গা জ্বালা করে।

কমল বলিল, এই মধু চুপ কর।

সে চুপ করিল। তখন কমল অভিনয় করিবার ভঙ্গিতে দুই হাত জোড় করিয়া বলিল আচ্ছা এইবার দয়া করে বলুন—আমাদের সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে যাওয়া হবে কি না!

হাসিতে কমল যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। মধুও তাহার এইরূপ ভঙ্গি দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমল তখন মধুর দিকে তর্জনী হেলন করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, খবরদার, চুপ! দেখছিস্ না আমাদের সামনে গুরুজন দাঁড়িয়ে, তার কাছে রঙ্‌তামাসা করতে লজ্জা করে না?

কমলের এই ইঙ্গিত বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না, কিন্তু তাহারা যদি জানিত যে তখন আমি কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এইরূপ আচরণ করিতে পারিত না। তাই তাহারা যখন পুনরায় বায়োস্কোপ দেখিবার জন্য অনুরোধ করিল, আমি বলিলাম, না।

কমল বলিল, না? শুনবো না তোর কথা, কোন্ রাজকার্য এখন তোমার বয়ে যাচ্ছে শুনি! দু'ঘণ্টার তো ব্যাপার—দুটো থেকে চারটে—তারপর যেখানে খুশি যাস্, কিছু আমরা বলবো না!

এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সহসা কমলের মুখের চেহারা বদ্‌লাইয়া গেল। সে তখন চিন্তাক্লিষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁরে, এখন তুই কোথায় থাকিস্ ভাই?

কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিছুতেই তাহাদের কাছে কোন কথা ভাঙ্গিব না। তাহাদের সঙ্গে আমার জীবনের আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তাহারা কি বুঝিবে আমার কথা? হয়ত বা ব্যঙ্গ করিয়া আমার এই দারিদ্র্যকে আরো দুঃসহ করিয়া তুলিবে।

কিন্তু মধু ও কমল কিছুতেই ছাড়িল না। তাহারা বলিল, আমরা তোর বাড়িতে বলতে যাবো না, অন্তত এটুকু আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখিস্!

তাহারা এরূপ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল যে, আমার পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব হইল না। তখন বলিলাম, একজনের বাড়ি 'গার্ডিয়ান টিউটর' ছিলাম, কিন্তু আজ সে চাকরী গেল!

কমল সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, এখন তাহলে কি করবি?

বলিলাম, তাই তো ভাবছি।

মধু বলিল, কত মাইনে দিত তারা?

সেকথা আর জিজ্ঞেস্ করিস্‌নি। এই বলিয়া আমি গম্ভীর হইয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, তাহাদের দুইজনেরও মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে মধু বলিল, আচ্ছা আলোক, তুই শিবপুরে থাকতে রাজি আছিস্? আমার এক মাসিমা থাকেন সেখানে, মার পিস্‌তুতো বোন, তাঁর সঙ্গে সেদিন মামার বাড়িতে দেখা হয়েছিল, তিনি একজন মাস্টার খুঁজছিলেন—বাড়িতে থাকবে, আর তাঁর ছেলেপুলেদের পড়াবে—অবশ্য মাইনেও দেবেন কিছু; থাক্‌বি সেখানে?

কমল বলিল, চল্ আগে ভেতরে গিয়ে বসা যাক্, তারপর সব কথা হবেখন।

তাহাই হইল। ভিতরে গিয়া মধুর সঙ্গে এই ঠিক হইল যে, বায়োস্কোপ দেখা শেষ হইলে সে আমাকে লইয়া গিয়া সেখানে রাখিয়া আসিবে।

বায়স্কোপ ভাঙ্গিলে কমল তাহার মেসে ফিরিয়া গেল। আর মধুতে আমাতে শিবপুরে চলিলাম।

সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ আমরা মধুর মাসির বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মধু রাস্তায় যাইতে যাইতে আমার কাছে তাহার এই মাসির সম্বন্ধে কত গল্প বলিল। তাঁহার নাকি একটি ভয়ানক দুর্বলতা আছে, কেহ মা বলিলেই তিনি গলিয়া যান। কখন তাঁহার নিকট হইতে কোন জিনিস চাহিয়া কেহ বিমুখ হয় না। কবে কোন্ ভিখারি শুধু মা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে কিরূপ ঠকাইয়াছিল, তাহার বহু কাহিনী বর্ণনা করিল।

গল্পগুলি শুনিয়া আমি মনে মনে সেই করুণাময়ী অপরিচিতার প্রতি যেরূপ

শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহার চেয়ে অনেক বেশী হইলাম মধুর প্রতি। তাই আমাকে তাহার মাসিমার নিকট রাখিয়া মধু যখন চলিয়া আসিল, আমি সংগে সংগে রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম ভাই মধু, আমায় ক্ষমা কর্।

মধু হাসিতে হাসিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ক্ষমা! কিসের জন্য!

বলিলাম, অপরাধ করেছি, তোকে ভুল বুঝে।

অপরাধ করেছিস তুই, আমার কাছে? দূর্ পাগ্লা! এই বলিয়া আমার হাতখানা ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। তারপর পকেট হইতে রুমালখনা বাহির করিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'গুড্ বায়'!

আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। কোন কথা আর আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না শুধু বারবার চোখে জল আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এইভাবে আমি আবার আশ্রয় পাইলাম মধুর মাসিমার কাছে। আমার বিষয় সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখিবার জন্য আমি মধু ও কমলকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহারাও কথা দিয়াছিল জ্যাঠামশাইরা কিছুতেই জানিতে পারিবে না বলিয়া।

(১১)

মধুর মাসিমাকে পাড়ার সবাই 'ছোড়দি' বলিয়া ডাকিত, যাহারা বয়সে বড় তাহারাও বলিত, আবার যাহারা ছোট তাহারাও বলিত। মোট কথা, তিনি ছিলেন সরকারী 'ছোড়দি'। বিপদে আপদে তিনি সকলকে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে ভালবাসিত।

কাহার ছেলের অসুখ করিয়াছে—রাত জাগিতে হইবে, কাহার মেয়ের রাতদুপুরে প্রসব-বেদনা উঠিয়াছে—তাহাকে প্রসব করাইতে হইবে, কাহার স্বামী 'রেস্' খেলিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিয়াছে—তাহাকে অর্থসাহায্য করিতে হইবে—এই সমস্ত দিকে তাঁহার ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অবস্থা তাঁহার ভগবানের কৃপায় ভালই ছিল, স্বামী চাকরি করিয়াও কি একটা ব্যবসা করেন, তাহাতে বেশ দু'পয়সা উপার্জন হয়। সংসারের মধ্যে চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী। ইঁহাদের বড় ছেলেদুটিকে আমায় পড়াইতে হইবে। তাহাদের একটি পড়ে সপ্তম শ্রেণীতে, আর একটি ষষ্ঠ।

প্রথম প্রথম মধুর মাসিমা মুখে আমাকে যথেষ্ট স্নেহ দেখাইলেও, অন্তরে যেন আমার প্রতি কোথায় একটা ঔদাসীন্য ছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেই একেবারে যেন চাক ঘুরিয়া গেল। প্রথম প্রথম মা বলিয়া ডাকিতে আমার কেমন লজ্জাবোধ হইত। অনেকদিন পর্যন্ত তাই বলিতে পারি নাই শেষে মধুর কথা মনে পড়িতেই সমস্ত সংকোচ কাটাইয়া একদিন হঠাৎ 'মা' বলিয়া ফেলিলাম এবং তাহার ফল একেবারে হাতে হাতে পাইলাম।

আমি একতালার বৈঠকখানা হইতে একেবারে দোতলার সব চেয়ে সুন্দর ঘরখানিতে আশ্রয়লাভ করিলাম। এবং শুধু আশ্রয় দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, আমাকে জোর করিয়া হাওড়া কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। আমি ইহাতে পাছে লজ্জাবোধ করি, এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, যখন মা বলেছ, তখন মায়ের যা কর্তব্য সে তো আমাকেই করতে হবে—তোমার আর কে আছে!

শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। কি যে বলিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, ভগবান সত্যসত্যই যেন আমার মাকে এতদিন পরে মিলাইয়া দিয়াছেন। ভাল খাবারটি, বড় মাছটুকু, ইহা ছাড়া যে জিনিসটি আমি খাইতে ভালবাসি, সেটি তৈয়ারি করিয়া আমায় খাওয়াইতেন। উপরন্তু ঠাকুর-চাকর এমন কি, নিজের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত আমার সামনে ডাকিয়া বহুবার বলিতে শুনিয়াছি, 'আলো যে আমার পেটের ছেলে নয়, একথা যেন কেউ বুঝতে না পারে—তোমরা কোন বিষয় ওকে পর ভেবো না।'

ইহা শুনিয়া আমার চোখে জল আসিয়া পড়িত, আমি অতিকষ্টে ইহা সম্বরণ করিতাম। সত্যই মাতৃস্নেহ কি জিনিস, এতদিনে তাহার আস্বাদ পাইলাম। তিনি নিজে হাতে করিয়া আমার ঘরে বিছানা পাতিয়া দিতেন, কলেজে যাইবার সময় পরিষ্কার জামাকাপড় আনিয়া আমার হাতে দিতেন এবং কোন জিনিস খাইব না বলিলে, পীড়াপীড়ি করিয়া না খাওয়ান পর্যন্ত ক্ষান্ত হইতেন না। নিজের ছেলেমেয়ে থাকিতেও পরের ছেলেকে যে কেহ এমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, ইহা অন্য কেহ বলিলে হয়ত আমিই বিশ্বাস করিতাম না।

কতদিন কত মহিলা আমাকে ভুল করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া মনে করিয়াছেন; মনে পড়ে—ইহাতে আমি যত লজ্জিত হইতাম, তত বেশী খুশী হইতেন তিনি। প্রথম দিনের কথা আজো মনে আছে। কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিলাম দুইজন অপরিচিতা তাঁহার সংগে বসিয়া গল্প করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ ভাই ছোড়দি, এটি বুঝি তোমার বড় ছেলে? বাবা দেখতে দেখতে মাথায় কত লম্বা হয়ে গেছে—লোকে বলে মেয়েমানুষের কলাগাছের বাড়; আমি ত দেখছি কেউ কম যায় না! আমি এই এতটুকু দেখে গিয়েছিলুম ওবছর পুজোর সময় এসে ......বাপের বাড়ি দু'বছর আসিনি, তার মধ্যেই পাড়ার অর্ধেক ছেলেমেয়েদের দেখলে চিনতে পারি না।'

ইহা শুনিয়া গর্বে ও আনন্দে মায়ের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি ইহার কোন উত্তর না দিয়া শুধু মৃদু হাসিলেন।

প্রতিবেশিনী তখন পরম উৎসাহে বলিতেছিলেন, হ্যাঁ ভাই ছোড়দি, এর রঙটা আগে যখন দেখেছিলুম কেমন মাজা মাজা ছিল না? এখন যেন বেশ ফরসা হয়েছে বলে মনে হয়! এ রঙটা তোমার মত পেয়েছে বটে কিন্তু মুখচোখগুলো কার মত হয়েছে ভাই? ওর বাপের চোখ ত এত বড় নয়?

এইবার তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং সংগে সংগে সেই প্রতিবেশিনীটির সঙ্গিনীও খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তাহার গায়ে একটা ঠেলা মারিয়া বলি[illegible] আ মরণ, ও তোর ছোড়দির ছেলে হতে যাবে কেন—ওযে মাস্টার, বাড়িতে থেকে ওর ছেলেমেয়েদের পড়ায়!

এই অপরিচিতাদের মধ্যে একজন ননদ ও একজন ভাজ। যিনি আমার সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা মনে পোষণ করিয়াছিলেন, তিনিই ননদ। দুই তিন বৎসর অন্তর ভায়ের বাড়ি আসেন কয়েকদিনের জন্য।

ননদটি এই কথা শুনিয়া ভাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ছোড়দি যেন কি ভাই! এতক্ষণ চুপ ক'রে মজা দেখছিল! তাই প্রথম থেকেই আমার মনে কেমন সন্দেহ হচ্ছিল, এই সে বছর এতটুকু দেখে গেলুম, আর এরি মধ্যে এত বড়টা হ'লো কি করে?

ভাজটি বলিল, তোমার মাথা! ছোড়দির বড় ছেলে কি করে এত বড় হয়! আমার গণেশ আর সে দু'মাসের ছোটবড়, না ছোড়দি?

মা বলিলেন, ওমা, তোর গণেশ তখন কোথায়? আমার বলাই যখন পেটে সেই বছর ত তোর বিয়ে হ'লো! দিন দিন তোদের যেন সব বেভ্রম হচ্ছে। আমার বেশ মনে আছে তোর বিয়ের দিন ঠাকুরপো এসে কত সাধাসাধি করলে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কিন্তু আমার শাশুড়ী কিছুতেই মত দিলেন না, বললেন, হোক্ না পাড়া, তবু ভরা পোয়াতি এই রাত্রে এতগুলো গাছতলা দিয়ে যেতে হবে ত? আমি কোন ভরসায় পাঠাই। তখন আমার সাত মাস!

এই বলিয়া মা থামিলেন বটে কিন্তু সেই প্রসংগ ক্রমশ অগ্রসর হইতে হইতে কাহার কোন বছরে বিবাহ হইয়াছে তাহা উঠিল এবং তাহা হইতে শেষে বয়সের হিসাবে গিয়া ঠেকিল। তখন তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে মায়ের বয়স একত্রিশ এবং তাঁহারা দুইজন তাঁহার চেয়ে দুই বছরের ছোট।

এইসব কথা যখন হইতেছিল আমি তখন উপরে ছিলাম। সেখান হইতে সবই আমার কানে আসিতেছিল। এমন সময় সহসা তিনি চেঁচাইয়া ডাকিলেন, আলো—ও আলো!

বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলাম, আমায় ডাকছেন মা?

হ্যাঁ বাবা। আমার জরদার কৌটোটা বিছানার ওপর ফেলে এসেছি, নিয়ে যা না চট্ করে!

আমি তাঁহার আদেশ পালন করিয়া যখন উপরে উঠিয়া আসিতেছিলাম তখন আমার কানে গেল এই কয়টি কথা—আলোক আমায় মা বলতেই অজ্ঞান, কি চোখে যে আমায় ও দেখেছে তা কি বলবো ভাই! বলে কি, তুমি আমার আর জন্মের মা ছিলে।

শেষের কথাটি বলিবার সময় তাঁহার গলা আবেগে কাঁপিয়া উঠিত। আমি যে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকি ইহাতেই তিনি যেন কৃতার্থ হইয়াছেন, তাই সাড়ম্বরে সেই কথাটি যাহার সংগে দেখা হইত তাহাকে একবার না বলিয়া মনে শান্তি পাইতেন না।

এমনিভাবে একমাস, দুইমাস করিয়া বছর কাটিয়া গেল। আমি 'ফার্স্ট ইয়ার' হইতে 'সেকেন্ড ইয়ারে' উঠিলাম তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া। ইহাতে কলেজে রীতিমত ভাল ছেলে বলিয়া আমার নাম রটিয়া গেল। আর পাড়ায় ত কথাই নাই! মায়ের মুখ হইতে সবাই শুনিয়াছিল, তাহা ছাড়া পাড়ার যেসব ছেলেরা আমার সংগে পড়িত তাহারাও আমার সুনাম রটাইয়াছিল। কাজেই পাড়ায় আমার রীতিমত খাতির বাড়িয়া গেল। ইহাতে যত না গৌরব আমি অনুভব করিলাম তাহার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী করিলেন মা।

একদিন তিনি পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা আলো, আসছে বারে ফার্স্ট হতে পারবিনে?

হাসিয়া বলিলাম, পারবো, তুমি যদি একটু কম ভালবাসো?

ইহা শুনিয়া তিনিও হাসিলেন কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষু যেন সংগে সংগে স্নেহে নিবিড় হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, যদি তোর মা থাকতো তা হলে কত ভালবাসতো?

বলিলাম, তবে তুমি কি আমার মা নও?

তিনি আমার কাঁধের উপর একখানা হাত

রাখিয়া বলিলেন, তুই কি আমায় সত্যি তাই মনে করিস্?

না, বলিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

তিনিও হাসিয়া বলিলেন, দুষ্টু ছেলে!

আমি মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পড়াশুনায় সত্যি সত্যি আরো মনোযোগ দিলাম। এমনি করিয়া যখন পড়াশুনার মধ্যে মনকে একেবারে ডুবাইয়া রাখিলাম তখন একদিন দুপুরবেলা কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মা কাহার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তাঁহার নূতন মুখ—একেবারে নূতন চেহারা! তাঁহাকে ইতিপূর্বে কোনদিন দেখি নাই।

আমাকে দেখিয়াই তিনি মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মা বলিয়া উঠিলেন, ও কি লো, একফোঁটা ছেলে ওকে দেখে আবার মাথায় ঘোমটা দিচ্ছিস্ যে—দিন দিন তুই যেন কচি খুকী হচ্ছিস—ও যে আলোক!

বুঝিলাম, আমার ইতিহাস যথানিয়মে ইঁহার কাছেও বলা হইয়াছে। তাই তিনিও আবার মাথার কাপড়টা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ও—আমি মনে করেছিলুম বোধ হয় অপর কেউ!

মা তখন বলিলেন, আলোক, ঐ তোমার মাসিমা হন, নমস্কার করো। আমার ছোট বোন, আজই এসেছে দিল্লী থেকে।

তাঁহাকে দেখিয়া আমিও কেমন সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অপরিচিতা বলিয়া নহে, অসাধারণ রূপসী বলিয়া। সুন্দরী বলিলে যে ছবি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে ইহা সে রূপ নহে। ইহা যেন চন্দ্রকিরণে প্লাবিত ভরা গঙ্গা—দেখিলে চক্ষু, আত্মা, মন ভরিয়া উঠে এক অতীন্দ্রিয় পুলকে!

তিনি বসিয়াছিলেন রাজেন্দ্রাণীর মত। আমি নমস্কার করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলো লইবার জন্য যেমন হাত বাড়াইলাম অমনি তিনি পা দুইটি সরাইয়া লইলেন। বলিলেন থাক থাক পায়ে আর হাত দিতে হবে না। এই বলিয়া আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া তিনি আবার সেই হাত তাঁহার মুখে ঠেকাইলেন।

মা বলিলেন, দিলেই বা পায়ে হাত—তুই যে গুরুজন হ'স পূর্ণিমা! —না দিদি, কেউ পায়ে হাত দিলে আমার বড্ড লজ্জা করে! সেখানে এমনি আমার এক দেওর আছে, আমিও তাকে পায়ে হাত দিতে দেবো না, সেও ছাড়বে না। এমন দুষ্টু ছেলে, কি বলে জানো দিদি? বলে, তোমায় নমস্কার করি শুধু তোমার ওই সুন্দর পাদু'টো একবার হাত দিয়ে ছোঁব বলে!

এই বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। অদ্ভুত সে হাসি। আমার মনে হইল হঠাৎ যেন কোন বীণার সহস্র তার একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল।

মা আমায় বলিলেন, যাও, বইপত্তর রেখে, হাতমুখ ধুয়ে এসে মাসিমার সঙ্গে আলাপ করো! বলাই, টুনু, অঞ্জু, বাসু সব খেলতে বেরিয়ে গেল! কতবার বললুম, মাসিমার কাছে তোরা বোস, আজ আর খেলতে যেতে হবে না কিন্তু কে কার কথা শোনে! বলাই-বাবুর আজ স্কুলে ফুটবল ম্যাচ খেলা, টুনু গেল দাদার সঙ্গে তাই দেখতে আর মেয়ে দুটো বেরিয়েছে পাড়ায় তাদের সঙ্গিনীদের ডাকতে—মাসিমার কাছ থেকে একটা টাকা পেয়েছে আর কি রক্ষে আছে! আজ পুতুলের বিয়ে হবে—ওই দেখনা একে একে সব বাগানের মধ্যে এসে জমা হচ্ছে!

ইহা শুনিয়া মাসিমা মন্তব্য করিলেন, দিদির যেন কি হয়েছে—ছেলেমানুষ ওরা, খেলাধুলো না ক'রে—আমি বুড়োমাগি আমার মুখের কাছে এসে বসে থাকবে না?

তারপর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ও কোথায় সমস্ত দিন কলেজ থেকে পড়াশুনো ক'রে এলো, এখন একটু বিশ্রাম করবে, না—অমনি হুকুম হলো আমার কাছে এসবার জন্যে। না, বাবা আলোক দিদির কথা শুনো না তুমি ততক্ষণ জিরোও গে আমি ওপরে গিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করবোখন দিদির মতো তাড়াতাড়ি! এই বলিয়া মাকে ঈষৎ ভৎর্সনা করিলেন।

কোন কথা না বলিয়া আমি উপরে উঠিয়া গেলাম। সিঁড়ি পার হইতে না হইতেই এই কথাটি আমার কানে ভাসিয়া আসিল, তুই ভেবেছিস্ পূর্ণিমা ওকে বারণ করলি বলে, ও তোর কথা শুনবে? আমি যখন বলেছি তখন ব্রহ্মা বিষ্টু, মহেশ্বর এলেও কেউ ওকে রোধ করতে পারবে না, আমার কথা যেন ওর কাছে বেদবাক্য!

মাসিমা ঠিক কি ভাবিয়াছিলেন জানি না, তবে আমাকে অতি দ্রুত ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, বাবা, ছেলের কি মাতৃভক্তি!—মায়ের কথাটাই সব হ'লো আর আমি যে মাসি, এত করে বললুম একটু বিশ্রাম করতে সেকথা কানেই ঢুকলো না? এমনি ক'রে দিদির কাছে আমায় অপমান করলি ত? মায়ের বোন মাসি, তার কথার সম্মান কি একটুও রাখতে নেই বাবা? এই বলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বলিলাম, মায়ের বোন মাসি কিন্তু আগে মা তারপর মাসি! মা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তুই আমার ছেলেকে ঠকাবি ভেবেছিস্—ও কি আমার বোকা হাঁদা ছেলে? দিনরাত কত বই পড়ে, এবার কলেজে ভর্তি হয়েছে—আসছে বারে ফার্স্ট হবে বলেছে। এই বলিয়া তিনি সগর্বে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন।

বেশ, বাবা, এই তো চাই! মায়ের মুখ ছেলেই ত উজ্জ্বল করবে; তার চেয়ে সুখ আর জগতে কি আছে! দিদির মুখে আমি তোমার কথা সব শুনেছি—আর যেটুকু বাকী ছিল তাও এই চোখে দেখলাম।

তারপর কবে আমাদের আই এস-সি পরীক্ষা শুরু হইবে, কবে কলেজের টেস্ট হইবে, সব জিজ্ঞাসা করিলেন।

মা বলিলেন, আমি মুখ্যু মানুষ তোদের এসব কথা কিছুই বুঝি না। তারপর আমাকে বলিলেন তোর মাসিমাকে সব বল না আলোক ওসব জানে—তোর মেসোমশায় ওকে বিয়ের পর মাস্টার রেখে অনেক ইংরিজী লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তারপর তোর মাসির সঙ্গে ততক্ষণ গল্প কর, আমি তোদের জলখাবারটা নিয়ে আসি—এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

অধুনা

সুধীরকুমার গুপ্ত

উঁচু আসনের এখনো টনক নড়েনি,
ঘোলাটে দুনিয়া রঙীন মলাটে ঢাকা,
বোমারু বিমান মিছেই আকাশে ওড়েনি
মেসিনগানেরও আওয়াজটা নয় ফাঁকা।

সাধা মিতালীর মুখোস পড়েছে খুলে,
হাসির পিছনে শানানো ছিল যে ছুরি—
আজ মুখোমুখি শিকায় রেখেছে তুলে
দরদী হিয়ার মহড়াটা পুরোপুরি।

একাকী স্বপ্ন মাঝপথে যায় ছিঁড়ে
ভেঙে পড়ে যত সাজানো কথার স্তূপ,
আগুন লেগেছে অনেক সাধের নীড়ে
দখিনা বাতাস আর নয় অপরূপ।

সাময়িক দিন হাতিয়ার নেয় কুড়িয়ে
আশাতে মেলেনি গলিত স্মৃতির খাদ
উধাও প্রেমের উত্তাপ গেছে জুড়িয়ে
হৃদয় পেয়েছে অনেক আলোর স্বাদ।

আগামীর কথা পুরানো হিসাবে মেলে না
তাই কল্পনাও অভাবটা নয় অল্প
কামান তো নয় ছেলে-ভুলানোর খেলেনা
ইতিহাস নয় জমাট আষাঢ়ে গল্প।

জ্ঞান-বিজ্ঞান

সুধীর বসু

ছবির সাহায্যে বিজ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা

আধুনিক যুগে চলচ্চিত্র লোক-শিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন বলে বিবেচিত হয়। ছবির ভিতর দিয়ে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও এর সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে জনসমাজে প্রচার করার প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে তেমন একটা হয়নি। সম্প্রতি কয়েক মাস হয় 'এসোসিয়েশান অব সায়েণ্টিফিক ওয়ার্কার্স' বা বিজ্ঞান কর্মী সম্মেলনের উদ্যোগে এ বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত লণ্ডনে একটি সভা আহূত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিনিধি ব্যতীত বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির প্রতিনিধিগণও উক্ত সভায় যোগদান করেন। জনসমাজে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাবধারা ফিল্মের ভিতর দিয়ে প্রচারের সুব্যবস্থার নিমিত্ত সভায় একটি 'সায়েণ্টিফিক ফিল্ম ফেডারেশন' গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়। বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির সহায়তায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ভাল ভাল ছবি তোলবার ও তা প্রচারের ব্যবস্থার ভার এই ফেডারেশনের উপর প্রদত্ত হয়। 'ব্রিটিশ কাউন্সিল' হতে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ 'মাইকেল ফ্যারাডের' জীবনী অবলম্বন করে এক বৈজ্ঞানিক চিত্র তোলবার ব্যবস্থা হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এ ধরণের ছবি সম্ভবত ইংলণ্ডে এই প্রথম তোলা হবে। শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রের মনীষীদের জীবনী অবলম্বন করে চিত্র ও নাটক রচনার একটা রেওয়াজ এদেশেও এসেছে। আমরা আশা করি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের জীবনী এবং আধুনিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে বিজ্ঞান যে দান করেছে সে সব বিষয় অবলম্বন করে ছবি তোলবার দিকে এদেশের চিত্রশিল্পীগণও মনোযোগী হবেন।

কৃত্রিম সারের অভাব

সামগ্রিক যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফলে পৃথিবীব্যাপী যে নিদারুণ খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে, হটস্প্রিংস্-এর খাদ্য সম্মেলনের আলোচনায় তা বিশেষভাবেই উদ্ঘাটিত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর সংগঠনে এ বিষয়ে যাহা হয় করা যাবে এ সিদ্ধান্ত করা ছাড়া বর্তমান সংকট সমাধানের কোন ভরসাই সম্মেলনের কর্মকর্তাগণ দিতে পারেননি। 'অধিক শস্য ফলাবার' একটা আন্দোলন হয়তো সব দেশেই প্রচণ্ডভাবে আরম্ভ হবে। কিন্তু যুদ্ধের ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে শস্য ফলনের কাজ কতটা সাফল্য লাভ করবে তা বলা কঠিন। আধুনিক যুগের কৃষি বহু ক্ষেত্রেই কৃত্রিম সার দিয়ে জমির উৎপাদিকা শক্তি-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। জাপান, নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশ প্রচুর পরিমাণে এই কৃত্রিম সার ব্যবহার করেই কৃষির উন্নতি করেছে। জার্মান, স্পেন, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও ইতালীও কৃত্রিম সার কম ব্যবহার করে না। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত কি পরিমাণ 'নাইট্রোজেন' প্রয়োজন হয়, ১৯৩৬-৩৭ সালের একটা হিসাব হতে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। ঐ বৎসর সর্বশুদ্ধ ২৭ লক্ষ টনের মধ্যে একমাত্র ইউরোপেই ১৫ লক্ষ টন নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়েছিল—এসিয়ায়ও ৫ লক্ষ টন এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মিলে ৫ লক্ষ টন নাইট্রোজেন জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

ফসফরাস, নাইট্রোজেন এবং পোটেসিয়াম এই তিনটি মৌলিক পদার্থই সব চেয়ে জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। সাধারণত সুপার ফসফেট্, এমোনিয়ম সলফেট্, 'সোডিয়ম নাইট্রেট্' সায়েনামাইড প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ জমিতে দিলে তাহা হইতেই জমি উপরোক্ত মৌলিক পদার্থগুলো গ্রহণ করে থাকে। বায়ুতে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকলেও (পৃথিবীর প্রতি একর জমিতে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন 'ফ্রি নাইট্রোজেন' হতে পারে) জমি তার অল্পই গ্রহণ করতে পারে। বীজাণু ও আলোকের প্রভাবে বায়বীয় নাইট্রোজেনের অতি সামান্য ভাগ মাত্র তার কাজে আসে। চিলির সল্টনিটারই সর্বপ্রথম কৃত্রিম সাররূপে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও আরও কয়েকটি দেশ অবশ্য নিজেদের চাহিদা মত পোটাসিয়ামযুক্ত কৃত্রিম সার প্রস্তুতের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এই অসুবিধা দাঁড়িয়েছে—যে সব যৌগিক পদার্থ হতে এ সমস্ত সার পাওয়া যেতে পারে, যুদ্ধের গোলা-বারুদ প্রস্তুতের কাজে তাদের চাহিদা এখন মিটানো দায় হয়ে উঠেছে। সুতরাং কৃত্রিম রাসায়নিক সার সরবরাহ বিশেষভাবেই সংকুচিত হয়েছে। ফ্রান্সের পটাসের খনিগুলি জার্মানদের দখলে আসায় ওদের একটু সুবিধা হয়েছে বটে, তবে যেখানে যুদ্ধের গোলা-বারুদের প্রয়োজনই সর্বগ্রাসী, সেখানে কৃত্রিম সার সরবরাহের কাজও বহুলাংশে সংকুচিত হতে বাধ্য। এ সব অবস্থা বিবেচনায় মনে হয়, যুদ্ধকালীন অবস্থায় ও তার পরবর্তী কিছুকাল সময় পর্যন্ত অধিক শস্য ফলনের কাজে বেশী অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

খাদ্যসংকটের উদ্ভব হওয়ার আমাদের দেশেও অধিক শস্য ফলাবার এক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। জমির উন্নতি-বিষয়ক কোন কাজে এদেশের সরকার পূর্বে কখনও হাত দেননি, মান্ধাতার আমলের প্রথায় এদেশের চাষীরাই শস্য উৎপাদন করে আসছে। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত এই কৃষকশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার অবসর শাসকদের কমই হয়েছে। আজ যদি সরকার সত্য অধিক শস্য জন্মাবার ব্যবস্থা করতে চান, তবে প্রথমেই তাঁকে এই উপেক্ষিত অজ্ঞাত কৃষকদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। শস্যের ভাল বীজ সরবরাহ করা, জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম সার যোগাড় করে দেওয়া, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কিভাবে শস্যের ফলন বৃদ্ধি করা যেতে পারে তার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও সরকার হতে হওয়া প্রয়োজন। এযাবত যা হয়নি, যুদ্ধের ডামাডোলে সরকার তা করে উঠতে পারবেন কি?

'মাতগুড় হতে পেট্রোল'

মাতগুড় সম্পর্কে এদেশে ডাঃ নীলরতন ধর মহাশয় বহু গবেষণা করেছেন এবং উহা যে সাররূপে ব্যবহার করে জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করা যেতে পারে, তৎসম্পর্কে বিবিধ সংবাদপত্রেও যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। মাতগুড় হতে পেট্রোল, এলকোহোল বা সুরাসারও প্রস্তুত হতে পারে। আমেরিকার 'কার্নেগি ইনস্টিটিউট্ অব টেকনোলোজী'তে সম্প্রতি মাতগুড়ের জলে দ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট্ অংশকে তৈলাক্ত "হাইড্রোকার্বনে" পরিবর্তিত করে পেট্রোল তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। আধুনিক যুদ্ধে পেট্রোলের চাহিদা খুব বেশী। সুতরাং যতরকমে উহার সরবরাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে তারই প্রচেষ্টা বিভিন্ন দেশে হয়ে আসছে। প্রচুর পরিমাণে মাতগুড় এদেশেও চিনির কলগুলো হতে পাওয়া যায়—উহা জমির সাররূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা হওয়া

(শেষাংশ ৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইটালীতে ব্রিটেনের প্রথম আক্রমণ

বসু বন্ধু শর্মা

বর্তমানে যুদ্ধের গতি ভালভাবেই মিত্রপক্ষের অনুকূলে ফিরেছে। টিউনিসিয়ায় অক্ষশক্তির সৈন্যদলের উপস্থিতি মিত্রপক্ষের ইউরোপীয় অভিযানের পথে প্রবল বাধা ছিল। বর্তমানে সে বাধা অপসারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, টিউনিসিয়ার বিজয়ের ফলে ভূমধ্যসাগরে মিত্রপক্ষের নৌশক্তির অবাধ আধিপত্য পুনরায় স্থাপিত হয়েছে। ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের সমর-সামর্থও অনেক বেড়ে গেছে—তাঁদের বিমান-বল বর্তমানে শত্রুর চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। ইতিমধ্যে মিত্রশক্তি ভূমধ্য সাগরে ইটালীর অধীনস্থ প্যান্টেলারিয়া এবং ল্যাম্পেডুসা নামক দুটি দ্বীপও দখল করেছেন। এইবার তাঁরা খাস ইউরোপে অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে একটা বড় রকমের আক্রমণে হাত দিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে সে আক্রমণে অনেকটা সাফল্যও লাভ করেছেন। ইটালীর অতি সন্নিকটবর্তী দ্বীপ সিসিলিতে মিত্রশক্তির বিপুল সৈন্যবাহিনী অবতরণ করেছে এবং সিসিলির প্রায় অধিকাংশ ভূভাগই মিত্রশক্তির করতলগত হয়েছে। যে মেসিনা প্রণালী সিসিলিকে খাস ইটালী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তার বিস্তার মাত্র মাইল দুয়েক। সিসিলি সম্পূর্ণরূপে মিত্রশক্তির করতলগত হলে, তাঁদের পক্ষে ইটালী অভিযান যে অধিকতর সহজ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সিসিলির যুদ্ধ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হবার আগেই ইটালীর রাষ্ট্রনৈতিক রঙ্গ মঞ্চে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। ফ্যাসিজমের প্রবর্তক ইটালীর সর্বশক্তিমান অধিনায়ক সিনর মুসোলিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর পদত্যাগে শুধু যে ইটালীর রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেই একটা পরিবর্তন এসেছে, তাই নয়—অক্ষশক্তিও এই পদত্যাগের ফলে একটা বড় রকমের আঘাত খেয়েছেন। মার্শাল বদোগ্লিওর নেতৃত্বে যে নূতন ইটালীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার আসল রূপ দেখবার সুযোগ আমাদের এখনও হয় নি। যুদ্ধ আগের মতই চলছে। মার্শাল বদোগ্লিওর অভ্যুদয়ে অনেকেই আশা করছেন যে শীঘ্রই হয়ত মিত্রশক্তির সঙ্গে নূতন ইটালীর গভর্নমেণ্টের আলাদা সন্ধি হ'তে পারে। এ পর্যন্ত সেরূপ আশা পোষণের কোন কারণ অবশ্য দেখা যায় নি। দরিদ্র ইটালী বর্তমানে যেরূপভাবে জার্মানীর উপর নির্ভরশীল এবং ইটালীতে বর্তমানে যত জার্মান সৈন্য আছে—তাতে ইটালীর পক্ষে অক্ষশক্তির বিরোধিতা করে—ভিন্ন সন্ধি করা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। মিত্রশক্তিকে হয়ত শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেই ইটালী জয় করতে হবে। এইসব দেখে শুনে মনে হয় যে, মিত্রপক্ষের ইউরোপীয় অভিযানে ইটালীই হবে প্রথম লক্ষ্য স্থল ; হয়ত মিত্রশক্তি একযোগে ইউরোপের বহু স্থানে আক্রমণ চালাতে পারেন—তবে ইটালীও সে অভিযান থেকে বাদ পড়বে না—কেন না ইটালী হচ্ছে অক্ষশক্তির দুর্বলতম অংশীদার।

সম্মিলিত মিত্রশক্তির এই ইটালী অভিযান অভিনব হতে পারে ; কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে বৃটেনের পক্ষে ইটালী আক্রমণ এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বেও বৃটেন একবার খাস ইটালীতে অভিযান চালিয়েছিল এবং সাময়িক হলেও সে অভিযানে সাফল্য লাভ করেছিল। এই বিজয়ের ছোট্ট ঐতিহাসিক কাহিনীটি হয়ত আজ অনেকে ভুলে গেছেন। কিন্তু বর্তমানে যখন বৃটেন ও আমেরিকা পুনরায় ইটালী আক্রমণ করতে যাচ্ছে তখন এই বিজয় লাভের কাহিনীটি নিয়ে আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৮০৬ খৃস্টাব্দের কথা। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ঁর তখন প্রচণ্ড প্রতাপ। অস্টারলিজের যুদ্ধ বিজয়ের পরে নেপোলিয়ঁর নেতৃত্বে ফরাসী জাতি পররাজ্য লোভী হয়ে উঠেছিল। তারা নেপল্‌সের রাজ্যটিকেও গ্রাস করে নিয়েছিল। কিন্তু সিসিলি তারা দখল করতে পারে নি ; এই দ্বীপটিতে মেজর জেনারেল স্যার জন স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে একদল বৃটিশ সৈন্য ছিল। ১৮০৬ খৃস্টাব্দের মে মাসের শেষে এই সৈন্যদলের সংখ্যা ছিল আট হাজার। এই বছরই গ্রীষ্মকালে ইটালীর ক্যালাব্রিয়া অঞ্চলের লোকেরা ফরাসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং স্টুয়ার্ট ব্রিটিশের মিত্রশক্তি অধিকারচ্যুত বুরবনদের সাহায্যার্থে ব্রিটিশ সৈন্য পাঠাতে মনস্থ করেছিলেন। চমৎকার গোপনীয়তা রক্ষা করে তিনি অতর্কিতে সৈন্যদল নিয়ে ক্যালাব্রিয়াতে অবতরণ করেছিলেন। এ আক্রমণের মূল পরিকল্পনা ছিল তাঁরই এবং পূর্বাহ্নে খুব কম লোকেই এ আক্রমণের কথা জানত। ইংলণ্ডে একজন লোকও এ সম্বন্ধে কিছু জানত না। অভিযানকারী সৈন্যদলে ৫৫০০ ব্রিটিশ সৈন্য ছিল—আর ছিল দুটি কর্সিকান এবং একটি সিসিলিয় সৈন্যদল। জুনের শেষ ভাগে এই সৈন্যদল রক্ষী জাহাজের পাহারায় মেসিনা থেকে স্যাণ্টা ইউফেমিয়া উপসাগরের দিকে রওনা দিয়েছিল। স্যার জন স্টুয়ার্টের সৈন্যদল নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত ছিল ; লেফটেনাণ্ট কর্ণেল কেম্পটের অধীনে অগ্রগামী সৈন্যদল ; জেনারেল কোলের অধীনে প্রথম ব্রিগেড ; জেনারেল অ্যাকল্যাণ্ডের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ব্রিগেড এবং জেনারেল অসওয়াল্ডের নেতৃত্বে তৃতীয় ব্রিগেড।

জেনারেল রেমিয়ারের নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৬৪৪০। এই সব সৈন্য রেগিয়ো উপত্যকায় বহু দূরবর্তী সেনানিবেশে ছড়িয়েছিল।

৩০শে জুন সন্ধ্যাবেলা অভিযানকারী সৈন্যদল স্যাণ্টা ইউফেমিয়া উপসাগরে নোঙ্গর ফেলেছিল। ভোরে কেম্পটের নেতৃত্বে অগ্রগামী হালকা সৈন্যদল বিনা বাধায় অবতীর্ণ হয়ে সমুদ্রোপকূলবর্তী বনাঞ্চল দখল করেছিল। অতি সাবধানে সৈন্যদলকে যখন গাছ এবং ঝোপের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন একটি ফরাসী ঘাঁটি থেকে তিনটি গোলা সৈন্যদলের বন্দুকের শব্দ পাওয়া গেছিল। তৎক্ষণাৎ কর্সিকান এবং সিসিলিয় অভিযানকারীরা পিছু হটে দাঁড়িয়েছিল। অবতরণকারীদের নেতৃত্ব ছিল অসওয়াল্ডের উপর ; সন্ধ্যার মধ্যে সমগ্র সৈন্যদলই তীরে নেমে স্যাণ্টা ইউফেমিয়া গ্রাম থেকে সগের পর্যন্ত নিজেদের আত্মরক্ষামূলক ঘাঁটি বেঁধিয়ে পড়েছিলেন।

মেসিনা থেকে স্টুয়ার্টের প্রস্থানের খবর পেয়ে ফরাসী সেনাপতি রেমিয়র ২রা জুলাই সন্ধ্যাবেলা সসৈন্যে মৈডায় এসে হাজির হয়েছিলেন এবং শহরের কাছাকাছি উঁচু পার্বত্যভূমিতে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। ব্রিটিশ এবং ফরাসী সৈন্যদলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি বনভূমি ছিল; পরদিন এই বনভূমি থেকে পরস্পরের শক্তি নির্ধারণের জন্য ব্রিটিশ এবং ফরাসী সেনাপতিরা বেরিয়ে পড়েছিলেন।

৪ঠা জুলাই ভোরে ব্রিটিশরা তাদের ঘাঁটি ছেড়ে সমুদ্র তীরের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় দুই শ্রেণীতে অগ্রসর হয়েছিল।

পথে ইপোলিটো এবং অ্যামাটো নামে দুটি নদী ছিল। ইপোলিটো পার হয়ে কেম্পট্ তাঁর দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষার জন্য বিংশসংখ্যক সৈন্যদলের সঙ্গে কর্সিকান্ এবং সিসিলীয়দের অ্যামাটোর ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা বনে ঢুকতে না ঢুকতেই ফরাসী গোলাগুলীর সম্মুখীন হয়েছিল এবং প্রায় দুইশ ফরাসী সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু বিংশতিতম সৈন্যদল বিস্ময়কর দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করার ফলে এ আক্রমণে কোনই ক্ষতি হয়নি। যুদ্ধের সমগ্র ফলাফল নির্ভর করছিল কেম্পট্-এর সঙ্গে শত্রুদের প্রথম সংঘর্ষের উপরে। এ যুদ্ধে কেম্পট্ যে দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সেরূপ দৃঢ়তা কমই দেখা যায়। শত্রুরা তাদের ঘিরে ধরুক এই আশায় কেম্পট্ তাঁর অগ্রগামী সৈন্যদলকে থামিয়ে রেখেছিলেন। তারপর তারা সুচিন্তিত সংকল্পের সঙ্গে অগ্রসরমান শত্রুর উদ্দেশ্যে যথাক্রমে ১৫০,৮০ ও ২০ গজ দূর থেকে তিনবার অগ্নিময় গোলাগুলী নিক্ষেপ করেছিল। ফরাসী স্বিচত্বারিংশতম সেনাবাহিনীকেও অ্যাকল্যাণ্ডের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী এমনই অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। ফরাসী সৈন্যদল অতর্কিত সেই আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ধীরে ধীরে পিছু হটেছিল বটে, কিন্তু ক্ষণপরেই পুনরায় দলবদ্ধ হয়ে নতুন অবস্থান দখল করে দাঁড়িয়েছিল।

যুদ্ধ তখন কোলের ব্রিগেডের দিকেও ছড়িয়ে পড়েছিল; এই সেনাপতি দলবহির্ভূত হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁর বারুদ প্রভৃতি ফুরিয়ে আসছিল এবং যুদ্ধের অবস্থাও কোনদিক থেকে আশাজনক ছিল না। এই বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে যে বিংশতিতম পদাতিক সৈন্যদলকে স্কিলায় (Scilla) পাঠান হয়েছিল, তারা ফিরে এসে অ্যামাটো নদীর মোহনায় অবতরণ করতে শুরু করেছিল। এই সৈন্যদলের নিভীক সেনাপতি প্রবল বন্দুকের শব্দ শুনে অবতরণ কার্য শেষ করার জন্য অপেক্ষা না করেই কিছু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে জলাভূমি পেরিয়ে কোলের বাম পার্শ্বে এসে মাত্র ৫০ গজ দূরে থেকে শত্রুর উপর গুলী ছোঁড়া শুরু করেছিলেন। এর ফল হ'ল চূড়ান্ত। অতর্কিতে নতুন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রেমিয়ার তৎক্ষণাৎ পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন। তিনি ব্রিটিশদের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য পশ্চাদরক্ষী বাহিনী নির্দিষ্ট করে বেশীর ভাগ সৈন্য নিয়ে পিছু হটলেন। এই যুদ্ধে দুই হাজারের অধিক ফরাসী সৈন্য হতাহত হয়েছিল; ব্রিটিশদের মাত্র তিনশ সাতাশ জন সৈন্য হতাহত হয়েছিল। মাত্র একজন ব্রিটিশ অফিসার নিহত হয়েছিলেন—এটাও খুব উল্লেখযোগ্য বিষয়।

জেনারেল স্টুয়ার্ট সারাদিন অস্থির পদবিক্ষেপে ব্যক্তিগত বিপদ উপেক্ষা করে সারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের ফলাফল দেখে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন—কিন্তু তিনি প্রকৃত যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কিছুই করেননি বলা চলে। সেদিনের যুদ্ধে প্রকৃত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন কেম্পট্; ইনি পরে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তারও পরে ক্যানাডার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই বিজয়ের কথা দাবাগ্নির মত ক্যালাব্রিয়ার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দলে দলে সশস্ত্র কৃষকরা এসে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছিল। শীঘ্রই এ বিপ্লব ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল; শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে এবং মেষপালকরা ভেড়ার দল ছেড়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য ফরাসীদের বিরুদ্ধে তৈরী হচ্ছিল। অল্প সময়ের জন্য হলেও ক্যালাব্রিয়ার উপর ফরাসী অধিকারের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে পড়েছিল।

গ্রেন্‌ভিল মন্ত্রিসভার সময়ে এই মৈডার বিজয়লাভই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইটালীতে অতর্কিত এই আক্রমণের কথা ইংলণ্ডে কেউ জানত না। এই সময় ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যে বিদ্বেষও চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছিল; পূর্ববর্তী বৎসরে নেপোলিয়ঁ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য তোড়জোড় করেছিলেন। ফলে মৈডার এই বিজয়লাভের ফলে ইংলণ্ডে সবাই খুব খুশী হয়েছিল এবং লণ্ডনে এই উপলক্ষে অনেক আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হয়েছিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাইএর এই ইটালী আক্রমণ ইংরেজদের কাছে মৈডা, ফরাসীদের কাছে সাঁৎ ইউফেমি এবং ইটালীয়দের কাছে সান্টা ইউফেমিয়া নামে পরিচিত। এই বিজয়ের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপই লণ্ডনের মৈডা হিল এবং মৈডা ভেল্-এর নামকরণ করা হয়েছিল।

জ্ঞান বিজ্ঞান

(৩৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজন। উহাকে রূপান্তরিত করে পেট্রোল সরবরাহের অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

ধূমপানের বদলে ইনজেকসন

ট্রামে বাসে ও জনসাধারণের যানবাহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করার জন্য বর্তমানে এক আন্দোলন শুরু হয়েছে। যানবাহনগুলোতে যে আন্দাজ ভিড় হয়, যাত্রীসাধারণের স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া মন্দ নহে। তবে ধূমপায়ীদের যে ইহাতে সাময়িক অসুবিধা ভোগ করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এবিষয়ে যে গবেষণা করেছে তাতে ধূমপায়ীদের দেশলাই ধরিয়ে বিড়ি, সিগারেট বা পাইপ জ্বালানোর হাঙ্গামা হয়তো আর পোহাতে হবে না, ধূমের তীব্র গন্ধে ধূমপানে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদেরও অস্বস্তির অবসান হবে।

সম্প্রতি ডাঃ লেনক্স জনস্টোন নামে একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, 'নিকোটিন' ইনজেকশন নিলে তাতে ধূম্রপানের যে ফল ঠিক সেরূপ ফলই পাওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি 'ল্যানসেট' পত্রিকায় ডাঃ জনস্টোনের এই গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে জানা যায় ধূম্রপানে অনভ্যস্ত ব্যক্তিও এই ইনজেকশনে কিরূপ একটা আমেজ বোধ করেন, ধূমপায়ীদের তো কথাই নাই। উপযুক্ত পরিমাণে 'নিকোটিন' ইনজেকশন নিলে তারা ধূমপানের ন্যায়ই আনন্দ উপভোগ করেন এবং ইনজেকশনের পর কিছু সময়ের জন্য তাদেরও আর ধূমপানের ইচ্ছা জাগে না। যদিও সাধারণ তামাকে 'নিকোটিনের ভাগ শতকরা ·৫ হইতে ৫ ভাগ মাত্র, তবু পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, একবার সিগারেট টানলে যে অনুভূতি আসে, ১/৫০০ হইতে ১/৭৫০ গ্রেণ পরিমিত নিকোটিন ইনজেকশনেও তদনুরূপ অনুভূতি জাগিয়া থাকে। ১/৫০ গ্রেণ পরিমিত নিকোটিন ইনজেকশনে পুরা একটি সিগারেট টানার ফল অনুভব করা যায়। ডাঃ জনস্টোনের মতে ধূমপানের ফলে যে উত্তেজনার উদ্রেক হয়, তাতে আমাদের মস্তিষ্কের অনুভূতি স্নায়ুগুলি (Sensory cells) বিশেষভাবে সংক্ষুব্ধ হয়। ধূমপানের পরে যে অবসাদ আসে তাহাই আবার পরে ধূমপানের ইচ্ছা জাগাইয়া তোলে। যতই অধিক ধূমপান করা হবে, অবসাদও তত বেশী হয়ে থাকে। ধূমপানের ইচ্ছাও তত তীব্র হয়; এইভাবে ধূমপানের নেশা এমন বেশী হতে থাকে যে তাকে ছাড়ানো দায় হয়ে উঠে।

শিশিরান্ত

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

গোরসুন্দর মরছে।

পল্লীটা অত্যন্ত খারাপ। এখানে মরলে, সে নিশ্চয়ই নরকে যাবে।

মৃত্যু তার সর্বাঙ্গে হাত বালাচ্ছে। সে তা পছন্দ করছে কি না বোঝা যাচ্ছে না—কিন্তু প্রতিবাদ করছে না এবং আস্তে আস্তে খুব বেশী রকম ঝিমিয়ে পড়ছে।

সারা রাত্রি বৃষ্টি হয়েছে। সকাল থেকেই মিঠে রোদ্দুরের ভেতর দিয়ে কে যেন হিসেব করছে গত রাত্রের উচ্ছৃংখলতার পরিমাণ।

বাইরের দিকে সাইনবোর্ড টাঙানো "শ্রীগৌর গীতি নাট্য সঙ্ঘ"।

পুরানো খোলার বাড়ি। পঞ্চাশ হাত দূরে দিয়ে অতি আধুনিক ট্রামগাড়ি চলছে, তারই একটা ঘরে গৌরসুন্দর এমন সুন্দর, এমন লোভনীয় সকালেও অবধার্য অন্তিম-সময়কে আটকে রাখতে পারছে না।

এই পঞ্চান্ন বছর বয়স পর্যন্ত কেউ তাকে দাঁড়ি না কামিয়ে রাস্তায় বেরোতে দেখেনি। সেই গৌরসুন্দরের দুধের মত সাদা গালে একরাশ দাড়ি জমে রয়েছে।

"খোকা, ও খোকা বিষ্টু?" গৌর-সুন্দরের জড়ানো গলার আওয়াজ ভেতরের উঠোনে গিয়ে পৌছুলো। বগলা বাড়িউলি, সকালে চান কোরে বাঁ হাতে আফিংয়ের কৌটা আর ডান হাতে তার থেকে সদ্য বের করে নেওয়া একটা বড়ি হাতে করে ডাকাডাকি করছিলো।

'ও মতি, মতি, এক পয়সার চা এনে দেনা মা।

তার পরে কলঘর থেকে সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলো। এমন সময় পৌছুলো গৌরসুন্দরের ডাক।

ঐ গো, ঠাকুরমশাই আবার ডাকছে! আর পারা যায় না বাপু। বামুনের ছেলে ছোঁয়া-নেপাও করা যায় না। আমার হয়েছে এক মহা হেনস্থা তা এমন দিনে ওরা খোকাকে টহল দিতে নিয়ে গেল কোন আক্কেলে!

বকুনি শুনে একটা মেয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই, বগলা বাড়িউলি বললে, "দেখতো মা চাঁপা, ঠাকুরমশাই কী চায়? না থাক, আমিই যাচ্ছি।"

বাড়িউলি তার বিপুল দেহ নিয়ে আস্তে আস্তে উঠলো। পঞ্চাশটা গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, সুখে-দুঃখে কাটিয়ে দিয়েছে; মৃত্যুর সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা আছে, কিন্তু অনাবশ্যক ভীতি নেই।

দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাড়িউলি জিজ্ঞেস করলো। ঠাকুরমশাই, কী চান? কথাটা দুচারবার আরও বলতে কোন উত্তর না পেয়ে বাড়িউলি বললে, হায় আমার কপাল উত্তর দেবে কে? এতো যে ডাকলুম—চোখের পলক যেমন ছিলো তেমনিই রইলো। তুই একবার ডেকে দেখনা মা চাঁপা, যদি কোন সাড়া পাস?

চাঁপা চেঁচিয়ে ডাকলো, 'ও মেশো, মেশো? একবার চাও দিকি! আমায় চিনতে পারছো না! আমি চাঁপা!'

গৌরসুন্দর একটু চোখচেয়ে, অত্যন্ত আস্তে বললে, 'জল'।

বগলা বাড়িউলি হাহাকার করে উঠলো—. পোড়ারমুখো যাত্রার দলের ছোঁড়াগুলোর আক্কেলখানা একবার দেখ; হাজার হোক বামুনের ছেলে—ওকে তো আর আমার হাতের জল দিয়ে পাপের ভাগী হ'তে পারি না? কি করি বলতো? সেই যে ছেলেটা নিয়ে রাত পোয়াতে বেরিয়েছে, আর ফেরবার নামটি নেই! পয়সা রোজগার করে বুড়োর ছান্দয় লাগবে?

বকুনির মাঝখান থেকে চাঁপা বলতে শুরু করেছিলো, 'মাসি, আমি দেবো জল?'

কথাটা বগলার যখন হৃদয়ঙ্গম হোলো, তখন বকুনি থামলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ ভঙ্গী করে গালে হাত দিয়ে বলে উঠলো, 'তুই বলিস কিরে চাঁপা? কথার আর রাখ-ঢাক নেই! কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিস, জানিস? তোর মত বামুনের মেয়ে অমন হাজার গণ্ডা এ পাড়ায় আছে। জল দোবো বল্লেই দেয়া যায়? কথায় বলে, বামুন না কেউটে সাপ!'

"তা তো বলছি না মাসি, বলছিলাম মানুষটা মরে........"

ইতিমধ্যে খোল করতাল ঘাড়ে করে একটি ৩০।৩৫ বছরের লোক একটা ১২।১৩ বছরের সুন্দর ফুটফুটে ছেলেকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকলো। বগলা তাদের দেখেই শুরু কোরলো 'হ্যাগা ফটিক, তোমার কি আক্কেল বল দেখিগা? মানুষটা এখন যায় তখন যায় অবস্থা, আর তুমি স্বচ্ছন্দে খোকাকে নিয়ে দোর সাধতে গেলে? এই যে জল জল করছে, কে তার মুখে এক ফোঁটা জল দেয় বল দেখি?

চাঁপার নির্দেশমত খোকা দৌড়ে গিয়ে তার বাবার কাছে বসেছে একগ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে। গৌরসুন্দরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খোকা ডাকছে, "বাবা জল চাইছিলে? এই তো জল--খাও?"

তার ক্লান্ত মৃদুস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে ফটিকের গলায়। ফটিক ধীরে সুস্থে খোল-করতাল দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখে বলতে লাগলো,"আজ দুদিন খোকাকে স[ঙ্গে] নিয়ে বেরিয়েছি, অমনি লোকে বলতে শুরু করেছে, তাকে কোথায় রেখে এলে সঙ্গে আনোনি কেন? আর আমাদে[র] তো বলে, তোমরা জোয়ান মদ্দ মানুষ খেটে খেতে পারো না? যত বোঝাই, [যে] তার জন্যেই ভিক্ষেয় আসা—তার বাপে[র] বড় অসুখ। তা কে কার কথা শোনে খরচপত্র তো চালাতে হবে? ঠাকুর মশাইয়ের অসুখ, দল উঠে গেল, অথ[চ] অসুখের খরচ আছে। এখন ইনি ভালো হয়ে উঠলেই তো হয়।"

বগলা বাড়িউলি বললে, "আর ভালো ... আছে নারায়ণের মনে তাই হবে।" এই ব[লে] আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে চাতালের এ[ক] পাশে চুল রোদে ছড়িয়ে দিয়ে বসলো বাড়ির অন্যান্য সকলে জেগে উঠেছে বাড়িউলির চা এসে পৌছুল। চায়ে গেলাসে একটু চুমুক দিয়ে আফিংয়ে বড়িটা মুখে ফেলতেই তার চোখ পড়ল একজনের ওপোর "বলি হ্যাঁলা গঙ্গা কাল রাতে অতো চেঁচাচ্ছিলি কেন? ... গোলমাল কি তোর ঘরেই হয় বাছ[া] বাড়িতে একটা মানুষের অসুখ মর[ণ] বাচন নিয়ে কথা, আর তোদের ফুর্তি ... না!'

গঙ্গা কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে দি[তে] কলঘরের দিকে চলে গেল। অন্য[া] মেয়েরা এখানে ওখানে বসে আ[...] হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে খোকা ফুঁপি[য়ে] কেঁদে উঠলো। বগলা বাড়িউলি ব্যা[কুল] হয়ে বলে উঠলো, 'ঐ দেখ, খো[কা] আবার কাঁদলো কেন! ওম চাঁপা, যা[তো] খোকাকে এখানে নিয়ে আয়। ফটি[ক] ওখানে বসে থাকুক। আহা কোন সকা[লে] উঠে বেরিয়েছে। দুধের ছেলেটাকে সা[রা] মুল্লুক ঘুরিয়ে নিয়ে এলো ওদের [কি] দয়াধর্ম নেই!' ততক্ষণ চাঁপার স[ঙ্গে] কাঁদতে কাঁদতে খোকা এসে পৌছো[লো] বগলা বাড়িউলি সস্নেহে তার মাথা কোলের ওপোর টেনে নিয়ে বলা[লো] 'কাঁদছো কেন বাবা! কান্না কিসে[র] বাবা ভাল হয়ে যাবে। রাতদিন এমন ক[রে] কাঁদলে যে অসুখ করবে?' তার[পর] খোকার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে...

"আহা, বুড়োর কত সাধ! এই সেদিন খোকাকে কালিঘাটে নিয়ে গিয়ে পৈতে দিয়ে নিয়ে এলো। এখনো ভালো করে মাথায় চুল ওঠেনি। ওমা চাঁপা, যা না? আমার ঘরের তাকের ওপোর একটা 'আনি' আছে। চট্‌করে নবীনের দোকান থেকে চার পয়সার খাবার নিয়ে আয়। আহা-হা, মুখটি একেবারে রাঙা হয়ে গেছে গো!

খোকার সত্যিই খিদে পেয়েছিলো। চাঁপার দেওয়া খাবার খাওয়া শেষ হলে বাড়িউলি বললে, 'তোরা কেউ এই বারান্দায় একটা মাদুর বালিস এনে দে। সারা রাত্তির ঘুমোয়নি, আবার কোন্ ভোরে উঠে বেরিয়েছে। হ্যাঁ দে, এইখানটায়। শোও খোকা, শুয়ে পড়?

গৌরসুন্দরের আড়ষ্ট স্থির চোখ ঘরের চারদিকে ঘুরছে। এক কোণে বসে ফটিক ছুরি দিয়ে কুচিয়ে কুচিয়ে কি যেন কাটছিলো। হঠাৎ গৌরসুন্দরের চোখ তার দিকে পড়তে, সে একটু জোর গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'ওস্তাদজি, কিছু বলবেন আমায়? চিনতে পারছেন আমাকে? আমি ফটিক!

বিস্ফারিত স্থির চোখ তখন অন্য দিকে সরে গেছে। ফটিক একটু ক্ষুন্ন হয়ে আবার নিজের কাজে মন দিলে।

গৌরসুন্দরের চোখ থেকে মাঝে মাঝে এক এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। ফটিক দেখে বললে, 'ওস্তাদজির বড্ড মায়া। আবার কাকে নেবেন, কে জানে!'

ওদিকে তখন বগলা বাড়িউলির চারপাশে এবাড়ি ওবাড়ির দুচারটে বিভিন্ন বয়সের মেয়ে ঘিরে বসেছে। বাড়িউলি ঝিমুতে ঝিমুতে গল্প করছে। গল্প বলতে বলতে তার মুখ ছাড়া অন্য কোনো অবয়বের ভাব পরিবর্তন হচ্ছে না। আর একখানা হাত তন্দ্রাচ্ছন্ন খোকার পিঠে হাতবোলাতে নিযুক্ত।

"কত রাত হয়েছিলো, তা কি বলতে পারি মা? সে কি আজকের কথা! সামনে ঐ যে পালেদের বড় বাড়ি, ঐখানে ছিলো নিস্তার গয়লানীর গোয়াল। সমস্ত মাঠময় গোবর পড়ে থাকতো। পাশের ঐ যে লম্বা লম্বা বাড়িগুলো?......কি যে বলে ওদের? ব্যারাক! ঐখানটায় আমার এক মাসী থাকতো। বজু অাড্ডির বড় ছেলে তাকে বাড়ি করে দিইছিলো। একদিন সেই ভদ্রলোকের ছেলেকে কে কেটে রেখে গেলো রাতারাতি। মাসী ঘুম থেকে উঠে দেখে ঘর একেবারে রক্তারাঙা। কত লোক এলো—মানুষ পুলিশের হাট-বাজার বসে গেলো। অনেক হ্যাঙ্গাম হুজ্জুত করে শেষে মাসীকে ধরে হাজতে নিয়ে গেলো। কী বল্লি চাঁপা? আপন মাসী? হ্যাঁরে হ্যাঁ, মায়ের—একমায়ের পেটের বোন। ঠেলছিস কেন গঙ্গা! বলছি, বলছি। টিপির টিপির বিষ্টি পড়ছে, আমি দরজায় বসে আছি, এমন সময় সেই হাড় জ্বালানে এলো। কে সে? ওমা তা জানিস্ না! কেতো মিত্তির। কোম্পানীর ঘরে চাকরী করতো, আর যত বড়মানসের ছেলের সব্বনাশ করতো। এসেই আমায় বলে, 'বগলা, আমার একটা উবগার করবি?' আমি বললাম, 'কোরবোনা কেন? উবগার করবার জন্যই তো বসে আছি! তবে চুরি, জোচ্চুরি, রাহাজানি ছাড়া আর সবই পারবো। তখন মিত্তির আমার কাছে এসে বললে, 'একটা লোককে আজকের রাত্তিরের মত আশ্রয় দিতে হবে।' আমি বললাম, 'আশ্রয় টাশ্রয় বুঝিনা, ওকাজ আমি পারবো না। চেনা নেই শোনা নেই, শেষকালে কি মাসীর মতন ফ্যাসাদে পড়বো? আমায় হাজার টাকা দিলেও পারবো না। তখন কেতো মিত্তির আমার একেবারে হাত জড়িয়ে ধরলো, দোহাই তোর বগলা—তুই অমত করলে অজ সব্বনাশ হয়ে যাবে। মানী ঘরের ছেলে, এ অবস্থায় বাড়ি গেলে আর মুখ দেখাতে পারবে না। একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছে। একবার মানুষটার দিকে চেয়েই দেখ? দেখলে তোর সত্যিই মায়া হবে।' আমি বললাম, অতোশতো মায়া-মমতার ধার ধারি না। তবে দেখতে বলছো মানুষটাকে? চলো দেখিগে।

কি বললি পারুল? কতো বয়েস তখন? এই উনিশ কি কুড়ি। ঐ বয়েসে অত পাকা হলাম কি করে? হতে হয় রে—হতে হয়। আমাদের মায়া দেখাতে নেই। আর যেমন দেখতাম শুনতাম তেমনিই বলতাম। হ্যাঁ যা বলছিলাম। মানুষটাকে তো দেখলাম। ঘোড়ার গাড়ির ভেতরে আধ-শোয়া, চোখ খোলা কি বোজা বুঝতে পারলাম না। হাতের হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে একটু উঁচু করে ধরতেই আমার মুখের দিকে চাইলেন। কী বর্ণই ছিলো তখন ঠাকুরমশায়ের। টানা টানা চোখ, রক্ত-রাঙা ঠোঁট। গায়ের জামা ছিঁড়ে গেছে, বুকের ওপোর একগোছা পৈতে দেখেই আমি চমকে উঠলাম। কেতো মিত্তির দেখি আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসছে, তার দিকে তাকিয়ে আমার গা যেন জ্বলে গেল। বললাম—'হ্যাঁ গা মিত্তির? অনেক লোকের মাথাই তো খেয়েছে—এযে তোমার ছেলের বইসি! তারপর পাঁজাকোলা করে দুজনে মিলে ওকে ঘরে নিয়ে এলুম। খাটের ওপোর শুইয়ে দেয়া হলে মিত্তির আমায় দশটা টাকা দিয়ে বললে, 'আমি চললাম—কাল সকালে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিও। আমি জিজ্ঞেস করলাম। ইটি কোথাকার লোক মিত্তির? মিত্তির হাসতে হাসতে বললে, 'বড়লোকের ঘর-জামাই'। দেখে শুনে অনেকটা বুঝলাম—তারপর মিত্তির চলে গেল। আলো জ্বালিয়ে ঠায় বসে আছি, মানুষটার গায়ে হাত দিয়ে যে ডাকবো, এমন ভরসাও হচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে অনেক রাত হয়ে গেল। শেষে আর কুল-কিনেরা না পেয়ে রাণীকে ডাকলাম। হ্যাঁরে হ্যাঁ? বড় খেঁদীর মা। সবে তখন সে এ বাড়িতে এয়েচে। সে দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। শেষে বলে 'দাঁড়া চোখে জল দিয়ে আসি।' তারপর একে একে সব ঘুম ভেঙে উঠে এলো। গঙ্গা, তোর দিদিমা বুড়িকে মনে আছে? সে বুড়িতো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। বলে' এমন চেহারা মানুষের হয় না। ও নিশ্চয়ই দেবতা। আমার সব পষ্ট মনে আছে। বাইরে তখন খুব বিষ্টি হচ্ছিলো। দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে সবাই কথাবাত্তা বলছি—এমন সময় ঠাকুরমশাই চোখ মেলে চাইলেন। শেষে না উঠে বসেই বললেন, মিত্তিরমশাই কি চলে গেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কটা বেজেছে'? কে যেন বললে মল্লিক-দের পেটা ঘড়িতে একটু আগে তিনটে বাজলো। উনি তাই শুনে বললেন কি ভয়ানক রাত হয়ে গেল! এখন তো আর বাড়ি ফেরা যাবে না, আমি বললাম, একটু পরেই রাত পুইয়ে যাবে। তখনই যাবেন? তখন আবার কেউ কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। উনি বললেন, তোমরা সবাই বোসো। বাকী রাতটুকু তোমাদের সঙ্গে গল্প করেই কাটিয়ে দিই। তারপর আমার কাছে একটু জল চাইলেন। জল নিয়ে তিনি খেলেন না। খালি মুখ হাত ধুয়ে আবার গিয়ে খাটের ওপোর বসলেন। মুখখানা যেন হাসি হাসি। গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে শেষকালে গলা ছেড়ে গান গাইতে আরম্ভ করলেন। কী গান? কেত্তোন গান। কী কেত্তোন? অতোশতো আমার মনে নেই। সেই যে শ্রীরাধিকের দুঃখের গান। সেতো গান নয়, যেন কান্না! কী মিষ্টি গলা। গঙ্গা, তোর দিদিমা বুড়িতো কাঁদতে আরম্ভ করলো! সেদিন—তোকে সত্যি বলছি চাঁপা, আমার জীবনে যেন ঘেন্না হয়ে গেল। ভগবান কেন যে আমাদের জন্ম থেকেই নরকে এনে দিলেন! কী বলছিস? কাঁদছি কেন? শুধু কি আজ কাঁদছি রে, যখুনি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে, তখনি মন থেকে যেন কান্না বেরিয়ে আসে। আজ পনেরো বছর আফিং ধরেছি, এখন আর তত কাঁদি না।

দুপুর হয়ে আসে ক্রমশ। মেয়েরা নিশ্বাস ফেলে যে যার কাজে যাবার যোগাড় দেখতে যাবে, এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে ফটিক চেঁচিয়ে উঠলো। অমন কর-

ছেন কেন? ও ঠাকুরমশাই? দেখুন আমার দিকে? না আর হোলো না। মাসী, ওমাসী, একবার এদিকে এসো গো?

কারো আর কাজে যাওয়া হোলো না। সবাই হুড়োহুড়ি করে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলো। একজন জোরে জোরে পাখা করতে লাগলো, আর একজন জল ঝাপটা দিতে লাগলো চোখে মুখে। সবই বগলা বাঁড়ুজ্যেলির নির্দেশে।

গৌরসুন্দরের শান্ত মসৃণ কপাল কুঁচকে গেছে। চোখ আধ-বোঁজা, গলা দিয়ে কেমন একটা শব্দ হচ্ছে, যা আগে ছিলো না। কিছুক্ষণ জল-বাতাস দেবার পর গৌরসুন্দরের কুঞ্চিত কপাল আবার মসৃণ হয়ে গেল আধ-বোঁজা চোখ খুলে গেল; কেবল গলা দিয়ে যে আওয়াজ হচ্ছিল সেটা আর থামলো না। বগলা বাঁড়ুজ্যেলি বললে, 'একটা টান গেল।'

মেয়েরা দুপুরের জন্যে রান্নাবান্না করবার ভরসা পেলে না। কি জানি যদি সব নষ্ট হয়! বলা তো যায় না!

ঘুমন্ত খোকার পাশে বসতে বসতে বগলা বললে, আর বেশী দেরী নেই, শ্বাস আরম্ভ হয়েছে। তোরা দোকান থেকে খাবারদাবার আনিয়ে খেয়ে নে। খোকার জন্যেও কিছু মিষ্টি নিয়ে আসিস।'

খাবারই যদি আনিয়ে খেতে হয়, তা হলে আর তেমন ব্যস্ত হবার দরকার নেই। সকলে আবার যে যার জায়গায় বসে পড়লো।

চারপাশে খোলার ঘরে ঘেরা টালি বসানো উঠোনের ওপোর দুপুর বেলাকার চোখ ঝলসানো রোদ্দুর এসে পড়েছে। গৌরসুন্দরের গলার আওয়াজটা যেন আরো বাড়ছে।

'কী হবে মা, কে জানে!' আফিংএর নেশায় আচ্ছন্ন বগলা বাঁড়ুজ্যেলি আঁচলের কোণে চোখ মুছলো। যা অবধার্য, যা এসে পড়লো, তার দিকে সকলে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। গৌরসুন্দরের একটানা ঘড়ঘড়ানি আওয়াজের সংগে সংগে বগলা বাঁড়ুজ্যেলি বলে চলেছে—কি বলছিলাম! হ্যাঁ, গান তো থামলো। শেষে গানে গল্পে রাত ভোর করে দিলেন। সকাল বেলা কেতো মিত্তির এসে বললে বাড়ি যেতে। উনি বললেন,—এই দিনে দুপুরে এখান থেকে বেরোই কি করে? মিত্তির চলে গেল। তারপর উনিও সেই যে সন্ধ্যের অন্ধকারে এখান থেকে গেলেন, আর মাসখানেকের মধ্যে দেখা নেই। বাড়ির সকলেই রোজ ভাবতো 'আজ বোধ-হয় তিনি আসবেন। কি বললি? আমি? হ্যাঁ, আমারও মনে হোতো বই কি! তারপর একদিন রাত্তির ন'টা-দশটার সময় সে যে কি ঝড় জল নামলো! আমার জন্মে তেমন ঝড়জল দেখিনি। বোসেদের বাগানের নারকোল গাছগুলো মড় মড় করে ভেংগে পড়লো। আর ঐ যে ট্রাম রাস্তার মোড়ে ঘোড়ার আস্তাবল? ঐখানে একটা বাজ পড়লো। কানে যেন তালা লেগে গেল। শোঁ শোঁ করে ঝড়ের আওয়াজ হচ্ছে, আমি দরজা বন্ধ করে বসে আছি, এমন সময় শুনি দরজায় দমাদ্দম শব্দ। আমি ভাবছি—এমন অভদ্রায় আবার কে এলো! যে ডাকছিলো সে সাড়া দিতেই চিনতে পারলুম। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি কি, ঠাকুর-মশাই নেশায় একেবারে চুর হয়ে এসেছেন। দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছেন না। হাত ধরে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলাম। শুয়েই বললেন, আজ আর মিত্তির মশাই সংগে নেই বগলা আজ আমি একাই এসেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম—বৌয়ের সংগে ঝগড়া করেছেন বুঝি? উনি বল্লেন, সে পাঠ একেবারে চুকিয়ে দিয়ে এলাম বগলা। এখন যতদিন পারি, তোমার কাছেই থাকবো। পকেটে অনেকগুলো টাকা আছে, তোমার কাছে রেখে দাও। তারপর কিছুদিন এখান থেকে নড়লেন না। কেতো মিত্তির এসে সাধলো। শ্বশুরবাড়ির সরকার গোমস্তা এসে কত বোঝালো তিনি কিছুতেই বাড়ি গেলেন না। তারপর একদিন গংগায় চান করতে গিয়ে আর ফিরলেন না। শুনেলাম গংগার ঘাটে ওঁর বৌয়ের সংগে দেখা হয়েছিলো। সে অনেক করে হাতে পায়ে ধরে বাড়ি নিয়ে গেছে। আমি ভাবলুম—এ ভালোই হোলো। লোকে তো আমাকেই দোষ দেয়। তারপর দশ বারো বছর আর এদিকে আসেননি। মাঝে মাঝে রাস্তায় ঘাটে দেখা হলে বলতেন, 'বগলা, ভালো আছো?'

খোকা জেগে উঠলো। সারা বাড়ি ভরে গৌরসুন্দরের গলায় শব্দে মৃত্যুর অনিবার্য অভিযানের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। খোকা খানিকক্ষণ কান পেতে শুনে বললে, 'বাবার কাছে যাবো।' বগলা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'যাবে বইকি বাবা?' একটু পরে যেও। বাবা এখন ঘুমুচ্ছেন। ও মা বেলা, বেলা খোকাকে একটু তেল মাখিয়ে চান করিয়ে?'

বাঁড়ুজ্যেলি ছাড়া বাড়ির আর কারো কাছে মৃত্যু তেমন সহজ হয়ে ওঠেনি। অমন যে মুখরা গংগা, সেও ফিস ফিস করে কথা বলছে। জীবন অত্যন্ত ভংগুর; আর জীবনান্তে অনুগামী অভিনয় তারা চোখের সামনে দেখে একেবারে চুপ করে গেছে।

এরা একটু অন্যমনস্ক হতে খোকা তার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। চাঁপা তাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে এলো।

খোকা এদের হাতে নিজেকে নিরুপদ্রবে সমর্পণ করে দিয়েছে, ওদিকে খোকার বাবার মরণপথের শোভাযাত্রার কোলাহল একটুও কমেনি।

বগলা বাঁড়ুজ্যেলি কাজ কর্মের মাঝে বলে চলেছে, সুখে স্বচ্ছন্দেই ছিলেন। শ্বশুর-শাশুড়ি মারা গেল, সর্ব্বেশ্বা নিজের হোলো। একদিন রাস্তায় দেখা একটা ছোট মেয়ের হাত ধরে যাচ্ছেন। বললেন, বগলা আমার মেয়ে দেখেছো? আবার অনেক দিন কোন খোঁজ খবর রাখি না—হঠাৎ একদিন একটা বুড়োপানা লোক এসে জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁ বগলা, ঠাকুর মশাই তোমার এখেনে এসেছেন? আমি বললাম 'কই না, তাঁকে তো অনেক দিন দেখিনি? বুড়ো লোকটি দুঃখ করে চলে গেলেন। বললেন, তোমার এখেনে এলে বাড়িতে খবর দিও। বুঝলুম ঠাকুর মশাই আবার কোথায় চলে গেছেন আবার বহুদিন কোনো খোঁজ খবর নেই। হঠাৎ একদিন আমার নামে একখানা চিঠি এলো। আমি ভাবলাম আমায় আবার চিঠি কে দেবে। সাত পাঁচ ভেবে চিঠিখানা নিয়ে গেলাম ক্যাবার ডাক্তারের কাছে। হ্যাঁরে—হ্যাঁ, হেনার বাপ। এই পাড়াতেই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করতো। সে পড়ে বললে, গৌর-সুন্দর মা কে পঞ্চাশটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, আর একখানা ছোট বাড়ি ভাড়া করে রাখতে বলেছে। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। ঠাকুর মশাই কারো কাছে এক পয়সার পান পর্যন্ত খান না, তিনি টাকা চেয়েছেন! দিলাম পাঠিয়ে টাকা।

গৌরসুন্দরের অবিশ্রান্ত শ্বাস টানার শব্দকে এড়াবার জন্যে মেয়েরা বগলার গল্পকে ভালো লাগাবার চেষ্টা করছে। বগলা বলে চললো, ভদ্রলোকের পাড়ায় একখানা বাড়ি ভাড়া করে রাখলাম। তার কদিন পরে খবর পেলাম তিনি এসেছেন। একদিন দেখা করতে গিয়ে দেখি বাড়ির বাইরের ঘর মানুষে পুলিশে একেবারে গিজ্ গিজ্ করছে। আমায় দেখে ঠাকুর মশাই বললেন, বগলা, বাড়ির ভেতর যাও। আমি ভেতরে ঢুকে দোতলার সিঁড়ির পাশে জড়ো সড়ো হয়ে বসে আছি, এমন সময় একটা ১৭।১৮ বছরের মেয়ে দোতলা থেকে নেমে এলো। তাকে দেখে যেন আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। তোকে কি বলবো গংগা, জীবন ভরে কতো মেয়েই তো দেখলাম কিন্তু তেমনটি আর চোখে পড়লো না। শেষে শুনলাম সব। ঠাকুর মশাই কোন পাড়াগাঁয়ের জমি-

দার বাড়িতে গান গাইতে গিয়ে সেখানেই থেকে যান। শেষে জমিদারের মেয়ে ওঁর সংগে ভালোবাসায় পড়ে যায়। ঠাকুর মহাশয়ের তখন বয়েস হয়েছে, মেয়ের বাপ-দাদা বিয়ে দিতে চাইবে কেন? শেষে দুজনে মিলে যুক্তি করে পালিয়ে এসে বিয়ে করে। মেয়ের বাপ খোঁজ করে পুলিশ নিয়ে এসেছিলো; কিন্তু মেয়ে হাকিমের সামনে গিয়ে বলে যে, সে নিজের ইচ্ছেয় এয়েছে। তাকে কেউ জোর করে আনেনি, আর তাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

কথায় কথায় অপরাহ্ন এগিয়ে আসছে। মেয়েরা কেউ কেউ সেইখানেই আঁচল পেতে শুয়ে আছে। হঠাৎ বগলা বাড়িউলি গল্প বলা থামিয়ে কান পেতে কি যেন শুনতে লাগলো। সকলেরই মনোযোগ গেলো সেইদিকে। গৌরসুন্দরের গলার আওয়াজ আর তো শোনা যাচ্ছে না! এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট......, সবাই অপেক্ষা করছে, ফটিক বুঝি এখুনি ডাকাডাকি আরম্ভ করবে। তারও কোনো সাড়া নেই। বগলা বাড়িউলি যে কান্না ভবিষ্যতে ডাক ছেড়ে কাঁদবে, তারই অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে মহলা দিতে দিতে দ্রুতপদে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সংগে গেল আর সবাই। তারা ঘরের দরজায় না পৌঁছতেই, আবার সেই আওয়াজ আরম্ভ হোলো। ফটিক দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছিল—তাকে সাবধান করে দিয়ে আবার সকলে যে যার জায়গায় ফিরে এলো। শ্বাসের শব্দটা যেন আগের চেয়ে কম। বগলা বললে 'নাভি-শ্বাস থেকে কণ্ঠশ্বাসে এলো। পূর্বের জের টেনে বগলা বলে চললো। তারপর হঠাৎ একদিন পাঁচ বছরের খোকাকে নিয়ে এসে হাজির; বললেন, শেষ-বয়েসটা তোমার কাছেই থাকবো বগলা। আমি তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম—যতো জিজ্ঞেস করি নতুন বৌ কোথায় গেল? ততই উনি কথা উড়িয়ে দেন। শেষকালে আমি বললাম, 'আপনি না হয় কাশী গিয়ে থাকুন—খোকাকে তার বড়মার কাছে পাঠিয়ে দিই। বড়বৌয়ের নাম শুনে তো উনি ভয়ানক রাগ করতে লাগলেন। শেষে আমায় দিয়ে মাথায় হাত দিইয়ে দিব্যি করিয়ে নিলেন, আমি যেন ওঁর শ্বশুর বাড়িতে খবর না দিই। এখানে এসে ঐ বাইরের ঘরে বাস করতে লাগলেন। প্রথম প্রথম বাড়ি বাড়ি গান শিখিয়ে বেড়াতেন। তাতো তোরা জানিস? শেষে ঐ যাত্রার দল করেই ওঁর সব্বনাশ হোলো। পুঁজিপাটা খুইয়ে শেষে পড়লেন অসুখে। তাও আমি কতদিন বলেছি যে আমার যা আছে, সব বেচেকিনে কোথাও বিদেশে চলে গিয়ে খোকাকে মানুষ করি। উনি বলতেন 'তাই যেও বগলা—আগে আমি মরি, তারপর তো খোকা তোমারই!'

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো। যে আওয়াজ ছিলো বিভীষিকা, সেটা এখন কান্নাকাটির মত শোনাচ্ছে।

মেয়েদের ভেতর ঔচিত্যবোধ বোধ হয় বেড়ে গেল। সকলেই অপেক্ষা করছে কে আগে আরম্ভ করবে। গঙ্গা বোধ হয় নিরুপায়। পারিপার্শ্বিকের শুচিতাকে অগ্রাহ্য করে, আয়না চিরুণী নিয়ে বসলো। তখন সকলেই চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে উঠলো।

বগলা বাড়িউলির আর কিছু বলবার নেই—তাই তারা যখন সামনের দীর্ঘরাতের পাড়ির জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো, তখন সে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে তার উপাখ্যানের উপসংহারের প্রতীক্ষায় মুখ্য নায়কের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলো। সে বসেছিলো দরজার বাইরে, সংগে সংগে খোকা এসে কাছে দাঁড়াতেই তার মাথাটা কোলের ওপোর টেনে নিলো। গৌরসুন্দরের শ্বাসবায়ু অবশেষে ওষ্ঠের ওপোরে এসে ভর করেছে। কেঁপে কেঁপে ওঠা ঠোঁটের দিকে চোখ রাখতে রাখতে বগলার মনে হোলো গৌরসুন্দরের আধবোজা চোখ তারই দিকে ফেরানো। গালের ওপোর হাত রেখে বগলা সেই দিকেই অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলো। মাঝে মাঝে শুধু প্রতিযোগী দুজোড়া চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বাড়িউলি বসেছে পথের ওপোরে; তাকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে কতো চেনা অচেনা লোক বাড়ির ভেতরে যাওয়া আসা করছে। খোকা কোন সময় ফটিকের ডাক উঠে গিয়ে তার বাবার মুখে একটু একটু গঙ্গাজল দিচ্ছিলো। গৌর-সুন্দরের ঠোঁট কাঁপছে—কিসের নেশায় চোখ আধ-বোজা।

"গান শুনবে বগলা?"

"যান, অমন কাঁদুনে গান আমি শুনতে চাই না।"

"সব গানই কি কাঁদুনে গান? আচ্ছা, আর একবার শোনো?"

মাধব, সো অব সুন্দরীবালা,
অবিরত নয়নে, বারি ঝরু নিঝর
জনু ঘন শাঙন মালা।

ফটিক সময়োচিত কর্তব্য করছে গৌর-সুন্দরের কানে ভগবানের নাম গান করে।

রঙিন শাড়িপরা, ঠোঁটে রঙ পায়ে আলতা দেওয়া উৎসব সহচরীরা সন্ধ্যে থেকে বসে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘর আলোয় ভরে গেলো। কেউ কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

চাঁপা ডাকলে 'মাসী, ও মাসী!' বগলা চমকে উঠে চেয়ে দেখলে ঘর আলোয় আলো। মাংগলিক সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, কে যেন বাইরে অপেক্ষমান রথে গিয়ে উঠে বসলেই বরযাত্রা সম্পূর্ণ হয়।

ফটিক বললে, 'এইমাত্র সব শেষ হয়ে গেল।'

সংসারে ঘরের পঞ্চম অতিথি ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিলো।

বগলা বাড়িউলি তার আফিংয়ের কৌটোটা খুঁজে পেলেই সকলের সংগে গলা মিলিয়ে কাঁদতে পারবে।

লাল আকাশ

শ্রীমিহিরকুমার সেন

পাহারায় থেকে রাতভ'র ওই মেয়েলী চাঁদ
নিল যে বিদায়; যদিও নিথর সেনা-শিবির;
গিরিকন্দর পার হ'য়ে কত সারাটা রাত,
কলঙ্কী চাঁদ মাথার ওপরে ডোবে আমার।
সাগর-উর্মি তুলছে যে শেষ দীর্ঘশ্বাস,
বালুরাশি নিয়ে বায়ু-রেখা হ'ল বিসর্পিল—
বুর্জোয়াদের চাঁদ ডুবে গেল, স্পন্দিত নেই!
সেনানী-শিবিরে এখনো অনেক রাতের ঘুম।

যাহাদের পীত-দেবতারা গেছে রণ-সাগর;
ফেনিল উর্মি বুকে তোলে যার কী তোলপাড়;
সমর-সাগর-সমীরে বহিছে যাদের চুম,
প্রিয়হীন রাত কাটান'র পর, তাহারা শোনো
পুব হাওয়া আনে নবজীবনের কী আশ্বাস—
গণ-মানসের সূর্য উঠিছে, লাল আকাশ।

বৈষ্ণব সাহিত্যের আদর্শ

ভদ্রমহোদয়গণ—

সিঁথি বৈষ্ণব সাম্মিলনীর পক্ষ হইতে আহূত বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মিলনের এই চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে আমি আপনাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণতির সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। আমরা নিঃস্ব এবং সম্পদ ও বিত্তহীন। আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার উপযুক্ত উপহার আমাদের কিছুই নাই; আপনারা নিজগুণে আমাদের সকল ত্রুটি মার্জনা করিয়া লইবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সম্বল সামান্য হইলেও আশা অত্যন্তই উচ্চ। তিন বৎসর পূর্বে বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণকে মূল সভাপতি করিয়া তাঁহারই আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া আমরা এই উদ্যমে অবতীর্ণ হই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ যথাক্রমে পরবর্তী অধিবেশনদ্বয়ে মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, বর্তমান বৎসরে আমরা বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়কে আমাদের মূল সভাপতিস্বরূপে লাভ করিয়াছি। স্যার যদুনাথের কীর্তি বিশ্ববিশ্রুত। অশেষ শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রগাঢ়; অধিকন্তু শাস্ত্রসম্মত ভাবে গৌরাঙ্গের ভক্তগণের নিত্য সঙ্গে তাঁহার পাণ্ডিত্য সর্বাংশে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বঙ্গ সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তাঁহার অবদান অপরিসীম। বঙ্গ সাহিত্যের তিনি একনিষ্ঠ সেবক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে জীবন বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বঙ্গ সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তাঁহার সেই অসমান্য অবদানকে তিনি সমধিক উজ্জ্বল করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির যে আসন জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, প্রভৃতি বঙ্গজননীর এমন বরেণ্য সন্তানের দ্বারা অলংকৃত হইয়াছে, আজ তিনি সেই আসনে অধিষ্ঠিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যিনি সভাপতি তাঁহারই সভাপতিত্বে এবং বঙ্গ সাহিত্য সাধনার পুণ্যপীঠ সাহিত্য পরিষদ ভবনে সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হইতেছে। বর্তমান অধিবেশনে ইহাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভদ্রমহোদয়গণ! সাহিত্যের ক্ষেত্র মনস্বিতার ক্ষেত্র এবং সকল রকম সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া এ সাধনার কমলকোরক প্রস্ফুটিত হইয়া অমল আভা বিস্তার করে। বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনা এই সার্বভৌম সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সে সাধনার ভিতর কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতার লেশ মাত্র নাই। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী এই কয়েক বৎসর তাহার স্বল্প ক্ষমতায় এই কথা বুঝাইতেই চেষ্টা করিয়াছে। সম্মিলনী এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, বৈষ্ণব সাহিত্যের মর্ম মূলে মানব সংস্কৃতির সমুন্নতি সীমা রহিয়াছে এবং সেই সংস্কৃতির ভিতর দিয়া মানবের চিত্ত পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব সাধকদের মর্মমূলে মন্থন করিয়া বঙ্গ বাণীর বীণায় একদিন যে ধ্বনি উত্থিত হয় বিশ্ববাসীকে আপ্যায়িত করিবার পর্যাপ্ত রসে তাহা আপ্লুত ছিল এবং সার্বভৌম সত্যে বিধৃত সে অবদানের অভিনবত্ব আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঘটনাচক্রের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া আমাদের সকলের চোখে এ সত্যটি তেমন সহজে ধরা পড়িতেছে না; কিন্তু সত্যের তাহাতে ব্যত্যয় ঘটে নাই। বঙ্গের অন্তরতলে বৈষ্ণববাণীর সে মঞ্জীর ধ্বনি আজও রিনিঝিনি রবে সমভাবেই বাজিয়া চলিয়াছে এবং বাঙলা সে ধ্বনিকে সংকর্ণ দিয়া গ্রহণ করিবার জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সেই সংবিদময়ী সংস্কৃতিই জাতি হিসাবে বাঙালীকে নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। বাঙলার সাহিত্য সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনার এই দিক হইতে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে; বৃহত্তের অন্তর রসে নিজকে নিষিক্ত করিয়া বহুর চিত্তে রস সঞ্চার করাতেই সাহিত্যিকের সাধনার সার্থকতা আমরা এই কথা শুনিতে পাই। বৈষ্ণব সাহিত্য সেই ব্যাপ্ত রসকে চিত্তে নিত্য করিয়া পাইবার পথই দেখাইয়াছে। সত্যের অপরিচ্ছিন্ন রসামৃত মূর্তি এই সাহিত্যের সংযোগে চিত্তে স্পন্দিত হয় বলিয়াই এ সাহিত্যকে সকল সাহিত্যের প্রজ্ঞান ঘনস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বাঙালীর বড় গর্বের বিষয় ছিল তাহার সাহিত্য, আরও গর্বের বিষয় ছিল এই যে সাহিত্যের এই প্রজ্ঞানঘন রস একদিন তাহাদের জাতীয় জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের চিত্তের সকল সংকীর্ণতা দূর করিয়া তাহাদিগকে জীবনের যত গ্লানির ঊর্ধ্বে আনন্দময় সত্তার সন্ধান দিয়াছিল। বিষয়ের চাপে অভিভূত এই বিশ্বের একান্ত অসহায়ত্বের মধ্যেও বাঙালী সহায়বান হইয়া অভয়ত্বের বার্তা সকলকে শুনাইয়াছিল। বাঙালী আপনার স্বকে ছন্দোময় অমৃতরূপে অন্তরে নিত্য করিয়া পাইয়াছিল এবং জগতে প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিল।

ভদ্রমহোদয়গণ! গৌরাঙ্গের নিত্য সিদ্ধ সাঙ্গগণের সে অমৃতময়ী বাণী আজও স্তব্ধ হয় নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্দিন আসিয়াছে সত্য; একথা সত্য যে, আজ আমরা যেন সত্যকার কোন আদর্শের আশ্রয় পাইতেছি না এবং নিজেদের স্বত্ব হারাইয়া স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া চলিয়াছি। এ অবস্থা বড়ই সংকটজনক অবস্থা। কিন্তু এই সংকটসংকুল অবস্থার মধ্যেও বাঙালী জাতির অন্তরে বৈষ্ণব সাহিত্যের রসাবদান উদ্দীপ্ত রাখিবার সাধনা চলিতেছে। প্রতিকূল এই অবস্থার মধ্যেও যে সব মহাজন এ তপস্যায় ব্রতী রহিয়াছেন, আজ এই উপলক্ষে তাঁহাদিগকে আমরা বন্দনা করিতেছি। লুপ্ত বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহের উদ্ধার করিয়া এবং সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় বৈষ্ণব সাধনার অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রদীপ্ত করিবার সাধনায় যাঁহারা ব্রতী রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জাতির নমস্য।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি নিজে অত্যন্ত আশাশীল ব্যক্তি; কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনার এই ক্ষেত্রের বিশালতা এবং সেদিকে আমাদের কর্তব্য কতখানি অনুষ্ঠাপিত রহিয়াছে, এই বিষয়ে যখন চিন্তা করি তখন নৈরাশ্যে অভিভূত হই। আমরা সম্মিলনীর দিক হইতে একলা কতটুকু কি করিতে পারি, এবং যেটুকু আমাদের সামর্থ্য তাহার সার্থকতাও আমাদের সহযোগিতার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। এক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি

বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনার এই ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অবদানের তুলনা নেই। যাঁহারা পরিষদের পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী জীবনের সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁহারা তাহা সম্যকরূপেই অবগত আছেন; কিন্তু আমাদের আশারও অবধি নাই; আমরা এসম্বন্ধে পরিষদের নিকট হইতে আরও অনেক কিছু আশা করিতেছি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পরিশেষে আমাদের তরুণ বন্ধুগণেরও প্রতি আমাদের কিছু নিবেদন আছে। নিবেদন এই যে বাঙলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে তাঁহারা বর্তমানের পক্ষে অনাবশ্যক, অতীতের জীর্ণ সংস্কারসর্বস্ব বস্তু বলিয়াই যেন উপেক্ষা না করেন। বৈষ্ণবের সাধনা সুন্দরের সাধনা, সে সাধনা চির-

কিশোরের সাধনা এবং সর্বকালের সমুন্নতির গীতিমূলক সংস্কৃতি সে সাধনার ভিতর রহিয়াছে। তাঁহারা যদি একটু এসম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হন, তবেই এসত্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মনে এইরূপ ধারণা যে, বৈষ্ণব সাহিত্য একান্ত অবাস্তব এবং কল্পনা বিলাসমূলক; কিন্তু সে ধারণা সত্য নহে। এ সাহিত্য অবশ্য অত্যন্তরূপে বস্তু-পরতন্ত্র নয়; অর্থাৎ মানুষকে বস্তুর অধীন করে নাই কিংবা বস্তুর ভারে মানুষের আত্মাকে ক্লিষ্ট করা এ সাহিত্যের আদর্শ নয়; কিন্তু মানব স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদাসূত্রে সেবাকে এ সাহিত্য সমাজ-জীবনে সত্য করিয়া বিশ্বের বস্তুরাজীকে মহিমান্বিত করিয়াছে। মানবের আত্মার গৌরবের আলোকে ঔদ্ধত্য এবং স্বৈরাচারের শূন্যগর্ভ দৈন্যকে উন্মুক্ত করিয়া এই সাহিত্য সমাজকে সংযত এবং সমাহিত স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার আদর্শ জগতের কাছে উপস্থিত করিয়াছে। বিশ্বমানবতা এবং সাম্যের পরম প্রেরণা এই সাহিত্যের ভিতর রহিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যিকের যিনি ঈশ্বর, তাঁর সম্বন্ধে তরুণদের কোন ভীতি পোষণ করিবার কারণ নাই; কারণ সে ঈশ্বর ঐশ্বর্যবিহীন ঈশ্বর। তিনি নিষ্কিঞ্চন এবং নিষ্কিঞ্চনজনেরই প্রিয়। তাঁহার মধ্যে কোনরূপ আভিজাত্যের লেশ নাই। আছে বাহু মেলিয়া সকলকে আলিঙ্গন। পতিত এবং অবজ্ঞাতের প্রতি প্রীতির টানে পাগল হইয়া তিনি সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্য-লক্ষ্মী তুচ্ছ করিয়া ধরণীর ধূলায় লীলা করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যিকের জীবন দেবতা সকলের বন্ধু, সকলের প্রিয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা বিশ্বপরিব্যাপ্ত ঐশ্বর্যের আবরণে প্রচ্ছন্ন দেবতার রূপকে সকলের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। দুরবগাহ সে সাধনার প্রভাবে হিরন্ময় আবরণ উন্মোচন করিয়া সকলের পোষণকারী পূষার সত্যধর্ম দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণবের অবদান আত্মলগ্ন; এজন্য বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে ভেদের স্থান নাই এবং মনের এ কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না যে, অধিকার-ভেদের গতানুগতিক যুক্তির একান্ত স্বীকৃতিও বৈষ্ণবের সাধনতত্ত্বে নাই। কারণ ঐশ্বর্যের সঙ্গেই অধিকার-ভেদের সম্পর্ক। অধিকার ভেদের সিঁড়ি বাহিয়া তাঁহাদিগকে দেবতার ঐশ্বর্যের বৈদুর্যময় কোঠার উপরে উঠিতে হয়, দেবতা যাঁহাদের পর; কিন্তু বৈষ্ণবের দেবতা সকলের আত্মা। তিনি নিজে সকলের জন্য নামিয়া আসেন। অহঙ্কৃত দৈন্যের গণ্ডীর মধ্যেই ঐশ্বর্যের অনুভূতি। প্রেমের দেবতার রস-মাধুর্য স্পর্শে, অনপেক্ষ আত্মীয়তাময় তাঁহার আপ্যায়নে ঐশ্বর্য বিলুপ্ত হয় এবং ঐশ্বর্যের যেখানে স্থান নাই, সেখানে অধিকার-ভেদের প্রশ্নও উঠে না। প্রেম যেখানে অপরিচ্ছিন্ন, সেখানে অধিকার-ভেদের দৈন্য রসাভাস সৃষ্টি করে। বৈষ্ণব সাহিত্য এমন রসাভাসের সঙ্গে যুক্তিবুদ্ধিকে জোড়া-তালি দিয়া চলিতে পারে না। বিষয় সম্পর্কিত দৃষ্টি শ্রুতিরসের অভ্যাসের রাজ্য হইতে প্রেমের পরম প্রকাশের অভ্যুদয়ের আলোকময় রাজ্যে মানুষকে লইয়া যাওয়াই বৈষ্ণব সাহিত্যের লক্ষ্য। পতিত অবজ্ঞাত এবং দুর্গত জনগণের বেদনাকে সাহিত্যে বাস্তবরূপে দান করাই যদি তরুণদের আদর্শ হয়, তবে, বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়া সে পথে সত্যকার সাহায্য পাইবেন। পরানুকরণের অস্পষ্টতা কাটিয়া গিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোকে তরুণ সাহিত্য জাতির অন্তরে কাজ করিবার মত জীবনীশক্তি লাভ করিবে। পক্ষান্তরে সে আশ্রয় যদি তাঁহাদের সাহিত্য সাধনার মূলে না থাকে, তবে বাতাহত শুষ্ক পত্রের মত দুইদিনে তাহা উড়িয়া যাইবে। জাতির অন্তর রসে সিক্ত হইয়া উহা পুঁথিগত পল্লবিত হইবে না।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আজ আপনাদিগকে এখানে পাইয়াছি। এদিন বড়ই আনন্দের দিন। যাঁহারা বঙ্গের মনীষিমণ্ডলের শীর্ষস্থানীয় পুরুষ, আজ তাঁহাদিগকে আমরা সভাপতি-স্বরূপে পাইয়াছি। তাঁহাদের মুখে কত নূতন বিষয় শিখিব, নূতন জ্ঞান লাভ করিব; সম্মিলনী তাঁহাদের লক্ষ্য পথে তাঁহাদের নিকট হইতে কত মূল্যবান নির্দেশ লাভ করিবে; এ আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করিবার নয়। আপনারা আমাদিগকে বল দিলেন, আশা দিলেন, আমাদিগকে সর্বতোভাবে কৃতার্থ করিলেন। আমি সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আপনাদিগকে পুনরায় আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। যাঁহার কৃপায় নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও আমাদের পক্ষে এ আনন্দ লাভ করা সম্ভব হইল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই প্রেম-কারুণ্য মহিমার জয় হউক।

---

* বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে 'দেশ' সম্পাদকের অভিভাষণ।

বিরহ বাদল ক্ষণে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অসীম অরূপ সে যে,—সীমার মাঝারে এসে করে লীলা কত!
তারি ছন্দ, তারি গীত আমারে আকুল করি' রাখে অহরহ।
গ্রহে গ্রহে তারকায় তাহারি কবিতা নিত্য ফোটে শত শত,
মহিমা-শিখর শীর্ষে জীবনের কবি মোর জীবন্ত বিগ্রহ।
বিজলী বিদীর্ণ রেখা নিমেষে ফুটিল নভে অব্যক্ত আবেশে,
অরণ্য শিহরে এবে কাঁপে বেণুকুঞ্জবীথি, দোলে কুন্দনীপ।
মুহূর্ত আলোকে যেন হেরিলাম তারি জ্যোতি ঘন ঘোর মেঘে,
অনন্ত গগন পানে চেয়ে থাকি; জ্বলিতেছে কুটিরে প্রদীপ।
শতশাখা অন্তরালে বিহঙ্গ গুটায়ে পাখা পুষ্পপানে চেয়ে
মৌন ম্লান। অন্ধকারে গন্ধবহ ভ্রমিতেছে অতীতেরে স্মরি';
শ্রাবণের চক্রবালে বর্ষার নবীন মেঘ আজি গেছে ছেয়ে,
নীলাকাশে নিমীলিত সন্ধ্যার তারা,—আসন্ন শর্বরী।
কেয়ায় বহিছে গন্ধ,—দূরে কার খঞ্জনীর শুনিতেছি ধ্বনি,
স্তব্ধ কোন্ নদীতটে ভাবের পাগল কাঁদে কাঁদায়ে ধরণী।

গুছাইতে গানগুলি আমারে হারায়ে ফেলি—শান্তি নাহি মনে,
অন্তরে বাহিরে মম বিরহের দোলে ছায়া। বিরলে একাকী
বসে আছি, কার যেন উত্তরীয় মেঘপুঞ্জে ওড়ে সমীরণে!
কিছুতে যায় না মোর হৃদয়ের গুরুভার,—অশ্রুসিক্ত আঁখি।
আর যে পারি না আমি, প্রতীক্ষার বুকে কাঁপে প্রদীপের শিখা,
সংসারের চারিভিতে যাহা কিছু, মোর চক্ষে, সকলি তাহার;
যুগে যুগে যতরূপে সে মোর এসেছে হেথা পারে প্রেম টিকা,
স্বরূপে শুভদৃষ্টি করি' শেষে দিয়ে গেল মোরে অন্ধকার।
সে কি আর আসিবে না! পাত্রে মোর মিলনের দিতে সুধারস?
আমারে বঞ্চিত রাখি তারে আজি কোন্ জন করিয়াছে বশ!

কোন্ দূরে নীলাচলে সে আমারে আছে ভুলে রামানন্দ সাথে!
নিত্যানন্দ-অঙ্কোপরি আবেশে বিভোর হয়ে প্রেমানন্দে রাজে।
মিশ্রের অঙ্গনতলে সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে সদা সংকীর্তনে মাতে,
বিশ্বেরে ভুলায়ে নাচে রসরাজ-মহাভাব বৈরাগ্যের সাজে।

সোনার দেহটি তার পথের ধূলায় বুঝি গড়াগড়ি যায়!
কোথা কোন্ তমালেরে জড়ায়ে ধরেছে আজ! কোন্ ব্রজধামে
করিবারে কৃষ্ণলীলা জাহ্নবীর তট হ'তে গেছে যমুনায়!
গৌর অঙ্গ হোলো কি গো কৃষ্ণ অঙ্গ বিনোদিনী রাধা লয়ে বামে!
তারি মালা জপিতেছে। সে তো আর আসেনাক মোর শূন্য ঘরে,
মেঘের মৃদঙ্গ বাজে, বাউল বাদল রাতি এলো বিশ্ব'পরে।

বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সংগীত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমাদের শৈশবে, সে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমরা হরিশ্চন্দ্র নাটক অভিনয় দেখিয়াছিলাম, সেই নাটকের একটি গান আমাদের কাছে এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমরা বালকেরা মিলিত হইয়া উহা গাইতে চেষ্টা করিতাম। সেই গানটি 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের শ্রেষ্ঠ সংগীত। মনোমোহন বসু মহাশয়ের লিখিত 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের এই সংগীতটি সেকালে সেই অর্ধ শতাব্দী পূর্বে কিংবা তাহারও আগে বাঙলার প্রাণে দেশপ্রীতির এক নব উদ্দীপনা আনিয়াছিল। গানটি এই :—

ভৈরবী একতালা

দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ॥
সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে,
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র সূর্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা রাহু মুখেলীন।
অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এমনি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুংগ দ্বীপ হ'তে পংগপাল এসে,
সারশস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের জন্যে খোসা ভূষি শেষে,
হায়গো রাজা কি কঠিন।
তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার,
সুতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় নাক আর,
হ'লো দেশের কি দুর্দিন!
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুংগরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে র'বে লাজ,
ধরবে কি লোকে তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন।
ছুঁচ সুতো পর্যন্ত আসে তুংগ হ'তে,
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটা জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে
কিছুতে লোকে নয় স্বাধীন।

হরিশ্চন্দ্র, প্রণয় পরীক্ষা, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি নাটক রচয়িতা হিসাবে যেমন মনোমোহনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তেমনি তিনি 'পদ্যমালা' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য কবিতা গ্রন্থ প্রভৃতি রচনায়ও সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

বংগভংগের সময় সমগ্র বাঙলা দেশব্যাপী যে স্বদেশপ্রীতি বা দেশাত্মবোধের ভাব জাগরিত হইয়াছিল, তখন এই 'দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন' সংগীতটি গ্রাম, নগর ও পল্লীতে শতসহস্র কণ্ঠে গীত হইত। আমরা সেই সংগীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

মনোমোহন বসু মহাশয়ের নাটকাভিনয় এক সময়ে সর্বত্রই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই প্রসংগে স্বর্গত সংগীতাচার্য রাধামাধব কর মহাশয় লিখিয়াছেন :—"১৮৬৫—৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সখের থিয়েটারের খুব ধুম পড়িয়া গেল। শিবপুরে বাঁধা স্টেজে 'রাজ্যাভিষেক' নাটক অভিনীত হইল। বাগবাজারে—নল-দময়ন্তী, বউ-বাজারে—হরিশ্চন্দ্র ও প্রণয়-পরীক্ষা নাটক অভিনয় হইয়াছিল। [মানসী ও মর্মবাণী ৯ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা বৈশাখ, ১৩২৩] কাজেই দেখা যাইতেছে যে প্রায় আশী বৎসর আগে 'দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন' জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। এই সংগীতটির প্রচারের অন্যতম কারণ—সে সময়ে বাঙলা দেশের সর্বত্রই নাটক অভিনয় হইত এই জন্যই ঐ সংগীতটির প্রচারেরও সুযোগ ঘটিয়াছিল।

আমরা এই সংগীতটির মধ্যে সেকালের অন্যান্য জাতীয় সংগীতের মত মুসলমান বিদ্বেষ বা সেই রাজপুত বীর ও রমণী-গণের স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও মৃত্যু বরণের উল্লেখ পাই না। পাই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার শোচনীয় পরিবর্তন ও পরিণামের কথা। কল-কারখানার দরুণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারের ফলে দেশের শিল্পী সম্প্রদায় শিল্পকার্য ত্যাগ করিয়াছে, সব প্রয়োজনীয় জিনিসই বিদেশ হইতে আসিতেছে দেশের এই দারিদ্র্য—অভাব ও অভিযোগই যে আমাদিগকে দিনের দিন দীন করিতেছে, তাহাই ছিল গানের প্রতিপাদ্য। এজন্য এই সংগীতটিকে আমরা অন্য দিক দিয়াও শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে পারি।

আমরা পূর্বে বেশ সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছি যে, স্বদেশপ্রীতি বা দেশাত্মবোধ আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতে পাইয়াছি। এই প্রসংগে—'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক গ্রন্থ প্রণেতা রায় বাহাদুর অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়ও বলিয়াছেন :—

'স্বদেশপ্রীতি বা দেশাত্মবোধ বলিতে যাহা বুঝায় ঐ ভাবটি আমাদের দেশে খুব প্রাচীন নহে; উহা আমরা ইংরাজীশিক্ষার শুভফলস্বরূপে পাশ্চাত্য দেশ হইতে লাভ করিয়াছি।"

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এই উক্তিটি খুব প্রাচীন হইলেও উহাকে দেশাত্মবোধের নিদর্শন বলা যায় না; পাশ্চাত্য সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া বাঙালী যখন পলিটিক্যাল প্যাট্রিয়টিজম শিক্ষা করিল, তখন ঐ বচনটি কিঞ্চিৎ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া ঐ ভাবের দৃঢ়ীকরণ ও দেশমধ্যে বিস্তারের সহায় হইয়াছিল। দেশাত্মবোধ ভাবটিই যে কেবল পাশ্চাত্য তাহা নহে; ঐ ভাবপ্রকাশক ভাষায়ও পাশ্চাত্য ভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইংরেজীতে স্বদেশকে Mother Land বা Mother Country বলে। আমরাও ঐ দৃষ্টান্ত বলে স্বদেশকে 'মাতৃভূমি' বলি। ইংরেজীতে ইংলণ্ড ফ্রান্স ইত্যাদি দেশবাচক নামগুলিও সব স্ত্রীলিংগ। সেই দৃষ্টান্তে বঙ্গ ভারত প্রভৃতি শব্দ মূলত স্ত্রীলিঙ্গ না হইলেও 'বংগ-জননী, ভারত-মাতা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে মনে কোনওরূপ দ্বিধা বোধ করি না; এমন কি "জননী ভারতবর্ষ" পর্যন্ত চলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সংস্কৃতে বসুন্ধরাকে বহুস্থানে জননী সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা ও বর্ণনা হিন্দুর কাছে অস্বাভাবিক বোধ হয় না। যাহা কিছু আপত্তি তাহা অবশ্য ব্যাকরণ-মূলক। সে যাহা হউক স্বদেশের প্রতি প্রীতি একটি সর্বজনীন ভাব হইলেও প্রাচীন যুগে পাশ্চাত্য আদর্শের স্বদেশ-প্রীতি বা দেশাত্মবোধ এদেশে নানা কারণেই পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজী শিক্ষার ফলে ঐ ভাবটির উৎপত্তি হইলে উহার সর্বজনীন ধর্ম প্রভাবেই উহা অত্যল্পকাল মধ্যে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত যতই স্বদেশের তুলনা করিতে লাগিলেন, ততই তাহার দুরবস্থার কথা ভাবিয়া ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কবি ছিলেন, তাঁহারা কাব্যে ও সংগীতে অল্পমাত্রায় করুণ রসের ছড়াছড়ি করিতে লাগিলেন—কেহ কেহ আবার রাজস্থান প্রভৃতি পাঠ করিয়া রাজপুতগণের স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও মুসলমানবিদ্বেষ প্রভৃতিকে জাতীয়ভাবরূপে গ্রহণপূর্বক তদবলম্বনে প্রচুর বীররসপূর্ণ কাব্য লিখিতে লাগিলেন। এই সকল কবি স্বদেশ বলিতে সমগ্র ভারতবর্ষকেই বুঝিতেন। এই যুগের জাতীয় কাব্য বা জাতীয় সংগীতগুলিতে প্রাদেশিকী প্রীতির ভাব বড় একটা পাওয়া যায় না। তখনকার 'জাতীয়' কবিরা ভারতের কথাই বলিতেন, ভারতের দুঃখে অশ্রুপাত করিতেন,

ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য অমিতউৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। তাহাদের নবসঞ্জাত স্বদেশপ্রীতি প্রাদেশিক জাতীয় ভাবকে বড় একটা আমল দিতে চাইত না—উহাকে বোধহয় বড় ক্ষুদ্র, বড় তুচ্ছ জ্ঞান করিত।* আমরা এবিষয়ে বিশদভাবে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আরও ঐরূপ দুই একটি সংগীত উদ্ধৃত করিলাম। স্বর্গত দেশপ্রেমিক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী গাহিলেনঃ—

পাহাড়ী—আড়া

ভারত দুঃখিনী আমি নরভাগ্যা পরাধিনী,
কেমনে এ পাপ-মুখ দেখাইব কলঙ্কিণী,
মৃতপ্রায় অধোমুখে কলংকী সন্তান বুকে,
কাঁদে পর গঞ্জনায়, কাঁদি আমি অভাগিনী,
চন্দ্র সূর্য বংশে আজি নিস্তেজ নক্ষত্ররাজি,
বিরাজে, কহিব কারে হেন দুঃখের কাহিনী।
অল্পমতি হীন প্রাণ, আর্যতেজ অভিমান,
হারাইয়া, পরপদ সেবিছে দিবাযামিনী।
হিমগিরি ভেঙে পড়, পাতালে প্রবেশ কর,
কোন্ লাজে উচ্চশিরে চে'য়ে আছ হতমানী!
সাগর প্রসার গ্রাস, এ মাটির দেহনাশ।
এ কলংক চিহ্ন বুকে, মুছে ফেল মা-ধরণী,
চন্দ্র সূর্য খসে পড়, এস আদি-অন্ধকার,
ঢেকে রাখ পাপ মুখ এ অপার দুঃখগ্লানি।

দ্বারকানাথ আর একটি সংগীতে বলিয়াছেনঃ—

মল্লার আড়া

সোনার ভারত আজ যবনাধিকারে।
ভারত-সন্তান-বক্ষ ভাসে অশ্রুধারে।
জ্ঞান রত্নাদির খনি, সভ্যতার শিরোমণি,
আজি সেই পুণ্যভূমি, ডোবে গভীর আঁধারে।
যার ধমনী প্রবাহে, আর্যের শোণিত বহে,
সে কিরে কখন সহে, এ ভীষণ অত্যাচারে।
সে বংশে যে জন্মে থাক, জাতির সম্মান রাখ,
যবনের রক্তে আঁক আর্যকীর্তি চরাচরে।
পুরুষেরা অস্ত্র ধর, যুদ্ধে যেয়ে মেরে মর,
অনলে প্রবেশ কর, যত রমণী নিকরে।
ভারত শ্মশান হোক্, মরু হ'য়ে পড়ে রোক্,
তবু অধীনতা বেড়ি, রেখনারে পায়ে ধরে!
ইত্যাদি

বঙ্গভূমিকে উদ্দেশ করিয়া প্রথম কবিতা লিখিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি অনবদ্য। এ কবিতাটি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কণ্ঠে শুনিতে পাওয়া যায়ঃ—'রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ইত্যাদি। শ্যামা জন্মদের প্রতি মধুসূদনের এই সম্ভাষণ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ও বাংলা দেশ

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা দেশের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম বঙ্গদেশ ও বাঙালীকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি বাঙালীকে বুঝাইলেন এই যে, সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ, এদেশ তাহাদেরই জন্মভূমি। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করিবার সময় লিখিলেনঃ—"এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। **বাঙালী সমাজে** ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপি-কৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্।" বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পরিচালনায় তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিলেন। ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে বিবিধ প্রবন্ধে 'বাঙালীর বাহুবল', বাঙালীর ইতিহাস, বাঙালীর শৌর্য ও বীর্য প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া বাঙালী জাতির মধ্যে এক নব প্রেরণা জাগাইয়া দিলেন। বাঙালী তাহার সাধন-মন্ত্র পাইল—'বন্দে মাতরম্', বঙ্কিমের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ঋষির কাছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়িতে পড়িতে এমন কোন্ বাঙালী আছে, যাহার প্রাণ না স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'কে আমরা সর্বপ্রথম জাতীয় ভাবদোত্যক্ উপন্যাস বলিতে পারি। আনন্দমঠ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থের বিষয়বস্তু বা আখ্যায়িকা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা এই প্রবন্ধের বহির্ভূত। 'আনন্দমঠে'র প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নলিখিত কথা কয়টি মাত্র লিখিয়াছিলেনঃ—

'বাঙালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়।

সমাজ বিপ্লব অনেক সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।

ইংরেজেরা বাঙলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথাও এই গ্রন্থে বুঝান গেল।'

'আনন্দমঠের' দশম পরিচ্ছেদে— বন্দে মাতরম্ সংগীতটি রহিয়াছে।

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্বিত, কিন্তু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিলেন। সে স্থির মূর্তি ধীর প্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই। সেই রণনিপুণ বীর মূর্তি—সৈন্যাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্তি আর নাই। এখনই যে গর্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন, সে মূর্তি আর নাই। যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তিশালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর-কানন নদনদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্তি হইল—

সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ আপন মনে নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন।

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—**সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা, শস্য শ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল,—"মাতা কে?" উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাহিতে লাগিলেন।**

"শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়"—

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী; আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, **মলয়জ** শীতলা শস্য শ্যামলা"—

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, তবে আবার গাও।'

ভবানন্দ আবার গাহিলেন,—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্ত কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্ত কোটি ভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহু বল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্ মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

ক্রমশ

---

*বঙ্কিমচন্দ্র—৩০৯-৩১০ পৃষ্ঠা। রায় শ্রীঅক্ষয়-কুমার দত্তগুপ্ত প্রণীত।

নিশির ডাক

অমর সান্যাল

পঞ্চু ঘোষের চলতি ব্যবসা একদিন অচল হয়ে গেল। তার জীবিকার সম্বল দুজোড়া গরু একদিন কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, তার আর কোন হদিস পাওয়া গেল না। সন্ধ্যেবেলা খবর পেয়ে পঞ্চু মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। প্রতিবেশী কেনারাম এসে বললো 'পন্ডে' খোঁজ করেছিলি? ঐ যে থানার কাছে নতুন পন্ড বসিয়েছে? পঞ্চু নির্বাক. উত্তরে শুধু একটা আঙ্গুল কপালে ছুঁইয়ে দিল।

গোয়ালা পাড়ার সান্ধ্য মজলিসে সেদিন পঞ্চুর দুরদৃষ্টই আলোচনা হল অনেকক্ষণ ধরে। লোকটার কপাল বটে! গেল বছর কলেরায় বৌটা মারা গেল। রেখে গেল একটা পাঁচ বছরের কচি মেয়ে। আর এবছর গেল গরুকটা!

ছিদু ঘোষ একটা গাবগাছে হেলান দিয়ে বসেছিল। সোজা হয়ে বললো—আমি জানি—পঞ্চুর গরু কোথায়। বড় রাস্তার চৌধুরীরা ধরে নিয়ে গেছে দরোয়ান দিয়ে।

চৌধুরীদের কথা উঠতে সকলে মৌন হয়ে গেল। বড় রাস্তায় ওদের বাড়িটা দেখলেই ভয় হয়! শুধু কেনারাম বললো—পঞ্চুর কাছে ওরা পাবে তো মোট বিশ টাকা। তাও ধার করেছে—গেল বছর ওর বৌয়ের কাজের সময়। তার জন্যে চারটে গাইগরু বাছুর শুদ্ধ নিয়ে গেল! আর সে কি যে গরু! পঞ্চুর কত আদরের ছিল।

সভার এক কোণে পঞ্চু বসেছিল হাঁটুতে মাথা গুঁজে। চৌধুরী বাড়ির সঙ্গে তার পরিচয় তো আজকের নয়। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সে দুধ দিচ্ছে ওবাড়িতে। সামান্য ক'টা টাকার জন্য এতদিনের সম্বন্ধে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল ওরা!

পঞ্চুর পিছনে ঝরা-বাঁশপাতার ওপর খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। সকলে তাকাল মুখ তুলে। পঞ্চুর মা আসছে নাতনীর হাত ধরে। কাছে এসে বুড়ি বললো—নে বাপু তোর মেয়ে। একটুও থাকতে চায় না আমার কাছে। পঞ্চু তুলসীকে কোলে টেনে নিল।

বুড়ি এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল সভার মাঝখানে। জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়িটা থেকে লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে অনেকখানি জায়গা নিয়ে। কুয়াশার ধোঁয়ায় ভরে গেছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের সুবিশাল বক্ষস্থল। রেলের লাইনটার শুধু একটুখানি আভাস পাওয়া যাচ্ছে। লাল টকটক্ করছে পঞ্চুর মার পাদুখানা, তার জীর্ণ মলিন বস্ত্র-খণ্ডের খানিকটা অংশ দেখাচ্ছে রক্তবর্ণ বেনারসীর মত। শীতার্ত হাওয়ার সঙ্গে তার কাঁপা গলার স্বর অদ্ভুত শোনাতে লাগল।

বুড়ি বললো, চৌধুরীদের সঙ্গে আলাপ আমার পঞ্চুর জন্মেরও আগে। কত্তা তখন বেঁচে। বুড়ো চৌধুরী একদিন বেড়াতে এল আমাদের এই গয়লাপাড়ায়। এদিকে তখনও রেলের লাইন বসেনি। সুমুখের ওই জঙ্গলটায় বাঘ লুকিয়ে থাকত। আমাদের কত্তা আবার গরু চরাত ঐ জঙ্গলের গায়ে; —বারণ শুনত না। বলত হাতে লাঠি থাকতে বাঘ আমার করবে কি? এদিকে চৌধুরী বুড়ো ত বেশ স্ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে জঙ্গলের গায়ে। সঙ্গে রয়েছে তিন চারজন পশ্চিমে দরোয়ান। হঠাৎ জঙ্গল থেকে হাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল বাঘের বাচ্চা একটা। দরোয়ানরা ত এক-যোগে চম্পট দিল। খালি চৌধুরী দাঁড়িয়ে ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। ব্যাপার দেখে আমাদের কত্তা ত হেসে খুন। 'হেই—হেই', বলে বাচ্চাটাকে দিল সে তাড়িয়ে। সেই থেকে আমাদের আলাপ হল শুরু।

ছিদু বললো—চৌধুরীরা তোমাদের উপকার আজ সুদে-আসলে শোধ করে দিয়েছে খুড়ি! বড়লোকের সঙ্গে কি আর আমাদের মিতেলী চলে? ও-জাতই আলাদা!

দুসপ্তাহ কেটে গেল। পঞ্চুর গরু চৌধুরীদের খেঁয়াড়ের সারবান খাদ্যে পুষ্ট হতে লাগল। কাকুতি মিনতিতে কোন ফল হল না। পঞ্চুর মার উপস্থিতি ও বাঘ সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ, অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারল না। বুড়ো চৌধুরী প্রাতঃভ্রমণ সেরে তখন চুরুট টানছিল বারান্দায় বসে। মাথার চুলে পাক ধরলেও শরীর তার তখনও স্বাস্থ্যশ্রীতে ঝলমল করছে। পঞ্চুর মাকে চিনতেই পারল না প্রথমে। পরিচয় শুনে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলো—টাকা এনেছিস? পঞ্চু কই?

পঞ্চুর মা এতটা আশা করেনি। ত্রিশ বছর আগেকার ব্যাঘ্রভীত চৌধুরীর সঙ্গে আরামকেদারায় উপবিষ্ট পক্ককেশ চৌধুরীর কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পেল না সে। এই সঙ্গে পঞ্চুর বাবার চেহারাও তার মনে ফুটে উঠল দূরাগত স্বপ্নের মত। বেঁচে থাকলে তারও মাথা এই রকম সাদা হয়ে যেত, কম্পিত পেশীর ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকত বিগত দিনের দুঃসাহসিক ইতিহাস। চৌধুরীর পাশে সেবারত নাতনীর মত তুলসীও দাদুর স্নেহাস্বাদে বঞ্চিত হত না।

বুড়ীকে নির্বাক দেখে চৌধুরী বললে সুদে আসলে তোদের হয়েছে একুশ টাকা ছ'আনা। টাকা দিয়ে পঞ্চুকে পাঠিয়ে দিগে যা গরু নিয়ে যাবে। চুরুট ফেলে চৌধুরী খবরের কাগজে মন দিল।

বুড়ী বুঝতে পারল অনুনয় বিনয়ে চৌধুরীর ঝুনো মনে চিড় খাবে না। সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনই সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল।

বড় রাস্তা ধরে চলেছে বুড়ী। বেলা এগিয়ে গেছে বেশ খানিকটা। বাঁক কাঁধে ছিদু আসছে দুধ নিয়ে; বুড়ীকে দেখে বাঁক নামাল রাস্তায়।

—গরু ছাড়ান পেলি খুড়ী?

—চৌধুরীরা গরু ছাড়ল না ছিদু। বলে, আগে টাকা দে, তবে গরু ছাড়ব।

বুড়ীর চোখের কোণে জল টলমল করছে, অসহায় জীবের বেদনার ধারা!

ছিদু বললে এক কাজ কর খুড়ী। আমার ত এখন গোটা বিশেক গরু দুধ দিচ্ছে। তুমি শহর বাজারে আমার দুধ বিক্রী আরম্ভ কর। তোমাদের খাওয়া-পরার ভার থাকল আমার ওপর। চৌধুরীর টাকা দু এক বছরেই শোধ হয়ে যাবে।

বুড়ীর চোখের জল কঙ্করাস্তীর্ণ রাজ-পথে পড়ছে। ছিদুর কথার উত্তর দেওয়ার ভাষা তার নেই। শ্রীহরি ঘোষকে আজও স্বপ্নে দেখে সে। সেই স্বাবলম্বী দীপ্তিময় দেহসৌষ্ঠব। তারই বিধবা সে, আজ নতি স্বীকার করবে ছিদু ঘোষের কাছে অন্ন-প্রার্থী হয়ে? কিন্তু পঞ্চু, পঞ্চু কোন্ পথে যাবে? তার জীবিকার সংস্থান হবে কোথায়? বুড়ী চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলল।

শেষে পর্যন্ত পঞ্চুর মার সংকল্পে ভাটা পড়ল। পরদিন থেকে সে নিয়মিত ছিদু ঘোষের দুধ বিক্রী করতে লাগল। সঙ্গে থাকত তুলসী। গোয়ালাপাড়া থেকে শহর-বাজার অনেকখানি পথ। রোজ সকালে দেখা যেত বৃদ্ধা গুটিগুটি চলেছে দুধের ভাঁড় মাথায় নিয়ে। বোঝার ভারে তার মাথা ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে, চোখের তারা আকাশের দিকে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। পিছনে ছটি হাতে তুলসীর দেখা পাওয়া যেত। হেমন্তের শিশিরসিক্ত মাঠ চঞ্চল

হয়ে উঠত তার পায়ের ধ্বনিতে। বৃদ্ধা সস্নেহে অনুযোগ করত—আস্তে চ, ও তুলসী। মাকে ত খেয়েছিস বাপু, আমাকেও খাবি এবার!

মুস্কিলে পড়ল পণ্টু। তার কর্মনিবন্ধ জীবন নিশ্চল প্রস্তরখণ্ডের মত অবহেলায় পড়ে রইল গোয়ালাপাড়ার এক প্রান্তে। ছিদু প্রভৃতি হিতৈষীরা পরামর্শ দিল, চৌধুরীবাবুর ছোট ছেলের হাতে পায়ে ধরগে না। বাবু সভায় বক্তিতে দেয়, দয়া-মায়া আছে বাবুর শরীরে।

পণ্টু তুবড়ীর মত ফেটে পড়ল,—ওদের কথা তোরা আর কখনও বলিস নে আমার কাছে। খুনোখুনি হয়ে যাবে। ছোট ছেলেকে আমার চেয়ে তোরা বেশী জানিস? সেবার দোলের সময় বাবুর গায়ে সাহস করে একটু আবীর দিলাম। বাবু চটে লাল। বললো, তোর আস্পদ্দা ত কম নয়! চাকর হয়ে তুই আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করিস? তোদের ভাবতে হবে না আমার জন্যে। হাত পা রয়েছে, খেটে খাব আমি।

ছিদুরা পণ্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিছু দিন পরে দেখা গেল, পণ্টুর সদম্ভ উক্তি মৌখিক আস্ফালনেরই নামান্তর। মাত্র সেদিনকার কর্মকুশলী পণ্টু স্বপ্নবিলাসী পতঙ্গের মত কিসের নেশায় অচল হয়ে গেল।

ছিদু একদিন এসে ডাক দিল, মাঠে যাবে না হে। চল আমার গরুক'টা নিয়ে চল।

এবার পণ্টু রীতিমত রেগে গেল, তোমার গরুর ধড়ে কি আর জীয়োন আছে হে। শুটকো হাড় বের করা গরু, দেখলেই আমার গা কেমন করে। আমার চারটে গরু তোমার পঁচিশটার সমান।

অভিমানে ছিদুর চোখ জলে ভরে এল। সে চিরদিনই শান্ত। কারও সঙ্গে ঝগড়া করা তার প্রকৃতির বাইরে। পণ্টুকে সে একদিনও জানায় নি তার উদারতার কাহিনী—পণ্টুদের সংসার চলার ইতিহাস। ছিদু নিঃশব্দে মাঠের দিকে পা বাড়াল। রেল লাইনের নীচে তৃণবিরল পতিত জমি। অকরুণ চেহারা, সজীব শ্যামলতার লেশমাত্র সেখানে দেখা যায় না। তবু তার একটা মোহ, একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে মানুষ ও পশুর কাছে সমানভাবে। দুপুরবেলা মাঠের প্রতি ধূলিকণা গোয়ালাপাড়ার জীবগোষ্ঠির কাছে পরম পবিত্র হয়ে ওঠে।

পণ্টুর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। চৌধুরীরা তার গরু নিয়ে গেলেও মাঠের মায়া তার কিছুমাত্র কমেনি। তালপাতার ছাতা মাথায় রাখালের দল গরু চরায়। গল্প করে আপন মনে। গরুর পাল মাঠের আনাচে কানাচে বৃথা খুঁজে ফেরে ঘাসের সন্ধানে। মাঠের বুকের ওপর খাড়া উঠে গেছে রেলের লাইন। দুপাশে খড়ের বন, কাশফুলে সাদা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে বাঘের বাচ্চা দু'একটা বেরিয়ে এসে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে। গরুর পাল ভয়ে ঘেঁসে না সেদিকে।

মাঠ ছেড়ে একটু দূরে রেলের সাঁকোটার ওপর পণ্টু রোজ বসে। হাতে থাকে ঠাকুর্দার আমলের লাঠি। তেলে রোদে কাঁচা হলুদের রং ফুটে উঠেছে তার গায়ে, গাঁটে গাঁটে পিতলের ঝন্‌ঝনা বাজে। পণ্টু ভাবে, চৌধুরীরা আর একদিন বেড়াতে আসে না এখানে? বাঘের বাচ্চা ত রোজই দেখা যায়। তার বাপের বীরত্বের পুনরভিনয় করে গরুক'টা উদ্ধারের পথ সে সুগম করে তোলে। নিজের পেশীস্ফীত হাত দুখানা ঘোরায় সে আপন মনে। অসহায় চৌধুরীর কাল্পনিক দুর্দশায় চোখে তার আশার আলোক ফুটে ওঠে।

ছেলের কাণ্ড দেখে পণ্টুর মা বিরক্ত হয়ে উঠল। গোয়ালার ছেলে গরুর শোকে এত চঞ্চল হয়ে ওঠে, এ ধারণা ছিল বুড়ীর কল্পনার বাইরে। পণ্টুকে ডেকে একদিন সে বললো,—ছিদুর কথা শুনলে কি অপমান হত তোর? কি আর বলেছে তোকে? ওর গরু ক'টা মাঠে নিয়ে যেতে।

পণ্টু বললো,—সে আমাকে দিয়ে হবে না মা। মাঠের দিকে তাকালেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ছিদুর গরু হারিয়ে গেলে ও আমাকে দুষবে।

—তা তুই একবার চৌধুরী বাড়ি যা না বাপু। কাল সকালে চ না আমাদের সঙ্গে।

—ও কথাটা বলো না মা। ও বাড়ির ছায়া আর মাড়াচ্ছি নে। বড়লোক বলে কি আমাদের এমনি করে সর্বনাশ করতে হয়!

—তবে কি গরু ক'টা খালাস হবে না? চিরটা কাল থাকবে চৌধুরীদের খোঁয়াড়ে? আহা, চারটে গরুতে দুধ দিচ্ছিল প্রায় দশ সের। আমার মা-মরা মেয়েটা এক ফোঁটা দুধ পাচ্ছে না, আর চৌধুরী বুড়োর কুড়ি বছরের ধাড়ী নাতনীটা দেখি সেদিন দুধ খাচ্ছে এক গেলাস।

পণ্টু এতটা ভেবে দেখে নি। তার বরাবরই একটা ধারণা ছিল,—চৌধুরীরা গরু খালাস করে দেবে একদিন। আজ বুড়ীর তীক্ষ্ণ মন্তব্য তার মনে আঘাতের মত বাজল। সে আশ্চর্য হয়ে গেল এই ভেবে যে, মন তার অকারণে কর্মবিমুখ হয়ে উঠেছে। সুকঠিন বাস্তব সত্য প্রসারিত রয়েছে তার সম্মুখে, উদ্ভট কল্পনার রঙীণ নেশায় তার বিহ্বল হওয়া উচিত নয়। অনেকদিন পরে সে তুলসীকে পিতৃস্নেহের মাপকাঠি দিয়ে দেখল ভাল করে। রোগা হওয়ারও একটা সীমা আছে, তুলসী যেন সে সীমারও বাইরে গেছে। বুড়ীর চেহারায়ও অনেক পরিবর্তন এসেছে। চোখের দৃষ্টি হয়েছে আরও ঘোলাটে, সারা মুখে একটা পরম ঔদাসীন্যের ভাব।

পণ্টু ঠিক করল, ছিদুর গরুর ভার সে নেবে। ছিদু চল্লিশটা গরু ও আটটা মোষের মালিক। মাথা পিছু দু'আনা মজুরী দেবে ছিদু। চার মাস কাজ করলেই চৌধুরীর দেনা শোধ হয়ে যাবে।

সন্দেহের সুরে বুড়ী বললো,—ছিদুকে বলবো তা হলে?

—বলতে পার। তবে চার মাসের কড়ারে কাজ ঠিক করে এস। ছিদুর গরু দেখলে আমার বমি আসে। রোঁয়াওঠা খস্‌খসে গা, গোবরমাখা সরু লেজ। ও আমি বেশীদিন চরাতে পারব না।

শিথিল উদ্যমকে সংযত করে পণ্টু কাজ আরম্ভ করে দিল। কিন্তু মনের রশ্মি তার আলগা হয়ে গেছে। অনুভূতির সে তীব্র বেদনা আর নেই। গানের মাঝখানে যেন হঠাৎ তাল কেটে গেছে। ছিদুর গরু দু'একটা প্রায়ই পাউণ্ডে যেতে লাগল।

মাঠে গরু চরে। পণ্টু তাকিয়ে থাকে রেলের সাঁকোটার দিকে। সাঁকোটা যেন তার পর হয়ে গেছে। মধ্যাহ্ন সূর্যকরে আতপ্ত রেল লাইনটা যেন তাকে বিদ্রূপ করে। পণ্টুর সারা দেহমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বৈকালের ছায়া নামবে এখনি মাটির বুকে। চৌধুরী আসবে বেড়াতে পশ্চিমা দরোয়ান নিয়ে। বাঘের মুখ থেকে তাকে বাঁচাবে কে? পণ্টুর মনে হয়, তার পিতার ইঙ্গিত যেন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে।

ছিদু একদিন অনুযোগ করল। বললো,—গরু ত রোজই দুটো একটা পণ্ডে যাচ্ছে। ছাড়িয়ে আনতে টাকা লাগে ত!

লজ্জিতমুখে পণ্টু বললো—কি জান ছিদুদা, মনটা কিছুতেই বশে আনতে পাচ্ছিনে। জান ত, আমার চার চারটে গরু, দশ সের দুধ হ'ত, চৌধুরী বাড়ির পেট ভরাচ্ছে। আর আমার ঘরে এক ফোঁটা দুধ নেই। তুলসীর চেহারাটা দেখছ ত?

সেদিন পণ্টু ঘরে ফিরতে বুড়ী বললো,—এই দ্যাখ্, ছিদুর কাণ্ডটা দ্যাখ না। এক ঘটি দুধ পাঠিয়ে দিয়েছে তুলসীর জন্যে!

বর্ষার বৃষ্টি কদিন থেকে খুব জোর নেমেছে। শহরের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনেও লেগেছে বর্ষণের ঘোর। বড় রাস্তার দুধারে বড় বাড়িগুলি নিঃসাড়ে অপেক্ষা করছে বর্ষণক্ষান্তির জন্য। বাড়ির

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৭শে জুলাই

সুইস বেতারে বলা হইয়াছে যে, মুসোলিনী স্পেনে উপনীত হইয়াছেন। স্পেনে ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

আলজিয়ার্সের সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল বাদোলিও যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস হইতে ২২ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্যকে ইতালিতে প্রত্যাবর্তন করিবার আদেশ দিয়াছেন। তিনি নাকি ফ্রান্স হইতেও তিন চারি ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য সরাইয়া আনিতেছেন।

ইউরোপ হইতে জনৈক বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন:—প্রাপ্ত বিবরণ সমর্থিত না হইলেও যাহারা সম্প্রতি ইতালি হইতে আসিতেছে তাহারা বলিতেছে যে, প্রচুর সংখ্যক জার্মান সৈন্য ব্রেনার গিরিপথ দিয়া উত্তর ইতালিতে প্রবেশ করিয়াছে।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, একদল সোভিয়েট সৈন্য ওরেলের সরাসরি ১৬ মাইল দক্ষিণস্থ ইরেভকিনা শহরে পৌঁছিয়াছে। অপর একদল রুশ সৈন্য ওরেলের ২১ মাইল দূরে বল্খোভ-নোভো শহরে পৌঁছিয়াছে। আরও একদল সোভিয়েট সৈন্য কুরস্ক-ওরেল রাস্তা বরাবর ৬ মাইল অগ্রসর হইয়া লোমোভেৎসত্র পৌঁছিয়াছে।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল কমন্স সভায় ইতালি সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলেন, "আমাদের প্রধান শত্রু জার্মানি, ইতালি নহে—জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে সকল অত্যাবশ্যক সুযোগ সুবিধা আমাদের আবশ্যক তাহাই ইতালির নিকট আমরা চাই। ইতালির স্বার্থের দিক হইতে এবং মিত্রপক্ষেরও স্বার্থের দিক হইতে বিনাসর্তে এবং সামগ্রিকভাবে আংশিকভাবে নহে—ইতালির আত্মসমর্পণ আবশ্যক।"

ভাওয়াল মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাণী বিভাবতী দেবী প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার যে আবেদন করিয়াছেন, অদ্য প্রিভি কাউন্সিলে তাহার শুনানী হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সোমবারের অধিবেশনে অনেক সদস্য কলিকাতার রাস্তা হইতে দ্রুত মৃতদেহ অপসারণের কর্তব্যের প্রতি কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত কৃষ্ণমাচারীর রাজনৈতিক বন্দী সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং শ্রীযুত দেশমুখের সংশোধন প্রস্তাব ৪১-৩৮ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

২৮শে জুলাই

মাদ্রিদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদের উল্লেখ করিয়া মরক্কো বেতারে জানান হইয়াছে যে, ইতালীয়ান গভর্নমেণ্টের পক্ষে মধ্যস্থ হিসাবে পোপ মার্কিন রাষ্ট্র প্রতিনিধির নিকট মিত্রপক্ষের যুদ্ধ বিরতির সর্ত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ইতালি হইতে সুইস টেলিগ্রাফ এজেন্সীর সংবাদদাতা প্রেরিত এক সংবাদে জানা যায় যে, প্রধান মন্ত্রী বাদোলিও মিত্রপক্ষের সহিত যুদ্ধ বিরতির সর্ত সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। ভাটিকানের বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধিদের সহিত নাকি ইতালীয়ান কর্তৃপক্ষের এই আলোচনা চলিতেছে।

ইতালীয়ান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ যে, নব গঠিত ইতালীয়ান মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে ফ্যাসিস্ত পার্টির বিলোপ সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হরিজনদের পূর্ণ সামাজিক ও নাগরিক অধিকার দাবী করিয়া একটি বিল উত্থাপন করেন। বিলে এই কথাও বলা হয় যে, অনগ্রসর শ্রেণী, অনুন্নত শ্রেণী, অস্পৃশ্য, হরিজন এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় প্রভৃতি বৈষম্যমূলক কথাগুলি তুলিয়া দেওয়া উচিত।

ময়মনসিংহের এক সংবাদে প্রকাশ, গত রবিবার রাত্রে শহরে কমরেড ফণী চক্রবর্তী তাঁহার বাড়ির সম্মুখে কয়েকজন লোক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গুরুতররূপে জখম হন। গত মঙ্গলবার তিনি হাসপাতালে মারা গিয়াছেন।

২৯শে জুলাই

জার্মান বেতারে বলা হয় যে, মার্শাল বাদোলিওর অধীন নূতন ইতালীয় মন্ত্রিসভার আগামী বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, ইতালির বৈদেশিক নীতি অপরিবর্তিত রহিবে। 'ট্রিবিউন দা জেনেভা' পত্রের রোমস্থ সংবাদদাতার বিবরণে প্রকাশ, নূতন ইতালীয় গভর্নমেণ্ট "জার্মানির সহিত সন্তোষজনক সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য মুসোলিনীর গভর্নমেণ্টের ন্যায় আগ্রহশীল।"

৩০শে জুলাই

অবস্থার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঙলার গভর্নর এক অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে দেশের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে মিঃ ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ছাত্রদের এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন যে, কলিকাতার মধ্যবিত্ত দুঃস্থ পরিবারসমূহকে অল্প মূল্যে অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে কলিকাতাস্থ অবাঙালী বণিকদের সহযোগে একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কলিকাতার দুঃস্থ পরিবারভুক্ত ৫৫,০০০ লোককে অল্প দামে চাউল আটা প্রভৃতি সরবরাহ করা হইবে। ডাঃ মুখার্জি ইহাও জানান যে, নিরন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে আহার্য দিবার জন্য বে-সরকারী ভাবে ইতিমধ্যেই কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। দৈনিক ৩২০০০ নিরন্নকে খাদ্যদানের নিমিত্ত কলিকাতায় ৮ হইতে ১০টি লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বরিশালের সংবাদে প্রকাশ, উজিরপুর থানার অন্তর্গত দত্তসার গ্রামে একদল ডাকাতের সহিত একদল পুলিশের ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই সংঘর্ষের ফলে একজন দারোগা ও আর একজন সহকারী দারোগা আহত হন।

৩১শে জুলাই

মুসোলিনী এবং ইতালির কোন ফ্যাসিস্ট নেতা বা যুদ্ধ সম্পর্কে অপরাধী ব্যক্তি নিরপেক্ষ দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, এই সম্ভাবনায় তুর্কী ও সুইডিস গভর্নমেণ্টের নিকট তাঁহাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রদূত মারফৎ সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট পত্রযোগে এই মর্মে এক অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন এই শ্রেণীর লোকদিগকে আশ্রয় না দেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও নিরপেক্ষ দেশসমূহের গভর্নমেণ্টদিগকে অনুরূপ মর্মে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

মার্কিন বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জেনারেল জিরো সমগ্র ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। জেনারেল দ্য গল জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি ডি সাভারকর সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, দীর্ঘ ছয় বৎসর এই পদের গুরুকর্তব্যভার বহন করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি অতঃপর সাধারণ কর্মী হিসাবেই হিন্দু মহাসভার আদর্শ অনুসারে কার্য করিবেন।

১লা আগস্ট

স্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, সিনর মুসোলিনী, ইতালীয়ান সেনাপতিমণ্ডলীর প্রাক্তন প্রধান কর্তা জেনারেল উগো ক্যাভেলেরো এবং ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার জেনারেল গালিয়াট্টিকে রাচ দুর্গে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, সিনর মুসোলিনীর পত্নী ডন রাসেল, তাঁহার ভিটোরিও, তাঁহার পুত্র ব্রুনোর বিধবা, তাঁহার কন্যা এডা ও এডার স্বামী কাউণ্ট সিয়ানো অন্যান্য সমস্ত আত্মীয়-স্বজনবর্গসহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

আলজিয়ার্স রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, মার্শাল বাদোলিও জার্মান সেনাদের সিসিলি ত্যাগের সুবিধা করিয়া দিতেছেন।

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, লণ্ডন হইতে প্রেরিত 'রেড স্টার' পত্রিকায় বলা হইয়াছে:—জার্মানরা ভোরোশিলভগ্রাদের ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মায়াস নদীর সোভিয়েট সেতুমুখ দখল করার অভিপ্রায় করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। জার্মানদের আক্রমণের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্মানরা সোভিয়েট ব্যূহের অনেক স্থানে যুগপৎ আক্রমণ চালায় এবং তাহারা পানংসার বাহিনীর দুইটি পুরা ডিভিসন নিয়োগ করে। অর্ধ-অবরুদ্ধ ওরেল নগরীর উত্তর ও দক্ষিণে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে, তৎসত্ত্বেও সোভিয়েট বাহিনী গতকল্য ওরেলের দক্ষিণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিয়াছে।

২রা আগস্ট

সিসিলির উত্তর-পূর্ব উপকূলে জার্মান-অধিকৃত নয়টি গুরুত্বপূর্ণ শহর আমেরিকান সৈন্যেরা দখল করিয়া লইয়াছে।

চীনা প্রেসিডেণ্ট ডাঃ লিন সেন অদ্য মারা গিয়াছেন। জেনারেল চিয়াং কাইসেক চীনের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে শ্রীযুত পি এন সপ্রুর একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কনরান স্মিথ বলেন যে, মিঃ গান্ধী যতদিন বিধিনিষেধের গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে যে সমস্ত পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত পত্রের প্রকৃতি অথবা বিষয়বস্তু প্রকাশ করিতে রাজী হইবেন না।

হয়ে উঠত তার পায়ের ধ্বনিতে। বৃদ্ধা সস্নেহে অনুযোগ করত—আস্তে চ, ও তুলসী। মাকে ত খেয়েছিস বাপু, আমাকেও খাবি এবার!

মুস্কিলে পড়ল পঞ্চু। তার কর্মনিবন্ধ জীবন নিশ্চল প্রস্তরখণ্ডের মত অবহেলায় পড়ে রইল গোয়ালাপাড়ার এক প্রান্তে। ছিদু প্রভৃতি হিতৈষীরা পরামর্শ দিল, চৌধুরীবাবুর ছোট ছেলের হাতে পায়ে ধরগে না। বাবু সভায় বক্তিতে দেয়, দয়া-মায়া আছে বাবুর শরীরে।

পঞ্চু তুবড়ীর মত ফেটে পড়ল,—ওদের কথা তোরা আর কখনও বলিস নে আমার কাছে। খুনোখুনি হয়ে যাবে। ছোট ছেলেকে আমার চেয়ে তোরা বেশী জানিস? সেবার দোলের সময় বাবুর গায়ে সাহস করে একটু আবীর দিলাম। বাবু চটে লাল। বললো, তোর আস্পদ্দা ত কম নয়! চাকর হয়ে তুই আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করিস? তোদের ভাবতে হবে না আমার জন্যে। হাত পা রয়েছে, খেটে খাব আমি।

ছিদুরা পঞ্চুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিছু দিন পরে দেখা গেল, পঞ্চুর সদম্ভ উক্তি মৌখিক আস্ফালনেরই নামান্তর। মাত্র সেদিনকার কর্মকুশলী পঞ্চু স্বপ্নবিলাসী পতঙ্গের মত কিসের নেশায় অচল হয়ে গেল।

ছিদু একদিন এসে ডাক দিল, মাঠে যাবে না হে। চল আমার গরুক'টা নিয়ে চল।

এবার পঞ্চু রীতিমত রেগে গেল, তোমার গরুর ধড়ে কি আর জীয়োন আছে হে। শুঁটকো হাড় বের করা গরু দেখলেই আমার গা কেমন করে। আমার চারটে গরু তোমার পঁচিশটার সমান।

অভিমানে ছিদুর চোখ জলে ভরে এল। সে চিরদিনই শান্ত। কারও সঙ্গে ঝগড়া করা তার প্রকৃতির বাইরে। পঞ্চুকে সে একদিনও জানায় নি তার উদারতার কাহিনী—পঞ্চুদের সংসার চলার ইতিহাস। ছিদু নিঃশব্দে মাঠের দিকে পা বাড়াল। রেল লাইনের নীচে তৃণবিরল পতিত জমি। অকরুণ চেহারা, সজীব শ্যামলতার লেশ-মাত্র সেখানে দেখা যায় না। তবু তার একটা মোহ, একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে মানুষ ও পশুর কাছে সমানভাবে। দুপুর-বেলা মাঠের প্রতি ধূলিকণা গোয়ালাপাড়ার জীবগোষ্ঠির কাছে পরম পবিত্র হয়ে ওঠে।

পঞ্চুর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। চৌধুরীরা তার গরু নিয়ে গেলেও মাঠের মায়া তার কিছুমাত্র কমেনি। তালপাতার ছাতা মাথায় রাখালের দল গরু চরায়। গল্প করে আপন মনে। গরুর পাল মাঠের আনাচে কানাচে বৃথা খুঁজে ফেরে ঘাসের সন্ধানে। মাঠের বুকের ওপর খাড়া উঠে গেছে রেলের লাইন। দুপাশে খড়ের বন, কাশফুলে সাদা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে বাঘের বাচ্চা দু'একটা বেরিয়ে এসে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে। গরুর পাল ভয়ে ঘেঁসে না সেদিকে।

মাঠ ছেড়ে একটু দূরে রেলের সাঁকোটার ওপর পঞ্চু রোজ বসে। হাতে থাকে ঠাকুর্দার আমলের লাঠি। তেলে রোদে কাঁচা হলুদের রং ফুটে উঠেছে তার গায়ে, গাঁটে গাঁটে পিতলের ঝনঝনা বাজে। পঞ্চু ভাবে, চৌধুরীরা আর একদিন বেড়াতে আসে না এখানে? বাঘের বাচ্চা ত রোজই দেখা যায়। তার বাপের বীরত্বের পুনরভিনয় করে গরুক'টা উদ্ধারের পথ সে সুগম করে তোলে। নিজের পেশীস্ফীত হাত দুখানা ঘোরায় সে আপন মনে। অসহায় চৌধুরীর কাল্পনিক দুর্দশায় চোখে তার আশার আলোক ফুটে ওঠে।

ছেলের কাণ্ড দেখে পঞ্চুর মা বিরক্ত হয়ে উঠল। গোয়ালার ছেলে গরুর শোকে এত চঞ্চল হয়ে ওঠে, এ ধারণা ছিল বুড়ীর কল্পনার বাইরে। পঞ্চুকে ডেকে একদিন সে বললো,—ছিদুর কথা শুনলে কি অপমান হত তোর? কি আর বলেছে তোকে? ওর গরু ক'টা মাঠে নিয়ে যেতে।

পঞ্চু বললো,—সে আমাকে দিয়ে হবে না মা। মাঠের দিকে তাকালেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ছিদুর গরু হারিয়ে গেলে ও আমাকে দুষবে।

—ত তুই একবার চৌধুরী বাড়ি যা না বাপু। কাল সকালে চ না আমাদের সঙ্গে।

—ও কথাটা বলো না মা। ও বাড়ির ছায়া আর মাড়াচ্ছি নে। বড়লোক বলে কি আমাদের এমনি করে সর্বনাশ করতে হয়!

—তবে কি গরু ক'টা খালাস হবে না? চিরটা কাল থাকবে চৌধুরীদের খোঁয়াড়ে? আহা, চারটে গরুতে দুধ দিচ্ছিল প্রায় দশ সের। আমার মা-মরা মেয়েটা এক ফোঁটা দুধ পাচ্ছে না, আর চৌধুরী বুড়োর কুড়ি বছরের ধাড়ী নাতনীটা দেখি সেদিন দুধ খাচ্ছে এক গেলাস।

পঞ্চু এতটা ভেবে দেখে নি। তার বরাবরই একটা ধারণা ছিল,—চৌধুরীরা গরু খালাস করে দেবে একদিন। আজ বুড়ীর তীক্ষ্ন মন্তব্য তার মনে আঘাতের মত বাজল। সে আশ্চর্য হয়ে গেল এই ভেবে যে, মন তার অকারণে কর্মবিমুখ হয়ে উঠেছে। সুকঠিন বাস্তব সত্য প্রসারিত রয়েছে তার সম্মুখে, উদ্ভট কল্পনার রঙীণ নেশায় তার বিহ্বল হওয়া উচিত নয়। অনেকদিন পরে সে তুলসীকে পিতৃস্নেহের মাপকাঠি দিয়ে দেখল ভাল করে। রোগা হওয়ারও একটা সীমা আছে, তুলসী যেন সে সীমারও বাইরে গেছে। বুড়ীর চেহারায়ও অনেক পরিবর্তন এসেছে। চোখের দৃষ্টি হয়েছে আরও ঘোলাটে, সারা মুখে একটা পরম ঔদাসীন্যের ভাব।

পঞ্চু ঠিক করল, ছিদুর গরুর ভার সে নেবে। ছিদু চল্লিশটা গরু ও আটটা মোষের মালিক। মাথা পিছু দু'আনা মজুরী দেবে ছিদু। চার মাস কাজ করলেই চৌধুরীর দেনা শোধ হয়ে যাবে।

সন্দেহের সুরে বুড়ী বললো,—ছিদুকে বলবো তা হলে?

—বলতে পার। তবে চার মাসের কড়ারে কাজ ঠিক করে এস। ছিদুর গরু দেখলে আমার বমি আসে। রোঁয়াওঠা খসখসে গা, গোবরমাখা সরু লেজ। ও আমি বেশীদিন চরাতে পারব না।

শিথিল উদ্যমকে সংযত করে পঞ্চু কাজ আরম্ভ করে দিল। কিন্তু মনের রশ্মি তার আলগা হয়ে গেছে। অনুভূতির সে তীব্র বেদনা আর নেই। গানের মাঝখানে যেন হঠাৎ তাল কেটে গেছে। ছিদুর গরু দু'একটা প্রায়ই পাউণ্ডে যেতে লাগল।

মাঠে গরু চরে। পঞ্চু তাকিয়ে থাকে রেলের সাঁকোটার দিকে। সাঁকোটা যেন তার পর হয়ে গেছে। মধ্যাহ্ন সূর্যকরে আতপ্ত রেল লাইনটা যেন তাকে বিদ্রূপ করে। পঞ্চুর সারা দেহমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বৈকালের ছায়া নামবে এখনি মাটির বুকে। চৌধুরী আসবে বেড়াতে পশ্চিমা দরোয়ান নিয়ে। বাঘের মুখ থেকে তাকে বাঁচাবে কে? পঞ্চুর মনে হয়, তার পিতার ইঙ্গিত যেন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে।

ছিদু একদিন অনুযোগ করল। বললো,—গরু ত রোজই দুটো একটা পণ্ডে যাচ্ছে। ছাড়িয়ে আনতে টাকা লাগে ত!

লজ্জিতমুখে পঞ্চু বললো—কি জান ছিদুদা, মনটা কিছুতেই বশে আনতে পাচ্ছিনে। জান ত, আমার চার চারটে গরু, দশ সের দুধ হ'ত, চৌধুরী বাড়ির পেট ভরাচ্ছে। আর আমার ঘরে এক ফোঁটা দুধ নেই। তুলসীর চেহারাটা দেখছ ত?

সেদিন পঞ্চু ঘরে ফিরতে বুড়ী বললো,—এই দ্যাখ্, ছিদুর কাণ্ডটা দ্যাখ না। এক ঘটি দুধ পাঠিয়ে দিয়েছে তুলসীর জন্যে!

বর্ষার বৃষ্টি কদিন থেকে খুব জোর নেমেছে। শহরের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনেও লেগেছে বর্ষণের ঘোর। বড় রাস্তার দুধারে বড় বাড়িগুলি নিঃসাড়ে অপেক্ষা করছে বর্ষণক্ষান্তির জন্য। বাড়ির

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৭শে জুলাই

সুইস বেতারে বলা হইয়াছে যে, মুসোলিনী স্পেনে উপনীত হইয়াছেন। সেখানে ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

আলজিয়ার্সের সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল বাদোলিও যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস হইতে ২২ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্যকে ইতালিতে প্রত্যাবর্তন করিবার আদেশ দিয়াছেন। তিনি নাকি ফ্রান্স হইতেও তিন চারি ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য সরাইয়া আনিতেছেন।

ইউরোপ হইতে জনৈক বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন:—প্রাপ্ত বিবরণ সমর্থিত না হইলেও যাহারা সম্প্রতি ইতালি হইতে আসিতেছে তাহারা বলিতেছে যে, প্রচুর সংখ্যক জার্মান সৈন্য ব্রেনার গিরিপথ দিয়া উত্তর ইতালিতে প্রবেশ করিয়াছে।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, একদল সোভিয়েট সৈন্য ওরেলের সরাসরি ১৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব ইরোভাকিনা শহরে পৌঁছিয়াছে। অপর একদল রুশ সৈন্য ওরেলের ২১ মাইল দূরে কস্তেলনোভো শহরে পৌঁছিয়াছে। আরও একদল সোভিয়েট সৈন্য কুরস্ক-ওরেল রাস্তা বরাবর ৬ মাইল অগ্রসর হইয়া নোমোভেস্কায় পৌঁছিয়াছে।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল কমন্স সভায় ইতালি সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলেন, "আমাদের প্রধান শত্রু জার্মানি, ইতালি নহে—জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে সকল অত্যাবশ্যক সুযোগ সুবিধা আমাদের আবশ্যক তাহাই ইতালির নিকট আমরা চাই। ইতালির স্বার্থের দিক হইতে এবং মিত্রপক্ষেরও স্বার্থের দিক হইতে বিনাসর্তে এবং সামগ্রিকভাবে আংশিকভাবে নহে—ইতালির আত্মসমর্পণ আবশ্যক।"

৫ ওয়াদের মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বন্দী বিভাবতী দেবী প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার যে আবেদন করিয়াছেন, অদ্য প্রিভি কাউন্সিলে তাহার শুনানী হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেমবারের অধিবেশনে জনৈক সদস্য কলিকাতার রাস্তা হইতে দ্রুত মৃতদেহ অপসারণের কর্তব্যের প্রতি কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত কৃষ্ণমাচারীর রাজনৈতিক বন্দী সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং শ্রীযুত দেশমুখের সংশোধন প্রস্তাব ৪১-৩৮ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

২৮শে জুলাই

মাদ্রিদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদের উল্লেখ করিয়া মরক্কো বেতারে জানান হইয়াছে যে, ইতালীয়ান গভর্নমেণ্টের পক্ষে মধ্যস্থ হিসাবে পোপ মার্কিন রাষ্ট্র প্রতিনিধির নিকট মিত্রপক্ষের যুদ্ধ বিরতির সর্ত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ইতালি হইতে সুইস টেলিগ্রাফ এজেন্সীর সংবাদদাতা প্রেরিত এক সংবাদে জানা যায় যে, প্রধান মন্ত্রী বাদোলিও মিত্রপক্ষের সহিত যুদ্ধ বিরতির সর্ত সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। ভাটিকানের বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধিদের সহিত নাকি ইতালীয়ান কর্তৃপক্ষের এই আলোচনা চলিতেছে।

ইতালীয়ান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ যে, নব গঠিত ইতালীয়ান মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে ফ্যাসিস্ত পার্টির বিলোপ সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হরিজনদের পূর্ণ সামাজিক ও নাগরিক অধিকার দাবী করিয়া একটি বিল উত্থাপন করেন। বিলে এই কথাও বলা হয় যে, অনগ্রসর শ্রেণী, অনুন্নত শ্রেণী, অস্পৃশ্য, হরিজন এবং তপশীলিভুক্ত সম্প্রদায় প্রভৃতি বৈষম্যমূলক কথাগুলি তুলিয়া দেওয়া উচিত।

ময়মনসিংহের এক সংবাদে প্রকাশ, গত রবিবার রাত্রে শহরে কমরেড ফণী চক্রবর্তী তাঁহার বাড়ির সম্মুখে কয়েকজন লোক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গুরুতররূপে জখম হন। গত মঙ্গলবার তিনি হাসপাতালে মারা গিয়াছেন।

২৯শে জুলাই

জার্মান বেতারে বলা হয় যে, মার্শাল বাদোলিওর অধীন নূতন ইতালীয় মন্ত্রিসভার অদ্যকার বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, ইতালির বৈদেশিক নীতি অপরিবর্তিত রহিবে। 'ট্রিবিউন দ্য জেনেভা' পত্রের রোমস্থ সংবাদদাতার বিবরণে প্রকাশ, নূতন ইতালীয় গভর্নমেণ্ট "জার্মানির সহিত সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য মুসোলিনীর গভর্নমেণ্টের ন্যায় আগ্রহশীল।"

৩০শে জুলাই

ভবঘুরে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঙলার গভর্নর এক অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে দেশের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে মিঃ ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ছাত্রদের এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন যে, কলিকাতার মধ্যবিত্ত দুঃস্থ পরিবারসমূহকে অল্প মূল্যে অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে বাঙলার স্বেচ্ছাসেবী দলগুলির সহায়তায় একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কলিকাতায় দুঃস্থ পরিবারভুক্ত ৫৫,০০০ লোককে অল্প দামে চাউল আটা প্রভৃতি সরবরাহ করা হইবে। ডাঃ মুখার্জি ইহাও জানান যে, নিরন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে আহার্য দিবার জন্য বে-সরকারী ভাবে ইতিমধ্যেই কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। দৈনিক ৩২,০০০ নিরন্নকে খাদ্যদানের নিমিত্ত কলিকাতায় ৮ হইতে ১০টি লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বরিশালের সংবাদে প্রকাশ, উজিরপুর থানার অন্তর্গত দত্তসার গ্রামে একদল ডাকতের সহিত একদল পুলিশের ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই সংঘর্ষের ফলে একজন দারোগা ও আর একজন সহকারী দারোগা আহত হন।

৩১শে জুলাই

মুসোলিনী এবং ইতালির কোন ফ্যাসিস্ট নেতা বা যুদ্ধ সম্পর্কে অপরাধী ব্যক্তি নিরপেক্ষ দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, এই সম্ভাবনায় তুরস্ক ও সুইডিস গভর্নমেণ্টের নিকট তাঁহাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রদূত মারফৎ সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট পত্রযোগে এই মর্মে এক অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন এই শ্রেণীর লোকদিগকে আশ্রয় না দেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও নিরপেক্ষ দেশসমূহের গভর্নমেণ্টদিগকে অনুরূপ মর্মে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

মার্কিন বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জেনারেল জিরো সমগ্র ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। জেনারেল দ্য গল জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি ডি সাভারকর সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, দীর্ঘ ছয় বৎসর এই পদের গুরুকর্তব্যভার বহন করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি অতঃপর সাধারণ কর্মী হিসাবেই হিন্দু মহাসভার আদর্শ অনুসারে কার্য করিবেন।

১লা আগষ্ট

স্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, সিনর মুসোলিনী, ইতালীয়ান সেনাপতিমণ্ডলীর প্রাক্তন প্রধান কর্তা জেনারেল উগো কাভেলেরো এবং ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার জেনারেল গালিয়ার্ট্টিকে রাচ দুর্গে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, সিনর মুসোলিনীর পত্নী ডন রাসেল, তাঁহার ভিটোরিও, তাঁহার পুত্র ব্রুনোর বিধবা, তাঁহার কন্যা এডা ও এডার স্বামী কাউণ্ট সিয়ানো অন্যান্য সমস্ত আত্মীয়-স্বজনবর্গসহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

আলজিয়ার্স রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, মার্শাল বাদোলিও জার্মান সৈন্যদের সিসিলি ত্যাগের সুবিধা করিয়া দিতেছেন।

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত খবর দ্বারা পত্রিকায় বলা হইয়াছে:—জার্মানরা ভরোশিলভগ্রাদের ৫০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে মিয়াস নদীর সোভিয়েট সেতুমুখ দখল করার অভিপ্রায় করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। জার্মানদের আক্রমণের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্মানরা সোভিয়েট ব্যূহের অনেক স্থানে পুনঃপুনঃ আক্রমণ চালায় এবং তাহারা পদাতিক বাহিনীর দুইটি পূর্ণ ডিভিসন নিয়োগ করে। অর্ধ-অবরুদ্ধ ওরেল নগরীর উত্তর ও দক্ষিণে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে, তৎসত্ত্বেও সোভিয়েট বাহিনী গতকল্য ওরেলের দক্ষিণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিয়াছে।

২রা আগষ্ট

সিসিলির উত্তর-পূর্ব উপকূলে জার্মান-অধিকৃত নাটি গুরুত্বপূর্ণ শহর আমেরিকান সৈন্যেরা দখল করিয়া লইয়াছে।

চীনা প্রেসিডেণ্ট ডাঃ লিন সেন অদ্য মারা গিয়াছেন। জেনারেল চিয়াং কাইসেক চীনের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে শ্রীযুত পি এন সপ্রুর একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কনরান স্মিথ বলেন যে, মিঃ গান্ধী যতদিন বিধিনিষেধের গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে যে সমস্ত পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত পত্রের প্রকৃতি অথবা বিষয়বস্তু প্রকাশ করিতে রাজী হইবেন না।

পুস্তক পরিচয়

রংমশাল—ছেলেমেয়েদের **সচিত্র** মাসিক পত্রিকা: রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা (শ্রাবন); মূল্য আট আনা। সম্পাদক—হেমেন্দ্রকুমার রায়: পরিচালক—অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন। বার্ষিক চাঁদা ৩৲ ষান্মাসিক ১৷৷০: প্রধান কার্যালয়—৯১।৯১-এ, টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা।

রংমশালের এই রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যাটি বাংলার শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করিবে। এই সংখ্যাটির প্রথমেই উল্লেখ করিবার মত ইহার চমৎকার কভার-ডিজাইনের পরিকল্পনাটি। মাল্যভূষিত চন্দন-চর্চিত বিশ্বকবির প্রতিকৃতিটি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বহু চিত্র বৈচিত্রে, নানা মধুর রচনা-সম্ভারে এই সংখ্যাটি সমুজ্জ্বল হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, অমিয় চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুধীর খাস্তগীর, কেশব গুপ্ত, নরেশ চক্রবর্তী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, চিত্রিতা গুপ্তা, জ্যোতিষ ঘোষ, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যার কয়েকটি নূতনত্ব দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তাহার মধ্যে, রংমশাল শিশু-সাহিত্য আসরের শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ বাঙলার শিশু-কিশোর মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের প্রশস্তি দ্রষ্টব্য। ইন্দিরা দেবী, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র দেব, প্রভাত-কিরণ বসু, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজন গঙ্গোপাধ্যায়, 'বাগবান', 'আতসবাজ', 'ভোলাদা' প্রভৃতির রচনা এই বিভাগে আছে। তাহাছাড়া, 'রংমশাল চয়নিকা'য় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা এবং দিদিভাই পরিচালিত 'চিঠির বাক্স'র পত্রগুচ্ছ কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ দিবে। কৃষ্ণদয়াল বসু, সুনির্মল বসু, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, মৈত্রেয়ী দেবী প্রভৃতি চিঠির বাক্সে পত্রাকারে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু না কিছু লিখিয়াছেন। রংমশালের এই রবীন্দ্র সংখ্যাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমরা রংমশাল কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাই যে, তাঁহারা কবিগুরুর প্রতি শিশু-কিশোর পক্ষ থেকে শুধু শ্রদ্ধা জানানি, তাঁহারা তৎ-সংগে বাঙলার শিশু-কিশোর সাহিত্যে একটি অনবদ্য উপহার দিয়া তাঁহার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

বিপিন-বিলাস, যমুনা-বিলাস, মাতৃ-মিলন বা সন্ন্যাস-বিলাস: কবিরাজ শ্রীতারকেশ্বর সেন শাস্ত্রী কর্তৃক প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া শ্রীযুক্ত কেশবলাল চক্রবর্তী, খুলনা বার লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথমোক্ত পুস্তকখানি একখানা ভক্তি ও প্রেমোদ্দীপক কীর্তন নাটিকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থের কথাগুলি পালা কীর্তন এবং অপেরা কীর্তন। মূল্য যথাক্রমে আট আনা, বার আনা এবং দশ আনা।

উক্ত গ্রন্থকার একজন ভক্ত। গৌরাঙ্গ লীলা অবলম্বন করিয়া এই নাটক এবং পালা গানগুলি লিখিত হইয়াছে। তাঁহার রসানুভূতি আছে; কীর্তনের আখরগুলির আলঙ্কারিকতায় সে পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্তিরসপিপাসু ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থগুলি পাঠে আনন্দ পাইবেন।

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ]   শনিবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৫০ সাল।   Saturday, 14th August, 1943.   [৪০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

অধিকতর দুর্দিন

কলিকাতা এবং শহরতলীর মজুত-বিরোধী অভিযান শেষ হইয়াছে। লোক-জনের এবং মজুত শস্যের মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া ছাড়া এই অভিযানের ফলে বাঙলার খাদ্যাভাব সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের যে বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে শহরেও খাদ্যদ্রব্য মজুত ছিল না। ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাহাদের ছিল তাহারাও সম্ভবতঃ মজুত মাল সরাইবার বন্দোবস্ত করিবার সুবিধা লাভ করিয়াছিল; কারণ গ্রামের সাধারণ লোকদের মত কলিকাতা শহরের এই সব মজুতদার আইন কানুনের মারপ্যাঁচ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নয় এবং আইনকে ফাঁকি দিবার সুযোগ সুবিধা করিবার মত অর্থবল ও বুদ্ধিবল উভয়ই তাহাদের আছে; সুতরাং সেদিক হইতে এই অভিযানের সম্বন্ধে আমরা কোন আশা পোষণ করি নাই। বাঙলা দেশে খাদ্যের অভাব পুরাপুরি রকমে ঘটিয়াছে। এই সোজা সত্যকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে এবং বাহির হইতে খাদ্য শস্য আমদানী করিয়া সে অভাব পূরণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বর্তমান সমস্যা সমাধানের অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বাঙলার অসামরিক খাদ্য সরবরাহ বিভাগের সচিব মিঃ সুরাবর্দী গত ৮ই আগস্ট কলিকাতার একটি অনুষ্ঠানে বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই বক্তৃতায় আশার আভাস আমরা কিছুই পাই নাই, পক্ষান্তরে কিছুদিন হইতে তাঁহার উক্তির ভিতর দিয়া নৈরাশ্যের সুর যেভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, সেদিনকার বক্তৃতায় তাহাই সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। দরিদ্রের অন্ন সংস্থানের নিমিত্ত দেশ-বাসীকে মুক্ত হস্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়া খাদ্য সচিব মিঃ সুরাবর্দী বলিয়া-ছেন যে, বাঙলা দেশের সর্বত্র দুর্দশা অতি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে এবং আগামী সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সে দুর্দশা অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করিবে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, সমগ্রভাবে বাঙলা দেশ আজ নিরন্নের দেশ হইয়া পড়িয়াছে; মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশেষ সৌভাগ্যবান ছাড়া বাঙালী জাতি আজ প্রায় ভিখারীর জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইহারও পর দুর্দশা আরও তীব্র আকার ধারণ করিলে দেশের অবস্থা কি দাঁড়াইবে ভাবিতেও আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। খাদ্য সচিব অন্ন সত্রসমূহ খুলিয়া সেবাব্রতে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া-ছেন। যাঁহারা উদার প্রাণ ব্যক্তি তাঁহারা এ বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন না, এ আশা আমাদের আছে। এ দেশের যুবকদের হৃদয়বত্তা সম্বন্ধেও আমরা অত্যধিক আশাশীল; কিন্তু এইভাবে ভিক্ষুককে অন্নদানের পথে একটা জাতির সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। প্রয়োজন সাধারণভাবে খাদ্য শস্যের মূল্য যাহাতে হ্রাস পায় এইরূপ ব্যবস্থা করা; কিন্তু খাদ্য সচিব সে সম্বন্ধে কোন ভরসাই দিতে পারেন নাই। তিনি চাউল কম খাইবার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়াছেন; কিন্তু সে স্থলে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, চাউলের অভাবটা পূরণ হইবে কিসের দ্বারা, যদি সস্তায় অন্য খাদ্য মিলে তবে পেটের দায়ে লোকে সে ব্যবস্থা করিয়া লইবেই। চাউল কম খাও; আটা ময়দা মিলে না। খাদ্য সচিব গম, বাজরা, বাদাম, জোয়ার চাউলের বদলে এইগুলি ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন; কুমড়া ও সকরকন্দ আলু প্রচুর পরিমাণে খাদ্য স্বরূপে গ্রহণ করিয়া সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, বলিতেছেন। খাদ্য সচিব চাউলের পরিবর্তে যে সব শস্য ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন, সেগুলি বাঙলা দেশে প্রচুর

পরিমাণে উৎপন্ন হয় না এবং মফঃস্বলে দূরের কথা, এই কলিকাতা শহরেও গমেরই মত জোয়ার, বাজরা এবং চীনা বাদামও দুর্মূল্য। কুমড়া এবং সকরকন্দ আলু বা লাল আলু বাঙলা দেশে উৎপন্ন হয় সত্য; কিন্তু ইতিমধ্যেই মফঃস্বলেও সেগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। লোকে যদি কুমড়া এবং লাল আলুকে প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে থাকে, তবে কয়েকদিনের মধ্যেই বাঙলা দেশে সেগুলি দুর্লভ বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং যেদিক দিয়াই বিচার করা হউক না কেন, বাঙলা দেশে খাদ্য সমস্যা যেরূপ উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে, বাহির হইতে খাদ্য শস্য আমদানী করিতে না পারিলে এ সমস্যার কিছুতেই প্রতীকার হইবে না। ফলে দেশের দুর্দশা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিবে এবং একটা সমগ্র দেশের আর্থিক এই সমস্যা যুদ্ধের সমস্যার চেয়ে কম নয়। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট এখনও এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্তব্যের গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতেছেন না। পরাধীন আমরা, ইহাই আমাদের বিধিলিপি।

ইউরোপের লড়াই

সম্মিলিত শক্তিবর্গের সৈন্যদল সত্বরই সিসিলি দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া ফেলিবে বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার পর খুব সম্ভব, খাস ইতালীর উপর অভিযান আরম্ভ হইবে; যে পর্যন্ত তাহা না হইতেছে সে পর্যন্ত ইউরোপের সামরিক পরিস্থিতির নূতন ধারাটা ঠিক স্পষ্ট হইয়া উঠিবে না। মুসোলিনীর বিদায় গ্রহণ করার ফলে সমরনীতির দিক হইতে ইতালীর মতিগতির বিশেষ কোন পরিবর্তন এ পর্যন্ত লক্ষিত হইতেছে না; পক্ষান্তরে মার্কিন সংবাদপত্রসমূহ ইতালীর বর্তমান রাষ্ট্র-নেতা মার্শাল বাদোগ্লিওকে দ্বিতীয় মুসোলিনী বলিয়া অভিহিত করিতেছে। রুশিয়ার দিকে ওরেল এবং বাইলগেরোড হইতে জার্মানদের পশ্চাদপসরণ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার; জার্মানদের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের ব্যর্থতাই ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে; ইহার পর শীতের ধাক্কায় তাহাদিগকে নীপার নদীর পশ্চিম পারে গিয়া হয়ত পড়িতে হইবে। ইতালী কিংবা বলকান অঞ্চলে কোন স্থানে সম্মিলিতপক্ষের আক্রমণের চাপ প্রবল হইলে রুশিয়া বেশী সুবিধা পাইবে। বলকানেই ইউরোপের সংগ্রামের চরম পরিণতি ঘটিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। দেখা যাইতেছে, রুশিয়াই প্রধানত যুদ্ধের গতি ঘুরাইয়া দিয়াছে। রুশিয়ার প্রতিরোধ-ক্ষমতা যদি এইরূপ সুদৃঢ় না হইত, তবে সম্মিলিত পক্ষের টিউনিস এবং সিসিলি অভিযানের সাফল্য এতটা সহজ হইত না। রণচাতুর্য এবং শৌর্য উভয় দিক হইতেই রুশিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের একান্ত সহযোগিতাই ইহার মূলে রহিয়াছে এবং দেশাত্মবোধের সূত্রেই যে সে সহযোগিতার এমন দৃঢ়তা, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। সমরনীতি সম্পর্কে ষ্ট্যালিন বস্তুতান্ত্রিকতা সহকারে দেশের স্বার্থ ওজন করিয়া কাজ করিতেছেন এবং আন্তর্জাতিক আদর্শকে যেখানে প্রয়োজন হইতেছে, বিনা দ্বিধায় বিসর্জন দিতেছেন। জাতীয়তা আগে; পরে আন্তর্জাতীয়তা—বর্তমান রুশিয়ার ইহাই সুস্পষ্ট নীতি।

বাঙলার সমস্যায় ভারত গবর্ণমেণ্ট

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কিত বিতর্ক হইয়া গেল। খাদ্যসচিব স্যার আজিজুল হক এই সমস্যা সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার কোন কোন অংশ ভারতের খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে ভারতসচিব মিঃ আমেরী যাহা বলিয়াছিলেন, সেইগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। স্যার আজিজুল তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—

"এ দেশে এখনও এমন সব লোক রহিয়াছে, যাহারা আমাদিগকে সাহায্য করে না। ইহারা নিজেদের হীন স্বার্থকেই বড় করিয়া বুঝে এবং কেবল নিজেদের লাভই খোঁজে। অপরের দুর্দশার সম্বন্ধে ইহারা উদাসীন। এই সব লোকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিমত ব্যক্ত হউক; এইসব মজুতদার ও লাভখোরদের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত হউক, ইহাই আমার অনুরোধ। আমার নিজের এবং আমার বিভাগের সম্বন্ধে আমি ইহাই বলিতে পারি যে, যাহাতে এই সব লোক নিস্তার না পায়, আমরা সর্বপ্রযত্নে তাহা করিব এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিবেন, আমার এমন আশা আছে।"

স্যার আজিজুল আরও বলিতেছেন,—

কৃষকগণ যদি বিপদের সময়ে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিবার জন্য কিছু মাল মজুত রাখে, অন্যান্য বৎসর তাহারা যেরূপ দারিদ্রের আহারে জীবন ধারণ করিত, যদি তাহার চেয়ে কিছু বেশী খায়, কিছু মাল যদি সঞ্চয়ের খাদে পড়ে, তবে তাহার ফলে বর্তমান অবস্থায় অকৃষক সম্প্রদায়ের খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে টানাটানির সৃষ্টি হয়।"

এই সব নামুলী কথা লইয়া বিচার করিবার সময় আমাদের নাই; কারণ মজুতদার বা লাভখোরগণই যদি যত অনিষ্টের গোড়া হয়, তবে সর্বশক্তিমান গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দমনে কৃতসংকল্প থাকা সত্ত্বেও তাহারা অদ্যাপি কেমন বজায় রাখিতেছে কেমন করিয়া; কৃষকদের ঘরে মাল মজুত রাখা এবং বেশী করিয়া খাওয়ার যুক্তি যে কত ভিত্তিহীন, বাঙলা দেশের মজুতবিরোধী অভিযানেই সে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বাঙলা দেশের বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার কি করিতেছেন? ইহার উত্তরে স্যার আজিজুল বলিতেছেন,—

"ঘাটতি প্রদেশগুলির অভাব মিটাইবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি; পাকা ব্যবস্থা করিতে কিছু সময় বেশী দরকার; আপাতত জরুরী সংকট কাটাইবার জন্য গভর্নমেণ্ট ব্যবস্থা করিতেছেন। রেলগাড়ির অসুবিধা দূর করিবার জন্য যুক্ত মেম্বর এবং ট্রান্সপোর্ট মেম্বর লাহোরে গিয়া সব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিল। ইহার পর জাহাজযোগে বাঙলা দেশে গম পাঠাইবার চেষ্টা করা গেল এবং সেজন্য দুইখানা জাহাজে গম ভর্তিও হইল; কিন্তু জাহাজ দুইখানা যখন ছাড়া হইবে সেই মুহূর্তে সেগুলির ইঞ্জিন বিগড়াইয়া গেল এবং এখন জাহাজ দুইখানা মেরামত করা হইতেছে। জাহাজ যোগাড় হইলে যাহাতে বাঙলা দেশে মাল পাঠান যায়, সেজন্য বর্তমানে ভারত গভর্নমেণ্ট ব্যবস্থা করিতেছেন।"

সুতরাং ভারত গবর্ণমেণ্টের দোষ নাই। দোষ আমাদের অদৃষ্টের। এতকাল পরে গম যোগাড় হইয়াছিল, জাহাজও মিলিয়াছিল, মালও জাহাজে উঠিয়াছিল; কিন্তু দামোদর প্রতিকূল হইল। সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি কোথায়? ইহার পর জাহাজ যোগাড় হইলে কিংবা গাড়ি মিলিলে সেগুলি বাঙলা দেশে না আসিয়া অন্য দেশে গিয়া না পড়ে আমাদের ইহাই হইতেছে ভাবনা। কারণ দেবতার যেখানে প্রতিকূলতা, সেখানে সকলই সম্ভব!

প্লাবনের পীড়ন

দামোদরের বন্যার জল সচরাচর দশ বার-দিনের মধ্যেই নামিয়া যায়; এবারেও সেইরূপ হইবে মনে করা গিয়াছিল; কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া উপর্যুপরি বারিপাত হইবার ফলে দামোদরের জল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বর্ধমানের এই বিপন্ন অঞ্চলের বহু লোক স্পেশাল ট্রেন ও এ আর পি লরীযোগে সরাইয়া আনিয়া বর্ধমানের আশ্রয়প্রার্থীদের শিবিরে রাখা হইয়াছে। গৃহহীন এবং সর্বপ্রকার সম্বলহীন এই সব বিপন্ন নরনারীর দলকে দেখিলে আত্মসম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাদের কতক লোক ইতিমধ্যেই কলিকাতা শহরে আসিয়া ভিক্ষুকের দলে যোগ দিয়াছে এবং অন্ন ভিক্ষার আর্ত নিবেদনে সমৃদ্ধিপূর্ণ শহরের বাতাস উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। মেদিনীপুরেরও ভীষণ অবস্থা। প্রকাশ, পাঁশকুড়ার কাছে কাঁসাই নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া

২৫০ খানি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। লোকে গাছের ডালে, ঘরের চালে উঠিয়া জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। ঐ সব স্থানে লোকে অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এ পর্যন্ত এই অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। ঘাটাল মহকুমার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। ইহা ছাড়া, মুর্শিদাবাদ ও ২৪ পরগণার কতকটা অঞ্চলের অধিবাসীরাও বন্যার ফলে দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। দেশব্যাপী অন্ন কষ্টের মধ্যে গৃহহীনদের এই দুর্দশা ভাষায় প্রকাশ করিবার বিষয় নয়। বিপন্নের এই বেদনা কি আমাদের অন্তরে এখনও মানবতার প্রেরণা জাগাইবে না?

এক বৎসর পর

সম্প্রতি প্রতিনিধি স্থানীয় একশত বৃটিশ মহিলা এবং পুরুষের স্বাক্ষরিত একখানা আবেদন পত্র ইংলণ্ডে প্রচার করা হইয়াছে। এই নিবেদন পত্রে বার্মিংহামের বিশপ, ব্রাড-ফোর্ডের বিশপ, ক্যান্টারবারীর ডিন, ওয়েস্টমিনিস্টারের আর্চ ডিকন, অধ্যাপক জোয়াড, অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রভৃতি স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই পত্রে বলা হইয়াছে,—"কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর এক বৎসর অতিবাহিত হইল। সহস্র সহস্র ভারতীয় নরনারী বর্তমানে কারারুদ্ধ বা বিনা বিচারে আটক রহিয়াছেন। এই এক বৎসরের মধ্যে রাজনীতিক অচল অবস্থার অবসান হয় নাই। তাহার ফলে ভারতের সর্বত্র অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে। এই অবস্থা বর্তমান থাকিলে ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্প্রীতি স্থাপনের পথ রুদ্ধ হইয়া পড়িবে। আমাদের বিশ্বাস, যাহাতে ভারত ও বৃটেন উভয়ের পক্ষে সম্মানজনক ও গ্রহণযোগ্য কোন মীমাংসা হয় তজ্জন্য বৃটিশ ও ভারতীয় নেতৃবর্গের বর্তমান অচল অবস্থা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে।"

কিন্তু কাহাদের কাছে এই আবেদন? বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডল অর্থাৎ চার্চিল-আমেরী দলের কাছেই যদি হয়, তবে, ইহার যে কোন মূল্য আছে আমরা তাহা মনে করি না; কারণ সেদিনও পার্লামেন্টের কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ সোর-সেনের প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব আমেরী সাহেব সোজা পথ বাৎলাইয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস নেতাদিগকে বাদ দিয়াই ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বন্দী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে অন্য দলের নেতাদিগকে দেখা সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবেই না, তাঁহাদের সঙ্গে পত্রালাপও নিষিদ্ধ। ভারতের জনমতের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের কর্মকর্তৃগণকে জেলে আটক রাখিয়া ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের জন্য যাহারা পথ নির্দেশ করেন, তাঁহাদের উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদমূলক মনোবৃত্তির পরিবর্তন ব্যতীত ভারতের রাজনীতিক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে। ভারতের প্রতি সদিচ্ছা সম্পন্ন ইংলণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদের শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে তেমন মনোভাব জাগাইবার মত প্রভাব প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবেন কি? মিঃ সোরসেনের ন্যায় ইংলণ্ডের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিও তেমন বিশ্বাস করেন না। সম্প্রতি তিনি 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অচল সমস্যার আলোচনা করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়াছেন। এই চিঠিতে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের যে সব ব্যক্তি স্বাধীনতা-প্রিয়, তাঁহাদের ভিতরে ও ভারতের এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য কার্যকর প্রতিবাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের তথাকথিত ভারত বন্ধুদের রাজনীতির এ রীতি আমাদের জানা আছে। ইংরেজ রাজনীতিকদের স্বাধীনতা-প্রিয়তা শুধু তাঁহাদের জাতিগোষ্ঠীরই জন্য; অপরের জন্য নয়; এরূপ অবস্থায় চার্চিল-আমেরী দলের মনোভাব পরিবর্তন করিবার জনমতের প্রভাব সেখানে জাগ্রত হইবে, এমন বিশ্বাস আমরা পোষণ করি না; আর সে প্রভাব যদি না জাগে, তবে এই ধরণের আবেদন নিবেদন নিরর্থক; কারণ সাম্রাজ্যবাদমূলক স্বার্থ যাহাদিগকে অন্ধ করিয়াছে, তাহাদের কাছে ন্যায় বা যুক্তির কোন মূল্যই নাই।

ভারতবাসীদের যোগ্যতা

সম্প্রতি লণ্ডন শহরে প্রত্নতাত্ত্বিকদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ স্যার লিওনার্ড উইলী এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতবর্ষের কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ ভারতবাসী-দের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, একথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছেন। ভারতবাসীরা এসব বিষয়ে এত অনভিজ্ঞ এবং আনাড়ি যে, তাহাদের দ্বারা এসব কাজ চালান ঠিক হইবে না। ইংরেজ-দের মধ্যে এ বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিত রহিয়াছেন, ভারতে যদি কোন প্রত্নতাত্ত্বিক এত ছোট রকমেও চালাইতেও হয়, তবে বিশেষজ্ঞ ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের দ্বারাই সেগুলি পরিচালিত হওয়া কর্তব্য। ইংরেজ পণ্ডিতদের অধীনে শিক্ষানবিসী করিলে কালক্রমে ভারতবাসীরা এক্ষেত্রে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। স্যার লিওনার্ড কৃপা করিয়া ভারতবাসীদিগকে যেটুকু সার্টিফিকেট দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ; সেই সঙ্গে এ সম্বন্ধে ভারতবাসীদের অজ্ঞতার জন্য বৃটিশ শাসকদের দায়িত্বের কথাটা তিনি যে উল্লেখ করিয়াছেন এজন্যও ভারতবাসীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে; কিন্তু এই সব ইংরেজ পণ্ডিত নিজে-দের গুরুগিরির মহিমা যদি একটু খাটো করিয়া কথা বলেন, তবেই ভাল হয়। ভাগ্যদোষে ভারতবাসীরা আজ না হয় পরাধীন হইয়াছে; কিন্তু এই পরাধীন ভারতেও এমন মানুষ এখনও জন্মে, যাঁহাদের অবদানকে আত্মসাৎ করিয়া কিংবা মূলত যাঁহাদের প্রত্নতাত্ত্বিক অবদানকে আশ্রয় করিয়াই তথাকথিত অনেক ওস্তাদ ইংরেজকে নাম জাহির করিতে হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখ করিতেছি। যে দেশে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় পুরুষের জন্ম হয় সে দেশের সম্বন্ধে কোন রকম মন্তব্য করিতে গেলে একটু মাত্রাজ্ঞান বজায় রাখিয়া কথা বলিলে তবে মানায়।

মাদ্রাজী রাজনীতিক

মাদ্রাজী রাজনীতির রীতিই এই যে, তাহা হাওয়াইয়ের মত জ্বলিয়া উঠে, আবার দেখিতে দেখিতে নীচে পড়িয়া নিভিয়া যায়। মিঃ রামনাথন্ মাদ্রাজের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী। তিনি সেদিন মাদ্রাজের এক যুব-সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস ব্যর্থ হইয়াছে। নহিলে কংগ্রেসের এমন দুর্বুদ্ধি হয়! ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস ভারতের স্বাধীনতা দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আসিলেন, আর কংগ্রেস নেতারা তাঁহাকে অপমানিত করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। এরূপ অবস্থায় মিঃ রামনাথনের যুক্তি এই যে, এখন নয়া নেতা চাই। তাঁহার মতে কংগ্রেসের দ্বারা আর কাজ চলিবে না। মিঃ রামনাথনের গুরু শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী মহাশয় তাঁহার এই শিষ্যটির জন্য এত চেষ্টা করিয়াও যখন একটা মন্ত্রিত্ব যোগাড় করিয়া দিতে পারিলেন না, তখন মিঃ রামনাথনের মনে, এরূপ বিক্ষোভ সৃষ্টি হইবারই কথা।



রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

- শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী -

আশ্রমের রোগীদের জন্য একটি ঔষধালয় ও হাসপাতাল ছিল—সেই পাহাড়টার পূবে দিকে। তখনকার দিনে না ছিল বিদ্যুতের আলো, না ছিল জলের কল। রবি নামে একজন চাকর লণ্ঠন সাজাইয়া সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। প্রত্যেক ঘরে গোটা দুই করিয়া ঝোলানো লণ্ঠন থাকিত। কাগজ ও আঠা দিয়া ভাঙা-চিমনি জোড়া দিবার কাজে রবি এমনই 'এক্সপার্ট' হইয়াছিল যে, আমরা বলিতাম—সে চিমনির একটুকরা কাচ পাইলেই একটা আস্ত চিমনি তৈরি করিয়া ফেলিতে পারে। তারপরে এক সময়ে বিদ্যুতের আলো খুঁটিতে খুঁটিতে তার বিস্তার করিয়া দেখা দিল—তখন রবির শতাভগ্ন চিমনিসহ লণ্ঠনগুলো কোথায় গা-ঢাকা দিল। অনেকে বলে আর কোথাও নয়, স্বয়ং রবির বাড়িতেই হইবে। এই রবিকে লইয়া মাঝে মাঝে বেশ মজা হইত। সন্ধ্যাবেলা কোন ঘরে হয়তো আলো পৌঁছে নাই, রবির নাম করিয়া কেহ ডাকিতেছে। অন্ধকারে আম-বাগানের মধ্য দিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হয়তো যাইতেছিলেন, তিনি নিজের নাম শুনিয়া উত্তর লইয়া বসিলেন। তখন অপর পক্ষের সে কি অপ্রস্তুত হইয়া দ্রুত পলায়ন!

আশ্রমের ইতস্তত কয়েকটি গভীর ইঁদারা ছিল। পশ্চিমী পালোয়ান চাকরেরা জল তুলিয়া চৌবাচ্চা ভরিয়া রাখিত—ভোর-বেলা স্নান করিতে হইবে। মেটে কলসীতে ভরিয়া জল লইয়া ছেলেদের ঘরে ঘরে রাখিয়া আসিত—পান করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে ইঁদারার জল শুকাইয়া যাইত—কোনক্রমে পানের জলটা মাত্র পাওয়া যায়। তখন আমরা সকলে সারি বাঁধিয়া ভুবন-ডাঙার জলাশয়ে স্নানের জন্য যাইতাম। কিংবা যখন ইঁদারার জলেই স্নান অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিত, তখন ছেলের দলের সঙ্গে তাহাদের কাপ্তেনরা দাঁড়াইয়া থাকিয়া জল রেশন (Ration) করিয়া দিত। হয়তো বলিত—কেহ পাঁচ মগের বেশি জল লইতে পারিবে না। মাঝে মাঝে হুঁসিয়ার করিয়া দিত, তোমার তিন মগ হইল, তোমার আর দুই মগ পাওনা আছে। তখন অনেকে আবার বড় আকারের মগ আমদানী করিয়া আইনে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কাপ্তেনরা বড় সহজ লোক নয় তাহারা নানারকম নজির দেখাইয়া মগের আকার নির্দিষ্ট করিয়া দিত। এই সব কাপ্তেনদের আমরা বড় ভয় করিতাম—ইঁহাদের কথা পরে বলিব।

গ্রীষ্মকালে এই যেমন এক ধরণের জলকষ্ট, শীতকালে তেমনি আর এক ধরণের জলকষ্ট ছিল। রাত্রিবেলা চাকরেরা বড় বড় চৌবাচ্চা ভরিয়া জল তুলিয়া রাখিত। সারা রাত্রি ধরিয়া শীত ও শীতল বাতাস সেই জলকে প্রায় বরফের পর্যায়ে পরিণত করিত—ভোরবেলা তাহাতে স্নানের পালা। তখনো সূর্য ওঠে নাই, দিবালোকের হ্রস্বতা পূরণের জন্য শীতকালে সূর্য অনুদয়ে শয্যাত্যাগ করিতে হইত। আর ঠিক স্নানের সময়েই কোথা হইতে যেন উত্তরে বাতাসটাও সময় বুঝিয়া বহিতে শুরু করিত। ইহাকে জলকষ্ট বলিব না তো কি! আর কাপ্তেনদের এমনই সতর্ক-দৃষ্টি যে, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া পরিত্রাণের উপায় একেবারেই ছিল না। অনেক দিন এমন জলকষ্ট সহ্য করিলাম। তার পরে, শেষে যখন বয়স কিছু বাড়িল, তখন কয়েকজনে মিলিয়া জলকষ্ট হইতে ত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিলাম। মাঝ রাত্রে আমরা উঠিয়া গিয়া চৌবাচ্চার নল খুলিয়া দিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িতাম। ভোর রাতে দেখা যাইত—চৌবাচ্চা খালি। কাজেই ভোর রাত্রির স্নানের সময় বেলা সাড়ে দশটায়, খাবার আগে, নির্দিষ্ট হইত। ওঃ সে কি মুক্তির আনন্দ। পর পর যখন এইরূপ কয়েকদিন হইল তখন কর্তৃপক্ষ বুঝিলেন ব্যাপারটা আকস্মিক নয়—কিন্তু অপরাধীকে ধরিবার উপায় কি! যখন সবজ্ঞ কাপ্তেনরাও অকৃতকার্য হইল—তখন চৌবাচ্চা পাহারা দিবার জন্য কুকরি-ধারী নেপালী দারোয়ান কুয়াতলায় বসিল। রাত্রিবেলা অফিস ও খাজাঞ্চি-খানা পাহারা দিবার জন্য সখা নামে একজন দারোয়ান ছিল, সে নূতনতর কাজ পাইল, কুকরি লইয়া কুয়াতলায় আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা দেখিলাম এ এক নূতন বিপদ! দু' একদিন সময়োচিত উপায় উদ্ভাবনে কাটিল। পর দিন রাত্রে কাছাকাছি একটা কুকুরকে ঢিল মারিলাম, সেটা চীৎকার করিয়া উঠিতেই কর্তব্যপরায়ণ নেপালী সেই দিকে ছুটিল, অমনি সেই অবসরে নিয়মমাফিক অপরাধী আসিয়া চৌবাচ্চার নল খুলিয়া দিয়া পলাতক। সখা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল জল পড়িয়া যাইতেছে। তা পড়ুক, সে তো জানে না যে এই জলতরঙ্গ রোধ করিবার জন্য তাহার নিয়োগ। সে ভাবিয়াছে নিশ্চয় ওই ইঁদারার মধ্যে গুপ্তধন আবিষ্কৃত হইয়াছে, নতুবা খাজাঞ্চি-খানা ছাড়িয়া এখানে থাকিতে আদিষ্ট হইবে কেন?

কি করিয়া এই চৌবাচ্চা-খোলা বন্ধ হইল মনে নাই, বোধ করি আমরা কাপ্তেন-শ্রেণীতে নির্বাচিত হইলাম। অমনি নল-খোলা বন্ধ হইল। কাপ্তেনরা সকলের উপরে খবরদারি করিত, তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। অতি কর্তব্যের চাপে যথাসময়ে যেন স্নান করিবার সময় পাইতাম না, এমন ভাব দেখাইয়া পীড়াদায়ক প্রাতঃস্নান হইতে রক্ষা পাইতাম।

আশা করি আমার এই স্মৃতিকথা শান্তি-নিকেতনের ছেলেদের হাতে পড়িলে তাহারা এইরূপ দুর্নীতিমূলক দৃষ্টান্তের অনু-করণ করিবে না—এই ভরসায় সব লিখিলাম। এখনকার ছেলেদের উপরে সকলের প্রতাপই কমিয়াছে, বোধ করি কাপ্তেনদেরও আর সে প্রতাপ নাই; কাজেই এখনকার ছেলেদের স্বাধীনতা আমাদের চেয়ে নিশ্চয় বেশি।

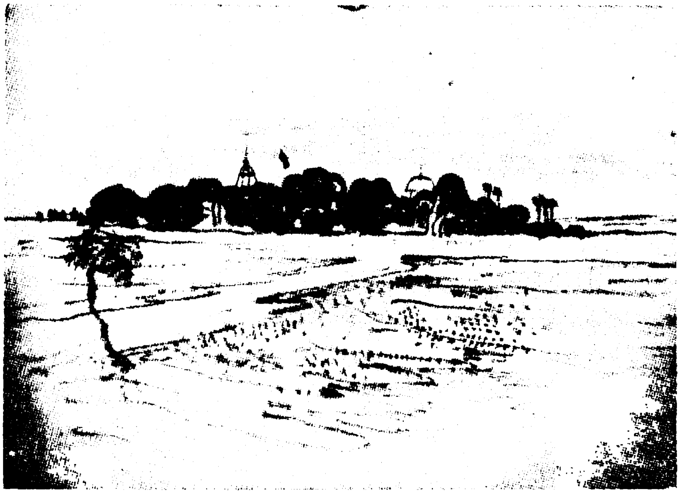
আর শুধু স্বাধীনতাই-বা বলি কেন, এখনকার শান্তিনিকেতনিকদের সুখ-সুবিধা আমাদের সময়কার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু অতীতের সুখ-দুঃখের পরিমাপ প্রায়ই বস্তুর দ্বারা হয় না; বস্তুর অভাব রসের দ্বারা পূরণ করিবার শক্তির উপরেই সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। তখন আমরা বস্তুদীন ছিলাম, কিন্তু তৎকালীন আবহাওয়ার প্রসাদে জীবনরসের প্রাচুর্যে সে দীনতা আমাদের চোখে পড়িত না, বরঞ্চ বস্তুর দীনতা পূরণের জন্য জীবনরসকে প্রয়োগ করিতে গিয়া জীবন যেন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিত। এখনকার শান্তিনিকেতনিক-দের সঙ্গে হয়তো এ বিষয়ে মতের মিল হইবে না। ইহাই স্বাভাবিক, তাহারা তাহাদের কালকে ভালবাসিবে, আমরা যেমন আমাদের কালকে ভালবাসিতাম।

রবীন্দ্র সান্নিধ্য

এক বিষয়ে শান্তিনিকেতনের আধুনিক ছেলেদের উপরে আমাদের জিত ছিল। আমরা রবীন্দ্রনাথের যে সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম, পরবর্তীকালের ছেলেরা তাহা পায় নাই। ছেলেদের কাছে থাকিবার জন্য কবি যখন নূতন বাড়ির

দোতালায় থাকিতেন—এখন যার নাম দেহলীভবন। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি ছেলেদের একটি ঘরেই বসিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলেন। এখানে বসিয়া সারাদিন তিনি লেখাপড়া করিতেন। কিন্তু এ সময়ে আমরা ছোট।

আর একটু বেশি বয়স হইলে দেখিয়াছি, এক একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি ছেলেদের এক একটি ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেন। নানা রকম নূতন খেলা তিনি উদ্ভাবন করিতেন। দু'একটা খেলা আমার মনে আছে। ইহাকে মিলের খেলা বলা যাইতে পারে। একটা শব্দ তিনি মনে ভাবিতেন। তাহার অনুরূপ মিল (Rhyme) প্রশ্ন করিয়া



গোয়ালপাড়ার রাস্তা হইতে শান্তিনিকেতন মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে

করিয়া মূল শব্দটিকে বাহির করিতে হইত। হয়তো তিনি মনে করিলেন, 'ঘর।' তিনি বলিলেন, শব্দটার সঙ্গে 'খর' শব্দের মিল। এখন আমাদের অনুরূপ মিল বলিয়া বলিয়া আসল শব্দটিকে আবিষ্কার করিতে হইত। অনেক সময়ে আমরাও ঐরূপ একটি শব্দ ভাবিতাম। তিনি প্রশ্ন করিয়া অনায়াসে মিলটা বাহির করিয়া ফেলিতেন। সব সময়ে যে পারিতেন এমন নয়। আর একটা খেলা ছিল—তিনি কবিতার একটা ছত্র বলিতেন, তাহার সঙ্গে মিল দিয়া অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া দ্বিতীয় ছত্র আমাদের বলিতে হইত। অধিকাংশ সময়ে আমাদের হাতে পড়িয়া হয়তো মিলটা দ্বিতীয় শ্রেণীর হইত, নয়তো অর্থের সঙ্গতি থাকিত না। এখনো তাঁহার রচিত গোটা দুই ছত্র আমার মনে আছে। একটা নদী পারাপারের বর্ণনা চলিতেছিল—নদীর স্রোতে আমাদের মিলের নৌকা বানচাল হইবার উপক্রম হইলে তিনি বলিয়া গেলেন,

সে কি পাড়ি দিল এই ভান্দরে?
ও বাবা! কার সাধ্য রে!

আবার অনেক সময়ে তিনি একটা গল্পের সূত্রপাত করিয়া দিয়া পালাক্রমে আমাদের চালাইয়া লইতে বলিতেন। বলা বাহুল্য, আমাদের হাতে দু'এক ধাপ পরেই গল্পটা ভুতুড়ে ধরণের হইয়া উঠিত, তখন তিনি ভূত ছাড়াইয়া গল্পটাকে সংগত পরিণামে পেঁাছাইয়া দিতেন। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে নিজের কবিতা পড়িয়া শুনাইতেন। সন্ধ্যাবেলা যখন যে-বাড়িতে তিনি থাকিতেন, নূতন গান শিখাইবার আসর বসিত। শিক্ষার্থী ও শ্রোতা কাহারও সেখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল না। এসব ছাড়া ছেলেদের নানারকমের ছোট বড় সভায় তিনি নিয়মিত আসিতেন। ছোট কথাটি নিরর্থক কারণ যে-সভাতে তিনি আসিতেন, তাহাই বিরাট আকার ধারণ করিত।

পাঠ চর্চার আরম্ভ

এখন একবার আগে ফিরিয়া গিয়া আমাদের লেখাপড়া কিভাবে আরম্ভ হইল বর্ণনা করিতে চেষ্টা করি। আমার যতদূর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ দিয়া আমাদের পাঠ আরম্ভ হয়। সেটা বোধ হয় নিম্নতম শ্রেণী ছিল, অর্থাৎ অক্ষর পরিচয়ের ঠিক উপরের ধাপ। 'শিশু'র 'কাগজের নৌকা' আমার প্রথম পঠিত রবীন্দ্র-কবিতা—প্রথম শব্দটার উপরে খুব জোর দিতে চাই না কারণ তার আগে বোধ হয় আর কারো কবিতা পড়ি নাই—কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ছাড়া।

কাগজের নৌকা ভাসাইয়া দিয়া বালক ভাবিতেছে:—

আমি ঘরে ফিরি, থাকি কোণে মিশি,
যেথা কাটে দিন সেথা কাটে নিশি
কোথা কোন গাঁয়ে ভেসে চলে যায়
আমার নৌকা খানি।

রাত্রে বালক বিছানায় শুইয়া ভাবে:—

চোখ বুজে ভাবি—এমন আঁধার,
কালি দিয়ে ঢালা নদীর দু'ধার,
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে।
আকাশের তারা মিটি মিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি।

এই ছবি আমার প্রবাসী বালকচিত্তে পদ্মা ছাড়িয়া-আসা সুদূর পল্লীর কথা মনে আনিয়া দিত। তখন এই কবিতার ছত্রে ছত্রে কাগজের নৌকাকে অনুসরণ করিয়া অভাবিতের বাঁকে বাঁকে যে-রহস্যের সন্ধান পাইতাম—এখন আর তাহা পাই না। আমার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে, অল্প বয়সে জোড় করি হাত, করি প্রণিপাত জাতীয় কবিতা নামধেয় অপদার্থ রচনা পড়িবার দুর্ভাগ্য আমার হয় নাই। ছোট ছেলেকে বড়ো কবিতা পড়াইবার মতো অত্যাচার খুব অল্পই আছে। বিজ্ঞজনেরা বলেন, রবীন্দ্রনাথের শিশুদের কবিতা দুর্বোধ্য, কাজেই ছেলেরা তাহা পড়িয়া লাভবান হয় না। বড়দের জন্যই হোক আর ছোটদের জন্যই হোক যে কবিতা ষোল-আনা বোধ্য তাহা কবিতাই নয়। কবিতার খানিকটা বোঝা যাইবে, খানিকটা যাইবে না। যে-টুকু বোঝা গেল তাহাতে কবিতার প্রতিষ্ঠা, যেটুকু গেল না তাহাতেই কবিতার প্রাণ। অর্থের দ্বারা নিরেট কবিতা পাঠকের পক্ষে দণ্ডস্বরূপ, সাহিত্যের শোভাযাত্রায় এই দণ্ডধারীর হয় তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী যে সোনার চতুর্দোলায় চাপিয়া আসেন তাহা এমন নিরেট নয়, তাহাতে অবকাশ আছে, আর অবকাশ আছে বলিয়াই কাব্যলক্ষ্মী চাপিয়া থাকেন না। ছেলেদের গোড়া হইতে ভালো কবিতা পড়িতে দিলে তাহারা এক রকম করিয়া বুঝিয়া লয়—অল্প বয়সে যেটুকু বোঝা দরকার বা উচিত ঠিক ততটুকু রস গ্রহণ তাহারা করিতে পারে। পরন্তু কান ও রুচি তৈয়ারী হইয়া উঠে। অর্থবোধের চেয়ে কান ও রুচি অধিকতর মূল্যবান। বাঙলাদেশের ইস্কুলে বালকদের কান ও রুচির সর্বনাশ যে আরও কতকাল চলিবে কে জানে! শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—ও মশায়, আমরা নিজেরাই বুঝি না তা বোঝাবো কিভাবে! শিক্ষা-বিভাগ কেন যে এই সব শিশুপাল-ছাত্রকদের খেলাইয়া দিয়া

দেশের শিশুচিত্তকে জড়ত্বমুক্ত করিবে! আর তাহাদেরই বা দোষ কি বাল্যকালে বাজে কবিতা পড়িয়া যাহারা কান ও রুচির মাথা খাইয়া বসিয়াছে, তাহারা তো ভালো কবিতাকে অস্পৃশ্য মনে করিবেই।

এই ক্লাশে আর একখানি পাঠ্য পাইলাম উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ছেলেদের মহাভারত। শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভেই রামায়ণ, মহাভারত ও রবীন্দ্র কাব্যের উপরে প্রতিষ্ঠা পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। বর্তমানে বাঙলাদেশের শিক্ষার সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, বালকদের ইস্কুল পাঠ্য ও অতিরিক্ত পাঠের তালিকায় রামায়ণ, মহাভারতের স্থান নাই বলিলেই চলে। ফলে বাঙলা-দেশের বালকচিত্ত ত্রিশঙ্কুর মতো প্রতিষ্ঠা-হীন হইয়া বায়ুভূত নিরাশ্রয়ে দোদুল্যমান। এখন কলেজে পড়াই;—দেখিয়াছি বি-এ শ্রেণীতেও এমন ছাত্র অবিরল যাহারা রামায়ণ মহাভারত পড়ে নাই। ইহারা দাঁড়াইবে কোথায়? যখন আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে ছোট ছেলেদের কি বই পড়াইবে—আমি অসঙ্কোচে বলিয়া বসি, রামায়ণ, মহাভারত আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়াও। আরও বলি, দোহাই তোমাদের,—নীতিমূলক কবিতাগুলো পড়াইও না। যাহারা সুনীতি দুর্নীতির কিছুই জানে না, অ-নীতির জগতে যাহাদের বাস, তাহাদের ঘাড়ে এখনই ও সব বোঝা চাপানো কেন? যখন তাহারা নীতির জগতে প্রবেশ করিবে তখন ওই সব বই হইতে যথার্থ নির্দেশ পাইবে। তোমার নীতিমূলক কবিতা কোনদিনই কোন কাজে লাগিবে না। মাঝে হইতে অপ-কাব্যের কানমলা দিয়া বেচারাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া দিবে।

রবীন্দ্র কাব্য দিয়া শিক্ষা জীবন আরম্ভ হওয়ায় আমি তেমন আগ্রহ সহকারে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পড়িতে পারি নাই। পরিণত বয়সে প্রয়োজনের খাতিরে কখনো কখনো পড়িতে বাধ্য হইয়াছি; কিন্তু আগাগোড়া যে পড়ি নাই, তাহাতে ঠকিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ এই সব কাব্য দিয়া লেখাপড়া শুরু করিলে হয় তো রবীন্দ্র-কাব্যের সম্যক রস-গ্রহণ করিতে পারিতাম না—এই সম্ভাবনা মাত্রেও আতঙ্কে শরীর কণ্টকিত হইয়া ওঠে!

তেজেশ বাবুর কাছে বাঙলা পাঠ শুরু হইল। ঘরের বাহিরে গাছের তলায় ক্লাস বসিত। কেহ জাম গাছ তলায় ক্লাশ লইতেন, কেহ বটগাছ তলায়, কেহ আম বাগানের মধ্যে। তেজেশ বাবুর ক্লাস বসিত নূতন বাড়ির কাছে একটা গোলক চাঁপা গাছের তলে। জগদানন্দবাবুর ক্লাসের জায়গা ছিল নাট্য-ঘরের কাছে ফটক-টার তলায়—সেই ফটকের উপরে ছিল একটা মাধবী, আর একটা মালতী লতা। কিন্তু তাঁহার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল গণিত শাস্ত্র। মালতীর সুগন্ধ যে গণিত শাস্ত্রকে কিছুমাত্র মনোরম করিতে পারিয়াছিল এমন মনে হয় না। যদিচ জগদানন্দবাবু প্রায়ই বলিতেন, 'একবার প্রবেশ করিলে দেখিবে এমন সরস বিষয় আর নাই।' তাঁহার কথাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না—কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম।

প্রত্যেকের বসিবার জন্য একখানি করিয়া আসন থাকিত—অধ্যাপকদেরও একখানা করিয়া আসন। খাতা, বই ও আসন লইয়া সকলে ক্লাশে গিয়া বসিতাম। ক্লাশ হইতেছে, এমন সময়ে বৃষ্টি আসিলে কি হইত? যার যার আসন লইয়া কোন ঘরে গিয়া আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

অঙ্কের ক্লাশ হইতেছে। জগদানন্দ বাবু আবার অঙ্ককে আঁক বলিতেন। অঙ্ক শব্দটাই যথেষ্ট শঙ্কাপূর্ণ, কিন্তু জগদানন্দ বাবুর মুখে আঁক শব্দটা একেবারে ছিটে-গুলির মতো মারাত্মক মনে হইত। জগদানন্দ বাবু বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আঁকটা কতদূর। আমরা নিবিষ্ট মনে ঘাড় হেঁট করিয়া খাতার পাতায় আঁক-জোক কাটিতেছি আর বারংবার আসন্ন মেঘখানার দিকে চাতকের চেয়েও করুণতর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছি। শেষে যখন তিনি খাতাখানা লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন, সেই মুহূর্তে সদয় দেবরাজ বারিপাতের আদেশ দিলেন। এক ফোঁটা জল পড়িয়াছে কি না পড়িয়াছে, অমনি আমরা আসন-পাতি গুটাইয়া দৌড় মারিলাম, জগদানন্দবাবুর হাতখানা তখনো শূন্যে উদ্যত। কিন্তু সব ছাত্রই যে আমাদের মত চাতক-বৃত্তি করিত তাহা নয়, বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতেও আঁক কষিতেছে এমন ছাত্র ছিল। বুঝিতাম, তাহারা গণিত শাস্ত্রের ম্যাজিনো লাইন ভেদ করিয়াছে। কিন্তু হায় এ জগতে সর্ববিদ্যা-বিশারদ কে? ইংরেজি অনুবাদের ক্লাশে দেখিতাম সেই গণিত ধুরন্ধরেরা আমাদের চেয়েও দ্রুততর পায়ে বৃষ্টির প্রথম সঙ্কেতেই ক্লাশ পরিত্যাগ করিয়া গৃহের দিকে ধাবমান। আসন্ন বিপদের মুখে প্রকৃতির হাতে এইরূপ সাহায্য বারংবার পাইতে পাইতে শেষ পর্যন্ত মানুষের চেয়ে প্রকৃতির উপরে আমার আস্থা দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের মারিবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু কখনো যে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, এমন নয়। বিশেষ, তখনকার দিনে অনেকেই দুরন্ত ছেলেটিকে সামলাইতে না পারিয়া দ্বীপান্তরে পাঠাইবার মনোবৃত্তি লইয়া শান্তিনিকেতনে পাঠাইয়া দিতেন। যাই হোক, কখনো কোন ছেলে মার খাইলেও কেহ কিছু মনে করিত না কারণ শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যে যথার্থ স্নেহের সম্বন্ধ ছিল তাহাতে মারের দাগ মনের মধ্যে পর্যন্ত পৌঁছিত না।

আমি নিজেই তেজেশবাবুর কাছে একবার মার খাইয়াছিলাম। দোষটা সম্পূর্ণ আমার ছিল না, কিন্তু সেই বয়সেই বুঝিয়াছিলাম, আসামী প্রতিবাদ করিলে বিচারকের মেজাজ প্রায়ই রুক্ষতর হইয়া ওঠে। তাই চুপ করিয়া রহিলাম। কাছেই মেদি গাছের ডাল ছিল, তেজেশবাবুর হাতেও বেশ শক্তি ছিল, আমার পিঠের চামড়া এখনকার মতো পুরু না হইলেও পিঠে কোটের আচ্ছাদন ছিল, ফলে যা হইবার হইল। বেশি বয়সে তেজেশবাবু যখন আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে এই গল্প বলিয়াছি। তিনি বলিলেন—তাঁহার মনে নাই। অভ্যস্ত আচরণই মনে থাকে, যিনি একবার জীবনে মারিয়াছেন তাঁহার মনে থাকিবার কথা নয়। যাই হোক, দুজনে খুব হাসিয়া লইয়াছি।

আর একবার জগদানন্দবাবু একটা ছেলেকে কিল না চড় কি যেন মারিয়াছিলেন। ইহার ফল জগদানন্দবাবুর পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া উঠিয়াছিল। জগদানন্দ বাবুকে দেখিয়া আমরা ভয় করিতাম কিন্তু তাঁহার মনটি স্নেহ ভালবাসায় পূর্ণ ছিল। তর্জন গর্জন যতই করুন বর্ষণ কদাচিৎ করিতেন। সেই ছেলেটাকে মারিয়া তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল, তিনি কিছুক্ষণ পরে তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাতে খান কয়েক বিস্কুট দিলেন। ওই তাঁহার কাল হইল। এই সংবাদ ছাত্র মহলে রটিবামাত্র তাঁহার কাছে মার খাইবার জন্য সকলেই উমেদারি আরম্ভ করিল। কিন্তু কি বিপদ—তিনি যে আর কাহারো গায়ে হাত তোলেন না! ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওরে বিস্কুটের বাক্সটা তো দেখিয়াছিস—কতগুলো ছিল? সে বলিল—বাক্স প্রায় ভরা! চল্ চল্! জগদানন্দবাবুর বাড়ির দিকে চল্। তিনি হয়তো তখন নিরিবিলি বসিয়া আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া পুস্তক রচনায় নিযুক্ত। যে-সব দুরন্ত গ্রহ-কণিকা তাঁহার দরজায় চপেটাঘাতের উমেদার হইয়া ধর্না দিয়াছে, তাহাদের প্রতি কি তাঁহার মন আছে? অবশেষে হতাশ হইয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে আমরা ঘরে ফিরিলাম।

ক্রমশ

বিদুষী ভার্যা

— শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় —

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে মহাদেবপুরের অভিমুখে যে রাজপথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার তিন ক্রোশ উত্তরে মনসাগাছা গ্রাম। প্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই মনসাগাছা গ্রামের প্রধান অধিবাসী। রাজসাহী এবং দিনাজপুর, উভয় জেলায় অবস্থিত তাঁহার বিস্তৃত জমিদারির নীট আয় বাৎসরিক চল্লিশ হাজার টাকার ঊর্দ্ধে। তেজারতি, কোম্পানির কাগজ, খাস জমা প্রভৃতি হইতেও আমদানী নিতান্ত অল্প নহে।

বৎসর পাঁচেক হইল প্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন। উপস্থিত তাঁহার তরুণ বয়স্ক দুই পুত্র দিবাকর ও নিশাকর এই বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী। প্রভাকরের একমাত্র কন্যা গৌরীবালার সাত বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। গৌরীবালার স্বামী হেমেন্দ্রনাথ লাহোর কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইলে গত দুই বারের ন্যায় এবারও প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে কোথাও দিবাকরের নাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এই অনভিপ্রেত দুর্ঘটনার জন্য অন্যবারের ন্যায় সম্ভবত এবারও দুষ্ট অংকশাস্ত্রই দায়ী সন্দেহ করিয়া মনে মনে দিবাকর অংকশাস্ত্রের মুণ্ডপাত করিল।

উপর্যুপরি তিনবার প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বার উদ্ঘাটনে অসমর্থ হইয়া লেখাপড়ার উপর তাহার ঘৃণা ধরিয়া গেল। এই অকৃতকার্যতার হেতু নিজের মেধা অথবা উদ্যমের ত্রুটির উপর আরোপ না করিয়া অদৃষ্টের উপর করিয়া সে সর্বান্তঃকরণে নিজেকে ক্ষমা করিল। মনে মনে সে তাহার সংক্ষুব্ধ অভিমানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, যতই কর না রে কেন বাপু, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই।

এমন করিয়া শুধু যে, সে নিজেকেই ক্ষমা করিল তাহা নহে; স্কুলের ক্ষুদ্র এলাকা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ঢুকাইবার অভিপ্রায়ে যে তিনজন গৃহশিক্ষক তাহাকে প্রচুর পরিমাণে ঠেলাঠেলি করিয়া নিষ্ফল হইয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধেও সে মনের মধ্যে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রবেশ করিতে দিল না। অযথা তিনটি নিরপরাধ ভদ্রলোকের উপর দোষারোপ করিলে চলিবে কেন? অদৃষ্টের কঠিন শিলাখণ্ডের উপর বিধাতাপুরুষ যে লিপি ক্ষোদিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে পরিবর্তিত করা মানুষের সাধ্য নহে।

সমস্ত ব্যাপারটা অদৃষ্টবাদের উপর স্থাপিত করিলেও, যে প্রকারেই হউক লেখাপড়ার উপর দিবাকরের ঘৃণা ধরিয়া গেল। দেশের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে আচার্য রায় যে দশ বৎসরের জন্য ল' কলেজের দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন, সে কথা স্মরণ করিয়া দিবাকর মনে মনে বলিল, দ্বার যদি বন্ধ করিতেই হয় ত' অতদূর অগ্রসর হইয়া, অত সময় নষ্ট করিয়া নহে; একেবারে প্রবেশিকার দ্বার বন্ধ করিয়া গোড়া মারিয়া কাজ করা উচিত। অনর্থের বৃক্ষকে ডাল-পালা বিস্তার করিবার অবসর না দিয়া অংকুরে বিনাশ করাই সুবুদ্ধির পরিচয়।

এই সদ্বিবেচনার ব্যাপকভাবে পরিণতি লাভ করিবার বিলম্বিত কাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া ব্যক্তিগতভাবে নিজের জীবনে ইহাকে কার্যসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সে নির্বিকল্পতার সহিত লেখা পড়ায় ইস্তফা দিল।

কয়েক দিন পরে একটা পাখীমারা বন্দুকের বিভিন্ন অংশ খুলিয়া ফেলিয়া দিবাকর নিবিষ্টচিত্তে সেগুলি সাফ করিতেছিল, এমন সময়ে সেখানে নিশাকর আসিয়া দাঁড়াইল।

মাডলের নিকট একটা জায়গায় একটু মরিচা পড়িয়াছিল। মিহি বালি-কাগজ দিয়া সেইটা ঘষিতে ঘষিতে নিশাকরের দিকে একবার ক্ষণিকের জন্য চাহিয়া দেখিয়া দিবাকর বলিল, "কি রে নিশা কিছু বলবি নাকি?"

নিশাকর বলিল, "হ্যাঁ বলব।"

"কি বলবি, বল।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিশাকর বলিল, "তুমি নাকি লেখাপড়া ছেড়ে দিলে দাদা?"

মরিচা সাফ করিতে করিতে মুখ নীচু করিয়াই দিবাকর বলিল, "আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম,—না, লেখাপড়া আমাকে ছেড়ে দিলে? আমি চেষ্টার কিছু ত্রুটি করেছি বলতে পারিস? তিন তিন বছর ধরে ধস্তাধস্তিটা কিছু কম হয়েছে? ওসব অদৃষ্টের কথা নিশা,—অদৃষ্টে না থাকলে তুইও কিছু করতে পারিস নে, আমিও কিছু করতে পারিনে।"

বিরক্তি ও অভিমানের প্রদীপ্ত কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "অদৃষ্ট, না আরো কিছু! না দাদা, তুমি ম্যাট্রিকুলেশনও পাশ করবে না, এ কিন্তু ভারি বিশ্রী দেখতে হবে।"

বন্দুকের নলটা ভূমিতে স্থাপন করিয়া অপর একটা অংশ তুলিয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "আর, তোর সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন দিয়ে ফেল করলে ভারি চমৎকার দেখতে হবে ত'? তুই যে রকম বড় বড় নম্বর পেয়ে লাফাতে লাফাতে আমাকে তাড়া ক'রে আসছিস, তুই ত' আমাকে ধরলি ব'লে।"

নিশাকর বলিল, "তার ত' এখনো এক বছর দেরি আছে।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "ওরে নিশা, যে লোক তিন-তিনটে বছর অনায়াসে ফেল করতে পারলে, আর একটা বছর ফেল করা তার পক্ষে খুব শক্ত হ'বে ব'লে কি মনে করিস তুই? লেখাপড়া ছেড়ে দিলে লোকে একথা ভাবতেও পারে যে, না ছাড়লে হয়ত' পাশ করতে পারতো; কিন্তু তোর সঙ্গে ফেল করলে সেকথা ভাববার কোন পথ থাকবে কি?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "কি বলব বল! মা নেই, বাবা মারা গেছেন,— তোমাকে বলবার মত কেউ ত নেই।"

দিবাকর বলিল, "কেন, তুই ত' বিলক্ষণ আছিস দেখতে পাচ্ছি! আচ্ছা, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে কি হবে বল দেখি? আরো দুটো ক'রে হাত-পা বেরোবে কি?

"তা হ'লে দেখছি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না করলেই আরও দুটো ক'রে হাত-পা বেরোবে।" বলিয়া গজগজ করিয়া কি বকিতে বকিতে নিশাকর প্রস্থান করিল।

নিশাকরের বয়স যখন দুই বৎসর, তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর পুত্রকন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রভাকর তাঁহার এক দূর সম্পর্কীয় দরিদ্র বিধবা পিতৃব্যকন্যা প্রসন্নময়ীকে গৃহে আনিয়া রাখেন। সে আজ বার তের বৎসরের কথা। সেই হইতে প্রসন্নময়ী মনসাগাছার জমিদার-গৃহে কর্ত্রী হইয়া আছেন।

সন্ধ্যার পর জপ ও আহ্নিক সারিয়া প্রসন্নময়ী নিজকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় দিবাকর প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমাকে ডেকেছিলে পিসিমা?"

প্রসন্নময়ী কহিলেন, "হ্যাঁ, ডেকেছিলাম। বোস্, বলছি।"

প্রসন্নময়ীর পালঙ্কের নিকট একটা চেয়ার লইয়া বসিয়া দিবাকর বলিল, "কি বল?

দুই একটা অবান্তর কথার পর প্রসন্নময়ী

আসল কথার অবতারণা করিলেন; বলিলেন, "লেখাপড়া ত' ছেড়ে দিলি দিবা এবার তুই বিয়ে কর।"

প্রসন্নময়ীর কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে হাসি দেখা দিল; বলিল, "লেখাপড়া ছেড়ে দিলে বিয়ে করা ছাড়া আর কি কিছুই করবার নেই?"

"আবার কি করবি?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "কেন, জমিদারীর কাজ শিখব, বন্দুক নিয়ে শিকার করব, সেতার নিয়ে বাজনা বাজাব, দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে তোমাকে তীর্থ করিয়ে বেড়াব; আর, কিছুই যদি করবার না থাকে ত' ও-পাড়ার যদু খুড়োর পিছনে পেয়াদা লাগব।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

তীর্থ করানোর প্রস্তাবে মনে মনে খুশি হইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, 'যদু খুড়োর পছনে তুই যে কত পেয়াদা লাগাবি তা আর আমার জানতে বাকি নেই বাবা। কিন্তু এই শ্রাবণ মাসেই আমি তোর বিয়ে দোব দিবা। কলকাতা থেকে গাঙ্গুলীদের বাড়ি একটি মেয়ে এসেছে। এমন সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে কদাচিৎ দেখা যায়। এ মেয়েকে কিছুতেই আমি হাতছাড়া করব না।"

ঔৎসুক্যের সহিত দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কত বয়স পিসিমা?"

উৎসাহিত হইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, 'এই শ্রাবণ মাসে চোদ্দ বছরে পড়বে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "তা হ'লে হ'তে পারে। নিশার সঙ্গে দিয়ে দাও, এক বছরের ছোট আছে, আটকাবে না। লেখাপড়া ছাড়া পাত্রের সঙ্গে তারা অমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?" বলিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রসন্নময়ী বলিলেন, "তোর মত লেখা-পড়া-ছাড়া পাত্রের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে সে এখন তপস্যা করছে দিবা।" তার-পর দিবাকর ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে প্রসন্নময়ী বলিলেন, "ওরে যাসনে, যাসনে দিবা,—আমার কথা শুনে যা।"

দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকর বলিল, "সে মেয়ের এখনও পাঁচ সাত বৎসর তপস্যা বাকি আছে পিসিমা। অসময়ে তার তপস্যা ভাঙালে অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে যাবে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

দিবাকরের কথা কিন্তু ঠিক দৈববাণীর মতই খাটিয়া গেল। পাঁচ বৎসর পরে সুদূর লাহোর শহরে একটি মেয়ের তপস্যা-কাল

২

ঠিক সেই সময়ে, বোধ করি অদৃষ্টেরই অনিবার্য আকর্ষণে, দিবাকর লাহোর যাইবার জন্য সংকল্প করিল। পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ শেষে তাহাকে ও নিশাকরকে গৌরী কিছুকালের জন্য লাহোর লইয়া গিয়াছিল। তাহার পর সে আর লাহোর যায় নাই। কিছুকাল হইতে গৌরী এবং হেমেন্দ্রনাথ উভয়েই তাহাকে লাহোর যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া পত্র দিতেছে। পার্বতীপুর এবং কাটিহার হইয়া লাহোর যাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নিশাকরের বিশেষ অনুরোধে কলিকাতা হইয়াই তাহার পথ স্থির করিতে হইয়াছে।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া দিবাকর পটলডাঙ্গা অঞ্চলে নিশাকরের বাসায় উঠিল। নিশাকর তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়ে।

চা পানের পর দিবাকর বলিল, "আমি কিন্তু আজকের পাঞ্জাব মেলেই লাহোর যাব নিশা।"

নিশাকর বলিল, "এত তাড়া কিসের দাদা? দিন দুই এখানে বিশ্রাম করে তারপর যেয়ো।"

দিবাকর কিন্তু তাহাতে সম্মত হইল না; বলিল, "আজ এখান থেকে রওনা হ'লে শনিবারে আমি লাহোর পৌঁছব। রবিবারে জামাইবাবুর বাড়িতে একটা উৎসব আছে। তাতে আমি উপস্থিত না থাকলে তাঁরা দুঃখিত হবেন।"

নিশাকর যখন দেখিল কোনও প্রকারেই দিবাকরকে আটকাইয়া রাখা যাইবে না, তখন সে নিকটবর্তী একটা দোকান হইতে তাহাদের এক আত্মীয়-গৃহে ফোন করিল এবং তাহার অল্পকাল পরে তাহাদের দূরসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভাত আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রভাতকে দেখিয়া দিবাকর প্রফুল্লমুখে বলিল, "কি প্রভাত, তোমাদের খবর সব ভাল ত?"

প্রভাত বলিল, "ভাল। আজ দুপুরে বেলা আপনি আর নিশাকাকা আমাদের ওখানে খাবেন।"

দিবাকর বলিল, "আমি ত' কয়েক ঘণ্টা মাত্র কলকাতায় আছি। আজ পাঞ্জাব মেলে লাহোর যাচ্ছি। এর মধ্যে এ সব হাঙ্গামা কেন করছ?"

প্রভাত কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হইল না, দিবাকরকে সম্মত করাইয়া প্রস্থান করিল।

প্রভাতদের গৃহ হইতে আহার করিয়া যখন দিবাকর ও নিশাকর তাহাদের বাসায় ফিরিয়া আসিল তখন বেলা দুইটা।

আমাকে কলকাতায় টেনে আনলি? শেষকালে তুই ঘটকালি আরম্ভ করলি নিশা?"

নিশাকর বলিল, "আমি কেন করব? ঘটকালি ত' করছেন মাধুরী বউদিদি। কিন্তু মেয়েটি দেখতে শুনতে চমৎকার নয় কি?"

সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদের পথ ছিল না, দিবাকর চুপ করিয়া রহিল।

উৎফুল্ল হইয়া নিশাকর বলিল, "তা হ'লে ওদের পাকা কথা দিই?"

দিবাকর বলিল, "লেখাপড়া কি করেছে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি।"

নিশাকর বলিল, "এই বৎসর ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে।"

সহসা অতর্কিতে বজ্রপাত হইলে মানুষে যেমন চমকিত হয়। নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকর তেমনি চমকিয়া উঠিল। বিহ্বল নেত্রে নিশাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "তুই আমাকে অপমান করতে চাস নিশা?"

বিস্মিত এবং নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া নিশাকর বলিল, "তার মানে?"

"তার মানে, একটা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা মেয়ের সঙ্গে আমার মত মূর্খ মানুষের বিয়ে দিয়ে আমার সমস্ত জীবনটা তুই হীনতায় মলিন ক'রে দিতে চাস?"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "তুমি বড় ভাই, তোমাকে বড় কথা বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু সত্যিই তুমি মূর্খের মত কথা বলছ দাদা। আচ্ছা, যে মেয়েটিকে তুমি দেখে এলে সে ত' তোমার চেয়ে তিন গুণ ফর্সা,—তবে তুমি সে বিষয়ে এতক্ষণ আপত্তি করনি কেন? নিজে ময়লা হ'য়ে একজন গৌরবর্ণা মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার জীবন হীনতায় মলিন হয় না?"

দিবাকর বলিল, "আমি তোর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করতে চাই নে। তোকে শুধু জানিয়ে দিলাম যে, আমাকে ফাঁসি দিলেও ও মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। আজ সন্ধ্যা বেলা গিয়ে তুই ওদের সে কথা ব'লে আসবি।"

"আচ্ছা, তাই না হয় আসব!" বলিয়া নিশাকর দুমদুম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঊর্ধ্বলোকে বিধাতাপুরুষ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, পুকুর দেখেই এতটা ভয় পেলে দিবাকর, আর আমি যে লাহোরে তোমাকে সাগরে চোবাবার ব্যবস্থা করেছি, তার কি করছ বাবা?

অদৃষ্টকে দেখা যায় না, বিধাতাপুরুষের বাক্য শুনা যায় না নচেৎ যতটা নিরুদ্বেগে সেদিন সন্ধ্যায় দিবাকর লাহোর যাত্রা করিল, তাহা ঠিক সম্ভবপর ছিল না।

পেঁৗছিল। পরদিন রবিবার বৈকাল পাঁচটার সময়ে হেমেন্দ্রনাথের গৃহে একটি প্রীতি সম্মেলন হইবে। কিছুদিন হইল 'মিত্র বিংশক' নামে একটি বন্ধু-সংঘ গঠিত হইয়াছে, পর্যায়ক্রমে এক-একজন সদস্যের গৃহে তাহার বৈঠক বসে। এবার হেমেন্দ্রনাথের পালা।

রবিবার সকালে বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া গৌরী হেমেন্দ্রনাথ এবং দিবাকর আসন্ন উৎসবের বিষয়ে শেষ কল্পনা-জল্পনা করিতেছে, এমন সময়ে হেমেন্দ্রনাথের মোটরগাড়ি বারান্দায় আসিয়া থামিল এবং তাহা হইতে অবতরণ করিল বছর একুশ বয়সের একটি লাবণ্যবতী তরুণী। সুগঠিত ছিপ্‌ছিপে দেহ এবং সমস্ত মুখমণ্ডলে এমন দুর্লভ সৌন্দর্যের লীলা, যাহা পুরুষের চক্ষুকে বারংবার আকৃষ্ট করে।

সকৌতূহলে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে দিদি?"

গৌরীবালা বলিল, "এখানকার হরলাল মুখুজ্যের ছোট মেয়ে যূথিকা। ভারি চমৎকার সেতার আর এসরাজ বাজায়। আজ বিকেলে উদ্বোধন বাদ্য ও-ই বাজাবে।"

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "উদ্বোধন গান হবে না?"

হেমেন্দ্র বলিল, "উদ্বোধন গান ভারি পচা হয়ে গেছে। উদ্বোধন বাদ্যের মধ্যে তবু একটু নূতনত্ব পাওয়া যাবে।"

বলিতে বলিতে যূথিকা সহাস্যমুখে নিকটে আসিয়া হেমেন্দ্রনাথ ও গৌরীকে প্রণাম করিল; এবং তাহার পর গৌরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিশেষ একটু ইঙ্গিতে দিবাকরের পরিচয় জানিতে চাহিল।

গৌরী বলিল, "আমার ভাই দিবাকর।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আমিও তাই মনে করছিলাম।" তাহার পর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তকরে বলিল, "নমস্কার।"

ব্যস্ত হইয়া দিবাকরও যুক্তকর করিয়া বলিল, "নমস্কার।"

ঊর্ধ্বলোক হইতে বিধাতাপুরুষ সহাস্যে বলিলেন, সাগর সৈকতে পেঁৗছে গেছে দিবাকর।

দৈববাণী গ্রহণ করিবার মতো সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি দিবাকরের ছিল না, তথাপি যুক্তকরে যূথিকাকে নমস্কার করিবার সময়ে তাহার মনে হইল, যেন সাগরেরই মত গভীর এবং বিস্তৃত কোনও বস্তুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে নমস্কার করিতেছে।

যূথিকা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম-এ. এ কথা তখন জানিতে পারিলে হয়ত নমস্কার করিবার সময়ে দিবাকরের তাহাকে সাগরের মত গভীর এবং ভয়াবহ বলিয়াই মনে হইত।

যূথিকা উপবেশন করিলে হেমেন্দ্র বলিল, "তোমার যন্ত্রপাতি আনোনি যূথিকা?"

যূথিকা বলিল, "এনেছি দাদা। সেতার আর এসরাজ দুই এনেছি। বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেছে।"

হেমেন্দ্র বলিল, "কি ঠিক করলে তুমি? উদ্বোধন সংগীতই বা কি বাজবে। আর উদ্‌যাপন সংগীতই বা কি বাজাবে?"

যূথিকা বলিল, "উদ্বোধন সংগীত মনে করছি এসরাজে ভীমপলশ্রী বাজাব, আর উদ্‌যাপন সংগীত বাজাব সেতারে জয়-জয়ন্তী।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া হেমেন্দ্র বলিল, "ভালই হবে। চল ও ঘরে গিয়ে দুটোই এক একবার শোনা যাক্। তুমিও চল দিবা।"

হেমেন্দ্রনাথের ড্রয়িং রুমের পাশের একটা ঘরে দেশী কায়দায় ফরাসের ব্যবস্থা ছিল, সেই ঘরে সকলে আসিয়া বসিল।

গৃহ হইতেই যূথিকা যন্ত্র দুইটি এক সুরে বাঁধিয়া আনিয়াছিল। অল্প একটু আধটু ঠিক করিয়া লইয়া পরে পরে সে এসরাজে ও সেতারে যথাক্রমে ভীমপলশ্রী ও জয়-জয়ন্তী বাজাইল।

প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া গভীর আবেগের সহিত সেতার বাজাইয়া যূথিকা যখন তাহার যন্ত্র বন্ধ করিল তখনও যেন সমস্ত কক্ষের বায়ুমণ্ডলী করুণ জয়-জয়ন্তী রাগিণীর সুমিষ্ট বেদনায় স্পন্দিত হইতেছিল।

বিমুগ্ধ দিবাকর উচ্ছ্বাস সহকারে বলিল, "চমৎকার!"

আনন্দদীপ্ত মুখে হেমেন্দ্র বলিল, "সত্যিই চমৎকার!"

গৌরী বলিল, "আমি ভাবচি, এই ছোট ঘরের ভিতরে কাছাকাছি বসে আমাদের তিনজনের ত' খুবই ভাল লাগল; কিন্তু ফাঁকা জায়গায় লোকের ভিড়ের মধ্যে একটি মাত্র যন্ত্রের বাজনা তেমন জমবে কি? এর সঙ্গে আরও এক আধটা যন্ত্র যোগ ক'রে যদি একটা কনসার্টের মত করা যেত তা হ'লে বোধ হয় বেশ ভাল হ'ত।"

যূথিকা বলিল, "তুমি ঠিক কথাই বলেছ বউদিদি। কিন্তু আমার জানাশোনা এক-আধজন লোকের সঙ্গে বাজিয়ে দেখলাম, কনসার্ট ত নিশ্চয়ই হয় না, কনসার্টের বিপরীতই হয়।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "হাাঁ, যোগ করলে সব সময়েই সংযোগ হয় না; অনেক সময়ে গোলযোগও হয়।" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি ত' সেতার বাজাতে পার দিবা, তুমি যূথিকার সঙ্গে বাজাও না, দেখি কেমন হয়।

এ প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি করিয়া দিবাকর বলিল, "ওঁর অত ভাল বাজনার সঙ্গে আমি বাজালে সংযোগ ত' হবেই না, হয় গোলযোগ হবে, না হয় হবে দুর্যোগ।"

হেমেন্দ্র বলিল, "আমি অবশ্য দু বৎসরের মধ্যে তোমার সেতার বাজানো শুনিনি, কিন্তু তখনই যা বাজাতে এ দু বৎসরে নিশ্চয় তার চেয়ে অনেক উন্নতি করেছ।" বলিয়া সেতারটা দিবাকরের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, "নাও, বাজাও।"

সেতারটা অগত্যা তুলিয়া লইয়া যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "আমার সঙ্গেও আপনার কনসার্ট হবে না, কনসার্টের বিপরীতই হবে।" বলিয়া সেতারে একটা ঝঙ্কার দিল।

কিন্তু ভীমপলশ্রীর গৎটা যখন যূথিকা এসরাজে এবং দিবাকর সেতারে বাজাইয়া শেষ করিল তখন দেখা গেল উভয়ের সংযোগে যাহা উৎপন্ন হইল তাহা কনসার্টের বিপরীত কোনো বস্তু নিশ্চয়ই নহে।

যূথিকা উৎফুল্ল মুখে বলিল, "কি সুন্দর বাজান আপনি! কোথায় লাগে এর কাছে আমার বাজনা!"

সহাস্য মুখে দিবাকর বলিল, "এ কথা এতই অপ্রকৃত যে এর প্রতিবাদ করাও আমি অন্যায় মনে করি।"

আনন্দিত কণ্ঠে গৌরী বলিল, "ঠিক এই জিনিসটাই আমি বিশেষভাবে চাচ্ছিলাম।"

প্রফুল্ল মুখে হেমেন্দ্র বলিল, "কারণ, ঠিক এই জিনিসটারই নাম হচ্ছে কনসার্ট।"

যূথিকার হস্ত হইতে এসরাজটা চাহিয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "এবার জয়জয়ন্তীর গতে আপনি সেতার বাজান, আর আমি বাজাই এসরাজ।"

সবিস্ময়ে গৌরী বলিল, "তুই এসরাজ বাজাতেও জানিস না-কি দিবা?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "ঐ সেতারেরই মত দিদি।"

যূথিকা বলিল, "তা যদি হয় তা হ'লে ত খুব চমৎকারই জানেন।" বলিয়া দিবাকরের সম্মুখ হইতে সেতারটা তুলিয়া লইল।

জয়জয়ন্তী শেষ হইলে সানন্দ উৎসাহে হেমেন্দ্র বলিল, "আজ আমাদের উৎসব আদ্যোপান্ত সফল হবে কি-না বলতে পারিনে, কিন্তু তার আদি আর অন্ত যে চমৎকার হবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম।"

(৮৫১)

স্থির হইল ভীমপলশ্রীর বাজাইবে এসরাজ এবং ি

সেতার,—এবং জয়জয়ন্তীর গতে যূথিকা বাজাইবে সেতার এবং দিবাকর এসরাজ।"

গৌরী বলিল, "এবার তোমরা দুজনে বার কতক গৎ দুটো বাজিয়ে বাজিয়ে বেশ ক'রে অভ্যাস ক'রে নাও ; আমরা ততক্ষণ অন্যদিকের ব্যবস্থা দেখিগে। কিন্তু যাবার আগে আর একবার আমাদের শুনিয়ে যেয়ো যূথিকা।"

প্রফুল্ল মুখে যূথিকা বলিল, "আচ্ছা।"

হেমেন্দ্র ও গৌরী, প্রস্থান করিলে দিবাকর এবং যূথিকা বহুক্ষণ ধরিয়া যন্ত্র পরিবর্তন করিয়া করিয়া ভীমপলশ্রী এবং জয়জয়ন্তী রাগিণী বাজাইতে লাগিল। সুরের সহিত সুর মিলাইবার জন্য তাহাদের প্রগাঢ় তন্ময়তা ক্রমশ যেন একটা গভীর নেশায় রূপান্তরিত হইয়া উভয়ের মনকেও আবিষ্ট করিয়া ধরিল। বাজাইবার ফাঁকে ফাঁকে অকস্মাৎ চকিত চক্ষের অকারণ দৃষ্টি বিনিময় হয় এবং পরক্ষণেই একের মুখে ফুটিয়া উঠে অতি ক্ষীণ মৃদু হাস্য এবং অপরের মুখে দুর্নিরীক্ষ্য রক্তিমা।

ড্রয়িং রুমের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। এসরাজটা ফরাসের উপর স্থাপন করিয়া দিবাকর বলিল, "আর না-হয় থাক ?"

মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "থাক।" তারপর সেতারটা ধীরে ধীরে এসরাজের পাশে স্থাপন করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আপনি তখন দুর্যোগ আর গোলযোগের কথা বলছিলেন, কিন্তু আমি ত' দেখছি মস্ত সুযোগ।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে হাসি দেখা দিল ; "সুযোগ ত' আমি দেখছি আমার !"

সকৌতূহলে যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার আবার কিসের সুযোগ ?"

দিবাকর বলিল, "এই রকম ক'রে সংগীতের মধ্য দিয়ে আপনার সংগে পরিচিত হবার।"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "সে সুযোগ আমারও ত' নিতান্ত কম নয় ; কিন্তু আমি বলছিলাম আপনি আসাতে আমার বাজাবার সুযোগের কথা।"

দিবাকর বলিল, "আগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, তারপর সে কথা বলবেন।"

কিন্তু পরীক্ষায় উভয়েই সগৌরবে উত্তীর্ণ হইল। আমন্ত্রিত জনতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসারবে উৎসবগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

উৎসব শেষে দিবাকরকে এক সময়ে একান্তে পাইয়া যূথিকা বলিল, "এ প্রশংসার আপনার অংশ কিন্তু বারো আনারও।"

...শহরে এর দিবাকর বলিল, "নিজ অংশ থেকে যদি আট আনা আমাকে দান করেন, তা হ'লে নিশ্চয় বারো আনা।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তা নয় ; সত্যিই বারো আনা।"

আরও দুই চারিটা কথার পর প্রস্থানোদ্যত হইয়া যূথিকা বলিল, "চললাম দিবাকরবাবু।"

বিস্মিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কোথায় চললেন ?"

"বাড়ি।"

"বাড়ি কেন ?"

দিবাকরের প্রশ্নে হাসিয়া ফেলিয়া যূথিকা বলিল, "বাড়িতেই থাকি।"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া দিবাকর বলিল, "তা' তো থাকেনই। আমার জিজ্ঞাসা করবার উদ্দেশ্য, এত শীঘ্র বাড়ি কেন ?"

বাম হস্তের রিস্ট-ওয়াচের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা স্মিতমুখে বলিল, "পৌনে নটা বাজে।"

"কিন্তু সাড়ে দশটা ত' বাজেনি মিস্ মুখার্জ্জি !"

পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া যূথিকা বলিল, "না, তা বাজেনি। কিন্তু এ গাড়িতে না গেলে গাড়ির অসুবিধা হবে; আগের গাড়িতে বাবা আর মা চ'লে গেছেন।"

ব্যগ্র কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "চ'লে গেছেন ? তা হ'লে ত তাঁদের সংগে আলাপ করা হ'ল না !"

"আপনি ত' এখন কিছুদিন আছেন,—পরে করবেন।"

"তাই করব। কাল আসছেন ত' মিস্ মুখার্জি ?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আমি ত' আজ দুবার এলাম, কাল ত' আপনার যাওয়ার পালা।"

ঈষৎ অপ্রতিভ কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "ও তাও ত' বটে। আচ্ছা আমিই যাব। কখন যাব বলুন? সকালে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "সকালে একজনদের আসবার কথা আছে। সন্ধ্যার সময়ে যাবেন ? কেমন?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "সকালে যখন অসুবিধা, তখন অগত্যা সন্ধ্যার সময়েই যাব।"

"আচ্ছা, নমস্কার।"

হস্তোত্তলন করিয়া দিবাকর বলিল, "নমস্কার।"

৩

পরদিন সকালে হেমেন্দ্রনাথ তাহার অফিস ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল, এমন সময়ে যূথিকার পিতা হরলাল মুখোপাধ্যায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হেমেন্দ্র বলিল, "আসুন কাকাবাবু, কি খবর বলুন ত ?"

হেমেন্দ্রনাথের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া হরলাল বলিলেন, "বাবা হেমেন্দ্র, আমি তোমার শরণাপন্ন হ'লাম !"

হরলালকে চেয়ারে বসাইয়া হেমেন্দ্র বলিল, "বুঝেছি কাকাবাবু, সম্ভবত দিবাকরের সংগে যূথিকার বিয়ের কথা আপনি বলছেন। কাল রাত্রে কাকিমাও গৌরীকে এ বিষয়ে অনুরোধ ক'রে গেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হবে ব'লে ত' মনে হয় না।"

ব্যগ্রকণ্ঠে হরলাল বলিলেন, "যূথিকার আমি জন্মদাতা, কিন্তু তুমি তাকে নিজের হাতে গ'ড়ে তুলেছ। আমি তার বেশি আপনার, না তুমি,—তা ঠিক ক'রে বলা কঠিন হেমেন্দ্র। যূথিকার এত বড় মঙ্গল যে ক'রেই হোক তোমাকে করতে হবে বাবা।"

হেমেন্দ্র বলিল, "দেখুন কাকাবাবু, যূথিকা পর হ'য়ে যাবে না, সে আমার এত নিকট আর আদরের আত্মীয় হবে, এর চেয়ে লোভনীয় ব্যাপার আমার পক্ষে খুব বেশী নেই। যতটা দেখছি, এ বিষয়ে গৌরীর আগ্রহও আমার চেয়ে কম নয়, হয়ত' বেশীই। কিন্তু শুধু আমাদের কথা ভাবলেই ত' চলবে না; যে দুজনের বিয়ে প্রধানত তাদের দিক থেকেই ত কথাটা ভেবে দেখতে হবে।"

হরলাল বলিলেন, "কি ভেবে দেখতে হবে বল ?"

হেমেন্দ্র বলিল, "যূথিকার কথা ভেবে দেখুন। সে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর এম-এ পাশ; আর, দিবাকর বার দুই তিন ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করেছে। এরূপ অবস্থায় এ বিয়ের প্রস্তাব যূথিকা হয় ত' মনে মনে পছন্দ না করতেও পারে।"

হরলাল বলিলেন, "এ বিষয়ে তা হ'লে তোমার ওপর ভার রইল হেমেন্দ্র। তুমি যূথিকাকে পরীক্ষা ক'রে দেখে তারপর যা ভাল মনে হয় স্থির করো। যূথিকাকে তুমি শুধু বিদ্যে দানই করনি বাবা, দৃষ্টিদানও করেছ। সেই দৃষ্টি দিয়ে সে শুধু দিবাকরের ফেল করাটাই দেখবে আর কিছুই দেখবে না, এ আমার কিছুতেই মনে হয় না।"

হেমেন্দ্র বলিল, "আমিও তাই আশা করি। কিন্তু বাধাটা দিবাকরের দিক দিয়েই খুব গুরুতর হবে বলে মনে হয়। যূথিকা এম-এ পাশ শুনলে সে কিছুতেই তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না। কাল কলকাতা থেকে আমার ছোট শালা নিশাকরের চিঠি এসেছে। সে লিখেছে, এবার কলকাতার

দিবাকরকে সে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে দেখিয়েছিল, দিবাকরের পছন্দও হয়েছিল খুব, কিন্তু মেয়েটি ম্যাট্রিক পাশ শুনে, সাপ দেখলে মানুষ যেমন আতঙ্কে পালায়, ঠিক তেমনি করে লাহোরে পালিয়ে এসেছে।"

অন্তরাল হইতে গৌরী এতক্ষণ সব শুনিতেছিল, এবার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কিন্তু যূথিকা ত' ম্যাট্রিক পাশ করা মেয়ে নয়। সুতরাং তার কথা স্বতন্ত্র। তার কথা শুনে দিবাকর লাহোর থেকে পালিয়ে না যেতেও পারে।"

গৌরীর কথা শুনিয়া হরলাল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "এ তুমি কি আশা কর বউমা? দিবাকরকে তুমি রাজি করতে পারবে?"

গৌরী বলিল, "হয়ত পারব। কিন্তু সে পথ যখন একেবারে নিরাপদ নয়, তখন বিয়ে দিতে হলে যূথিকার পাশ করার কথা লুকিয়ে রেখেই দিতে হয়।"

হেমেন্দ্র বলিল, "তারপর? বিয়ের পর যেদিন সে জানতে পারবে, যূথিকা তার এম-এ পাশ করা স্ত্রী, সেদিন কি হবে?"

গৌরী বলিল, "সেদিনের ভাবনা আমাদের নয়; সেদিন সামলাবে যূথিকা।" তাহার পর হরলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ বিয়ের বিষয়ে আপনারা যদি মনস্থির করে থাকেন কাকাবাবু, তাহলে দিবাকরের ব্যাপার আমার আর যূথিকার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আপনারা অন্য সব ব্যাপারে মন দিন।"

যুক্ত কর ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করিয়া, হরলাল বলিলেন, "জয় মা গৌরী! আমি তাহলে তোমারই শরণাপন্ন হয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।"

হেমেন্দ্র বলিল, "কিন্তু যূথিকার পাশের কথা লুকিয়ে রেখে বিয়ে দিতে হলে দিবাকরকে এখানে বেশি দিন আটকে রাখা চলবে না। হঠাৎ কারো মুখে পাশের কথা শুনে ফেললে, তখন সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। বিয়েতে যদি তার সম্মতি পাওয়া যায়, তাহলে অবিলম্বে তাকে অন্য কোথাও চালান দিতে হবে।"

ঈষৎ চিন্তিত মুখে গৌরী বলিল, "কিন্তু সে-ও ত' ভারি কঠিন কথা! এত লেখালেখি করে এতদিন পরে তাকে আনিয়ে দুদিন যেতে না যেতেই কি করে বলা যায়,—এবার তুমি যাও।"

হেমেন্দ্র বলিল, "সেটা কৌশলে বলতে হবে। ধর, মিরাটে যোগেনের কাছে তাকে পাঠানো কতকটা সহজ হতে পারে।"

যোগেন্দ্র হেমেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সহোদর। সকৌতূহলে গৌরী বলিল, "মিরাটে কি ক'রে পাঠাবে?"

হেমেন্দ্র বলিল, "কিছুদিন থেকে ছোট-বউমার শরীর ত' অসুস্থ যাচ্ছে; হঠাৎ মিরাট থেকে এমন একটা চিঠি আসবে, যার জন্যে একবার তাঁকে দেখে-শুনে আসবার জন্যে তোমার মিরাট যাওয়ার দরকার হবে। আমার কলেজ; সুতরাং দিবাকরকে নিয়ে তুমি মিরাট যাবে। তারপর, সেই অসুখ-বিসুখের সংসারে এমন তুমি আটকে পড়বে যে, দিবাকরকে বাঙলা দেশে চালান না দিয়ে কিছুতেই লাহোরে ফেরা তোমার সম্ভব হবে না।" বলিয়া হেমেন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গৌরী বলিল, "তার-পর, দিবা যদি মিরাটে এক মাস ধরে' ছোট-ঠাকুরপোর সঙ্গে বসে আড্ডা দেয়, তাহলে আমাকেও ত' ঘর-সংসার ফেলে সেখানে এক মাস বসে থাকতে হবে?"

হেমেন্দ্র বলিল, "নিশ্চয় হবে। পরোপকার করতে গেলে কিছু-না-কিছু আত্মোৎসর্গ করতেই হয়।"

"আচ্ছা, সে যেমন হয় পরে করা যাবে। উপস্থিত আর কি কথা আছে বল?"

হেমেন্দ্র বলিল, "আর দুটি কথা আছে। প্রথম কথা, উদ্দেশ্য সাধু হলেও উপায় যখন অবলম্বন করা হচ্ছে অসাধু, তখন অপরাধের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে তোমার, কারণ তুমি হচ্ছ দিবাকরের ভগ্নী; আর আমার হচ্ছে দ্বিতীয় দায়িত্ব, কারণ আমি তার ভগ্নিপতি।"

হরলাল সহাস্যমুখে বলিলেন, "তাহলে তৃতীয় দায়িত্ব আমার। কিন্তু তা নয় বাবা, এ যদি একান্তই অপরাধ হয় ত' এর সব দায়িত্বই আমার।"

হেমেন্দ্র বলিল, "না কাকাবাবু, এ অপরাধে আপনার কোনো অংশ নেই; কন্যাদায় হচ্ছে এমন একটা বিপদ, যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে ছলই বলুন, বলই বলুন, আর কৌশলই বলুন সব কিছুই অবলম্বন করা যেতে পারে।"

গৌরী বলিল, "তোমার দ্বিতীয় কথা কি?"

"আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ যদি করতেই হয় ত' চটপট করে' ফেল; এ-সব ব্যাপারে Delay is dangerous."

হেমেন্দ্রনাথের এ উপদেশ পালন করিতে গৌরী অবহেলা করিল না, সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্বে গাড়ি পাঠাইয়া যূথিকাকে আনাইয়া লইল।

ক্ষণকাল তাহার সহিত কথোপকথনের পর হেমেন্দ্রর নিকট উপস্থিত হইয়া সহাস্য-মুখে সে বলিল, "শুনছ? রাজি।"

সকৌতূহলে হেমেন্দ্র বলিল, "ষোল আনা?"

"মনে হল; দু-আনা বেশি। কালই সেতারে-এস্‌রাজে বিয়ে হয়ে গেছে; মানুষে মানুষে যতটুকু বাকি আছে, তার জন্যে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।"

"দিবাকে রাজি করতে পারবে ত'?"

ঈষৎ উচ্ছ্বাসের সহিত গৌরী বলিল, "ও-মা! এখন আর 'করতে পারবে ত'' বললে চলবে না,—এখন করতেই হবে। যূথিকার সঙ্গে কথা কওয়ার পর কতটা দায়িত্বের মধ্যে পড়লাম, বল দেখি! কিন্তু মনে হচ্ছে, ভগবানই এর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। হয়ত দিবাকে নিয়েও তেমন কিছু বেগ পেতে হবে না; সহজেই কার্য-সিদ্ধি হবে।"

ঔৎসুক্যের সহিত হেমেন্দ্র বলিল, "কেন সে কিছু বলেছে না কি?"

গৌরী বলিল, "মুখ ফুটে কিছু বলে নি, কিন্তু কাল থেকে যূথিকার বাজনার বিষয়ে যখন তখন যে রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে, তাতে মনে হয়, সে উচ্ছ্বাসটা শুধু সেতার আর এস্‌রাজের কথা ভেবেই নয়।" বলিয়া মৃদু হাস্য করিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "ঠিক যেমন বিয়ের সময়ে আমি আমার অদৃষ্টের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতাম শুধু শ্বশুর মশায়ের বিষয় আর সম্পত্তির কথা ভেবেই নয়।"

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি যে তোমার শ্বশুরমশায়ের বিষয়-সম্পত্তির কথা কত ভাবতে, তা জানতে আর আমার বাকি নেই।"

স্মিতমুখে হেমেন্দ্র বলিল, "তুমি কি তা হ'লে বলতে চাও গৌরী, আমি আমার শ্বশুরমশায়ের কন্যার কথাই শুধু ভাবতাম?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গৌরী বলিল, "ওরে, বাপ্‌রে! সে কথা কখনো বলতে পারি! শ্বশুরমশায়ের কন্যেকে বড়লোকের মেয়ে ভেবে তুমি ত' প্রায় নাকচ ক'রে দিয়েছিলে।"

"তারপর?"

"তারপর?—তারপর, হঠাৎ দয়াই হ'ল, না খেয়ালই হ'ল, চোখ-কান বুজে বড়-লোকের মেয়েকে বিয়ে ক'রে ফেললে।" বলিয়া গৌরী হাসিতে লাগিল।

স্মিতমুখে হেমেন্দ্র বলিল, "তারপর?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গৌরী বলিল, "না রে! বিয়ের পরের 'তারপর' ত' তুমি বলবে।"

হেমেন্দ্র বলিল, "বলতে আমার আপত্তি নেই,—কিন্তু সে 'তারপর' শুনলে তোমার মনে গর্ব হবে গৌরী।"

মাথা নাড়িয়া গৌরী বলিল, "না, না, সে 'তারপর' শোনা এখন থাক। এ-সব কথায়

(শেষাংশ ৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভূগর্ভে গ্রীসীয় সভ্যতার ইতিহাস

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য

এথেন্স

আমেরিকান স্কুল অব ক্লাসিকাল স্টাডিস ৮ বছর যাবত এথেন্সের আগোরায় মাটি খুঁড়ে যেসকল তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, তাতে প্রাচীন গ্রীস ও গ্রীসীয় সভ্যতার অনেক-কিছু জানা গেছে। আজ যেখানে বহু আধুনিক ঘর-বাড়ি নির্মিত হয়েছে, প্রাচীন যুগের এথেনিয়ানরা সেখানে শত শত বছর ধরে তাঁদের শিল্প ও সংস্কৃতির সঞ্চয় রেখে গেছেন। কিন্তু মাটি খুঁড়ে সেগুলি বার কর্তে অন্তত ১৯০,০০০ টন মাটি সরাতে হয়েছে। আমেরিকান স্কুল অব ক্লাসিক্যাল স্টাডিস দীর্ঘদিন যাবত এ কাজ করে এসেছেন এবং প্রাপ্ত ঐতিহাসিক সম্পদকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

এখানে মনে রাখতে হবে, এথেন্স বহু-বার আক্রমণকারী শত্রুবাহিনীর পদানত হয়েছিল। শত্রুরা কেবলমাত্র সামরিক



ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি মৃত্পাত্র

সম্পদকেই ধ্বংস করে নাই, ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্বের বহু সম্পদকেও তারা আক্রোশ-ভরে ধ্বংস করেছে। খৃঃ পূর্ব ৪৮০ অব্দে পারসিকরা, রোমানরা খৃঃ পূর্ব ৮৬ অব্দে এবং এলারিকের অধীনে গথরা ৩৯৬ খৃঃ অব্দে এথেন্স অভিযান চালিয়েছেন। ফলে, এই দাঁড়িয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাতন ঘর-বাড়ির কেবলমাত্র ভিত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু তথাপি সেগুলি চিনে নিতে কোন কষ্টই হয় নাই। প্রাচীন লেখক গোষ্ঠী, বিশেষত পসানিয়াসের লেখা অনুসারেই এ সকল ঘর-বাড়িকে চিনে নিতে হয়েছে। পসানিয়াস ছিলেন একজন পর্যটক। খৃস্ট জন্মের দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই পর্যটক এথেন্সে আবির্ভূত হন। অবশ্য কোনরূপে 'গাইড-বুক' লেখা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু এমন সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে তিনি সমস্ত বর্ণনা করে গেছেন যে, আমেরিকান ক্লাসিক্যাল স্টাডিসের কাজ অনেকাংশে সহজ হয়েছে।

পসানিয়াসের লেখা থেকেই আমরা বিখ্যাত মন্দির ও ঐতিহাসিক ভবন চিনে নিতে পারি। থলোস, Portico of Zeus, আরেশের মন্দির কোন কিছুকেই চিনে নিতে তেমন কষ্ট হয় না। শুধু ক্লাসিক্যাল যুগের নয়, তারও পূর্ববর্তী যুগে মার্কেট প্লেসের যে ভৌগোলিক অবস্থা ছিল, তা জানা গেছে। খৃস্ট জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্ব থেকে আধু-নিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যে সকল সম্পদ ভূগর্ভে ক্রমশ সঞ্চিত হয়েছে, তার একটা ধারাবাহিক তালিকাও প্রস্তুত হয়েছে। বিভিন্ন ভূস্তর সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক-দিগকে এ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং আনুমানিক ৩৮ হাজার জিনিসের তালিকা তৈরী হয়েছে। মাটি খুঁড়বার কাজ আরম্ভ হবার পূর্বে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক বিবরণ সমন্বিত জিনিস ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না। কেননা, এথেন্স- আক্রমণকারীরা তাম্রলিপি বা শিলালিপি ধ্বংস করবার ব্যাপারে খুব উৎসাহান্বিত ছিল— এমন কিছু প্রমাণ নাই। অবশ্য একথা ঠিক, যতটা আশা করা গিয়েছিল, তার চাইতেও অনেক বেশী সংখ্যায় এ সমস্ত জিনিস পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত যে ৫৫০০ খোদিত রচনা পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে সোলোন রচিত আইন, আলকাইবিডসের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির সরকারী তালিকা, মারেথনে নিহত এথেন্সবাসীদের সম্মানার্থে রচিত, সাইমনাইড ও একিলাসের রচিত কবিতা প্রভৃতি রয়েছে। প্রাচীন যুগের এথেন্সের বিচারপতিদের নামও পাওয়া গেছে বিভিন্ন দলিল-পত্র থেকে। যে সমস্ত অনারারী ডিগ্রি দেওয়া হত, তার সন তারিখ থেকে প্রাচীন যুগের গ্রীসীয় ক্যালে-ণ্ডারের পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রাচীন যুগে কোন ব্যক্তিবিশেষকে এথেন্স থেকে নির্বাসন করবার প্রয়োজন হলে নগরবাসীদের ভোট গ্রহণ করা হত। এ সম্পর্কে ২৮৯খানা ভোট-গ্রহণ-পত্র পাওয়া গেছে। দেখা যায়, প্রথম যে ব্যক্তিকে এথেন্স থেকে ভোটের জোরে নির্বাসিত করা হয়েছিল, তাঁহার নাম পাহিরাকোস এবং তিনি চারমোসের পুত্র। খৃস্ট পূর্ব ৪৮৭ অব্দে তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন। এ সকল ব্যালট কেবলমাত্র সামরিক দলিল। এদের ঐতিহাসিক মূল্য ত আছেই তা-ছাড়া এথেন্সবাসীদের বর্ণবিন্যাস সম্পর্কেও প্রকৃষ্ট পরিচয় এগুলিতে রয়েছে। গ্রীক ও রোমান যুগের ভাস্কর্য-সম্পদও সকলকে বিস্মিত করেছে। কারুকার্যবিশিষ্ট পাত্র-গুলি চোখের সামনে রাখলে যেন সেই প্রাচীন যুগের কথা অতি সহজেই মনে পড়ে যায়। অনেকগুলি পাত্র এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। কবর ও কূপের মধ্যেই অধিকাংশ পাত্র পাওয়া গেছে। এমন সমস্ত কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে যে-গুলির সৃষ্টিকাল খৃস্ট পূর্ব তিন হাজার বছর আগেকার নিওলিথিক যুগ, বা খৃস্ট পূর্ব ১২০০ বছরের ধরা যেতে পারে। এ ছাড়াও এমন একটি পারিবারিক কবরের



Hernos'র ব্রঞ্জ মূর্তি

সন্ধান পাওয়া গেছে, যা খৃস্ট পূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে খোঁড়া হয়েছে বলে মনে হয়: সেখানে বয়স্কদের সুড়ঙ্গপথে কবর দেওয়া হয়েছে এবং শিশুদের কোন পাত্রে ভরে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। সারাটা গোরস্থান বেষ্টন করে এক দীর্ঘ প্রাচীর সেখানে রয়েছে। মৃত ব্যক্তিদের কঙ্কাল বিশ্লেষণ করে, তাহাদের চেহারায় পারি-বারিক সামঞ্জস্যও খুঁজে পাওয়া গেছে। একটি মেয়ের কবরে কারুকার্যখচিত ২৮টি পাত্র পাওয়া গেছে।

(শেষাংশ ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেড়াইতে থাকেন। ইহাতে বালক অমরনাথের অযত্নের সীমা-পরিসীমা রহিল না। নিরূপায় হইয়া অমরনাথের পিসিমা

বর্তন করিল না। নিরূপায় দীননাথ জ্ঞানদযতীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এ সব তোমাদের শিক্ষার ফল।" ক্রোভে,

পাইয়াছেন। আমি শারীরিক ভালো আছি। আশা করি আপনারাও কুশলে আছেন।

গেছে। কিন্তু তথাপি সেগুলি চিনে নিতে কোন কষ্টই হয় নাই। প্রাচীন লেখক

প্রাচীন যুগে কোন ব্যক্তিবিশেষকে এথেন্স থেকে নির্বাসন করবার প্রয়োজন

অব্যাত মেয়ের কবরে কারুকার্যখচিত ২৮টি পাত্র পাওয়া গেছে।

(শেষাংশ ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেড়াইতে থাকেন। ইহাতে বালক অমরনাথের অযত্নের সীমা-পরিসীমা রহিল না। নিরুপায় হইয়া অমরনাথের পিসিমা

বর্তন করিল না। নিরুপায় দীননাথ ভানুমতীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এ সব তোমাদের শিক্ষার ফল।" ক্ষোভে,

পাইয়াছেন। আমি শারীরিক ভালো আছি। আশা করি আপনারাও কুশলে আছেন।

কেন ব্যক্তিবিশেষকে ... ২৮৮

...নন কষ্টই হয় নাই। প্রাচীন লেখক এথেন্স থেকে নির্বাসন করবার প্রয়োজন ... পায় পাওয়া গেছে।

(শেষাংশ ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উত্তরাধিকারী

মালবিকা রায়

"বৌমা!"

"কেন বাবা?"

"আজও কোন চিঠিপত্র আসেনি মা?"

বিষণ্ণমুখে সাবিত্রী বলিল "না বাবা।"

দীননাথ চিন্তিত স্বরে বলিলেন, "তাই ত' মা, আমি ভেবেছিলাম আজ একটা চিঠি নিশ্চয়ই পাবো।" সাবিত্রী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বধূর বিষণ্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দীননাথের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। তিনি সস্নেহে বধূর আলুলায়িত কুন্তলের উপর হাত বুলাইয়া বলিলেন, "চুলও বাঁধনি দেখছি। নিজে না পারো, তোমার পিসিমাকে বললে ত' পারো মা।"

সাবিত্রী তেমনি নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আঙুলে একগোছা চুল জড়াইতে লাগিল।

দীননাথ অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তুমি কিছু ভেব না মা। আমি আজই অমরের খবর আনাচ্ছি। তুমি মনোহরদাদুকে জানো ত—তিনি আমাদের উকীল, তার ভাইপো শচীন বিলেতে গেছে, আমি আজই তার কাছে টেলিগ্রাম করছি। কালের মধ্যেই খবর এসে যাবে। রাধাবল্লভজীকে ডাকো, তিনি সব মঙ্গল করবেন।"

বধূকে সান্ত্বনা দিয়া দীননাথ যেন নিজ অন্তরে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তিনি বাহির হইয়া গেলে সাবিত্রী দুই হাত জোড় করিয়া মনে মনে বলিল, "হে ঠাকুর, তাই যেন হয়। তিনি যেন ভালো থাকেন, আর আমি কিছু চাই না প্রভু।"

সাবিত্রীর প্রার্থনা সফল হইল। পরদিন টেলিগ্রামের উত্তর আসিল—"অমর ভালো আছে।" সাবিত্রীর দুই চোখে আনন্দ-অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

* * * *

কিষণপুরের জমিদার হরনাথ ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। হিন্দুধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। স্বীয় পুত্র দীননাথকেও তিনি নিজ আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন। দীননাথ কিন্তু অমরনাথকে নিজ আদর্শে গঠিত করিতে সমর্থ হন নাই।

অবশ্য তাহার কারণও ছিল। অমরনাথের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তাহার জননী ইহলোক ত্যাগ করেন। দীননাথ প্রথমে শোকে অধীর হইয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। ইহাতে বালক অমরনাথের অযত্নের সীমা-পরিসীমা রহিল না। নিরুপায় হইয়া অমরনাথের পিসিমা ভানুমতী অমরকে কলিকাতায় নিজ গৃহে লইয়া আসেন।

ভানুমতীর স্বামী দিবাকরকে গোঁড়া হিন্দু বলা চলে না। অপুত্রক দিবাকর অমরনাথকে অত্যন্ত স্নেহের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং অমরকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন। ইংরেজি শিক্ষার গুণেই হোক, অথবা দিবাকরের চালচলনের জন্যেই হোক, অমর গোঁড়া হিন্দু হইতে পারিল না।

একদিন অমর ও দিবাকর খাইতে বসিয়াছিল। অমরের মাথার দিকে চাহিয়া দিবাকর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে তোর মাথার উপর হিন্দুয়ানীর ধ্বজা দেখছি নে যে? কি ব্যাপার বল ত। তুই যে একেবারে ম্লেচ্ছ হয়ে উঠলি!"

অমর বাধা দিয়া বলিল, "আহা, মাথায় টিকি রাখলেই বুঝি খুব হিন্দু হওয়া যায়, না! তাই যদি হয়, তবে আমি ম্লেচ্ছ, একথা একবাক্যে স্বীকার করছি।"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "দেখছ গিন্নী তুমি আমাকেই ম্লেচ্ছ মনে কর, তোমার ভাইপো যে আমার চেয়েও এককাঠি সরেস।"

ভানুমতী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সবই আমার অদৃষ্ট। একে ত সেখানে তুমি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন বলে কত কথা শুনতে হয়। তারপর অমু যদি আবার তোমার মত হয়, তবে ত সোনায় সোহাগা। না, অমু, তুমি ও রকম হয়ো না। বামুনের ছেলে বামুনের মত থাকবে, ও সব কি?"

ভানুমতীর উপদেশ সত্ত্বেও অমর ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। দীননাথ যে ছেলের মনোভাব বুঝিলেন না, তাহা নহে। প্রথম শোকের বেগ কমিলে যখন তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন, অমর তখন ছুটি উপলক্ষে মাঝে মাঝে দেশে আসিত। সেই সময় হইতেই দীননাথ পুত্রের মনোভাব অবগত হইলেন।

যাহা হউক, এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু যে বৎসর অমর সম্মানের সহিত বি এ পাশ করিল, সেই বৎসরই গোলমাল বাধিল। অমর দিবাকরকে বলিল, "পিসেমশায়, আমি বিলেত যাবো, ডাক্তারী পড়তে।"

এই প্রস্তাবে দিবাকর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু দীননাথ ও ভানুমতী সম্মত হইলেন না। অমরও মত পরিবর্তন করিল না। নিরুপায় দীননাথ ভানুমতীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এ সব তোমাদের শিক্ষার ফল।" ক্ষোভে, অভিমানে ভানুমতী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অবশেষে দীননাথ বলিলেন "যদি বিলেত যাবেই তবে বিয়ে করে যাও।"

অমর অগত্যা রাজী হইল। যথাসময়ে সাবিত্রীর সহিত অমরের বিবাহ সম্পন্ন হইল। ইহার কিছুদিন পরে অমর বিলাত যাত্রা করিল।

বিলাতে পৌঁছিয়া অমর পিতাকে ও পত্নীকে নিয়মিত পত্র দিত। সাবিত্রীকে যে পত্র দিত তাহাতে খুব বেশী না হইলেও বসন্তের অরুণ রাগের চিহ্ন কিছু কিছু পাওয়া যাইত।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইল। সহসা একদিন অমরের চিঠি পাওয়া গেলো না। প্রথম সপ্তাহ, দ্বিতীয় সপ্তাহ, তৃতীয় সপ্তাহও কাটিয়া গেলো, তথাপি পত্র আসিল না। দীননাথ ও সাবিত্রী অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে দীননাথ শচীনকে টেলিগ্রাম করিয়া সংবাদ আনাইলেন।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরের কথা— দীননাথ রাত্রিকালে উপরে উঠিতে উঠিতে সাবিত্রীকে বলিয়া গেলেন, "বৌমা, তোমার খাওয়া হলে একবার আমার ঘরে যেও।"

কথা শুনিয়া সাবিত্রীর বুকের ভিতর কি এক অজানা আশংকায় কাঁপিয়া উঠিল। মনে মনে রাধাবল্লভকে প্রণাম করিয়া সাবিত্রী শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিল।

দীননাথ চোখ বন্ধ করিয়া শুইয়াছিলেন, সাবিত্রীর পদশব্দে উঠিয়া বসিলেন।

সাবিত্রী নতমুখে বলিল, "আমাকে ডেকেছিলেন?"

"হ্যাঁ" বলিয়া দীননাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "অনেকটা জানালে ত বৌমা!"

নিকটেই লণ্ঠন ছিল। সাবিত্রী আলো জ্বালিল। মাথার বালিশের তলা হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া দীননাথ সাবিত্রীকে পড়িতে আদেশ করিলেন। সাবিত্রীর বক্ষ কম্পিত হইল। প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সাবিত্রী পড়িল—

লণ্ডন,

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু,

সেদিন আপনার টেলিগ্রাম পাইয়া তৎমুহূর্তেই উত্তর দিয়াছি। নিশ্চয় পাইয়াছেন। আমি শারীরিক ভালো আছি। আশা করি আপনারাও কুশলে আছেন।

কাকাবাবু, আজ কর্তব্য বোধে একটি অপ্রিয় সংবাদ দিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি নিশ্চয় জানেন অমর এখানে যে পরিবারে বাস করে, তাহা আমার অত্যন্ত পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, আমার বন্ধু বলিয়াই অমর সে পরিবারে স্থান পাইয়াছে। সেই পরিবারের কর্তার নাম রবার্ট স্মিথ। স্বামী, স্ত্রী, একটি ১৯ বছরের মেয়ে আইরিণকে লইয়া এই সংসার। অমর ও আইরিণ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে থাকে, এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহের আলোচনাও হয়। মিঃ স্মিথ ইহা বুঝিতে পারিয়া অমরকে সাবধান করেন। কিন্তু আইরিণ পিতা-মাতার বিনা অনুমতিক্রমেই অমরকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হয়।

গত সপ্তাহে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি এই খবরের বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না। যখন জানিতে পারিলাম তখন ইহা নিবারণ করিবার কোন উপায়ই ছিল না। অমর এখন এডিনবরায়। নেটিভের সহিত বিবাহ হওয়ায় মিঃ স্মিথ অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছেন এবং সমাজে মান বাঁচাইবার জন্য কন্যা জামাতাকে এডিনবরায় প্রেরণ করিয়াছেন।

আমার সহিত অমরের দেখা হইয়াছিল, আমি তাহাকে তিরস্কার করায় সে কোন উত্তরই করিল না। কেবল বলিল, "বাবা আমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেন না। তবুও তুমি এ সংবাদ তাঁকে দিও। নিজে তাঁকে এ সংবাদ দেবার মত শক্তি আমার নেই। তাঁকে বলো আমি তাঁর অযোগ্য সন্তান। আর সাবিত্রী, তাকে বলবার আমার কিছুই নেই।"

আমাকে আপনি ক্ষমা করিবেন। অধিক কি আর লিখিব। ইতি—

প্রণত সেবক শচীন।

চিঠি পড়া শেষ হইয়া গেলো। তথাপি সাবিত্রী যন্ত্রের ন্যায় অচল হইয়া বসিয়া রহিল। কি যে পড়িল কিছুই বুঝিতে পারিল না। সহসা দীননাথের কণ্ঠস্বরে চেতনা ফিরিয়া আসিল, "চিঠি পড়া হোল, মা?"

সাবিত্রী মস্তক হেলাইয়া উত্তর দিলো, হ্যাঁ।

দীননাথ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এ সংবাদ তোমাকে আমি দিতাম না। পরে সাত পাঁচ ভেবে জানানোই স্থির করলাম। তুমি বোধ হয় আমাকে খুব স্নেহশীল মনে কর। স্নেহশীল আমি বটে, কিন্তু কঠোরও আমি কম নই। সে ঠিকই বুঝেছে আমি কোনদিন তাকে ক্ষমা করতে পারবো না। আজ থেকে আমি মনে করবো আমার ছেলে নেই—না, না, তুমি অমন কোর না, মা, মনকে দৃঢ় কর। তুমি মনে কর যে তুমি আজ থেকে বিধবা।

বর্ষাকাল। ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সন্ধ্যাও হইয়াছে। একটি যুবক দ্রুতপদে কলিকাতার একটি সংকীর্ণ গলিতে প্রবেশ করিয়া একটি জীর্ণ গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কড়া নাড়িতে হইল না। দুয়ার আপনিই খুলিয়া গেলো এবং একটি কোমল বাহু বন্ধন যুবককে বেষ্টন করিয়া ধরিল। যুবক গৃহে প্রবেশ করিল।

আইরিন্ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "তোমার এত দেরি হোল কেন? ইস, একেবারে যে ভিজে এসেছ! তুমি কাপড় বদলে নাও, আমি তোমার জন্য চা নিয়ে আসি।"

অমর বাধা দিয়া বলিল, "চা পরে এনো, রাণু। তার আগে তোমাকে একটা শুভ সংবাদ দিই, আমি একটা চাকরী পেয়েছি, পরশু থেকে জয়েন করতে হবে। বেতন অবশ্য বেশী নয়, মোটে চল্লিশ টাকা।" বলিতে বলিতে অমরের মুখ ম্লান হইয়া গেলো।

আইরিন্ তাহা লক্ষ্য করিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "চল্লিশ টাকা, উঃ, তাতে আমাদের বেশ স্বচ্ছন্দে দিন চলে যাবে।"

অমর গভীর দৃষ্টিতে আইরিনের দিকে চাহিয়া বলিল, "চল্লিশ টাকাতে আজ তোমার খুবই স্বচ্ছন্দে দিন যাবে, কিন্তু রানু, চল্লিশ টাকাকে তুমি একদিন কত তুচ্ছ মনে করতে, মনে আছে কি?"

"তোমার যত বাজে কথা", বলিয়া আইরিন্ দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল। কিছুক্ষণ পরে চা লইয়া আসিয়া তিরস্কারের সুরে অমরকে বলিল, "আচ্ছা তুমি কেন অমন করে' বল, বল ত? জানো না ওতে আমি কত ব্যথা পাই?"

আইরিনকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া অমর বলিল, "তোমাকে ব্যথা দেবার জন্য বলিনি, রানু, অনেক ব্যথা পেয়েই বলেছি। সত্যিই মনে হয় তোমাকে বিয়ে করে খুব অন্যায় করেছি। তোমাকে তোমার আত্মীয়-স্বজনের বিরাগভাজন করেছি, সমস্ত সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছি, কিন্তু সুখী করতে পারিনি।"

আইরিন্ বাধা দিয়া বলিল, "অর্থই যদি মানুষের সব চেয়ে বড় কাম্য হয়, তবে তুমিই-বা কেন অর্থ সম্পদকে তুচ্ছ করে' আমাকে বরণ করে নিলে? অর্থ ত তোমার কম ছিল না?"

ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া আইরিন্ আবার ধীরে ধীরে বলিল, "আমরা পরস্পরকে ভালবেসে, পরস্পরকে বরণ করে নিয়েছি। দুঃখ আসবে, এ কথা ত দুজনেই জানতাম। কিন্তু সব দুঃখকে তুচ্ছই মনে হয়, কারণ, জানি—তুমি আমাকে ভালোবাস।"

আইরিন্‌কে বুকের মধ্যে চাপিয়া অমর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এই জন্যই কোন দুঃখকে দুঃখ বলে মনে হয় না কিন্তু তবুও সময় সময় তোমার কথা ভেবে মনটা কেমন অস্থির হয়ে পড়ে।"

অমরের বুকে মাথা রাখিয়া আইরিন্ বলিল, "ও-সব বাজে কথা ভেবো না, লক্ষ্মীটি! তাহলে সত্যিই আমি রাগ করবো।"

এইবার একটু পূর্বের ঘটনা বলা দরকার। আইরিন্‌কে বিবাহ করিয়া অমর প্রায় বছর-খানেক এডিনবরায় ছিল। সেখানে মিসেস স্মিথের কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল। অমর কোন একটা কাজকর্মের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিয়া অমর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল ও অবশেষে আইরিণকে বলিল, "দেখো, ভারতবর্ষে এর চেয়ে ঢের কম খরচে থাকা যায়। চল আমরা দেশে যাই।"

আইরিন্ সানন্দে সম্মত হইল। কিন্তু মিসেস স্মিথ ভয়ানক আপত্তি করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে তাঁহাকে বুঝাইয়া আইরিন্ কলিকাতায় আসিল। আসিবার সময় মিসেস স্মিথ যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহা অল্পদিনেই নিঃশেষ হইয়া গেলো। অমর আবার চাকরীর চেষ্টা শুরু করিল। প্রথমে কিছুদিন কিছুই করিতে পারিল না, অবশেষে বহুকষ্টে এই চল্লিশ টাকা বেতনের চাকরীটি জোগাড় করিল।

বেতন মাত্র চল্লিশ টাকা, কিন্তু খাটুনি অনেক। সকালে নয়টায় যায়, সন্ধ্যে আটটায় বাড়ি ফিরে। এইরূপ কষ্টসাধ্য চাকরী দেখিয়া আইরিন্ অত্যন্ত ব্যথা পাইল। খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে-ও একটি ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরী জোগাড় করিল। অমর প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, অবশেষে আইরিনের জেদে সম্মতি দিতে হইল।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেলো। আইরিন্ সহসা একদিন অসুখে পড়িল। অসুখ সামান্য, কিন্তু অমর ডাক্তার আনিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। ডাক্তার আসিলেন এবং জানাইয়া গেলেন, অসুখ সামান্য, তবে সাবধান হওয়া উচিত; কারণ রোগিণী অন্তঃসত্ত্বা।

অমরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তোমার আর কাজ-টাজ করা চলবে না—তা বলে দিচ্ছি কিন্তু।"

নিতান্ত বাধ্য হইয়া আইরিন্‌কে কাজ ছাড়িতে হইল।

অমর বলিল, "দেখো, খোকা যদি তোমার মত হয়, তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর হবে দেখতে।"

আইরিন্ লজ্জিত হাস্যে উত্তর করিল, "খোকা হবে কি খুকী হবে, তুমি কি করে জানলে?"

"যাই হোক না কেন, তোমার মত হলেই সে খুব সুন্দর হবে।"

"আর তোমার মত হলে?"

"লোকে বলবে কালো পেঁচা।"

"আহা কি কথার ছিরি।" আইরিন্ রাগ করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিল। অমর হাসিতে লাগিল।

একটু পরে বালিশ হইতে মুখ তুলিয়া আইরিন্ বলিল, "মাকে কিন্তু একটা খবর দিতে হবে।"

"কি খবর?"

"আহাঃ—কিছু যেন জানো না!"

"জানি, আমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট সার্থক করে দিয়ে স্বর্গ থেকে নেমে আসছে দেবদূত আমাদের পরে হাতে নিয়ে!"

সাবিত্রী সেদিন প্রথম নিজের চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরের দিকে চাহিবার অবকাশ পাইল, তখনই দেখিতে পাইল যে, অন্তরের দারুণ বিপ্লবে দীননাথ কিরূপ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছেন।

সাবিত্রীর নিজের উপর ধিক্কার জন্মিল। কেন সে এতদিন নিজেকে লইয়া ব্যস্ত ছিল? সে বলিল, "বাবা, আপনার শরীর ভেঙে পড়েছে—চলুন বাইরে বেড়িয়ে আসবেন।"

"তাতে স্বাস্থ্য খুব ভালো হবে,—না মা? —স্বাস্থ্য ভালো হবার মত বয়স আর কি এখনো আছে?" দীননাথ হাসিতে লাগিলেন।

মুখে যা-ই বলুন, সাবিত্রীর অনুরোধে তাঁহাকে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইতে হইল। দীননাথের ছেলেমেয়ে—সকলের স্থান আজ সাবিত্রীই গ্রহণ করিয়াছিল।

দীর্ঘ নয় মাস নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে দীননাথ কাশীতে আস্তানা গাড়িলেন। সাবিত্রী লক্ষ করিল, স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং স্বাস্থ্য আরো ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সাবিত্রী একথা বলিলে দীননাথ হাসিতে লাগিলেন, "যতই বল মা, বিশ্বেশ্বরের পায়ে যখন স্থান নিয়েছি, এখান থেকে আর কোথাও নড়ব না।"

দীননাথের এ আকাঙ্ক্ষা বিধাতা পূরণ করিলেন না। দেওয়ান অবিনাশচন্দ্র লিখিলেন কি একটা বিশেষ মোকদ্দমার জন্য জমিদারবাবুর অবিলম্বে উপস্থিতি প্রয়োজন।

দীননাথ বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিলেন। শরীর তাঁহার অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল, অল্পদিনের মধ্যেই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। সাবিত্রী ডাক্তার আনাইল। ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া দীননাথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমায় ভালো করতে পারবেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আপনার এমন কিই-বা হয়েছে?

ডাক্তার বাহির হইয়া গেলে দীননাথ আপনমনে হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ত ছেলেমানুষ বাবা, তোমার বাবা এলেও পারবে না।"

ডাক্তার বিদায় হইলে অবিনাশকে ডাকিয়া দীননাথ বলিলেন, "দেখুন, মনোহরবাবুকে আসবার জন্য একটা তার করুন ত!"

উকীল মনোহরবাবু অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আপনার অসুখ শুনে ভারি চিন্তিত ছিলাম। তার পেয়ে আরো চিন্তা বেড়ে গেল। এখন কেমন আছেন?"

"ভালোই, তুমি বোসো, মনোহর।" মনোহর বসিলেন।

দীননাথ বলিলেন "একটা উইল করবার জন্য তোমাকে ডেকেছি হে।"

"উইল, উইল কি হবে? তা যা করবার আপনি ভালো হয়ে করলে হ'ত না?"

"তখন যদি আর সময় না পাই মনোহর, কাজেই কাজগুলো সব এখন থেকেই শেষ করে রাখতে হবে যে।"

উইল লেখা হইল। মনোহর সংকুচিত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু এটা কি ঠিক হ'ল?"

গম্ভীর কণ্ঠে দীননাথ বলিলেন, "কি ঠিক—কি বেঠিক বোঝবার মত বয়স আমার হয়েছে।"

মনোহর চুপ করিয়া রহিলেন। দীননাথ বলিলেন, "উইলখানা তুমি কালই রেজিস্টারি করে পাঠিও।"

"আচ্ছা," বলিয়া মনোহর উঠিয়া গেলেন। দুপুরে মনোহর খাইতে বসিলে সাবিত্রী নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। মনোহর এ বাড়ির বহুদিনকার বন্ধু, সেজন্য সাবিত্রী তাঁহার সম্মুখে বাহির হইত। তাহা ছাড়া মনোহরের ভাইপো শচীন তাহার দূর-সম্পর্কীয় পিসতুতো ভাই হইত। এই কারণে সাবিত্রী মনোহরের সম্মুখে বাহির হইতে অভ্যস্ত ছিল।

সাবিত্রীকে দেখিয়া মনোহর কুশল প্রশ্ন করিলেন, তারপর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখো, মা, কর্তা রোগে-শোকে পাগলের মত হয়ে যদি একটা অন্যায় করেন, তোমার তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয় কি? অবশ্য তোমার প্রতি সে যথেষ্টই অন্যায় ব্যবহার করেছে বটে, তবুও—"

"কি হয়েছে, পিসেমশায়?"

মনোহর তাহাকে উইলের বিষয় সমস্ত খুলিয়া বলিলেন।

দীননাথ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সাবিত্রীকে দান করিয়াছেন। তাহাতে অমরের নাম কোথাও নাই। শুনিয়া সাবিত্রী স্তব্ধ হইয়া রহিল, কিন্তু সুখী হইতে পারিল না। অমরের কথায় তাহার বুকের ভিতরটা অসহ্য বেদনায় গুমরাইয়া উঠিল। অমর তাহাকে ব্যথা দিয়াছে, কিন্তু সে অমরের ব্যথার কারণ হইতে পারিবে না। সে যাহাই করুক, একদিন সে যে তাহার ধ্যানের দেবতা ছিল। আজও পূজার সময় সিংহাসনে উপবিষ্ট দেবতাকে ধ্যান করিতে বসিলে অমরের মূর্তিই ভাসিয়া উঠে যে!"

দৃঢ় মনে, সংকল্প স্থির করিয়া সাবিত্রী দীননাথের কক্ষে প্রবেশ করিল। দীননাথ শুইয়াছিল, বধূকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খেয়েছো মা?"

দৃঢ় মনে সংকল্প স্থির করিয়া সাবিত্রী দীননাথের কক্ষে প্রবেশ করিল। দীননাথ শুইয়াছিল, বধূকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"খেয়েছো মা?"

"হ্যাঁ" বলিয়া সাবিত্রী নিকটে উপবেশন করিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সাবিত্রী বলিল, "আপনি কি সব উইল করেছেন, শুনলাম।"

"হ্যাঁ," বলিয়া দীননাথ চুপ করিলেন।

"কিন্তু এটা কি ঠিক!"

"কি ঠিক কি ঠিক নয়, সেটা কি তুমি আমাকে বোঝাবে মা?"

"বাবা, তিনি আপনার কাছে অপরাধী, আপনি তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়ে যদি থাকে, তাদের আপনি কি বলে নিজের অধিকার থেকে—"

"কি করে অধিকারচ্যুত করবো, না মা! বলে যাও তুমি আমি আমার সংকল্প স্থির আছি। আর শাস্তি! শাস্তি কাকে দেবো মা? যার শরীরের প্রতি শিরায়-উপ-শিরায় আমার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, যার অণু-পরমাণুর সঙ্গে আমার অণু-পরমাণু মিশে আছে তাকে?"

দীননাথ চোখ মুদিলেন। চোখ মুদিয়া দেখিলেন, একটি সুবেশা সুন্দরী একটি ফুল্লকুসুমতুল্য শিশুকে বক্ষে ধরিয়া আদর করিতেছে। কিন্তু শিশু ব্যাকুল বাহু প্রসারিত করিয়া পিতার ক্রোড়ে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে। তাহার কাণ্ড দেখিয়া জনক-জননী উভয়েই হাসিয়া আকুল হইতেছেন। দীননাথ চোখ খুলিয়া দুই

হস্ত যোড় করিয়া রাধাবল্লভের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

সহসা দীননাথের দৃষ্টি পড়িল সাবিত্রীর দিকে। মূর্তিমতী বিষণ্ণতা। দীননাথের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া দীননাথ বলিলেন, "আমাকে তুমি বড় নিষ্ঠুর ভাব, না মা! ঠিক-ই ত! যে তার একমাত্র সন্তানকে চিরদিনের জন্য অন্তর থেকে নির্বাসন দেয়, সে মানুষ নয়। কিন্তু কত ব্যথা, কত বেদনা আমাকে এমন পাষাণ করেছে, সে ত কেউ জানে না মা। এই রাধাবল্লভের মন্দির কবে প্রতিষ্ঠা হয় জানো? আমার মায়ের দিদি-শাশুড়ীর শাশুড়ীর আমলে। তখন থেকে এই মন্দিরে রোজ পুজো হচ্ছে। এ বাড়ির সব বউ, সব মেয়ে এই মন্দিরে বসে কত সুখ-দুঃখ, কত ব্যথা দেবতার চরণে নিবেদন করে দিয়েছে। আমার পিতামহ প্রপিতামহ সকলে এই বাড়িতেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছেন। এই বাড়ি এই মন্দির আমার কাছে কত পবিত্র কত সুন্দর, তাতো তুমি জান না মা। আমার মৃত্যুর পর এই বাড়িতে কি হবে জানো? এই বাড়ি হবে ম্লেচ্ছের পানশালা, নৃত্যশালা আর আমার দেবতার মন্দির হবে—উঃ মা!"

বলিতে বলিতে দীননাথের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। সাবিত্রী সমস্ত বুঝিল। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনি কিছু ভাববেন না, বাবা। আপনার বাড়ির অমর্যাদা কোনদিন হবে না। আমিই আপনার উত্তরাধিকারিণী। আমার জন্য এ বাড়ির সম্মান নষ্ট হবে না।"

দিনকয়েক পরে একদিন সাবিত্রী শ্বশুরের জন্য পথ্য লইয়া যাইতেছিল পিছনের শব্দে চমকাইয়া চাহিতেই দেখিল শচীন। শচীনকে দেখিয়া সাবিত্রী বিস্মিত হইল। পথ্য মাটিতে নামাইয়া শচীনকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভালো আছেন, মেজদা!"

"হ্যাঁ, কাকাবাবু কেমন আছেন?"

"সেই রকমই, চলুন না তাঁকে দেখবেন।"

"যাচ্ছি" বলিয়া শচীন একটু চুপ করিয়া রহিল।

"আচ্ছা, আপনি আসুন, আমি যাচ্ছি" বলিয়া সাবিত্রী যাইবার উপক্রম করিতেই শচীন বলিল, "সাবিত্রী শোন। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।"

"আমার সঙ্গে কথা? বেশ বলুন।"

শচীন নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "ভগবানের কি বিধান জানিনে, তোমার জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক সংবাদগুলি আমাকেই দিতে হবে, এমনি হতভাগা আমি। তবু উপায় নেই বলতেই [illegible] কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছিল, তার স্ত্রীকে নিয়ে। সেখানে দুজনেই চাকরী করে খুব কষ্টেই দিন কাটাচ্ছিল। এমন সময় তাদের একটি ছেলে হয়। ছেলেটিকে তিনমাসের রেখে তার মা মারা যায়। আর মাত্র তিনমাস পরে, আজ ১৫ দিন হোলো সে তার বাপকেও হারিয়েছে।"

সাবিত্রী দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখের রক্ত নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল। ভাষাহীন চোখে পাষাণ প্রতিমার মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

সেইদিকে চাহিয়া শচীন ধীরে ধীরে বলিল, "আমি এখানে ছিলাম না সাবিত্রী, থাকলে নিশ্চয় বাঁচাবার চেষ্টা করতাম, যদিও তাতে কিছুই হোতো না। তাদের পাড়ার একজন লোক আমার ঠিকানা জেনে আমাকে চিঠি দিয়েছিল, সেই-ই দিতে বলেছিল বলে। আমি তখন এলাহাবাদে, কাজেই চিঠি পেলাম না। এখানে এসে চিঠি পেয়ে সেই লোকটির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সে ডাক্তার। অমরের শেষ চিকিৎসা সেই করছিল। সে বললে অমর বলে গেছে আজ পিসীমা বেঁচে থাকলে তাঁর কাছে-ই ধ্রুবকে দিয়ে যেতাম, কিন্তু তিনি নেই, তবু একজন আছে সে সাবিত্রী! আমি তার উপর যত অবিচার-ই করে থাকি, তবু সে নারী। আমার অপরাধের শোধ সে আমার সন্তানের ওপর নেবে না। তার হাতে-ই আমি আমার ধ্রুবকে দিয়ে গেলাম।"

পাষাণ প্রতিমায় যেন প্রাণ সঞ্চার হোল। বিবর্ণমুখে চিৎকার করিয়া সাবিত্রী বলিল, "আমার কাছে?"

"তোমার কাছেই সাবিত্রী। সে হতভাগা, তোমাকে জানবার সুযোগ লেশ পায় নি, তবে এটুকু সেও জানে, আমিও জানি যে, তুমি নারী।"

শচীন চুপ করিল। সাবিত্রী নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপিয়া সাবিত্রী বলিল, "ছেলেটি কোথায়?"

শচীন সাবিত্রীর দিকে চাহিল। সে মুখ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দীপ্তিতে, বেদনার বিষণ্ণতায়, আর নারীর স্বভাবজাত করুণায় পরিপূর্ণ। শচীন সহসা দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। মৃদু স্বরে উত্তর করিল, "আমার কাছে ত তাকে রাখা সম্ভব নয়, সে আমার এক মুসলমান বন্ধুর কাছে আছে। আমি তাকে সন্ধ্যার মধ্যেই তোমার কাছে এনে দেবো।"

সত্যই সন্ধ্যে বেলা শচীন ধ্রুবকে লইয়া আসিল। সুন্দর ছেলে যেন পিতার প্রতিমূর্তি। সাবিত্রী তাহাকে বুকের উপর টানিয়া অজস্র অতৃপ্ত স্নেহ ক্ষুধা মিটাইতে লাগিল। শচীন ধীরে ধীরে সরিয়া গেলো।

কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী ধ্রুবকে লইয়া দীননাথের কক্ষে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যা হইয়াছিল, ঘরেও আলো ছিল না, দীননাথ প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। সাবিত্রী নিকটে আসিলে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এসেছ মা? আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। বুড়ো হয়েছি ত!"

সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল ধ্রুবের উপর। ব্যগ্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কাদের ছেলে মা, দেখি একবার।"

সাবিত্রী ধ্রুবকে শ্বশুরের কোলের কাছে নামাইয়া দিল। শিশুকে ভালো করিয়া দেখিয়া দীননাথ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "এ কে মা? একে কোথা থেকে আনলে? তুমি কি আমাকে ছলনা করছ?" উত্তেজনায় তিনি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন।

সাবিত্রী তাঁহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "একটু স্থির হোন, আপনি কি একে চিনতে পাচ্ছেন?"

উত্তেজিত হইয়া দীননাথ বলিলেন "চিনতে পাচ্ছি? ও মুখ যে আমার বুকের মধ্যে আঁকা রয়েছে। তুমি বল, মা, তোমায় মিনতি করছি, আমায় বল, এ কে! সে কি আবার ছোট হয়ে আমার কোলে ফিরে এসেছে? বল, মা, বল!"

সাবিত্রী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "এ তাঁর ছেলে।"

"তার ছেলে! বৌমা, কেন তুমি একে আমার কাছে নিয়ে এলে? যাও নিয়ে যাও, এখুনি নিয়ে যাও।" বলিতে বলিতে দীননাথ উত্তেজনায় হাঁপাইতে লাগিলেন।

"বাবা, আপনার পায়ে পড়ি একটু স্থির হোন, দেখুন ছেলেটা ভয়ে কেঁদে ফেলেছে।"

দীননাথ দুই বাহু বাড়াইয়া ধ্রুবকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ভয় কি, দাদু, ভয় কি।"

ধ্রুব কিন্তু কান্না থামাইল না। সাবিত্রী তাহাকে নিজের কোলে তুলিয়া লইল। দীননাথ চুপ করিয়াছিলেন। তাঁহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল। সহসা তীব্র দৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু কে ওকে নিয়ে এল? সে এসেছে! কেন সে এল?" দীননাথের দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। "যাও

(শেষাংশ ৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সংগীত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসকে যেমন সমৃদ্ধ করিয়াছে, তেমনি করিয়াছে বাঙালীর জাতীয় জীবনকে। বাঙালী আপনার গৌরব বিস্মৃত হইয়াছিল—তাহার যে একদিন বাহুবল ছিল, রাজ্য ছিল, বীরত্ব ছিল, সেনাবল ছিল ও নৌবিতান ছিল, সে যেমন একদিকে ধর্ম, জ্ঞান ও বিদ্যার জন্য অপূর্ব কীর্তি সঞ্চয় করিয়াছিল—তেমনি তাহার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধ ছিল। বাঙালী তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল—সে যখন জাতীয় ভাবে উদ্দীপ্ত হইল, তখনও সে নিজ দেশ, জাতি ও সমাজের কথা বলে নাই—ভারতের দুঃখেই কাঁদিয়াছে। বঙ্কিম সকলের আগে মেঘমন্দ্রকণ্ঠে কহিলেন,—"গ্রীনল্যাণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল যেখানে নৈষধ চরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্য দেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।' বাঙালীর ইতিহাস যে একদিন জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল— সেকথা আমাদিগকে বঙ্কিমচন্দ্র নানাভাবে শুনাইয়াছেন :— "অতএব কি বাঙালীরা কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গঙ্গেশের ন্যায়াধিকার, চৈতন্যের ধর্ম, রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব বিদ্যাপতি, মুকুন্দদেবের বাক্য কোথা হইতে আসিল? দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য অনেক জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপে অবিনশ্বর কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙলার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?"

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জাতিকে তাহার অতীত ইতিহাস এবং জাতীয়তার দিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া বাঙালীর জাতীয় জীবনে এক অনুপম প্রেরণা ও স্বদেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিবার জন্যই লিখিত।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গভঙ্গ হয়, তখন এই 'বন্দে মাতরম্' সারা ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে অপূর্ব স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয় সাধনমন্ত্ররূপে যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তাহা বোধ হয় ভারতবাসীদের হৃদয় মধ্যে চিরন্তনভাবে সঞ্জীবিত থাকিবে।

এ বিষয়ে আমি একজন ইংরেজ লেখকের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"The partition of Bengal in 1905, and the agitation which continued till its modification in 1911, helped Sakta ideas once more to secure firm hold on the popular imagination. Kali was regarded as a personification of the province. Inspiration was drawn by the extreme nationalists from the life of Sivaji, both as regards spirit and method. Resistance to the British Government received a religious sanction. Until late last century Sivaji had been almost entirely forgotten, and his tomb allowed to fall into ruin. The revival of his memory, and the conversion of it into a living force, is ascribed by Valentine Chirol, in his book *Indian Unrest*, to B. G. Tilak. Surendra Nath Banerjee made Sivaji a power in Bengal, and this was no small feat, since, for generations following the Maratha raids, his name had been a bogey with which mothers hushed their babies. A new sense of helplessness, wretchedness and bitterness has again come over large sections of the population. Advanced political propaganda and agitation have been bound up in certain cases with a Sakta revival. In 1918 the Rowlatt commission reported that the revolutionary outrages in Bengal were 'the outcome of a widespread but essentially single movement of perverted religion and equally perverted patriotism. The truth of the adjective 'perverted' may be disputed by some, but there can be no doubt as to the intimate connection here, as elsewhere, between religion and patriotism." [The Saktas' by Earnest Payne—100—101.]

ঐ সময়ে বাঙলা দেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষানুভূতি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা জানেন যে, সে সময়ে সর্বত্র যে গভীর আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাহাতে সত্য-সত্যই দেশবাসী নূতন করিয়া শক্তি মন্ত্রের উপাসক হইলেন। মাতৃভূমি শক্তিরূপিণী—এই জ্ঞানলাভ হইল। সেই স্বদেশী যুগে বাঙলা দেশ শিবাজীকে স্বাধীনতার প্রতীকরূপে বরণ করিয়া লইলেন। সে সময়ে শিবাজী উৎসবের যে সমারোহ হইয়াছিল, সেকথা আমাদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতিপথে জাগরূক আছে। মনে পড়ে টাউন হলে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের শিবাজীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত বিখ্যাত কবিতা—স্বর্গত কবি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মুখে শুনিয়া শত শত দর্শক সাধুবাদে ও করতালি ধ্বনিতে সমগ্র টাউন হলখানি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এখনও মনে পড়ে :—

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে, অরণ্যের
কোন্ এক অন্ধকারে বসে
হে রাজা শিবাজী।
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি
এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন
বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।

এই প্রসঙ্গে আমরা আবার আমাদের পূর্বে উদ্ধৃত ইংরেজ লেখকের লেখা হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"That the connection in many cases amounts to confusion is illustrated by the hymn *Bande Mataram*, or "Bow to the Mother" which became a sort of Marseillaise of those opposing the partition of Bengal, and which has maintained its popularity in Nationlist circles. When the Indian National Congress met in Calcutta, in 1906, agitation was at its height, and Rabindranath Tagore attended, and sang this song to music he had himself written. It comes from Ananda Math (The Monastery of Joy), the novel by Bankim Chatterji, which is based on the story of the incursion of the *Sanyases* into Bengal during the governorship of Waren Hastings. These ascetics well-armed and disciplined, wandered about the province, their ranks swollen by a crowd of starving peasants: and obtained temporary success against some Government levies under British officers. The Novelist puts into the mouth of the leader the following song." [The Saktas—Page 101—102.]

অতঃপর লেখক বন্দে মাতরম্ সংগীতটির ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। বন্দে মাতরম্ সংগীতটির ইংরেজী অনুবাদ অনেকেই করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদও নানা সংবাদপত্রে কয়েকবার প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এখানে যে ইংরেজী অনুবাদটি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা করিয়াছেন (Mr. W. Sutton Page of the London School of Oriental studies) মিঃ শাটন পেজ্।

I hail the Mother,
Well-watered, fruitful,
Dusky with crops,
The Mother!
With her nights made glad by brilliant moonlight,
Adorned with many trees with flowering blossoms,
With her pleasant smile and sweet speech,
Joy-giver, boon-giver,
The Mother!
O thou who art made fearsome by the hum of seventy million voices,
Thou who art armed with sharp swords grasped by twice seventy million hands,
Why, O Mother, art thou weak, when thou hast such might?
To thee the mighty one
I bow, the deliverer,
The queller of foes,
The Mother.
Thou art wisdom, thou art virtue,
Thou art the very soul in my body.
In (power of) arm art thou *sakti*,
In (tenderness of) heart art thou *Bhakti*.
Thy image would I build in every temple.
Thou art *Durga armed with her ten weapons*;
Thou art Kamala (*Lakshmi*) wandering midst the lotus blossoms;
And Vani (Sarasvati) the *wisdom-giver*.
To thee I bow,
I bow to the fair,
Spotless, peerless,
Well watered, fruitful
Mother!
I hail the Mother,
The dusky, simple,
Smiling, richly decked
Land, my nurse,
My Mother.

বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'বন্দে মাতরম্' সংগীত যে তাঁহার মাতৃভূমি বঙ্গমাতাকে উদ্দেশ করিয়া রচিত হইয়াছিল, একথাই আমাদের মনে হয়। **জননী জন্মভূমি**—যিনি কোটি সন্তানপালিনী, তিনি মাতা—তিনি শক্তি—তিনিই দুর্গা; তাঁহাকে মাতৃরূপে শক্তিময়ী আরাধ্যা অধিষ্ঠাত্রী বঙ্গ-জননী-রূপে সম্বোধন করা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি এবং মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগের কথা প্রকাশ করিতেছে। উডরফ সাহেব বলেন,—

"Wife and children and all else are Her, and service of them is service of Her. It is the one Devi who appears in the form of all. Service of the Devi in any of her aspects is as much worship as are the traditional forms of ritual Upasana. This is not to say that these may, therefore be neglected. *India also is one of Her forms a specific Sakti, the Bharata—Sakti.*" *

তন্ত্রশাস্ত্রপারদর্শী উডরফ (Woodroffe) সাহেবের এই ব্যাখ্যান অতি সুন্দর ও সঙ্গত। দুর্গাপূজা কত দিনের বা তাহার ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াও আমরা 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের মধ্যে পাইতেছি—তান্ত্রিক অভিষেক—ভারত-শক্তির আবাহন গীতি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট পথেঘাটে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা আইন বিগর্হিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।*

বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হয়, তখন উত্তরবঙ্গের একটি সৈন্য-সংগ্রহ সভায় ব্রিটিশ কর্মচারীরা পর্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়া মিলিত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত করিয়াছিলেন।

["In 1906 the new Government of East Bengal declared the shouting of *Bande Mataram* in the streets to be illegal, but *during the Great War, at a recruiting meeting in North Bengal, British officers stood up with the rest of the audience and sang it.*"]

স্বর্গত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "এ কাব্যে বৈষ্ণবের মাধুরী আছে, তান্ত্রিক শাক্তের তেজস্বিতা আছে, এবং আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের Idealism-এর মোহ আছে। এই তিনের সমবায়ে মঠের গল্পটা খুব জাঁকাল হইয়াছে বটে; কিন্তু সিদ্ধান্ত বাক্য তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। হয়ত বা অন্য নানা কারণে তিনি ইচ্ছা করিয়া তাহা ফুটান নাই। তাই আনন্দমঠের অনেক কথা ঢাকা আছে; সেই কারণ উহার নাট্যাংশ ও উপদেশাংশ উভয়ে উভয়ের অনুবর্তী (Complementary) হয় নাই। * * * আনন্দমঠের মহিমা চরিত্রোন্মেষে নহে, চিত্রাঙ্কনে নহে, **উহার মহিমা "বন্দে মাতরম্" গানে।** এবং মাতৃমূর্তি প্রদর্শনে। শক্তি-প্রতিমাকে কেমন করে দেশাত্মবোধের প্রতীকে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে বুঝাইয়া দিয়াছেন। উহাই আনন্দমঠের বিশিষ্টতা।"

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রকৃতির প্রিয় ভক্ত। 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের প্রথমেই তিনি বঙ্গজননীকে বন্দনা করিয়া বলিতেছেন—মা, তোমাকে বন্দনা করি। তুমি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা মলয়জ শীতলা মাতা। শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীতে তোমার অপূর্ব রূপমাধুরী ফুটিয়া উঠে। তোমার বনশ্রী পুষ্পে পুষ্পে শোভাময়ী হয়। তোমার প্রসন্ন হাস্যময়ী মূর্তি—তোমার সুমধুর ভাষ—আমাদিগকে আনন্দিত করে। তুমি আমাদের সুখদায়িনী এবং বরদায়িনী জননী। তোমাকে আমরা বন্দনা করি। এই-রূপে ঋষি বঙ্কিম বঙ্গ-প্রকৃতিকে অতি সুন্দরভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তারপর জননী যে অবলা নহেন, তাঁহার সপ্ত কোটি সন্তান কণ্ঠে কল কল নিনাদ করাল শুনিতে হয়—তাঁহাদের দ্বিসপ্ত কোটি হস্তে খর তরবাল, তবে কেন এমন শক্তিশালী সন্তানগণের জননীকে অবলা বলিবে? জননী আমাদের বহুবল-ধারিণী, তিনি রিপুদলবারিণী, তারিণী, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি। এই সংগীত কি সত্যসত্যই জননী জন্মভূমির চরণে অর্ঘ্যদানের পবিত্র মন্ত্র নয়! জননী তুমি যে আমাদের সব—তুমিই যে আমাদের সর্বস্ব, প্রাণদায়িনী শক্তি—জগজ্জননী দুর্গা। তাইত বলিতেছি:—

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

এই অপূর্ব ঋষি-বাণী কি চিত্ত মধ্যে শক্তি-সাধনায় জাতীয় জীবনের উদ্বোধন মন্ত্র নহে। তারপর তিনি জননীকে—

ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণধারিণী

বলিয়া পূজায় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত—Life of Keshab Chandra Sen নামক গ্রন্থে দেশ-জননীকে দুর্গা রূপে, তারিণী রূপে আখ্যাত করিবার ব্যাখ্যান মহাত্মা কেশবচন্দ্রের প্রচার মধ্যেও পাই। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন:—

* আমরা এইরূপ ইটালিকসে দিলাম।
* The Saktas—Page 103.

"In the month of October 1879, when all Bengal was throbbing with the great excitement of the national festival of *Durga Pujah*, Keshub contemplated the first great undertaking of the new revival, a missionary expedition, consisting of a powerful contingent of his most enthusiastic disciples, travelling through a large tract of country in Northern Bengal and Behar. Its object was proclaimed in the shape of a divine commandment. The proclamation was thus worded:—

"Go and proclaim me Mother of India," said the Lord to his disciples gathered around him. "Many are ready to worship me as their father. But they know not I am their mother too, tender, indulgent, forbearing, forgiving, always ready to take back the penitent child. You shall go forth from city to city and from village to village singing my mercies and proclaiming unto all men that *I am India's Mother*. Let your behaviour and conversation, preaching and singing, be such as may convince those amongst whom you go that you are intoxicated with my sweet dispensation and sweeter name. And may India so convinced, come to me and say—Blessed be thy name sweet Goddess! We have hard and seen the Supreme Mothers' apostles." [The Life and Teachings of Keshub Chandra Sen—P. 362—by P. C. Mozoomdar].

উডরফ সাহেব বন্দে মাতরম্ সংগীতের মধ্যে 'ভারতশক্তি'কে মূর্তিমতী করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র দুর্গাকেই Mother of India রূপে প্রচার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—I am India's Mother—এই যে মাতৃনামে ঈশ্বরকে পূজা উহা চিরন্তন সত্যরূপে ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাই দেশকে মাতারূপে সম্বোধন দেখিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের "নমামি" তারিণীম্ এবং "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী" রূপে আবাহন মন্ত্র কি ভারত-শক্তিকেই বুঝাইতেছে না?

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার কথা বাঙালী মাত্রেই জানেন, সে সময়ে শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা সম্পাদন করেন এবং তৎকালে হিমালয়ের এক নিভৃত শিখরে "ভবানী মন্দির" প্রতিষ্ঠার সংকল্পও অনেকের মনে জাগরিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ সে সময়ে ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি এবং 'ভবানী' কে, তাহা জনগণকে বুঝাইবার জন্য 'Bhawani Mandir' নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড রোনাল্ডশে তৎপ্রণীত "Heart of Aryavarta" নামক গ্রন্থে 'ভবানী মন্দির নামক পুস্তিকা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ 'ভবানী' কে এবং 'শক্তি' কি, বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"In the unending revolutions of the world, as the wheel of the Eternal turns mightily in its course, the Infinite Energy, which streams from the Eternal and sets the wheel to work, looms up in the vision of man in various aspects and infinite forms. Each aspect creates and marks an age. * * * This Infinite Energy is Bhawani. She is also Durga. She is Kali: she is Radha the beloved, she is Lakshmi. She is our Mother and creatress of us all. In the present age the Mother is manifested as the Mother of Strength. ...... The deeper we look the more we shall be convinced that the one thing wanting which we must strive to acquire before all others is strength—strength physical, strength mental, strength moral, but above all strength spiritual, which is the one inexhaustible and imperishable source of all others."

আচার্য কেশবচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের উক্তির দ্বারা আমাদের কাছে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের অর্থ সুন্দরভাবে হৃদয়ংগম হয়; তখনই বুঝিতে পারি, কেন ঋষি বঙ্কিম বলিয়াছেন :—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরনীম মাতরম্॥

এখানে আর একটি কথা বলিয়াই এবারকার প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে National Congress বা জাতীয় মহাসমিতির জন্ম হয়। এবং উহার প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ভারতবন্ধু মহাত্মা এ ও হিউমের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আসিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীত তাহার পূর্বেই বিরচিত হইয়াছিল। "বঙ্গদর্শন" ও বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলী প্রকাশের সংগে সংগেই, বিশেষ 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইবার পর—বাঙলা দেশে জাতীয় কবিতা ও সংগীতের যে সৃষ্টি হইল ভারতব্যাপী যে জাতীয় জাগরণের প্রেরণা জাগিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এক অবিনশ্বর কীর্তিপ্রভাবে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

ভূগর্ভে গ্রীসীয় সভ্যতার দান

(৬৪ পৃষ্ঠার পর)

কূপগুলিতে সাধারণত আবর্জনা ভরে রাখা হয়েছিল। অনেকেরই ধারণা, আক্রমণকারী শত্রুবাহিনী যাতে কূপের জল বিষাক্ত করে তুলতে না পারে, তজ্জন্যই এ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

কূপগুলিতে টুকরো টুকরো অবস্থায় বহু ভাস্কর্য-সম্পদ পাওয়া গেছে। সেগুলি জোড়াতালি দিয়ে একটা পুরোপুরি জিনিস তৈরী হতে পারে। নগরের উপকণ্ঠে আক্রমণকারীর পদশব্দ শুনে আতঙ্কিত মানুষেরা যে স্বেচ্ছায় সেগুলি ফেলে দিয়েছিল এবং আশা করেছিল ভবিষ্যতে সেগুলি তুলে নেওয়া যাবে, একথা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সব চাইতে বিস্ময়কর আবিষ্কার হ'ল Apllo Lykeiosর গজদন্ত নির্মিত মূর্তিই। ২৭৫ খানা ছোট টুকরো এক করে পুরো মূর্তিটা দাঁড় করানো যেতে পারে। Hermesর মূর্তি পাওয়া গেছে—এর একমাত্র খুঁৎ যে ডান হাতখানা নাই। অবশ্য, ব্রঞ্জের মূর্তি দীর্ঘকাল জল বা আবর্জনায় পড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তথাপি একথা ঠিক, প্রাচীন এথেন্স বা আগোরার অধিকাংশ সম্পদ কূপেই লুক্কায়িত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বহু শত বৎসর আগেকার ঐতিহাসিক সম্পদকে এ সকল কূপ সযত্নে রক্ষা করেছে। আগোরার বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শুধু এপোলোর মন্দিরই নাই—দীর্ঘ সভ্যতার অসংখ্য মানুষের গোপন সঞ্চয়ও সেখানে আছে। মানুষের কৌতূহল শুধু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই তৃপ্ত হয় নাই। বিগতের আকর্ষণও মানুষের কাছে দুর্নিবার। তাই এথেন্স, মিশর বা মহেঞ্জোদোরো মানুষের কাছে এত বড়। মানুষ যা করেছে তা দিয়েই মানুষ যা করবে তার পরিচয় মিলে।*

*Scientific American হইতে সংকলিত।

মিঃ জিন্না কি চান ?

রেজাউল করীম, এম এ, বি এল

মানুষ যখন তাহার প্রার্থিত বস্তুটা কি, তাহা নিজেই জানে না, তখন সে কেমন করিয়া অপরকে তাহা বুঝাইয়া গোছাইয়া বলিবে? তখন সে বাগাড়ম্বর, বাকচাতুরী, ছলনা, মিথ্যাচার, শঠতা, কুতর্ক ও কুৎসিত ইঙ্গিত দ্বারা নিজের কথা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে নানা কথার সৃষ্টি করিয়া মনে করে যে, তাহার সব কিছুই বলা হইয়াছে। কিন্তু যে-কোন লোক ধরিয়া ফেলিতে পারে যে, সে কিছুই বলিতে পারে নাই। শূন্যগর্ভ আস্ফালন ব্যতীত তাহার মধ্যে আর কিছুই থাকে না। এবারকার মুসলিম লীগের দিল্লী অধিবেশনে মিস্টার জিন্নার তিন ঘণ্টাব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতা পড়িয়া মনে হইল যে, তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারেন নাই। বক্তৃতায় তিনি অনেক কিছু বলিয়াছেন। তাঁহার ভক্ত, অনুরক্ত ও স্তাবকদের সম্মুখে ভারতের গত দুই তিন বৎসরের কাহিনীর একটা অধ্যায় অনর্গলভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে তিনি তাঁহার কোন বক্তব্যই পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। লাহোর-প্রস্তাবের পর লীগের আদর্শ হইয়াছে 'পাকিস্থান'। কিন্তু এই পাকিস্থানের স্বরূপ কি, ইহার গঠনতন্ত্র কি, ইহাতে মুসলমানের সুবিধা অসুবিধা কি কি, এ সম্পর্কে কোথাও তিনি কোনরূপ আলোকপাত করেন নাই। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে—পাকিস্থানের স্বরূপটা ব্যাখ্যা কর, ইহার কাঠামো রচনা কর, কিন্তু কোন সঠিক ধারণার অভাবে তিনি তাহা করেন নাই। কেবল অস্পষ্ট ইঙ্গিত ও শূন্যগর্ভ বুলি ছাড়া তিনি কিছুই করেন নাই। গত দিল্লী অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে গিয়া তিনি নানা বিষয়ে মনের অবরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন—কে সাহেবের নিন্দা হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী ও গান্ধীবাদের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে কংগ্রেস হইতেছে সকল অকল্যাণের মূল উৎস। বক্তৃতায় তিনি ব্রিটিশ সরকারের উপর অভিমান করিয়াছেন—ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের স্তুতি করিয়াছেন। তিনিও ব্রিটিশ-বিরোধী, ইহা বুঝাইবার জন্য কোথাও কোথাও কর্তৃপক্ষকে চোখা চোখা বুলিও শুনাইয়াছেন। কিন্তু নাই তাঁহার বক্তৃতায় আসল কোন কথা, নাই তাহাতে বর্তমান অচল অবস্থার সমাধানের সামান্যমাত্র ইঙ্গিত। এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে তিনি পাকিস্থান সম্বন্ধে কোনরূপ আলোকপাত করিতে পারেন নাই। অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, এই বক্তৃতায় জিন্না সাহেব আপোষের দরজা খুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কোথাও আপোষের আভাস ইঙ্গিতও পাইলাম না; বরং আপোষের জন্য সামান্য যদি কোথাও পথ ছিল, তিনি আঁটিয়াসাঁটিয়া তাহাও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গান্ধীজী তথা কংগ্রেসকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া তিনি কোন্ মুখে আপোষের কথা বলিতে পারেন? সে পথ জিন্না সাহেব স্বহস্তে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেকটি দিক বিশ্লেষণ করিবার দরকার নাই। দু-একটা বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইব যে, তিনি কিভাবে ঘৃণা ও মিথ্যা-ভাষণ দ্বারা দেশের আবহাওয়াকে কলুষিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। জগৎবরেণ্য মহামানব গান্ধীজীকে শঠ, কপট ও মিথ্যাচারী প্রমাণিত না করিলে জিন্না সাহেবের তথা মুসলমান সমাজের "কায়েদে আজমের" কোন অস্তিত্ব নাই। তাই তিনি সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে গান্ধীজীকে যত আক্রমণ করিয়াছেন, আর কাহাকেও সেরূপ করেন নাই। গান্ধীজীকে আক্রমণ করিয়া তিনি যেসব উক্তি করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা মিথ্যা উক্তি ও সত্যের অপলাপ আর কিছু হইতে পারে না। গান্ধীজীর অপরাধ কি? তাঁহার প্রধান অপরাধ এই যে, তিনি হিন্দু! গান্ধীজীর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিয়া মিস্টার জিন্না নিজেরই কলুষিত মনের পরিচয় দিয়াছেন। গান্ধীজী হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করেন ইহা যদি অপরাধ বা অন্যায় হয়, তবে জিন্না সাহেব ইসলামে বিশ্বাসী একথাই বা কেন অপরাধজনক হইবে না? কেহ যদি বলে, মিস্টার জিন্না পৌত্তলিকতার বিরোধী, ইসলাম ধর্মাবলম্বী, গো-খাদক, অতএব তাঁহার সহিত আপোষ আলোচনা করিব না, তবে তাহা যে ধরণের যুক্তি হইবে, মিস্টার জিন্নার যুক্তিও ঠিক সেই প্রকারের। রাজনৈতিক বক্তৃতায় হিন্দু হিসাবে গান্ধীজীর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবার কি দরকার ছিল? তাঁহার বক্তব্য কিছুই ছিল না বলিয়া অবান্তর বকিবার উদ্দেশ্যে এই সব কুৎসিৎ কথার অবতারণা করিয়াছেন। আর একটা কারণ এই যে, মুসলমান সমাজকে অধিকতর গান্ধী-বিরোধী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গান্ধীজীর ধর্মবিশ্বাসের উপর বক্র ইঙ্গিত করিয়াছেন। গান্ধীজীর ভক্তগণ তাঁহাকে অতিমানব বলিয়া মান্য করে, ইহাতে গান্ধীজীর উপর জিন্না সাহেবের বলিবার কি আছে? জিন্না সাহেব সেই ধরণের লোক যাহারা কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকট নিজেকে এত ছোট মনে করে যে, তাঁহাকে গালাগালি করা ব্যতীত অন্য কোন ভাবে আত্মস্বস্তি পায় না। গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতি অপেক্ষা তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপরই জিন্না সাহেবের রাগ সর্বাপেক্ষা বেশী। গান্ধীজীকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলির উদ্দেশ্যকে এমন বিকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দেখিলে মনে হয় যে, জিন্না সাহেব যেন সত্য কথা বলিবার অভ্যাসটা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। [illegible] প্রতিষ্ঠান [illegible] তিনি [illegible] করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকটির [illegible] সাহেব [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সকলেই জানে [illegible] নিরপেক্ষভাবে দেশের সেবা করে। সুতরাং [illegible] দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। যদি এগুলি গান্ধীজীর কীর্তি হয়, তবে সেজন্য তিনি নিখিল মানবের শ্রদ্ধার পাত্র হইবার যোগ্য। হরিজন সেবা সংঘের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিন্না সাহেব যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা নিছক দুরভিসন্ধিপূর্ণ। লক্ষ লক্ষ হরিজন মানবতার অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল, তাহাদিগকে মানবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে হরিজন আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিন্না সাহেব বলিতেছেন যে, অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদেরকে ইসলামের ও খৃস্টান ধর্মের আশ্রয়ে আসিতে বাধা দিবার জন্যই ইহা গঠিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল মিথ্যা মুসলিম স্বার্থের নামে চীৎকার করিয়া জিন্না সাহেব বিশ্বমানবতার অনুভূতি এমনভাবে হারাইয়া ফেলিয়াছেন যে, যে কোন মহৎ প্রতিষ্ঠানকেই বিকৃত ও সংকীর্ণভাবে ব্যতীত অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখিতে বা বুঝিতে পারেন না। আজ কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের নেতারা কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছেন। এই অবসরে তিনি সত্য মিথ্যা বিচার না করিয়া ইচ্ছামত কংগ্রেসকে ও তাহার মহান নেতাদেরকে গালাগালি করিয়াছেন। ইহাতে জিন্না সাহেবের ভক্তগণ ও বিদেশী প্রভুগণ উভয়েই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিতে চাই, ইহার দ্বারা কোন কাজই হইবে

গান্ধীজীর উপর তাঁহার রাগের আর একটা কারণ এই যে, গান্ধীজী সকলকে পত্র লেখেন, কিন্তু জিন্না সাহেবকে [illegible] পত্র লেখেন না। ইহার [illegible] জিন্না সাহেব ভুল করিয়াছেন। [illegible] সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের [illegible] জিন্না সাহেবের নিকট গান্ধীজী [illegible] গিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবারই জিন্না [illegible] গান্ধীজীকে রিক্ত হাতে ফিরাইয়া [illegible]। জিন্না সাহেব নিজেই যে পথ [illegible] দিয়া আজ কোন মুখে বলেন গান্ধীজী তাঁহাকে পত্র লেখেন না। [illegible] জিন্নার এরূপ উক্তি নিতান্তভাবে [illegible] মনোভাবের উক্তি ব্যতীত আর [illegible] নহে।

[illegible] সাহেব ঐতিহাসিক [illegible] [illegible] বিকৃত করিয়া দেখাইতে [illegible] [illegible] "Command [illegible] performance" [illegible] [illegible] হইতে সম্মুখ দিয়া জিন্না সাহেব

অপরের সহিত নিজের বিবেককে বৃটিশ কূটনীতির নিকট বন্ধক রাখিয়া দিয়াছেন। মুসলমানের পক্ষে ইহা আনন্দ ও গৌরবের বিষয় নহে—ইহা তাহাদের পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। পরবর্তী যুগে আরব জগতে যেমন মক্কার শরীফ হোসেন মিথ্যা প্রলোভনে ভুলিয়া আরবের অনিষ্ট করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি জিন্না প্রমুখ ব্যক্তিগণ পৃথক নির্বাচনের মোহে ভুলিয়া ভারতের তথা মুসলমানের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। তিনি যে কি চান তাহা তাঁহার এই সুদীর্ঘ অভিভাষণের মধ্যে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারেন নাই। একটা গভীর প্রতিহিংসা, একটা জাতক্রোধ, একটা গান্ধীভীতি তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। গান্ধীজীর নাম উল্লেখমাত্র রাগে তাঁহার অন্তর এমনভাবে উদ্বেগ করিতে থাকে যে তিনি সব ভুলিয়া যান, কেবল বিষ ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না। আজ গান্ধীজী ও কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ কারাগারের অভ্যন্তরে। তবে তাঁহাদের উপর এত রাগ কেন? রাগের কারণ এই যে, এত করিয়াও তিনি গান্ধীজীর সমান করিতে পারেন নাই। অন্য পরের কা কথা, তাঁহার নিজের সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ লোক মিঃ জিন্না অপেক্ষা গান্ধীজীকেই [illegible] ও সম্মানীয় মনে করে।

[illegible] জিন্না সাহেবের এই বক্তৃতা পড়িবার পর মনে হইল যে, [illegible] মিঃ জিন্না [illegible] মুসলিম লীগের সহিত ভারতের কোন [illegible] [illegible] হইবে না। কংগ্রেসের সহিত মিলনের পথ তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই বক্তৃতার পর আর কোন সন্দেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইবে না। তাঁহার সমগ্র বক্তৃতার মধ্যে কোথাও গঠনমূলক প্রস্তাব নাই। সর্বত্রই ধ্বংসমূলক ইঙ্গিত আর মেছোহাটার গালাগালি। জিন্না সাহেবের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতাও শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা বেশী অনিষ্ট আর কেহ করিতে পারে নাই। দেশ যদি ইহা সহ্য করিতে পারে, তবে মিঃ জিন্নার সহিত হাত মিলাইবার আর কোন প্রয়োজন নাই। পাকিস্থানের ইস্যুতে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইবে না। এক্ষণে ভারতের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে জিন্নাকে সেকেলে বাদ দিয়াই করিতে হইবে। মিঃ জিন্না একটা মায়া মরীচিকা। এ মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিয়া কাহারও কোন লাভ নাই। জাতীয়তাবাদীদের প্রত্যেকটা দাবীর মূলে আছে দেশের স্বাধীনতা ও সর্বসাধারণের সমান অধিকারের দাবী। আর জিন্না সাহেব সেই সব দাবীর প্রতিবাদ করাকেই জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি জীবনে কোন গঠনমূলক প্রস্তাব দিতে পারেন নাই, তাঁহার নিকট কোন কিছুই আশা করা যায় না। তাঁহার সমগ্র বক্তৃতা ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ। ভারতের শত্রুগণের উক্তিই তাঁহার নিকট অকাট্য সত্য। তাহাদের উক্তিই তাঁহার উক্তি। এ হেন ব্যক্তির সহিত ভারতের স্বাধীনতাকামীদের কোনওরূপ সহযোগিতা সম্ভব নয়। আশা করি জিন্না সাহেবের দিল্লীর বক্তৃতার পর হিন্দু-মুসলমান সমস্যার এক অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল। পুনরায় যে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে তাহাতে জিন্না সাহেবের কোন "পার্ট" থাকিবে না। আশা করি, তাঁহার অভিনয় এইখানেই শেষ হইল।

উত্তরাধিকারী

(৬৮ পৃষ্ঠার পর)

[illegible] এক্ষুনি ফিরিয়ে দিয়ে এস। ওকে [illegible] আর কি দরকার?"

"ওকেই ত এখন আমাদের সব চেয়ে [illegible] বাবা", সাবিত্রী ধীর স্বরে উত্তর দিল, "আপনার সমস্ত বিষয়ের ত ওই [illegible] প্রকৃত উত্তরাধিকারী।"

[illegible] চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "কী বললে? ও আমার বিষয়ের উত্তরাধিকারী? তুমি কি পাগল হলে? [illegible] বাবা যে ধর্মত্যাগী, ও যে ম্লেচ্ছ, [illegible] কথা কি ভুলে গেলে?"

সাবিত্রী যাহা কখনো করে নাই, [illegible] করিল। দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলে "কিছুই ভুলিনি, বাবা। তিনি সত্যই ধর্মত্যাগ করেন নি। কিন্তু যদি তিনি তাই করে থাকেন, তবে যে ধর্ম তিনি ত্যাগ করেছেন বলে আপনি আজ তাঁকে ত্যাগ করলেন, সেই ধর্মই বলছে স্বামীর যে ধর্ম, স্ত্রীরও সেই ধর্ম, তিনি যদি ধর্ম-ত্যাগী হন, তবে আমারও ধর্ম নেই, আমিও আপনার বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হতে পারি না। কিন্তু সে কথা যাক্। যিনি এ জগতে নেই, তাঁর সঙ্গে আর বিরোধের প্রয়োজনীয়তা কি। তবে তাঁর

তাঁর ছেলেকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে না।"

সাবিত্রীর কথা শেষ না হইতে দীননাথ বিছানার উপর বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কি বলছ, মা? কে মৃত, কে এ জগতে নেই? তবে কি—তবে কি—আমার অমু এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে—ওঃ "দীননাথ দন্তে অধর দংশন করিলেন, তাহার পর সহসা মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন, "সে নেই, সে নেই। অন্ধকার, সব অন্ধকার। আমি যে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, বৌমা, আলো, আলো আনো মা, আমার দাদুর মুখখানি একবার দেখি।

বৈষ্ণব সাহিত্যের দান

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

প্রথমেই আমি আপনাদের আমার অভিবাদন জানাই। আজ এই শাখায় সভাপতিত্ব করবার জন্য আমাকে আহ্বান কেন করা হল জানি না, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার অক্ষমতা জ্ঞাপন প্রচলিত বিনয়বচন মাত্র নয়, সেটি ভূতার্থ-ব্যাহৃতি। এক্ষেত্রে আপনারা আমাকে এই ভার দিলেন সম্ভবত আপনাদের বৈষ্ণবোচিত গুণে, সেইজন্য আমার অক্ষমতা এবং ত্রুটী-বিচ্যুতি আপনারা ক্ষমা করবেন এ ভরসাও আমার আছে।



বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন

১ স্যার যদুনাথ সরকার; ২ অধ্যাপক সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়; ৩ অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী

বৈষ্ণব সাহিত্যের মত বিরাট সাহিত্যের সম্পূর্ণ আলোচনা দূরের কথা, কেবলমাত্র দিগ্‌নির্ণয় করাও সহজ নয়। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে হতে বর্তমান-কাল পর্যন্ত এই সাহিত্য বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে—এর বহু-বৈচিত্র্যের আস্বাদ গ্রহণ সকলের পক্ষে ঘটে না। দর্শন, ব্যাকরণ, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, জীবনচরিত, পদাবলী—বিভিন্ন দিকে বৈষ্ণব সাহিত্যের যে বিকাশ হয়েছিল তা বিস্ময়কর। এ একটি বন্যা, শুধু ভাববন্যা নয়, এটি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। দৃষ্টিভঙ্গীতে এই মৌলিক পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেক দিকেই পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সেই কারণে আমরা প্রত্যেক দিকেই সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে নতুন দৃষ্টিকোণ স্থাপনার চেষ্টা দেখতে পাই। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সংস্কৃত সাহিত্যেও এই নব-জীবন এসেছিল। এই দুটি সাহিত্যে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন ভাববন্যা, নতুন প্রাণ-স্পন্দন দেখা দিয়েছিল আমাদের বর্তমান সাহিত্যেও তার সজীব এবং প্রাণবান উত্তরাধিকার রয়েছে, সেই মহৈশ্বর্য আজও আমাদের বিস্ময়ের বস্তু।

কালের ব্যবধানে বৈষ্ণব-সাহিত্যের গোড়ার কথা সম্বন্ধে যেটি আমাদের চোখে আজ বড় হয়ে ওঠে সেটি সম্ভবত এই যে, সেকালে বাংলায় যে নতুন সমাজ এবং নতুন জীবন শুরু হয়েছিল বৈষ্ণবসাহিত্য সেই যুগসন্ধির অপূর্ব সৃষ্টি। তত্ত্ববিচার ছাড়া শুধু সাহিত্য-বিচারে দেখা যায়, সে সময় বৌদ্ধযুগের অবসান ঘটছে—আমাদের সমাজে, সাহিত্যে ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন ক্রমশ পরিস্ফুট। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখি কাব্যের স্রোত ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে চলেছিল, প্রকৃত রসের পরিবর্তে নানা কলা কৌশলের চাপেই সে রস নিষ্পিষ্ট এবং ব্যাহত। এমন সময়ে প্রাণধারার পুনরভিব্যক্তি দেখা গেল জয়দেবের কাব্যে। তারপর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের আবির্ভাব—এঁদের কাব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কতবড় স্থান অধিকার করে আছে সে কথার উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। পাঁচশ বছরেও এঁদের কাব্যের দ্যুতি ম্লান হওয়া দূরের কথা, সে দ্যুতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমরা এখনও তাঁদের রচনায় মুগ্ধ হই, বিচলিত বিগলিত হই, কেন না সে ঐতিহাসিকের বা ভাষাতাত্ত্বিকের আলোচনার বস্তু নয়, সে আমাদের প্রাণের কথা। আমরা যতই বিদ্যার কুটিলতায় সহজ অনুভূতি হারিয়ে ফেলি না কেন, চণ্ডীদাসের পদগুলি এখনও আমাদের কানের ভিতর দিয়া মর্ম পর্শ করে, তার কারণ সেটি মর্মেরই কথা, বিদ্যার প্রদর্শন নয়। এই ধারা বিস্তৃত হল পদাবলী সাহিত্যে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর মানসিক সংস্থানে যে বিপ্লব এলো সেই বিপ্লব প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কাব্যকে চৈতন্যপরবর্তী যুগে আরও বিশাল করে তুলেছিল—পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটি বিস্ময়কর দিক।

কিন্তু শুধু কাব্য বা রস-সাহিত্যই যে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রধানতম কীর্তি একথা মনে করা ভুল। সংস্কৃতে যেমন ষট্‌সন্দর্ভের মত একটি গভীর দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, ব্যাকরণের মধ্যে হরিনামামৃত ব্যাকরণ যেমন একটি নতুন জিনিস, বাংলাতেও তেমনি নানাদিকে বিকাশ দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে কি সিদ্ধান্ত স্থাপিত হল সেটি দার্শনিক-দের বিচার্য, কিন্তু এর সহজ অথচ গুরুগম্ভীর ভাষা অদ্ভুত সৃষ্টি। গম্ভীর বিষয় আলোচনার পক্ষে এ ভাষা এখনও আমাদের আদর্শ হতে পারে। এই ভাষার আদর্শ সেকালের বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের গাম্ভীর্য এত না হলেও তার মধ্যেও যথেষ্ট গাম্ভীর্য আছে এবং ভাষায় এমন একটি পরিচ্ছন্নতা আছে যা সেকালের সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রেই মেলে না। ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলীও ভাবগাম্ভীর্যে অতুলনীয়—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার সকল কথাই তিনি ললিত পদাবলীর মধ্য দিয়ে বলেছেন এবং তার মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের সার সংকলনও দেখি।

বাংলার প্রাণের কথার সঙ্গে এই বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি গভীর যোগাযোগ আছে। বাংলার প্রাণের কথার এই রকম সহজ প্রকাশ এর আগে বাংলা ভাষায় এরকমভাবে হয়নি সে হিসেবে বাংলার বর্তমান সাহিত্যের গোড়াপত্তনও এইখানে। মহাপ্রভুর আগে যে সমাজবিপ্লব এসেছিল সেই সমাজবিপ্লবেই এর মূল নিহিত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে সে সময়ের সামাজিক অবস্থার একটি বর্ণনা পাই—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥

* * *

গঙ্গাস্নান নিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥

এই অবস্থায় বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালীর জাতিভেদ দূর করে যে একটি সার্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারই ফলে কাব্যে সাহিত্যে এরকম সহজ অথচ সজীব ভঙ্গীর প্রবর্তন সহজ হয়েছিল, মিথ্যা আড়ম্বর এবং অকারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের হাত হতে সাহিত্যের নিষ্কৃতি মিলেছিল। সেই সময় বাংলার সর্বসাধারণের সঙ্গে বাংলার ধর্মতত্ত্ব রসতত্ত্বের যোগাযোগ ঘটল। সংকীর্তনের ভাষা সংস্কৃত নয়, সে সর্বজনবোধ্য কেননা সকলে সম্মিলিত না হলে সংকীর্তন সম্ভব নয়। মহাপ্রভুর যে সমস্ত চরিত লিখিত হয়েছিল, সেগুলিও জনসাধারণের পাঠ্য, সেগুলি শুধু পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র হতে যারা বঞ্চিত ছিল সেই বঞ্চিতদের স্থান দেওয়াই যে বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের বিশেষত্ব শুধু তাই নয়, এই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এমন একটি ধর্মের কথা প্রচারিত হল, যে ধর্মটির আড়ম্বর নেই, যা সহজ ধর্ম এবং সকলেরই ধর্ম। নতুন অধিকারী-বিচার দেখ

দিল, প্রচলিত পন্থায় অধিকারী-অনধিকারী ভেদ চললো না। বাংলার সমাজকে ক্ষয়িষ্ণুতার হাত হতে রক্ষা করার ফলেই বাংলা সাহিত্যেও সে সময় পুনরুজ্জীবন দেখা দিয়েছে, এমন কি তার ঢেউ সংস্কৃত সাহিত্য পর্যন্ত পৌঁছেছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও পদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃত ব্যাখ্যা এ কথার প্রমাণ। স্পষ্ট বোঝা যায়, এবার গোড়ার কথাটা অন্য। বাংলা সাহিত্য শুধুই সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষম অনুসরণ করছে না, সে তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। খাঁটি বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ এইখানে। তার মধ্যে যেমন সুললিত পদাবলী আছে, তেমনি গম্ভীর আলোচনা আছে, বাংলা ভাষার বহুমুখীনতার প্রথম পরিচয় সম্ভবত সেই যুগেই।

ক্রমশ যেদিন আমাদের সমাজজীবনে সে ক্ষয়িষ্ণুতা আবার প্রবল হল, তখন তার ফলে আমরা এই সাহিত্য-কৌশলটি ভুলে যেতে বসেছিলাম। [illegible] বাংলা সাহিত্যে [illegible], এবং সংস্কৃতের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সেকালের সামাজিক দ্বন্দ্বের ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের আভাস মেলে। একদিকে যেমন রামমোহন রায়ের রচনায় [illegible] সমস্ত উদার প্রভাব দেখা যায়, অন্য দিকে তেমনি অন্য লেখকদের রচনায়, এমন কি [illegible] সময় মৃত্যুঞ্জয় [illegible], সংস্কৃত শব্দের অস্বাভাবিক চাপে ভাষার গতি [illegible]। এরই প্রতিক্রিয়ায় সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত [illegible] ও সংস্কৃতের প্রভাব নষ্ট করে ইংরেজির প্রভাব বাংলা সাহিত্যে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম যুগের লেখকেরা [illegible] সবাই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত [illegible]—তাঁরা আত্মস্থ হবার সুযোগ পান নি। কিন্তু তবুও লক্ষ্য করবার বিষয়, যখনই এই নিষ্প্রয়োজন আতিশয্য ও অকারণ পাণ্ডিত্যের হাত হতে বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করার প্রয়োজন ঘটেছে, তখনই বৈষ্ণব সাহিত্যের দিকে নজর পড়েছে। ব্রজাঙ্গনা কাব্য মাইকেল লিখেছিলেন এ কথাটির মধ্যে একটা গভীরতর অর্থ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] যে একটি সমন্বয় [illegible] চেষ্টা করেছিলেন, এর মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একটি মননীয় রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ বোঝা গেল সেটিও যথেষ্ট নয়। ও রকম ভাবে আমাদের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভারসাম্য সম্ভব নয়। আমাদের প্রাণের কথা যে ভঙ্গীতে যে ভাষায় ঝংকৃত হয়েছে, তার মূল রহস্যটি ও কৌশলটির স্বাঙ্গীকরণ না হলে কৃষ্ণবিষয়ক কাব্য হতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব কাব্যের সাহিত্যিক উৎকর্ষের মূল কৌশলটির সার্থক ব্যবহার হবে না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ ব্রজাঙ্গনা কাব্য বা বৈষ্ণবক লেখেন নি, তিনি আরও মৌলিক পরিবর্তন করতে চাইলেন। তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী সেই চেষ্টার সূচনামাত্র। পরবর্তী যুগে তাঁর গানে বা কবিতায় বৈষ্ণব কাব্যের এরকম স্পষ্ট অনুকৃতি নেই—কিন্তু তার মধ্যে এমন একটি অনুরণন আছে, যা বৈষ্ণব কবিদের একতারায় পাওয়া গেছে—তার মধ্যে এমন একটি সৌরভ আছে যা অনেক সময়েই বৈষ্ণব [illegible] পদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমরা বর্তমানে যে দুর্দিনের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি, তাতে এই কথাটি স্মরণ করার আবার প্রয়োজন হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সময় সাহিত্যের দিক থেকে বৈষ্ণব সাহিত্য হতে আমরা সম্ভবত তিনটি প্রধান শিক্ষা নিতে পারি বলে আমার বিশ্বাস। তার প্রথমটি এই যে [illegible] চাপে লোকসাধারণ এবং [illegible] মধ্যে যখন ব্যবধান ক্রমবর্ধমান, তখন সাহিত্যের অবনতি অনিবার্য। এ অবস্থা হতে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াতে হবে, সমাজে প্রাণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হলে কোনো সাহিত্যে পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে না। বৈষ্ণব সাহিত্যের দ্বিতীয় বড় কথা এই যে, প্রাণের বৈচিত্র্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে লোকসাহিত্য এবং জনসাধারণের ভাষাকে সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। প্রাকৃত ভাষাই প্রকৃত ভাষা [illegible] না, কিন্তু সংস্কৃতের মহিমায় প্রাকৃতের সাহিত্যিক সম্ভাবনাকে অস্বীকার করাও চলবে না। বরং সেই সাহিত্যিক সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলাতেই নতুন সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘজীবন সম্ভব। আমরা বর্তমানে যে সংকটে উপস্থিত হয়েছি, তাতে এই সমস্যা আবার প্রবল হয়ে উঠেছে। বর্তমানে আমরা আবার ব্রজবুলিতে ফিরে যাব এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাঁরা খাঁটি বাংলাকে সর্ববিষয়ক আলোচনার উপযুক্ত করে তুলেছিলেন তাঁরা কি উপায়ে সেটি করেছিলেন এবং আমরা বর্তমানে সেই কৌশল কি উপায়ে প্রয়োগ করতে পারি এ কথা বিবেচ্য। আর বৈষ্ণব সাহিত্যের তৃতীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি আমার মতে কীর্তনের সৃষ্টি। এর মধ্যে কথা ও সুরের যে অপূর্ব মিলন ঘটেছিল তাতে গান এবং কবিতা দুই-ই অপমৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেয়েছে। কথা ও সুরের সমন্বয় কিভাবে ঘটতে পারে সে নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত, আর সংগীত শুধু বৈঠকী সংগীত না থেকে কিভাবে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে সেটি আমাদের একটি বড় সমস্যা। বৈষ্ণব কবি ও সুরকারেরা আশ্চর্য কৌশলে এ দুটিকে মিলিয়েছিলেন। তার ফলে মার্গসংগীত কীর্তন ধ্রুপদের সমগোত্রীয় হয়েও ধ্রুপদের মত ক্ষীয়মাণ শ্রোতৃপংক্তির উপরেই নির্ভর করতে বাধ্য হয়নি। জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে এই ধ্রুপদী সুরকে মেলানো এবং তারই সহায়ে শুধু বিদগ্ধদের নয় জনসাধারণের মনোরঞ্জন—এটি সহজ নয়। বাংলা গানে কথা ও সুরের সম্পর্কে এদিক হতে আমরা নতুন শিক্ষা লাভ করতে পারি। কিন্তু এ সবকটির গোড়ার কথা হচ্ছে এমন একটি ধর্ম যার মধ্যে প্রাণের কথা আছে। সম্প্রতি সেইটির অভাব ঘটেছে। জনসাধারণের অসংযত প্রবৃত্তি আমাদের উন্মাদ হয়ে উঠেছে। এর নিরাকরণ প্রেমে সম্ভব না হলে মোহমুদ্গরের সাহায্যে হবে। সুতরাং মুদ্গরের হাত এড়াতে হলে প্রেমের শরণ নেওয়াই ভাল, তাতে আমাদের সামাজিক ও সাহিত্যিক উভয়বিধ মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। এ দুটির সঙ্গে পারমার্থিক মঙ্গলের কথার উল্লেখ করলাম না, কারণ বৈষ্ণব সাহিত্যে বৈকুণ্ঠের চেয়ে গোলোকের মাহাত্ম্যই বেশী, আর ওটি দর্শনের কথা যা আমার মত প্রাকৃত জনের বিচার্য নয়।*

* বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি কুমার বিমলচন্দ্র সিংহের অভিভাষণ।

সংগ্রাম

শ্রীসমরজিৎ বসু

আজি সাম্যের দানে
শোষিত পেষিত দীন মজুরের প্রাণে,
দুয়ের অন্তে কপাট দিলেম খুলি
স্বপন প্রভাতে চেতনা উঠিছে দুলি
মন-উল্লাসে জোয়ারের কলতানে
নরনারী কাঁপে জীবনসন্ধ্যা টানে।

ব্যথার গান

প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

চাওয়া পাওয়া শেষ হয়েছে সখি,—
গ্লানির ভারে শুধুই বেঁচে থাকা;
দুঃখ-আঁধি আঁধার করে আসে,—
পাঁজরখানি শুধুই ঢেকে রাখা!!
কওয়া-বলার নেইতো আজি কিছু,—
মূক হয়েছে বুকের অভিধান;
সজল চোখে চেয়েই শুধু থাকা,—
মনের বীণায় ব্যথার শুধু গান!

রঙ্গজগৎ

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘ

কলিকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যে সকল চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল, তাদের মধ্যে কোনগুলো শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে—তার একটি তালিকা সম্প্রতি বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘ প্রকাশিত করেছেন। বলা বাহুল্য যে চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের সভ্যদের ভোটের দ্বারাই এই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়েছে। নীচে ক্রমিক গুণানুসারে তাদের ভোটের ফলাফল দেওয়া গেল :

(ক) দশটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র : (১) আপনা ঘর (সার্কো), (২) গরমিল (চিত্রবাণী) (৩) বন্দী (চিত্ররূপা) (৪) ভরত মিলাপ (প্রকাশ) (৫) সৌগন্ধ (নিউ থিয়েটার্স) (৬) ডাক্তার (নিউ থিয়েটার্স) (৭) কুঁয়ারা বাপ (আচার্য আর্ট) (৮) বসন্ত (বোম্বে টকিজ্) (৯) শেষ উত্তর (এম্ পি প্রোডাক্‌সন্স) (১০) লগন (নিউ থিয়েটার্স)।

(খ) শ্রেষ্ঠ অভিনয়—অভিনেতা : বাঙলা চলচ্চিত্রে 'বন্দীতে' জহর গঙ্গোপাধ্যায় এবং হিন্দী চিত্রে 'আপনা ঘরে' চন্দ্রমোহন। অভিনেত্রী : বাঙলায় 'শেষ উত্তরে' কানন দেবী এবং হিন্দীতে 'ভরত মিলাপে' দুর্গা খোটে।

(গ) শ্রেষ্ঠ পরিচালনা : বাঙলা চলচ্চিত্রে 'গরমিলের' পরিচালক নীরেন লাহিড়ী এবং 'বন্দীর' পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সমান সংখ্যক ভোট পেয়েছেন। হিন্দী চলচ্চিত্রে 'আপনা ঘরের' পরিচালক দেবকী বসু।

(ঘ) শ্রেষ্ঠ মৌলিক চলচ্চিত্র-কাহিনী : বাঙলায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'বন্দী' এবং হিন্দীতে দেবকী বসুর 'আপনা ঘর'।

(ঙ) ১৯৪২-এর শ্রেষ্ঠ চিত্র : বাঙলায় চিত্র-রূপা লিমিটেডের 'বন্দী' এবং হিন্দীতে সার্কো প্রোডাকসন্সের 'আপনা ঘর'।

এতদ্ব্যতীত বিদেশী দশটি শ্রেষ্ঠ চিত্রের তালিকাও চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘ দিয়েছেন। বাহুল্য বোধে সে তালিকা এখানে উদ্ধৃত করা হল না।

কাঁচা ফিল্মের নূতন আইন

ভারত সরকার পরিকল্পিত কাঁচা ফিল্মের নূতন আইন গত ১লা আগষ্ট সারা ভারতে চালু করা হয়েছে। ভারতরক্ষা আইনের অধীনে এই নূতন আইনটি জারী করা হয়েছে। ভাব-সাব দেখে মনে হয় যে ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায় সম্বন্ধে এই আইনের নিয়মগুলো বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রযুক্ত হবে। এর ফলে কাঁচা ফিল্মের ব্যাপারে সর্বপ্রকার অতিলাভের ব্যবসায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল বলেই মনে হয়। অবশ্য এই আইনটি কিছুদিন কার্যকরী অবস্থায় না থাকা পর্যন্ত এর দোষগুণ ভালভাবে বোঝা যাবে না। গত সপ্তাহে এবিষয় নিয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছিলাম। বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে এসম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ আছে।

এই আইনটির দুটো দিক আছে : এর মধ্যে ক্ষতিকারক কিছুটা অংশ যে না আছে এমন নয়—তবে ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ের দিক থেকে এই আইন কিছুটা শাপে বরের কাজও করবে। এই আইনের দুটো দিক আছে—একটা গভর্ণমেণ্টের দিক এবং অপরটি ফিল্ম ব্যবসায়ী-দের দিক। বর্তমানে সামরিক প্রয়োজন এত বেশী যে জাহাজে করে ভারত গভর্ণমেণ্ট যখন বিদেশ থেকে ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ীদের জন্য ফিল্ম আনেন, তখন গভর্ণমেণ্টকে কিছুটা সামরিক স্বার্থত্যাগ করতে হয় বৈকি। এই স্বার্থত্যাগ করতে হয় বলেই এই নূতন আইনের বলে গভর্ণমেণ্ট ফিল্ম ব্যবসায়ীদের কাছে দাবী করেছেন যে তাঁরা যেন যুদ্ধবিষয়ক চিত্র নির্মাণ করে ভারত সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কিছুটা সাহায্য করেন। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই দাবীটা খুব অন্যায় বলে মনে হয়না, তাঁদের দিক থেকে তাঁরা ঠিকই করেছেন। জনগণের মনের উপর চলচ্চিত্রের অপরিসীম প্রভাব; সেই চলচ্চিত্র যদি গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনরূপ সাহায্য না করে তবে বিদেশ থেকে কাঁচা ফিল্ম আমদানী করতে গিয়ে গভর্ণমেণ্টের যে সামরিক ক্ষতি হয়, সে ক্ষতির সম্মুখীন তাঁরা হবেন কেন? যেমন করেই হোক্ যুদ্ধ-জয় সরকারকে করতেই হবে। ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা যদি যুদ্ধ-জয়ে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য না করেন, তবে তাঁরাই বা কাঁচা ফিল্ম জুগিয়ে ভারতীয় চিত্র ব্যবসায়ীদের সাহায্য করবেন কেন? এ ত আর জাতীয় গভর্ণমেণ্ট নয় যে সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনকে তাঁরা সমান চোখে দেখবেন! তাই ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্, ভারতীয় চলচ্চিত্রের অস্তিত্ব যুদ্ধকালে বজায় রাখতে হলে আমাদের চিত্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা না করে উপায় নেই। তবে আশা করি আমাদের নামজাদা চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো নেহাৎ আজে-বাজে যুদ্ধপ্রচেষ্টামূলক চিত্র নির্মাণ করে এঁদের সুনাম নষ্ট করবেন না। বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় যুদ্ধপ্রচেষ্টার সহায়ক ভাল ভাল চিত্র দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। সেসব চিত্রে যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রচারকার্য যেমন থাকে, তেমনি থাকে দর্শকদের জন্য আনন্দের খোরাক। এই দুটো জিনিসের সংমিশ্রণে সার্থক যুদ্ধ-প্রচেষ্টামূলক ভারতীয় চিত্র আমরা দেখতে পাব—এরূপ আশার কারণ আছে। ফিল্ম সম্পর্কীয় এই নূতন আইনটি কার্যকরী হওয়ায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের সম্প্রসারণ অবশ্য সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। তা হলেও সাধারণ চিত্রের ষ্ট্যাণ্ডার্ড উঁচুতে উঠবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে—কেননা চিত্রের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে পূর্বাপেক্ষা অধিক সজাগ হতে হবে। সর্বপ্রকার অপচয় বন্ধ করে এঁদের সংযমী হয়ে উঠতে হবে। অল্প ফিল্ম নিয়ন্ত্রিত করে কম দৈর্ঘ্যে ভাল চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করতে হবে। বছরে চিত্রনির্মাণের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক কমে যাওয়ায় অনেক প্রতিষ্ঠান হয়ত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে—তবে চিত্রের সাধারণ উৎকর্ষ অনেক বেড়ে যাবে। যুদ্ধোত্তর যুগে চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের মুখে এই যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা অনেক কাজে লাগবে বলে মনে হয়।

বিদুষী ভার্যা

(৬৩ পৃষ্ঠার পর)

আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ নেই। ড্রয়িংরুমে যূথিকা বেচারা একলা বসে আছে, তুমি একটু তার কাছে যাও: আমি তোমাদের চায়ের ব্যবস্থা ক'রেই আসছি।"

"দিবাকর কোথায় ?"

"সে বেড়াতে বেরিয়েছে। ভালই হয়েছে; সে বাড়ি থাকলে যূথিকার সঙ্গে কথা কওয়ায় হয়ত একটু অসুবিধে হ'ত।" বলিয়া গৌরী প্রস্থান করিল। *

(ক্রমশ)

* বৎসর দুই পূর্বে 'অলকা' মাসিক পত্রিকায় 'বিদুষী ভার্যা' নামে লেখকের একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই গল্পটিকে উপক্রমণিকা স্বরূপ ব্যবহার করিয়া বর্তমান 'বিদুষী ভার্যা' উপন্যাস রচিত হইয়াছে। উপন্যাসের ঠাটের উপযোগী করিবার জন্য লেখক 'অলকায়' প্রকাশিত উক্ত অংশ প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত, পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত করিয়াছেন। দেঃ সং।

খেলাধূলা

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ডের সকল খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বর্তমানে মাত্র চারিটি খেলা বাকি আছে। এই সকল খেলায় স্থানীয় দলসমূহই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। ইহাদের মধ্যে কোন্ দল শীল্ড বিজয়ী হইবে, সঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারে না। ফাইনালে কোন্ দল দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে, তাহাও বলা কঠিন। তবে সেমি-ফাইনাল খেলা সম্বন্ধে আমরা যে উক্তি করিয়াছিলাম, তাহা একরূপ সত্য হইতে চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও পুলিশ দল সেমি-ফাইনালে উঠিয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিংয়েরও উঠিবার সম্ভাবনা আছে। বি এণ্ড এ রেল দল ইহাদের বিরুদ্ধে চতুর্থ রাউণ্ডের খেলায় তীব্র প্রতিযোগিতা করিয়াছে সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতিয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। রেল দলের আক্রমণভাগের একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় সিধু মজুমদার প্রথম দিন মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া আহত হইয়াছেন। তাঁহার পায়ের আঘাত মারাত্মক না হইলেও সাময়িক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনে বাধা সৃষ্টি করিবে, এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার ক্রীড়ানৈপুণ্যের উপর দলের জয়লাভ অনেকখানি নির্ভর করে। সুতরাং রেল দলের আক্রমণভাগ অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অবস্থায় পর পর দুই বৎসরের শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং দল রেল দলকে পরাজিত করিবে অনেকে বলিতে পারে। মহমেডান দল সেমি-ফাইনালে উঠিলে ইস্টবেঙ্গল দলের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। এই বৎসরের লীগ প্রতিযোগিতার খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং দল ইস্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। এমন কি, দুইটি খেলার মধ্যে একটিতেও বিজয়ী হইতে পারে নাই। সুতরাং শীল্ড প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং দল ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করিবেই, ইহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। লীগ প্রতিযোগিতার খেলার কথা স্মরণ করিয়া সকলেই এইরূপ কল্পনা করিতেছেন, ইস্টবেঙ্গল দলই এই খেলায় বিজয়ী হইবে ও শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠিবে। অপরদিকে মোহনবাগান দল সম্পর্কেও লোকে অনুরূপ আশা পোষণ করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন যে, লীগ-প্রতিযোগিতায় যখন পুলিশ দল মোহনবাগানকে পরাজিত করিতে পারে নাই, তখন শীল্ড প্রতিযোগিতায় পারিবে, ইহা ধারণা করাই অন্যায় হইবে। সাধারণের ধারণা যদি সত্যে পরিণত হয়, তবে ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলকেই প্রতিযোগিতা করিতে দেখা যাইবে। ইতিপূর্বে শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলায় কখনই ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলকে ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেখা যায় নাই। সুতরাং যদি এই দুইটি দল ফাইনালে উন্নীত হয়, তবে খেলার দিন মাঠে অসম্ভব জনসমাগম হইবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। উত্তেজনাও প্রবল হইবে। কদিন, ঘণ্টা, শঙ্খও এই দিন মাঠে এবং অধিকসংখ্যক দর্শকগণ আনিবেন যে, তাহার সমবেত শব্দ দর্শকগণের চিৎকার ধ্বনি অতিক্রম করিবে। অন্যান্য দলের তুলনায় এই দুইটি দলের জনপ্রিয়তাই অধিক। সুতরাং এই দুইটি দল ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে ক্রীড়ামোদিগণ বিশেষভাবেই আনন্দলাভ করিবেন।

মাঠের সমস্যা

আই এফ এ শীল্ড পরিচালকমণ্ডলীকে মাঠের সমস্যা বিশেষভাবেই বিচলিত করিয়াছে। গত বৎসরও এই সমস্যা দেখা দিয়াছিল এবং শীল্ড ফাইনাল শেষ পর্যন্ত মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসর সেই সমস্যার সম্মুখীন হইতে না হয়, এই উদ্দেশ্য লইয়া আই এফ এ শীল্ড পরিচালকমণ্ডলী প্রতিযোগিতার প্রথম হইতেই প্রতিদিন বহুসংখ্যক খেলার ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা ধারণা করিয়াছিলেন, ৭ই আগস্ট ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত করিবেন এবং খেলাটি ক্যালকাটা মাঠেই হইবে। কারণ, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের পরিচালকগণ ৭ই আগস্ট পর্যন্ত মাঠ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ৯ই আগস্ট হইতে রাগবী খেলা আরম্ভ হইবে এবং তাহার পর তাঁহাদের পক্ষে মাঠ দেওয়া সম্ভব হইবে না। কিন্তু আই এফ এ শীল্ড পরিচালকমণ্ডলীর পরিচালনা-ত্রুটির জন্য সকল খেলা ৭ই আগস্টের মধ্যে শেষ হইল না। প্রতিযোগিতার শেষের দিকে দর্শকগণের [illegible] আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তাঁহারা প্রতিদিন একটি করিয়া খেলার নির্দেশ দেন। ফলে এখনও পর্যন্ত প্রতিযোগিতা শেষ হয় নাই। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল প্রভৃতি জনপ্রিয় দলসমূহ প্রতিযোগিতার শেষ-সীমানার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের খেলা দেখিবার জন্য মাঠে বিশেষ জনসমাগম হইয়া থাকে। ক্যালকাটা মাঠে মোহনবাগান বা মহমেডান স্পোর্টিং মাঠ অপেক্ষা বহু বেশী দর্শক বসিতে পারে। সেই মাঠ পাওয়া যাইবে না, এই জন্য পরিচালকমণ্ডলী বিচলিত হইয়াছেন। গত বৎসরের অভিজ্ঞতার পরও কেন যে তাঁহারা পূর্ব হইতে যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন না, ইহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না! শোনা যাইতেছে, ফাইনাল খেলাটি ক্যালকাটা মাঠে যাহাতে হইতে পারে তাহার জন্য আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলী বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রচেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাগবী পোস্ট তুলিয়া ফুটবল খেলার ব্যবস্থা যে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের পরিচালকগণ করিবেন, সে আশা আমরা করি না। আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর পরিচালনার ত্রুটির জন্য বহু ক্রীড়ামোদী শীল্ড প্রতিযোগিতার শেষের খেলাগুলি দেখিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন, ইহা দুঃখের বিষয়।

বেঙ্গল অলিম্পিকের চ্যারিটি ম্যাচ

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অর্থের অভাব নাই, এই কথাই আমরা এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি। বহু রাজা-মহারাজা ও জমিদার এই এসোসিয়েশনকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন ইহাই আমরা জানিতাম। কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণকে আই এফ এর দ্বারস্থ হইতে দেখিয়া আমাদের সেই ধারণার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। আই এফ এর পরিচালকগণ বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আবেদন সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় নাই, অর্থাৎ কোন চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় নাই। শোনা যাইতেছে, কোন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ইহা অনুমোদন করেন নাই। তিনি নাকি বলিয়াছেন, "বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ন্যায় বাঙলা দেশে বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা এইরূপ আবেদন করিতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা দিলে তাহাদেরও দিতে হয় এবং তাহা আই এফ এর পক্ষে সম্ভব নহে।" যুক্তি যে সঠিক, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তবে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ অর্থসংগ্রহের জন্য ইহার পর কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই হইতেছে চিন্তার বিষয়। ৯।৮।৪৩

সাপ্তাহিক সংবাদ

৩রা আগষ্ট

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব জানান যে, লুই ফিসারের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলি ক্ষতিকর ও ভ্রমাত্মক এবং উহা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির ও মিত্রশক্তিবর্গের সহিত সদ্ভাব রক্ষার পরিপন্থী হওয়ায় ঐ সকল প্রবন্ধ এদেশে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

ঘাটশীলা অঞ্চলে কয়েকদিন যাবৎ অবিরাম বারিবর্ষণের ফলে বন্যা দেখা দিয়াছে। ফলে গৃহাদির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে একটি রেলওয়ে সেতুর ক্ষতি হইয়াছে।

৪ঠা আগষ্ট

মস্কো হইতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী হওয়ায় ডনেৎস অববাহিকায় জার্মান অভিযান ক্ষান্ত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ অগিনভী জানান যে, জার্মানি ও ইতালীতে গত ৩১শে মে পর্যন্ত ১২,৫৭৭ জন ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ছিল।

সিসিলিতে মেসিনার দিকে মিত্রপক্ষের সম্মিলিত আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে।

৫ই আগষ্ট

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, রুশ সৈন্যেরা ওরেলে প্রবেশ করিয়াছে। জার্মান নিউজ এজেন্সী কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে যে জার্মান সৈন্যেরা ওরেল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

সিসিলিতে মিত্রবাহিনী কর্তৃক কাতানিয়া অধিকৃত হইয়াছে।—মিত্রপক্ষের আলজিয়ার্স রেডিওতে এই সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

"বাঙলা দেশে সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহা নিরসনের জন্য গভর্নমেন্ট সময় সময় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই"—এতৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার আবদুল হালিম গজনবী যে মুলতুবী প্রস্তাব আনেন, সভাপতি তাহা বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন।

কমন্স সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব মিঃ আমেরী বলেন যে, ভারতে কংগ্রেসী আন্দোলন সম্পর্কে অপরাধের দায়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তির সংখ্যা ১লা মে তারিখে ছিল ২৩,২৮৬। অল্পকাল বা অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক লোকের সংখ্যা ১২,৭০৪।

বর্ধমানের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, হাজারীবাগ, রাঁচী ও রামগড়ে প্রবল বর্ষণের ফলে গতকল্য হইতে দামোদরের জল ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে ঐ অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীকে স্পেশ্যাল ট্রেনে এবং এ আর পি লরীতে করিয়া বর্ধমানে সরাইয়া আনা হইয়াছে।

কমন্স সভায় মিঃ সোরেন্সেন জিজ্ঞাসা করেন, মিঃ রাজাগোপালাচারী ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে চাহিলে তাহাতে বাধা দিবার কি হেতু থাকিতে পারে? মিঃ আমেরী বলেন, ভারত গভর্নমেন্টের মতে যাঁহারা শাসনতান্ত্রিক পথ বর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে গেলে ক্ষতি হইবে। কারাগারে গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে না দেওয়াই ভারত গভর্নমেন্টের নীতি।

৬ই আগষ্ট

বিয়েলগোরদ দখলের সংবাদ অদ্য রাশিয়া ঘোষণা করিয়াছে। মঃ স্টালিনের এক বিশেষ ঘোষণায় সংবাদটি জানা গিয়াছে। ওরেল ও বিয়েলগোরদের সাফল্যের জন্য মস্কোতে ১২০টি কামান হইতে ১২ বার তোপধ্বনি করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আজমীঢ় মাড়োয়াড়ের চীফ কমিশনার কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মেবার ও মাড়োয়াড়ের পাহাড়ে অত্যধিক বারিপাতের ফলে আজমীঢ় মাড়োয়াড়ের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত খারী নদীতে অভূতপূর্ব বন্যা হয়। ৩০শে জুলাই প্রত্যুষে বন্যা আরম্ভ হয়। প্রায় ৫০খানা গ্রাম বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে। আপাততঃ অনুমান করা হইয়াছে যে, বন্যার ফলে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। বিজয়নগর নামক ছোট শহরটির সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে। এখানকার সাত হাজার অধিবাসীর মধ্যে তিন হাজার হইতে চারি হাজার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বহু সম্পত্তি ও গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে।

বোম্বাই শহরে পুলিশ কয়েকটি স্থান ঘেরাও করিয়া ১৫২ জনকে ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

জেনারেল ম্যাক আর্থারের হেড কোয়ার্টারের এক ইস্তাহারে মুণ্ডা অধিকৃত হইবার সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

বার্লিন রেডিও মারফৎ ডাঃ গোয়েবল্‌স ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটিশ বিমান হানার আশঙ্কায় বার্লিন হইতে আংশিকভাবে লোকজন সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৭ই আগষ্ট

সোভিয়েটের এক বিশেষ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, খারকভের বিরুদ্ধে রুশ বাহিনীর এক নূতন অভিযান আরম্ভ হইয়াছে এবং খারকভকে উত্তর পার্শ্বে রাখিয়া ৩৭ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। বুধবার (৪ঠা আগষ্ট) এই আক্রমণ আরম্ভ হয়।

সমগ্র ইতালীর উপর অবরোধ অবস্থা ঘোষণা করিয়া এক রাজাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে।

মার্কিন বেতারে বলা হইয়াছে যে, প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মার্কিন বাহিনী ট্রয়না (সিসিলি) অধিকার করিয়াছে।

বাঙলা গভর্নমেন্ট খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে কলিকাতা, হাওড়া এবং বালিতে দুইদিনব্যাপী অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন।

৮ই আগষ্ট

অদ্য সোভিয়েট বাহিনীর নূতন আক্রমণের চতুর্থ দিবস। তাহারা এখন খারকভ হইতে মাত্র ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আছে।

বৃটিশ বিমান-বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বিমান বহর ইতালীতে মিলান, টুরিন ও জেনোয়ার উপর প্রবলভাবে বোমাবর্ষণ করে।

সিসিলিতে মিত্রবাহিনী কর্তৃক আদ্রানো, বেলপাসো প্রভৃতি শহর অধিকৃত হইয়াছে।

বিহারের গভর্নর ভারতরক্ষা নিয়মাবলী অনুসারে প্রকাশ্য স্থানে কংগ্রেস-পতাকা প্রদর্শন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই আদেশের কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান সময়ে কংগ্রেস পতাকা প্রদর্শন করা হইলে শান্তি রক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

৯ই আগষ্ট

মেদিনীপুরের সংবাদে প্রকাশ, কাঁসাই নদীতে বন্যার ফলে তমলুক মহকুমায় সাতটি ইউনিয়নের প্রায় ৪০ খানা গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে। ক্ষেত্রস্থ ফসল নষ্ট হইয়াছে এবং বহু বাড়ির ক্ষতি হইয়াছে। হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে।

মস্কোর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, খারকভের চারিদিকে এবং খারকভ হইতে দুই শতাধিক মাইল উত্তরে ব্রিয়ানস্কের পূর্বদিকে জার্মানরা সংহতভাবে লালফৌজকে জোর বাধা দিতেছে। ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে সোভিয়েট সেনাপতি জেনারেল রোকোসোভস্কির সৈন্যেরা আরও এক শত জনপদ দখল করিয়াছে।

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ।   শনিবার, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৫০ সাল।   Saturday, 21st August, 1943.   ৪২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বন্যার জের

বন্যার ফলে বর্ধমানের লক্ষাধিক লোক বিপন্ন অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুরের কতক অঞ্চলও ভাসিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকবার যেরূপ হয়, এবারও জল সরিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু গ্রামে কলেরা মহামারীর আকারে দেখা দিয়াছে। মাড়োয়ারী সাহায্য সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতি সেবা-প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণ বিপন্নদের সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু এই ধরণের সাহায্যের ব্যবস্থা দ্বারা ব্যাপক সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। কয়েক বৎসর হইল দেখা যাইতেছে যে, দামোদরের এই প্লাবন পূর্বাপেক্ষা ঘন ঘন হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ইহার ধাক্কা একদিকে মেদিনীপুর, অন্য দিকে বীরভূম পর্যন্ত গড়াইতেছে। ডাক্তার মেঘনাথ সাহা সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধে দামোদরের এই সমস্যার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং এই সব সমস্যার স্থায়ী সমাধানের সম্পর্কে গভর্নমেন্টের ঔদাসীন্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে-সব পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা কিছুই কার্যে পরিণত করা হয় নাই; পক্ষান্তরে বিষয়টি ধামা-চাপা দেওয়া হইয়াছে। অথচ সমস্যাটি যে সমাধানের অতীত—এমনও নয়। দামোদর পশ্চিমের নদী, পার্বত্য অঞ্চল হইতে জল নামিবার ফলেই এই অঞ্চল প্লাবন ঘটে; এ স্রোতোবেগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু তদ্রূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই; এমন কি, বন্যা নীচে নামিয়া আসিবার পূর্বে যথাসময়ে জনসাধারণকে সতর্ক করিবার মত কোন ব্যবস্থাও নাই; এজন্য বহু লোক সহজেই বিপন্ন হয় ও এমনকি অনেকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে। ডাক্তার সাহার এমন অভিযোগের কারণ রহিয়াছে; কিন্তু যতদিন জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত এ অবস্থার প্রতিকার সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

দুর্দশার প্রতিকার

ভারত সরকারের নূতন খাদ্য সচিব স্যার জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বর্তমান সমস্যার প্রতিকার করিবেন বলিয়া অনেক বড় বড় কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন; কিন্তু যেখানে উদরের জ্বালা সেখানে শুধু বড় কথা সান্ত্বনার কারণ হয় না; পক্ষান্তরে সে-সব বিরক্তিরই কারণ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বাকী কিছুই নাই। কলিকাতা রাস্তা হইতে দুই দিনে শতাধিক অনাহারে মুমূর্ষু লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, ইহাদের মধ্যে চৌদ্দজন হাসপাতালে ভর্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়াছে; অবশ্য এইদিন মুমূর্ষুদের সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। মফঃস্বলের অবস্থা আরও শোচনীয়। এক মাদারীপুরে তিন সপ্তাহে রাস্তা হইতে ৪০টি মৃতদেহ সরাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। এ অবস্থার প্রতিকার কি? মানবতার এই প্রশ্নই আজ সকলের চেয়ে বড় হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যত্ব সত্যই আমাদের আছে কি না আজ কার্যের দ্বারা সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় আসিয়াছে। বাঙলা দেশে গাড়ি গাড়ি ভর্তি করিয়া খাদ্য-শস্য পাঠান হইতেছে, স্যার জ্বালাপ্রসাদ, স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল এ সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন;

কিন্তু এই সব খাদ্যশস্য কোথায় যাইতেছে, আমরা তাহাই ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি; কারণ চাউল কিংবা আটা ময়দা কলিকাতার বাজারে দুই-ই মহার্ঘ্য এবং দুইয়ের কোনটিরই দর কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। লোকে যদি বাজারে জিনিসই না পাইল, তবে সরকারী সরবরাহ-প্রণালীর সার্থকতা থাকে কোথায়? কোন যাদুমন্ত্রে এই সব খাদ্যশস্য অন্তর্হিত হইতেছে অথবা গোপন গুদামে কেমন করিয়া ভর্তি হইতেছে আমরা ভাবিয়া পাই না। স্যার জওলাপ্রসাদ বিদেশে হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু খাদ্য বিভাগের জেনারেল সেক্রেটারী মেজর জেনারেল উডের মতে যথেষ্ট জাহাজের অভাবে বিদেশ হইতে ভারতে খাদ্যশস্য আমদানী করা এক প্রকার অসম্ভব। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব খাদ্য সচিব স্যার আজিজুল হক দুইখানা কল বিগড়ানো জাহাজের কথা শুনাইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এদিকে দেখা যাইতেছে যে, ভারত ছাড়া অন্য দেশে খাদ্যশস্য পাঠাইবার বেলায় জাহাজের কোন অপ্রতুলতাই ঘটে না। ভারত হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য পারস্য দেশে প্রেরণ করিয়া কিভাবে সে দেশের দুর্ভিক্ষ দূর করা হইয়াছিল, কিছুদিন পূর্বে ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আমাদিগকে তাহা জানাইয়া কৃতার্থ করেন। সম্প্রতি কলিকাতা হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাতে বহু পরিমাণ চাউল রপ্তানি করা হইতেছে—ভারতীয় বণিক সমিতি এইরূপ অভিযোগ করেন; ভারত সরকার ইহার একটা মামুলী প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে; কিন্তু অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালে, অর্থাৎ বাঙলাদেশে এই অন্নাভাবের দৈন্যের মধ্যেও ভারতবর্ষ হইতে ৭২৭ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে; তবে তাহা বিদেশীর সুবিধার জন্য নয়, প্রধানত প্রবাসী ভারতবাসীদের জন্যই এই চাউল প্রেরিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া পারস্য উপসাগরের বন্দর দিয়া ১৯৪৩ সালে ভারত হইতে আরও দুই হাজার টন চাউল রপ্তানি হইয়াছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, প্রবাসী ভারতবাসীদের জন্য ভারত হইতে যদি চাউল বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়, তবে ভারতবর্ষে যে-সব বিদেশী আছে, তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যও ভারতের এই অন্নাভাবের দিনে বিদেশ হইতে কেন আনা হইবে না, এ প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

মার্কিন সমর বিভাগ প্রচারিত একটি সংবাদে সম্প্রতি বলা হইয়াছে যে, গ্রীসের অন্নদানাক্লিস্ট জনগণের সাহায্যের জন্য আমেরিকার নিউইয়র্ক বন্দর হইতে কিছুদিন হইল ১৫ হাজার টন খাদ্যশস্য তিনখানা জাহাজ ভর্তি করিয়া পাঠানো হইয়াছে। এই সংবাদের উপর টিপ্পনী করিয়া 'সায়েন্স এণ্ড কালচার' পত্র লিখিয়াছেন—

"গ্রীস শত্রুদের অধিকৃত দেশ। সেখানে খাদ্য-দ্রব্য পাঠাইতে হইলে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সমিতির মারফতে অনেক লেখালেখি করিতে হয় এবং নিরপেক্ষ কোন শক্তির নিকট হইতে এজন্য জাহাজ যোগাড় করাও সহজ নহে; অথচ আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে খাদ্যশস্য প্রেরণ করিতে হইলে এগুলি কিছু দরকার হয় না; কিন্তু ভারতের জন্য এমন-ভাবে খাদ্যশস্য পাঠানো হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে, তবে কারণ কি?"

আমেরিকা হইতে প্রকাশিত 'সায়েন্স' পত্র কিছুদিন পূর্বে লিখিয়াছিলেন যে, আমেরিকা এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য উত্তর আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত মরক্কো, আলজিরিয়া ও টিউনিসিয়ায় প্রেরিত হইতেছে এবং ইহার পূর্বেও হইয়াছে। রয়টারের সংবাদেও আমরা এই সংবাদের সমর্থন দেখিতে পাই। ২৪শে জুলাই ভারতে রয়টারের প্রেরিত একটি সংবাদে প্রকাশ পায় যে, গ্রেট ব্রিটেন হইতে গত ৫ মাসে ফরাসী অধিকৃত উত্তর আফ্রিকায় কয়লা এবং খাদ্যশস্যে ৩ লক্ষ টনের অধিক মাল জাহাজযোগে প্রেরিত হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জাহাজ কিংবা খাদ্যশস্য অন্য দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সেগুলির অপ্রতুলতা কিছুই নাই; কেবল ভারতের বেলাতেই এগুলি জুটে না। বড়লাটের শাসন-পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ভারতবাসী; সুতরাং ভারতে শাসন কর্তৃত্ব ভারতবাসীদের হাতে গিয়াছে, ভারতসচিব আমেরী প্রভৃতির যুক্তির ইহাই পরিণতি।

ঔদাসীন্যের ফল

আমরা পূর্বেও বহুবার বলিয়াছি এবং এখনও সেই কথাই বলিতেছি যে, বাঙলা-দেশে বর্তমানে যে অতি ঘোর অন্ন-সংকট দেখা দিয়াছে, ভারত সরকারের ঔদাসীন্য এবং সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে অসংগত শিথিলতারই তাহা ফল। যুদ্ধের অনিবার্য ভবিষ্যৎ-পরিণতির দিকে তাকাইয়া যদি তাঁহারা পূর্ব হইতে কিছুমাত্র সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, তবে সমস্যা এরূপ জটিল আকার ধারণ করিত না; তাঁহারা তাহা করেন নাই। অধিকন্তু যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও এমন ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে, তাহার কিছুই সুফল হয় নাই। ভারত সরকারের "খাদ্য-আন্দোলনের" পরিণতি দেখিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা কিছু প্রমাণিত হইবে। গত বৎসরের চেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে খাদ্য-শস্যের চাষ এ বৎসর করা হইয়াছিল; কিন্তু হিসাবে দেখা যায়, উৎপন্ন মালের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হইয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সেদিন রাষ্ট্রীয় পরিষদে হিসাব দেখাইয়াছেন যে, ১৯৪২-৪৩ সালে যত জমিতে গম এবং চাউলের আবাদ হয়, তাহা গত পাঁচ বৎসরের অপেক্ষা কম। খাদ্য-সমস্যা সমাধানে সরকারী কর্মনীতির সফলতার এইরূপ নজীর। সর্দার সন্ত সিং পাঞ্জাবের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাবে যথেষ্ট গম ক্রেতার হিসাবে পড়িয়া আছে; অথচ কলিকাতা শহরে আটা ময়দা দুষ্প্রাপ্য। বাঙলাদেশে চালান দিবার জন্য দিল্লীতে যে সব খাদ্য-শস্য মজুত করা হইয়াছিল, সেগুলি শুনিতেছি, এখনও বন্দরবন্দী অবস্থায় পড়িয়া আছে; এদিকে নিরন্নের হাহাকারে বাঙলাদেশের আকাশ বিদীর্ণ হইতে বসিয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কর্তাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, উদরের জ্বালার ব্যাপার যেখানে, সেখানে সর্বাগ্রে তাহাই প্রশমন করা কর্তব্য এবং সেজন্য সুনির্ধারিত নীতি প্রয়োগ করাও প্রয়োজন; কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তেমন নীতি প্রয়োগের কার্যকর কোন পরিচয় পাইতেছি না।

আটলাণ্টিক সনদের উৎসব

আটলাণ্টিক সনদ সংস্কারের দ্বিতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। এই উপলক্ষে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বাগ্মিতার উচ্ছ্বাস বহাইয়াছেন। সনদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে গিয়া রুজভেল্ট বলেন,—

"প্রথমত আমরা এই নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করি যে, প্রত্যেক দেশের লোকেরই তাহাদের স্বদেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিবার অধিকার থাকিবে। দ্বিতীয়ত সকলের নিরাপত্তা, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিধান ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আমরা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করি।"

খুব শুভ ইচ্ছা সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের সংশয়ী অন্তর এ সব কথায় সাড়া দেয় না। আমাদের প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হয় যে, অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা দূরের কথা; এ ক্ষেত্রে সম্মিলিত পক্ষের অপর শক্তি ব্রিটেনের সহযোগিতা রুজভেল্ট পাইয়াছেন কি? ভারতবাসীদিগকে এই

সনদের অধিকার দান করিতে চার্চিল সাহেবের অসম্মতির কথা তাঁহার নিশ্চয়ই অবিদিত নহে। চার্চিল সাহেব এবং তাঁহার অনুগামী দল এ ক্ষেত্রে এই বলিয়া ধাপ্পা দিতেছেন যে, তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে নিজেদের শাসনতন্ত্র নির্ণয়ের অধিকার দিয়াই রাখিয়াছেন; সুতরাং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই সনদ একেবারে অবান্তর। ভারতবাসীরা সকল দল একমত হইলেই তাহারা এ অধিকার লাভ করিতে পারে। কিন্তু রুজভেল্ট সাহেব একজন পাকা রাজনীতিক পুরুষ। তিনি নিশ্চয়ই বুঝেন যে, কোন দেশের প্রত্যেকটি লোক একমত হইবে, এমন অবস্থায় কখনই সৃষ্টি হইতে পারে না। মতভেদ সব দেশেই থাকে; তবে গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে বহুর মতেরই রাষ্ট্রনীতিতে প্রাধান্য বর্তে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই গণতান্ত্রিক নীতি স্বীকার না করিয়া কৌশলক্রমে এখানে নিজেদের প্রভুত্বই কায়েম রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং এ কথা সত্য যে, রুজভেল্ট উহা জানিয়া এবং বুঝিয়াও প্রতিবাদের একটি অক্ষরও উচ্চারণ করেন নাই, এরূপ অবস্থায় আটলাণ্টিক সনদের গুণগানে ভারতবাসীদের মন প্রীতি রসে উচ্ছ্বসিত হইবে—এমন আশা করা সংগত হইবে না। কারণ ভারতবাসীরা জুলু বা হটেনটট নয়; তাঁহাদের মাথায়ও কিছু বুদ্ধি আছে। ইউরোপ এবং আমেরিকার বাকাবীরগণ ইহা বিচার করিয়া যদি কথা বলেন, তবে ভাল হয়।

কলিকাতার রাস্তায় মৃতদেহ

বাঙলা সরকার নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন—

"সম্প্রতি ইহা জনসাধারণের সমালোচনার বিষয় হইয়াছে যে, অনাহার কিংবা অল্পাহারের ফলে রাস্তায় মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত লোকদিগকে কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ভর্ত্তি করিতে অসম্মতি প্রকাশ করা হইয়াছে। গভর্নমেণ্ট এইরূপ ব্যক্তিদের চিকিৎসার একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করেন। এতদনুসারে তাঁহারা ক্যাম্বেল হাসপাতালে এবং বেহালাস্থ নিউ এমারজেন্সি এ আর পি হাসপাতালে এরূপ ব্যক্তিদিগকে ভর্তি ও চিকিৎসা করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাদিগকে পীড়া কিংবা অল্পাহারজনিত দুর্বলতার ফলে রাস্তায় অচল অবস্থায় দেখা যাইবে; জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, কেহ যদি কোন লোককে রাস্তায় অবসন্ন বা অচল অবস্থায় দেখিতে পান, তবে যেন তৎক্ষণাৎ সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ পুলিস অফিসারের নিকট কিংবা এ আর পি ওয়ার্ডেন পোস্টে সংবাদ দেন।"

পূর্বে শুশ্রূষা কিংবা খাদ্য-সংস্থানের উপযোগী ব্যবস্থার অভাবের ফলে যে সব হতভাগ্য রাস্তায় শেষ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত, তাহাদের সম্বন্ধে এতদিনে যে এমন একটা ব্যবস্থা করা এদেশে সম্ভব হইয়াছে, ইহাও আশার কথা বলিতে হইবে। কলিকাতা সহরে এক হাজার লোকের আশ্রয়ের উপযুক্ত নিরাশ্রয় লোকেদের আশ্রয়ের জন্য একটি বাড়ি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া সহরের বিভিন্ন স্থানে অন্নহীনদিগকে অন্নসত্রসমূহ হইতে অন্নও বিতরণ করা হইতেছে। প্রত্যহ সংবাদপত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু তথাপি সহরের রাস্তায় অন্নহীনদিগকে এইরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে; এতদ্দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে সাহায্যের জন্য যে সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহা পর্যাপ্ত নয় এবং যথোচিতভাবে সেগুলি পরিচালিত হইতেছে না। আমাদের মতে ব্যাধির প্রতিকার করার চেয়ে লোকে যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত না হয়, তাহাই করা দরকার; নতুবা হাসপাতালে কুলাইবে না। অন্নাভাবজনিত এ ব্যাধির প্রতিকারের জন্য যদি ব্যাপকভাবে অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা না হয়, তবে গোটা বাঙলা দেশটাকে মুমূর্ষুর হাসপাতালে পরিণত করিতে হইবে এবং চারিদিকে শ্মশানের আগুন জ্বলিবে।

সুস্পষ্ট সত্য

'স্টেটসম্যান' পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর ভারতের বর্তমান সমস্যা সমাধানে লর্ড লিনলিথগোর নীতির ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধের এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন,—

"From the most ultra-loyal Maharajah or the most greedy candidate for honours or contracts, down to the eager young nationalist school boy believes for a moment in His Majesty's Government desire for Hindu-Muslim unity."

অর্থাৎ ভারতের অতি বড় রাজভক্ত মহারাজা অথবা খেতাব ও কণ্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্য অতিশয় লোভী হইতে আরম্ভ করিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী স্কুলের ছাত্র পর্যন্ত কেহই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের আগ্রহের কথায় অনুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করে না। বলা বাহুল্য, মিঃ আর্থার মুরের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য; কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে শাসনাধিকার দিবার নামে, কয়েক দফা শাসনতন্ত্রের ভিতর দিয়া ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতারই বিস্তার করিয়াছেন; অথচ ভবিষ্যতের স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ঐক্য বা অ-সাম্প্রদায়িক আদর্শের অজুহাতই ক্রমাগত উপস্থিত করিতেছেন। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টার ত্রুটি কিছু করে নাই। মুসলীম লীগের হাতে ভারতের জাতীয় গবর্নমেণ্ট গঠনের ভার দিতেও কংগ্রেসের আপত্তি ছিল না; কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সেরূপ ক্ষেত্রেও ক্ষমতা নিজেদের হস্ত হইতে ছাড়িতে স্বীকৃত হন নাই। ইহার ফলেই স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপসের দৌত্য ব্যর্থতায় পরিণত হয়। এখনও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কর্ণধারদের ভারত সম্পর্কিত মতিগতির কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই। ভারতবাসীদিগকে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের দেশ-শাসনের অধিকার না দিয়া ব্রিটিশ শাসনকে এদেশে কায়েম রাখাই তাঁহাদের নীতির উদ্দেশ্য; এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীদের ভিতর এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

- শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী -

চিত্রশিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

(৩)

ক্ষিতিমোহনবাবুর সম্বন্ধে প্রহারের একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ক্ষিতিমোহনবাবু চাম্বা রাজ্যে কাজ করিতেন, আশ্রমে যখন আসিলেন তখন তাঁহার প্রচুর স্বাস্থ্য ও প্রচুরতর পাণ্ডিত্য। শিক্ষক যতই পণ্ডিত হোক তাহাকে যাচাই করিয়া লওয়া ছাত্র মহলে একটা সনাতন রীতি। ক্ষিতিমোহনবাবু যখন ক্লাসে বসিয়াছেন, একটি ছেলে নিজের জুতা জোড়া ক্লাশের মধ্যে রাখিল। তখন জুতো পায়ে দিবার নিয়ম ছিল না, অসুখে বিসুখে হইলে কেহ কখনো পরিত। ক্ষিতিমোহনবাবু বলিলেন জুতা জোড়া বাইরে রাখো। ছেলেটি নূতন শিক্ষককে বলিল—আমাদের এখানে ক্লাসের ভিতরে জুতা রাখাই নিয়ম। ক্ষিতিমোহনবাবু বলিলেন—এরকম অবাধ্যতা করলে মার খাবে। তখন ছাত্রটি আশ্রমিক নিয়মের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিল—বলিল, এখানে আশ্রমের ভিতরে মারার নিয়ম নেই। ইহা শুনিয়া ক্ষিতিমোহনবাবু আর কোন কথা না বলিয়া ছেলেটির কান ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এখন তুমি তো আশ্রমের বাইরে। এই বলিয়া এ গালে এক চড়। আবার অন্য কান ধরিয়া তুলিয়া অপর গালে আর এক চড়। তারপরে ছেলেটিকে আবার আশ্রমের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। এই একটি ঘটনাতেই ছাত্র মহলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা পাকা হইয়া গেল। তারপরে কোন ছাত্র আর তাঁহাকে যাচাই করিয়া লইবার দুঃসাহস প্রকাশ করে নাই। ইহা আমার শোনা-গল্প, দেখা নয়।

আমি যখন আশ্রমে গেলাম তখন ক্ষিতিমোহনবাবু সর্বাধ্যক্ষ। ও পদটা অনেকটা ইস্কুলের হেড মাস্টারের অনুরূপ। তিনি ছেলেদের নানা কাজে ডাকিয়া পাঠাইতেন। কোন ছেলের ডাক পড়িলেই সে শঙ্কিত হইয়া উঠিত। তাঁহার কাছে যাইবার সময়ে পুরু গরম জামা গায়ে দিয়া যাইত—অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। ছেলেরা কানাঘুষায় এই যাত্রাকে দার্জিলিং যাত্রা বলিত। গিরিরাজের মত তাঁহার দেহের বিপুলতা ইহার অন্যতম কারণ ছিল, কিন্তু একমাত্র কারণ নিশ্চয় নয়। একদিন আমার ডাক পড়িল। আমি খালি গায়েই রওনা হইতেছিলাম। আমার অনভিজ্ঞতায় বিস্মিত বালকের দল আমার গায়ে যার যত গরম জামা ছিল পরাইয়া দিয়া পিছনে পিছনে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিল। ক্ষিতিমোহনবাবু আমার সঙ্গে কি দুই একটা কথা বলিয়া বিদায় দিলেন—আমার কৌতূহলী অনুচরদের মুখে সে কি আশাভঙ্গের ছাপ!

শরৎবাবুর কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। তিনি ছিলেন মোটা মানুষ, পাখা দিয়া বাতাস খাইতে খাইতে লেখাপড়া করিতেন। তাঁহার পাখাকে যুগপৎ মক্ষিকা ও ছাত্রদল ভয় করিত। কারণ ছাত্রদের মারিবার প্রয়োজন হইলে সহজলভ্য সেই পাখার ডাঁট তিনি ব্যবহার করিতেন। দু'এক ঘা মারিয়া বলিতেন, হাঁটু গাড়িয়া থাকো। তিনি ছিলেন বরিশালের লোক, সেই হইতে বরিশালের লোকের মুখের 'ইয়া' প্রত্যয় আমাদের মনে আতঙ্ককর হইয়া আছে।

এক সময়ে তিনি আমাদের ঘরে থাকিতেন। প্রত্যেক ঘরেই দু-একজন করিয়া শিক্ষক বাস করিতেন। এখন দুপুরবেলা খাবার কিছুক্ষণ পরে একটা ঘণ্টা বাজিত, সেই ঘণ্টা বাজিলেই প্রত্যেকের নিজ নিজ ঘরে ফিরিতে হইত। একদিন এই রকম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে, আমরা যথাসময়ে ঘরে ফিরিতে পারি নাই। আমি ও আমার সঙ্গী গোপাল নামে এক ছেলে দুজনেই বুঝিলাম আজ অদৃষ্টে কি আছে। গোপাল বুদ্ধি দিল—চলো কানে তেল মাখিয়া যাওয়া যাক্। শরৎবাবুর অভ্যাস ছিল বাম হাত দিয়া কান ধরিয়া প্রথমে ছেলেটাকে আয়ত্ত করিয়া লইতেন, তারপরে ডান হাতে পাখা চলিত। যুক্তি সমীচীন মনে হওয়াতে দুজনে পাকশালা হইতে কিঞ্চিৎ তেল সংগ্রহ করিয়া দু-কানে মাখিয়া ঘরের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এখন প্রবেশের সময়ে আমি গোপালকে ধাক্কা দিয়া আগে ঢুকাইয়া দিলাম। শরৎবাবু আসিয়া গোপালের কান ধরিলেন, মসৃণ কান ফস্কিয়া গেল। তখন গোপালেরই ধুতি দিয়া গোপালের কান ধরিয়া পাখার ডাঁট বর্ষণ—আর 'হাঁটু গাড়িয়া থাকো' তর্জন। গোপাল হাঁটু গাড়িলে যখন তিনি আমার দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন আমি আমার তক্তপোষের উপরে অনেকক্ষণ হইল নিতান্ত সুবোধের মতো হাঁটু গাড়িয়া আছি। যে আসামী স্বেচ্ছায় ফাঁসিটা গলায় পরিয়া বিচারকের পরিশ্রম বাঁচাইয়া দিল, তাহার প্রতি সদয় ভাব না হয়, এমন পাষাণ বিচারক বোধ করি নাই—আমার কান দুটো সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

এই রকম প্রহারের ব্যাপার কখনো কদাচিৎ হইলেও ছাত্র-শিক্ষকের স্নেহের সম্বন্ধ এখানে যেমন দেখিয়াছি, তেমন বোধ করি আর কোথাও নাই। স্নেহের সম্বন্ধ বলিলে সম্বন্ধের ধরণটা স্পষ্ট বলা হয় না। তখনকার দিনে সমগ্র এই প্রতিষ্ঠানটিতে একটি নিবিড় পারিবারিকতার ভাব ছিল। যথার্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই পারিবারিক চেতনা একেবারে প্রাথমিক প্রয়োজন—অন্য সব অভাব এই একটিমাত্র সদ্ভাবে পূর্ণতা লাভ করে।

প্রথম ছুটি

ক্রমে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। আশ্বিনের আকাশ নির্মল হইয়া উঠিল; শিউলি গাছের তলা ঝরাফুলের আলপনায় খচিত হইয়া গেল; ধানের ক্ষেতের সবুজের সঙ্গে কাশের ফুলের শাদায় হিল্লোল তুলিবার প্রতিযোগিতা লাগিয়া গেল; মাঠে মাঠে ঘাসের ডগায় শিশির-কণার ঝলমলানি দেখা দিল; আর তালগাছের কম্পিত শাখায় শাখায় উত্তুরে বাতাস শির্ শির্ করিয়া উঠিল।

পড়াশুনা কাজকর্ম শিথিল হইয়া আসিল; সময়জ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনির কাংস্যকণ্ঠেও যেন কোমলের আভাস লাগিল, এমন কি জগদানন্দবাবুর ছাত্র-ভীতি মুখমণ্ডলকেও আর তেমন ভীষণ বলিয়া বোধ হইল না।

এই সময়কার একটি দিনের কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। আমি পাহাড়ের উপরে স্টেজ বাঁধিবার জন্য ডালপালা ভাঙিতে গিয়াছি, দূরে নাট্যঘরে শারদোৎসব নাটকের রিহার্সাল চলিতেছিল; সেখান হইতে গানের একটি পদ কানে ভাসিয়া আসিল:—

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরির খেলা

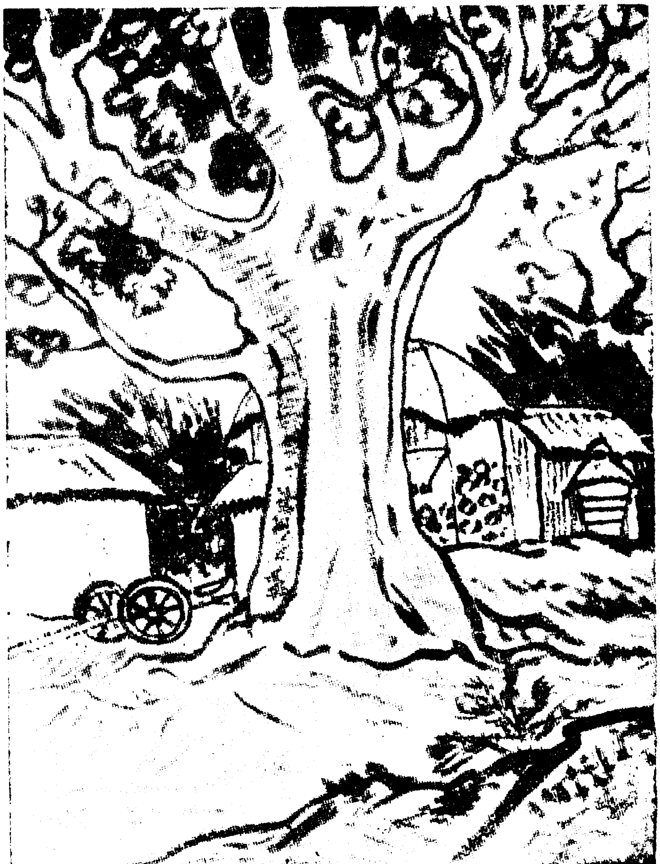
আজ নীল আকাশে কে ভাসালে
শাদা মেঘের ভেলা।

এই দূরাগত গানের সুরে হঠাৎ কি মন্ত্র যেন পড়িয়া দিল! চাহিয়া দেখি পরিচিত পৃথিবীর চেহারা যেন বদলিয়া গিয়াছে; আকাশে বাতাসে জলে স্থলে কে যেন কখন্ অপরূপের বাতায়ন খুলিয়া দিয়াছে। আমি ডালভাঙা ভুলিয়া স্বপ্নগ্রস্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম—আর আমার চোখ হইতে কেন যে অশ্রু গড়াইতে লাগিল নিজেই কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। বাস্তবিক শরৎ বালকচিত্তের ঋতু। সেইজনাই বোধ করি রবীন্দ্রনাথের দুইখানি শরৎকালীন নাটকেরই নায়ক দু'জন বালক, উপনন্দ ও অমল।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা মনে আছে। একবার গ্রীষ্মের ছুটির প্রারম্ভে শান্তিনিকেতনের দোতালায় রাজা নাটকের রিহার্সাল চলিতেছিল। তখন সন্ধ্যাবেলা, আমি যেন কি কাজে যাইতেছিলাম, হঠাৎ কানে আসিল, 'পুষ্প ফোটে কোন্ কুঞ্জবনে!' আজও যখন এই গানটি শুনি বালক-কালের সেই সন্ধ্যাটি আমার মনে পড়িয়া যায়।

ছুটির সময়ে ছেলেদের লইবার জন্য দেশ হইতে অভিভাবকেরা আসিতেন। ট্রেনের সময় হইলেই আমরা ছুটিয়া গিয়া পথের ধারে অপেক্ষা করিতাম, বোর্ডিংএর চারিদিকে চারটি সীমানা চিহ্ন ছিল, কোনদিকে বা একটা গাছ, কোনদিকে বা শড়ক, তাহার বাহিরে যাইতে হইলে সেই কাপ্তেনদের অনুমতির দরকার হইত। অনুমতির প্রয়োজন না হইলে বোধকরি বাড়ির লোকের আগমন আশায় স্টেশন পর্যন্ত যাইতাম। যাহার অভিভাবক আসিল সে খুশি; সে তখন আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া অভিভাবকের সঙ্গে জুটিয়া গিয়া আগাম গৃহসুখ অনুভব করিত। যার অভিভাবক আসিল না সে ক্ষুণ্ণ হইয়া পরবর্তী ট্রেনের ভরসায় থাকিত।

এই সময়ে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ত্রিপুরা অঞ্চলের বহু ছেলে ছিল। বহু দূর দেশ হইতে অভিভাবক আসিতেও অনেক খরচ বলিয়া আশ্রমের কর্তৃপক্ষ এই সব ছেলেদের দলবদ্ধ করিয়া কোন একজন শিক্ষকের সঙ্গে প্রেরণ করিতেন। একটি ঢাকা-batch, অপরটি ত্রিপুরা-batch। ঢাকার ছেলেরা নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত একত্র গিয়া যার যার বাড়ি চলিয়া যাইত, অনেক অভিভাবক সেখানে অপেক্ষা করিত। ত্রিপুরার ছেলেরা চাঁদপুর পর্যন্ত এক সঙ্গে যাইত। আশ্রমের কর্তৃপক্ষ আগে চিঠি লিখিয়া জানিতেন কে batch এ যাইবে, কে একাকী যাইবে, কার বা অভিভাবক আসিবে। এ বিষয়ে বেশ একটি মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। একজন অভিভাবক তাহার ছেলে batch-এর সঙ্গে যাইবে কি না জিজ্ঞাসিত হইয়া লিখিল, নিশ্চয়ই তাহার ছেলে batch-এর সঙ্গে যাইবে। batch সাহেব কবে আসিয়া পৌঁছিবেন, তাঁহার জন্য আহারাদির আয়োজন করিতে হইবে—এ সব বিষয় জানিবার জন্য অভিভাবকটি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া আছে, জানাইল। লোকটি batch-কে কোন সাহেব মনে করিয়াছিল।



শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত ভুবনডাঙা পল্লী

ছুটি হইয়া গেলে ছেলেরা অসময়ে গোধূলি সৃষ্টি করিয়া দলে দলে স্টেশনের দিকে চলিয়া যাইত। সঙ্গে জিনিসপত্রও তাহাদের সামান্যই থাকিত, একটা করিয়া বোঁচকা-ই যথেষ্ট, পায়ে তো জুতার বালাই ছিলই না, গায়েও জামার একটা নামান্তর মাত্র থাকিত। দুই একদিনের মধ্যেই আশ্রম জনশূন্য হইয়া যাইত, তখন আম বাগানের মধ্যে ছেলেদের কোলাহলের পরিবর্তে দোয়েলের শিষ জাগিয়া উঠিত।

আশ্রম ছুটি হইবার সময়ে ছেলেদে অভিভাবক, কবির ভক্ত প্রভৃতি অ অতিথি আসিতেন। তাঁহারা সক প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি। দু' দিন তাঁহারা থাকিতেন, রবীন্দ্রনা নাট্যাভিনয় দেখিতেন। এই উপল প্রথমে রামানন্দবাবুকে দেখিলাম। তাঁ বিদুষী কন্যাদ্বয়ও আসিতেন। সাহিত্যি দের মধ্যে সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ মণি গাঙ্গুলীর কথা মনে আছে। আসিতেন সুনীতি চাটুজ্জে, প্রশান্ত মহ নবিশ, কালিদাস নাগ, অমল হোম। এখ তাঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তখ তাঁহারা যুবক মাত্র, অনেকেই সবে বিশ্ব বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছেন মাত্র। জগদী বসু ও যদু সরকারও মাঝে মাঝে আসিতেন।

এখন আশ্রমে অতিথিদের কাছ হইতে সামান্য কিছু guest charge বলিয়া লওয় হয়। ইহাতে অনেকের আপত্তি। কিন্ যে বিশেষ ঘটনার ফলে এই নিয়ম প্রবর্তি হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। একব

ছুটির সময়ে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিবার লোভে কলিকাতা হইতে হঠাৎ পাঁচ সাতশ অতিথি আসিয়া উপস্থিত। শান্তিনিকেতনের মতো সীমাবদ্ধ স্থানে অত অতিরিক্ত লোক আসিয়া পড়িলে কর্তৃপক্ষের পক্ষে সত্যই মুস্কিল হয়—না আছে থাকিতে দিবার স্থান, খাদ্য সংগ্রহ করাও সহজ নয়। সেবার অভিনয় দুই রাত্রি করিতে হইল,—এক রাত্রে আশ্রমের লোক ও অতিথিদের নাটালয়ে ধরিবার কথা নয়। তখন হইতে অতিথিদের নিকট হইতে কিছু দক্ষিণা লইবার ব্যবস্থা করা হইল —ইহাতে সংখ্যা কমিবে এই আশায়।

প্রথম নাট্য দর্শন

এবার ছুটির সময়ে দুটি নাটক হইল। শারদোৎসব ও বিসর্জন। ইহাই আমার প্রথম অভিনয় দর্শন। ইহার পূর্বে বাড়িতে যাত্রা গান শুনিয়াছি, তবে তাহা কর্তৃপক্ষের চক্ষু এড়াইয়া সে না দেখারই সামিল। সকাল হইতে নাটাঘরে স্টেজ সাজানো আরম্ভ হইল, আয়োজন যৎ সামান্য। দেবদারুর ডালপালা দিয়া চারখানা wings রচনা করা হইল, পিছনে একখানা কালো পর্দা, সম্মুখের যবনিকায় আঁকা মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য। আমরা ছোট ছেলেরা এতই নগণ্য যে, কেহ কোন কাজের ফরমাস করে না। করিবে এই ভরসায় আমরা বসিয়া স্টেজ-বাঁধা দেখিতেছি, আর কে কোন্ পার্ট লইয়াছে এ বিষয়ে নিজ নিজ বক্তব্য বলিতেছি। এমন সময়ে বিকালের দিকে স্টেজ-বাঁধা সাঙ্গ হইলে যবনিকা ফেলিয়া দেওয়া হইল। সর্বনাশ! এ যে পর্দা পড়িয়া গেল—এখন দেখিবে কেমন করিয়া? আগে যাত্রা দেখিয়াছি তাহাতে পর্দার বালাই ছিল না—পর্দার অভিজ্ঞতা আমার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, নিশ্চয়ই দেখিবার কোন একটা কৌশল আছে নতুবা এত আয়োজন হইবে কেন? ভাবিলাম অত সূক্ষ্ম কৌশলের মধ্যে গিয়া কাজ নাই, সময় হইবামাত্র wings-এর পাশ দিয়া স্টেজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িব—ওখানে বসিলে নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। অভিনয়ের ঘণ্টা বাজিবামাত্র আমি সবেগে ঘরে ঢুকিয়া দেবদারু পাতার wings-এর উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। আগে ঢুকিতে হইবে, স্টেজের মধ্যে স্থান অল্প স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এমন সময়ে স্টেজের মধ্য হইতে একখানি পুরুষ বাহু আমাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল—পর্দার ফাঁক দিয়া একবার যেন খানিকটা দাড়িও দেখা গেল। দৃশ্য হাতের অদৃশ্য মালিক বলিল—বাইরে যাও।

আমি বলিলাম—দেখবো কেমন ক'রে? পর্দা যে!

কণ্ঠ বলিল—পর্দা উঠে যাবে। বাঙাল! না! এ পটল দা না হইয়া যায় না, অর্থাৎ যিনি রঘুপতি সাজিয়াছেন। বাস্তবিক রঘুপতি তোমার পক্ষে শিশুহত্যা, রাজহত্যা কিছুই অসম্ভব নয় দেখিতেছি। নির্বাসন দণ্ড তো তোমার পক্ষে বে-কসুর খালাস।

গোবিন্দ মাণিক্য সাজিয়াছিলেন সন্তোষ মজুমদার; নক্ষত্র রায় দেবলদা, গুণবতী সুধীররঞ্জন দাস। রাজবিধান ভঙ্গ করিবার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইয়া রাজবিধান রক্ষায় সাহায্য করিতেছেন। মন্ত্রের মতো বসিয়া নাটকের শেষ কথাটি পর্যন্ত পান করিলাম। এই নাটক আমার কাছে অপরূপের আর একটা বাতায়ন খুলিয়া দিল। ইহাই আমার প্রথম নাটক দর্শনের অভিজ্ঞতা।



জগদানন্দবাবুর ক্লাস

শীতের প্রারম্ভ

ছুটির পরে যখন ফিরিলাম তখন শান্তিনিকেতনের মাঠে রীতিমত শীত পড়িয়া গিয়াছে। বিবিক্ত, সংযত জলে স্থলে মহাদেবের তপোবনের শান্তি, আর নন্দীর ধবল উত্তরীয় প্রান্তের মত উত্তরে বাতাসের স্পর্শ মজ্জার অন্তঃস্থল পর্যন্ত কাঁপাইয়া তোলে।

শীতারম্ভের চিত্রের সঙ্গে বেগুন-ভাজার স্মৃতি জড়িত। তখন নূতনওঠা বেগুন ভাজায় এবং তরকারিতে আহার্যের প্রধান উপকরণ, কোন্ নিয়মে জানি না, শীতের সূত্রপাত ও সদ্য-ওঠা বেগুনে আমার মনে হরগৌরীর মত একাঙ্গ হইয়া আজ পর্যন্ত বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু নূতন-ওঠা বেগুন বা কচিৎ দর্শন ফুলকপি কিছুই ভালো লাগিত না, প্রথম কয়দিন বাড়ির জন্য মনটা বড় খারাপ থাকিত। আশ্রম ছাত্র-অধ্যাপকে ভরিয়া উঠিতে কয়েকদিন সময় লাগিত—ছুটির আরম্ভে যেমন একদিনেই খালি হইয়া যাইত, তেমন দ্রুত পূর্ণ হইত না।

আমাদের ইংরেজি পড়াইতেন দেবলদা। তিনি তখন এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ওখানেই বাস করিতেছিলেন। তখন ওখানকার ডাকঘর বোধ করি পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতেও বোধ করি কাজ করিতেন। এ সমস্তই বুঝিতাম, কেবল বুঝিতাম না, এত জায়গা থাকিতে আশ্রমের উত্তর প্রান্তে একেবারে খোলা মাঠের ধারে একটা মহুয়া গাছের তলায় তিনি কেন ক্লাশ লইতেন। কনকনে উত্তরে হাওয়াটা আশ্রমে ঢুকিবার আগেই আমাদের উপরে আসিয়া পড়িত। বেশ মাথা ঠাণ্ডা করিয়া ইংরেজি পাঠ লইবার উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু আমাদের একেবারে মগজটা সুদ্ধ জমিয়া যাইবার উপক্রম হইত।

ক্রমশ

বিদুষী ভার্যা

- শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় -

৪

ড্রয়িং রুমে বসিয়া যূথিকা একটা বাঙলা মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময়ে হেমেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া সহাস্য মুখে বলিল, "ধন্যবাদ যূথিকা! তুমি যে আমাদের পরমাত্মীয় হতে সম্মত হয়েছ, এর জন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমাকে লাভ করে আমার শ্বশুর বাড়ির কতটা শ্রীবৃদ্ধি হবে তা আমার চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না। যে সঙ্গীত তোমাদের দুজনের মিলনের পথ এত শীঘ্র সুগম করেছে, তোমাদের দুজনের ভবিষ্যৎ জীবন যেন এই সঙ্গীতের মত মধুর হয়, এই কামনা করি।"

নত হইয়া যূথিকা হেমেন্দ্রের পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "যদিও এ কথার এমন কিছু প্রয়োজন নেই, তবুও তোমাকে আমি পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত করছি, তোমার নির্ধারণে একটুও ভুল হয়নি। দিবাকরের মত সহৃদয়, সচ্চরিত্র আর ভদ্র ছেলে আজ-কালকার দিনে দুর্লভ, একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া, সংসার চালনার জন্যে যে অর্থের একান্ত প্রয়োজন, তা তার প্রচুর আছে, সে কথা তুমি নিশ্চয় শুনেছ। তোমার জীবন সে আনন্দময় করতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার সম্পূর্ণ আছে।"

একজন ভৃত্য আসিয়া চা প্রস্তুত হওয়ার সংবাদ দিয়া গেল।

হেমেন্দ্র বলিল, "এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে ইউনিভার্সিটির লেখাপড়ায় দিবাকরের পরিচয় নিতান্তই সামান্য। কিন্তু অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্যে কাজ-কর্ম চাকরি-বাকরির আশ্রয় নেবার প্রয়োজন যার নেই, তার পক্ষে ইউনিভার্সিটি বিদ্যের অভাব অক্ষমনীয় অপরাধ নয়, যদি তার নিজের মাতৃভাষা আর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা ভাল রকম সংস্কৃতির অধিকার থাকে। আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাকে জানাচ্ছি, সে অধিকার দিবাকরের আছে। কথাবার্তার ভঙ্গী আর বাঁধুনি থেকে আমি তার শিক্ষিত মনের পরিচয় পেয়েছিলাম; তারপর তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা ওঠার পর থেকে আজ সারাদিন তার সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছি, বাঙলা সাহিত্যে তার বেশ ভাল রকম অধিকার আছে; ইংরেজি সাহিত্যে তোমার যা অধিকার আছে, বোধ হয় তার চেয়ে কম নয়।" বলিয়া হেমেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

গৌরী আসিয়া বলিল, "চা ফেলেছি, কড়া হয়ে যাবে। চল, চা খেতে খেতে গল্প করবে।"

যূথিকাকে লইয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত হইয়া হেমেন্দ্র বলিল, "কই, দিবাকর এখনও ফিরল না?"

গৌরী বলিল, "তার আসতে হয়ত দেরি হবে, যূথিকা আসার মাত্র মিনিট পাঁচ-সাত আগে সে বেরিয়েছে। যূথিকাদের বাড়িতে কার আসবার কথা আছে বলে ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়। দিবার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করবার দরকার নেই।"

কিন্তু চা-পানের কিছু পরে যূথিকা যখন গৃহে ফিরিবার জন্যে গৌরীর সহিত বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল, তখন দেখা গেল দিবাকর দ্রুতপদে গেটে প্রবেশ করিতেছে।

নিকটে আসিয়া যূথিকার দিকে চাহিয়া উৎফুল্ল মুখে সে বলিল, "নমস্কার মিস্ মুখার্জি!"

ঈষৎ আরক্তমুখে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "নমস্কার।" তারপর গৌরীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "চললাম বউদি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "সে কি এরই মধ্যে চললেন কেন? এই ত সবে সন্ধ্যা হয়েছে। দিদির মুখে শুনেছিলাম, আপনি গান গাইতেও পারেন খুব ভাল। যদি দয়া করে এক-আধটা গান গান, খুবই খুশি হব। এরই মধ্যে যাবেন না মিস্ মুখার্জি!"

সলজ্জমুখে যূথিকা বলিল, "বাড়িতে একটু কাজ আছে।"

নির্বন্ধসহকারে দিবাকর বলিল, "তেমন যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে সে কাজটা কালকের জন্যে রাখলে হয় না মিস্ মুখার্জি?"

যূথিকার বিমূঢ় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গৌরী প্রচুর কৌতুক অনুভব করিতেছিল। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে দিবাকরের সহিত তাহার বিশেষ একটা অভিসন্ধিমূলক আলোচনা শেষ হইবার পূর্বে দিবাকর এবং যূথিকার বেশিক্ষণ একত্রে থাকা নিরাপদ নহে মনে করিয়া সে বলিল, "ও কি করে থাকবে বল? ওর যে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। ওদের বাড়িতে এখনই লোক আসবার কথা।"

যেটুকু কৌশল গৌরী প্রয়োগ করিল তাহা ব্যর্থ হইল না। বিবাহের সম্বন্ধ এবং বাড়িতে লোক আসা, দুইটি পরস্পর-সম্বন্ধ ব্যাপার মনে করিয়া ঈষৎ নিষ্প্রভমুখে যূথিকার দিকে চাহিয়া দিবাকর বলিল, "ওঃ! সেই কাজের কথা বলছিলেন বুঝি? —না, তাহলে আর কেমন করে থাকেন? না, তাহলে যেতেই হয়।"

এ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া দিবাকরের ধারণাকে যূথিকা আরও পাকা করিয়া দিল।

সে কিছুতেই বলিতে পারিল না যে যে-সম্বন্ধের কথা গৌরী বলিতেছে, তাহা দিবাকরেরই সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ, এবং তাহাদের বাড়িতে যে-লোকের আসিবার কথা, সে দিবাকর ভিন্ন অপর কেহই নহে।

সহসা একটা কথা মনে করিয়া দিবাকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বলিল "তাহলে দেখছি—বেশ একটা কাণ্ড করে এসেছি!"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার ঔৎসুক্যের অন্ত রহিল না।

সকৌতূহলে গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আবার কি কাণ্ড করে এলি দিবা?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "মিস্ মুখার্জিদের বাড়ি গিয়েছিলাম, কাকবাবু আর কাকিমার সঙ্গে আলাপ করতে। কিছুতেই তাঁরা ছাড়লেন না, অনেক কিছু খাবার খাওয়ালেন। তার মধ্যে ডিমের প্যাটিসগুলো ভারি ভাল লাগল। চেয়ে চেয়ে বোধ হয় দশ বারোখানাই খেয়ে ফেললাম। তারপর আরও খানদুই চাইতে কাকিমা একেবারে অপ্রস্তুতের শেষ! বললেন, আর একদিন তৈরি করিয়ে খাওয়াবেন।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিস্মিতকণ্ঠে গৌরী বলিল, "অতগুলো প্যাটিস সব খেয়ে ফেললি?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল "সব! এক-খানাও বাকি রাখিনি। আবার শুনলাম

খাবারের মধ্যে ঐ খাবারটাই মিস্ মুখার্জি তৈরি করেছিলেন।" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্ মুখার্জি আপনার তৈরি খাবার দিয়ে পাত্রপক্ষের মন বেশ খানিকটা ভোলানো যেতে পারত, কিন্তু আমি তার সব সুযোগ নষ্ট করে এসেছি। তবে আমার বিশেষ অপরাধও নেই; কারণ প্যাটিসগুলো এত ভাল করেছিলেন যে শেষ না করে কিছুতেই থামা গেল না; আর পাত্রপক্ষের লোকের আসবার কথা আছে তা আমি সত্যিই জানতাম না। এখেনে এসে শুনছি।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া সলজ্জ কৌতুকের চাপা হাসিতে যূথিকার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "আমার ত' মনে হয় পাত্রপক্ষের লোকের আসবার কথা আছে জানলে তুই অন্য সব খাবারগুলোও শেষ করে আসতিস।"

সকৌতূহলে দিবাকর বলিল, "কেন বল দেখি?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া গৌরী বলিল "পাত্রপক্ষের লোকের উপর রাগ করে।"

গৌরীর কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল "শোন একবার কথা। পাত্র-পক্ষের লোকের ওপর আমি রাগ করব কেন?"

গম্ভীর মুখে গৌরী বলিল, "পাত্রপক্ষের লোকেরা সম্বন্ধ করে যূথিকাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় বলে।"

এ কথাটা দিবাকরের অতিশয় গোলমেলে বলিয়া মনে হইল। পাত্রপক্ষের লোকের উপর একেবারেই যে রাগ হয় না, তাহা খুব জোরের সহিত বলা চলে না • হয়ত একটু হয়; কিন্তু যে কারণে হয় তাহা এমন অনির্ণেয় এবং এখনো তাহার অস্তিত্ব অবচেতন মনের এমন গোপন প্রদেশে নিহিত যে তাহা লইয়া কাহারো সহিত আলোচনা করা চলে না। কথাটা এড়াইয়া গিয়া দিবাকর বলিল, "কোথায় সম্বন্ধ হচ্ছে?"

গৌরী বলিল, "কেন, সে খোঁজে তোর কি দরকার?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "না, দরকার আর এমন বিশেষ কি; তবে বাঙলা দেশে যদি হয়, তাহলে ভবিষ্যতে ওঁর বাজনা শোনবার কিছু সম্ভাবনা হয়ত থাকে।"

"ও-র বাজনা এত ভাল লাগে তোর?"

দিবাকর বলিল, "লাগে। উনি এত ভাল বাজান যে ওঁর বাজনা ভাল-না-লাগা একটা অপরাধ বলে আমি মনে করি।"

হাসি চাপিয়া গৌরী বলিল "বাঙলা দেশেই ওর সম্বন্ধ হচ্ছে।"

গাড়ির দরজা খোলাই ছিল, ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গাড়ির ভিতরে গিয়া বসিয়া যূথিকা দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

যূথিকার পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া গাড়ির দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঔৎসুক্যের সহিত দিবাকর বলিল, "বাঙলা দেশে ওঁর সম্বন্ধ হচ্ছে? বাঙলা দেশে কোথায়?"

গৌরী বলিল, "যদি বলি, আমাদের মনসাগাছা গ্রামে?"

সবিস্ময়ে দিবাকর বলিল "মনসাগাছা গ্রামে? মনসাগাছার কার সঙ্গে?"

গৌরী বলিল, "যদি বলি, তোর সঙ্গে!"

এবার গৌরীর কথা শুনিয়া দিবাকর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গৌরী বলিল "হাসলি যে বড়!"

দিবাকর বলিল, "কী যে বল তুমি দিদি! আমার মত লোকের সঙ্গে ওঁর মত—" বলিয়া কথা শেষ না করিয়া পুনরায় হাসিতে লাগিল।

যূথিকার নিকট হইতে সঙ্কেতে আদেশ পাইয়া গাড়ি তখন ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া আসিয়া গৌরী বলিল, "যূথিকার সঙ্গে তোরই সম্বন্ধ হচ্ছে দিবা। ওদের বাড়ি গিয়ে তুই যে পার্টি খেয়ে এসেছিস, সে আর-কোনো পাত্রপক্ষের জন্যে তৈরি হয়নি।"

বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া দিবাকর বলিল, "বল কি দিদি!"

গৌরী বলিল "হ্যাঁ, ঠিকই বলি। কিন্তু ও-কথাটা তুই তখন ভাল বললিনে ভাই। কি জানি, যূথিকা হয়ত বা একটু অপমানিত বোধ করেই চলে গেল।"

উদ্বিগ্নমুখে দিবাকর বলিল, "কি কথা বলত?"

"ঐ যে তুই বললি, 'তোমার মত লোকের সঙ্গে ওর মত'—না কি; তাতে হয়ত ও মনে করলে, তুই বলতে চাস্ যে, তোর মত ধনী লোকের সঙ্গে ওর মত গরীবের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তোর ঐ হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মতই হাল্কা।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "না, না, দিদি! এ-কথা কখনই সে মনে করে নি। এমন কথা কিছুতেই আমি বলতে পারিনে এটুকু সে নিশ্চয় বোঝে।"

সে কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া গৌরী বলিতে লাগিল, "আর সত্যিই ত' তোর তুলনায় যূথিকার এমন কিই-বা আছে? থাকবার মধ্যে ত' একটুখানি চেহারার শ্রী, ঐ একটু সেতার আর এসরাজ বাজনা, আর—।" অসমাপ্ত কথার মধ্যে গৌরী সহসা থামিয়া গেল।

প্রবল আগ্রহের সহিত দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল "আর? আর কি বল্লো?"

গৌরী বলিল "আর? —আর তার মিষ্টি স্বভাব, শান্ত প্রকৃতি।"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "আর লেখাপড়া?"

গৌরী বলিল, "সেইটেই ত' ওর হয়েছে সবচেয়ে লজ্জা, আর বিপদের কথা। ওর লেখাপড়ার যথার্থ অবস্থার কথা শুনলে তোর মত লোকও হয়ত ঘাবড়ে যেতে পারে।"

একটা অভাবনীয় প্রত্যাশার আশ্বাসে দিবাকরের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; বলিল, "কেন বল দেখি? লেখাপড়া তেমন কিছু করেনি না, কি?"

পূর্বের ন্যায় এ প্রশ্নেরও সাক্ষাৎ-সোজা উত্তর না দিয়া গৌরী বলিল "আজকালকার দিনে লেখাপড়া করা কি সহজ কথা রে দিবা? যূথিকার বাপের মতো দরিদ্র লোকের কটা মেয়ের লেখাপড়া সম্ভব হয় বল দেখি? ভদ্রলোক ত মোটে শ' দেড়েক টাকা পেন্সন পান, তার ওপর একপাল পুষ্যি।"

মনে মনে যৎপরোনাস্তি আশ্বস্ত হইয়া দিবাকর বলিল "সেকথা সত্যি।" তাহার পর, যূথিকা লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানে না, এই বিশ্বাসে নিরাপদ বাহাদুরি করিবার লোভে বলিল, "কিন্তু অত বড় মেয়ে, শুধু এসরাজ আর সেতার বাজাতেই শিখেছে, খানিকটা লেখাপড়া শেখাও উচিত ছিল। আমি অবিশ্যি মেয়েদের পাশ করার পক্ষপাতী নই; কিন্তু চিঠিপত্রটা লেখা, নভেলটা পড়া,—এই রকম ছোটখাটো কাজ চালাবার মতো একটু লেখাপড়া জানা মন্দ নয়।"

গৌরী বলিল, "বেশ ত,, বিয়ের পরে ওর বিদ্যা পরীক্ষা করে দেখে যদি কিছু দরকার মনে হয়ত' সেটুকু শিখিয়ে পড়িয়ে নিস্; কিন্তু খবরদার ভাই, বিয়ের আগে ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হলে, খবরদার—এই সব লেখাপড়ার কথা তুলে ওকে যেন লজ্জা দিস নে। বড়সড় হয়েছে, এখন অতি অল্পতেই মনে আঘাত লাগতে পারে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "না না, দিদি, তা কখনো পারি! এটুকু সাবধান তুমি আমাকে না করে দিলেও পারতে।"

প্রসন্নমুখে গৌরী বলিল, "বেশ কথা। তাহলে যূথিকার বাপকে কথা দিতে পারি? —কি বলিস?"

দিবাকর বলিল, "ওঁরা সত্যিসত্যিই এ প্রস্তাব করেছেন নাকি?"

গৌরী বলিল, "করেছেন শুধু নয় এর জন্যে কাল রাত্রি থেকে হরলালবাবুর স্ত্রী আর হরলালবাবু ঝুলোঝুলি করছেন। যূথিকার মত জানবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে তাকে এনেছিলাম।"

আগ্রহের সহিত দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "তার মত আছে?"

"সম্পূর্ণ।"

"কি করে জানলে?"

"যেমন করে তোর মত জানছি। জিজ্ঞাসা করে করে।"

একটু ইতস্তত করিয়া ঈষৎ সংকোচের সহিত দিবাকর বলিল, "কি উত্তর দিলে তোমাকে?"

স্মিতমুখে গৌরী বলিল, "সে কথাও শুনতে হবে নাকি তোর?"

দিবাকর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "কি জান দিদি, চিরদিনই নিজেকে অপদার্থ বলে জেনে এসেছি; আজ বাজারে হঠাৎ একটু দর পেয়ে দরটা যাচাই করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "সে যাচাই ত' হয়ে গেছে দিবা। বাজারে তোর দর অনেক, ইচ্ছামাত্র তুই যখন যূথিকার মত একটি বহুমূল্যে রত্ন অনায়াসে অধিকার করতে পারিস।"

মনে মনে দিবাকর বলিল, বহুমূল্য নয় অমূল্য!

একটি রত্ন হাতে লইয়া মানুষে যেমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহার দীপ্তি পরীক্ষা করিয়া দেখে, দিবাকর তেমনি যূথিকাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। কোনো দিক হইতে বিকীর্ণ হইল তাহার রূপের সুষমা, কোনো দিক হইতে তাহার গঠনের ভঙ্গী, কোনো দিক হইতে তাহার প্রকৃতির মাধুর্য, কোনো দিক হইতে বা তাহার সংগীত-বিদ্যার নিপুণতা।

মনে মনে খুশি হইয়া দিবাকর বলিল, "তোমাদের মত আছে ত' দিদি? —তোমার জামাইবাবুর?"

গৌরী বলিল, "ষোল আনা। যূথিকার সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয়, তাহলে নিশ্চয় বলতে হবে তোর ভাগ্য ভাল। তার লেখা-পড়ার দিকটা যদি ক্ষমা করে নিতে পারিস তাই তাহলে আর কোনো গোল থাকে না।"

ব্যস্ত হইয়া দিবাকর বলিল, "না, না, দিদি, ঐটেই আমার একটা বড় রকম আগ্রহের কারণ হওয়া উচিত। এ বিয়ে হয়ে গেলে আর কিছু না হোক, নিশার হাত থেকে রক্ষে পাই। কোন্ দিন ও লুকিয়ে-চুরিয়ে একটা ম্যাট্রিকুলেশন-টুলেশন পাশ করা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে, সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি।"

মনে মনে যুগপৎ শঙ্কিত এবং পুলকিত হইয়া গৌরী বলিল, "তাছাড়া, প্রাণ ভরে সেতার আর এসরাজ শুনতে পাবি।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "হ্যাঁ, সেও একটা মস্ত প্রলোভন বটে।"

গৌরী বলিল, "তাহ'লে রাজি ত?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, রাজি।" তাহার পর এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া বলিল, "বিয়ের দিনও তোমরা স্থির করে রেখেছ নাকি?"

গৌরী বলিল, "একটু আগে পাঁজিটা দেখছিলাম। বিয়ের দিন নিয়েই যত গোলে পড়েছি। আজ বাইশে শ্রাবণ; এ-মাসে বিয়ের শেষ-তারিখ চব্বিশ। তারপরে একেবারে তিন মাস পরে অঘ্রাণ মাসে দিন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "তিন মাস নিশার হাতে আমাকে ফেলে রেখো না দিদি; সে যে-রকম কোমর বেঁধে লেগেছে, তাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে। করতে যদি হয় ত' চব্বিশেই সেরে ফেলা ভাল।"

মনে মনে অল্প উদ্বিগ্ন এবং অনেকখানি উৎফুল্ল হইয়া গৌরী বলিল, "মাত্র দুদিন। এত অল্প সময়ে কি করে হয়ে উঠবে রে?"

দিবাকর বলিল, "কপালকুণ্ডলা পড়েছ ত' দিদি। হিজলির মন্দিরে অধিকারী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিয়ে দিতে পেরেছিল; আর, তুমি আর জামাইবাবু, দুজনে মিলে এত বড় লাহোর শহরে দুদিনে পারবে না?"

ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া গৌরী বলিল, "তা হয়ত পারব। সকালে কথা আরম্ভ হয়ে রাত্রে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এমনও ত' হয়। কিন্তু লাহোর থেকে মনসাগাছার জমিদারের বিয়ে হলে গ্রামের লোকে বলবে কি?"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "যাই বলুক না কেন, বউভাতের ভোজে কলকাতার সন্দেশ-রসগোল্লা দিয়ে ভাল করে মুখ বন্ধ করে দিলে আর কিছু বলতে পারবে না।"

"সে যা হয় হবে, কিন্তু নিশা? নিশাও বিয়েতে উপস্থিত থাকবে না?"

মনে মনে একটু হিসাব করিয়া দেখিয়া দিবাকর বলিল, "কি করে থাকে বল? আজ এখনি টেলিগ্রাম করে দিলেও পঁচিশে সকালের আগে সে কিছুতেই পৌঁছতে পারে না। তাছাড়া, মাত্র দিনপাঁচেক আগে তার পছন্দসই ম্যাট্রিক পাশ করা মেয়েকে নাকচ করে একজন লেখাপড়া-না-জানা মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে তাকে বারো শ' মাইল টেনে আনলে সে খুব খুশি হবে না।"

সেই দিনই ঘণ্টাখানেক পরে হেমেন্দ্র এবং গৌরী হরলাল মুখোপাধ্যায়ের গৃহে উপস্থিত হইল এবং সকলের মধ্যে কথাটা আলোচিত এবং বিবেচিত হইয়া চব্বিশে তারিখেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

৫

বিবাহের পরদিন প্রত্যূষে দিবাকর এক-সময়ে হেমেন্দ্রের গৃহে আসিয়া গৌরীকে বলিল, "আজ সন্ধ্যায় আমরা দুজনে কলকাতা চললাম দিদি। যত শীঘ্র সম্ভব তোমরা কলকাতায় পৌঁছো। তোমরা পৌঁছলে, তারপর সকলে মিলে মনসাগাছা রওনা হওয়া যাবে।"

সবিস্ময়ে গৌরী বলিল, "সে কি রে! আজ তুই কি করে যূথিকাকে নিয়ে যাবি। আজ যে কালরাত্রি; আজ রাত্রে বউয়ের মুখ দেখতে নেই।"

গৌরীর কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "কাল-রাত্রি কখনো আজ হয় না দিদি; কাল-রাত্রি কাল গেছে আবার কাল আসবে; এ-কালের সমস্ত রাত্রিই আজ-রাত্রি। তাছাড়া, কাল রাত্রেই যখন কুশণ্ডিকে হয়ে গেছে, তখন ষোল আনা বিয়ে হওয়ার পর আর কালরাত্রির কথা ওঠে না।"

মনে মনে কি চিন্তা করিতে করিতে গৌরী বলিল, "ও-নিয়মের কথা আমি জানিনে। আচ্ছা, তাই যেন হ'ল, কিন্তু কাল রাত্রে তোদের যে ফুলশয্যে রে। কাল-রাত্রেও ত' তোরা গাড়িতে থাকবি।"

দিবাকর বলিল, "বিয়েটা যেমন অদ্ভুত-ভাবে হ'ল, ফুলশয্যে রেল-গাড়িতে হলে তার সঙ্গে বেখাপ্পা হবে না।" তারপর নির্বন্ধপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "না দিদি তুমি অমত কোরো না। জামাইবাবুর মতও তোমাকে করিয়ে দিতে হবে।"

দিবাকরের প্রকৃতি গৌরীর অজানা ছিল না। চূড়ান্তভাবে যে সংকল্পের মধ্যে সে একবার প্রবেশ করে, তাহা হইতে তাহাকে নিরস্ত করা কঠিন কার্য বিশেষত সেই সংকল্পের মধ্যে খেয়ালের প্রভাব বর্তমান থাকিলে,—তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। বলিল, "আচ্ছা, তাহলে সেই ব্যবস্থাই না হয় করি। কাকাবাবুদের মত নিয়েছিস ত'?"

দিবাকর বলিল, "নিয়েছি। আমরা রওনা হলে পরশু সকালে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থাকবার জন্যে নিশাকে আজই একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ো। কিন্তু আমি যে বিয়ে করে যাচ্ছি, সে কথা জানিয়ো না।"

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "আচ্ছা।"

হেমেন্দ্র শুনিয়া বিশেষ আপত্তি করিল না; বলিল, "তা মন্দ নয়; দু-রাত্রি রেল-গাড়িতে হানিমুন,—বেশ একটু নূতনত্ব হবে।"

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা পাঞ্জাব মেলে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া দিবাকর এবং যূথিকা কলিকাতা রওনা হইল।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া দিবাকর শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন করিতেছিল। হেমেন্দ্র এবং গৌরী রেল-গাড়ির কামরার মধ্যে যূথিকার নিকট বসিয়াছিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "দিবাকরকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জান যূথিকা?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে যূথিকা হেমেন্দ্রর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "মনে হচ্ছে, Veni, Vidi, Vici; এলাম, দেখলাম, আর জয়

করে নিয়ে চললাম। ওর মধ্যে যে এতখানি শক্তি আছে, তা জানা ছিল না।"

যূথিকার নীরব মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

গৌরী বলিল, "তুমি যে দিবাকরের মূর্খ স্ত্রী নও, এম-এ পাশ করা বউ, সেটা তাকে প্রথম সুযোগেই বুঝিয়ে দিয়ো।"

হেমেন্দ্র বলিল, "আর, তারপর দিবাকরকে বুঝিয়ে বোলো যে, উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তাহলে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অসাধু উপায় অবলম্বন করাও অসাধুতা নয়। সুতরাং তোমার লেখাপড়ার বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করবার সময় তোমার দিদি যে 'ইতি গজ' নীতি অবলম্বন করেছিলেন, তা সে ক্ষমা করতে পারে।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

গৌরী বলিল, "যূথিকার সুন্দর মুখ সামনে থাকলে সে তার দিদিকে অনায়াসেই ক্ষমা করতে পারবে।" তারপর যূথিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি সে জন্যে একটুও ভয় কোরো না যূথিকা,—সুযোগ উপস্থিত হওয়ামাত্র তাকে জানিয়ে দিয়ো। দেরি কোরো না।"

ঊর্ধ্বলোকে বিধাতাপুরুষ সকৌতুকে বলিলেন, সে সুযোগের ব্যবস্থা আমি এই পাঞ্জাব মেলেই করে রেখেছি গৌরী।

গাড়ি ডিস্ট্যান্ট সিগনাল পার হইবার পর দিবাকর যূথিকার দক্ষিণ হস্তখানা নিজ হস্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "আমার কি মনে হচ্ছে জান যূথিকা?"

অপাঙ্গে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিল, "কি মনে হচ্ছে?"

দিবাকর বলিল, "মনে হচ্ছে, দিন আষ্টেক-নয় আগে মনসাগাছা থেকে বেরিয়ে হুড়তে পুড়তে লাহোরে এসে এই যে তোমাকে দিন চার-পাঁচেকের মধ্যে বিয়ে করে নিয়ে কলকাতায় ছুটে চলেছি,—এ একটা স্বপ্ন নয় ত'? হঠাৎ যদি কোনো মুহূর্তে জেগে উঠে দেখি, এর সবটাই স্বপ্ন, মনসাগাছার দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে আছি, তাহলে কি মনে হবে জান?"

যূথিকা বলিল, "কি মনে হবে?"

"মনে হবে, এর চেয়ে ভীষণ দুঃস্বপ্ন জীবনে কোনো দিন দেখিনি।"

যূথিকা বলিল, "কেন, আমি এতই ভীষণ না-কি?"

যূথিকাকে আর একটু নিকটে টানিয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "হ্যাঁ, গো হ্যাঁ, তুমি এতই ভীষণ!"

যূথিকা বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি উত্তর দেবে?"

"কি কথা?"

"দিদির মুখে আমি সব শুনেছি। আচ্ছা, পাশ-করা মেয়ের ওপর তোমার অত ঘৃণা কেন?"

দিবাকর বলিল, "পাশ-করা মেয়ের ওপর আমার কতটা ঘৃণা আছে তা বলতে পারিনে, কিন্তু মূর্খস্য বিদুষী ভার্যা। অর্থাৎ মূর্খ মানুষের বিদুষী স্ত্রী, আমি একেবারেই পছন্দ করিনে। তুমি জান, আমি তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করেছি?"

যূথিকা বলিল, "জানি। কিন্তু তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করলে মূর্খ হয়, এ তোমাকে কে বললে? এম-এ পাশ ক'রেও কত লোক মূর্খ থাকে তা তুমি জান?"

দিবাকর বলিল, "তা জানবার মত আমার যথেষ্ট বিদ্যা নেই যূথিকা।"

সদ্যবিবাহিত স্বামীর আত্মত্রুটি স্বীকৃতির এই অনাবৃত কুণ্ঠাহীনতা দেখিয়া একটা সুমিষ্ট শ্রদ্ধায় যূথিকার মন সরস হইয়া উঠিল। বলিল, "বিদ্যে না থাকলেও জানবার মত বুদ্ধি তোমার যথেষ্ট আছে। আচ্ছা, দিদির কাছে সব কথা জানার পর ধর যদি এমন কথাও জানতে যে আমি ম্যাট্রিক পাশ করা মেয়ে, তা হ'লে তুমি আমাকে বিয়ে করতে?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "এত শক্ত শক্ত প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না যূথিকা। জান ত' আমার ফেল করা অভ্যেস আছে, শেষকালে তোমার কাছেও ফেল করতে আরম্ভ করব। তার চেয়ে বার কর তোমার সেতার আর এসরাজ,—এস, দুজনে মিলে খানিকটা বাজানো যাক।"

যূথিকা বলিল, "বাজনা পরে হবে, তার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এবার কলকাতায় যে পরমাসুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে ঠাকুরপো তোমার সম্বন্ধ করেছিলেন, তাকে বিয়ে করলে না কেন।"

সহাস্য মুখে দিবাকর বলিল, "সে কথাও শুনেছ?"

"শুনেছি। কেন বিয়ে করলে না বল?"

কি বলিবে ভাবিতে ভাবিতে দিবাকরের মুখ সহসা নিঃশব্দ হাস্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "তা হ'লে তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'ত না বলে। কেমন, ঠিক বলেছি ত? দাও নম্বর দাও, ফুল নম্বর—একেবারে পঁচিশের মধ্যে পঁচিশ।"

দিবাকরের হাতখানা একটু চাপিয়া ধরিয়া যূথিকা বলিল, "না, ঠাট্টা নয়। বল না, কেন বিয়ে করলে না!"

এবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দিবাকর বলিল, "বল কি যূথিকা! সেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা মেয়েকে আমি বিয়ে করব? সে মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ তা তুমি শোন নি?"

যূথিকা বলিল, "শুনেছি। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে সে ত আর বাঘ হয়নি যে, তাকে এত ভয়!"

দিবাকর বলিল, "না, বাঘ হয়নি। বাঘ হয় এম-এ পাশ করলে। সে বরং ভাল, এক থাবাতে শেষ করে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলে মেয়েরা বেরাল হয়। কাছে গেলেই ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, আর বাগে পেলেই আঁচড়ে দেয়।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

যূথিকা বলিল, "একটা এম্-এ পাশ করা মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হ'ত।"

দিবাকর বলিল, "কেন বল ত?"

"যূথিকা বলিল, তোমার বন্দুক আছে বাঘ শিকার করতে।"

দিবাকর বলিল, আমি ত' শিকার করতাম, কিন্তু সে ত' আমাকে স্বীকার করত না। বলত যে লোকে তিন তিনবার চেষ্টা ক'রে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারেনি, তাকে আমি অস্বীকার করি।'"

যূথিকা বলিল, "আর যদি বলত, যে লোক তিন তিনবার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করা সত্ত্বেও একজন এম-এ পাশ করা মেয়েকে বিয়ে করার উপযুক্ত শক্তি ধরে আমি তাকে ভালবাসি। তা হ'লে?"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে আমি বলতাম, সে মনে করে বটে তাকে ভালবাসে, কিন্তু আসলে সে ভালবাসে তার অর্থ আর বিষয়-সম্পত্তিকে। তা হয় না যূথিকা, কিছুতেই তা হয় না। একজন এম-এ পাশ করা মেয়ে সত্যি সত্যিই অন্তরের সঙ্গে একজন ম্যাট্রিকুলেশন ফেল-করা স্বামীকে ভালবাসতে পারে না।"

দিবাকরের এই কথা শুনিয়া যূথিকা হতাশ হইল। কথোপকথনের পূর্বাংশ-কালে তাহার অল্প আশা হইতেছিল যে, পাশ করা মেয়ে সম্বন্ধে তাহার স্বামীর অভিমতের ভিত্তি খুব দৃঢ় না হইতেও পারে। কিন্তু অর্থ এবং বিষয়-সম্পত্তির বর্ণে রঞ্জিত করিয়া সে যাহা বলিল তাই যদি তাহার প্রকৃত সবল মনোভাব হয়, তাহা হইলে ত' কোনোদিনই যূথিকা তাহার স্বামীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না যে, স্বামীর প্রতি তাহার ভালবাসার মধ্যে অর্থচেতনার কোনো খাদ নাই। ক্ষণকাল পূর্বে যে সুযোগের প্রত্যাশা আসন্ন মনে হইয়াছিল, এখন মনে হইল, তাহা সুদূর পরাহত। কে জানে কতদিন ধরিয়া তাহাকে এই অভিশপ্ত বিদ্যার বোঝা বহন করিয়া জীবনকে দুর্বহ করিয়া চলিতে হইবে!

ক্রমশ

তক্ষশীলার পথে

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বেলুচিস্থান, সিন্ধ, গুজরাত, কাথিয়াবাড়, মহারাষ্ট্র ও রাজপুতানা ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া আমি পাঞ্জাবে আসি। অমৃতশহর, হারাপ্পা, কাংড়া ও জ্বালামুখী দেখিয়া লাহোরে কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম করি। বৎসরাধিক ক্রমাগত ভ্রমণের ফলে শরীর ও মন উভয়ই ক্লান্ত হইয়াছে। কিন্তু কর্মজীবনে বিশ্রামের অবসর কোথায়? বিশ্রাম সংক্ষেপে শেষ করিয়া আমি রাওয়ালপিণ্ডী যাত্রা করি। লাহোর হইতে রাওয়ালপিণ্ডী ১৮০ মাইল, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া সওয়া তিন টাকা এবং ট্রেণে যাইতে প্রায় ১০।১১ ঘণ্টা সময় লাগে। রাওয়ালপিণ্ডীতে আমরা বাঙালী 'কালীবাড়ি'তে অতিথি হই। রাওয়ালপিণ্ডী শহরটি ক্যাণ্টনমেণ্ট ও সিটী এই দুই অংশে বিভক্ত। ক্যাণ্টনমেণ্ট অংশেই 'কালীবাড়ি' অবস্থিত। এই কালীবাড়িটি প্রবাসী বাঙালীর একটি 'অক্ষয়কীর্তি' এবং শতাধিক বৎসর প্রাচীন। ইহা সিমলা, আম্বালা ও পেশোয়ার শহরস্থিত কালীবাড়িত্রয়ের সমসাময়িক। রাওয়ালপিণ্ডী কালীবাড়িতে একটি বড় নাটমন্দির আছে; এখানে প্রতিমায় দুর্গাপূজো ও কালীপূজো এবং অন্যান্য উৎসব স্থানীয় প্রবাসী বাঙালিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। কালীবাড়িতে একটি বাঙালী লাইব্রেরীও আছে। এখানে বাঙালীর সংখ্যা ৫০।৬০ এর অধিক হইবে না। কালীবাড়িতে সানন্দে কয়েক দিন আহার ও আশ্রয় পাইলাম। রাওয়ালপিণ্ডী শহরের ক্যাণ্টনমেণ্ট অংশটি খুব সুন্দর; রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানকার মল রোডটি শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত। রাত্রিতে এই রাস্তাটি নীল বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইয়া জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির সৃষ্টি করে। ক্যাণ্টনমেণ্টটিও খুব বড়—গোরা সৈন্যদের আড্ডা। রাওয়ালপিণ্ডী সিটী এন ডবলিউ রেল লাইনের উত্তরে এবং ক্যাণ্টনমেণ্টটি উহার দক্ষিণে অবস্থিত। সিটী অংশটিই প্রাচীন শহর। ইহার রাস্তা ধূলিময়, কর্দমাক্ত, নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত। এই অংশে কোর্ট, কলেজ ও স্কুল, বড় বাজার প্রভৃতি আছে। নূতন বিস্তারটির রাস্তা ও গৃহাদি চমৎকার। এই স্থানের রামবাগটি দর্শনীয়। রামবাগটিতে একটি রামমন্দির, মন্দিরের চতুর্দিকে ফুলের বাগান এবং বাগানের মধ্যে মধ্যে সাধুদের থাকিবার কুটিয়া। এই রামবাগে সাধুদিগকে আহার আশ্রয় দেওয়া হয়। রামবাগের অদূরে সৈয়দপুরী মোহল্লায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসিদ্ধ ও পণ্ডিত সন্ন্যাসী স্বামী শর্বানন্দের সহিত দেখা হইল। গত তিন চারি বৎসর যাবৎ স্বামিজী কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একান্তে ঈশ্বর চিন্তা ও শাস্ত্রাধ্যয়নে মগ্ন আছেন। স্বামিজীর দীর্ঘ বপু, শ্বেতকায় ও আজানুলম্বিত বাহু, আর্য আকৃতি, মধুর প্রকৃতি অসাধারণ। তাঁহার বহু গ্রন্থ আছে।

রাওয়ালপিণ্ডী দেখা শেষ করিয়া আমরা ২৯শে জুলাই, বৃহস্পতিবার বোম্বাই এক্সপ্রেসে তক্ষশীলা যাই। রাওয়ালপিণ্ডী হইতে তক্ষশীলা মাত্র কুড়ি মাইল এবং ট্রেনে যাইতে মাত্র একঘণ্টা লাগে। তক্ষশীলা মিউজিয়ামের কিউরেটার শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত। আমরা দত্ত মহাশয়ের অতিথি হইলাম। মণীন্দ্রবাবু অতি অমায়িক, সদাশয় ও অতিথিসৎকারপরায়ণ। তিনি আমাদিগকে বিশেষ যত্নে আহার ও আস্থান দিলেন এবং দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ এই স্থানে আছেন। তক্ষশীলার খনন কার্যের সময় হইতেই তিনি এখানে কার্য করিতেছেন এবং তক্ষশীলা সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ (authority). তিনি মিউজিয়ামটি এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত রাখিয়াছেন যে, দর্শকের পক্ষে উহা বিশেষ উপকারী। মিউজিয়ামটি নাতিবৃহৎ। নিখিল ভারত মিউজিয়াম প্রদর্শনীতে তক্ষশীলার মিউজিয়ামটি মডেল মিউজিয়ামরূপে পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। মিউজিয়ামের ভিতরটি চিত্রবৎ সুন্দর। গুপ্ত মহাশয়ের নিকট শুনিলাম—তক্ষশীলার বিশাল ইতিহাস ইংরেজিতে কয়েক শত পৃষ্ঠাব্যাপী লিখিত হইয়াছে—কিন্তু যুদ্ধের দরুণ কাগজের অভাবে ছাপা হইতেছে না। তিনি নিজেও মিউজিয়ামের একটি 'Guide' লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ এখনও উহা প্রকাশের সুযোগ পাইতেছেন না! গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তক্ষশীলার বিষয় অনেক আলোচনা হইল। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চিহ্নই তাঁরা পান নাই; তবে এত বৌদ্ধ মঠ



ধর্মরাজিকা স্তূপ, তক্ষশীলা

এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তাহার সংখ্যা অধিক এবং এই সকল মঠে শত শত ছাত্র বাস করিয়া অধ্যয়ন করিত। আমি মণীন্দ্রবাবুকে বাঙলায় বা ইংরেজিতে তক্ষশীলার নাতিদীর্ঘ ইতিহাস লিখিতে নিবেদন জানাইলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মণীন্দ্রবাবুকে উক্ত গ্রন্থ লিখিবার অনুরোধ করিলে ভাল হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করিলে যশস্বী হইবেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কে এই কার্যে অগ্রসর হইতে আমরা আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি। মণীন্দ্রবাবু সমগ্র জীবন তক্ষশীলার চর্চায় ও অনুসন্ধানে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার মত দ্বিতীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর বর্তমানে নাই। মিউ-

জিয়ামের পার্শ্বে বাগান ও অতিথিশালা। অতিথিশালার বন্দোবস্তও সুন্দর এবং প্রত্যেকে প্রত্যহ আট আনা ভাড়া দিয়া এখানে থাকিতে পারেন।

পাঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাওয়ালপিণ্ডী শহরের বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়েতে Taxila নামে একটি জংশন আছে। এই জংশনের নিকটে পূর্বে এবং উত্তর-পূর্বে তক্ষশীলার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বিরাজিত। জংশনের প্রায় এক মাইল দূরে একটি পি ডব্লিউ ডি বাংলো আছে। এই বাংলোতে থাকিবার জন্য রাওয়ালপিণ্ডী জেলার ইঞ্জিনিয়ারের অনুমতি লইতে হয়। জংশন হইতে আধ মাইলেরও কম দূরে আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম। সরকার-রক্ষিত ধ্বংসস্তূপ দেখিবার জন্য এখানে টিকিট কিনিতে হয়। সমগ্র প্রাচীন স্থানটি সম্যকরূপে দেখিতে হইলে পুরা দুইদিন সময় লাগে। দ্রষ্টব্য প্রসিদ্ধ স্থানগুলি পর্যন্ত ভাল মোটর-রাস্তা আছে। সুতরাং পদব্রজে দেখা অসুবিধা হইলে ঘোড়ারগাড়ি বা মোটর ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্যার জন মার্শাল সাহেব লিখিত 'A Guide to Taxila' নামক বইখানি (মূল্য আড়াই টাকা এবং ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত). আমরা লাহোরে কিনিয়া উত্তমরূপে পড়িয়াছিলাম। তাই আমাদের সব দেখিবার ও বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইল। যে উপত্যকার উপরে ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত, তাহা অতি মনোরম স্থান; উহা হারো (Haro) নদীর জলে বিধৌত। ইহার উত্তরে ও পূর্বে হাজারা ও মুরী পাহাড় এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে মার্গালা পর্বত।

মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার সহিত হিন্দুস্থানের বাণিজ্যপথে তক্ষশীলা অবস্থিত। স্থানটি অতি উর্বর: এই সকল কারণে প্রাচীনকালে তক্ষশীলার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। আরিয়ান (১) (Arrian) সাহেবের মতে সম্রাট আলেকজেণ্ডারের সময়ে তক্ষশীলা একটি সমৃদ্ধ শহর এবং বিতস্তা ও সিন্ধু নদীর মধ্যে যত শহর ছিল, তন্মধ্যে তক্ষশীলা বৃহত্তম ছিল। স্ট্রাবো (২) (Strabo) সাহেব বলেন—তক্ষশীলা শহরটি ঘন জনসমাকীর্ণ ও অত্যন্ত উর্বর ছিল। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাংও (৩) লিখিয়াছেন যে, তক্ষশীলা উর্বর, শস্যপূর্ণ, বৃক্ষলতা-সমাকীর্ণ এবং নদীমাতৃক স্থান। তক্ষশীলার পূর্বাংশ হাথিয়াল পর্বত কর্তৃক দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরাংশ হারো নদীর ক্যানাল-সমূহ দ্বারা জলসিঞ্চিত হওয়ায় এই অংশে আজকাল খুব শস্য জন্মে। দক্ষিণাংশ প্রস্তরময় ও অনুর্বর। এই অংশে তাম্রনালার স্রোত প্রবাহিত। উপত্যকার উত্তরার্ধে হারো নদীর শাখা লুণ্ডীনালা প্রবাহিত। এই উপত্যকায় তিনটি পৃথক প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। শহরগুলির নাম ভীরমাউণ্ড, শিরকাপ এবং শিরসুক। পরস্পরের মধ্যে সাড়ে তিন মাইলের অধিক দূরত্ব নাই। ভীরমাউণ্ড অধিকৃত স্থানটি উত্তর-দক্ষিণে ১২১০ গজ দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৭৩০ গজ প্রস্থ। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে এই স্থানটি তক্ষশীলার প্রাচীনতম অংশ এই প্রবাদের সত্যতা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের খনন-কার্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। গ্রীকগণের আসিবার কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই শহরটি সমৃদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীকগণ আসিয়া শহরটিকে শিরকাপ নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন। শিরকাপ দ্বিতীয় প্রাচীন শহর। এই শহরের মধ্যস্থিত প্রাচীরটি প্রস্তর নির্মিত এবং খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় শক রাজা প্রথম আজেশ (Azes I) দ্বারা স্থাপিত। এই প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছয় হাজার গজ এবং ইহা ১৫ ফুট হইতে ২১½ ফুট পর্যন্ত চওড়া। তৃতীয় শহরটির নাম শিরসুক। ইহা লুণ্ডীনালার বিপরীত দিকে অবস্থিত এবং কুশনরাজ কনিষ্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শহরটির আকার সামন্তরীক ক্ষেত্রের ন্যায়। শিরসুক নগর যে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, তাহার দৈর্ঘ্য তিন মাইল ও প্রস্থ আঠার ফুট। শহরের মধ্যে বর্তমানে মীরপুর, ঢর্কিয়ান এবং পিণ্ডগাখরা নামক তিনটি গ্রাম আছে। উপত্যকার দক্ষিণাংশটি বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষে সমাকীর্ণ। বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভসমূহের মধ্যে ধর্মরাজিকা স্তূপ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মোহরা মোরাদু, পিপ্পল, জৌলিয়ান, বাদলপুর, লালচক এবং ভানদিয়াল স্থান সকলেও বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার ছিল।

প্রাচীন তক্ষশীলার অসাধারণ সমৃদ্ধি ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ইহার ইতিহাস অতি সামান্যই পাওয়া যায়। গ্রীক ও চৈনিক লেখকগণের বিবরণ এবং খনন কার্যের দ্বারা আবিষ্কৃত মুদ্রা এবং কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য শিলালিপি হইতে ইহার ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হয়। গ্রীক ও রোমান্ লেখকগণ তক্ষশীলাকে Taxila বলিয়া লিখিতেন। অতি প্রাচীনকালে তক্ষশীলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মহাভারতে রাজা জন্মেজয় অনুষ্ঠিত মহা সর্পযজ্ঞের সময়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তক্ষশীলা কোন রাজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তক্ষশীলা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ডাঃ ভি এস সুখথংকর গবেষণা দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছেন—ভারতীয় সাহিত্যে তক্ষশীলার উল্লেখ কোথায় কোথায় আছে। চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্যের তক্ষশীলায় জন্ম হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর আরামাইক (Aramaic) অক্ষরে লিখিত শিলালিপি হইতে তক্ষশীলার উপর মৌর্য প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতীত হয়।

বৌদ্ধ জাতকসমূহের নানা স্থানে ইহার উল্লেখ হইতে ইহা জানা যায় যে, তক্ষশীলা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় এবং পরবর্তী শতাব্দী পর্যন্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎকালীন শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চার শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের বসন্তকালে সম্রাট আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া তক্ষশীলা অধিকার করেন। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গী এবং সমসাময়িকগণের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালীন তক্ষশীলা নগর অতিশয় ধনশালী, বৃহৎ, জনবহুল এবং সুশাসিত ছিল এবং ইহার রাজ্যগুলি সিন্ধু নদী হইতে বিতস্তা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উপরোক্ত বিবরণসমূহ হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, তথায় তখন বহু-বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। যে সকল কুমারীগণ দারিদ্র্যবশতঃ বিবাহ হইত না তাহাদিগকে বাজারে বিক্রয় করা হইত; এবং মৃতদেহ সকল শকুনীর নিকট নিক্ষেপ করা হইত। রাজা আম্ভীর সহিত রাজা পৌরভ এবং রাজা অভিসারের বিবাদ ছিল। রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারের সাহায্যে পৌরভকে পরাজিত করিবার জন্য আলেকজাণ্ডারকে পাঁচ হাজার সৈন্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারের রাজ্যাধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। গ্রীক সম্রাট খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে বাবিলনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর ছয় বৎসরের মধ্যে গ্রীক গভর্নর ইউডামাস সিন্ধু উপত্যকা হইতে সৈন্যসামন্ত অপসারিত করিয়া অ্যাণ্টিগোনাসের বিরুদ্ধে ইউমেনিসকে সাহায্য করেন। প্রায় সেই সময়ে কিংবা হয়তো তাহার কিছু পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক সৈন্যদল সমূহকে সিন্ধু নদীর পূর্বে বিতাড়িত করিয়া তক্ষশীলা এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য রাজ্যগুলি মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সেলিউকাস নিকেটার খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে আলেকজাণ্ডারের অপহৃত রাজ্যগুলি পুনরায় অধিকার করিবার জন্য বৃথা চে

(1) Vide 'The Invasion of India By Alexander the Great' By Mc-Crindle p. 92

(2) Vide 'Ancient India' By Mc-Crindle p. 33

(3) Vide 'On Yuan Chwang' By T Watters. Vol. 1, p. 240.

করেন। সেলিউকাস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করিয়া হিন্দুকুশ পর্যন্ত সকল গ্রীক রাজ্য ভারতীয় সম্রাটের হস্তে সমর্পণপূর্বক মাত্র পাঁচশত হস্তী তাঁহার বিনিময়ে গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র বিম্বিসার যখন মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তক্ষশীলা মৌর্য অধীনতা কিছুকালের জন্য ত্যাগ করে। পরে বিম্বিসারের পুত্র অশোক বিম্বিসারের প্রতিনিধিরূপে তক্ষশীলা শাসন করেন। হুয়েনস্যাং একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, অশোকের পুত্র কুনাল অন্ধ হইবার পরে রাজা অশোক তক্ষশীলা হইতে যে সকল লোককে নির্বাসিত করিতেন, তাহারা খোটানে যাইয়া বাস করিত। স্টাইন (S) সাহেবের (Stein) তাঁহার গ্রন্থে উক্ত প্রবাদটি উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৯ অব্দে অশোকের মৃত্যু হইলে মগধ সাম্রাজ্য অনেক অংশে বিভক্ত হয়। সেই সময় তক্ষশীলা অন্যান্য পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের সঙ্গে কিছুকালের জন্য স্বাধীন হয় এবং তৎপরে ব্যাক্ট্রিয়া হইতে আগত গ্রীক আক্রমণকারীদের অধীন হয়। ব্যাক্ট্রিয়া হইতে আণ্টিয়োকাসের জামাতা ডেমিট্রিয়াস (প্রথম) আসিয়া তক্ষশীলা অধিকার করেন। তাহার ত্রিশ বৎসর পরে ইউক্রেটাইডস ডেমিট্রিয়াসের নিকট হইতে তক্ষশীলা কাড়িয়া লন। তক্ষশীলায় এ্যাপলোডোটাস এবং এ্যাণ্টিয়ালসিডাস —এই গ্রীক রাজদ্বয় রাজত্ব করেন। কানিংহাম (৫) সাহেবের মতে এ্যাপলোডোটাস ইউক্রেটাইডসের পুত্র ছিলেন। তক্ষশীলায় গ্রীক রাজত্ব এক-শতাব্দীর অধিক স্থায়ী হয় নাই। গ্রীকগণের পরে শকগণ তথায় রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে শক দলপতি মাউয়েস (Maues) এর অধীনে একদল শক আসিয়া তক্ষশীলা অধিকার করে। এই শকগণ পার্থিয়ান প্রদেশের অধিবাসী ছিল। শক-রাজগণ সেইজন্য রাজ্য-শাসনে পারস্যের প্রণালী অনুসরণ করিত। পার্থিয়ান সংস্কৃতি গ্রীক ও পারস্য সভ্যতার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। তক্ষশীলা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পার্থিয়ান রাজা গণ্ডোফারেসের (Gondophores) অধীন হয়। গণ্ডোফারেসের খ্যাতি পাশ্চাত্য জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজ-দরবারে সেণ্ট টমাস (St. Thomas) প্রেরিত হন। খ্রীষ্টীয় ৪৪ অব্দে পার্থিয়ান রাজত্বের সময়ে টায়ানার এ্যাপলোনিয়াস (Appollonius Tyana) তক্ষশীলা পরিদর্শন করেন। এ্যাপলোনিয়াসের জীবনী লেখক ফাইলোস্ট্রেটাসের (Philostratus) মতে তক্ষশীলার তদানীন্তন রাজা ছিলেন ফ্রাওটিস। এ্যাপলোনিয়াস তক্ষশীলায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে জান্দিয়াল মন্দিরে বিশ্রাম করেন। তখন শিরকাপ নগর নিনেভে নগরের মত সুবৃহৎ ও সমৃদ্ধ এবং গ্রীক নগরসমূহের মত সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত ছিল। এথেন্স নগরের রাস্তার মত উহার রাস্তাগুলি সংকীর্ণ অথচ সুন্দর ছিল। গৃহগুলি মাটির নীচে একতলা এবং মাটির উপরে আর একতলা ছিল। নগরটি একটি সূর্য-মন্দির এবং একটি রাজপ্রাসাদে শোভিত



শিরের মূর্তি, জাউলিয়ান, তক্ষশীলা

ছিল। পার্থিয়ানদের পরে তক্ষশীলা কুশনগণের অধিকারে আসে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষাংশে কুশনগণ চীনদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ব্যাক্ট্রিয়া এবং কাবুল উপত্যকা অধিকারান্তে উত্তর ভারতের সমতলভূমি আক্রমণ করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুশনরাজ কাজুলা তক্ষশীলাকে পার্থিয়ানদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। কাজুলার পরে ভীমা, তৎপরে কনিষ্ক এবং হুবিস্ক এবং বাসুদেব তক্ষশীলায় রাজত্ব করেন। কনিষ্ক ছিলেন কুশনরাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পুরুষপুর বা আধুনিক পেশাওয়ার ছিল তাঁহার শীতকালের রাজধানী। কুশন রাজ্য ধ্বংস হইবার পরে তক্ষশীলা সাসানিয়ানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। স্যার জন মার্শাল তক্ষশীলায় অনেক সাসানি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছেন।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ান ৪০০ খ্রীঃ তক্ষশীলায় বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভগ[illegible] পরিদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভা[illegible] বশত উহার কোন বিবরণ লিখিয়া [illegible] নাই। শ্বেতকায় হূনগণ ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে[illegible] পরে ভারত আক্রমণ করিবার সময়ে ত[illegible] শীলার প্রাসাদ এবং প্রতিষ্ঠানগু[illegible] নৃশংসভাবে ধ্বংস করেন। এই ধ্বংসাব[illegible] হইতে তক্ষশীলা আর কখনও পূর্ব[illegible] ফিরিয়া পায় নাই। যখন হুয়েনস্যাং সপ্[illegible] শতাব্দীতে তক্ষশীলায় আগমন কর[illegible] তখন উহা কাশ্মীরের অধীন একটি প্[illegible] এবং উহার বৌদ্ধ মঠগুলি জনশূন্য [illegible] ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তক্ষশীলার ধ্ব[illegible] স্তূপের খননকার্যে প্রত্নতাত্ত্বিক [illegible] ডেলমেরিক এবং রাওয়ালপিণ্ডীর ডেপ[illegible] কমিশনার মেজর পিয়ার্স এবং মে[illegible] ক্রাক্রফট (Cracroft) প্রথমে প্র[illegible] করেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে [illegible] পরেও ভিস্তিগণ তক্ষশীলাস্থ স্তূপগু[illegible] খুঁড়িয়া এবং তন্মধ্যস্থ মূল্যবান বস্তুগু[illegible] অপহরণ করিয়া বিক্রয়পূর্বক জীবি[illegible] অর্জন করিত। শাহডেরী গ্রামের নূর ন[illegible] একটি ভিস্তি অনেকগুলি প্রাচীন [illegible] নষ্ট করিয়াছিল এবং জান্দিয়ালের এব[illegible] স্তূপে লেখপূর্ণ একটি স্বর্ণপাত্র অপহ[illegible] করিয়াছিল। জেনরেল কানিংহাম ১৮[illegible] খ্রীঃ প্রাচীন তক্ষশীলার বর্তমান অবস্থি[illegible] নির্দেশপূর্বক ১৮৬৩—৬৪ [illegible] ১৮৭২—৭৩ অব্দের শীতকালে খননক[illegible] চালাইয়াছিলেন। তিনি মোহরা মালিয়া[illegible] নামক গ্রামের নিকটে দুইটি বৃহৎ ম[illegible] আবিষ্কার করেন। তাঁহার খননকার্যে[illegible] ফল সেই সেই বৎসরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ[illegible] রিপোর্টে পাওয়া যায়। স্যার জন মার্শ[illegible] ১৯১২ খ্রীঃ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভ[illegible] শীত-ঋতুতে তক্ষশীলায় যে খননক[illegible] করিয়াছিলেন, তাহার সচিত্র বিবরণ প্রত্ন[illegible] বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে পাওয়া যা[illegible] উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে জ[illegible] যায় যে তক্ষশীলা খ্রীষ্টপূর্ব প[illegible] শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতা[illegible] পর্যন্ত—এক সহস্র বৎসরের মধ্যে সা[illegible] রাজ্যের শাসনাধীন হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃ[illegible] এবং চতুর্থ শতাব্দীতে যখন তক্ষশী[illegible] মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ত[illegible] তথায় হিন্দুস্থানের স্বদেশী শি[illegible] বিস্তার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু [illegible] শিল্পের অবস্থা উন্নত ছিল না। শিল্প[illegible] রত্নগুলি কাটিয়া পালিশ করিত এবং [illegible] সকলের উপরিভাগে অনেক কারুক[illegible] করিত। গ্রীক রাজাগণের শাসনে খ্রী[illegible] পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তক্ষশী[illegible]

(4) Khotan By Stein I, p 156.
(5) Numismatic Chronology. By Cunningham. p. 241—3.

শিল্পের উপর কিঞ্চিৎ গ্রীক প্রভাব পতিত হয়, কিন্তু ঐ প্রভাব বাসগৃহ, মন্দির, সাধারণ স্তম্ভ বা মূর্তির রূপান্তর করিতে পারে নাই। মুদ্রাসকলের উপর এই প্রভাবের গভীরতা প্রতীত হয়। অধিকাংশ মুদ্রার উপর আলেকজাণ্ডার প্রমুখ গ্রীক সম্রাটগণের আকৃতি খোদিত হইত। মুদ্রার সাধারণ ওজন এথেন্সের মুদ্রার ওজনের সমান ছিল। পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি গ্রীক ভাষায় লেখা হইত। পারস্য মুদ্রা প্রচলনের সময়েও তক্ষশীলার মুদ্রাগুলির একদিকে গ্রীক ভাষা এবং অন্যদিকে খোরোষ্ঠি ভাষায় সব কিছু লেখা হইত। ক্রমে ক্রমে গ্রীক প্রভাব হ্রাস পাইল। গ্রীক প্রভাবের ছাপ ভারতীয় শিল্পের উপর দীর্ঘস্থায়ী এবং সুদূরব্যাপী হইয়াছিল। এই প্রভাব যে মধ্য ভারত অবধি বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ একটি শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে। তক্ষশীলা হইতে এক সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত মধ্য ভারতে বিদিষা নামক প্রাচীন শহরে একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা আদিম ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত এবং একটি স্তম্ভের উপরে খোদিত। শিলালিপির বিবরণ এইঃ—"তক্ষশীলা গ্রীক রাজা এ্যাণ্টিয়ালসিডাস বিদিষা রাজ্যে ডিয়নের পুত্র হেলিও ডোরাস নামক গ্রীককে দূত-রূপে প্রেরণ করেন এবং সেই দূত কর্তৃক উক্ত স্তম্ভ স্থাপিত হয়।" স্যার জন মার্শাল তাঁহার তক্ষশীলা সম্বন্ধীয় সার-গর্ভ গ্রন্থে বলেনঃ—"গ্রীকগণ এই দেশে আসিয়া এই দেশের ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। ভারতীয় দেবতাগণকে দেশীয় দেবতাগণের সহিত অভেদ জ্ঞানপূর্বক তাহারা শ্রদ্ধা করিত। তাহারা যেমন ইটালিতে মিনার্ভার সহিত এ্যাথেনাকে বা ডাইওনিসাসের সহিত বাক্কাসকে অভেদ ভাবিত, সেইরূপ ভারতে তাহারা সূর্যকে এ্যাপলো এবং কামদেবকে ইরস (Eross) মনে করিত। শিব বা পার্বতী, বিষ্ণু বা লক্ষ্মীকে ভক্তি-অর্ঘ্য দান করিতে তাহারা ইতস্তত করিত না।" গ্রীক-শিল্প এই সকল কারণে ভারতে বিশেষভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল। শক-শাসনে গ্রীক প্রভাব মন্দীভূত হয়, কিন্তু পার্থিয়ান রাজত্বের সময় গ্রীক প্রভাব পুনরায় মস্তক উত্তোলন করে। পার্থিয়ান সংস্কৃতি পারস্য এবং গ্রীক সভ্যতান্বয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। একদিকে আফগানিস্তান ও উত্তর ভারত এবং অন্যদিকে ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্তী দেশসমূহ—এই উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য আদান-প্রদানের কেন্দ্র ছিল পারস্য। তক্ষশীলাস্থিত শিরকাপ শহরটি পার্থিয়ান সভ্যতার কেন্দ্র ছিল বলিয়া উহার উপর ভারত অপেক্ষা গ্রীসের প্রভাব অধিকতর পতিত হয়। তক্ষশীলার উপর পার্থিয়ান প্রভাব খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবল ছিল।

গান্ধার স্থাপত্যের অনেক নমুনা তক্ষশীলায় পাওয়া গিয়াছে। খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে কুশন রাজাদের সময়ে এই স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হয়, কিন্তু ইহা তৃতীয় শতাব্দীতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। স্যার জন মার্শাল (৬) বলিয়াছেন—"সেলিউকিড রাজাদের সময় হইতে পশ্চিম এশিয়া প্রাচীন জগতের শিল্পোন্নতির কেন্দ্রস্থল ছিল। মেসোপোটেমিয়া, পারস্য, আইওনিয়া এবং গ্রীসের শিল্পসমূহ পশ্চিম এশিয়াতেই মিলিত ও মিশ্রিত হইয়াছিল। এই পাশ্চাত্য এশিয়া হইতে দুইটি শিল্পস্রোত প্রবাহিত হইয়া একটি রোম সাম্রাজ্যে এবং অপরটি পার্থিয়া, তুর্কীস্থান এবং ভারতে বিস্তৃত হয়। এশিয়ার উপর কখনও রোমীয় শিল্পের প্রভাব পতিত হয় নাই। গান্ধার এবং রোমের শিল্প একই মূল হইতে উৎপন্ন।" তক্ষশীলার ইতিহাস এবং শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। এখন আমরা দর্শকের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিবরণ দিতেছি।

ধর্মরাজিকা স্তূপটি প্রথমে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৌদ্ধগণ কোন পবিত্র স্থান বা মহাপুরুষ বা বুদ্ধের স্মৃতিরক্ষার্থে স্তূপ নির্মাণ করে। স্তূপ নির্মাণ বৌদ্ধদের নিকট একটি মহা পুণ্য কার্য। সংস্কৃত স্তূপ শব্দটি প্রাকৃত ভাষায় থূপ হয়। স্তূপকে বর্মায় (Burma) প্যাগোডা, সিংহলে ডাগোবা এবং নেপালে চৈত্য বলে। শব্দটির ইংরেজি অপভ্রংশ হইয়াছে তোপ। ধর্মরাজিক স্তূপটিকে স্থানীয় লোকে 'চির-তোপ' বলে। কখন যে এই স্তূপটি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করা বর্তমানে অসম্ভব। সম্ভবত, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে ইহা নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা যে শক, মাউয়েস এবং আজেশ রাজাদের সময়ে অবস্থিত ছিল, তাহা ইহার চতুর্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র স্তূপশ্রেণীর দ্বারা প্রমাণিত হয়। স্তূপের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ-পথ আছে। এই পথে বৌদ্ধগণ স্তূপটিকে ডানদিকে রাখিয়া পরিক্রমা করিত। আজকাল বৌদ্ধগণ সাধারণত কোন স্তূপকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু কোন ব্রতগ্রহণকালে সাতবার, চৌদ্দবার বা একশো আটবার প্রদক্ষিণের বিধি আছে। সমগ্র প্রদক্ষিণ পথটি কাচের টাইল (Glass Tiles) দ্বারা আবৃত ছিল। এই পথে বোধিসত্ত্বের একটি সুন্দর প্রস্তর-মূর্তি এবং ৩৫৫টি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটির হস্তদ্বয়ে অভয়-মুদ্রা এবং মস্তকে আতপত্র এবং উভয় পার্শ্বে পার্ষদগণ আছে। মুদ্রাগুলি হুবিস্ক এবং বাসুদেব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাজার সময়ের। এই মহাস্তূপটি তক্ষশীলার প্রাচীনতম বৌদ্ধ স্তম্ভ। ইহার চতুর্দিকে যে ক্ষুদ্র স্তূপগুলি আছে, তাহাদের ১১টি ইতি-মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্র স্তূপগুলি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নহে। একটি স্তূপের মধ্যে চার ইঞ্চি উচ্চ একটি কৌটার মধ্যে প্রায় দুই ইঞ্চি উচ্চ একটি রৌপ্য কৌটা পাওয়া গিয়াছে। এই রৌপ্য কৌটার মধ্যে কিছু অস্থি ও ভস্ম এবং কয়েক খণ্ড স্বর্ণ, হীরক ও অন্যান্য রত্ন এবং কয়েকটি অস্থিমালার দানা ছিল। দানাগুলির আকার পশু বা পাখীর মত; যথা,—সিংহ, কচ্ছপ, ব্যাঙ ও হাঁস প্রভৃতি। কয়েকটি দানা ত্রিরত্নের আকার। একটি স্তূপের চারিটি মৃন্ময় প্রদীপ চারিকোণায় রক্ষিত ছিল। এই স্তূপগর্ভে একটি স্বর্ণ কৌটা এবং কয়েকটি সোনার আলপিন এবং কৌটার মধ্যে অস্থি এবং মণিনির্মিত মালার দানা এবং কোন বৌদ্ধ সাধুর কিছু অস্থি-ভস্ম পাওয়া গিয়াছে। এই মহামূল্য দ্রব্যগুলি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড কর্তৃক সিংহলের বৌদ্ধগণকে উপহারস্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। এবং তাহারা ক্যাণ্ডিস্থিত দালাদা মালিগাওয়া নামক প্রসিদ্ধ দন্ত-মন্দিরে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রধান স্তূপে তিনটি বিভিন্ন যুগের পাকা গাঁথুনী (Masonry) লক্ষিত হয়। প্রথম স্তরটি শক যুগের, দ্বিতীয়টি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর এবং তৃতীয়টি পরবর্তীকালের। একটি মৃত্তিকানির্মিত উচ্চ বেদীর ধ্বংসাবশেষ প্রধান স্তূপের অদূরে দৃষ্টি-গোচর হয়। এই বেদীর মধ্যে বহু মৃন্ময় শীল পাওয়া গিয়াছে। শীলগুলিতে এই বৌদ্ধ বাক্যটির ছাপ দেওয়া আছে; যথা,—"যে ধর্মাঃ হেতুপ্রভাবাঃ" ইত্যাদি। উত্তরে সামান্য পথ অতিক্রম করিলে কয়েকটি বৌদ্ধ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তাহাদের একটিতে ৩৫ ফুট উচ্চ একটি বৌদ্ধ মূর্তি ছিল। মহাস্তূপসংলগ্ন যে সকল বিহার ছিল, তাহাদের কয়েকটি ১৯৩৪ সনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল বিহারে অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বাস করিতেন। বিহারের সঙ্গে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণের ব্যবহারের জন্য অন্নশালাদি ছিল।

(6) See "A Guide to Taxila" by Sir John Marshall. p. 33.

রবীন্দ্রনাথের দান

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব দিবসে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য আমার তরুণ বন্ধুরা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য তাঁদের কাছে সকলের আগে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। রবীন্দ্রনাথের চরিত্র এবং তাঁর অবদান এত বিশাল এবং বিরাট যে, কথায় তা বলে শেষ করা যায় না; অনেক কথাতেও সে কথা কথনীয় থেকে যায় এবং চিরকাল তা থাকবেও। আমাদের এ-যুগ চলে গেলেও বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে লোকে তাঁর কথা বলবে এবং সে-সব কথা বুঝতে চেষ্টা করবে। যে কথা মধুর, অর্থাৎ যে কথা প্রচুর প্রাণরসে পুষ্ট, সে কথার বিশেষত্বই হ'ল এই। কবির কথা এমনই কথা। রবীন্দ্র-চরিত্রের সম্বন্ধে আপনারা অনেক দিক থেকে আলোচনা করলেন এবং অনেক নূতন কথা এখানে এসে জানতে পারলেম; কিন্তু আমি একটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। আমার মতে, আমরা রবীন্দ্রনাথকে যে যেভাবেই বুঝি না কেন, প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কবি। 'কবি' এই শব্দটি এদেশের ভাষায় অত্যন্ত গৌরবার্থ দ্যোতক; শুধু পদ্য লিখলেই কবি হওয়া যায় না। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আমরা দেখতে পাই একটা অভিভব; অন্য কথায় দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং অভাবজনিত পীড়ন। এর বদলে যিনি ভাবকে দেখেন, তিনিই কবি। আমার যুবক বন্ধুরা বলবেন, এতো হ'ল একটা লঘু ভাবুকতা; এতে বড় কি হলো। এ হ'ল একটা প্রতীতি মাত্র, এতে বস্তুর আত্যন্তিক প্রকৃতি কি বদলালো; বাস্তব দুঃখ-কষ্টের যে সমস্যা, সে সমস্যার সমাধান হ'ল কতটুকু? এ-কথার উত্তর এই যে, বস্তুর তথাকথিত বস্তুত্ব আমাদের দেখার উপরই নির্ভর করে। বস্তুর প্রকৃত বস্তুত্ব আমার কাছে হ'ল ভাবে অর্থাৎ লাভের হিসাব খতিয়ে। লোকসানের দিক থেকে নয়। অথচ আমরা সাধারণ মানুষ সকল বস্তুর অবাস্তব অর্থাৎ এই লোকসানের দিকটা, এই অভাবের দিকটার সঙ্গেই আমরা সর্বাধিক পরিচিত। কবি বস্তু-জগৎকে আমার পক্ষে বাস্তব করেন, অর্থাৎ বস্তুর লাভের দিকের স্বরূপটা আমার কাছে উন্মুক্ত করেন। জানি, আমার তরুণ বন্ধুরা এত সহজেই আমাকে রেহাই দিবেন না। তাঁরা বলবেন, বস্তুর যে দিকটা আপনি অভাবের দিক বলছেন, সেটাই আমরা বলি বাস্তব; কারণ বহুর কাছে সেই দিকটাই যখন সত্য এবং নিত্য; কবি মধুর কথায় কল্পনার জাল বোনা সত্ত্বেও বহুর কাছে বস্তুর সে দিকটা তো সমানই থেকে যাচ্ছে। এ কথার উত্তর এই যে, যাঁরা এ ধরণের যুক্তি তুলছেন, বহুর সঙ্গে তাঁদের যোগ নেই; বহুর সঙ্গে প্রাণের টান না রেখে কেবল ব্যক্তি-সর্বস্বতার দিক থেকেই তাঁরা এমন কথা বলছেন। বহুর সঙ্গে যুক্ত হ'লে তাঁরা এমন কথা আর বলতেন না। অন্তরের কোণ থেকে স্বার্থদৃষ্টি দূর করে যদি তাঁরা পরার্থপর হ'তে পারতেন, তবে বস্তুর ভাবের দিকটা তাঁরা ধরতে পারতেন। এতে 'বিশ্ব-জগতে কারো অভাব থাকতো না কিংবা বিশ্বের সকল সমস্যার একেবারে সমাধান হ'য়ে যেতো, এ কথা আমি বলছিনে, তবে যেটুকু বস্তুর উপলব্ধি অন্তরে পেলে বহুর সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তব শক্তি জাগতো, সেটুকু পাওয়া সম্ভব হ'তো। ভাবের একটা ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে অকুতোভয়ে তাঁরা কাজ করতে পারতেন। কবির অবদান হ'ল বহুর সঙ্গে অন্তরের যোগের কৌশলের দ্বারা মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সেই পথে মানুষকে অভাবের থেকে ভাবের রাজ্যে নিয়ে যাওয়া; অন্য কথায় বলা যায়, কবির অবদানের স্বরূপ হ'ল মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান করা। কারণ, মানুষের জীবনের সার্থকতা হ'ল তার মননের শক্তি। অপর সৃষ্ট জীবের চেয়ে এই দিক থেকেই মানুষের বিশিষ্টতা। অপরাপর সৃষ্ট জীব বস্তুর দ্বারা কেবল দেহের অভাবই পূরণ করছে, কিন্তু মানুষ; দেহের অভাব পূরণের সাময়িকতা অতিক্রম করেও বস্তুর থেকে নিত্য করে পাবার মত রস আদায় করে নিতে সমর্থ হয়। একেই বলা যায় মনন। বহুর সঙ্গে যোগসূত্রেই এই মননের স্ফুরণ ঘটে। মনুষ্য জীবনের সত্যকার সূচনা হ'লো সেখান থেকে। মানুষ নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'লো। আর সকল সৃষ্টির মূলে হ'ল ঐ স্বমহিমার উপলব্ধি; অর্থাৎ দশের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে বস্তুর ভাবের দিকটার সত্যকার বিত্তে সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির দৈন্যকে অতিক্রম করে মানুষ যখন অধিষ্ঠিত হ'লো তখনই সে কর্মের অনুপচীয়মান আনন্দ রসে অভিষিক্ত হ'লো। এই দিক থেকে কবি বড় কর্মী; কারণ বহুর ভিতরে কর্মের প্রেরণা তিনি জাগিয়ে দেন। তাঁর কর্মের ধারা পরিমিতির বেড়ার মধ্যে বাঁধা নয়, তাহা অপরিমিত এবং নিত্য। এদেশের আলঙ্কারিকগণ এজন্য কবিত্বকে অদ্ভুত নির্মাণক্ষম প্রতিভা ব'লে অভিহিত করেছেন।

দৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টির এইভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সুন্দরের অনুভূতিতে হৃদয়ের যে পরিস্পন্দন, সৃষ্টির মূলে রয়েছে সেই জিনিস। অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে থাকে প্রত্যক্ষতার পরম বল; অনুমান বা প্রত্যয় সেখানে জোরালো কাজ কর্তে পারে না। বড় বড় কথা শুনে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সৃষ্টির পরিস্পন্দন জাগেনি; তিনি মধুরকে চোখে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনে যে রস আস্বাদ করেছিলেন, মনের গোড়া ফাঁকা রেখে উপর-টপকা বাহাদুরী লুফে নেবার দায় তাঁর ভিতর ছিল না; পক্ষান্তরে মনের গোড়ায় প্রগাঢ় রসের পরমস্পর্শই তাঁর চিত্তে প্রকাশের দায়কে প্ররোচিত করেছিল। নিকটকে ছেড়ে বা তুচ্ছ করে তিনি বাইরে ছুটে যাননি; নিকটে যারা তাদের আত্মীয়তার ছন্দই তাঁর চিত্তে পরিস্পন্দন তুলে বিশ্বমানবতার প্রবলতর উচ্ছ্বাস তাঁর সৃষ্টিতে একান্ত সত্য করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা এই-ভাবে জাতীয়তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। সবিতার যে বরণীয় দেবতার মহিমা আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ কীর্তন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ভূভুবঃ এবং স্বর্লোকে তাঁর পরিব্যাপ্তি অনুভব করেছিলেন; কিন্তু ভারতের আত্মরূপে ভর্গদেবই তাঁর ধীশক্তিকে প্রণোদিত করেছিলেন মধুময় আপ্যায়নের রস সঞ্চার করে। এদেশের আকাশ বাতাসকে এমন করে আর কয়জন দেখতে পেরেছেন; এ দেশের নরনারীর অন্তরের মাধুরী আর কোন কবির ভাষায় এমন করে উন্মুক্ত হয়েছে? এ দেশের দুঃখ কষ্ট এবং দুর্দশায় তাঁর অন্তরটি অনুদিন উত্তপ্ত থাকত; আর সেই বহ্নিগর্ভ অন্তর থেকে অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বজ্রাগ্নি উদ্গীর্ণ হ'ত।

আজ বাংলা দেশের এই দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের ভিতর থাকতেন, তবে তাঁর লেখনী কি আগুন যে ছড়াত, আজ সেই কথাই বিশেষভাবে মনে হচ্ছে। 'ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা তোমরা লইবে আজ কেবা'— যে কবি জাতিকে এমন করে আহ্বান করেছিলেন, দশদিক-চক্রবালে নিরন্নের হাহাকার ধ্বনি তাঁকে উন্মত্ত করে তুলতো; আর কবির অন্তরের সে উন্মত্ত রসোচ্ছ্বাসে জাতি প্রাণবলে পরিপুষ্ট হ'ত। কাজেই একটু বিচার করলেই বুঝতে দেরী হবে না যে, বিশ্ব-সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের যে অবদান এমন অপরিসীম, দেশ এবং জাতির সীমার ভিতরেই সে অসীম স্ফূর্ত হয়ে ছিল; এদেশের নরনারীর প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিরসে সিঞ্চিত হয়েই সে প্রবাহ প্রজ্ঞার

এবং পুষ্পিত ও পল্লবিত হয়েছিল। তিনি আগে জাতীয়তার কবি, তারপরে বিশ্বকবি। দেশ এবং জাতির প্রতি প্রীতির যে রস, তাঁর চিত্তে সঞ্চার হয়েছিল, তাই উদ্বেলিত হয়ে বিশ্ব-প্রীতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার তরুণ বন্ধুদের আমি রবীন্দ্রনাথের অবদানের এই দিকটিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করছি। তাঁদের কাছে আমার এই অনুরোধ যে, ফাঁকির পথে তাঁরা যেন পা না দেন। জাতীয়তার রসে যেখানে প্রাণ পুষ্ট হয়নি, প্রতিবেশ-প্রভাবের প্রত্যক্ষতার মধ্যে মনের মূল বসে নি, সেখানে বিশ্ব-মানবতা, আন্তর্জাতিকতা, এসব কেবল কথারই কথা। সে সব বুলির মধ্যে অনেকখানি বঞ্চনা থাকে। প্রতিকূলতার প্রথম আঘাতেই সেখানে কর্মীর মনের বল এলিয়ে পড়ে; কারণ, গোড়া সেখানে কাঁচাই থেকে যায়। প্রথমটা আড়ম্বরের কোলাহলে মনের এ গোড়ার খবরটা হয়ত জানা যায় না; কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে পড়লেই সে দিককার দুর্বলতা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং তখন ধাক্কা তো সহ্য করা যায়ই না; অধিকন্তু অনেকটা নীচুতেই পড়ে যেতে হয়। এই প্রসঙ্গে বেদের ঋষিদের একটি বড় কথা আমার মনে পড়ছে। তাঁরা ইন্দ্রিয়দের ডেকে বলেছেন, যিনি তোমাকে ঘেঁসে রয়েছেন আগে তাকে দেখো, তার সঙ্গে কথা বলো; তবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র অবস্থান করে যিনি আনন্দ-রস বিস্তার করছেন, তাঁকেই সকল সমর্পণ করে সেবা করবার মত তাঁর মাধুরী দেখতে পাবে। সাহিত্য সাধনার মূলে রয়েছে এই তত্ত্ব। সন্নিকটস্থ স্থূলের মূলে ডুবে তবে এ সাধনা সৃষ্টির সার্থকতা লাভ করে থাকে। অন্যদিকে কর্মের বলও উচ্ছল হয়ে উঠে এই দিক থেকেই। মনের কোণে দুর্বলতাকে চাপা দিয়ে ফাঁকার উপরে বিশ্ব-মানবতার যে বাঁধ সে কেবল বালুর বাঁধ। অন্যভাবে আরও একটু স্পষ্ট করে এই কথাটা বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে। রকমটা হয়ত একটু আধ্যাত্মিক হবে; কিন্তু আমার যুবক বন্ধুদের পক্ষে বুঝতে কিছু গোল হবে বলে আমার মনে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে একটা জায়গায় বলেছেন, দেখো, কাঁচা জমির উপর কোন বড়ো জিনিসের ভিত গেঁথে তোলা যায় না। মনের উপর নিরন্তর চারদিক থেকে যাদের ছাপ এসে পড়ছে, তাদের প্রতি প্রীতির রসে মনকে দৃঢ় করে তোল; তবে তো বড় কাজ করতে পারবে। জাতির প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির রসে মনকে শক্ত করে, মানুষ হবার মনস্বিতা-মূলক এই যে অবদান, এই হ'ল আমাদের বর্তমান দুর্গতিতে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। রবীন্দ্রনাথ জাতিকে অনেক দিয়েছেন; বিশ্বের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তাঁর অবদানও অপরিসীম এবং সে দানের কোন একটা ফর্দ করে দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় দান হ'ল এই যে, তিনি আমাদিগকে হৃদয় দিয়েছেন। হৃদয়ের এই দানে তিনি বদান্য এবং এতেই আমাদের সকল দিককার দৈন্য ঘুচাতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, বড় গলায় এই কথাটা বললেই আমরা বিশ্বে বড় হ'তে পারবো না। বিশ্বকে এমন প্রেমের দৃষ্টিতে দেখবার শক্তি তিনি কোন্ সূত্র ধরে পেয়েছিলেন, এটি গভীরভাবে বুঝতে হবে। ভাগবতের ভক্ত কবি বলেছেন, সুন্দরকে দেখতে হ'লে বড় বেশী কিছু করতে হয় না। উৎকণ্ঠাপ্রবৃত্ত - প্রণয়বাষ্প - নিরুদ্ধাবলোকনয়ন অর্থাৎ প্রেমে গলে দুই ফোঁটা চোখের জলে চোখ ঢেকে ফেললেই সকল-সুন্দর-সন্নিবেশ সে দেবতাকে বিশ্ব জুড়ে দেখা যায়। এদেশের দীন-দুঃখী, পতিত এবং অবজ্ঞাতের তাপে রবীন্দ্রনাথের চোখ অশ্রুতে ভেসে ছিল, তাই বিশ্বদেবতার উদার অভ্যুদয়কে তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী অদ্ভুত নির্মাণ-ক্ষমা কর্ম-প্রতিভার গোড়াকার কথা আমার কাছে এইটিই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণের পুণ্যতিথিতে তাঁর অবদানের অন্তর্নিহিত এই সত্যকে আমরা যেন সমগ্র অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। চিত্তের কোনরকম লঘুতা নিয়ে আমরা যেন অগ্রসর না হই। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার গূঢ় বাণীটি যেন একান্তভাবে আমাদের অন্তর স্পর্শ করতে পারে এবং দেশ ও জাতির প্রতি মমত্ববোধ আমাদের অন্তরে প্রগাঢ় হয়। বিশ্বমানবতা না আন্তর্জাতিকতা খুবই ভাল জিনিস; কিন্তু ঠিক ঠিকভাবে সে জিনিস ধরতে হবে এবং বুঝতে হবে। জানা আর শোনা এক কথা নয়। জানা বা সংবিদের গোড়াকার কথাই হ'ল প্রত্যক্ষতা— জাতির ভাবধারার সঙ্গে আমাদের মনের প্রত্যক্ষ এবং একান্ত সংযোগ রয়েছে, তাকে আমরা যুক্তির জোরে অস্বীকার করতে পারি; কিন্তু অস্বীকার করে অধিকার পাব না, আমাদের কোন দিককার সাধনাই টেকসই হবে না। জাতির অন্তরের ভাবধারাকে আশ্রয় করে সেখানে বনিয়াদ পাকা করেই আমাদের অধিকার অর্জন করতে হবে। যে দুর্বল, যে অনধিকারী, বিশ্বমানবতার মিথ্যাচারকে ধরে সে কোন দিন মাথা তুলতে পারে না এবং তার মাথা তুলে ধরতে পারে, অন্য কারো এমন ক্ষমতাও নেই। এটি বুঝতে হবে এবং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাধনার অনুধ্যান আমাদের অন্তরে সে বোধবিকাশে সাহায্য করবে। গীতার কথা একটু ঘুরিয়ে আমার তরুণ বন্ধুদের বোঝাতে চাই যে, "মহতো মহীয়ানে"র গুণগান করাই কবির সত্যকার অবদান নয়, যিনি অণুর অণু, তাঁর অনুস্মরণ করাতেই তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা। আমার যুবক বন্ধুরা বিশ্ব-মানবতা বা আন্তর্জাতিকতার "মহতো মহীয়ানে"র আলেয়ার পিছু যেন দিশেহারা হ'য়ে না ছুটেন, অণুর অণু হয়ে পড়ে রয়েছে এদেশের যেসব গরীব কাঙালের দল, তাদের সম্বন্ধে তাঁদের চিত্তে যেন অনুস্মরণ জাগে; অর্থাৎ দিনরাত তাদের দুঃখ-কষ্টের বেদনা আত্মীয়তার ভাবে তাঁদের চিত্তকে যেন উত্তপ্ত করে। তবেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অবদানের গুরুত্ব তাঁরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং অন্তরের সেই উত্তাপে তাঁদের কর্মকে যদি প্রভাবিত করতে পারেন তবেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের সত্যকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। সেদিন হবে তাঁর প্রতি তর্পণের নিবেদন। রবীন্দ্রনাথ কবি এবং যিনি কবি তিনি মৃত্যুর অতীত। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। কালের গণ্ডীর মধ্যে ছেদ কেটে নিরিখ বাঁধা দৃষ্টির দৈন্য নিয়ে মরণের দিন গুণে গুণে আমাদের চলতে হয়; কিন্তু কবির দৃষ্টি সীমাকে অতিক্রম করে অসীমের মাধুর্য ছন্দে নিত্য সঙ্গীতিত থাকে। অসীমের সুরে তাঁর সেই গানের ছন্দেই তিনি প্রাণবান থাকেন। এমন যাঁরা তাঁরা নিজেরা অনপেক্ষ; সুতরাং স্মৃতির জন্য তাঁদের অপেক্ষা করতে হয় না; কিন্তু আমাদের পক্ষে এঁদের স্মৃতিপূজার প্রয়োজন রয়েছে। এঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের ভিতর দিয়ে আমাদের অন্তরের দৈন্য কেটে যায়; অব্যবহিত আত্মীয়তার স্পর্শ আমরা অন্তরে পাই। এতে বড় কাজ করবার সামর্থ্য আমাদের ভিতর জাগে। এজন্য রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজার প্রয়োজন আছে। সে পূজো আমাদের পক্ষে নিত্য হোক এবং সত্য হোক; রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টি দিয়ে এদেশের নরনারীকে দেখেছিলেন, তাঁর স্মৃতিপূজার ভিতরে আমরা যেন সে দৃষ্টির পুষ্টি লাভ করতে পারি। তবেই জাতি হিসাবে আমাদের দুর্দশা দূর হবে এবং বিশ্বের দরবারে আমাদের মান-মর্যাদা বাড়বে। *

---

* হাওড়া অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতিতে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা।

বন্যা

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার, এম এ

তামাকের শূন্য চোংগাটা সম্মুখে করিয়া মেনাজ মোল্লা ভোর হইতে বসিয়া আছে। বাঁশের একটা চোংগা, বহুদিন ধরিয়া তামাকের রসে পাকিয়া পাকিয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে। আশি বৎসর মেনাজের বয়স হইতে চলিল কিন্তু এত বড় বর্ষা জীবনে সে দেখে নাই। পাড়ায় এক নবীন কুণ্ডুর বাড়ি ছাড়া আর সব বাড়িতেই জল উঠিয়াছে। মেনাজের বাড়ির উঠানেও এক হাঁটু জল। বাড়িতে ঘরের বাহুল্য নাই। একখানি মাত্র ঘর, তাহারও চারিদিকের দাওয়া ধসিয়া গিয়াছে। আজ দিন সাতেক হইল অনবরত বৃষ্টি।

মেঝেয় মাদুরের উপর পড়িয়া মেনাজের মেয়ে ফুলী অঘোরে ঘুমাইতেছে। মেনাজের দৃষ্টি বাহিরের দিকে। বাড়ির সম্মুখ দিয়াই নবীন কুণ্ডুর চাকরেরা রোজ ডিঙ্গি নৌকা নিয়া বিলে ঘাস কাটিতে যায়। তামাকের সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণেই তাহাদের সংগে থাকে। কয়েক দিন হইল তাহাদের নিকট হইতেই এক আধ ছিলিম চাহিয়া লইয়া মেনাজ কাজ চালাইতেছে। বাঁকের মোড়ে হিজল গাছের নীচে নৌকাখানি দেখিয়া মেনাজ একটু চঞ্চল হইয়া ওঠে। চঞ্চল হওয়া অবশ্য বিচিত্র নয়। সকালে উঠিয়া এক ছিলিম তামাক না টানিলে জীবনটাই তাহার বিস্বাদ মনে হয়। তবে ইহা লইয়া তাহার কুণ্ঠারও অন্ত নাই। কিন্তু তামাক ত আর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।

দেখা যায় নবীন কুণ্ডুর ছোকরা চাকরেরা বৃদ্ধ মেনাজকে বেশ সমীহই করে। —চাচা কেমন আছ? চাচার খবর কি? প্রভৃতি কুশল প্রশ্ন করিয়া তাহারা রোজই মেনাজের দাওয়ার কোলে আসিয়া নৌকা বাঁধে। মাথায় টিনের টুপী লাগান মাজা কলিকাটি হুকার মাথায় চড়াইয়া মেনাজের দিকে আগাইয়া দেয়।

—আর থাকাবে, বাবা! মেনাজ অস্ফুট খেদোক্তি করিয়া সাগ্রহে হুকাটি টানিয়া নেয়। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে। 'মাথাইস' মাথায় দিয়া তাহারা নৌকার উপর বসিয়াই ভিজিতে থাকে। বড় একটা মানপাতা দিয়া ঢাকা আগুনের 'আইলাটা' একজন সাবধানে নীচে নামাইয়া রাখে। তামাকে টান দিতেই মেনাজ মোল্লার চক্ষু দুটি অর্দ্ধ নিমিলিত হইয়া আসে। কলিকার তামাকটুকু নিঃশেষ হইলে মেনাজের খেয়াল হয় যে, তাহাদের আর দেরী করান ঠিক নয়। হুকার মুখটা হাতের তালুতে মুছিতে মুছিতে মুছিতে হুকাটি মেনাজ তাহাদের হাতে ফিরাইয়া দেয়। যাইবার সময় দুই এক ছিলিম তামাকও তাহারা চোংগাটার মধ্যে রাখিয়া যায়। রোজ এমনি হয়। নবীন কুণ্ডুর ছোকরা চাকরেরা একদিনও চাচার খবর লইতে ভুল করে না। তাহাদের এই গরজ চাচাকে উপলক্ষ্য করিয়া হইলেও যে একমাত্র চাচার জন্য নয়,—মেনাজ মোল্লা তাহা না বুঝিলেও গৃহের দ্বিতীয় প্রাণীটির নিকট তাহা গোপন থাকে না। ফুলী অনেক কিছুই আজকাল বুঝিতে শিখিয়াছে। ইহাদের দৃষ্টির সামনে সে শুকাইয়া ওঠে। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। তাহার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া ওঠে। পিতাকে এসব কথা বলিতেইবা সে কেমন করিয়া? আর বলিবার মত আছেই বা কি? তাহারা তাহাকে কিছু ত কোনদিন বলে নাই। বলে নাই এমন কিছু, যাহাতে ফুলীর অসন্তোষের কারণ ঘটিতে পারে। বরং তাহার উপকারই করে। ফুলীর বৃদ্ধ পিতাকে সমীহ করে, সম্মান করে। সময় অসময় বৃদ্ধ মেনাজের ফাইফরমায়েসটাও খাটিয়া দেয়। তবু ফুলীর সন্দেহের অন্ত নাই। ইহাদের এই সহানুভূতির পিছনে গূঢ় একটা অভিসন্ধির পরিকল্পনা যেন লুকাইয়া [illegible] সন্ধান যেন সে পায়। পুরুষের [illegible] দৃষ্টির অর্থ বুঝিবার বয়স ফুলীর হইয়াছে। সেইজন্যই ফুলী এতটুকু হইয়া যায়।

গরীবের মেয়ে হইলেও ফুলীকে কোনদিন খাটিয়া খাইতে হয় নাই। মেনাজ ছিল ওপাড়ার চৌধুরীবাবুদের সর্দার। চৌধুরী বাবুদের বনিয়াদী জমিদারী। প্রবল প্রতাপ। তবে সে দিন আর নাই। নীলমাধব চৌধুরীর সংগে সংগে চৌধুরীদের সবই যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। টাকার গরম জাহির করার অপরাধে যে নবীন কুণ্ডুকে একদিন চৌধুরী বাবুরা পাইক দিয়া ধরিয়া লইয়া জুতাপেটা করিয়াছিলেন; দশ বৎসরও হয় নাই—সেই চৌধুরীবাবুদের গোটা জমিদারীটাই আজ নবীন কুণ্ডুর সিন্দুকে ঢুকিতে বসিয়াছে। নবীন কুণ্ডু আইন আদালত করে নাই। কারণ ঘটে তাহার বুদ্ধি ছিল। সে জানিত আদালতের হাকিম ডাক্তার নয় যে তাহার পিঠের ঘা আরাম করিয়া দিবেন, বরং উকীল-মোক্তার মহুরী-পেস্কারের দল পিছনে লাগিলে তাহার কাটা ঘা হইতে আবার ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিবে। তাই বৃথা সাময়িক উত্তেজনা দমন করিয়া নবীন কুণ্ডু খাতকদের গৃহে গৃহে সুদের তাগাদা দিয়া বেড়াইয়াছে। নবীন কুণ্ডুর পিঠের ঘা শুকাইলেও দাগ মিলায় নাই। কুণ্ডু জানে ইহা লইয়া লোকে চোখ টেপাটেপি করে। ওপাড়ার বদু বোষ্টম জারি গানের পদ বাঁধিয়া দেয়। ইহা লইয়া কি একটা ছড়াও যেন সে বাঁধিয়াছিল।

চৌধুরী বাবুদের সংগে সংগে মেনাজেরও অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। মেনাজ ছিল সর্দার, হইয়াছে মোল্লা;—জমিদারের কাজে অনেক কিছুই করিতে হয়। সর্দার মেনাজকে লোকে যাহাই ভাবিয়া থাকুক, মোল্লা মেনাজকে দেখিলে মনে শ্রদ্ধা জাগে,—সম্ভ্রম হয়। সৌম্য, শান্ত, বৃদ্ধ। একমুখ পাকা দাড়ি ঋজু দীর্ঘ দেহ।

শান্তিতে ও নিরুদ্বেগেই মেনাজ মোল্লার দিন কাটিয়া যাইতেছিল। তাহার একমাত্র বন্ধন ফুলী। চৌধুরী বাবুদের দেওয়া কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি ভাগে চাষ করাইয়া বৎসরের ধান হয়ে ওঠে। তাহার উপর চৌধুরী-বাড়ির বড় বৌমা দুই টাকা মাসহারা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন। নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় মেয়ের উপর সব ভার ছাড়িয়া দিয়া কোরাণ পড়িয়া মেনাজ দিন কাটায়। গত বৎসর অজন্মা গিয়াছে তাহার উপর এ বৎসর আবার বন্যা। কি করিয়া যে দিন কাটিবে মেনাজ ভাবিয়া কূল পায় না। দুনিয়াই যে অন্ধকার! এক কাঠা চিঁড়া, ধানও তাহার ঘরে ওঠে নাই। মেনাজ ভাবে, কাশীতে বড়বৌমার নিকট অবস্থা জানাইয়া পত্র লিখিলে কেমন হয়। মেনাজ জানে, কথাটা বড়বৌমার কানে কোন মতে গিয়া পৌঁছিলে না খাইয়া তাহাকে মরিতে হইবে না। তাঁহার শ্বশুরের আমলের বৃদ্ধ ভৃত্য মেনাজকে তিনি ত ঠিক চাকরের মত দেখেন না। জীবন বিপন্ন করিয়া মেনাজ একদিন নীলমাধব চৌধুরীর প্রাণরক্ষা করিয়াছে। সে কথা আর সকলে ভুলিয়া গেলেও বড় বৌমা কোনদিন ভুলিবেন না। তবু মেনাজের কেমন যেন সংকোচ বোধ হয়। পাওয়ার দাবী যেখানে বেশী হওয়ার নৈরাশ্যও হয়ত সেখানে তত বেশী করিয়াই দেখা দেয়। অনেক ভাবিয়াও মেনাজ মন ঠিক করিতে পারে না। এলোমেলো চিন্তাগুলি মনের মধ্যে জট পাকাইয়া তোলে। ফুলী গিয়াছিল চৌধুরী-বাড়ি, মুখখানা অন্ধকার

করিয়া সে ফিরিয়া আসে। কলিকাতা হইতে নোয়াবাবুর হুকুম আসিয়াছে—লাট দাখিল না হওয়া পর্যন্ত সরকারী তহবিলের এক পয়সাও খরচ হইবে না। নায়েব গোমস্তাদের মাহিনা পর্যন্ত বন্ধ। ফুলী ভাবিয়া রাখিয়াছিল, এ মাসের টাকা পাইলে সাহাজাদপুরের হাট হইতে গফুরকে দিয়া একখানা সাড়ী কিনিয়া আনিবে। রঙগীন ডুরে সাড়ী, বেশ চওড়া নক্সা পাড়, ফুলীর কতদিনের সাধ। একখানা মাত্র কাপড়, তাহাও ছোট হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর পূজার সময় বড়মা কাশী হইতে আনিয়া দিয়াছিলেন। বৎসরে তিনি একবার মাত্র দেশে আসেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন ফুলী সেই ছোট্টটিই আছে। ফুলীর কৈশোর যে শেষ হইয়া আসিয়াছে। যে বয়সে নিজের দেহের দিকে চাহিয়া মেয়েরা নিজেই লজ্জা পায় অথচ বারে বারে চাহিয়া দেখিতে লোভও হয়—ফুলীর আজ সেই বয়স। ছোট কাপড় লইয়া ফুলীর বিড়ম্বনার শেষ নাই। কাছারী বাড়িতে গোমস্তা বিপিন চক্রবর্তী যেভাবে তাহার দিকে চাহিয়াছিল, তাহার সহিত নবীন কুণ্ডুর ছোকরা চাকরদের লুব্ধ দৃষ্টির ত কোন পার্থক্যই নাই! পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টির মাঝেই যৌবনের আগমনীর সুরটি মেয়েরা চিনিতে শেখে।

কয়েকদিন হইতেই মেনাজের জ্বর। জমিদার-বাড়ির খবর শুনিয়া গুমে হইয়া সে বসিয়া থাকে। কুণ্ঠিত মুখে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ফুলী; অপরাধ যেন তাহারই। মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করে, কার হুকুম?—নোয়াবাবুর?

—হ্যাঁ, বাবা।

নিঃশব্দে মেনাজ বসিয়া থাকে। কোথায় সে ভাবিয়াছিল—বন্যার কথা জানাইয়া বড়-বৌমার কাছে আরও কিছু বেশী চাহিয়া পাঠাইবে! ব্যাপারটা মেনাজ অন্দাজ করিয়া নেয়। এসব সংবাদ কাশীতে বড়বৌমার কানে নিশ্চয়ই পেঁৗছে নাই। কলিকাতা হইতে নোয়াবাবু হুকুম দিয়াছেন। কিন্তু পুত্রের হুকুমের বিরুদ্ধে মায়ের নিকট আপীল করিবে মেনাজ কেমন করিয়া?

—ভয় কি মা? ফুলীকে সে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার নিজের কণ্ঠই বিকৃত হইয়া ওঠে। বৃদ্ধ পিতার বুকের কাছটায় ফুলী আগাইয়া আসে।

—তুমি ভেব না বাবা। ধীরে ধীরে পিতাকে সে মাদুরের উপর নিয়া শোয়াইয়া দেয়। জ্বরে গা পুড়িয়া যাইতেছে, কাঁথাখানা গায়ে চাপাইয়া দিয়া পিতাকে সে ঘুমাইতে বলে।

মেনাজের জ্বরটা ক্রমশ খারাপের দিকেই চলিয়াছে। চোখ দুটি ভয়ংকর লাল। কথা বলিতে জড়াইয়া যায়। ফুলী ভয় পাইয়া যায়। ঠিক করে—ডাক্তার দেখাইবে। সিকার উপর হইতে একটা খুঁচি নামাইয়া মাটিতে উপুর করিয়া ফেলিল। গুনিয়া দেখে সাড়ে নয় আনা। কিন্তু ডাক্তারকে অন্তত একটি টাকা ত দিতেই হইবে! কলিকাতায় পাশ দেওয়া ইউনিয়ন বোর্ডের নূতন ডাক্তার। হঠাৎ ফুলীর খেয়াল হয়—তাহার মায়ের পায়ের এক জোড়া রূপার মল আছে। বৃদ্ধ মেনাজ ন্যাকড়ায় মুড়িয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। বিবাহের সময় মেয়েকে পরিতে দিবে। মল জোড়া হাতে লইয়া ফুলী বাহির হইয়া পড়ে। কাছেই রহিম পরামাণিকের বাড়ি। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হইয় কয়েক বৎসরের মধ্যেই রহিম অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। রহিম আজকাল সুদে টাকা খাটায়।

দাওয়ায় বসিয়া রহিম পরামাণিক তামাক টানিতেছিল। মাস দুইয়েক হইল রহিমের পত্নী বিয়োগ হইয়াছে। রহিমের স্ত্রীকে ফুলী চাচী বলিয়া ডাকিত। রহিমচাচাকেও ফুলী খুব চেনে। তবে বোর্ডের মেম্বার হওয়ার পর পাড়াপরশির বাড়ি যাওয়াটা রহিম বিশেষ পছন্দ করে না।

—কে-ও ফুলী না? মস্ত দেখি ডাগর হয়ে উঠেছিস! আয় আয় হাতে কি? এদিকে যে আসিস না আজকাল? রহিম যেন একটু তরল হইয়া ওঠে। সংক্ষেপে ফুলী অবস্থাটা খুলিয়া বলে। রূপার মল জোড়া বাঁধা রাখিয়া যাহা হয় কয়েকটি টাকা দিতে রহিমচাচাকে সে সবিনয়ে অনুরোধ জানায়। কথা শেষ হইতেই ফুলী টের পায়, তাহার রূপা অপেক্ষা তাহার দেহের রূপের দিকেই রহিম পরামাণিকের নজর বেশী।

—তা বেশ, বেশ, টাকা চাস—নে। তা মল কেন? তোর সখের বয়স—মল তুই পরগে। আর দেখ্ ফুলী—রহিম পরামাণিকের কথা-গুলো প্রার্থনায় যেন কোমল হইয়া ওঠে—টাকা পয়সা থেকেই কি আর না থেকেই কি। —ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর রহিম হঠাৎ দার্শনিক হইয়া উঠিল নাকি? টাকা পয়সা থাকলেই কি আর সুখ থাকেরে?

রহিমের কথাগুলো ফুলীর কাছে দুর্বোধ ঠেকে। —আমার যা কিছু আছে সবই তোর হবে, তুই আমার ঘরে আয় ফুলী!

পাটের ব্যাপারী রহিম পরামাণিক, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার, সোনা বাঁধান দাঁত, মোটা কালো প্রৌঢ় রহিমচাচা হঠাৎ আজ বলে কি? প্রথমে ঘাবড়াইয়া গেলেও মুহূর্তের মধ্যে ফুলীর সমস্ত শরীর ইস্পাতের মত কঠিন হইয়া ওঠে। —ছিঃ চাচা। রহিমের দিকে জ্বলন্ত একটা দৃষ্টি হানিয়া দৃপ্তপদে ফুলী রহিমের দাওয়া ছাড়িয়া উঠানের জলে নামিয়া পড়ে। নিভিয়া যাওয়া তামাক-ছিলিমের মতই রহিম পরামাণিক মলিন হইয়া বসিয়া থাকে।

পথে আসিয়া ফুলী থমকিয়া দাঁড়ায়। বৃদ্ধ পিতার রোগ পাণ্ডুর অসহায় দৃষ্টির কথা মনে পড়ে। আজই তাহার টাকা চাই। রূপার মল জোড়া দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া সে নবীন কুণ্ডুর বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। বুক জল ভাঙিয়া নবীন কুণ্ডুর বাড়িতে যখন সে আসিয়া পেঁৗছে বেলা তখন আর নাই বলিলেই হয়। ডাণ্ডাভাংগা নিকেলের চশমা আঁটিয়া নবীন কুণ্ডু একখানা খতের হিসাব কষিতেছিল। সামনেই মাটিতে বসিয়া শ্রীধর মালী; খত-খানা বোধ হয় তাহারই। ফুলী যথাযথ-ভাবে আবেদন জানায়। বাঁ-হাত বাড়াইয়া কুণ্ডু মল জোড়া গ্রহণ করে। নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে থাকে। ফুলীর মনে হয় তাহার অর্ধাবৃত দেহের দিকে রহিম পরামাণিক যেভাবে চাহিয়া ছিল, মল জোড়ার দিকে নবীন কুণ্ডু ঠিক তেমনি লোলুপ দৃষ্টিতেই চাহিয়া আছে।

মুখ তুলিয়া কুণ্ডু বলে, তিন টাকা

—তাই দিন, ফুলী যেন বর্তাইয়া যায়।

—কিন্তু হাঁ, আবার ঋণ সালিশী বোর্ডে যাসনে যেন। হয়ত তিন টাকার জন্য দশ বছরের কিস্তি নিয়ে আসবি। আজকাল আর কাউকে বিশ্বাস নাই রে বাপু। মেয়েটিকে যেন নবীনের চেনা চেনা মনে হয়।

—তুই মেনাজ মোল্লার মেয়ে—না?

—আজ্ঞা।

মুহূর্তের মধ্যে নবীন কুণ্ডু যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়।........এই মেনাজই একদিন নীলমাধব চৌধুরীর হুকুমে...........।

রুক্ষ শ্লেষের সুরে নবীন রুখিয়া ওঠে। তা-তুই এখানে কেন? যা যা চৌধুরী বাড়ি যা—জমিদার বাড়ি-যা। তোদের আবার টাকার ভাবনা? তিন টাকার জন্যে রূপা বাঁধা দিতে এসেছিস!

ফুলী বিমূঢ় হইয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকে।

—দিন। মল জোড়া ফিরাইয়া লইবার জন্য সে হাত বাড়ায়। ফুলীর মুখে কেমন যেন একটা রুক্ষ দৃঢ়তা ফুটিয়া ওঠে। বিশ বছর আগেকার মেনাজ সর্দারের মুখের একটা ছাপ যেন নবীন কুণ্ডু হঠাৎ দেখিতে পায়

—না, থাক। এসেছিস যখন নিয়ে যা। মানী লোকের মেয়ে তুই। সন্ধ্যে বেলা আর তোকে বিমুখ করব না। নবীন কুণ্ডুর শেষ-কথাগুলিতে শ্লেষ ছিল কিনা ঠিক বোঝা যায় না। তিনটি টাকা সে বাহির

করিয়া দেয়। নত হইয়া টাকা ক'টি তুলিয়া লইয়া ধীরপদে ফুলী বাহির হইয়া যায়। সেই কখন হইতে ভিজা কাপড়ে ঘুরিতেছে। ভিজা বাতাসে তাহার শীত করিতে থাকে। দিন সাতেক হইল মেনাজকে সরকারী ডাক্তারের ঔষধ খাওয়ান হইতেছে। কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে। ফুলীর দুর্ভাবনার অন্ত নাই। আর মাত্র দুইটি পয়সা তাহার সম্বল। গুম হইয়া সে পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকে। কি করিবে ভাবিয়া পায় না। করিবার হয়ত নাই-ও কিছু। তিন চার দিন আগে গফুরের নানী চাট্টিখানেক মুড়ি দিয়া গিয়াছিল। সেই ফুলীর শেষ-আহার, ক্ষুধায় তাহার সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম করিতে থাকে। আঁচলে-বাঁধা পয়সা দুটি বারে বারে সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। গফুরকে দিয়া দুই পয়সার চাউল আনাইয়া দুটি ভাত ফুটাইয়া নিবে নাকি? কিন্তু এই যে তাহার শেষ-সম্বল। বার্লি কিনিবে সে কি দিয়া? বার্লি'ও ত আর ঘরে নাই! যাহা ছিল ফুটাইয়া রাখিয়াছে। মেনাজ একবার খাইলেই ফুরাইয়া যাইবে। কিন্তু ফুলী যে আর সহ্য করিতে পারে না। গফুরকে ডাকিবার জন্য দরজার দিকে সে আগাইয়া যায়। জ্বরের ঘোরে মেনাজ একটু কাৎরাইয়া ওঠে। ফুলী যেন চাবুক খাইয়া ফিরিয়া আসে। ছিঃ ছিঃ তাহার হইয়াছে কি? পেটের জ্বালাই তাহার বড় হইল! ধিক্কারে অনুশোচনায় সে মরিয়া যায়। শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধের লোলগণ্ডে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দেয়। মমতায় ফুলী গলিয়া পড়ে। তৃপ্তিও একটু পায়; দুর্বলতা জয় করিয়াছে। ফুলী বসিয়া থাকে। শরীরটা ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসে। নেতাইয়া পড়া লতার মতই আচ্ছন্নভাবে সে পড়িয়া থাকে। ঘরের মধ্যে কি একটা শব্দ হইতেই ফুলীর তন্দ্রার ঘোর ছুটিয়া যায়। উঠিয়া বসে। পেটের মধ্যে কেমন যেন ঘাঁটিয়ে ওঠে। তীব্র একটা জ্বালা। মাথার কাছে চাপা দেওয়া বার্লির বাটিটার দিকে ফুলীর নজর পড়ে। সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে। এক চুমুকে বার্লিটুকু সে নিঃশেষ করিয়া ফেলে।

ছিঃ ছিঃ ফুলী একি করিল! এতটুকু সংযম তাহার নাই। তীব্র আত্মগ্লানির কষাঘাতে ফুলী পাগল হইয়া ওঠে। কি ভাবিয়া পিছনের দাওয়ায় ছুটিয়া যায়। গলার মধ্যে ডান হাতের পাঁচটি আঙ্গুলে এক সঙ্গে ঢুকাইয়া দেয়। বমির শব্দে মেনাজের তন্দ্রা ছুটিয়া যায়।

—মা-মা কি হল রে? ক্ষীণকণ্ঠে মেনাজ বারে বারে জিজ্ঞাসা করে।

ফুলী মরিয়া যায় নিদারুণ গ্লানি আর লজ্জায়! বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে থাকে: পিতাকে মুখ দেখাইবে সে কেমন করিয়া? এই মুহূর্তে যদি তাহার মৃত্যু হইত যদি মুছিয়া ফেলিতে পারিত তাহার অস্তিত্ব—ফুলী পাগল হইয়া যাইবে নাকি? দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে বসিয়া পড়ে। বসিয়া সে কাঁপিতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসে। পিতার দিকে চোখ তুলিয়া সে চাহিতে পারে না।

—বমি করলি মা, কি হয়েছে? শীর্ণ কম্পিত হস্তে মেনাজ মেয়ের একখানা হাত বুকের উপর টানিয়া নেয়।

—ও কিছু নয় বাবা, তুমি ভেবো না। ফুলী লজ্জায় মরিয়া যায়। কি জবাব সে দিবে? পাশে বসিয়া পিতার শীর্ণ বুকটার উপর সে হাত বুলাইয়া দেয়। হাতখানা তাহার কাঁপিতে থাকে।

—কিছু খেয়েছিস মা—খাবিই-বা কি?

—হা আল্লা: বুক ভাঙ্গা একটা দীর্ঘশ্বাস মেনাজ মোল্লার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে।

বৃষ্টির উৎসব

রাখাল তালুকদার

ঘন-মেঘ-ঘেরা-টোপ আকাশ নিশ্চল
বাতাস শ্বসিছে রুদ্ধ শ্বাস;
কোন্ দূরে নদীপারে ছায়াঘেরা বনে
আজ শুধু বৃষ্টির উৎসব।
বাতাসে ভাসিছে ঘ্রাণ,
বৃষ্টিভেজা সুবাস মদির;
সবুজ ওড়নাখানি ভিজে গেছে,
দেখা যায়,—
বৃষ্টি-ধোওয়া বনানীর বুক।
বাতাসে ভাসিছে ঘ্রাণ—
ছেড়েদেওয়া চুলের সুবাস;
সিক্ত অঙ্গ লাবণ্য উচ্ছল,
বৃষ্টির উৎসব দিনে আকাশ মেদুর,
—সোঁদালী আঘ্রাণ।

—তুমি আসবে তো?
এসো না এখন।
শিহরিয়া ওঠে দেওদার বন
দেখা পেয়ে দূরে সোনালী তপন;
—এসো না এখন।
আজ যে আমার ভাবনার থেই—
কবিতার মিল—এক নিমেষেই
পেয়েচে কখন।
—তুমি আসবে তো?
এসো না এখন।

—গানের অবশ বেলা কপোত-কূজনে
নিভৃত কুলায় কাটে,
সেই যুগপানে ফিরে ফিরে চাই।
বাতাসে জেগেছে নিবিড়তা,
দীপ্তিহীন স্নিগ্ধ কালোরূপ পথিক-বধূরে।
অবশ বিবশ বেলা,
তবু কই অবসর?
বৃষ্টির উৎসবে আজ
কোন গান গাওয়া হয় নাই;
বৃষ্টির উৎসবে মনে পড়ে
সে তো আসে নাই॥

শ্রীচৈতন্য লোপ

শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এ কাহিনীটি হোলো এ্যানেস্থিটিক বা চৈতন্যনাশক দ্রব্য নিয়ে। প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় এ্যানেস্থিসিয়া অর্থাৎ সরল সহজ উপায়ে রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ইচ্ছামত কা'রো চৈতন্য বা চেতনাশক্তি নাশ ও হরণ করা। দু'টি উপায়ে এই প্রক্রিয়া সাধিত হয়। এক সাধারণভাবে সংজ্ঞা (বিশেষ ক'রে যন্ত্রণা অনুভূতি) লোপ ক'রে দিয়ে হতচেতন ক'রে দেওয়া। একে বলা হয় সাধারণ চৈতন্যলোপ বা জেনার্ল এ্যানেস্থিসিয়া। আর এক হ'ল, দেহের কোন বিশেষ স্থানে বা অংগ প্রত্যংগের কোনও সুনির্দিষ্ট জায়গায় চৈতন্যহারী কোনও দ্রব্যের প্রয়োগে সেই নির্দিষ্ট স্থানের যন্ত্রণা অনুভূতি দূর করা। এটা হ'ল স্থানীয় চৈতন্যলোপ বা লোক্যাল এ্যানেস্থিসিয়া। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে শেষোক্ত উপায়টির কার্যকারিতা ও গুণাগুণ ধরা পড়ে তিনটি সুদীর্ঘ গবেষণায়। ১৮৫৮ সালে এ্যালবার্ট নিম্যান্ (Albert Niemann) কোকো পাতা থেকে কোকেন উদ্ধার করলেন। নিজের জিভের ওপর কোকেন প্রয়োগ ক'রে দেখলেন যে কোনও জায়গাকে অসাড় ক'রে দেবার ক্ষমতা এর অসীম! কিন্তু এই কোকেনকে চৈতন্যনাশক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করার কথা তাঁর মনেই আসেনি। কাজেই বহুকাল ধরেই এই ব্যাপারে কোকেন কৌতূহলের বিষয় হ'য়েই রইলো। তারপর এই অসমাপ্ত কোকেন-কাহিনী প্রচার করলেন কার্ল কোলার (Carl Koller)। ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এ'র জন্ম। স্বনামধন্য মনঃসমীক্ষণবিদ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের সহকারী হিসেবে ভিয়েনাতে কাজ করার সময় জিভের ওপর কোকেনের অসাড় করার ক্ষমতা হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে। সংগে সংগেই কোকেন ব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনার কথাও তাঁর মনে জাগে। চোখের ওপর এর প্রয়োগের ফলাফল নিয়ে সতর্ক পরীক্ষা চালিয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, এ্যানেস্থিটিক হিসেবে এর উপকারিতা অপরিসীম এবং অস্ত্র চিকিৎসা ব্যাপারে এর সাহায্য নিয়ে কাজ করলে ব্যাপারটি চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই পক্ষে খুব সহজ ও সরল হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এই সংগেই কোলার পরীক্ষার সাহায্যে প্রচার করলেন, কোকেনের বিপরীত প্রতিক্রিয়াও যে নেই তা' নয়, অনেক ক্ষেত্রে অনিষ্টকর ফলাফলের জন্য এর ব্যবহার সংকুচিত করতে হয়েছে। তারপর সংশ্লেষণের সাহায্যে আইনহর্ন ও ব্রন্ নামক দু'জন উৎসাহী চিকিৎসাবিদ্ একটা নতুন জিনিষ বের করলেন। তার নাম নোভোকেন বা প্রোকেন্। পরে দেখা গেছে যে স্থানীয় চৈতন্যলোপের ব্যাপারে এইটিই সবচেয়ে ফলপ্রসূ অথচ নিরাপদ।

আধুনিককালের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সাহায্যে চৈতন্যলোপ পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে, যখন থেকে বিজ্ঞানীরা আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের ওপর বায়বীয় পদার্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয়েছেন। ১৭৭২ সালে যোসেফ প্রিস্টলী অক্সিজেন গ্যাসকে পৃথক করলেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী খৃষ্টীয় যাজক। আসলে কিন্তু অক্সিজেন আবিষ্কার ও তৈরী করার কৃতিত্ব হ'ল—ল্যাভয়সিয়ের ও তাঁর স্ত্রীর। নিশ্বাসের সংগে নেওয়ার পর ইথার আর নাইট্রাস অক্সাইডএর কার্যকারিতা হুবহু একরকম—এটা সাগ্রহ পরীক্ষার ফলে ভালোভাবেই জানা গেছে।

সাধারণ চৈতন্যলোপের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথা ঘামান ইংলণ্ডের পাড়াগাঁএর এক অখ্যাত চিকিৎসক, নাম হেনরী হিল্ হিক্‌ম্যান। কার্বন ডায়ক্সাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইড—এ দু'টো নিয়েই তিনি পরীক্ষা চালান কিন্তু তাঁর এই আরব্ধ কার্যে এবং ফ্রান্সে তাঁর গবেষণার অকৃতকার্যতার দরুণ এত বেশী ঘরে-পরে উপহাস ব্যংগ বিদ্রূপ তাঁর ওপর বর্ষিত হয়েছিলো যে তিনি ক্ষোভে লজ্জায় আর ছন্নছাড়া দারিদ্র্যে অল্প বয়সেই অকালমৃত্যু বরণ করলেন।

তারপর ১৮৪৬ সালের অক্টোবরের কথা। আমেরিকার অন্তর্গত ম্যাসাচুসেটস-এর জেনারল হাসপাতালে একজন রোগীর অস্ত্র চিকিৎসা হবে। তার ওপর ইথার প্রয়োগ ক'রে তার সমস্ত চৈতন্য গ্রাস ক'রে নিয়ে বেশ সহজেই কাটাকুটি করা হ'ল। এতটুকু যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র আভাসও সে দিলে না, নড়লও না, চড়লও না। ঐ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে প্রথম ইথারের কার্যকারিতা পরখ করা হয় এবং বছরখানিকের মধ্যেই সারা পৃথিবীর অস্ত্র চিকিৎসকগণ তাঁদের দৈনন্দিন রুটিন-কাজে ইথারের রীতিমত ব্যবহার শুরু ক'রে দিলেন।

১৮৪৬এর নভেম্বরে নামজাদা কবি মনীষী অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস ... বন্ধু মর্টনকে একখানি চিঠি লেখার ... প্রথম "এ্যানেস্থিসিয়া," "এ্যানেস্থিটি... "এ্যানেস্থিটিস্ট" প্রভৃতি কথাগুলি ব্যব... করেন। তিনি ছিলেন আবার হার্ভা... এ্যানাটমির অধ্যাপক। সেই থেকেই ক... গুলি চ'লে আসছে। ইংলণ্ডে সর্বপ্র... ইথারের ব্যবহার করেন জে ওয়াই সিমস... কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এর গন্ধ ... জ্বালাদায়ক উত্তেজক শক্তির দরুণ ই... ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে লিভারপু... তৎকালীন নামজাদা রসায়নবিদ্ ওয়াল্ড... পরামর্শে তিনি "ক্লোরোফরম"এর গুণা... পরীক্ষায় মন দিলেন। পরীক্ষার ... গেল, এর ফল বেশ সন্তোষজনক ... এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ১৮৪৭এর নভে... তিনি একখানা চিত্তাকর্ষক পুস্তিক... প্রচার ক'রে ফেললেন। ইথার আর ক্লো... ফরমের গুণের তারতম্য নিয়ে এর চে... বেশী সতর্ক ও যুক্তিপূর্ণ গবেষণা চা... লেন ইংলণ্ডের চিকিৎসক জন ... ১৮৫৮ সালে তাঁর গবেষণা ও সিদ্ধ... তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন কি... সেই বছরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। এ্যানে... সিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ... পাণ্ডিত্যপূর্ণ দানের জন্য জন স্নোর ... সবচেয়ে বেশী স্মরণীয়।

ইথার আর ক্লোরোফরম্এর প্র... প্রাধান্যে নাইট্রাস্ অক্সাইড এত... অবজ্ঞাত হ'য়ে প'ড়ে ছিল। এর হৃত ... পুনরুদ্ধার করলেন শিকাগোর এডমণ্ড... এণ্ড্রু। তাঁর বহুমূল্য গবেষণার সা... তিনি নির্দেশ দিলেন যে, সকল স... নাইট্রাস অক্সাইড্ অক্সিজেনের সংগে ... ক'রে প্রয়োগ করা উচিত। ঠিক এই স... ক্লোরোফরম্ প্রয়োগের ফলে কয়েকটি ক্ষে... জনকয়েক রুগীর মৃত্যু ঘটে, অথচ ... আকস্মিক মৃত্যুর কোনও কারণ কো... বিজ্ঞানীই খুঁজে পান না। ফলে এর ... বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকমণ্ডলীর ভক্তি ... গেল এবং এর গুণ সম্বন্ধে তাঁরা ক্র... সন্দিহান হ'য়ে উঠতে লাগলেন। ক... ক্লোরোফরমের প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে একেবা... বিলুপ্ত হ'য়ে গেল।

চৈতন্যলোপী দ্রব্যের তালিকায় সম্প... আরও কয়েকটি যোগ হয়েছেঃ ইথিল...

(শেষাংশ ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৺পূজার কাপড়

অধ্যাপক—শ্রীবরদা দত্ত রায় এম এ

...জো আসিতেছে। 'পূজা আসিবার সঙ্গে বাঙালী ছোট বড় সকলের ... 'পূজার কাপড়ের কথা জাগিয়া ... কারণ, 'পূজার সঙ্গে বাঙালীর ...ক প্রথার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে ...ত পরিবারের সকলের জন্য নূতন ...ড় চাই-ই। সঙ্গে সঙ্গে ঝি-চাকর ...ত-প্রতিপালিত পরিজনেরাও 'পূজার ... তাহাদের বাবুদের এবং আশ্রয়দাতাদের ... হইতে নূতন কাপড়ের আশা করিয়া ...। কিন্তু এবার যেভাবে কাপড়ের দর ...য়াছে তাহাতে ধনীদের কথা ছাড়িয়া ...লেরা কিভাবে তাঁহাদের পরিবারের ... প্রয়োজনীয় কাপড়ের চাহিদা ...ইবেন তাহা শুধু আলোচনার বিষয় ... ভাবনার বিষয়ও বটে। কারণ এ ... বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন ... যে কাপড় জোড়া ইং ১৯৩৯ সালের ...র সময় ২।০ টাকায় বিক্রী হইত, ... জাতীয় কাপড়ের বর্তমান বাজার ...৮, ৮।০ টাকা। সরকারের স্ট্যান্ডার্ড ... বাজারে বাহির হইয়াছে সত্য, ... তাহা এখনও সর্বজনীন হইয়া ... নাই। কলিকাতা শহরেই দেখা ...তেছে যে, সকল পরিবারকেই তিন মাসে ...টি করিয়া কাপড় নির্দিষ্ট করে ...ন হইতেছে। অবশ্য পরিবারের লোক ... পাঁচজনও হইতে পারে আবার দশ ... হইতে পারে। কিন্তু সরকারী ...ে প্রতি তিন মাসে দুইখানির বেশী ...পড় দিবার নিয়ম নাই। কাজেই ...ন্ডার্ড ক্লথের অন্য নাম 'গরীব কাপড়' ...লেও তাহাতে গরীব জনসাধারণের ... অভাব মিটিবে না। পাঁচজন লইয়া ... পরিবার গঠিত, সেই পরিবারের ...পুরুষে দুইখানি কাপড় মিলিতে পারে ...তু অন্য তিনজনের জন্য বাজারের সেই ...মী কাপড়ই কিনিতে হইবে। সেখানে ...পড়ের যে দর দিতে হইবে তাহা কোন ...ক্ষেত্রেই স্ট্যান্ডার্ড ক্লথের দ্বিগুণের ...ম নহে।

কিন্তু কাপড়ের এই অগ্নি মূল্যের মূল ...রণ কোথায়? গত জুলাই মাসে ...বোম্বাই শহরে ভারতীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ...ক সম্মেলনে সভাপতি শেঠ গোকুলদাস ...মোরারজী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ...র্তমান বস্ত্র সংকটের মূল কারণ এক নহে, ...বং একাধিক। প্রথমত এ কথা মনে ...রাখিতে হইবে যে, বর্তমান যুদ্ধের পূর্বেও ভারত বস্ত্র-জোগানে আত্ম-নির্ভরশীল ছিল না। প্রায় প্রতি বৎসরই ভারতকে ১৪।১৫ কোটি টাকার সূতা ও সূতী কাপড় বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত। যুদ্ধের আওতায় পড়িয়া সম্প্রতি সেই আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয়ত, ভারত সরকারের সামরিক বিভাগ বিপুল পরিমাণে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতেছে, তৃতীয়ত, মুদ্রা প্রসারণের অজুহাতে কাপড়ের দামও চড়িতে বাধ্য হইয়াছে, চতুর্থত, যানবাহনের বিশৃঙ্খলা, পঞ্চমত, মুদ্রা প্রসারণের দরুণ বস্ত্র উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি এবং ষষ্ঠত এই যুদ্ধসময়েও ভারতের বাহিরে কাপড় রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে বস্ত্র সংকট দেখা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলাও বোধ হয় প্রয়োজন যে কাপড়ের কলগুলির শতকরা ৩৫ ভাগ তাঁত শুধু সামরিক সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য নিযুক্ত আছে। পূর্বে দেশের লোকের প্রয়োজনে যে পরিমাণ মিল-বস্ত্র সরবরাহ করা হইত, সেই তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র সরবরাহ করা হইতেছে। সুতরাং এ হেন অবস্থায় যদি বস্ত্র সংকট উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে আর কবে হইবে?

সরকারের মতে বস্ত্র-সংকটের মূল কারণ এইখানে নহে। সরকারী মাল সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হাইদরী বোম্বাইএ এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ভারতের এই রপ্তানী বাণিজ্য ভারতকে মধ্যপ্রাচী ও সুদূর প্রাচ্যের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে স্থায়ী রপ্তানী বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখাইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকারও বস্ত্র-মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া কাপড়ের দর কমাইবার সংকল্প করিয়াছেন। সেইজন্য সরকার হইতে কাপড়ের কলসমূহে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কয়লা, তুলা ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করিবেন, কাপড়ের খুচরা দর বাঁধিয়া দিবেন এবং উৎপন্ন কাপড় তিন মাসের অধিক সময় কল কেহই গুদামে মজুত রাখিতে পারিবেন না। সংকল্প সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে কাপড়ের যোগান কম, সেখানে ক্রমবর্ধিত বস্ত্রাভাব মিটিবে কিসে? তার উপর ইদানীং আবার বোঝার উপর শাকের আঁটীর মত বাঙলার কলসমূহে কয়লার অভাব দেখা দিয়াছে। বঙ্গীয় কাপড়ের কলসমূহের পক্ষ হইতে মিঃ এম এন শাহ এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, কয়লার অভাবে কলসমূহের কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। অথচ বাঙলার দুয়ারেই কয়লার খনি, তার উপর আবার সরকারের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে যে, সরকার পক্ষ হইতে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাপড়ের কলসমূহকে কয়লা সরবরাহ করা হইবে। তবু যদি কয়লার অভাবে কাপড়ের কলগুলি বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে বস্ত্র-সংকট মোচন হইবার আর কোন আশা আছে কি?

এদিকে সরকারের পক্ষ হইতে মজুত ধুতি কাপড় বিক্রয় করিবার জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, মিল মালিকগণের পক্ষ হইতে সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিলেও সরকার সে আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ফলে, আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত মজুত মাল বিক্রয় করিতে হইবে। ইহাতে কাপড়ের দাম অল্প সময়ের জন্য সামান্যভাবে কমিতে পারে সত্য, কিন্তু তারপর? হিন্দীতে একটি প্রবচন আছে, "তিন্ দিনকো রোশনী ফির আঁধেরী রাত"। তিনদিন চাঁদনী রাতের পর আবার সেই তিমিরে সেই তিমিরে। কয়লার অভাবে হয়ত নূতন কাপড় আর সেভাবে উৎপন্ন হইবে না, কিংবা উৎপন্ন হইলেও হয়ত সেই কাপড়ের দর বর্ধিত কয়লার দরের দরুণ সস্তা না হইয়া বরং আরও চড়াই হইবে। সুতরাং—? অন্যদিকে কলিকাতা বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরাজী থাকার্সে সমিতির তৃতীয় বার্ষিক এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সরকারী আদেশের ফলে মজুত মাল বিক্রয় হইয়া যাইতে পারে সত্য, মূল্য নিয়ন্ত্রণের দরুণ আপাতত কাপড়ের দাম কিছু কমিতে পারে সত্য, কিন্তু বিদেশে বস্ত্র রপ্তানি বন্ধ না হইলে দেশে বস্ত্রের অভাব হওয়া অনিবার্য। কথাটা শুনিতে যেমন ভাল লাগে না, তেমনি চিন্তা করিতে গেলেও যেন কোথায় গিয়া চিন্তার সূত্র হারাইয়া যায়। দেশে একে খাদ্যাভাব, তদুপরি কয়লার অভাবে চট্ শিল্প, কাচ্ শিল্প, বস্ত্র শিল্প ইত্যাদি এমন কি শহরের বহু গৃহস্থালী পর্যন্ত ম্রিয়মান। আবার যদি সেখানে বস্ত্রাভাব ঘটে, তাহা হইলে এবার-কার 'পূজার বাজার যে খুব জমকালো হইয়া উঠিবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই দুর্দিনে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জন-সাধারণের কথা ভাবিয়া পণ্ডিত মালব্যজী বস্ত্র সমস্যা সমাধানকল্পে চরকা প্রচলন

করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। চরকা ও দেশী তাঁতে কয়লা ও সুতার অভাবের কোন ভয় নাই। কোন রকমে সুতা কাটিয়া আনিয়া তাঁতে দিতে পারিলেই কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। মিহি ও মিলের কাপড় ব্যবহার করিয়া আমরা এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে চরকার মোটা সুতার কাপড় অনেকেরই মনে ধরিবে না জানি, কিন্তু যেখানে অন্য উপায় নাই সেখানে খাঁটী দেশী ও খাঁটী ভারতীয় কুটির শিল্পের অবদান গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? ইতিমধ্যে অনেকেই খদ্দরের জামা ও ছেলেদের প্যান্ট করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাবুরা ধুতি না পরেন পায়জামা ও লুঙ্গী করিয়াও ব্যবহার করিতে পারেন। লুঙ্গী ভারতের—শুধু ভারতের কেন আব্রহ্ম ভারতের নিজস্ব পরিচ্ছদ। মাদ্রাজের "আয়ার" ব্রাহ্মণ হইতে তিব্বতের ফুঙ্গীরা পর্যন্ত লুঙ্গী পরিয়া থাকেন। সুতরাং এভাবে পরিধেয় ব্যবহার করিয়া কাপড় বাঁচাইলে মোটা কাপড়েও চলিবে এবং দশ হাতের স্থলে পাঁচ হাত কাপড়েই লজ্জা ও অসভ্যতা নিবারণ হইবে। বাঙলার শাড়িতে হাত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। বাঙলার শাড়ি আজ শুধু বাঙলায় নয়—ইহা আজ আসমুদ্র ভারতের মহিলাদের সুদৃশ্য ও সুরম্য অঙ্গাভরণ। বাঙলার এই বৈশিষ্ট্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলেও বাঙালী পুরুষকে নিজেদের জন্য মোটা খদ্দর ব্যবহার করা উচিত। অন্য যুক্তি না হয় এখানে নাই-বা তুলিলাম।

মহাপ্রভুর যুগধর্ম

স্যার যদুনাথ সরকার

যে বৈষ্ণবধর্ম মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রথম বঙ্গদেশে প্রচার করেন [illegible] নিকট বাঙালীর সর্বপ্রধান দান। এই ভক্তির ধারা বাঙলা হইতে উড়িষ্যা ও বৃন্দাবন প্লাবিত করিয়াছে এবং আসামে গিয়া শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্মের সহিত যোগ দিয়া সেই সমস্ত দেশটা, মণিপুর পর্যন্ত বৈষ্ণব করিয়া ফেলিয়াছে। বিষ্ণুর উপাসনা আগেও ভারতে ছিল এবং ভক্তিমার্গ চৈতন্যের আগেও লোকে জানিত, একথা সত্য। কিন্তু আমাদের মহাপ্রভু সেই পুরাতন ভাগবত ধর্মকে একটি নূতন ছাঁচে ঢালিয়া এ যুগের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। তিনি ধর্মের তত্ত্বকে মন্দির হইতে, গিরিগহ্বর হইতে, ব্রাহ্মণের পরম শুচি যজ্ঞক্ষেত্র হইতে, পণ্ডিতের টোল হইতে বাহির করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে আনিয়া পথে ঘাটে আনিয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত, ধনী হইতে বস্ত্রহীন ভিখারী পর্যন্ত, পণ্ডিত হইতে নিরক্ষর মজুর পর্যন্ত, সকলেই হাতের কাছে মাতৃভাষায় ঈশ্বরের নাম ঈশ্বরের মহিমা শুনিতে পাইল এবং ভক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়া নিজেই ভাবে বিভোর হইতে লাগিল। কোটি কোটি হিন্দুর চিত্ত এই বৈষ্ণব ধর্মে পরাশান্তি পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে। ইহাই হইল চৈতন্যের প্রথম কীর্তি! ভগীরথের মত তিনি এই পবিত্র জীবনদায়িনী ভক্তিধারাকে বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্যে নামাইলেন, ভারতভূমির ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিলেন, লক্ষ লক্ষ নরনারী তাহার অমৃতরস পান করিতে সক্ষম হইল। কলিতে মুক্তির উপায় যে কীর্তন, তাহাই তিনি দেখাইয়া দিলেন। যদি তাঁহাকে অবতার বলি, তবে নামধর্ম প্রচার করা অর্থাৎ কীর্তন প্রচলিত করা হইল তাঁহার অবতারের ফল।

হরি বোল, হরি বোল হরি বোল ভাই।
হরি নাম বিনে জীবের আর গতি নাই॥

এই যে মন্ত্রটি ইহা বুঝিতে কোন পাণ্ডিত্য কোন শাস্ত্রজ্ঞান দরকার নাই; এই মন্ত্রটি কার্যে পরিণত করিতে কোন অর্থবল, কোন যাগযজ্ঞ কোন কঠোর তপস্যা আবশ্যক নয়। সমস্ত জীবের মুক্তির জন্য ইহা হইতে সহজ উপায়, ইহা হইতে অধিকতর সার্বজনীন পন্থা কল্পনা করা যায় না। ভক্তের কীর্তন ভগবানকে বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিতে পারে, সেই জন্যই তিনি নারদকে বলিয়াছেন—

নাহম্ তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে
যোগীনাম্ হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি
তত্র তিষ্ঠামি, নারদ॥

কিন্তু শুধু মুখে নাম আওড়াইলেই কি বৈষ্ণবের সাধনা সম্পূর্ণ হইল? না, তাহা নহে। বৈষ্ণবকেও আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে, নচেৎ সে বৈষ্ণব নামের অধিকারী হইবে না, মুক্তি পাইবে না। বৈষ্ণবের লক্ষণ "নামে রুচি জীবে দয়া"—অর্থাৎ আন্তরিক ও সহজ ঈশ্বর প্রেম, এবং নররূপী নারায়ণের সদা সেবা—শুধু চারিটি অক্ষর আওড়ান নহে। প্রকৃত বৈষ্ণব তৃণ অপেক্ষাও নীচ, তরুর অপেক্ষাও অধিক সহিষ্ণু হইবেন এবং নিজে মানের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া পরকে মান দিবেন! যাঁহারাই চৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে, মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তদের সম্মুখে বৈষ্ণবের কি উচ্চ আদর্শ ধরিয়াছিলেন এবং তাহাদের নৈতিক চরিত্রের প্রতি কি কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন। এই বিষয়ে তিনি ছিলেন একাধারে কুসুমের মত কোমল অথচ বজ্রাদপি কঠোর। তাই আজও আমরা দেখিতে পাই যে, যেখানে বৈষ্ণব প্রাধান্য সেখানেই দয়া দাক্ষিণ্য ও কোমলতা লোকের চরিত্রে দীপ্যমান।

আর এককথা; মহাপ্রভু যে ধর্ম প্রচার করিলেন তাহাতে জাতি বা কুল বা পদের কোন পার্থক্য রহিল না কীর্তনের ধুলায় সব ভক্ত এক হইয়া গেল। বৈষ্ণব শাস্ত্রের এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সমান কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে। যেসব বর্ণকে প্রাচীন পন্থীরা ঘৃণা করিতেন তাহাদের মধ্যেও কত কত বড় ভক্ত লেখক ও কবি জন্মিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের পর্যন্ত প্রণামের যোগ্য হইয়াছেন। মহাপ্রভুর পায়ের ধুলায় জাতিভেদের বালাই ঘুচিয়া গিয়াছিল। আমরা যেন মনে রাখি যে এটা পাদ্রীদের, ব্রাহ্মদের অথবা ইংরেজী শিক্ষিতদের নিকট হইতে আমরা শিখি নাই, এটা মহাপ্রভুর সাড়ে চারি শত বৎসর আগেকার শিক্ষাদান।

বৈষ্ণবদের রচনা লইয়াই ত বাঙলা পদ্য সাহিত্যের, কাব্যের, সংগীতের অভ্যুত্থান এবং রবীন্দ্র যুগ পর্যন্ত সেই বৈষ্ণব প্রেমকাহিনীই আমাদের কবি ও গায়কগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সেইজন্য উচ্চ শিক্ষিত বিলাত-ফেরৎ ধনীর সন্তান ব্রহ্মজ্ঞানী কেশবচন্দ্র সেন, কলিকাতার মত সভ্য নগরীতে রাস্তায় রাস্তায় খালি পায়ে খোল করতাল বাজাইয়া হরি নামের, প্রেম ধর্মের সংকীর্তন করিতেন। এটা আশ্চর্যের নয়, অস্বভাবিকও নয়।

প্রাচীন বৈষ্ণব গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থগুলি উদ্ধার করিয়া, তাহা বিশুদ্ধ পাঠ ও ভাষা-অনুবাদ সহিত মুদ্রিত করিয়া, সিঁথি বৈষ্ণব সমাজ যে মহৎ কার্য করিতেছেন তাহা বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব বঙ্গভাষাভাষি মাত্রেরই প্রশংসার যোগ্য। তাঁহাদের শ্রম সার্থক হউক। *

---

* সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণ।

সাহিত্য-সংবাদ

"ঝঙ্কারের" পক্ষ হইতে সর্বসাধারণের নিকট হইতে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও ছবি এই চারিটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকারীকে একটি করিয়া রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়—'নিরক্ষরতা মানব জীবনে চরম অভিশাপ।' বাকী তিনটির জন্য কোনও নির্বাচিত বিষয় নাই। প্রবন্ধ ও গল্প যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছবির সাইজ—৬"×৫" ইঞ্চি। পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে ভাদ্র, ১৩৫০।

প্রবন্ধ ইত্যাদি—সম্পাদক, "ঝঙ্কার" C/o Gupta Pharmacy Giridih, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন, "ঝঙ্কারের" বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া ধরা হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠান

নিখিল বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে বিগত শনিবার, ৩১শে জুলাই ও রবিবার, ১লা আগষ্ট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রমেশ ভবনে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম এ প্রাতে উদ্বোধন করেন। দেশ সম্পাদক শ্রীকিরণচন্দ্র সেন সভাপতিরূপে তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি স্যার শ্রীযদুনাথ সরকার তাঁহার মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

কবি শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের পটভূমি সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ও অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু প্রমুখ ভক্ত সুধীবৃন্দ বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশালতা ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, পরমভাগবত শ্রীহরিহর শেঠ, ; কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিবস

দ্বিতীয় দিবস শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী কর্তৃক স্বাগতম পাঠের পর দর্শন শাখার অধিবেশন হয়। ডাঃ শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম এ পি এইচ ডি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম এ অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয়।

পাইকপাড়ার রাজকুমার বিমলচন্দ্র সিংহ এম এ সাহিত্য শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবি কালিদাস রায় বি এ কবিশেখর, পণ্ডিত শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম এ ভাষাতত্ত্বরত্ন, শ্রীমৎ হরিদাস দাস, শ্রীঅকিঞ্চন দাস ও শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী প্রমুখ সুধীবৃন্দের লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়।

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবি শ্রীঅপূর্ব ভট্টাচার্য কবিকঙ্কন, কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কবি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম এ, কবি কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত, গোপেশ্বর সাহা ও সুরেশ সরকার প্রমুখ কবিবৃন্দ কর্তৃক উচ্চাঙ্গের কবিতা পঠিত হয়। কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মূল সভাপতি, বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি, সমাগত ভক্তসুধীবৃন্দ ও সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষকে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ডাঃ সরসীলাল সরকার, অধ্যাপক বিমলেন্দু কয়াল, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর গাঙ্গুলী, ডাঃ অজিতশঙ্কর দে, পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, কবি হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত মণিময় প্রামাণিক, পণ্ডিত শ্রীনিতাই চৈতন্য দাস, সুসঙ্গের রাজপরিবারের শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র সিংহ শর্মা, পণ্ডিত কুঞ্জকিশোর ভাগবতভূষণ প্রমুখ ভক্তসুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মিলনীর সভ্য নীরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী আলোকচিত্র গ্রহণ করেন।

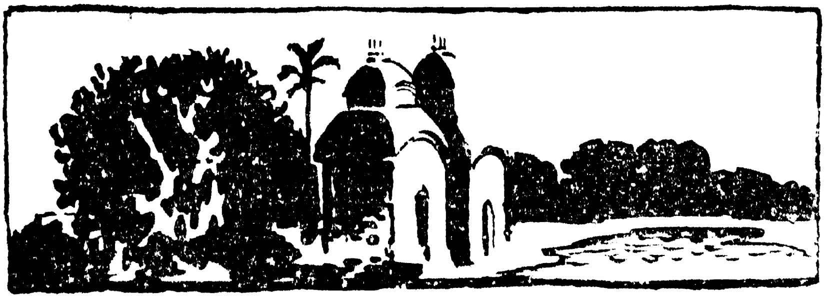
চৈতন্য লোপ

(৯৮ পৃষ্ঠার পর)

ভিনেছেন, এভার্টিন্ আর সাইক্লোপ্রোপেন্। এখন অবশ্য স্থান কাল পাত্র ও অবস্থা বিশেষে বিশেষ বিশেষ এনেস্থেটিক ও তার বিশেষ বিশেষ প্রয়োগপদ্ধতির উত্তরোত্তর প্রচলন চলেছে।

বিগত দশ বছর ধরে এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ, উৎসাহ ও কর্ম প্রেরণার যেন সীমা নেই। নিত্য নতুন গবেষণার পর গবেষণা, প্রয়োগের পর প্রয়োগ চলেছে অবিশ্রান্তভাবে। পাশ্চাত্য প্রদেশের বেশীর ভাগ মেডিকেল স্কুলেই এই বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে তরুণ চিকিৎসকগণকে এই ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তত্ত্বোপদেষ্টাগণ যে এনেস্থেটিকের ব্যবহারকে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বিধান লঙ্ঘন বলে অভিহিত করতেন তারা বিংশ শতাব্দীর মানুষ শুধু তার ব্যবহারকে অপরিহার্য বলে মেনেই নেয়নি, তার চরম ও পরম কার্যকারিতার রহস্যকে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টায় নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছে ও করছে।



রঙ্গজগৎ

রাণী

বড়ুয়া প্রোডাকসন্সের হিন্দী চিত্র : প্রযোজক ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া; সংগীত পরিচালক—কমল দাশগুপ্ত ; প্রধান ভূমিকায়—বড়ুয়া, যমুনা দেবী, জহর গাঙ্গোপাধ্যায়, পেসেন্স কুপার, কলাবতী প্রভৃতি।

ভারতীয় চিত্রজগতে 'রাণী' প্রমথেশ বড়ুয়ার আধুনিকতম অবদান। সম্প্রতি এই বহু-প্রতীক্ষিত চিত্রখানি কলিকাতার সেন্ট্রাল ও ছায়া চিত্রগৃহে এক সঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে।

ইতিপূর্বে আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, উত্তর ভারতে নাকি 'রাণী' দেখার জন্য অভূতপূর্ব জনসমাবেশ হয়েছিল এবং বড়ুয়ার পূর্ববর্তী চিত্র 'জবাবের' মতই নাকি 'রাণী' প্রচুর আর্থিক সাফল্য [illegible] করেছে। একথা যদি সত্য হয়, তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের ভারতীয় [illegible] চিত্র দর্শকেরা মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে। আমরা কিন্তু 'রাণী' দেখে একটুও সন্তুষ্ট হতে পারি নি—বরং দুঃখিত হয়েছি এই ভেবে যে, ভারতীয় চিত্রজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক [illegible] প্রমথেশ বড়ুয়া আলোচ্য চিত্রখানির প্রযোজক ও পরিচালক।

'রাণী' দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'মুক্তি' প্রভৃতি চিত্রের পরিচালকের রুচিগত অধঃপতনের কথা। যে শিল্পী পূর্বোক্ত চিত্রগুলোর নির্মাতা, তিনিই আবার কি করে 'রাণী'র মত তৃতীয় শ্রেণীর একখানি চিত্র নির্মাণ করতে পারেন—সেটা ভাবলে অবাক হ'তে হয় বৈকি! 'রাণী' চিত্রখানি স্পষ্টতই সাধারণ দর্শকদের মানসিক ভাবপ্রবণতাকে খুঁচিয়ে অর্থার্জনের উদ্দেশ্যে নির্মিত। এর মধ্যে ছায়াচিত্র শিল্পী প্রমথেশ বড়ুয়ার হাতের বিশেষ কোন ছাপ নেই। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই প্রমথেশ বড়ুয়াই কিছুদিন পূর্বে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নির্মিত আর্টের ('Art for Sale) নিন্দা করে একটি বিবৃতি দিয়ে চলচ্চিত্র রসিক মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন। এখন মনে হয় যে, 'রাণী'র প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি পূর্বাহ্ন থেকেই সচেতন ছিলেন বলে আত্মরক্ষার জন্যই পূর্বোক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন। বর্তমান ধনতান্ত্রিক যুগে শিল্প মাত্রেরই একটা ব্যবসায়ের দিক আছে—আর সে দিকটা উপেক্ষণীয়ও নয়, কিন্তু তাই বলে ব্যবসায়ই আবার সব কিছু নয়। ভারতীয় চিত্র-শিল্পের ব্যবসায়িক দিকটার প্রতি যেমন দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি এই শিল্পের অগ্রগতির দিকেও নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।



নীলাম্বরীয় চিত্রে যমুনা ; ছবিটি রূপবাণীতে চলিতেছে

আমাদের ধারণা আছে যে, প্রমথেশ বড়ুয়ার মধ্যে ইতিপূর্বে আমরা যে শিল্প জ্ঞানের বিকাশ দেখেছি, তাতে ইচ্ছা করলে তিনি ভারতীয় চিত্র-শিল্পকে অনেকটা অগ্রগতির [illegible] এগিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে দেবার পর থেকে কাহিনী নির্বাচনে তাঁর ক্রমিক অবনতি দেখে আমরা উত্তরোত্তর শঙ্কিত হয়ে উঠছি। আমাদের আশা বুঝি শেষ পর্যন্ত অপূর্ণই থেকে যাবে।

'রাণী'র গল্পাংশ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর—দুর্বল। বিবাহের [illegible] ভাঙানি [illegible] র ফলে একটি সুন্দরী গ্রামের মেয়ের বিয়ে ভেঙে যায়; লজ্জা নিবারণের জন্য সে পালিয়ে চলে আসে কলকাতায় এবং সেখানে এসে নাম পাল্টে সে একটি হোটেলের দাসীর কাজ করে জীবিকা-নির্বাহ করতে থাকে। এই হোটেলেই এসে ওঠে তাদের গ্রামের জমিদার-পুত্র, [illegible] দুজনের কাছে অচেনা। ক্রমে উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় [illegible] সম্পর্ক গড়ে ওঠে [illegible] পর্যন্ত তার পরিণতি হয় প্রেমে। এই হ'ল মূল কাহিনী। মূল কাহিনীতে [illegible] শরৎ-চন্দ্রের চরিত্রহীনের সাবিত্রীর ছাপ সুস্পষ্ট। [illegible] নায়িকাকে [illegible] সৌ [illegible] স্পষ্ট। [illegible] দর্শকদের এ জিনিসগুলো অত্যন্ত পীড়িত করে। তারপর গল্পের সাধারণ [illegible] অনাবশ্যক ভাবপ্রবণতার অংশ নিয়ে [illegible] হয়েছে [illegible] ফলে [illegible] অভাব দেখা যায় — [illegible] এই [illegible] অভাব পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। [illegible] এমন সব চরিত্রের আমদানী করা হয়েছে—গল্পের দিক থেকে [illegible] অস্তিত্ব অর্থহীন। [illegible] হোটেলের দাসী [illegible] জমিদার পুত্রের [illegible] পরিচয় পাওয়া যায়,—এই [illegible] কোন বৃহত্তর সামাজিক সার্থকতা নেই।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলেই প্রথমে নাম করতে হয় যমুনা দেবীর। যে সারল্য এবং স্বাভাবিক কারুণ্যের সঙ্গে তিনি হোটেলের দাসীর ভূমিকাটি অভিনয় করেছেন, সেটি সহজে ভোলা যায় না। নায়কের ভূমিকায় বড়ুয়া নিজে যমুনা দেবীর কাছে ম্লান হয়ে গেছেন। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে একটি ছোট অংশে নির্বাক যুগের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিস পেসেন্স কুপার মন্দ অভিনয় করেননি। নায়কের দাদার ছোট ভূমিকাটিতে জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের মত একজন শক্তিশালী অভিনেতার [illegible] নির্বাচনের আমরা কোন [illegible] খুঁজে পেলাম না। বর্তমান চিত্রে তাঁর অভিনয়-শক্তি অপচয়িত হয়েছে বলা চলে—কেননা অভিনয় করার কোন সুযোগই তিনি পাননি বলা যায়। অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকাগুলো চলনসই।

যান্ত্রিক উৎকর্ষের দিক থেকে 'রাণী' উল্লেখ-যোগ্য। আলোক চিত্রণ ও শব্দ গ্রহণ উচ্চাঙ্গের হয়েছে বলা চলে। সংগীত বর্তমান চিত্র-খানির সর্বপ্রধান আকর্ষণ। সংগীত পরিচালক কমল দাশগুপ্তের সুরে [illegible] নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য না থাকলেও ছবিখানির কণ্ঠসংগীত-গুলো উপভোগ্য।

খেলাধুলা

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা এখনও শেষ হয় নাই। গত সপ্তাহে শেষ হইবার কথা ছিল, কেবল মোহনবাগান ও পুলিশ দলের সেমি-ফাইনাল খেলা দুইদিন অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় তাহা সম্ভব হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে এই খেলাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হইবে। কোন দল বিজয়ী হইবে বলা কঠিন। তবে দুইদিনের খেলা দেখিয়া যতদূর মনে হয় মোহনবাগান দলই ফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা লাভ করিবে। অপর সেমি-ফাইনাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল বিজয়ী হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী বি এণ্ড এ রেল দল শোচনীয়ভাবে ৭—১ গোলে পরাজিত হইয়াছে। আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সেমি-ফাইনাল খেলায় কোন দলকে এত অধিক গোল করিতে দেখা যায় নাই। ইস্টবেঙ্গল দলের এই কৃতিত্ব প্রকৃতই প্রশংসনীয়। এই দিনের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। আক্রমণভাগের খেলা চমকপ্রদ হয়। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়গণও সুন্দরতার সহিত খেলিয়া আক্রমণভাগের খেলোয়াড়গণকে সাহায্য করিয়াছেন। ফাইনাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়গণ যদি এইরূপ খেলার পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন মোহনবাগান বা পুলিশ যে দলই ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খেলিবার যোগ্যতালাভ করিবেন, এই খেলায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন না; পরাজিত হইবারই সম্ভাবনা অধিক থাকিবে।

শীল্ড ফাইনালের খেলার মাঠ

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে। কোন মাঠে এই খেলা হইবে জানা যায় নাই। তবে শোনা যাইতেছে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা পরিচালক কমিটির সভাগণ ক্যালকাটা মাঠে এই খেলার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হউক। নতুবা বর্তমানে যে সকল মাঠে শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে ফাইন্যাল খেলা হইলে অনেক দর্শককেই খেলা দেখিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। কারণ অন্যান্য মাঠ অপেক্ষা ক্যালকাটা মাঠেই অধিক সংখ্যক দর্শক বসিবার স্থানের ব্যবস্থা আছে। ক্যালকাটা মাঠের পরিচালকগণ এই ব্যবস্থার একমাত্র অন্তরায় হিসাবে উল্লেখ করিতে পারেন যে, বর্তমানে তাঁহাদের মাঠে ফুটবল গোলপোষ্ট তুলিয়া রাগবি খেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিবর্তন করিলে রাগবি প্রতিযোগিতার খেলার ক্ষতি হইবে। রাগবি খেলা সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে এবং এই সময় দুই একদিন খেলা বন্ধ থাকিলে বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করা হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া ফাইনাল খেলাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াও ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের পরিচালকগণের উচিত মাঠটি ফাইনাল খেলার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া। আই এফ এর অন্তর্ভুক্ত ক্লাব হিসাবেও তাঁহারা এই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন না। আই এফ এর নিয়মাবলীর পুস্তকের ৮৩নং পৃষ্ঠার ৯নং আইনে স্পষ্ট লেখা আছে "আই এফ এর পরিচালিত প্রতিযোগিতায় যে সকল দল যোগদান করিবে, তাহাদের খেলার মাঠ খেলিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যহ আই এফ এর পরিচালক মণ্ডলীর হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে।" এই আইন বহুকাল হইতেই বর্তমান রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা মাঠ দিতে কিরূপে অস্বীকার এতদিন করিয়াছেন ইহা আমরাই বুঝিতে পারি না।

আই. এফ. এর পরিচালকগণও উক্ত আইন কার্যকরী করিবার জন্যও দৃঢ়তা অবলম্বন করেন নাই, ইহাও আশ্চর্যের বিষয়। যাহা হউক এই বৎসরের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল ক্যালকাটা মাঠে অনুষ্ঠিত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

ক্রিকেট খেলোয়াড় হেডলী ভেরিটী

মহাসমর আরম্ভ হইবার পর হইতে প্রতি সপ্তাহেই ক্রীড়া জগতের কোন না কোন বিশিষ্ট খেলোয়াড় সম্বন্ধে দুঃসংবাদ আমাদের শুনিতে হইতেছে। এই সকল সংবাদ কতদিন যে শুনিতে হইবে জানি না তবে সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হেডলী ভেরিটী সম্বন্ধে যে সংবাদ শুনিতে পাওয়া গেল তাহা প্রকৃতই দুঃখের। তিনি নাকি সিসিলির যুদ্ধে আহত অথবা বন্দী হইয়াছেন। সুস্থ হইয়া নির্বিঘ্নে দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে ক্রীড়ামোদী সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

বেঙ্গল ওয়াটারপোলো লীগ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ওয়াটারপোলো লীগের সকল খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় হাটখোলা "এ" দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি দীর্ঘদিন ধরিয়াই এই খেলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য-লাভ করিয়া যে গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এই বৎসর তাহা রক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। লীগ প্রতিযোগিতায় বৌবাজার দলের রাণার্স হইবার আশা আছে। লীগ প্রতিযোগিতা শেষ হইলেই আরও কয়েকটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা অবলোকন করিয়া খেলা পরিচালকগণকে অনেক সময়েই মারাত্মক ত্রুটি করিতে দেখা গিয়াছে। অন্যান্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সময় ইহার পুনরাবৃত্তি না হইলে ভাল হয়।

মহমেডান স্পোর্টিং হকি দল

কলিকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল খেলায় খ্যাতি আছে কিন্তু হকি খেলায় সেইরূপ নাই। অথচ সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে, এই দলের পরিচালকগণ একটি হকি দল কাবুলের বিভিন্ন অঞ্চলে খেলিবার জন্য প্রেরণ করিতেছেন। এই ব্যবস্থা হওয়া যে খুব অন্যায় হইয়াছে ইহা আমরা বলিতে চাহি না; তবে ভারতীয় হকি খেলোয়াড়গণের সুনাম সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে কি না সেই বিষয় সন্দেহ আছে। এই দলে যে সকল খেলোয়াড় যাইতেছেন তাঁহাদের কাহাকেও প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। এই পর্যন্ত যতবার ভারতীয় হকি দল ভারতের বাহিরে প্রেরিত হইয়াছে ততবারই ভারতীয় খেলোয়াড়গণ বিভিন্ন খেলায় শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত করিয়াছেন। এমন কি বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে তিন তিনবার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দল বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় একটি শক্তিহীন দলকে ভারতের বাহিরে খেলিবার জন্য ভারতীয় হকি ফেডারেশন যদি অনুমতি দিয়া থাকেন তবে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া বলা চলে না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১০ই আগষ্ট

মস্কো হইতে **রয়টারের** বিশেষ সংবাদদাতা **জানাইয়াছেন** যে, **লালফৌজ** এক্ষণে তিনদিক **হইতে খারকভ শহরটিকে** বেষ্টন **করিয়াছে।** একদল সোভিয়েট সৈন্য শহরের ৩৬ মাইল পশ্চিমে নিকটোভকা শহরে পৌঁছিয়াছে, অপর একদল সোভিয়েট সৈন্য উত্তর ডোনেৎসের **পশ্চিম তীরস্থ বেলজেনায়া শহর বরাবর খার-**কভের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বার্লিন হইতে **ঘোষিত হইয়াছে** যে, বিশেষভাবে সুরক্ষিত **স্মলেনস্ক** হইতে মাত্র ৫০ **মাইল** পূর্বে এক **স্থানে রুশগণ এক প্রচণ্ড আক্রমণ** আরম্ভ **করিয়াছে।**

রয়টারের সংবাদদাতা **জানাইতেছেন** যে, **সিসিলিতে জার্মান আত্মরক্ষার মূল ঘাঁটি রাণ্ডাজ্জো কে আগে দখল করিতে পারিবে, তাহা লইয়া মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রতি-যোগিতা আরম্ভ হইয়াছে।**

বর্ধমানের এক সংবাদে প্রকাশ, জুলাই মাসের বন্যার পর দামোদর পুনরায় ৫ই আগষ্ট হইতে রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছে। আরও ২০ খানি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে এবং প্রায় ৫ হাজার কুটীর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, ফলে কয়েক সহস্র লোক আশ্রয়হীন ও নিঃস্ব হইয়াছে।

আরামবাগের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৩১শে জুলাই কৃষ্ণবল্লভপুরের পরলোকগত আউসাই নামক এক ব্যক্তির বিধবা পত্নী তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু সন্তান রাখিয়া **অনাহারে** মারা গিয়াছে। আরাম**বাগে অনেকগুলি** লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে।

১১ই আগষ্ট

মিত্রপক্ষের উত্তর-আফ্রিকাস্থিত হেড-কোয়ার্টার হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা **জানাইতেছেন** যে, এটনা পর্বতের পাদদেশে গার্দিয়া অধিকৃত হওয়ায় খাস ইতালীর ভূখণ্ড এক্ষণে অষ্টম আর্মির দৃষ্টি সীমার অন্তর্ভুক্ত হইল। অদ্যকার ইতালিয়ান ইস্তাহারে বলা **হইয়াছে** যে, সিসিলির মধ্য ও উত্তর রণাঙ্গনে **ইতালীয়ান** ও জার্মান সৈন্যেরা কঠোর আত্মরক্ষা-মূলক সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে।

মিঃ চার্চিল কানাডায় উপস্থিত হইয়াছেন। **কানাডার** প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জী কিংএর **সহিত** আলোচনা শেষ করিয়া তিনি প্রেসিডেণ্ট **রুজভেল্টের** সহিত আলোচনা করিবেন।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন যে, গান্ধীজীর **উপর** যতদিন বিধিনিষেধ আরোপিত থাকিবে, **ততদিন** পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে **প্রাপ্ত** চিঠিপত্রের **বিষয়বস্তু** কিরূপ ধরণের, **তাহা** প্রকাশ করিবেন না।

আমেদাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, পাঁচমহল দোহাদ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, খাদ্য শস্যের গুদাম লুণ্ঠন করায় একদল ভিল কৃষকের এক জনতার উপর পুলিশ গুলীচালনা করে। ফলে তিনজন নিহত হয়।

কলিকাতা শহরে খাদ্য অভিযানের ফলে ভাউজন ... ৪০০০/ মণ [illegible]

[illegible]

হাজার মণ আটা মজুত রাখার জন্য **আরও** তিনজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের **করা** হইয়াছে।

১২ই আগষ্ট

মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, রুশ সৈন্যেরা খারকভ হইতে পোলটাভা-গামী রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব হইতে তিনটি রুশবাহিনী ব্রিয়ানস্ককে বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে।

সিসিলি হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন যে, জার্মানদের সিসিলি ত্যাগ পুরাদমে চলিয়াছে। মূল এক্সিস আত্মরক্ষা ঘাঁটি রাণ্ডাজ্জোর উপর মিত্রপক্ষের সম্মিলিত বাহিনীর প্রচণ্ড চাপ চলিতেছে। এক্সিস বাহিনী মরিয়া হইয়া বাধা দান করিতেছে।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, লবীর আলাপ-আলোচনায় প্রকাশ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বড়লাটের নিকট এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মনে হয় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং খাদ্য সমস্যা সম্পর্কেই পত্রখানি লিখিত হইয়াছে এবং উহাতে সমস্যার সমাধান সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

১৩ই আগষ্ট

সিসিলিতে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কর্তৃক রাণ্ডাজ্জো অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া সরকারী-ভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

মার্কিন বেতারে প্রকাশ, রোমের **লিটোরিও** ও সান লরেনজোর সামরিক ঘাঁটিতে মার্কিন বিমান বোমাবর্ষণ করে।

অদ্য বেঙ্গল ন্যাশনাল, ইণ্ডিয়ান মুসলিম এবং মারোয়াড়ী চেম্বার অব্ কমার্সের কমিটি-গুলি ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে সম্প্রতি কলিকাতা হইতে এক চালানে বহু চাউল দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা সংবাদ পাইয়াছেন। কমিটিগুলি এইভাবে চাউল রপ্তানির তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। "কেন না, চাউল রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া সম্প্রতি গভর্নমেণ্টের ঘোষণা জারী হওয়া সত্ত্বেও এই রপ্তানি হইয়াছে।" কমিটিগুলির মতে, এই ঘটনায় "এদেশের নিরন্ন জনগণকে অন্নদান করার প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গভর্নমেণ্ট যে সম্পূর্ণ উদাসীন" এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

মস্কো রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিলের আসন্ন সাক্ষাৎকালে মঃ স্টালিন অথবা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন, এই মর্মে যে সংবাদ রটিয়াছে টাস নিউজ এজেন্সী তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। টাস এজেন্সী জানাইতেছেন যে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এই সভায় উপস্থিত থাকিবার কোন আমন্ত্রণ পান নাই!

১৪ই আগষ্ট

ইতালীয়ান নিউজ এজেন্সী জানাইয়াছেন যে, ইতালীয়ান গভর্ণমেণ্ট রোমকে অরক্ষিত নগরী বলিয়া ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সোভিয়েট সৈন্যদল খারকভের উপকণ্ঠে জার্মান ব্যূহ ভেদ **করিয়াছে** এবং **উত্তরে শহরের** প্রবেশমুখে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলিতেছে। ব্রিয়ানস্কের ২৫ মাইল পূর্বস্থ **কারাচেভের** পতন আসন্ন।

অদ্য রাষ্ট্রীয় পরিষদে কলিকাতা হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় চাউল রপ্তানি বন্ধ করিতে সরকারের অক্ষমতা আলোচনা করিবার জন্য মিঃ ভি ভি কালিকর একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৫ই আগষ্ট

সোভিয়েট **ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, স্মলেনস্ক রণাঙ্গনে এক নূতন সোভিয়েট আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। ভিয়াজমার দক্ষিণে স্পাস ডেমেনস্ক শহরের উত্তর-পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-পূর্ব হইতে লালফৌজ আক্রমণ করে;** এই যুগ্ম আক্রমণ **যথাক্রমে ১২ মাইল ও ১০** মাইল আগাইয়া গিয়াছে। **কারাচেভ দখল করা** হইয়াছে বলিয়া মস্কোতে **সরকারীভাবে** ঘোষিত হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের **সহিত** আলোচনা করিয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল কুইবেকে ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের সমর নায়কদের মধ্যে আলোচনার প্রাথমিক ব্যবস্থাও শেষ হইয়াছে।

আলজিয়ার্স রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, সিসিলির উত্তর উপকূল বরাবর অগ্রসর হইয়া আমেরিকান সৈন্যগণ এখন মেসিনার ২০ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। জার্মানরা দ্রুত মেসিনার দিকে হটিয়া যাইতেছে। মার্কিন বাহিনী রাণ্ডাজ্জো হইতে অগ্রসর হইয়া উত্তর হইতে দক্ষিণগামী সড়কটি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তবে পলায়ন পর জার্মানদের পথ আগলাইতে পারে নাই।

১৬ই আগষ্ট

মস্কোর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ৭০ মাইল প্রশস্ত এক ফ্রন্টে অগ্রসর হইয়া লালফৌজ এখন ক্রমশ ব্রিয়ানস্কের নিকটবর্তী হইতেছে। লালবাহিনীর দক্ষিণ ও বাম বাহু এক বিরাট সাঁড়াশীর আকারে জার্মানদের এই বৃহৎ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উত্তর বাহু ব্রিয়ানস্ক হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী কিরেকভো স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং দক্ষিণ বাহু সোজা পশ্চিমে নাভিয়া রেল জংশনের দিকে প্রচণ্ডভাবে অগ্রসর হইতেছে। মারাভেলনিকে রুশ সৈন্যেরা বর্তমানে ব্রিয়ানস্ক-খারকভ রেলপথ বরাবর অগ্রসর হইয়া ব্রিয়ানস্কের ২০ মাইলের **মধ্যে যাইয়া** পৌঁছিয়াছে।

রয়টারের সংবাদদাতা **জানাইয়াছেন** যে, জার্মানী হইতে সৈন্য ও **সমরোপকরণ লইয়া** বহু ট্রেন ব্রেনার গিরিপথ অতিক্রম **করিতেছে।** স্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, উত্তর ইতালিতে ভেরোনা শহর ইতালীয় সৈন্যেরা ত্যাগ করিয়াছে। উহা এখন **জার্মান হেডকোয়ার্টার্স।** **ইতালীয় সৈন্যেরা শীঘ্রই সমগ্র উত্তর ইতালি ত্যাগ করিবে বলিয়া মনে হয়।**

আলজিয়ার্স বেতারে ঘোষণা **করা হইয়াছে** যে, ইতালির মূল ভূখণ্ড এক্ষণে **মিত্রপক্ষের** কামানের পাল্লার মধ্যে। **সিসিলি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি আসন্ন।**

দেশ

সম্পাদক- শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ বর্ষ]   শনিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৩৫০ সাল।   Saturday, 28th August, 1943.   [৪৪শ সংখ্যা

সাময়িকপ্রসঙ্গ

নূতন পরিকল্পনা

খাদ্য সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার আর এক দফা নূতন পরিকল্পনা লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা এবার ধান ও চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। গত ১১ই মার্চ ধান ও চাউলের বাঁধা দর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়া গভর্নমেন্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, এতদ্দ্বারা বাঙলার খাদ্য সমস্যা সমাধানে গভর্নমেন্টের সে ব্যবস্থার ব্যর্থতাই স্বীকার করা হইল। নিজেদের অবলম্বিত নীতির পুনঃপুনঃ এইরূপ ব্যর্থতার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লইয়া চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসাবেই সম্ভবত সরকার সম্প্রতি এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু মাত্র ধান এবং চাউলের দর নির্ধারণ করিয়া দিলেই যে সমস্যার সমাধান হয় না, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতেই তাহা বুঝা গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম না লইয়া তেমন নীতি অবলম্বন করিলে আবার কিছুদিন পরে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, সরকারকে সে নীতি প্রত্যাহার করিতে হয়। অধিকন্তু প্রতিক্রিয়ার ফলে যে অনাস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাতে বাজার আরও বিপর্যস্ত হয়; সুতরাং বাজারের দর বাঁধিয়া দিয়া দ্রব্য মূল্য যদি কমতির দিকে লইতে হয়, তবে সরবরাহ সংস্থানের সম্বন্ধে আগে সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন এবং শুধু তাহাই নয়, সেই সঙ্গে সরবরাহের গতি যাহাতে চোরা বাজারের অভিমুখে কোনক্রমেই সঞ্চারিত হইতে না পারে, তেমন কঠোর ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন; কারণ আমরা দেখিতেছি যে, ভারত সরকার হইতে কলিকাতায় কিছু দিন হইতে ক্রমাগত গম এবং চাউল গাড়ি গাড়ি সরবরাহ করা হইতেছে; তথাপি বাজারের দর কমিতেছে না, পক্ষান্তরে বাড়িয়াই চলিয়াছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাইতেছে, তাঁহারা একবারে চূড়ান্ত দর বাঁধিয়া না দিয়া ক্রমশ ধান-চাউলের দর হ্রাস করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ২৮শে আগস্ট, ১০ই এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর এই তিন দফায় সরকার সর্বনিম্ন দর বাজারে দাঁড় করাইতে চাহেন। আউসের ফসলের দিকে অনেকখানি তাকাইয়াই সম্ভবত তাঁহারা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, আউস ফসলের উৎপন্নের পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা নিশ্চিত ধারণা আছে কি? আমরা পূর্বে বহুবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি বাঙলা দেশে আউসের যে ফসল উতরাইয়াছে, তাহা যদি বাজারে ষোল আনা আমদানীও হয়, তথাপি ধান-চাউলের দর শুধু সেই ফসলের জোরে স্থায়ীভাবে নামিবে না, ঘাটতি থাকিয়াই যাইবে এবং সেই ঘাটতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত থাকিয়া লাভখোরের দল চোরা-বাজার সৃষ্টি করিবে। এ সম্বন্ধে আমাদের অতীতের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট দ্রব্য বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। এখনও সরিষার তেলের সম্বন্ধে এবং মিছরির সম্বন্ধে আমরা সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছি। সরকার তেলের দর বাঁধিয়া দিবার ফলে বাজারে সরিষার তেল মিলিতেছে না; সুতরাং সরবরাহের স্বাচ্ছন্দ্য এক্ষেত্রে গোড়াকার কথা এবং যে সব কর্মচারী কার্যক্ষেত্রে এই সব ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবেন তাঁহাদেরও সততা থাকা প্রয়োজন। বাঙলা সরকার এক্ষেত্রে যে দায়িত্ব লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা আশা করি সেই দায়িত্বের গুরুত্ব তাঁহারা

উপলব্ধি করিবেন। ধান-চাউলের দর বাঁধিয়া দেওয়া, গভর্নমেণ্টের পক্ষে কিছুই কঠিন কথা নয়; এক কলমের খোঁচাতেই তাহা করা সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু বাঙলার লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষা-কাতর বিপন্ন নর-নারীর নিকট সস্তা দরে ধান চাউল সরবরাহ করাই প্রয়োজন। সে প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার পক্ষে সরকারের এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হইবে ইহাই হইতেছে প্রধান বিষয়। আমরা আশা করি, এতদিন পরে বাঙলা সরকার তাঁহাদের এই কর্তব্য উপলব্ধি করিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙলার ঘরে ঘরে আজ নিরন্নের হাহাকার উঠিয়াছে। অন্নাভাবে মানুষ রাস্তা-ঘাটে পড়িয়া মরিতেছে; এমন অবস্থায় অন্ন সংস্থানের দ্বারা মানুষকে রক্ষা করিবার কর্তব্যই বর্তমানে সরকারের প্রধান কর্তব্য। সে কর্তব্য পালনে যদি এখনও কার্যকর নীতি প্রযুক্ত না হয়, তবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অপেক্ষা বাঙলা দেশের অবস্থা ভীষণ আকার ধারণ করিবে।

কলিকাতার সমস্যা

খাদ্য সমস্যা বর্তমানে সমগ্র বাঙলার প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদিক হইতে কলিকাতার অবস্থা বরং ভাল; গ্রামের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় আজকাল কাতারে কাতারে যে শ্রেণীর বুভুক্ষা নরনারী ঘুরিয়া ফিরিতেছে, বাঙলার গ্রামে গ্রামে আজ সেই অবস্থা। কিন্তু গ্রামের সমস্যার প্রতিক্রিয়া উত্তরোত্তর কলিকাতার উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং কলিকাতার জনসংখ্যা পরিস্ফীত হইয়া উঠিতেছে। বুভুক্ষু নরনারীদের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা-প্রণালী কলিকাতার পৌর-স্বাস্থ্য বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগ এ জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন; ইহার ফলে একদিকে মানবতা অন্যদিকে পৌর-স্বাস্থ্য রক্ষার কর্তব্যের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতা শহরের মধ্যে বহু অন্নসত্র খোলা হইয়াছে, সেগুলির সুবিধা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে গ্রাম হইতে দলে দলে লোক কলিকাতায় আসিতেছে। এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করিয়া সাহায্য ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলিত করা প্রয়োজন এবং গ্রামের এই সব সাহায্য ব্যবস্থাকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে সরকার হইতে লক্ষ্য রাখা দরকার। বাঙলা দেশে উৎসাহশীল কর্মী যুবকগণের অভাব নাই; আমরা আশা করি ইঁহাদের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে ক্ষুধিতের অন্নদান ব্রত সার্থক করিবার প্রচেষ্টা শহর হইতে সম্প্রসারিত হইবে। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অন্নদান ব্রত-পরিচালনায় অগ্রণীর কাজ করিতেছেন। আমরা আশা করি তিনি ও অন্যান্য দেশসেবক নেতৃবৃন্দের দ্বারা সুনির্ধারিত একটি কর্মপ্রণালী দ্বারা বঙ্গব্যাপী সাহায্য কর্ম পরিচালিত হইবে। অবিলম্বে এইদিকে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন; কারণ, তাহা না হইলে কলিকাতার সমস্যা নানা দিক হইতে ক্রমেই সমধিক জটিল আকার ধারণ করিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। শুধু স্বাস্থ্য হানির দিক হইতেই এই আশঙ্কার কারণ নয়; অন্য দিক হইতেও আশঙ্কা আছে। কলিকাতা শহরের উপর জাপানীদের বিমান আক্রমণের উদ্যম গত বৎসর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু বর্ষা কাটিয়া গেল। শহরের উপর পুনরায় তাহাদের বিমান অভিযান এখন অসম্ভব নয়; তবে এজন্য তেমন উদ্বিগ্ন হইবার কোনই কারণ নাই। গত বৎসর জাপানীরা শহর আক্রমণ করিতে আসিয়া বিশেষ ভরসা পায় নাই; গত বৎসরের সে অভিজ্ঞতা হইতে এদিকে তাহাদের ভয়ের কারণ রহিয়াছে। কিন্তু সময় থাকিতে এ সম্বন্ধে সতর্কতামূলক পাকা ব্যবস্থা করিয়া রাখা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

বাঙলা হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানী

ভারত সরকার সম্প্রতি একটি ইস্তাহারে ১৯৪৩ সনে ভারতবর্ষ হইতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে তাহার একটি মাসিক হিসাব প্রদান করিয়াছেন। এই হিসাবে দেখা যায়, খাদ্যশস্য বাহিরে রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস করা হইয়াছে। সিংহল, পারস্য উপসাগর এবং আফ্রিকার বন্দর ও উপকূলবর্তী দ্বীপগুলিতে ভারত হইতে খাদ্যশস্য পাঠান হইয়াছে। বাঙলাদেশ হইতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য ঐ সব অঞ্চলে পাঠান হইয়াছে, তাঁহারা বলেন, সে পরিমাণ অত্যন্ত সামান্য। আগস্ট মাসেও ভারতের বাহিরে খাদ্য শস্য পাঠান না হইয়াছে এমন নয়; তবে সওদাগরী জাহাজের ভারতীয় মাঝিমাল্লাদের জন্যই সামান্য কিছু পাঠান হইয়াছে, ইহার পরিমাণ কয়েক শত টন মাত্র। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে, রপ্তানী নিষেধের আজ্ঞা সত্ত্বেও সরকারী ব্যবস্থাতেই রপ্তানী কেমন করিয়া সম্ভব হয়। ভারত সরকার ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের খুব সাফাই গাহিয়াছেন; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ভারত হইতে খাদ্য শস্য রপ্তানী করিয়া এই কোম্পানী দেশ-বিদেশে যে দাতব্য ব্রত পরিচালনা করিয়াছেন, বিলাতী কাগজেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই কর্পোরেশন যুদ্ধের পর জগতে যাহাতে সম্মিলিতপক্ষের বন্ধুর দল ভারী হয়, সে পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। বন্ধুর দল ভারী করা খুবই ভাল; কিন্তু যাহাদের বন্ধুত্বের দোহাই দেওয়া হয়, তাহারা যাহাতে খাদ্যাভাবে বিপন্ন না হয়, এ ভাবনাটা আগে করিয়া খাদ্য দ্রব্য রপ্তানী করিতে দেওয়া উচিত ছিল। বৎসরখানেক হইল এই কোম্পানী ভারত হইতে বাহিরে খাদ্য শস্য প্রভৃতি চালান দিতেছে না, সরকারী ইস্তাহারে আমাদিগকে এমন আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু নিজেদের ঘরের পাঁজি বিচার করিয়া পূর্ব হইতে দাতব্য নিয়ন্ত্রণ করিলে ভাল হইত। দেশের অবস্থা যখন বাহিরে খাদ্য শস্য রপ্তানীর অনুকূল নয়, তখনও ভবিষ্যতের বিচার না করিয়া কিভাবে রপ্তানী চালাইতে দেওয়া হয় ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। রপ্তানী নিষিদ্ধ হইলেও রপ্তানী চলে, সরকারী নীতির এমনই মহিমা। বাঙলা সরকার সম্প্রতি তাঁহাদের বিজ্ঞপ্তিতে বাঙলা দেশ হইতে চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন; ইতঃপূর্বে রপ্তানী নিষেধের আদেশ বহু-বৎ থাকা সত্ত্বেও এখান হইতে চাউল রপ্তানী হইয়াছে; বর্তমানে এই নিষেধাজ্ঞাও যাহাতে সেইরূপ প্রহসনে পরিণত না হয়, তাহা করা প্রয়োজন।

কুইবেকের বৈঠক ও ভারতবাসী

কুইবেকে সম্মিলিত শক্তিবর্গের যে বৈঠক হইতেছে, তাহাতে ভারতীয় সমস্যা উত্থাপনের জন্য আমেরিকার প্রবাসী ভারতবাসী এবং পার্ল বাক, লুই ফিসার প্রভৃতি ভারত হিতৈষী মার্কিন নেতৃবৃন্দ চেষ্টা করেন। আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ আশাশীল নহি। সম্মিলিতপক্ষ জার্মানির বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে নূতন আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। স্ট্যালিন এই সম্মেলনে যোগদান করেন নাই; কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতির ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ব্রিটিশ এবং মার্কিনের পক্ষ হইতেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মস্কোতে ছুটিতে হইবে এবং শুধু ইতালি আক্রমণ করিলেই চলিবে, রুশ সীমান্তে যাহাতে জার্মানদের উপর চাপ পড়ে সেজন্য বলকান কিংবা ফ্রান্সে

লিতপক্ষকে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। তারপর আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, শুধু ইউরোপের সম্বন্ধেই এই বৈঠকে আলোচনা হইবে; কিন্তু দেখা যাইতেছে চীনা জাতীয় দলের গভর্নমেন্টের পররাষ্ট্র সচিবও এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন; সুতরাং জাপানের বিরুদ্ধেও আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বনের বিষয় এই বৈঠকে আলোচনা হইবে। জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিতপক্ষের সে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বনের সার্থকতা সম্পূর্ণভাবে ভারতের জনবল, সমরসংগতি এবং জনগণের আন্তরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে। আজ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে তবে সমস্ত ভারতের আন্তরিক সহযোগিতা লাভে সম্মিলিতপক্ষের রণনীতি সুদৃঢ় হইবে; রণনীতির চাতুর্যের দিক হইতে সম্মিলিত শক্তির সাফল্যের পক্ষে ভারতের স্বাধীনতার দাবী পূরণ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং তাহাতে যুদ্ধপ্রয়াসের দিক হইতে তাহাদের লাভই হইবে। কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহ সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারা এই সব উপদেশ এতদিন পর্যন্ত উপেক্ষাই করিয়াছেন; এখন যদি তাঁহাদের নীতির পরিবর্তন ঘটে এবং ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থার সমস্যার সমাধানের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তবে তাঁহারা শীঘ্রই পরিচয় প্রদান করিবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রথমে বিবেচ্য হইল এই যে, মার্কিন গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উপর এ ব্যাপারে চাপ দিতে প্রস্তুত আছেন কি না; দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বর্তমান কর্ণধার চার্চিল-আমেরী কোম্পানী ভারতীয় সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতা সম্বন্ধে তাঁহাদের ছেঁদো যুক্তি ছাড়িয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা। স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু সেদিন ভারত সচিব আমেরী সাহেবের উক্তির সমালোচনা করিয়া সত্যই বলিয়াছেন, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বাদ দিয়া ভারতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টার যে কথা আমেরী সাহেব বলিয়াছেন, তাহাতে ভারতের প্রতি পরিহাসই করা হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের সংস্কারে মতিগতি যাঁহাদের এখনও এমন উদ্ধত, তাঁহাদের কাছে আবেদন-নিবেদন নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়।

দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে

বাঙলা দেশের রাজধানী কলিকাতা শহরের রাজপথ হইতে প্রত্যহ গাড়ী ভর্তি করিয়া মুমূর্ষু নর-নারীকে হাসপাতালে লওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়া বহু মৃতদেহও অপসারিত করা হইতেছে। সমৃদ্ধিশালী শহরের নানাস্থানে অন্নসত্র রহিয়াছে তাহা সত্ত্বেও এই অবস্থা। মানুষ আবর্জনা স্তূপ হইতে উচ্ছিষ্ট কণা সংগ্রহ করিবার উৎকণ্ঠায় কুকুর বিড়ালের সঙ্গে লড়াই করিতেছে। গ্রামের অবস্থা যে কি ভীষণ তাহা তো ভাষায় বর্ণনাই করা যায় না। অথচ ইহাতেও নাকি দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই এবং বাঙলা দেশকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিবার মত সমস্যা সৃষ্টি হয় নাই। এক্ষেত্রে সরকারী ভাষা মতে দুর্ভিক্ষ শব্দের অর্থকে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের সম্বন্ধে সরকারী দায়িত্ব সম্পর্কে যে বিধান আছে সে বিধানের সার্থকতা কার্যত কি থাকিতে পারে, আমরা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব খাদ্যসচিব স্যার আজিজুল হক বিশেষ বিনয় সহকারে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, কোন অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া ঘোষণা করিলেই হয় না, সেই সঙ্গে সরকারের দায়িত্বও আছে। এ যুক্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে সে দায়িত্ব প্রতিপালনে সরকারের কর্তব্য রহিয়াছে বলিয়া তো আইনও আছে। সরকার অন্য সকল দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহাদের অক্ষমতা শুধু এই বেলায়। একটা দেশের শাসন ব্যাপার সম্পর্কে দায়িত্ব লইয়া যাঁহারা এই ধরণের যুক্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। আমাদের মতে বাঙলার অবস্থা যেরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, বাঙলা সরকার কর্তৃক খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সে সমস্যার সম্যক সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। তাঁহারা খাদ্যশস্যের যে দর বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহাও কম নয়। সে মূল্য দিয়া খাদ্য শস্য কিনিবার সামর্থ্য অনেকেরই নাই। এরূপ অবস্থায় বাঙলা দেশকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেশবাসীর অন্নসংস্থানের দায়িত্ব সাক্ষাৎ সম্পর্কে সরকারের গ্রহণ করা কর্তব্য।

অবদমন

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্জন শিখরের স্তম্ভিত মহিমায়
ওগো লম্বিতা কেশশালিনী
কাঁচের গন্ধের মতো সেতুবন্ধের
দুর্জয় বীর্যকে মানিনি!
চিরকাল একটানা, গণ্ডীর রেখাটানা
মন প্রাণ ভেসে গেছে হর্ষে—
দৃক্‌পাত করবার, হীন হ'য়ে মরবার
কাঁপি নাই ভীরু পরামর্শে!

দুর্গত জন আসে নির্গত শ্রাবণের
প্লাবনের বারিধারা বক্ষে,
আমি চেয়েছিনু তার, বাঁচবার অধিকার
আমি চেয়েছিনু জ্যোতি চক্ষে,
আমার আকাশ ঘেরি, শ্রাবণের বিভাবরী
পেয়েছিনু তাকি আমি জানতে,
ঝর্ঝর বারিধার, ভেসে গেলো চারিধার
তোমাদেরি সব কথা মানতে!

গর্বিত চরণের স্পর্ধিত মরণের
আজ শেষ আবরণ দুলছে
ওগো মোহ অঞ্জনা, বৃথা হানো গঞ্জনা
তোমার মুখোস সবই খুলছে!
কুজ্ঝটি আবরণে, মিথ্যা ঢাকো আভরণে—
ক্লান্তি কলঙ্কিত কাহিনী
ঘৃণ্য তোমার মুখ, ঘৃণ্য তোমার সুখ—
—ঘৃণ্য এ রূপ আমি চাহিনি!

ঘর্ঘর গর্জন—মেঘ নীল বর্ষণ—
বিশ্ব কি টুকরোই ভাঙলো!
রাত্রির রঙ দিয়ে, মোহ আর কেন প্রিয়ে
লাল মেঘে আকাশ যে রাঙলো।
এখানে ধানের ক্ষেত, এখানেই নাচে প্রেত—
জীবন উঠেছে এসে কণ্ঠে,
ওগো আলোকের শিখা—অতীতের মণিদীপা,
তুমিও পড়েছো নির্ঘণ্টে।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

- শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী -

চিত্রশিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

[৫]

মন্দিরের উপদেশ

আশ্রমে বুধবার অনধ্যায়। এইদিন সকালে মন্দিরে উপাসনা হইত। গুরুদেব উপস্থিত থাকিলে তিনিই উপাসনা করিতেন ও উপদেশ দিতেন। তিনি উপস্থিত না থাকিলে ক্ষিতিমোহনবাবু, শাস্ত্রী মহাশয়, নেপালবাবু বা অন্যকেহ উপাসনা করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনার দিনকে আমরা বড় ভয় করিতাম; প্রথমত তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে অনেক সংস্কৃত শ্লোক থাকিত, দ্বিতীয়ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সাময়িক [illegible] জন্য তিনি কিছু [illegible] করিয়া বক্তৃতা করিতেন। একবার তাঁহার স্বর [illegible] আসিত, মনে হইত এইবার বুঝি থামিবেন, কিন্তু হায় সকলকে হতাশ করিয়া পুনরায় তাঁহার স্বর উঁচু হইয়া উঠিত। আবার নীচু হইয়া এবারে নিশ্চয় শেষ, কিন্তু না, আবার স্বরের পুনরুত্থান ঘটিল। এইভাবে কণ্ঠস্বরের চড়াই উৎরাই ভাঙিতে ভাঙিতে অবশেষে হঠাৎ এক সময়ে তিনি থামিতেন। কিন্তু থামাটা আকস্মিক বলে নয় ইচ্ছা করিলে সারাদিন তিনি চালাইতে পারিতেন—তাঁহার মুখে অবসাদের কোন চিহ্ন দেখি নাই।

অনেকের ধারণা আছে যে, শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে উপাসনা হইয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। এখানকার উপাসনা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক—ধর্মের সর্বজনগ্রাহ্য মূলতত্ত্বই বিবৃত হইয়া থাকে মাত্র। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণের উপদেশও যেমন প্রদত্ত হয়, তেমনি খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি ধর্মগুরুদের কথাও বর্ণিত হয়।

গুরুদেব যেদিন মন্দিরে উপাসনা করিতেন সেদিন মন্দির পূর্ণ হইয়া যাইত। শান্তিনিকেতন গ্রন্থমালার মন্দিরে প্রদত্ত অনেক বক্তৃতার সারাংশ আছে।

আমরা যখন ছোট তখন দেখিয়াছি বুধবারে দুইবার উপাসনা হইত; সকালে বড়দের জন্য, সন্ধ্যায় ছোটদের জন্য। সন্ধ্যাবেলায় উপাসনা হওয়াতে আমাদের ভালই লাগিত, সন্ধ্যার অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া আমরা নিরুদ্বিগ্নে ঘুমাইয়া লইতাম। এইভাবে বেশ শান্তিতে চলিতেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধহয় সুষুপ্তি সরব হইয়া উঠিল, ঘুমের সঙ্গে নাসিকাধ্বনি যুক্ত হইল। তখন হইতে গুরুদেব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উপদেশ দান শুরু করিলেন, কাজেই আমাদেরও দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। প্রায় প্রত্যেক বুধবারে উপাসনার জন্য তিনি নূতন গান রচনা করিতেন। কখনো তিনি স্বয়ং, কখনো বা দিনুবাবু গান করিতেন। একবার গুরুদেবের উপাসনাকালে বেশ একটি মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। গুরুদেব কেবলি সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া বসিয়াছেন, বক্তৃতা আরম্ভ করিবেন—এমন সময়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। একজন অধ্যাপক ধরা যাক, তাঁহার নাম রামবাবু—রামবাবু হঠাৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে উঠিয়া আসিয়া গুরুদেবের সম্মুখে বসিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য রামবাবু লোকটি ভালমানুষ, আর ভালমানুষ না হইলে এমন কাণ্ড কেহ করে না। রামবাবু ভালমানুষ হইলে কি হয়, বড় ভাবাল ছিলেন। তিনি সর্বদা ধ্যানে নাকি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতেন। তার আগের দিনই নাকি পায়েস রাঁধিতে রাঁধিতে সুগন্ধি ধোঁয়ার আড়ালে অস্পষ্টভাবে তাঁহার নাকি ভগবৎ-দর্শন ঘটিয়াছিল। সেই অভিনব অভিজ্ঞতা তিনি ঘণ্টা দুই ধরিয়া কখনো কাঁদিয়া কখনো হাসিয়া প্রকাশ করিয়া চলিলেন। গুরুদেবের কাছেও বোধ করি এই অভিজ্ঞতা অভিনব। আর আমাদের কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, ব্যাপারটা মন্দ লাগিল না। একঘেয়ের মাঝে একটু নূতনত্বের ছিটা।

৭ই পৌষের উৎসব

৭ই পৌষের উৎসব আশ্রমের সবচেয়ে জমকালো পর্ব। ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা, ৮ই পৌষে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। কাজেই এই দুইদিন খুব ধুমধাম হইত।

অঘ্রাণ মাসের শেষে দেখিতাম এক আতসবাজীর কারিগর আসিয়া পৌঁছ[illegible]। তাহারা বাখারি, বাঁশ, কাগজ, বারুদ অন্যান্য মশলা দিয়া নানা রকম [illegible] তৈরী করিত। হাউই, তুবড়ি [illegible] বাজী। কিন্তু সবচেয়ে [illegible] মনোহরণ করিত, [illegible] কাগজের [illegible] ও [illegible] অন্য সব বাজী পোড়ানো শেষ হইলে [illegible] এই দুটি সোলা [illegible] ভস্ম হইয়া যাইত। [illegible] করিত, দাঁড়াইত [illegible] অন্য দশ বাঁশের কেল্লা [illegible] দুইদল একমত হইয়া আক্রমণ করিত [illegible] ফিরিত। আমি কিন্তু প্রত্যেকবারই [illegible] ও কেল্লার একই লীলা ও একই [illegible] দেখিতাম—[illegible] হাত ছিলেন [illegible] আভাস ছিল না। [illegible]

[illegible] হইয়া দলে দলে [illegible] মেলার [illegible] ধ্বনিত হইতেছে রসুনচৌকির [illegible] বিষাদের হৃদয়ভেদী রাগিণী।

এদিকে আশ্রমও অতিথিসজ্জনে পূর্ণ হইয়া যাইত। আমরা ছোটরা [illegible] মেলায় যাইবার হুকুম [illegible] কিন্তু চিহ্নিত স্থান ছাড়া কোথাও [illegible] উপায় ছিল না, পিছনে অভিভাবকের [illegible] সেই কাপ্তেনের দল লাগিয়াই [illegible] কিছু যে কিনিব সে উপায় নাই, [illegible] টাকা পয়সা নিজেদের কাছে রাখিবার [illegible] ছিল না, তার উপরে আবার [illegible] সতর্ক দৃষ্টি।

[illegible] মেলা আরম্ভ হইত [illegible] যাত্রা গান [illegible] হইত। আমরা সারিবদ্ধভাবে [illegible] দিয়া বসিতাম। [illegible] আমাকে [illegible] মধ্যে [illegible], আমি তন্ময় হইয়া বসিয়া দেখিতাম। নীলকণ্ঠ [illegible] কৃষ্ণলীলাত্মক কোন একটা পালা। [illegible] শুনিতে শুনিতে হঠাৎ যখন হুঁস হইত [illegible] নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, আকাশ [illegible] হইয়া উঠিয়াছে, [illegible] মুখর হইয়া উঠিয়াছে, আর [illegible] তাল বাঁধিয়া চলিতেছে, [illegible] ডুগডুগি, বাউলের একতারা, ঝিঁঝি-[illegible] বাঁশী, আর সাঁওতাল নাচের মাদল।

সন্ধ্যার আগে আহার—খাওয়াটা বেশ [illegible] হইত। খানিক পরে আবার [illegible] মন্দিরের সে কি আলোক-সজ্জা! [illegible] মোমবাতির আলো, মেঝেতে [illegible] অসংখ্য মোমবাতি। সন্ধ্যার সময়ে [illegible] ভিড় এত বাড়িয়া উঠিত যে তাহা [illegible] করার মধ্যে [illegible] রবি সিংহ [illegible] ছিল না। হাঁ, জনতা [illegible] মত চেহারা বটে! রবি সিংহ [illegible] লাল, চাদর লাল, পাগড়ি [illegible] চক্ষু দুটিও যেন লাল। [illegible] তো শুধু পাগড়ি লাল। এই [illegible] হাতে [illegible] জনতাকে [illegible] করিয়া চলিতেছেন, জনতা [illegible] করিতেছে। এ বিষয়ে [illegible] সিংহের টেকনিক নিখুঁত। [illegible] জনতাকে শাসন করা সম্ভব নয়। [illegible] উপরে এক জায়গায় চাপ দিলে তাহা [illegible] সমানভাবে সঞ্চারিত হয়—[illegible] টেকনিকও তদনুরূপ। [illegible] যে কোন একটা জায়গায় আঘাত [illegible] তাহার ফল সর্বত্র সমানভাবে [illegible]। রবি সিংহ আধুনিক ডিক্টেটরদের [illegible] পূর্বপুরুষ।

[illegible] বাজি পোড়ানো হইত। [illegible] মুহূর্তের মধ্যে অগ্নির [illegible] পর্যবসিত, [illegible] হইয়া নিঃশেষ [illegible] যাইত। ঊর্ধ্বমুখী হাউইগুলো [illegible] তারার প্রতি বিদ্যুৎ বেগে [illegible] করিয়া অবশেষে এক সময়ে বিচিত্র [illegible] করিয়া পড়িত। সবশেষে জাহাজ [illegible] অগ্নিসংযোগ হইত। ততক্ষণে [illegible] হইয়াছে; শীতের শিশির [illegible] শুকনো ঘাসের উপর পড়িয়া এক-[illegible] গন্ধ জাগাইয়া দিয়াছে—সেই [illegible] উৎসবের দিন ক্লান্ত করিয়া আমরা [illegible] ফিরিয়া আসিতাম।

[illegible] পৌষ আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের [illegible] আম্রবাগানে সভা বসিত। প্রাক্তন [illegible] সারিবদ্ধভাবে সভায় প্রবেশ করিত—সর্বাগ্রে প্রাক্তনতম রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

৯ই পৌষ একটা স্মরণ-উৎসব ছিল। আশ্রমের যে সব ছাত্র, অধ্যাপক, কর্মী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের শ্রাদ্ধ-তিথি উপলক্ষ্যে হবিষ্যান্ন গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল।



শীতের শালবীথি

দুর্দৈব

উৎসব ও দুর্দৈবের মধ্যে একটি দিনের মাত্র ভেদ। ১০ই কি ১১ই পৌষ বার্ষিক ক্লাস-প্রোমোশনের পালা। সকলে ক্লাস অনুসারে সারিবন্দীভাবে দাঁড়াইতাম, সর্বাধ্যক্ষ মহাশয় উন্নীত ছাত্রদের নাম ডাকিয়া যাইতেন। যাহারা অনুন্নীত থাকিত, তাহারা দু-চার দিনের জন্য লজ্জায় আত্মগোপন করিত। কিন্তু আমাদের খুব বেশি লজ্জা হওয়ার কথা নয়। পড়াশুনোটা জীবনের মুখ্য নয়, এমনকি পড়াশুনোর জন্যই এখানে আসি নাই, এই কথাগুলো এতবার এতভাবে শুনিয়াছিলাম যে, ফেল হইলে লজ্জার ভাবটা একরকম কাটিয়া গিয়াছিল। এমনকি এক-একবার সন্দেহ হইত, অনেকে বোধ করি ফেল করাকে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে উন্মুখ ছিল। তাছাড়া, বছরে বছরে নিয়মিত পাশ করিয়া গেলে শীঘ্রই এমন প্রিয়স্থান ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এমন আশঙ্কাও যে কারো কারো মনে ছিল না তাহা নয়।

কিন্তু ইহার বিপরীত ঘটনাও কখনো কখনো ঘটিত। একবার ব্যাপার মারাত্মক আকার ধারণ করিল। সেবার আমরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিই, আমাদের সঙ্গে পড়িত দ্বিজেন পাল। তখন আমাদের টেস্ট পরীক্ষা দিয়া আসিতে হইত চুঁচুড়াতে

স্কুল ইন্সপেক্টরের অফিসে। যাহারা পাশ করিত, তাহাদের নামে পরীক্ষা দিবার একখানা করিয়া অনুমতি-পত্র সেই অফিস হইতে পাঠাইয়া দিত।

দ্বিজেনের সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে ঝগড়া হইত, একদিন বোধ হয় দু-এক ঘা চড়ও মারিয়াছিল। বাহুবল দুর্বলের শক্তি নয় জানিয়া তাহাকে জব্দ করিবার অন্য পন্থা খুঁজিতে লাগিলাম। ভজু নামে আমার আর এক সহপাঠী পরামর্শ দিল, দ্বিজেনের অনুমতি-পত্রখানা লুকাইতে হইবে। বোধ করি ভজুও দু-একটা চড় খাইয়া থাকিবে। আমরা জানিতাম দ্বিজেন পাশ-ফেল সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, কিন্তু তাহার তীব্রতা যে কতখানি, তাহা কেহই জানিতাম না। যথাদিনে আমরা সকলেই ডাকঘরে গেলাম, সকলের নামেই চিঠি আসিল, দ্বিজেনের নামে আসিল না। এমন সাধে বাদ সাধিল দেখিয়া ইন্সপেক্টরের উপর আমাদের রাগ হইল। দ্বিজেন কোথায় গেল কেহ খোঁজ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিল না।

ঘণ্টা দুই পরে বোলপুর স্টেশন হইতে সংবাদ আসিল শান্তিনিকেতনের কাছে রেল লাইনে একজন কাটা পড়িয়াছে। সকলে রেল লাইনের দিকে ছুটিলাম, লাইনটা সেখানে খাদের ভিতর দিয়া গিয়াছে। উপরে দাঁড়াইয়া নীচে চাহিলাম, গাছপালা ছিল বলিয়া সব দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু সবটা দেখিবার প্রয়োজনও ছিল না, এক পাশে রক্ষিত দ্বিজেন পালের চাদরখানাই যথেষ্ট।

প্রথমেই মনে হইল ভাগ্যে তাহার চিঠি আসে নাই। সে চিঠি লুকাইলেও এই ব্যাপার হইত! কোন দিন কি আর নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিতাম! পরের দিন দ্বিজেনের নামে অনুমতিপত্র আসিল। মাখন নামে তার এক ভাই নীচের ক্লাসে পড়িত, সে অন্ত্যেষ্টিসমাধা করিল।

পরদিন মাখনের ঘরে গেলাম, দেখি সে কেমন আছে। সেখানে গিয়া দেখি তার তিন চারজন সহপাঠী তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গীতাপাঠ করিয়া শুনাইতেছে, নিছক সংস্কৃত শুনিয়া পাছে সান্ত্বনা পাইতে অসুবিধা হয় তাই বোধ-সৌকর্যার্থে অনুবাদও করিয়া দিতেছিল। এমন সময় একটা ধাতুরূপে ঠেকিয়া গেল—টীকাতেও কুলাইল না। প্রধান উপদেষ্টা শমীনাথ বেগতিক দেখিয়া বলিল—দেখ দেখি একবার ব্যাকরণ কৌমুদীখানা। হায় কে জানিত গাম্ভীর্যের চূড়া হইতেই এক পা ফসকাইলেই একেবারে হাস্যকরতার অতলস্পর্শী খাদ! ব্যাকরণ কৌমুদী সহযোগে মৃত্যুসান্ত্বনা আমার কাছে এমনই হাস্যকর মনে হইল যে পাছে তাহার গাম্ভীর্য নষ্ট করিয়া ফেলি সেই ভয়ে স্থান ত্যাগ করিলাম। উপদেষ্টাদের দোষ দেওয়া যায় না—তাহারা শুনিয়াছে গীতা সর্বরোগের মকরধ্বজ। কিন্তু কঠিন ধাতুরূপ যে নিরপেক্ষ। উৎসবের আনন্দ ও মৃত্যুর শোক উভয়ের প্রতিই সে সমান নির্বিকার! তাহার খোঁজ কে রাখিত!

শীতের ভ্রমণ

নূতন বৎসরের ক্লাস আরম্ভ হইতে জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ হইত। উৎসবের পর হইতে এ পর্যন্ত ছুটি। অল্প দিনের ছুটি বলিয়া ছেলেরা বাড়ি যাইত না। কাছে যাহাদের বাড়ি, তাহাদের অনেকেই যাইত বটে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে এ সময়ে নানা দলে বিভক্ত হইয়া এক এক দিকে বেড়াইতে যাইত। অধিকংশ দলই হাঁটিয়া যাইত;



৭ই পৌষের মেলায় বাউল

কোন কোন দল রেলে করিয়া বেড়াইয়া আসিত।

এই সময়ে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের পীঠস্থানে প্রকাণ্ড মেলা বসে, অনেকে সেখানে যাইত। আবার নান্নুরে চণ্ডীদাসের পীঠস্থানও অনেকের আকর্ষণের বস্তু ছিল। বীরভূম এক সময়ে হয়তো বীরভূমি ছিল, কিন্তু চিরকালের জন্য ইহা কবিভূমি নামে পরিচিত হইয়াছে; জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও ভানুসিংহ ঠাকুর।

এই সময়ে আমিও অনেক বার দল লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, কিন্তু মেলা দেখিবার জন্য কোন দিনই আমার তেমন ঝোঁক ছিল না। দেশে দেশে মানুষ দেখিয়া বেড়াইলেই যে মানুষে মানুষে সৌহার্দ বৃদ্ধি পায়, এ বিশ্বাস আমার নাই। ইহা সত্য হইলে রেল, জাহাজ, মোটর, টেলিগ্রাফের যুগ পৃথিবীতে মানব সৌহার্দের সত্য যুগের অবতারণা করিত। এখন মানুষ দেশে বিদেশে ছুটিয়া বেড়ায় বটে কিন্তু তাহা মানুষের পরিচয় পাইবার জন্য নয়, কোথায় কি অপহরণযোগ্য ঐশ্বর্য ... সেই সন্ধানে। নিছক জ্ঞানের জন্য ... রেস্টে আরোহণ করিয়া আজিও ... সফল হইল না, কিন্তু হঠাৎ যদি ... যায় যে, ওখানে হীরক বা প্লাটিনামের আছে তাহা হইলে কালই প্রতাপশালী রাজা চতুরঙ্গ বাহিনী সাজাইয়া হিমা... তলদেশে উপস্থিত হইবে। ইউ... আমেরিকার লোকরাই সব চেয়ে ভ্রমণ... কিন্তু তাহারাই যে সব চেয়ে বড় ... প্রেমিক—ইহা কে স্বীকার করিবে? ... দেশে মানুষ দেখিয়া বেড়াইলে ... মানুষে মানুষে অনৈক্যটাই চোখে ... বর্ণে, ভাষায়, আচারে, সংস্কৃতিতে। ফলে হয় এই যে, সব মানুষ যে এক... অজ্ঞাতসারে এই অনুভূতিই মজ্জার... বসিয়া যায়। আর সব মানুষে এক... হইলে ছোট বড় ভাল মন্দর প্রশ্ন ... আসিয়া পড়ে। একটা জাতিকে নিম্ন... স্তরের বলিয়া বোধ হইলে তখন ... উন্নতি করিবার ইচ্ছা জাগে। অপর ... উন্নতি করিবার অপর নাম লুণ্ঠন, অপ... অপঘাত, দাসীকরণ। এক হাতে বাই... দান করিয়া অপর হাতে সোনার খনি ... এক হাতে বিজ্ঞানের সূত্র দান করিয়া ... হাতে রেশম ও তুলা অপহরণ, এক ... সেক্সপীয়র দান করিয়া, অবাধ্য ... পল্লীতে জমি প্রদান সুলভ মূল্যে ... পণ্য কিনিয়া লইয়া কৃষ্ণাঙ্গদের উপর ... জন্য উচ্চ মূল্যে ওভারকোট বিক্রয়—ই... তো ইউরোপীয় সভ্যতার পরিচয়—ই... রোপীয় সভ্যতা দুই দিকে ধার তলোয়া... মতো দ্বিগুণ মারাত্মক।

বরঞ্চ যখন প্রাচীনকালে মানুষ ... বিদেশে ভ্রমণ করিবার সুবিধা পায় ... নিজের গ্রামের মধ্যেই সারা জীবন কাটা... বাধ্য হইত, তখন প্রত্যক্ষ দর্শনের অভ... কল্পনায় পূরণ করিয়া লইত। ... কল্পনায় দেখিত পৃথিবীর সর্বত্রই মন... একই রকম, কাজেই মানুষের অন্তর্নি... ঐক্যটাই তাহাদের অনুভূতিগম্য ... সব মানুষই যে একই রকম, ছোট বড় ... মন্দ নাই। ইহা মানিত বলিয়াই সভ্য... প্রচারের নামে অপর দেশ ধ্বংসে করি... তাহারা ভগবৎ-আদিষ্ট হইয়া কখনো অগ্রস... হইত না। ইন্দ্রিয়ের প্রতি অত্যধিক আ... রেনেসাঁসের লক্ষণ; ইন্দ্রিয় বাহির... দেখাইতে পারে; বাহিরের বিচারে মানু... মানুষে ভেদ; বর্তমান যুগ সেই ... ভেদের সমস্যার যুগ; আমরা নিজ নি... ভেদের পরিখার মধ্যে বিদ্বেষের আগ্নেয়... হাতে করিয়া অপরের পরিখাশায়ী শত্রু... দিকে অনবরত অন্ধকারে গুলী ছুঁড়...

যাইতেছি। ইহারই বৈজ্ঞানিক নাম জীবন সংগ্রাম। মানুষের উন্নতি হয় নাই একথা বলা অন্যায়; মানুষ আদিম বর্বরতা হইতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক বর্বরতার হিরন্ময় যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

গ্রীষ্মের ছুটির অপেক্ষায়

নূতন বছরের ক্লাস আরম্ভ হইল কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটি আর আসে না। গ্রীষ্মের ছুটির পরে পূজার ছুটি পর্যন্ত মাস তিনেক কাল দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইত, কিন্তু পূজার ছুটির পর হইতে গরমের ছুটি প্রায় ছমাসের ধাক্কা, দিন আর কাটিতে চায় না।

পৌষ মাস গেল শালপাতা ঝরিতে আরম্ভ করিল; মাঘ মাস আসিল আমের মুকুল ধরিল, ফাল্গুন মাসে শালের কচি পাতা উঁকি মারিল; ইহারা যেন অঙ্কুর দণ্ড লাগি [illegible] উত্তাপ ঠেলিয়া আমাদের [illegible] ছুটির ঘড়ির দিকে লইয়া চলিয়াছে। উঃ কত দূরে!

অবশেষে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িল। বিকাল বেলার ক্লাস একে আর সম্ভব নয়, এত গরম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, শান্তিনিকেতনে ক্লাস দুই বেলা হয়, একবার সকালে একবার বিকালে, মাঝখানে বিরাম। বিকাল বেলার ক্লাস বন্ধ হইয়া কেবল সকালে ক্লাস চলিতে লাগিল। ইঁদারার জল কমিয়া আসিল, মধ্যাহ্নে স্নান শুরু হইল। তরকারীর [illegible] কমে [illegible] পাইয়াছে। এখন চালাইতেছে ডাল-ভাত, সজনের ডাঁটার শাক। দুধ বিশুদ্ধ হইয়া ঘোল নাম ধরিয়াছে।

শহরের দিক হইতে কানাঘুষায় আভাস পাই, এবারে কি অভিনয় হইবে, কখনো শুনি 'রাজা', কখনো শুনি 'অচলায়তন'। অধ্যাপক মহলের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, কবে ছুটি দেওয়া যায়। কেহ বলেন বৈশাখের প্রথমে এবারে এত গরম; কেহ বলেন, ২৫শে বৈশাখের পরে—এবারে গুরুদেবের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি।

—জলের কি হইবে? ইঁদারা যে শুকাইল।

—ছেলেদের বাঁধে স্নান করিতে পাঠাও। ইঁদারার জলে রান্না ও পান চলিবে।

অবশেষে একদিন পাকা রকমে শুনিলাম, ছুটি ২৫শে বৈশাখের পরে। ছুটি বিলম্বে হইল বটে কিন্তু গুরুদেবের জন্মোৎসব হইবে, কাজেই কাহারো বিশেষ দুঃখ হইল না।

ঢাকা, ত্রিপুরা প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলের ছেলেরা ইতিমধ্যেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; এই ব্যস্ততাও যাওয়ার আনন্দের রূপান্তর। কেহ কেহ বা একখানা সাদা খাতা বাঁধিয়া ফেলিল। পথের স্টেশনগুলোর নাম লিখিবে। প্রয়োজনের হিসাবে ইহা একেবারে নিরর্থক, আর টাইম টেবল হইতে অনায়াসে নামগুলা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পথের আনন্দটিকে পর্বে পর্বে চিহ্নিত করিয়া দীর্ঘতরভাবে ভোগ করিবার জন্যই ইহার আয়োজন। সমযাত্রী ছেলেরা এখানে ওখানে বসিয়া প্রায়ই সলাপরামর্শ করে। গোয়ালন্দের কোন্ হোটেলটা ভালো এ বিষয়ে মতভেদ ঘটিলেও বেশিক্ষণ অনৈক্য থাকে না, যাওয়ার আনন্দে বাদী প্রতিবাদী অবিলম্বে আপোষ করিয়া ফেলে। কলিকাতা প্রভৃতি কাছের যাত্রীদের প্রতি দূরের যাত্রীদের কি অবজ্ঞা। তাহাদের সঙ্গে ভালো ভাবে কথাও বলে না। ভাবটা আমরা এখন



পাহাড়ের উপর মহর্ষির উপাসনার বেদী

বড় ব্যস্ত, তোমাদের মতো সুখের যাত্রা আমাদের না; তোমাদের চিন্তা নাই, কিন্তু আমাদের এখন বড়ই উদ্বেগে দিন কাটিতেছে। দুঃখের কষ্টে মানুষ কখনই বাঁচিতে পারে না, যদি না দুঃখের সঙ্গে দুঃখের গৌরব না থাকিত।

বসন্ত রাত্রির বৈতালিক

গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে আরামের সময়টি রাত্রি। গরমের জন্য সকলেরই ঘরের বাহিরে শুইবার ব্যবস্থা। তক্তপোষখানা টানিয়া মাঠের মধ্যে আনিয়া চারখানা বাখারি বাঁধিয়া মশারি টাঙাইবার বন্দোবস্ত। এমনি করিয়া মাঠের মাঝে শাল গাছের ছায়ায়, বহু তক্তপোষ পড়িয়া গিয়াছে। সারাদিন রোদে পুড়িয়া রাত্রে সে কি স্নিগ্ধ বিরাম। সূর্য ডুবিতেই পশ্চিম হইতে হাওয়া ওঠে; সেই হাওয়ার উপরে সোয়ার হইয়া ধূলিকণা বালক ক্রুজেডারদের মতো প্রবল বেগে সর্বনাশের মুখে ছুটিয়া চলে। কিন্তু আমাদের কি তাতে হুঁস আছে। কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া গল্প করিতেছি, কেহ-বা আপন মনে গান জুড়িয়া দিয়াছি। এমনকি অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ছাত্রের মনেও পড়া হইল না বলিয়া বিবেক দংশন করিতেছে না।

একটা কোকিল বসিয়াছে আমবাগানের কোন্ গাছে, আর একটা নিশ্চয় ওই শিরিষ শাখায়। দুটিতে উত্তর-প্রত্যুত্তরের কুহু-বিনিময়ের মাকু ছুঁড়িয়া সুরের সূক্ষ্ম মসলিন বুনিয়া তুলিতেছে। বাতাস একটু পড়িতেই শালফুলের গন্ধ আকাশের ভাঁজে ভাঁজে জমিয়া চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করে। এমন সময়ে সাঁওতাল গ্রামের ঊর্ধ্বে বিলম্বিত পথিকের মতো কৃষ্ণপক্ষের ক্লান্ত চন্দ্রের আবির্ভাব। পুষ্পিত শাল বীথিকার শীর্ষ পুরাতন হস্তীদন্তের মতো ঘন শুভ্র! মুকুলের মধ্যে মসৃণ আমের পাতা বর্শাফলার মতো উজ্জ্বল। আর অন্ধকার বনভূমিতে পরিবর্তনশীল ওই সাদা-কালো দাগ, না জানি কোন্ শিখনপ্রয়াসী দেব-শিশুর স্লেটের পটে আঁকা অপটু হাতের প্রথম হাত [illegible]।

দূর হইতে সুর ভাসিয়া আসিল, ওই যে বৈতালিক দল গান আরম্ভ করিয়াছে! ও কাহারা চলিয়াছে আলো-ছায়ার ভাঁজে ভাঁজে শাল বীথিকার তলে তলে, ঝরা-পাতার মঞ্জীর যাহাদের পায়ে পায়ে ধ্বনিত, ঝুরে-ঝরা ফুলের মধু অনেকক্ষণ যাহাদের পদতল ঘিরিয়া সুনিপুণ অলক্তক রেখায় আঁকিয়া দিয়াছে। 'বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হলো উতলা।' কোকিল দুটি প্রতিযোগিতা ছাড়িয়া ওই গানের সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য সহযোগিতা করিতেছে। বাতাসে বনভূমি নড়ে, ছায়ার দোল-রজ্জুতে জ্যোৎস্না যেন ওই গানের তালে তাল রাখিয়া দুলিতেছে।

'আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান দুলিছে নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা।'

কাহাদের স্রস্তকেশে এতক্ষণ শাল ফুল ঝরিল, কাহাদের কবরীর রক্তকরবী অন্ধকারের পথকে চিহ্নিত করিয়া করিয়া রাখিয়া গেল, কাহাদের সুরে মানুষে প্রকৃতিতে বাণী বিনিময় ঘটিল।

'আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন নিদ্রা ভুলিছে,
আজি আমার হৃদয় দোলায় কেগো দুলিছে?'

তখন কেবল আলো-ছায়ার দোরোখা আস্তরণের তলে শুইয়া সম্মিলিত সুরের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া পরিচিত কণ্ঠটি অনুধাবন করিবার প্রয়াসে ছুটিতে ছুটিতে অজ্ঞাতসারে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সুষুপ্তির মধ্যে অকস্মাৎ কখন আত্মবিস্মরণ!

গান দূরতর, বাতাস মৃদুতর, চারিদিক প্রায় নীরব। শাল বীথিকার পূর্বতম প্রান্ত

(শেষাংশ ১১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিদুষী ভার্যা

— শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় —

৩

পাঞ্জাব মেল হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল।

নিজের চিন্তাস্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া যূথিকা বলিল, "তুমি বলছ, একজন এম্‌ এ পাশ করা মেয়ে যখন মনে করে তার স্বামীকে ভালবাসে, তখন কিন্তু সে আসলে ভালবাসে তার স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিকে। কিন্তু এমন একজন মেয়ে, যে এম্‌ এ পাশ কেন, কোনো পাশই করেনি, ধর যাকে এক রকম নিরক্ষরই বলা চলে, সে যখন ভালবাসে তার স্বামীকে, তখন কি সে তার স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিকেও ভালবাসে না?"

দিবাকর বলিল, "নিশ্চয় ভালবাসে,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তার স্বামীকেও ভালবাসে। সে তার স্বামীকে ধনবান মনে করে, কিন্তু মূর্খ মনে করে না। তুমি জান না যূথিকা বিদ্যের অমিলের চেয়ে বড় অমিল আর নেই। যারা বিদ্বান, যারা পণ্ডিত, যারা ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখেছে, তারা মূর্খ লোকদের সঙ্গে একটা বড় রকমের অন্তরের যোগ কখনো সৃষ্টি করতে পারে না। বিদ্যেটা বাইরের জিনিস ত' নয়, অন্তরের জিনিস। অন্তরে সহজে কেউ নিজেকে খাটো করতে চায় না। তাই পণ্ডিত লোকে মূর্খ লোককে দয়া করতে পারে, করুণা করতে পারে, এমন কি কখনো বা ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেও পারে,—কিন্তু ভালবাসতে পারে না।"

যূথিকা বলিল, "এ কিন্তু তুমি ভুল বলছ। আজকালকার কথা না-হয় ছেড়ে দাও, চিরকাল বিদ্বান স্বামীরা তাদের মূর্খ স্ত্রীদের ভালবেসে এসেছে।"

দিবাকর বলিল, "তা'ত এসেইছে। আজকালকার কথাও ছাড়বার দরকার নেই, আজকালও বাসে। আমি এ পর্যন্ত সেই কথাটাই তোমাকে অন্যরকমে বোঝাবার চেষ্টা করছি। বিদ্যে, বুদ্ধি, শারীরিক বল—এই সব ব্যাপারে স্ত্রীরা স্বামীদের চেয়ে একটু খাটো হয়, প্রত্যেক স্বামীই তা ইচ্ছে করে। শুধু তাই নয়,—পুরুষের চক্ষে স্ত্রীলোকের মাধুর্যের একটা অংশই হচ্ছে এই সব গুণের অল্পতা। লতার মতো স্ত্রী জড়িয়ে থাকে, স্বামী তাই চায়; লম্বা তাল-গাছের মত খাড়া হ'য়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে,—তা চায় না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

দিবাকরের কথোপকথনের ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া যূথিকার হেমেন্দ্রর কথা মনে হইতেছিল; বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠে সে বলিল, "দেখ, তুমি যেসব কথা বলছ, আর যে রকম ক'রে বলছ,—আমি নিশ্চয় বলতে পারি, আমাদের দেশের এম-এ পাশ করা লোকদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনেও তেমন পারে না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল, বলিল, "সৌভাগ্যক্রমে এম-এ পাশের বিষয়ে তোমার ধারণা নেই, তাই এ কথা তুমি বলতে পারলে। কলকাতার সেই ম্যাট্রিক পাশ করা মেয়েটিকে এইজন্যেই আমি বিয়ে করতে রাজি হইনি, যদিও অন্য কোনো দিক থেকে তাকে অপছন্দ করবার কারণ ছিল না। সে কখনো আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবতেও পারত না, বলতেও পারত না।" ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া বলিতে লাগিল, "কেন তুমি পাশ করা মেয়েদের পক্ষ নিয়ে ওকালতি করছ, তা আমি বুঝতে পারছি যূথিকা। কিন্তু বিশ্বাস কর আমাকে এ বিষয়ে এমন ক'রে আমার মন পরীক্ষা ক'রে দেখবার কিছু-মাত্র দরকার নেই। তুমি যে বেশি লেখা-পড়া করোনি, তার জন্যে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়ো না। করোনি তাই রক্ষে! যদি করতে, তাহ'লে—" বাকিটুকু কোন্‌ ভাষায় কেমন করিয়া বলিলে যূথিকাকে পীড়া দেওয়া হইবে না, সহসা তাহা ভাবিয়া না পাইয়া দিবাকর থামিয়া গেল।

ব্যগ্রকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "তা হ'লে কি হ'ত?"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া দিবাকর বলিল, "তা হ'লে কি হ'ত তা বলতে পারিনে; কিন্তু তা হ'লে যা না হ'তে পারত, তার কথা ভেবে দুঃখ বোধ করছি।" বলিয়া যূথিকাকে দৃঢ়তর বেষ্টনে আবদ্ধ করিল।

এ কথার উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া যূথিকা নীরবে বসিয়া রহিল।

দ্রুতগতিশীল পাঞ্জাব মেল মাইলের পর মাইল পশ্চাতে ফেলিয়া শটশট শটশট শব্দ করিতে করিতে সুদূর বঙ্গদেশের অভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছে। তাহারই এক কক্ষে নব-বিবাহিত দম্পতি নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন হইয়া বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

মৌন ভঙ্গ করিল দিবাকর; বলিল: "মেয়েদেরও অল্প একটু ইংরিজি জ্ঞান থাকা ভাল। তুমি ইংরিজি কতটা জান তা জানিনে। যদি দরকার মনে কর ত সময় মত অল্প একটু শিখে নিতেও পার। আমি আছি, তা ছাড়া নিশা আছে। নিশা বি-এ পড়ছে—শুনেছ বোধহয়?"

মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "শুনেছি।"

"বি-এ-তে নিশা আবার ইংরিজিতে অনার্স নিয়েছে। অনার্স কাকে বলে জান?"

এবার যূথিকা কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দিবাকর বলিতে লাগিল, "অনার্স মানে সম্মান। বি-এতে ইংরিজিতে মামুলি যে-সব বই আছে, তার ওপর আরও অনেক শক্ত শক্ত বই প'ড়ে পাশ করলে তাকে অনার্সে পাশ করা বলে। নিশা সেই অনার্সের পড়া পড়ছে। ওকে ত' ইংরিজিতে বেশ পণ্ডিতই

বলা চলে। এবার অবশ্য ওর দ্বারা কিছু হওয়া সম্ভব হবে না। কাজকর্ম চুকে গেলে আমার কাছেই না হয় একটু-আধটু পড়তে আরম্ভ কোরো। তারপর পুজোর ছুটিতে নিশা এসে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যেতে পারবে।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ইংরিজি ফার্স্টবুক সেকেন্ডবুক পড়েছ কি?"

অতিকষ্টে যূথিকা বলিল, "এ সব কথা এখন থাক্।"

ব্যগ্রস্বরে দিবাকর বলিল, "নিশ্চয় থাক্। তুমিই ত' ওসব কথা তুললে যূথিকা, আমি ত তুলিনি। এবার তা হ'লে বার করি তোমার এসরাজ আর সেতার?"

যূথিকা বলিল, "আর একটু পরে। তার আগে তোমাকে একটা কথা বলব।"

ব্যস্ত হইয়া দিবাকর বলিল, "আবার কি কথা? না, না, ও কথাও এখন থাক। এখন কথা চলুক এসরাজে আর সেতারে।"

ডিস্টান্ট সিগন্যাল পার হইয়া গাড়ির গতি মন্দ হইয়া আসিতেছিল; যূথিকা বলিল, "অমৃতসর বোধহয় এল। আচ্ছা অমৃতসরের পরে বলব'খন।"

দেখিতে দেখিতে গাড়ি জনাকীর্ণ কলকোলাহলময় অমৃতসরের প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইল। দিবাকর ও যূথিকা পরস্পর হইতে একটু দূরে সরিয়া বসিয়া যাত্রিগণের উঠা-নামার ব্যস্ততার দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়াছে, গার্ড প্রথম হুইস্‌ল দিয়াছে এমন সময়ে গৌরবর্ণ পলিতকেশ একটি সম্ভ্রান্ত-দর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দিবাকরদের কামরার সম্মুখে আসিয়া সানুনয় কণ্ঠে বলিলেন, "বাবুজি, কোথাও জায়গা মিলল না। মেহেরবানি ক'রে আপনার কামরায় যদি একটু আশ্রয় দেন?"

দিবাকর বলিল, "আমি কিন্তু সমস্ত কামরাটা রিজার্ভ করেছি।"

পশ্চিমা ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তা' জানি, সেই জন্যেই আশ্রয় চাচ্ছি। বেশীক্ষণ থাকব না, রাত দশটায় লুধিয়ানায় নেমে যাব।" তারপর যূথিকার প্রতি চাহিয়া মিনতিনম্রস্বরে বলিলেন, "মাঈ, তুমি হামার লড়কির সমান, হামি বুড্ঢা মানুষ একদিকে প'ড়ে থাকব। বহুৎ ভারী দরকার আছে মাঈ, দয়া করো।"

গার্ডের দ্বিতীয় হুইস্‌ল বাজিল। দৌড় দিবার অভিপ্রায়ে এঞ্জিন ধ্বনিময় হইয়া উঠিল।

দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা মৃদুস্বরে বলিল, "আসতে দাও।"

আর আপত্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দিবাকর দরজা খুলিয়া দিল।

পশ্চিমা ভদ্রলোকটি কামরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পিছনে পিছনে প্রবেশ করিল তাঁহার এক প্রৌঢ় পরিচারক। কুলি যখন ভদ্রলোকের সুটকেশ এবং হোল্ড-অল গাড়ির ভিতর ঠেলিয়া ঢুকাইয়া দিল তখন গাড়ি ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বেঞ্চে বসিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া দিবাকর এবং যূথিকার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, "ধন্য বাবুজি, ধন্য মাঈ, আপনারা হামার প্রতি বহুৎ কৃপা করেছেন।"

দিবাকর বলিল, "না, না, এমন কিছুই আমরা করিনি যার জন্যে এ কথা আপনি বলতে পারেন। আর, যদি কিছু ক'রে থাকেন ত উনিই করেছেন।" বলিয়া যূথিকাকে দেখাইয়া দিল।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সে বাত ত হামি ফওরন্ বুঝেছিলাম বাবুজি। লেকিন আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে সেরেফ মাঈকে দিলে মাঈ ত প্রসন্ন হোবেন না।" বলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

দিবাকরও হাসিতে লাগিল, এবং যূথিকার মুখেও নিঃশব্দ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

কথায় কথায় পরস্পরের পরিচয় গ্রহণের পর জানা গেল ভদ্রলোকটির নাম ব্রিজবিহারী সিং, নিবাস লুধিয়ানা। সেথায় তাঁহার তেজারতি এবং শীত-বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার।

চাকরটি ব্রিজবিহারী সিং-এর হোল্ড-অল হইতে বিছানা বাহির করিতে ব্যস্ত ছিল। দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে?"

ব্রিজবিহারী বলিলেন, "এটি রামভরোখা লাল, হামার খাওয়াস আছে বাবুজি।"

খাওয়াসের অর্থ দিবাকরের জানা ছিল না, জিজ্ঞাসু নেত্রে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

অনুচ্চকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "চাকর।"

মৃদুস্বরে বলিলেও এ কথা ব্রিজবিহারীর শ্রবণ অতিক্রম করিল না; আনন্দিত কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, চাকর। মাঈ হামাদের হিন্দী বোলি সমঝায়; বাবুজি বিলকুল বাঙালী আছেন।' বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া দিবাকর বলিল, "হাঁ সিংজি, আমি বিলকুল বাঙালী আছি।"

"হোল্ড-অল হইতে প্রভুর শয্যা বাহির করিয়া রামভরোখা লাল বেঞ্চের উপর ভাল করিয়া পাতিয়া দিল। তাহার পর ব্রিজবিহারী শয্যায় উপবেশন করিলে গাড়ির মেঝের উপর প্রভুর পদতলে বসিয়া মৃদুস্বরে কি জিজ্ঞাসা করিল।

অস্পষ্ট অনুচ্চকণ্ঠে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রিজবিহারী বলিলেন, "দেখলেন ত' বাবুজি, এক মিনিটও ওয়কৎ ছিল না, তাই রামভরোখাকেও আপনার গাড়িতে তুলে নিতে হ'ল।" তাহার পর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কিছু যদি মনে না করেন, তা হ'লে আপনাদের কাছে একটা প্রার্থনা করি।"

দিবাকর বলিল, "কি বলুন?"

ব্রিজবিহারী বলিলেন, "এই বুড্ঢা আদমির বহুৎ জোর বাতের বিমারি আছে বাবুজি। সন্ঝাকালে একটু গোড় হাত মলিয়ে না নিলে, তামাম রাত ভারি কষ্ট হোয়। আপনারা কৃপা ক'রে যদি ইজাজৎ দেন তা হ'লে রামভোরখাকে দিয়ে একটু গোড় হাত মলিয়ে নিই।"

(শেষাংশ ১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তক্ষশীলার পথে

পূর্বানুবৃত্তি

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

খৃষ্টীয় পঞ্চাশ শতাব্দীর শেষার্ধে পশুস্বভাব হূনগণ আসিয়া তক্ষশিলাস্থিত সকল বৌদ্ধমঠ ধ্বংস করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসমূহকে হত্যা করে। একটি স্তূপে গ্রীক রাজা জয়িলাশের (Zoilus) ২৮টি রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রধান স্তূপের বিপরীত দিকে একটি বিহারে একটি প্রস্তর-পাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই পাত্রের মধ্যে একটি রৌপ্যময় দীর্ঘ পাত্র ছিল। এই রৌপ্যপাত্রে খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে খরোষ্টি অক্ষরে রৌপ্যপত্রে লিখিত একটি লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপি হইতে জানা যায় যে, উপরোক্ত রৌপ্য-পাত্রের মধ্যে যে স্বর্ণকৌটা ছিল তাহাতে ভগবান বুদ্ধের মহাস্থি রক্ষিত হইয়াছিল। অধ্যাপক স্টেনকনো (৭) (Sten Konow) রৌপ্য-পত্রে লিখিত লিপিটি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করিয়া তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

"আষাঢ় মাসের পঞ্চদশ দিবসে আজেশ অব্দের ১৩৬ সালে ভগবান বুদ্ধের Relics নাওকা নগরের অধিবাসী ইমতবহ নামক জনৈক ব্যাকট্রিয়ানের বংশধর উরশক কর্তৃক এই স্থানে প্রোথিত হইল। উরশক তক্ষশিলা-স্থিত ধর্মরাজিকা-স্তূপ-সংলগ্ন বোধিসত্ত্ব বিহারে ভগবান বুদ্ধের Relics প্রোথিত করিলেন। ইহা মহারাজ কুশানের স্বাস্থ্য-লাভের জন্য, সকল বুদ্ধের সম্মানার্থ, প্রত্যেক বুদ্ধের সম্মানের জন্য, সকল অর্হতের সম্মানের জন্য, সকল প্রাণীর সম্মানার্থ, স্বীয় মাতাপিতার সম্মানার্থ, স্বীয় জ্ঞাতিকুল-স্বজনবর্গ-পরামর্শদাতাগণ এবং বন্ধুবর্গের সম্মানার্থ এবং নিজ স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত। এই মহাদান আমাকে নির্বাণগামী করুক।"

একটি বিহারের দেওয়াল গাত্রে গৌতমের কপিলাবাস্তু হইতে মহানিষ্ক্রমণ প্রভুর নিকট হইতে অশ্ব কণ্টকের বিদায় গ্রহণ—এই দুইটি চিত্র আছে। দ্বিতীয় চিত্রটিতে দেখা যায় কণ্টক নতজানু হইয়া গৌতমের পদ-চুম্বন করিতেছে এবং তাহার উভয় দিকে ছন্দক, বজ্রপাণি এবং অন্য একজন দণ্ডায়মান। তক্ষশিলায় গান্ধার স্থাপত্যের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলেও লিপিযুক্ত অধিক বস্তু পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র একটি প্রস্তর-প্রদীপে খরোষ্টি অক্ষরে খোদিত একটি লেখা পাওয়া গিয়াছে। এই লেখা হইতে জানা যায়, এই প্রদীপটি ভিক্ষু ধর্মদাস কর্তৃক তক্ষশিলার ধর্মরাজিকা দেব-স্থানে প্রদত্ত। প্রধান স্তূপের চৈত্য বিহারটি কার্লী, অজন্তা, ইলোরা এবং অন্যান্য বৌদ্ধ-স্থানে আবিষ্কৃত চৈত্যের ন্যায়। একটি চৈত্য প্রকোষ্ঠের মেজে কাঁচের টাইল (Glass tiles) দ্বারা নির্মিত। টাইলগুলি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল ও মোটা কাঁচের এবং কালো, নীল, শ্বেত এবং পীত বর্ণের। টাইলগুলি ১০½ ইঞ্চি দীর্ঘ ও প্রস্থ এবং ১½ ইঞ্চি পুরু। কাঁচের টাইল নির্মিত এইরূপ পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন ভারতে আর পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এক কালে উত্তর ভারতে কাঁচের টাইল ব্যবহৃত হইত। চীন দেশে একটি প্রবাদ



শির্কাপে প্রাপ্ত রৌপ্য পাত্রাদি

আছে যে, কাঁচ নির্মাণ শিল্প উত্তর ভারত হইতে চীনদেশে আসিয়াছিল। এই প্রবাদ যে কত সত্য তাহা তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত কাঁচের টাইল হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

ধর্মরাজিকা স্তূপের দক্ষিণ-পূর্বে মার্গালা পাহাড়ের ক্রোড়ে অবস্থিত খুরম্ প্রাচা এবং খুরম্ গুজার নামক দুইটি গ্রাম। এই দুইটি গ্রামের মধ্য দিয়া কিছু দূরে পার্বত্য পথে গমন করিলে গিরি নামক স্থানে যাওয়া যায়। এই স্থানে একটি জলের প্রস্রবণ আছে। ইহার দক্ষিণে দেড় হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়। স্থানটি জনশূন্য, ঝড় বাতাস হইতে রক্ষিত, বহির্জগত হইতে পৃথকীকৃত এবং জলপ্রবাহ হইতে অদূরে অবস্থিত। এই স্থানে দুই শ্রেণী স্তূপ ও মঠ আছে। স্থানটি দুর্গের ন্যায় প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত বলিয়া এখানে অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিয়া নির্বাণ লাভের জন্য জীবনপাত করিত। হাথিয়াল, জাউলিয়ান, মোহরা মোরাদু এবং বাজরান প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ মঠস্থ সহস্র সহস্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পঞ্চম শতাব্দীতে পলায়ন করিয়া গিরি মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। গিরি মঠ হইতে তাহারা মুরী পাহাড়ের দুর্গম স্থানে লুকাইত থাকিয়া শ্বেত হূনদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিত। এই স্থানের বিধ্বস্ত গুহাবলী পরিষ্কার করিয়া লোহার পেরেক, কব্জা, সূচ, তীরের মাথা, কাঁচের বালা, পাথরের মালার দানা, হাতী দাঁতের বালা, ঘণ্টার হাতা, চামচ, লোহার হাতুড়, স্বর্ণালঙ্কার, লোহার এবং কাঁচের মালা-দানা এবং শাঁখা প্রভৃতি গৃহ-ব্যবহার্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। পাংশু বর্ণ গান্ধার প্রস্তরের একটি সুন্দর রিলিফ (Relief) এই স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রিলিফটির চিত্র এইরূপঃ—"ভগবান বুদ্ধ ইন্দ্রশাল গুহাতে উপবিষ্ট; উভয় পার্শ্বে দেবতাগণ দণ্ডায়মান এবং সম্মুখে কয়েকটি পশু নির্নিমেষ নেত্রে তাঁহার দিব্য মূর্তি দর্শন করিতেছে। শূন্য হইতে দেবতা-চতুষ্টয় তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন। দেবতাগণের ভাব ও ভঙ্গী মুখে প্রস্ফুটিত।" প্রায় ৩০৯টি মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে—মুদ্রাগুলি কনিষ্ক, হুবিস্ক এবং বাসুদেব প্রভৃতি বিভিন্ন রাজাদের। ইহা হইতে জানা যায় যে, বহু শতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত মুদ্রাগুলি মঠ-ধ্বংসের কালেও এই স্থানে প্রচলিত ছিল।

হুয়েন স্যাং যখন তক্ষশিলা পরিদর্শন করেন তখন সির্কাপ নগর পঞ্চ শতকের অধিক পরিত্যক্ত এবং ইহার গৃহাবলী বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি যে শহরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার নাম শিরসুখ। এই নগরের অদূরে চারিটি বিখ্যাত বৌদ্ধস্তম্ভ তিনি দেখিয়াছিলেন। প্রথম স্তম্ভটি রাজা ইলাপাত্রের জলাশয়। দ্বিতীয়টি একটি স্তূপ; এই স্থানে বুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে মৈত্রেয়ের আবির্ভাব কালে মহা-রত্ন চতুষ্টয়ের অন্যতম তথ্য প্রকাশিত হইবে।

(7) Vide 'Corpus Inscrip. Ind.' (Vol. II, p. 70—77) by Sten Konow.

বৌদ্ধ প্রবাদ মতে চারিটি মহারস্তূপের (৮) প্রথমটি গান্ধারের ইলাপাত্রের, দ্বিতীয়টি মিথিলার পাণ্ডুকের, তৃতীয়টি কলিঙ্গের পিঙ্গলের এবং চতুর্থটি কাশীর শঙ্খের। তৃতীয় বৌদ্ধ স্তম্ভটি অশোক স্থাপিত একটি স্তূপ এবং চতুর্থটিও একটি স্তূপ। শেষোক্ত স্তম্ভটি সম্রাট অশোক স্বীয় পুত্র কুনালের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তম্ভটি জেনারেল কানিংহাম বহু বৎসর পূর্বে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পবিত্র জলাশয় সংযুক্ত স্তম্ভটি হাসান আবদাল রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পাঞ্জা সাহেব নামে পরিচিত। কুনাল স্তূপটি হাতিয়াল পাহাড়ের নিম্নদেশে অবস্থিত। এই স্তূপটি তক্ষশিলার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। এই স্থান হইতে হারো উপত্যকার এবং সিরকাপ শহরের মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। হুয়েন সাং-এর মতে স্তূপটি ১০০ শত ফুট উচ্চ ছিল। অন্ধ রাজপুত্র কুনাল এই স্থানে প্রার্থনাদি করিবার জন্য আসিয়াছিল। এই স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল যে, অন্ধগণ প্রার্থনাদি দ্বারা তাহাদের নষ্ট দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইত। কুনালের জীবন কাহিনী হৃদয় বিদারক। তাঁহার বিমাতা তিষ্যরক্ষিতা তাঁহার প্রেমে পড়িয়া হন এবং সেইজন্য তাঁহাকে তক্ষশিলায় ভাইসরয়রূপে প্রেরণ করিতে অশোককে অনুরোধ করেন। অশোক যখন নিদ্রিত ছিলেন তখন তিষ্যরক্ষিতা তাঁহার স্বামীর নামে একটি চিঠি লিখিয়া মন্ত্রীদের নিকট পাঠান। এই পত্রে কুনালকে তিনি মিথ্যা অভিযোগ দেন এবং সেই অপরাধে তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত করিবার আদেশ প্রদান করেন। মন্ত্রিগণ এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হইলে রাজপুত্র কুনাল পিতার প্রতি আনুগত্যহেতু শাস্তি গ্রহণ করিবার জন্য নিজেই রাজী হন। শাস্তি গ্রহণান্তর কুনাল স্বীয় পত্নীর সহিত পদব্রজে ভিক্ষান্নে জীবনধারণপূর্বক সুদূর রাজধানীতে পিতার নিকট গমন করেন। পিতা অন্ধ পুত্রের কণ্ঠস্বর ও বংশীধ্বনি শ্রবণে তাঁহাকে চিনিলেন। হৃদয়হীন ও প্রতিহিংসাপরায়ণ তিস্যরক্ষিতা নিহত হইলেন এবং বৌদ্ধ অর্হত ঘোষা নামক বৈদ্যের চিকিৎসায় বুদ্ধগয়াতে কুনাল তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন। কুনালের প্রকৃত নাম ছিল ধর্ম বিবর্ধন, কিন্তু তাঁহার নয়নযুগল হিমালয়বিহারী কুনাল নামক পাখীর ন্যায় ছোট ও সুন্দর ছিল বলিয়া অশোক তাঁহাকে স্নেহপূর্বক কুনাল বলিয়া ডাকিতেন। কুনাল স্তূপটি দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে ১০৫ ফুট এবং প্রস্থে পূর্ব পশ্চিমে ৬৪ ফুট।

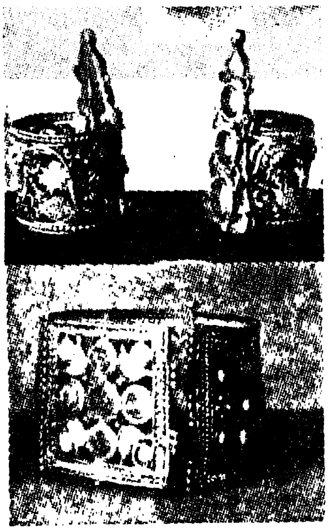
স্তূপের পশ্চিমে কিঞ্চিৎ উচ্চতর ভূমিতে একটি বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ। এই মঠের দেয়ালগুলি ১৩।১৪ ফুট উচ্চ। মঠের প্রাচীরটি প্রায় ১৫২ ফুট দীর্ঘ এবং ১৫৫ ফুট প্রস্থ। তারপর সিরকাপ শহরটি দর্শনযোগ্য ভীর-মাউণ্ড হইতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তক্ষশিলা শহর সিরকাপ নগরে স্থানান্তরিত হয় এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যথাক্রমে গ্রীক শক, পহলব এবং কুশন রাজাদের অধীনে থাকে। গ্রীকদের সময়ে নগরের চতুষ্পার্শস্থ প্রাচীরটি মাটির ছিল এবং পরবর্তী রাজাদের সময় উহা প্রস্তরের হয়। মাটির প্রাচীরের কিয়দংশ জানদিয়াল মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিমে এখনও দেখা যায়। রাজা প্রথম আজেস খৃষ্টপূর্ব পঞ্চাশ অব্দে প্রাচীরটি প্রস্তরময় করেন। দেওয়ালটির পাকা গাঁথুনী ১৫ ফুট হইতে ২১½ ফুট পর্যন্ত পুরু। সিরকাপ শহরের মধ্যে একটি বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, একটি বৌদ্ধ মন্দির এবং এবং কয়েকটি ছোট ছোট জৈন মন্দির ছিল। প্রাসাদটির সম্মুখ অংশ ৩৫০ ফুট এবং অন্যদিকে ৪০০ শত ফুট। প্রাসাদটি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত হয়। উহার তিনটি দ্বার এখনও দেখা যায়। কিন্তু সব দ্বারই ছোট। মোগল প্রাসাদের দেওয়ান-ই-আম এবং দেওয়ান-ই-খাস-এর ন্যায় উক্ত প্রাসাদে ভিন্ন ভিন্ন দরবার-গৃহ ছিল। ইহাতে সৈনিকদের জন্য জেনানা, ভৃত্যদের গৃহ, স্তূপ ইত্যাদি ছিল। স্তূপের পার্শ্বে পোড়া মাটির চারিটি পুকুর ছিল। সেইগুলি এখন স্থানীয় মিউজিয়ামে রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক পুকুরে (Tank) নামিবার সিঁড়ি ও জল-জন্তু আছে। পুকুরের পাড়ে পক্ষীগণ উপবিষ্ট এবং চারি কোণায় চারিটি প্রদীপ। এই সমস্ত বস্তুটি মাটি জল বায়ু ও অগ্নি এই চারি ভূতের প্রতীক। বাঙলা দেশে এখনও কুমারীগণ মৃত্যুদেবতা যমকে এই প্রকার যম-পুকুর প্রদান করেন। প্রথাটি ভারতে অতি প্রাচীন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে উক্ত প্রকার পুকুর খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ঐজিয়ান দ্বীপসমূহে এবং খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে মিশরে ব্যবহৃত হইত। সিরকাপ শহরের এই প্রাসাদটির সহিত মেসোপোটেমিয়ার অন্তর্গত সারগনের (Sargon) আসিরিয়ান রাজপ্রাসাদের সাদৃশ্য আছে। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই কারণ পারস্য, ব্যাকট্রিয়া এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের উপর আসিরিয়া যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে সুস্পষ্ট। এই প্রসাদে বিভিন্ন রাজার ৪১টি তাম্রমুদ্রা এবং মুদ্রা ঢালাই করিবার জন্য অনেকগুলি

ছাঁচ পাওয়া গিয়াছে। সিরকাপ নগরে ছাদে, বারাণ্ডায়, দরজায় এবং অন্যান্য স্থানে কাঠ (Timber) ব্যবহৃত হইত। ছাদগুলি সমতল এবং একস্তর পুরু মাটিতে ঢাকা থাকিত। এই নগরের এক স্থানে আর একটি জৈন্য স্তূপ ছিল। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নগরবাসিগণের মধ্যে অনেকেই জৈন ছিলেন। একটি বড় রাস্তার পার্শ্বে বহু দোকান-গৃহ এবং নাগরিকগণের বাসগৃহ ছিল। একটি স্তূপের গাত্রে অনেকগুলি কুলুঙ্গি (Niche) আছে। প্রত্যেক কুলুঙ্গির উপরে একটি করিয়া ঈগল পাখী। ঈগল পাখীগুলির মধ্যে একটির দুইটি মাথা। পশ্চিম এশিয়ার বাবিলন ও হিটাইট স্থাপত্যে এবং স্পার্টার শিল্পে এইরূপ দ্বি-মস্তক ঈগল পাখী দৃষ্ট হয়। পরে এই প্রতীকটি শকগণের পরম প্রিয় হইয়া উঠে এবং শকগণই তক্ষশিলায় ইহা আমদানী করে। শকগণের নিকট হইতে জার্মেনি ও রাশিয়ার রাজকীয় চিহ্নরূপে গৃহীত হয়। তক্ষশিলা হইতে এ প্রতীকটি বিজয়নগর ও সিংহলে প্রচারিত হয়। সিংহলে ক্যাণ্ডির রাজাগণের পতাকা এখনও ইহা দৃষ্টিগোচর হয়। পুরো হিতের বাসগৃহের দেয়ালে শ্বেত মার্বেল পাথরের একটি স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভটির উপরে আরামায়িক ভাষায় একটি লেখা খোদিত আছে। লেখাটি এখন খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং ইহার অর্থ উদ্ধার করাও অসম্ভব। কিন্তু লিপিটির যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা হইতে জানা যায় যে মার্বেল স্তম্ভটি কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সম্মানার্থ স্থাপিত হইয়াছিল। এই লিপি আবিষ্কারের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে খরোষ্ঠি অক্ষরের উৎপত্তি আরামায়িক ভাষা হইতে তক্ষশিলা নগরেই হইয়াছিল। খরোষ্ঠি জেলার প্রধান নগর তক্ষশিলা উত্তর পশ্চিম ভারতে আরামায়িক ভাষা খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে একিমনাইড গণ কর্তৃক আনীত হয়। দরবার-গৃহে একস্থানে ডাইওনিসিয়াসের রৌপ্যময় মস্তক এবং মিশরীয় শিশুদেবতা হার্পোক্রেটিসের পিতল নির্মিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য আবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে সোনা বালা আংটি মালার দানা, রূপার চামচ পক্ষযুক্ত এফ্রোডাইটের সোনার মূর্তি কিউপিডের ছবিযুক্ত একটি মেডেল, একটি সোনার হার এবং শতবর্ষ প্রমুখ রাজাগণের অনেক মুদ্রা আছে। বিবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্য অলংকার, রৌপ্য পাত্র, বহু প্রকার মাটির পাত্র ও প্রদীপ, জলপানের পাত্র ও ধূপদানি শস্য ও তৈল প্রভৃতি জমা রাখিবার জন্য ৩।৪ ফুট উচ্চ বড় বড় জার (Jar) পোড়া মাটির নানা প্রকার খেলনা, পাথরের থা

(8) Vide 'On Yuan Chwang' by T. Watters, Vol. I, p. 245.

ও থালা, লোহার পাত্র ও চেয়ার ও ত্রিপাদিকা, ঘোড়ার জিন, চাবি, পিতল ও তামার বাটি, ছোরা, বোতল, দোয়াত ও কলম, ঘণ্টা এবং কয়েক সহস্র মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি রৌপ্য পাত্রের উপরে দাতাগণের নাম খোদিত আছে। অন্যতম দাতার নাম জিহোনিকা (Zeionises)। ইনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে চুক্ষের শত্রপ ছিলেন। একটি স্তূপের রেলিক (Relic) প্রকোষ্ঠে মৌর্যযুগে নির্মিত একটি স্ফটিক পাত্রের কয়েক টুকরা পাওয়া গিয়াছে। এই পাত্রটি অন্য প্রাচীন কোন ভগ্নস্তূপ হইতে আনা হইয়াছিল এবং এই ভগ্নাবস্থায় এইখানে প্রোথিত করা হইয়াছে। যে পাত্রে বুদ্ধের কোন রেলিক রক্ষিত হয়, তাহাও বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র। ভগবান বুদ্ধের রেলিক যখন বিতরিত হইতেছিল, তখন ব্রাহ্মণ দ্রোণ রেলিকের পাত্রটি গ্রহণ করিয়াছিল। সাঁচি, সারনাথ এবং অন্যান্য স্থানের স্তূপেও রেলিক পাত্রের টুকরা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিরকাপ নগরে মৃত্তিকা খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে পর পর ছয়টি স্তর আছে। এক এক যুগে ঐ স্থানে গৃহাবলী নির্মিত হইয়া কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তী যুগে মানুষ আসিয়া সেই স্থানে পুনরায় বসবাস ও গৃহ নির্মাণ করে। এইরূপে এক একটি স্তর সৃষ্ট হইয়াছিল এবং প্রত্যেক স্তরে ভিন্ন ভিন্ন যুগে নির্মিত গৃহাবলীর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন হারাপ্পা শহরের মৃত্তিকাতেও এই প্রকার কয়েকটি স্তর দেখা যায়।

সিরকাপ নগর হইতে 'কাচ্চা কটে'র মধ্য দিয়া জান্দিয়ালে যাইতে হয়। পূর্বে এখান হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত একটি পথ ছিল। জেনারেল কানিংহাম ১৮৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানটি পরীক্ষাপূর্বক এই স্থানে একটি প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব অনুমান করেন। পরে উক্ত মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়। মন্দিরটি একটি উচ্চ স্থানে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫৮ ফুট ও প্রস্থে ১০০ শত ফুট। ভারতের কোন মন্দিরের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই, কিন্তু গ্রীস দেশীয় প্রাচীন মন্দিরগুলির সহিত ইহার নিকট সাদৃশ্য আছে। এথেন্সে পার্থেনন মন্দির বা এফিশাসে আর্টিমিসের মন্দিরের সহিত ইহার সাদৃশ্য আশ্চর্যজনক। মন্দিরটি কোন ধর্মের তাহা এখনও নির্ণয় করা সাধ্যাতীত। কিন্তু ইহা যে বৌদ্ধ, জৈন বা বৈদিক মন্দির নহে, তাহা সুনিশ্চিত। সারজন মার্শালের মতে ইহার সুউচ্চ তোরণ থাকায় এবং মন্দিরাভ্যন্তরে কোন মূর্তি না থাকায় ইহাকে পার্শী ধর্মের মন্দির বলিয়া মনে হয়। মেশোপোটেমিয়ার মন্দিরে জিকুরাতের মত বা মিশরের পিরামিডের ন্যায় জান্দিয়াল মন্দিরের তোরণটি আকাশস্পর্শী। পার্শী মন্দিরের ন্যায় মেশোপোটেমিয়ার আসিরীয় মন্দিরগুলিও মূর্তিশূন্য। তক্ষশিলায় পার্শী মন্দিরের অস্তিত্ব হইতে অনুমিত হয় যে, এইখানে এককালে পার্শীদের বিশেষ প্রভাব ছিল। ফাইলোস্ট্রেটাস তাঁহার "Life of Apollonius" নামক গ্রন্থে এই জান্দিয়াল মন্দিরের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন, মন্দিরটি প্রস্তর-নির্মিত এবং অতি সুন্দর ছিল। মন্দিরের দেওয়াল গাত্রে পুরু এবং আলেকজান্ডারের চিত্র-সমন্বিত বহু পিত্তল-ফলক লাগান আছে।



শিকাপে প্রাপ্ত আংটী ও চুড়ী

জান্দিয়াল মন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে শিরসুক নগর। তক্ষশিলার তিনটি শহরের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা আধুনিক। নগরটি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুশন রাজগণের দ্বারা স্থাপিত হয়। নগরের চারিদিকে ১৮½ ফুট মোটা একটি প্রাচীর। ইহার অধিকাংশভাগ কয়েকটি গ্রামে পরিণত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশে চাষ আবাদ হইতেছে। সুতরাং অন্যান্য শহরের ন্যায় ইহার কিছু ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা অসম্ভব। শহরের চতুর্দিকস্থ প্রাচীরের কিয়দংশ খনন করিয়া কিছু মুদ্রা ও কয়েকটি মাটির পাত্র পাওয়া গিয়াছে। মাটির পাত্রগুলি সম্ভবত জল বা তৈল রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। মুদ্রাগুলি কনিষ্ক এবং বাসুদেব প্রভৃতি রাজাদের সময়কার। শিরসুক নগর হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে লালচক এবং বাদলপুর। কিন্তু এই দুই স্থানের ধ্বংসাবশেষগুলি উত্তমরূপে রক্ষিত নহে। দর্শকগণ ইচ্ছা করিলে এই স্থানদ্বয় দর্শন না করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। লালচকে কয়েকটি বৌদ্ধ-স্তূপ, মঠ ও উপনিবেশ ছিল। এইগুলি সম্ভবত খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। এই স্থানে শ্বেতকায় হূনদের সময়ের চারিটি রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, শহরটি মাত্র অর্ধ শতাব্দী নিরাপদ ছিল এবং পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূনগণের আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়। এখানে একটি ত্রিশূল, একটি পিত্তলের আংটি, একটি লৌহ কুঠার, স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ফটিক ও হীরিকাদি পাওয়া গিয়াছে। নিকটবর্তী আরেকটি স্তূপে সামন্তদেব প্রমুখ রাজাগণের সময়কার ১৪০টি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। বাদলপুরের মহাস্তূপটির বিষয় কিছুই জানা যায় না। ইহার আকার প্রভৃতি ভাল্লার এবং কুনাল স্তূপের মত। এক সময় ইহা তক্ষশিলার একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ ছিল। স্তূপের ভিত্তি ৮০ ফুট দীর্ঘ এবং ২০ ইঞ্চি উচ্চ। সম্ভবত ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। কনিষ্ক, হুবিষ্ক এবং বাসুদেব এই তিনজন কুশন রাজের সময়কার কয়েকটি মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে।

এখন মোহরামোরাদু, পিপ্পলা এবং জাউলিয়ান এবং ভাল্লার স্থানগুলি দ্রষ্টব্য। মোহরামোরাদুর স্তূপটি খৃষ্টীয় তৃতীয় এবং পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে স্থাপিত। এখানে কয়েকটি বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিগুলির কারুকার্য অতি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত। মূর্তির গাত্রে কাপড়ের ভাঁজগুলি এত সুন্দররূপে খোদিত হইয়াছে যে, সেইগুলিকে একটু দূর হইতে প্রকৃত বস্ত্র বলিয়া ভ্রম হয়। মূর্তির মুখে গম্ভীর ও শান্তভাব উচ্চভাবোদ্দীপক। কয়েকটি মূর্তির মস্তক স্থানীয় মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। মূর্তিগুলির সমগ্র মুখ ওষ্ঠ ব্যতীত সাদা। নাসিকার ধার, চক্ষুর পাতার ভাঁজ, চুলের অগ্রভাগ, দাড়ি এবং কানের পাতার ভাঁজ গুলি লাল রং-এর এবং চুলগুলি কাল। স্তূপসংলগ্ন মঠগুলিও অতি সুন্দর। মঠের দেওয়াল গাত্রে বহু বুদ্ধ মূর্তি অবস্থিত ছিল। মঠের মধ্যে উপস্থানশালা, উপাহার-শালা, অগ্নিশালা কোষ্ঠক এবং বর্চক কুঠী ছিল। মঠের আদি দেওয়ালগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত হয়। মঠের মেঝেতে কুশন রাজ হুবিষ্ক এবং

বাসুদেবের সময়কার অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। বোধিসত্ত্ব গৌতমের একটি অতি নিখুঁত মূর্তি এবং গুপ্ত যুগের হরিশ্চন্দ্র নামক জনৈক ব্যক্তির একটি সীল (seal) আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিপ্পল স্থানটিও দর্শনযোগ্য। মোহরামোরাদু এবং জাউলিয়ান পাহাড়ের মধ্যে ইহা অবস্থিত। এখানেও কয়েকটি বৌদ্ধ মঠ ছিল। এই মঠগুলিও জাউলিয়ান এবং মোহরামোরাদুতে অবস্থিত মঠগুলির সদৃশ। এই স্থানে কনিষ্ক, বাসুদেব এবং অন্যান্য অনেক রাজার সময়কার অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। জাউলিয়ানের বৌদ্ধ-কীর্তি স্তম্ভগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত। সম্ভবত এইগুলি কুশন রাজত্বের সময়ে দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত এবং হূনদের সময়ে পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে বিধ্বস্ত হয়। তক্ষশিলার রাজধানী সেই সময়ে শিরসুকে নগরে ছিল। স্থানটি বৌদ্ধ সঙ্ঘের সভ্যগণের নিকট তখন অতিশয় মনোরম ছিল। স্থানটি ধূলিহীন ও শীতল পর্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত এবং ইহার সম্মুখে বিস্তৃত সমতল ভূমির দৃশ্য। এই স্থানের বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপে অনেক বুদ্ধ মূর্তি অবস্থিত ছিল। মূর্তিগুলির নাম এবং তাহাদের দাতাগণের নাম খরোষ্ঠি ভাষায় একটি স্তূপের উপরে লিখিত আছে। প্রধান স্তূপটি কুশন রাজত্বের সময়ের। ইহার উত্তর দিকে একটি উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্তি। মূর্তিটির নাভিদেশে একটি গোলাকার ছিদ্র। ইহার উপরে খরোষ্ঠি ভাষায় লিখিত আছে যে, মূর্তিটি বুদ্ধ মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত। নাভিতে যে ছিদ্রটি আছে তাহাতে আঙুল রাখিয়া বৌদ্ধ ভক্তগণ শারীরিক ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিত। প্রধান স্তূপের দক্ষিণ দেওয়ালে অনেকগুলি বিশালকায় বুদ্ধ মূর্তি। এই মূর্তিগুলি সম্ভবত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত। প্রধান স্তূপের পশ্চিম দিকে একটি ছোট স্তূপ। এই স্তূপ গাত্রে খরোষ্ঠি অক্ষরে অনেকগুলি লিপি আছে। একটিতে লেখা আছে, "সংঘ-মিত্রসস বুদ্ধ দেবসস ভিক্ষুসস দানমুখো।" জাউলিয়ানে যে সকল শীর্ষলিপি পাওয়া গিয়াছে সেইগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অধিক পূর্বে খোদিত হয় নাই। এই সকলের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খরোষ্ঠি লিপি তক্ষশিলায় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই স্থানের একটি মঠে ধ্যান-মুদ্রা-সংযুক্ত একটি উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্তি আছে। মূর্তির উভয় পার্শ্বে আরও দুইটি বুদ্ধ মূর্তি দণ্ডায়মান এবং পশ্চাতে দুইটি পার্ষদের মূর্তি। পার্ষদ যুগলের একটির হাতে চৌরী এবং অন্যটির বজ্র। জাউলিয়ানে যে সকল সুন্দর সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কয়েকটি স্থানীয় মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই মূর্তিগুলির একটি সিংহাসনে সমাসীন ও ধ্যানমুদ্রা-যুক্ত; অন্য একটি উপবিষ্ট এবং আরেকটি দণ্ডায়মান ও অভয়মুদ্রাযুক্ত। অভয়মুদ্রা-যুক্ত বুদ্ধ মূর্তির দক্ষিণে একটি বিদেশী পুরুষের দণ্ডায়মান মূর্তি। এই পুরুষ মূর্তিটি শ্মশ্রুযুক্ত এবং বোতামওয়ালা পাজামা পরিহিত। ইহার মাথায় টুপী এবং গাত্রে কোমরবন্ধযুক্ত লম্বা পাঞ্জাবী। জাউলিয়ানে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে একটি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই অগ্নি দ্বারা গৃহাবলী ভস্মীভূত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই স্থানে পোড়া মাটির একটি শীল এবং একটি গাছের ছালে (bark) লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। শীলটির উপরে গুপ্ত যুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা আছে,—"শ্রীকুলেশ্বর দাসে।" পুঁথিটি বার্চ (birch) গাছের ছালে গুপ্ত যুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত একটি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ। কিন্তু অগ্নি দ্বারা এই পুঁথিটি এত নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে ইহার মারমর্ম উদ্ধার করা অসম্ভব। ইহার অধিকাংশ ভাগ ছাপে লিখিত। ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত এইরূপ পুঁথি ভারতবর্ষে আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর প্রায় দুই শত মুদ্রা অনেক লোহার পেরেক ও কব্জা, তামার অলঙ্কার ও পোড়ামাটির বহু পাত্র এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হারো উপত্যকার উত্তরে সর্দা পাহাড়ের উপরে ভাল্লার স্তূপটি অবস্থিত। স্তূপটি হারো নদী হইতে অর্ধ মাইল এবং তক্ষশিলা স্টেশন হইতে পাঁচ মাইল। স্টেশন হইতে টাঙ্গিতে চড়িয়া স্তূপে যাতায়াত সুবিধাজনক। হুয়েনসাং (৯) এর মতে ভাল্লার স্তূপটি প্রথমে সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত হয়। এই স্থানে নাকি কোন এক পূর্ববর্তী জীবনে ভগবান বুদ্ধ তাঁহার মস্তক দান করিয়াছিলেন। এই পবিত্র স্থানটির স্মৃতি-রক্ষার্থে অশোক উক্ত স্তূপ নির্মাণ করেন। হুয়েনসাং বলেন যে, সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ মতের প্রতিষ্ঠাতা কুমার-লব্ধ এই মঠে গ্রন্থ রচনা করেন। এই স্তূপের উঠানে একটি অলৌকিক ঘটনা হুয়েনসাং-এর আগমনের কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল। একটি কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত নারী স্তূপে পূজা করিতে আসেন। স্থানটি অতি অপরিষ্কার ও আবর্জনাবৃত দেখিয়া তিনি উহা পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হন এবং তৎপরে স্তূপের চতুর্দিকে সুগন্ধ ফুল ছড়াইয়া দেন। তাহাতে নারীর কুষ্ঠব্যাধি সারিয়া যায় এবং তাঁহার পূর্বশ্রী ফিরিয়া আসে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভীরমাউণ্ডটি তক্ষশিলার প্রাচীনতম স্থান। স্থানীয় মিউজিয়মের দক্ষিণে ৫ মিনিট পথ চলিলেই উক্ত স্থানে যাওয়া যায়। এই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ দেখিয়াছেন যে ইহার চারিটি স্তর আছে। উপরের স্তরটি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর; দ্বিতীয় স্তরটি মৌর্য যুগের; তৃতীয় স্তরটি মৌর্য যুগের পূর্ববর্তীকালের এবং নিম্নতম স্তরটি সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর। চারিটি স্তরের গভীরতা প্রায় ২০ ফুট। দ্বিতীয় স্তরে যে গৃহাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার আয়তন প্রায় তিন একর ভূমি। এখানে কয়েকটি গোলাকার বা চতুষ্কোণ কূপ ছিল। একটি কূপ হইতে ১৬৪টি পাত্র পাওয়া গিয়াছে। আরেক প্রকার কূপ এখানে দেখা যায়। বড় বড় মাটির পাত্রের তলায় এক একটি ছিদ্র করিয়া পাত্রগুলিকে একটির উপর অপরটি সাজাইয়া এইরূপ কূপ হইত। মেসোপোটেমিয়ার soak well-এর সহিত এই কূপের সাদৃশ্য আছে। পোড়ামাটির নানা প্রকার পাত্র ও খেলনা, মাটির থালা, হাড়ের দ্রব্য, হাতীর দাঁতের ও সোনার অলংকার লোহার বাসনপত্র এবং বহু মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে। একটি পাত্রের উপরে সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মাথার ছাপ আছে। আলেকজাণ্ডার ও ডিওডোটাসের মুদ্রা সোনার বালা, সোনার ও রূপার দুটি হার এবং ১১৬৭ রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি বহু জিনিষ এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

২৯শে জুলাই বৃহস্পতিবার সমগ্র দিবস কখনও পদব্রজে কখনও ঘোড়ার গাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরা তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষগুলি দেখিলাম। স্থানটি এখনও স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর। জুলিয়ানের বৌদ্ধমঠটির সুন্দর দৃশ্য আমাদের মনে লাগিয়া রহিল। একটি নূতন বৌদ্ধমঠ এখানে স্থাপিত হওয়া উচিত।

তক্ষশিলা ভ্রমণ ও দর্শন শেষ করিয়া আমরা পরদিবস ৩০শে জুলাই শুক্রবার পাঞ্জা সাহেব যাই। পাঞ্জা সাহেব শিখদিগের অন্যতম প্রধান তীর্থ এবং তক্ষশিলা হইতে মাত্র ১০ মাইল দূরে পর্বতের ক্রোড়ে অবস্থিত। হাসান আবদাল নামক রেলওয়ে স্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে পাঞ্জাসাহেব। শহরটি ছোট। গুরুদ্বারার চতুর্দিকেই বাজার ও ধর্মশালা। শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা

(9) Vide "Buddhist Records of the Western World' By Beal, Vol I, p. 138.

গুরুনানক এখানে তপস্যা করিতেন। তিনি পর্বতের পাদদেশে তাঁহার মুসলমান শিষ্য মরদানার সহিত থাকিতেন এবং সেই পর্বত-শিখরে একটি মুসলমান ফকির থাকিত। পর্বতশিখরে ফকিরের কুবিয়ার পার্শ্বে জলের ঝরনা। মরদানা নিত্য ২।১বার গুরুনানকের জন্য জল আনিতে উপরে যাইতেন। তাহাতে ফকির বিরক্ত হন এবং মরদানাকে উপরে আসিতে ও জল লইতে নিষেধ করেন। এই কথা শুনিয়া গুরু-নানক স্বীয় অসি দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া জলস্রোত বাহির করেন। তাহাতে ফকিরের জলস্রোত শুকাইয়া যায় এবং তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া গুরুনানককে বধ করিবার জন্য পর্বত-পৃষ্ঠ হইতে একটি বিশাল প্রস্তর নীচে গড়াইয়া দেন। প্রস্তরখণ্ড ভয়ংকর শব্দে ও তীব্রবেগে গুরুনানকের দিকে আসিতে-ছিল, এমন সময় গুরুনানক তাহা নিজের হাতের পাঞ্জা দ্বারা আটকাইয়া রাখেন। ইহাতে তাঁহার পাঞ্জার চিহ্ন প্রস্তরখণ্ডে লাগিয়া যায়। পাঞ্জার দাগ এখনও দেখা যায়। পাঞ্জার নামানুসারে এই শিখ-তীর্থের নাম 'পাঞ্জা-সাহেব'। গুরুনানক এইভাবে নিজেকে রক্ষা না করিলে হয়ত বাঁচিতেন না, প্রস্তরাঘাতে প্রাণ হারাইতেন। পাঞ্জার চিহ্নযুক্ত প্রস্তরখণ্ডের পার্শ্ব দিয়াই জলস্রোত এখনও বহিতেছে। উহার জল স্বাদু, স্বচ্ছ ও শীতল। শত শত শিখ নরনারী এই স্রোতের জলে স্নান করিয়া ধন্য হইবার জন্য এখানে আসেন। স্রোতের উপরে বিরাট গুরুদ্বারা। গুরুদ্বারার ধারে 'লংগর' চলিতেছে। শিখগণ অন্ন-সত্রকে 'লংগর' বলে। এখানে সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত সকলকে অন্নদান করা হয়। এইপ্রকার অন্নদান বার মাস চলিতেছে। রুটি, দাল ও আচার সকলকে খাইতে দেওয়া হইতেছে। লক্ষপতি কোটি-পতি শিখ নরনারীগণ এই লংগরের জন্য রুটিবেলা, দাল সিদ্ধ করা ও থালা পরিষ্কারাদি কার্য করিতেছেন। সাধুদিগকে এখানে বিশেষ যত্ন করা হয়। শিখগণ অতিশয় সাধুভক্ত; সাধুভক্তি শিখধর্মের একটি প্রধান অংগ। আমরা স্রোতে স্নান করিয়া প্রাণ জুড়াইলাম এবং স্নানান্তে লংগরে ভোজন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। এখানে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। রাওয়ালপিণ্ডির দন্তচিকিৎসক ডাঃ এল নাথ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ৮।৯ বৎসরের পুত্র ধর্মবীর পাঞ্জা সাহেবে স্বীয় মাতা ও ভগিনীর সহিত আছে এবং আমা-দের আসার কথা শুনিয়া বাঙালী সাধু দেখিবার তাহার খুব ইচ্ছা হইয়াছে। ধর্মবীর বালকটি অতিশয় সাধুভক্ত—ডাঃ নাথ বলিলেন। অবশ্য আমরা পূর্বে কখনও ধর্মবীরকে দেখি নাই। ধর্মবীরকে তাহার পিতা অবশ্য আমাদের পাঞ্জা সাহেব যাবার কথা পত্রে লিখিয়াছিলেন। আমরা স্রোতে স্নানান্তে কাপড় ছাড়িতেছি, আমাদের ম… বহু সাধুও এইরূপ করিতেছেন। এমন সম… দেখি, একটি বালক একদৃষ্টে আমাদিগে… পানে তাকাইয়া আছে; কি যেন বলিতে চায়। বালকের নাম জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম—এ… সেই বালক ধর্মবীর! অন্তরের আগ্রহে… বালক আমাদের প্রতি একটা অব্যক্ত আকর্ষ… অনুভব করিতেছিল। ধর্মবীর আমাদে… পাইয়া আনন্দে অধীর এবং আমরা যে ক… ঘণ্টা পাঞ্জা সাহেবে ছিলাম ততক্ষণই আমাদে… সংগে ছায়ার মত ঘুরিয়াছিল এবং বিদায়ে… সময় অশ্রুপাত করিল। এ কি দৈবী মা… কে জানে? ইহা কি জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ… ডাঃ নাথ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে… বান্নু জেলার লোক, তাঁহার সংগে আমাদে… এই প্রথম পরিচয়। পাঞ্জা সাহেব-এ আর… ২।১টি মন্দির, সন্তপুরা ও হাই স্কুল… দেখিলাম। হাই স্কুলটির নাম সার সিকন্দ… হায়াত স্কুল। সার সিকন্দরের জন্মস্থান… এইখানে এবং তিনি পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

পাঞ্জাসাহেব দর্শনান্তে আমরা রাওয়াল-পিণ্ডি ফিরিলাম এবং ২।১ দিন বিশ্রাম করিয়া ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শন এবং তথা হ… অমরনাথ দর্শনের জন্য যাত্রা করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

(১১১ পৃষ্ঠার পর)

হইতে, রূপকথার জগৎ হইতে যেন ভাসিয়া আসিল—

'দুলিয়ে দিল সুখের রাশি,
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনম-ভরা
ব্যথা অতলা।'

একি স্বপ্ন না সত্য? মনের কল্পনা না জ্যোৎস্নার মরীচিকা! বিস্মৃতির উজান ঠেলিয়া উজ্জয়িনীর কোন্ স্বপ্ন যেন দক্ষিণ হাওয়ায় ভাসিয়া আসিল।

'দুলিয়ে দিল জনম-ভরা ব্যথা অতলা।'

আশ্রম নীরব। তখন সেই কোকিল-থামা বাতাসধরা, শান্তিনিস্তব্ধ আকাশে কেবল স্পন্দিত তারাগুলি মাত্র জাগ্রত—আর কেহ কোথাও জাগিয়া থাকেনা

(ক্রমশ)



হাওয়া বদল

শ্রীসুবোধ বসু

শুইয়া শুইয়া আর ভালো লাগে না। ডাক্তার বলিয়াছে আর এক সপ্তাহ পরেই বসিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু ডাক্তারবাবু তো কত আশ্বাসই দেন—অনুপম তাঁকে আর একটুও বিশ্বাস করে না। তিন বছর তার কাটিয়া গেল বিছানায়; এর মধ্যে বড় জোর কখনও সখনও ঈজিচেয়ারে উঠিয়া বসিয়াছে। বাস, ঐ পর্যন্তই। ডাক্তারবাবুর কথা শুনিলে এ জন্মে আর তার উঠিয়া দাঁড়ান হইবে না!

বাহিরের পৃথিবী, জনকোলাহল, সুনীল আকাশ সর্বক্ষণ যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে। অনুপমের নিজেকে খুব সুস্থ বোধ হয়, ইচ্ছা হয়, দেওয়ালগুলির হাত এড়াইয়া একবার ছুটিয়া বাহিরে যায়, ছাদহীন আকাশের তলায় দাঁড়াইয়া বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। কিন্তু ঐখানেই ডাক্তারবাবু অবুঝ! এমন রাগ হয় অনুপমের!—ফুসফুস যদি তৃপ্তি মিটাইয়া হাওয়া খাইতে না পারে তবে তো চিরকালই পঙ্গু ও দুর্বল হইয়া থাকিবে। কিন্তু ডাক্তারবাবু যদি কথাটা একটুও খেয়াল করেন! বার বার বলিয়া অনুপম হার মানিয়াছে।

ডাক্তার! কিছু ওদের ক্ষমতা নাই, শুধু বড়াই-ই সার! অনুপম একদিন উঠিয়া নিশ্চয়ই বাহিরে ছুটিয়া যাইবে; খোলা আকাশের তলায়, দেওয়ালের বাধাহীন উন্মুক্ততায় যাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া আসিবে। নিশ্চয়ই তবে আর অসুখ থাকিবে না; তিন বছরের অসুখ এক নিমিষে দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু তারই-বা উপায় কোথায়? মাও কি অনুপমের সঙ্গে কম শত্রুতাটা করেন! অধিকাংশ সময়েই অনুপমের পাশে বসিয়া থাকিবেন, আর ঘরে না থাকিলেই-বা কি, সারাক্ষণই তার এদিকে নজর রহিয়াছে; অনুপমকে নিজ ইচ্ছামত একটুও চলিতে ফিরিতে দিবে না। কেউ যদি তার একটু হিত বোঝে! কেবলই ডাক্তারের সঙ্গে সায় দেওয়া। ডাক্তার যাহা বুঝায় তাহাই বুঝিবে, যাহা করিতে বলিবে তাহাই করিবে। এমন!

দয়া করিয়া ডাক্তারবাবু যদি তাকে একবার ছাড়িয়া দেন, অনুপম ভাবে—তবেই সে বাঁচিয়া ওঠে। ধেৎ, অসুখ আর নাই, অনুপম স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে, একদিন, অসুখ আর অবশিষ্ট নাই। বিছানায় সারা দিন, সারা রাত যদি এমন করিয়া পড়িয়া থাক, তবে মুখ দিয়া অমন একটু-আধটু রক্ত পড়িবেই। ওতে কিছুই হয় না। কেবল একবার ছাড়া পাইলেই সে ঠিক হইয়া যাইবে। ঈস্, কী ইচ্ছা করে একবার ভোরবেলা ভিজা ঘাসের উপর দিয়া শুধু পায়ে দৌড়াইতে! একবার কলেজে যাইতে দেয় তো বন্ধুদের সঙ্গে মিশিয়া খুব এক চোট হাসিয়া আসে। কি হাসিতেই যে ইচ্ছা করে! একদিন ফুটবল ম্যাচ দেখিয়া আসিতে পারে তো একটু অসুখও বাকি থাকিবে না—পই পই করিয়া পলাইয়া বাঁচিবে।

পাশের বাড়িটা ভারি রহস্যময় মনে হয় অনুপমের কাছে; সেটা যেন অতি কাছাকাছি থাকিয়াও একটা আলাদা জগৎ। ও-বাড়ির ছেলেরা সারাক্ষণ কেমন লাফালাফি হৈ চৈ করে, দুষ্টুমি করে, হাসে, চেঁচাইয়া গল্প করে। অনুপম ভালো হইয়া উঠিলেই ওদের সঙ্গে ভাব করিবে। ওদের বোনটি বড় ভালো মেয়ে। কতদিন অনুপম তাকে তার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছে, যেন অনুপমকে সারাক্ষণ শুইয়া থাকিতে দেখিয়া ওর ভারি কষ্ট হয়। কষ্ট হইবেই তো, ডাক্তারের দৌরাত্ম্যটা দেখিয়া কার না মায়া হয়! যেমন সুন্দর দেখিতে মেয়েটি তেমনি ওর স্বভাব। কী চমৎকার যে ওর হাসিটা! কী চমৎকার নাম বকুল!

ঈশ্বর কত বেশি প্রাণ দিয়াছেন ওকে। নাচিয়া দৌড়াইয়া, হাসিয়া ভঙ্গি করিয়া সারাক্ষণ সে যেন প্রাণকে উপভোগ করিতেছে। এমন ভালো লাগে অনুপমের—এমন জীবন্ত কাউকে দেখিতে! ওকে দেখিলেই কেন জানি মনে হয়, পৃথিবীতে কান্না নাই ব্যথা নাই—মৃত্যু নাই। মৃত্যু? না, না, মরিতে সে পারিবে না। সে বাঁচিবে, হাসিবে, রৌদ্রভরা আকাশের তলায় ছুটিয়া বেড়াইবে।

'অনু!'

অনুপম চমকাইয়া এদিকে তাকাইল; মা আসিয়াছেন। ফিডিং-কাপটা আগাইয়া ধরিয়া কহিলেন, 'এইটুকু-খেয়ে নে, বাবা!'

'খেয়ে নে বাবা, খেয়ে নে বাবা,' ভেংচাইয়া অনুপম কহিল 'সারাক্ষণ কেবল যন্ত্রণা। ও-সব ছাইভস্ম পথ্য আমি কিছুই খাব না। আমার চানাচুর কই?...'

'আর দুচার দিন একটু কষ্ট কর, বাবা,' করুণমুখে মা কহিলেন, 'তার পরই তো আবার ভাত দেবেন ডাক্তারবাবু, বলেছেন। একটু কষ্ট করলেই...'

অনুপম উত্তেজিত হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল। চিঁচিঁ করিয়া কহিল, 'ডাক্তার! ওর আমি মাথা ফাটিয়ে দেব। লক্ষ্মীছাড়া ডাকাত কোথাকার! শুধু শুধু ভিজিট নেবার লোভে আমাকে শুইয়ে রেখেচে। একটুও আর আমার অসুখ নেই। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারচি, আমি ভালো হয়ে গেছি। আমি আজই উঠে বাইরে বেড়াতে যাব; ঠিক যাব, বলে দিলুম...'

'বেশ বাবা, যেও। এখন এইটুকু খেয়ে নাও।—দেখো কদিন পরেই আমরা পুরীতে বেড়াতে যাব, সেখানে সমুদ্রতীরে বালুর উপর দিয়ে তুমি হেঁটে বেড়াবে—পায়ের কাছে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছাড় খাবে। কেমন খোলা আকাশ, কেমন বড় সমুদ্র!...'

আকাশ, বিস্তৃতি এবং জলের আশ্বাস অদ্ভুত কাজ করিল। অনুপম আর আপত্তি করিল না, অতি বাধ্য ছেলের মতো পথ্যটুকু নিঃশেষ করিল।

কি সুন্দর শাড়িটা! এমন ভালো দেখাচ্ছে বকুলকে—যেন রূপকথার দেশের মেয়ে যেন সাত ভাই চম্পার বোন পারুল। পৃথিবীর সব লোকের মধ্যে ওরই একটু তবু দরদ আছে তাহার জন্য—অনুপম ভাবিল। মিছামিছি ভয় পাইয়া বন্ধুরা আসা বন্ধ করিয়াছে। বাইরের লোক প্রায় কেউকেউ অনুপম দেখে না; শুধু বকুল নিজেদের বারান্দার রেলিংয়ের ধারে অনুপমের জানালাটার বরাবর দাঁড়াইয়া প্রতিদিন দেখা দিয়া যায় এমন লক্ষ্মী মেয়ে।

বাসন্তী রঙের মিহিশাড়ির পাড়টার নক্সাটা এমন চমৎকার! বেণীটি সাপের মতো ভঙ্গিতে কাঁধের উপর দিয়া নামিয়া আসিয়া বুকের এক পাশে লুটাইয়া পড়িয়াছে। নিশ্চয়ই সূর্য এখনও অস্ত যায় নাই, নইলে এতটা লাল রং আর কোথা হইতে বকুলের মুখে পড়িবে। এমন নিটোল বকুলের হাত দুটি; এমন আশ্বাস পাওয়া যায় ওর প্রসন্ন স্বাস্থ্য হইতে।

অনুপমের ইচ্ছা হইতেছে ডাকিয়া ওর সঙ্গে একটু কথা বলিতে। বলিবে কি, 'আপনাকে দেখে বড় আনন্দ পাই, আর একটু বেশিক্ষণ করে দাঁড়াবেন। কাল মাত্র একবার এসেছিলেন কেন? অত কম

করে এলে চলবে না।' কিন্তু ধ্যেৎ, তাও কি বলা যায়? কী যে মাথামুণ্ডু ভাবে! বকুলের সাথে যে পরিচয়ই হয় নাই! একবার বাইরে যাইতে পারিলেই অনুপম ওদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইবে। বকুলকে হয়তো একদিন বলিবে, 'অসুখের সময় আপনি এত উপকার করেছেন...'

দুদিন ধরিয়া বকুলের দেখা নাই। একবারও যদি সে বারান্দায় আসিয়া একটু দাঁড়াইয়াছে! একটু বোঝে না, অনুপম ওর আসিবার আশায় সারাক্ষণ কেমন উৎসুক হইয়া থাকে। ঘর হইতে একটুক্ষণের জন্য বারান্দার এদিকটায় একটু আসা—ভারি তো কষ্ট! তাও যদি বকুল আসিবে। এমন করলে বুঝি মানুষের রাগ হয় না—অনুপম মনে মনে বলে। অনুপমও এবার আড়ি করিয়াছে। বকুল যদি এখন স্বস্থানে আসিয়া দাঁড়ায়ও, তবু সে একটিবারও তাকাইয়া দেখিবে না, এদিকের দেওয়াল-পঞ্জিকাটার দিকে চাহিয়া সমস্ত তারিখগুলি এক এক করিয়া গুণিবে। পাহাড় আর পাইন গাছের ছবিটা এ-ঘরে টাঙানো থাকিলে ভালো হইত। এমন ভালো লাগে পৃথিবীর দৃশ্য দেখিতে; মাকে কাল অনুপম অনেক ছবি আনিয়া এ-ঘরের দেওয়ালে টাঙাইয়া দিতে বলিবে—চাঁদ, নদীর পাড়, গাছের সারি, খেয়া নৌকা, তেপান্তরের মাঠ.....

বকুল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত মুখমণ্ডলে যেন জিজ্ঞাসা। অনুপম মাত্র একটিবার চাহিয়া দেখিল, তারপরই এ-পাশ ফিরিয়া শুইল।—ওর বুঝি আর রাগ হয় না! ঈস, দয়া করিয়া দুদিন পরে উনি একটু দেখা দিতে আসিয়াছেন তাতেই যেন অনুপম ধন্য হইয়া গেল! এই দুই দুইটি দিন অনুপমের কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তার কি একটুও খোঁজ নিয়াছে?

এ-পাশে ফিরিয়া কিন্তু অনুপম ভাবিতে লাগিল। —হয়তো এখানে ছিলই না, আত্মীয়-স্বজন কারুর বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছিল। হয়তো বা জ্বরজারিই হইয়াছিল, বিছানা হইতে উঠিবার উপায় ছিল না।—তবে অবশ্য ওর দোষ দেওয়া যায় না! না, না, জ্বর কিছুতেই নয়। সজীব সরস মুখ, চোখের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যের প্রসন্নতা প্রতিফলিত। এ নিশ্চয়ই বেড়াইতে যাওয়া।—বেশ তো, বেড়াতে যেতে কে আর মানা করেচে! একটু বলে গেলেই হয়! একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, অমনি কাউকে বা বাতাসকে বললেই তো বুঝতে পারা যায়! এমন বোকা মেয়ে, একটু যদি বুদ্ধি থাকে! অনুপম তাকে ক্ষমা করিল।

অনুপমের দিন ভালোই যাইতেছিল। বকুল বেশ লক্ষ্মী মেয়েটি হইয়াছে। গত কয়দিন দুতিন বারে মোট অন্তত দশ মিনিট করিয়া জানালার সম্মুখে সে দাঁড়াইয়া গেছে। ঘরের ভিতর যাইয়া অনেক গান সে শোনায়। 'আমার জন্যই তো অতটা চেঁচিয়ে গান করে, নইলে আমি দূরে থেকে শুনতে পাব না কি না'—অনুপম সিদ্ধান্ত করে। বর্ষার দিনে মেঘের দিকে অনুপম তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে দেখে; জ্যোৎস্না-রাতে তাহার নিশ্চুপে দাঁড়াইয়া থাকা লক্ষ্য করে; অলস ধূসর বৈকালে ঈজিচেয়ারে শুইয়া গল্পের বই পড়িতে দেখে—কত বিচিত্র রূপে, কত শতবার বকুল দেখা দিয়া যায়। 'ওরও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ভাব করার ইচ্ছে', অনুপম সিদ্ধান্ত করে, 'কিন্তু চেনা নেই কি না, তাই কথা বলতে পারে না।'

বকুলের দাদারা বাড়িতে একদিন এক নতুন এবং অপরিচিত যুবককে ডাকিয়া আনিল এবং অনুপমের চোখের সামনেই তাহার সাথে বকুলের আলাপ করাইয়া দিল। খুব চটপটে, খুব আমুদে ছেলেটি। বকুল তো তার গল্প শুনিয়া হাসিয়া কুটপাট। গল্পে, হাসি-হল্লায় ওদের আড্ডা খুবই জমিয়া উঠিল।

অনুপম একবার ওদিকে তাকাইল, একবার এ-পাশ ফিরিল, আবার ওদিকে চাহিল, পুনর্বার গভীর অসন্তোষের সঙ্গে এ-পাশ ফিরিয়া শুইল। কে এই অজবুগটা? থিয়েটারের ভাঁড় নাকি? ভঙ্গি করিয়া মূর্খের মতো রসিকতা করিয়া, অনাবশ্যক জোরে হাসিয়া ভাবিতেছে—খুব বুঝি বাহাদুরি হইতেছে। 'আর এমন করে বকুলের সঙ্গে কথা বলচে, যেন তার সঙ্গে ওর কতদিনেরই চেনা!' বকুলের দাদাদেরও কি কাণ্ডজ্ঞান একটুও নাই! যাকে তাকে আনিয়া ওর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিবে; এমন ভঙ্গি, রসিকতা আর ইয়ার্কি করিতে দিবে! এমন সব!

একটু বেশি রাত্রে বকুল যখন বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকিয়া গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছে, তখন অন্ধকারের মধ্যে অনুপম একদৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া রহিল। মনে মনে কহিল, 'ওর সঙ্গে আর অমন করে' হাসি-তামাসা ক'রো না বকুল; তেমন সুবিধের ছেলে মনে হচ্চে না। তোমার দিকে ওর চাউনিটা তুমি হয়তো লক্ষ্য করো নি, আমি করেচি।—ওর সঙ্গে আবার যদি অতটা বাড়াবাড়ি করো তবে কিন্তু আমি নিশ্চয়ই আড়ি করব সে আড়ি কিছুতেই ভাঙবো না—'

কিন্তু দুদিন পরেই আবার সেই যুবকটি আসিল এবং আজ বারান্দাতে চায়ের পার্টি বসিল। বকুল চা পরিবেশন করিল, হাসিল, কৌতুক করিল।

অনুপম হিংস্রমুখে বালিশের পাশ হইতে কমলা নেবুটা উঠাইয়া লইয়াছে।

'ওকি, বাবা, নেবুটা অমন করে' ছুঁড়লে কেন?'

'অ্যাঁ, ওঃ, মাঃ?' অনুপম চমকাইয়া উঠিয়া কহিল। 'পচা কমলা নেবু যে, একদম পচা, একদম। ছুঁড়ে ফেলব না, খেয়ে মরব?......'

'তোমার অমন করে' ছুঁড়তে নেই, বাবা। ওতে পরিশ্রম হয়।'

'পরিশ্রম না হাতী। আমার কিছু অসুখ নেই, শুধু ভিজিটের লোভে—এই জানলাটা বন্ধ করে দাও তো মা......'

'না, না, হাওয়া আসুক। কিন্তু ও জানালা দিয়ে কিছু ছুঁড়ো না। পাশের বাড়ির বারান্দায় গিয়ে পড়লে ওরা রাগ করবে। একেবারে কাছাকাছি কিনা...'

'কাছাকাছি, কাছাকাছি। তবে বন্ধ করে' দাও না। বলচি বন্ধ কর। বলচি।'

মা যাইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

দুদিন পরে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া যাইবার সময় কহিয়া গেল, 'নাঃ, কিছুই উন্নতি দেখচি না, বরঞ্চ......! পুরীতেই নিয়ে যান, দেখা যাক, ওখানে কতটা উন্নতি হয়; ভয়ানক weak—'

পুরী! সমুদ্র! আকাশ! বাঃ, চমৎকার হবে। আমি যাবই তো—পুরী যাইবার প্রস্তাবে অনুপম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আর মাত্র তিনটি দিন, তারপরই সমুদ্র তীরে হাঁটা, দৌড়ান লাফালাফি; ঢেউয়ের শব্দের সঙ্গে উচ্চ হাসি, ঝিনুক কুড়ানো! আকাশ কত বড় আকাশ! বহু যোজন দূরে সাগর ও গগনের অস্পষ্ট মিলন! কী বিরাট বিস্তৃতি, মুক্ত বাতাসে কত প্রাণ! এই ঘরটা হইতে ছাড়া পাইলে অনুপম বাঁচে।

সেই ছেলেটা আবার আসিয়াছে। সন্ধ্যা হয় হয়; বারান্দায় বকুল একা বসিয়া আছে, দাদারা কেহ নাই। এমন সময়, বলা নাই, কহা নাই, ছেলেটা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে বকুলের পাশের চেয়ারটায় চাপিয়া বসিয়া পড়িল। সেই টগবগ, সেই উচ্ছ্বাস। ক্রোধে, বিরক্তিতে, ঈর্ষায় অনুপম এ পাশে মুখ ফিরাইয়া চোখ বুজিল। ঠোঁট কামড়াইল, দাঁত কিড়মিড় করিল, দুর্বল আঙুলগুলি শীর্ণ হাতের তেলোতে আনিয়া বারম্বার মুষ্ঠিবদ্ধ করিল। 'যান, চলে যান এক্ষুণি চলে যান। আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত। আস্পর্ধার একটা মাত্রা থাকা উচিত......'

(শেষাংশ ১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রশান্ত মহাসাগরীয় ষ্ট্র্যাটেজী

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রপক্ষের ব্রহ্ম অভিযান আসন্ন একথা নানা মহল থেকেই শোনা যাচ্ছে। ওদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়ও মিত্রপক্ষীয় সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থার একে একে দ্বীপ দখলের চেষ্টা করছেন। কিভাবে জাপানকে যুদ্ধে পরাস্ত করা যায়, এ নিয়ে কানাডায় কুইবেক সম্মেলনেও নিশ্চয়ই বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে পরামর্শের জন্যে একটি বৃটিশ সামরিক প্রতিনিধিদলও সেখানে প্রেরিত হয়েছে। উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের জয় সিসিলির পতন এবং সোভিয়েট রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর ব্যর্থতা ও লালফৌজের প্রত্যাক্রমণের প্রভাব সুদূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনেও পড়তে বাধ্য। ইউরোপে এক্সিস শক্তির বিক্রম যতই কমে আসবে, বৃটিশ এবং মার্কিন শক্তিও ততই বেশী প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের দিকে নজর দেবার সুযোগ পাবে। বর্তমানে অবস্থা খানিকটা মিত্রপক্ষের অনুকূল দেখা যাচ্ছে। জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাবার পক্ষে অবস্থা কতখানি অনুকূল এই প্রবন্ধে তাই দেখবার চেষ্টা করব।

প্রথমেই বলা দরকার, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে জাপান তার প্রতিপক্ষ বৃটিশ ও মার্কিন শক্তিকে ঘা দিয়ে যথেষ্ট বল সঞ্চয়ে সমর্থ হয়। মূল এশিয়াখণ্ডে তো সে বিস্তীর্ণ এলাকা পায়ই তদুপরি যতগুলি দ্বীপ তার হস্তগত হয় জগতে আর কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই এতগুলি দ্বীপ দখলে নেই। মূল জাপানী দ্বীপপুঞ্জ, মাঞ্চুকুও, চীনের অধিকৃত এলাকা ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, মালয়, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ এবং ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মিলে তার যে বিরাট সাম্রাজ্য দাঁড়ায় তার লোক সংখ্যা ৪০ কোটির কম হবে না। এশিয়ার অর্থনৈতিক সম্পদের বেশীর ভাগই তার হাতে পড়ে। জগতের উৎপাদন ধরলে রবার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ, টিন শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ চা শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ, চিনি শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ চাউল শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ পেট্রোল (ক্রুড) শতকরা প্রায় ৫ ভাগ, টাংস্টেন শতকরা প্রায় ২০ ভাগ এবং ফসফেট্স্ শতকরা প্রায় ৮ ভাগ তার হস্তগত হয়। এর ফলে পূর্ব এশিয়ার সামরিক অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। জাপান সামরিক ঘাঁটিগুলি দখল করে এবং তার অর্থনৈতিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। এলুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং ওসিয়ানিয়া থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এক বিস্তৃত এলাকায় সে সামরিক আধিপত্য লাভ করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মার্কিন, বৃটিশ ও ওলন্দাজদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর এবং সুরাবায়া জাপানী ঘাঁটিতে পরিণত হয়। মার্কিন ও বৃটিশ শক্তি হাওয়াই, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষে বাধ্য হয়ে সরে আসে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মিত্রপক্ষের সমরনীতিতে এই সংকট দেখা দেবার মূলে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ তাদের সমরনীতিতে যথেষ্ট সহযোগিতার অভাব। গোড়ার দিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় কেবল পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে জাপানকে বাধা দেবার কথা চিন্তা করে। চীনকে বাদ দিয়ে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, হল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সকে নিয়ে সম্মিলিত দল গঠন করা হয়। ইউরোপে ফ্রান্সের পতনের পর আমেরিকা, বৃটেন এবং ডাচ (ওলন্দাজ) অর্থাৎ এ-বি-ডি দলে পরিণত হয়। এশিয়ার দুটি বৃহৎ শক্তি চীন এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তার ফলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মিলিত সমরপ্রচেষ্টা এশিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়ই সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ দেখা যায় প্রথম দিকে জাপানের একরূপ চারদিকেই শত্রু ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র চীন, গ্রেট বৃটেন এবং হল্যাণ্ড এই কয় শক্তিকে নিয়ে যদি তখন জাপানের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা হ'ত তবে হয়ত সে এই সম্প্রসারণের সুযোগ পেত না। কিন্তু তা' না করার ফলে জার্মানীর ন্যায় জাপানও ক্রমশ বাহু বিস্তারের সুযোগ পেয়ে যায়। ইউরোপে সোভিয়েট শক্তিকে বাদ দিয়ে মিউনিক চুক্তির দ্বারা এক্সিস পক্ষকে তোয়াজ করতে গিয়ে যে অবস্থা দাঁড়ায় এশিয়ায়ও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ হাত গুটিয়ে থাকায় জাপান চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে সুবিধে পায় এবং তারপর সুযোগ বুঝে সে ইঙ্গ-মার্কিন-ওলন্দাজ শক্তিকেও আঘাত করে। বিপদে প'ড়ে তারা তখন চীনকেও দলে টেনে নেয়, কিন্তু তাতে জাপানের আঘাত থেকে তাদের অব্যাহতি মেলেনি। জার্মানীর ন্যায় জাপানও একে একে তার শত্রুকে পরাজিত করবার সুবিধে পায়।

প্রশান্ত মহাসাগরে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পরাজয়ের আর এক কারণ উক্ত এলাকায় তাদের অপ্রতুল সমরায়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ঘাঁটিগুলি রক্ষার সুব্যবস্থা না করায়ই তাদের এই বিপদ ঘটে। এমন কি প্রচুর অর্থব্যয়ে সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি স্থাপন ক'রেও তা' রক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। কেবল নৌবলের চিন্তাই তাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল; কাজেই স্থলসেনা ও বিমানবল বাড়াবার কথা তারা ভালোভাবে ভেবেই দেখেনি। জাপানী আক্রমণ যখন আসন্ন তখনও পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি রক্ষার জন্যে বৃটিশ ও মার্কিন গোরা সৈন্যের সংখ্যা এক লক্ষের বেশী ছিল কি না সন্দেহ। অত বড় বিস্তীর্ণ এলাকা রক্ষার জন্যে মিত্রপক্ষের মাত্র শ' কয়েক আধুনিক বিমান ছিল। অথচ কাগজে-পত্রে সমরশক্তির খুব বড় বড় হিসেব প্রকাশ করা হ'ত। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সমরায়োজন সম্বন্ধেও লোকের মনে ঠিক এমনই ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছিল, কার্যত জার্মানীর তুলনায় ফ্রান্সের সমরায়োজন ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

তারপর প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের পরাজয়ের তৃতীয় কারণ হ'ল জাপবিরোধী দল গঠনে যথার্থ সমর-পরিকল্পনার অভাব। জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং বহু আত্মরক্ষাত্মক দু'ভাবে যুদ্ধ চালাবারই সম্ভাবনা ছিল। ভৌগোলিক বিচারে জাপানের চেয়ে তার প্রতিপক্ষদেরই সুবিধে ছিল বেশী। জাপানের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাবার অনুকূল ক্ষেত্র থাকা সত্বেও মিত্রপক্ষ তার সদ্ব্যবহার করে নি। এলুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ফিলিপিন, হংকং ও গুয়ামকে ভিত্তি করে জাপানের ওপর সরাসরি আক্রমণ চালানো সম্ভব ছিল। তদুদ্দেশ্যে সমর থাকতে প্রস্তুত হ'লে জাপানের নিকটবর্তী এই

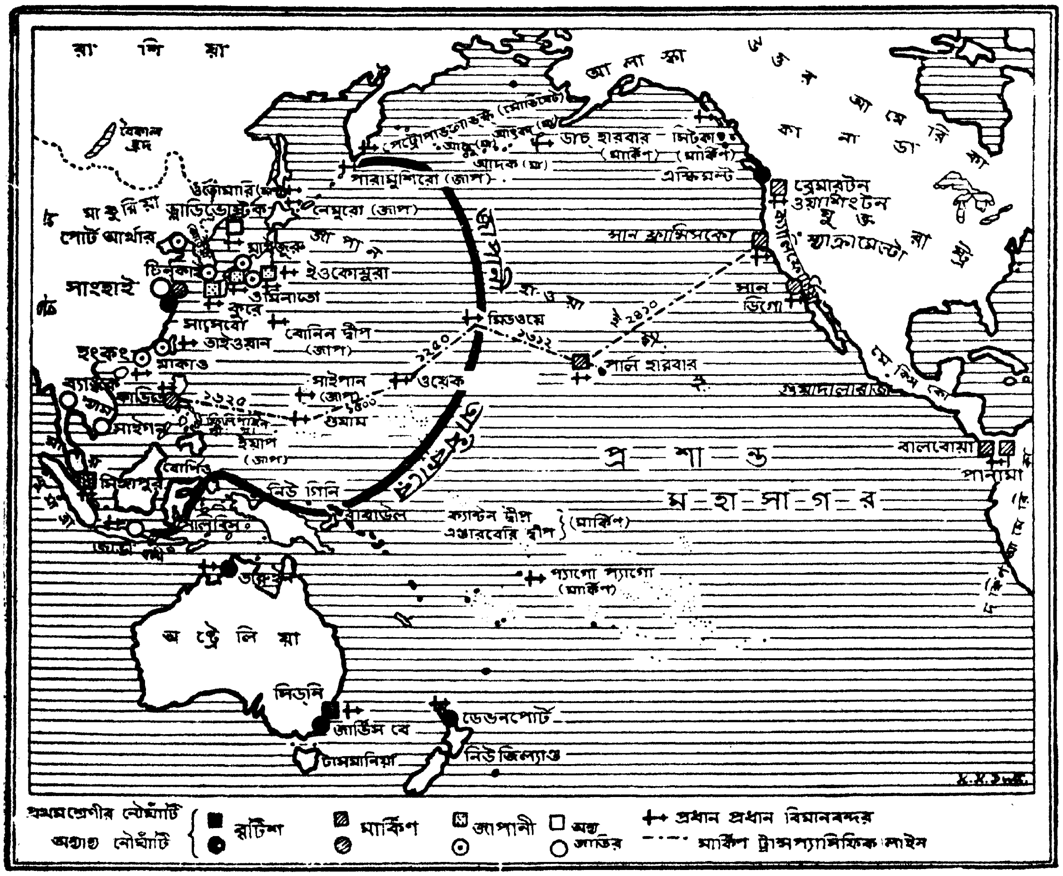
It was not an ABCD (including China) but an ABDF coalition: American, British, Dutch, French. —The Great offensive—by Max Werner, Page 164.

ঘাটিগুলি ভিত্তি ক'রে মিত্রপক্ষ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে জাপানী-দের সম্প্রসারণ রোধ, চীন সাগরের দক্ষিণ ভাগে আধিপত্য লাভ, ফরমোসা এবং হক্কাইডোর উপর চাপ এবং জাপানী দ্বীপ-পুঞ্জের ওপর প্রবলভাবে বিমানহানা দেবার সুযোগ পেত। তারপর যদি আত্মরক্ষাত্মক নীতিতে আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা করা হ'ত তাহ'লেও সিংগাপুরে ঘাঁটিকে কেন্দ্র ক'রে ভালোভাবেই যুদ্ধ করা চলত। এমন কি ফিলিপিন, গুয়াম এবং হংকং হাত-ছাড়া হ'লেও, সিংগাপুর থেকে ভালোভাবে যুদ্ধ চালাবার আয়োজন করলে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় জাপানী সম্প্রসারণ রোধ করা সম্ভব হ'ত; মালয় এবং ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ রক্ষা করা চলত এবং ভারত মহা-সাগরে জাপানীদের প্রবেশপথও উন্মুক্ত হ'ত না। কিন্তু আসলে কি আক্রমণাত্মক কি আত্মরক্ষার কোন সুষ্ঠু সমরপরিকল্পনাই মিত্রপক্ষের তরফ থেকে সেখানে করা হয়নি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মিত্রপক্ষ প্রধানত অবরোধ নীতি ও নৌ যুদ্ধের নীতির ওপর নির্ভর করে জাপানীদের বাধা দেবার চেষ্টা করে; কিন্তু কার্যত সেভাবে যুদ্ধ হয় নি। যুদ্ধটা হয়েছে সেখানে খণ্ড খণ্ড ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে। যুদ্ধের যথার্থ কোন পরি-কল্পনা করতে হ'লে শক্তি সংহত করতে হয়, প্রতিপক্ষকে পাল্টা ঘা দেবার চেষ্টা থাকা আবশ্যক এবং বাধা দানের জন্যে কয়েকটি প্রধান স্থান বেছে নেওয়া দরকার। এসব দিক বিচার করলে প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের কোন সমর পরিকল্পনা ছিল না বললেই চলে।*

* Above all, they (Allies) had no war plan aimed at and adapted to thwarting the Japanese war plan.

পক্ষান্তরে জাপানীরা অত্যন্ত তৎপরতা ও দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ চালায় এবং সমস্ত যুদ্ধটাই ছিল তাদের পরিকল্পিত। তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে সমরনীতির সম্পূর্ণ সংগতি পরিলক্ষিত হয়। আগেই বলেছি, তারা মূল এশিয়াখণ্ডে এবং প্রশান্ত মহাসাগর দু' এলাকায়ই আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। সেজন্যই তারা মহাদেশিক এবং সামুদ্রিক এই দু' নীতির সমন্বয়ে সমরনীতি নির্ধারণ করে এবং তদনুসারে জাপানীরা এক দিকে মূল এশিয়াখণ্ডে এবং অপর দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপ-পুঞ্জ দখল করতে থাকে। কাজেই তাদের সমরনীতি কেবল নৌনীতির ওপর নির্ভর-শীল নয়। জাপানীদের সমর পরিচালনায়

Japan's methods of conducting war were completely misunderstood by the military leadership of the Allies. —*The Great offensive—by Max Werner, Page—165.*



প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়ঃ—

(১) জাপানী বাহিনী এককভাবে নিয়োজিত হয়। জাপান তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী একসঙ্গে নিয়োজিত করে এবং এই তিন-বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। জাপানের স্থল সেনা এবং নৌ-সেনা সমভাবে গড়ে ওঠে। প্রশান্ত মহাসাগরে যখন যুদ্ধ বাধে অন্তত তখন পর্যন্ত স্থল-সেনা এবং নৌ-সেনার সমবেত শক্তি ধরলে জাপান জগতে শীর্ষস্থানীয় ছিল; কোন দেশ হয়ত তার চেয়ে নৌ-বলে বেশী শক্তিশালী ছিল, আবার কোন দেশের হয়ত স্থল-সেনা জাপানের স্থল-সেনার চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল; কিন্তু জাপানের মতো স্থল-সেনা ও নৌ-সেনার সমাবেশ আর কোনোও দেশের ছিল না। এই সত্যটি উপলব্ধি না করলে জাপানের শক্তির যথার্থ পরিমাপ করা যায় না। বলা বাহুল্য, জাপানী বিমানবাহিনীর স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই, নৌ ও স্থলবাহিনীতে তা বিভক্ত এবং এই দুই বাহিনীকে সাহায্য করাই জাপানী বিমানবাহিনীর প্রধান কাজ। জাপানের সেনাপতিরা এক বাহিনীর সাহায্যে কোথাও আক্রমণ চালাবার কথা চিন্তা করেন না; তাঁরা সর্বদাই স্থল নৌ ও বিমান—এই তিন বাহিনীর সমবেত শক্তির কথাই ভাবেন। তারপর ব্যক্তিগতভাবে জাপানী সৈন্যরা সকল অবস্থায়ই লড়তে সক্ষম; অবস্থার সঙ্গে তারা সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং যুদ্ধ ব্যাপারে কোন সনাতনী ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকার মনোভাবও তাদের মধ্যে কম। জাপানী নৌবাহিনী অনেকক্ষেত্রেই কোন স্থান দখলের কালে ভাসমান গোলন্দাজ-বাহিনীর কাজ করেছে। সৈনাবাহী জাহাজ রক্ষা এবং সৈনাদের ভূতলে অবতরণকালে সাহায্য করাই দেখা যায় জাপানী নৌ-বাহিনীর প্রধান কাজ। স্থল সেনার কোন কোন অংশ অনেক সময় নৌবহরের ঘাঁটি দখলের জন্যে নৌসেনার কাজ করেছে। এভাবে জাপানী নৌবাহিনী স্থল-সেনার কাজ করে এবং স্থল-সেনা নৌবাহিনীর জন্যে ঘাঁটি দখল ক'রে দেয় এবং এই পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর ক'রেই তারা দ্রুত সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়। বিভিন্ন বাহিনীর এই ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাই জাপানী সমরনীতির মূল ভিত্তি।

(২) জাপানী স্ট্র্যাটেজীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সামুদ্রিক "ব্লিৎসক্রীগ"। স্থল-যুদ্ধ ও নৌ-যুদ্ধকে একত্র মিলিয়ে তার এই সমরনীতি গ'ড়ে উঠেছে। সাগর পাড়ি দিয়ে দূরবর্তী দ্বীপে গিয়ে দ্রুত অবতরণের কৌশলটা সে ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছে। এর সঙ্গে হিটলারের নরওয়ে অভিযানের খানিকটা মিল দেখা যায়; কিন্তু জাপানের এই অভিযান চলে এক বিশাল মহাসাগর বক্ষে; কাজেই জাপানের সামুদ্রিক "ব্লিৎসক্রীগের" গুরুত্ব অনেক বেশী। স্থল যুদ্ধে জার্মান সেনা জাপানী সেনা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সম্মিলিত নৌ যুদ্ধে জাপানীবাহিনী যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে তা অতুলনীয়। তারা কেবল নৌ যুদ্ধের জন্যে নৌযুদ্ধ করে নি; সামুদ্রিক সম্প্রসারণে তারা নৌ-বল নিয়োজিত করেছে। নৌ, বিমান ও স্থল সেনার সমাবেশে তারা দ্রুত গতিশীল নৌ-অভিযান চালিয়েছে। জাপানের সম্মিলিতবাহিনী সামুদ্রিক এলাকায় যেরূপ দ্রুত কাজ করেছে—এমন কি হিটলারের যান্ত্রিকবাহিনীও অনেক ক্ষেত্রে তা পারে নি।

(৩) জাপান চূড়ান্ত ঘা দিয়েছে তার স্থলসেনা ও বিমানবলের সাহায্যে। এখানেই মিত্রপক্ষের জাপানকে বুঝতে ভুল হয়েছিল। তারা ভেবেছিল প্রশান্ত মহাসাগরে উভয়পক্ষে বড় রকমের নৌযুদ্ধ হবে এবং তারই ওপর জয়পরাজয় নির্ভর করবে।* কিন্তু কেবল নৌনীতির ওপর নির্ভর করে জাপানের সমরনায়কগণ প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান চালাননি। বরং জাপানের নৌবাহিনী তার স্থলসেনা ও বিমানবাহিনীর কাজ এগিয়ে দিয়েছে। আগেও বলেছি যে, জাপানী নৌবাহিনীর প্রধান কাজ দেখা গেছে—সৈন্যবাহী জাহাজগুলিকে রক্ষা করা এবং স্থল সৈন্যদের অবতরণে সাহায্য করা। যতদূর সম্ভব জাপান বড় রকমের নৌযুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা করেছে। সমুদ্রবক্ষে জাপান বিশাল এলাকা দখল করেছে কিন্তু কোন জাপানী ব্যাটল্-শিপ থেকে এপর্যন্ত কোন মার্কিন ব্যাটল্-শিপের ওপর একটিও গোলাবর্ষিত হয়েছে বলে শোনা যায়নি। প্রশান্ত মহাসাগরে যেসব জাহাজডুবি হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে বিমান-আক্রমণে। কেবল সমুদ্রে টহল দিয়ে জাপানী নৌবাহিনী সমুদ্রবক্ষে তথাকথিত আধিপত্য লাভের চেষ্টা করেনি। একমাত্র মিডওয়ে দ্বীপে আক্রমণ করা ছাড়া মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী নৌ-বাহিনী মার্কিন নৌবাহিনীর আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করার জন্যে সম্মুখসমরে কোথা[illegible] অবতীর্ণ হয়নি। দ্বীপবাসী জাপানী[illegible] নৌমনা হওয়া খুবই স্বাভাবিক; কি[illegible] তা' বলে তারা কেবল নৌবলের গ[illegible] মেতে রয়নি; নৌযুদ্ধে জাপানের এ[illegible] গৌরবময় ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও স্থলসে[illegible] এবং বিমানবাহিনীর সঙ্গে সহযোগি[illegible] করতে তার নৌবাহিনী কোনরূপ কুণ্ঠা [illegible] করেনি। সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত ম[illegible] সাগরীয় এলাকা দখল করে জাপানের স্থ[illegible] সেনা ও বিমানবাহিনী।

অথচ সামরিক বিচারে জাপানের নৌ[illegible] প্রথম শ্রেণী এবং স্থলসেনা দ্বিত[illegible] শ্রেণীতে পড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশা[illegible] মহাসাগরীয় এলাকায় জাপানী স্থলসেন[illegible] আশাতীত সাফল্য দেখে একথা ম[illegible] করবার কোন কারণ নেই যে, তারা হিটলারে[illegible] জার্মান বাহিনী বা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে[illegible] লালফৌজের সমকক্ষ। সমরায়োজনে মিত্রপ[illegible] সুদূরপ্রাচ্যে অসম্ভব দুর্বল ছিল ব[illegible] জাপানীরা এত সহজে জয়লাভে সম[illegible] হয়। সোভিয়েট রণাঙ্গনে বা উ[illegible] আফ্রিকায় যেরূপ আধুনিক যান্ত্রিক য[illegible] হয়েছে, সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাক[illegible] তেমন যুদ্ধ একটি স্থানেও হয়নি। প্রতি[illegible] পক্ষের অপ্রস্তুতি ও দুর্বলতার কথা ভাল[illegible] ভাবে জানতো বলেই জাপান অপেক্ষাকৃত [illegible] বল নিয়েও এক বিস্তীর্ণ এলাকা দখ[illegible] অগ্রসর হয়। সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগর[illegible] যুদ্ধে জাপান চার লক্ষ সৈন্য এবং [illegible] হাজারের বেশী বিমান নিয়োজিত করেছি[illegible] কিনা সন্দেহ। অথচ জার্মানীকে প্রত্যে[illegible] বড় যুদ্ধেই এতদপেক্ষা বেশী সৈন্য [illegible] বিমান নিয়োজিত করতে হয়েছে। আধুনি[illegible] যান্ত্রিক যুদ্ধে সমকক্ষ কোন শক্তির স[illegible] লড়তে গেলে জাপানীরা দাঁড়াতে পার[illegible] কিনা তার পরীক্ষা আজও হয়নি।

পার্ল পোতাশ্রয়ে জাপানী বিমানহানা[illegible] একটা আকস্মিক ঘটনা বলে' ধরে নেও[illegible] চলে না; জাপানের সমগ্র সমরপরিকল্পন[illegible] তা' একটা অঙ্গ। প্রশান্ত মহাসাগ[illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিকেন্দ্রে হানা দি[illegible] তার নৌবল ও বিমানবল ধ্বংস বা অস্থ[illegible] সাময়িকভাবে অকর্মণ্য করাই ছি[illegible] জাপানের উদ্দেশ্য। পার্ল পোতাশ্রয়ে হা[illegible] দিয়ে তার সেই উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফ[illegible] হয় এবং তাতেই খানিকটা [illegible] ম[illegible] সে ফিলিপিন ও মালয়ে অভিযান চালা[illegible] পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহ[illegible] সাগরীয় এলাকায় তার আসল লক্ষ্য ছি[illegible] সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর ঘাঁটি দখলের জন্যে জাপান বহুদিন আগে থেকেই চেষ্টা কর[illegible] আসছিল। (আগামীবারে সমাপ্য)

* "The United States and Britain saw the world through marine glasses that did not reach to the shores. Tokyo, its big Navy notwithstanding contemplates the Pacific area through field glasses."
—*Alexander Kiralfy.*

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

"সপ্তর্ষি"

এমাইনো এসিডের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ এই প্রথম শরীরের পক্ষে amino acidএর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছে। ইহার সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইলেও জানা গিয়াছে যে, ইহা ভিটামিনের ন্যায় জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক অধ্যাপক William C. Rose (Nutrition Foundation-এ) বলিয়াছেন যে, তাঁহার আশ্রিত "গিনিপিগ্‌সমূহ প্রমাণ করিয়াছে যে, ১২টি এমাইনো এসিড জন্তুজানোয়ার এবং মানুষ উভয়ের পক্ষে সমানভাবেই অপ্রয়োজনীয়। ৮টি এসিড উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজনীয় এবং "হিস্টিডিন্" নামক একটি এমাইনো এসিড মানুষের দেহের মধ্যে যবক্ষারযান সমপরিমাণে রাখিবার পক্ষে প্রয়োজনীয়।

এমাইনো এসিড সংক্রান্ত পূর্বতন সকল পরীক্ষাই জন্তুর সাহায্যে করা হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে অধ্যাপক Rose "threonine" নামে দশম এমাইনো এসিড আবিষ্কার করেন। ইহা সাধারণ বৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয়। খাদ্যের মধ্যে যে প্রোটিন আছে তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া এমাইনো এসিডের সৃষ্টি হয়। এমাইনো এসিডের সংখ্যা হইতেছে ২২টি।

গত আট মাস ধরিয়া ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি গ্র্যাজুয়েট ছাত্রকে কৃত্রিম আহার করাইয়া মানুষের মধ্যে এমাইনো এসিডের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত পরীক্ষা চলিতেছে। ছাত্রগণ বৈচিত্রহীন সারবস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রোটিন ব্যতীত প্রায় সকল রকম খাদ্যই তাহাদের আহারের নিমিত্ত দেওয়া হয়। প্রোটিনের পরিবর্তে ছাত্রগণ পরিস্রুত জলে এমাইনো এসিডের দ্রাবণ পান করিয়া থাকে।

মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া হইতে রক্ষা পাইবার আলোচনা

৮ই জুলাই হইতে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের "সুরাসার সম্বন্ধীয় আলোচনার বিদ্যালয়ে" ছয় সপ্তাহের জন্য এক অধিবেশন বসিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের বিদ্যালয় এই প্রথম। ইহার বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে,— "সুরাসার সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহে, বিশেষ বৈজ্ঞানিক চিন্তাযুক্ত নেতৃবর্গের অভাবে সুরাসার পানে প্রতিক্রিয়া এবং তাহা হইতে মন্দ অবস্থার সৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা সঠিকভাবে হইতেছে না। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইতেছে ঐ সকল নেতৃবর্গকে উপরিউক্ত বিষয়সমূহে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সহিত বিশেষভাবে পরিচয় করাইয়া দেওয়া।"

সুরাসার বিষয়ে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ Doctor E. N. Kellinek-এর পরিচালনায় ঐ বিদ্যালয় ১৮ই আগস্ট হইতে আরম্ভ হইবার কথা ছিল। একটি পরামর্শদাতা সমিতি এবং সুরাসার সংক্রান্ত আইন, চিকিৎসা, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ক ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। আশা করা যায় সমগ্র জাতির ছাত্রগণের নিকট হইতে সাড়া পাওয়া যাইবে।

নূতন ধরণের আলোকবিজ্ঞান সংক্রান্ত কাঁচ

আলোক বক্র করিবার অদ্বিতীয় ক্ষমতাসহ প্রকৃত নূতন ধরণের আলোকবিজ্ঞান সংক্রান্ত কাঁচ হইতে দৃষ্টি আলোকচিত্র এবং জীবাণুবিষয়ক পরীক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত লেন্স তৈয়ারী হইতে পারে। মার্কিন "অপটিকাল কোম্পানীর" গবেষণা বিষয়ক পরিচালক E. D. Tillyer দশ বৎসর গবেষণার পর ঐরূপ উন্নত ধরণের কাঁচ পাইবার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ কাঁচ প্রস্তুত করিতে বালুকার প্রয়োজন হয় না। এক ধরণের উন্নত কাঁচ প্রস্তুত করিতে 'বেরিলিয়ম অক্সাইড' ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কাঁচ প্রস্তুত করিতে জিংক অক্সাইডের পরিবর্তে 'ক্যাডমিয়ম্ অক্সাইড' ব্যবহার করা হয়। ইহা এক বিরাট পরিবর্তন। পূর্বের যে সকল কাঁচ নির্মাণে বালুকা ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহাদের সহিত তুলনায় এই সকল নূতন কাঁচের আলোক বক্র করিবার ক্ষমতা অনেক বেশী এবং বিভিন্ন রঙীন রশ্মিতে আলোকের বিশ্লেষণ পূর্বের কাঁচ অপেক্ষা ইহার অনেক কম।

আলুর মূলের অংশ এবং খোসা হইতে আলু প্রস্তুত প্রণালী

Maurice Copisarow 'নেচার পত্রিকায়' এক বিবরণে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেলফাস্টের Alexander Cleland ১৯৩৭ সাল হইতে আলুর মূলের অংশ এবং খোসা হইতে আলুর চাষের বিষয় পরীক্ষা করিতেছেন। এক মরসুমের শেষে ২৪ পাউণ্ড আলুর ২৮৮টি "চক্ষু" হইতে মোট ১৭২ পাউণ্ড ওজনের ৮০৪টি আলু এবং বহু বীজ আলু পাওয়া গিয়াছে। খোসাগুলিকে জমির উপর ইতস্ততঃ ছড়াইয়া মাটির দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল। চারাগাছ সকল শীঘ্রই অংকুরিত হইয়াছিল এবং শেষে ব্যবহারোপযোগী ৩২ পাউণ্ড আলু এবং বহু বীজ আলু উৎপন্ন হইয়াছিল। ফসলসমূহ উন্নত ধরণের এবং জীবাণু শূন্য ছিল।

নূতন উপায়ে প্রোটিন উদ্ধার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের Irwin W. Tucker এবং Dr. A. R. Balls কর্তৃক একটি পরিস্রবণ প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহার ফলে গম হইতে প্রতি বৎসর ১০০,০০,০০০ পাউণ্ড প্রোটিন উদ্ধার করা সম্ভবপর হইতে পারে।

কাগজ কলের পরিত্যক্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ সোডিয়ম সালফেটের দ্রবণের সহিত গমকে মিশ্রিত করা হয়। প্রোটিন গম হইতে নির্গত হইয়া জমিয়া যায় এবং পীত বর্ণের ঘন ফেনার আকারে দ্রবণের উপরিভাগে দেখা দেয়। শুষ্ক অবস্থায় ইহা দেখিতে ডিমের শ্বেত অংশের মত। এই প্রোটিন মানুষের ব্যবহারের উপযোগী, পাউণ্ড প্রতি ইহার মূল্য প্রায় পাঁচ সেন্ট অর্থাৎ প্রায় দশ পয়সার মত। মূল্যবান যবমণ্ডের (barley-malt) পরিবর্তে পরিস্রবণের বিশেষ উৎকৃষ্ট দ্রব্যটি সুরাসার পরিস্রবণের নিমিত্ত ব্যবহার করিতে পারেন।

এই প্রণালী আবিষ্কারের পূর্বে সুরাসার পরিস্রবণের পরে প্রোটিন উদ্ধার করা হইত। এই প্রোটিন গৃহপালিত জন্তুর আহারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত, অন্য কোন প্রয়োজনে লাগিত না। নূতন উপায়টি অধিকতর সহজ এবং ইহার দ্বারা যে কেবল বেশী মাত্রায় প্রোটিন উদ্ধার সম্ভব তাহা নহে, উপরন্তু ইহা মানুষের প্রয়োজনে লাগিবার পক্ষে যথেষ্ট নিশ্চয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে নূতন রসদ

উত্তর আফ্রিকা হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তথাকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিমান বাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলের নূতন রসদ প্রেরণ করা হইয়াছে। এই রসদে আছে বিবিধ সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী যাহার রন্ধনের প্রয়োজন হয় না। উষ্ণ বা শীতল জলের সাহায্যে এই রসদ হইতে প্রাতঃরাশে ব্যবহৃত ছোলা জাতীয় পদার্থ, কফি হ্যাম (শূকরের লবণাক্ত জঙ্ঘা) ডিম, কাবাব, সিদ্ধ মাংসখণ্ড এবং আরও অনেক প্রকার খাদ্য পাওয়া যায়। কাষ্ঠের উপাদানে নূতন রসদ রাখা হয়। প্রতি উপাদানে পাঁচজন বাহিনীর একদিনের উপযোগী আহার দ্রব্য থাকে।

বোমার চঞ্চল শিখা হইতে রক্ষার জন্য কাঁচ নির্মিত বস্ত্রের আচ্ছাদন

বোমাবর্ষী বিমান রক্ষার জন্য এবং লক্ষ্যস্থল প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত চঞ্চল শিখার দীপ্তি হইতে বোমাবর্ষণকারীর চক্ষু রক্ষার জন্য কাঁচের তন্তু নির্মিত আচ্ছাদনের ব্যবহার আজকাল প্রচলিত হইয়াছে। দশলক্ষ

বাহিরে দীপ্তি শাক্তযুক্ত বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত ম্যাগনিসিয়ম শিখার সহিত এই সকল আচ্ছাদন* ব্যবহার করা হয়। এই প্রদীপশিখা যদি উপর হইতে আচ্ছাদিত না হইত তবে বোমাবর্ষণকারিগণ নিম্নের জমি দেখিতে পাইত না এবং আক্রমণকারী বিমানসমূহকে শত্রুপক্ষের বিমানধ্বংসী কামানের লক্ষ্য পড়িতে হইত। 'অনলম্ভ গ্রাফাইট' নামক রঙের সাহায্যে কাচ-নির্মিত বস্তুটিতে একটু আবরণ দিলেই ইহা সকল প্রয়োজনের উপযোগী হইবে। কারণ ইহা পরিবাহক নয় এবং তাপবিকিরণে [illegible] তাপ সহ্যকারী।

ম্যালেরিয়া রোগে বিসমাথ এবং কুইনাইন

দক্ষিণ ক্যারোলাইনা [illegible] চিকিৎসক Martin D. Young, Sol B. McLendon এবং Roy S. Marr প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জানা যায় যে বিসমাথ এবং কুইনাইন একত্রে প্রয়োগে [illegible] ম্যালেরিয়া রোগে কুইনাইন সহযোগে 'থায়োবিসমল' (বিসমাথ ঘটিত একটি যৌগিক পদার্থ)এর ব্যবহার প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

খাদ্য শুষ্ক করিবার জন্য 'ইনফ্রা রেড' রশ্মির প্রদীপ

পেনসিলভানিয়া ষ্টেট কলেজের অধ্যাপক John E. Nicholas আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ইনফ্রা রেড রশ্মির প্রদীপের বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা ফল এবং তরি-তরকারী দ্রুত শুষ্ক করা যায়। শুষ্ক করিবার ঘরে ইনফ্রা রেড রশ্মির প্রদীপ রাখিবার একটি স্থান আছে। প্রদীপ জ্বালাইবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে। খাদ্য রাখিবার কোন উচ্চতাপের প্রয়োজন হয় না, কেননা ইনফ্রা রেড রশ্মি খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অতি সহজেই প্রবেশ করে এবং ইহার ফলে ঐ সকল পদার্থ হইতে [illegible] অতি শীঘ্র নির্গত হয়।

পক্ককেশের ভিটামিন চিকিৎসা

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Harold Brandelone, Dr. Elizabeth Main এবং Dr. J. Murray Steele এক্সপেরিমেণ্টাল বায়োলজি এবং মেডিসিনের সমিতির বিবরণীতে যাহারা পক্ককেশের পূর্ব বর্ণ ফিরিয়া পাইবার জন্য ভিটামিন চিকিৎসার আশ্রয় খুঁজিতেছিল তাঁহাদের আশাভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পুরা আটমাস অপরিমিত ভিটামিন চিকিৎসার ফলে ১৯ জন বয়স্ক নরনারীর মধ্যে মাত্র দুইজনের কেশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে। ১৭ জন রোগীর মধ্যে সাধারণ যে সমস্ত পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা হইতেছে কেশ শীতল অথবা তৈলাক্ত হওয়া, তারের ন্যায় ইতস্ততঃ রুক্ষ কেশের উৎপত্তি এবং কেশের চাকচিক্য ভাব হওয়া। মাত্র একজনের কেশশূন্য মস্তকে নবীন এবং উভয় বর্ণের কেশের উৎপত্তি হইয়াছিল। যে দুইজনের মাথার কেশের সন্তোষজনক পরিবর্তন হইয়াছিল তাহাদের এবং আরও পাঁচজনকে প্রত্যহ ক্যালসিয়াম প্যান্টোথিনেট, প্যারাএমাইনো-বেনজোয়িক এসিড এবং সুরা প্রস্তুতকারীর ইষ্ট সেবন করান হইত। অন্য পাঁচজনের কেশের সন্তোষজনক পরিবর্তন হয় নাই।

হাওয়া বদল

(১২০ পৃষ্ঠার পর)

অনুপম চকিতে ফিরিয়া তাকাইল। দেখিল, বকুল [illegible] করিয়াছে; তার দুই চোখে বিস্ময় ও অভিমানের দীপ্তি, মেয়েটি মূর্তিমতী ভর্ৎসনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। মেয়েটাও কুকুরের মতো সেই ছেলেটি পৃষ্ঠপ্রদর্শনে রত। সহসা অপার আনন্দে অনুপম হাসিয়া উঠিল। হি হি হি......এমন প্রাণ-খোলা হাসি গত তিন বৎসরে সে একটি বারও আর হাসে নাই।

রাত্রির আহারের অন্তে বকুল প্রায় রোজই আসিয়া বারান্দায় দাঁড়ায়। আজও এক মিনিটের জন্য আসিয়াছিল। সেই তখন হইতেই অনুপম ওদিকে তাকাইয়া আছে, তারপর এখন গভীর রাত্র হইয়াছে। 'বকুল এমন লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, মিছিমিছি আমি রাগ করি। শরীরটা ভালো নেই কিনা, তাই একটুতেই রাগ করি। বড় খিটখিটে হয়ে গিয়েছি। আমি কিন্তু সত্যিই আর তোমার সঙ্গে আড়ি করি নি, ওটা মিছি-মিছি, ভয় দেখানো আড়ি......'

মধ্যরাত্রের পৃথিবীতে শুধুমাত্র গাছ-পালার নিঃশ্বাসের শব্দ হয়। জানলা দিয়া দূরে কটা তারা দপদপ্ করে; অলস এবং করুণ একটু বাতাস আসে।

অনুপম কহিতে লাগিল, 'এই তো আমরা পুরী যাচ্ছি, বকুল, তারপর এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি ঠিক হয়ে যাব। কলকাতায় ফিরে এসেই তোমাদের সঙ্গে আমার চেনা হবে, বুঝলে? তোমাকে ছেড়ে যেতে সত্যি কিন্তু আমার ইচ্ছেই হচ্ছে না, কিন্তু এবার মুখ-পোড়া ডাক্তারটাকে এড়াতে না পারলে আমার আর সুস্থ হওয়াই হবে না। তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে আসব বলেই পুরী যেতে রাজি হয়েছি, নইলে কিছুতেই যেতুম না। কতদিন আর, সাত দিন, না হয় দশ দিন, পনেরো দিন......'

অনুপম পুরীতে গেল। কিন্তু কোনও দিনই আর ফিরিয়া আসিল না।

বিদুষী ভার্যা

(১১০ পৃষ্ঠার পর)

দিবাকর বলিল, "থাকলে অবশ্য দেব।" তারপর যূথিকার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া লইয়া বলিল, "আমাদের ইজাজৎ আছে নাকি যূথিকা?"

মুখ টিপিয়া অল্প হাসিয়া যূথিকা বলিল, "আছে।"

যূথিকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংস্থানের বিস্তার দেখিয়া খুশি হইয়া দিবাকর বলিল, "আছে? তাহলে একটু বার করে দাও"।

যূথিকা বলিল, "ইজাজৎ ট্রাঙ্ক-বাক্স থেকে বার করতে হয় না, মুখ দিয়ে বার করতে হয়। ইজাজৎ মানে অনুমতি।"

যূথিকার কথা শুনিয়া কৌতুকের নিঃশব্দ হাস্যে দিবাকরের মুখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর আরও মৃদু করিয়া বলিল, "কি সর্বনাশ! আমি মনে করেছিলাম, মালিশ ক'রে পা টেপবার জন্যে ইজাজৎ তেল-টেল কিছু হবে!"

(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ

আধুনিক তরুণদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের ম্বন্ধে কোন কথা বলা কঠিন; কারণ দেশের সাধকগণ যে ভাব অন্তরে নিয়ে ং যে অলংকারের সাহায্যে এই লীলা না করেছেন, সে ভাষা এবং সে অলংকার মরা বুঝে উঠতে পারি নে; সত্য কথা তে গেলে—আমরা চিন্তা করি, রজীতে; সুতরাং আমাদের ভাষার রগুলি বাঙলা হ'লেও ভঙ্গীটি থাকে রজী; এজন্য এদেশের প্রাচীনদের প্রাণের বুঝে উঠা আমাদের কাছে কঠিন এবং এ দেশের সংস্কৃতির ব্যাপ্ত স্তরে মাদের মনন প্রবেশ কর্তে পারে না। চ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব চিত্তে স্ফূর্ত করে পারার তরুণদেরই। বিষয়ের চিন্তার যুগে দের মন জীর্ণ হয়ে গিয়েছে তাদের জন্য তত্ত্ব নয়। তারুণ্যের লাবণ্যে শ্রীকৃষ্ণ না অনুরঞ্জিত। এমন জন্মই-বা কার, ন কর্মই-বা কার। তাঁর জন্ম হয়েছিল সের কারাগারে, তিনি পালিত হয়েছিলেন প-পরিবারে এবং তাঁর সমগ্র জীবনে ার পরম ধর্ম মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ব সংস্কৃতির পরম উৎকর্ষের আকর্ষণ ছে তাঁর জীবন লীলায়। সুতরাং দুষের অন্তরের আকুতি তাঁর চরণে দিনই প্রণতি জানাবে এবং সে আকুতির র দিয়ে তাঁর রসবিগ্রহও নিত্য হয়ে বে। মানুষ তাঁকে যুগে যুগে প্রত্যক্ষ বে। কারণ আমরা প্রত্যক্ষ করি যে . সে রূপের প্রকৃত স্বরূপ কি? শের ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করতে সে কথাটা ভেঙ্গে বলেছেন। তাঁরা ন, ইন্দ্রিয়ের আকুতিই রূপে স্ফূর্ত উঠে এবং ইন্দ্রিয়ের এই আকৃতি জগতে তকে উদ্দীপ্ত করে। স্মৃতি উদ্দীপ্ত মধুরতায় এবং মধুরতার ভিত্তি হ'ল ব। শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে মানুষের রের সকল ভাবধারার সমাহার রয়েছে। শের সাধকেরা বলেন, মানুষের তির সর্বভাবে পরিপূর্তির চিৎঘন র্তিই হলেন শ্রীকৃষ্ণ। যতদিন মানুষের রে অবিক্ষিপ্ত থাকবে, ইষ্ট সাধনা থাকবে দিন অভীষ্টস্বরূপে কৃষ্ণলীলারও অনু- চলবে। ঋষিরা বললেন, কৃষ্ণ হাসের বস্তু নন; তিনি চলে যাননি, ন আছেন এবং তাঁর মর্ত্যলীলা হয়ে- , তাঁর অনুধ্যানের ভিতর দিয়ে তত্ত্বকে মানুষের কাছে উন্মুক্ত করবারই । তাঁরা বলেন, তিনি যখন দেহ ধারণ এসেছিলেন, প্রকট লীলা করেছিলেন, তখন সকলে তাঁকে দেখেনি এবং দেখলেও ধরতে পারেনি; কারণ তাঁর সে লীলা সাধারণ লোকের কাছে ছিল প্রচ্ছন্ন লীলা; তিনি তাঁর প্রকট লীলার এই ছায়া দেহটি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিত্যলীলাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর নামের ভিতর। এইভাবে থাকলেন, সকলের হয়ে থাকলেন, ভারতের আত্মার ব্যাপ্ত রসে দীপ্ত হয়ে থাকলেন। তাঁর এই নরলীলা তাঁর স্বরূপ এবং এই তাঁর সর্বোত্তম লীলা। অর্থাৎ এই লীলাকে আশ্রয় করেই তিনি মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন; শুধু তাই নয়, জগতের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। অন্য কোন লীলায় এটি সম্ভব হয়নি; সকল ভাবে মানুষের মনে তিনি প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তিনি ভূতভাবন ছিলেন বটে; কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে জগৎকে ভাবিত করতে সমর্থ হননি; অর্থাৎ জগৎটা ভাবে ভরে দিতে পারেননি; জগৎ মানুষের পক্ষে মধু হ'ল, মানুষ মধুবিদ্যা লাভ করল তাঁর এই লীলাকে আশ্রয় করে। ধর্মের নামে মানুষ জগৎকে তুচ্ছ করতেই শিখেছিল, মানুষকে তুচ্ছ করে ছুটেছিল স্বর্গ কামনার আলেয়ার পিছনে, সেবা ছেড়ে, ত্যাগ ছেড়ে বৈরাগ্যের নামে জড়িয়ে ধরেছিল ভোগকে—এইভাবে তাদের জীবন ছিল পরোক্ষ; এই লীলায় তিনি মানুষকে প্রত্যক্ষ জীবনে, নিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। মানুষকে দিলেন মানুষের পরম মহত্ত্ব। গীতার তত্ত্ব কথা তো এই। গীতাই শ্রীকৃষ্ণের বাণীমূর্তি। গীতার ভিতর দিয়েই আমরা তাঁকে ধরতে পারি এবং অনুস্মরণের সাহায্যে অর্থাৎ নামের মধ্যে তাঁকে নিত্য করে পেতে পারি। শুধু ঐতিহাসিক বিচারের মধ্যে কৃষ্ণকে পাওয়া প্রকৃত পাওয়া নয়, কারণ সে সব ক্ষেত্রে তিনি পরোক্ষ এবং পরোক্ষ বিচারগত যে আদর্শ, যে আদর্শের মধ্যে প্রত্যক্ষতার স্পর্শ হৃদয় পায় না, সে আদর্শে কার্যে প্রবর্তনার মধ্যে সামর্থ্য থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনের জোর ব্যক্তি-জীবনে স্ফূর্ত করে, সমাজ-জীবনে তা সত্য করতে হ'লেও শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষতার সূত্রে চিত্তে মূর্ত ক'রে পাওয়া প্রয়োজন। আমার তরুণ বন্ধুরা যদি বুঝে থাকেন যে, ধর্ম পরোক্ষ, অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের কোন সম্পর্ক নেই, তবে তাঁদের বলব, তাঁরা অন্য যে ধর্মের সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা পোষণ করুন না কেন, শ্রীকৃষ্ণের ধর্মের সঙ্গে সে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম—গীতার প্রবর্তিত ধর্ম, কেবল তাই বা কেন, এই শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বকে ভিত্তি করে বাঙলার বৈষ্ণবগণ যে ধর্ম প্রচার করলেন সে ধর্ম বাস্তব-জীবনের সমস্যা সমাধানেরই ধর্ম। সত্য কথা বলিতে কি—স্বর্গ সাধনা প্রভৃতি পরোক্ষবাদকে তাঁরা একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে যে ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে সে ধর্ম জগৎকেই বড় বলে বুঝেছে; গীতার আগা-গোড়া তো সেই কথা—যজ্ঞের জন্য কর্ম এবং সে যজ্ঞ যে আগুনে ঘি ঢালার প্রক্রিয়া মাত্রই নয়, সাক্ষাৎ সম্পর্কে জগতের লোকের সেবা এ-তো স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। যে পথে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করলে জগতের লোকের অভাব পূরণ করবার মত শক্তির উৎসমূলে যাওয়া সম্ভব হ'তে পারে, গীতায় তারই সন্ধান দেওয়া হয়েছে; বাঙলার বৈষ্ণবেরাও গীতাকে ব্যতিক্রম করেননি। গীতার অন্ত-র্নিহিত যজ্ঞার্থের গূঢ়তাকেই তাঁরা রসো-পলব্ধির প্রগাঢ়তা দিয়ে সমাজে সত্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে গীতার যজ্ঞের অনুপ্রেরণার রস উচ্ছল হয়ে উঠেছে। আমার তরুণ বন্ধুদিগকে এই সত্যটি একটু তলিয়ে বুঝবার জন্যে অনুরোধ করছি। ধর্মকে তাঁরা অপ্রয়ো-জনীয় বলতে চান বলুন, কিন্তু প্রেমকে প্রয়োজন বলে স্বীকার করতে তাদের আপত্তি করবার কারণ কিছু দেখা যায় না; কারণ জগতের লোকের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার যে প্রেরণা বা তাপ আমরা অন্তরে অনুভব করি, তাই তো প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ লীলার অনুধ্যানের ভিতর দিয়ে এদেশের সাধকেরা এই প্রেমকেই উপলব্ধি করেছেন। ভাগবতের ঋষি স্পষ্ট ভাষাতে বলেছেন, ধর্ম বলতে আর কিছুই নয়; লোকের দুঃখে কষ্টে তাপ বোধ করাই ধর্ম এবং অখিলাত্মা ভগবানের সেই হ'ল পরম আরাধনা। ধর্মের নামটা আমরা করি বা না করি, লোকসেবার তাপ অন্তরে নিয়ে কর্ম করলেই শ্রীকৃষ্ণের আদর্শের অনুসরণ করা হবে। নানারূপ আচার-বিচার এবং কুসংস্কারের ভিতর দিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ যে সত্য-ধর্ম গীতার সাহায্যে প্রদীপ্ত করেছিলেন, তা আজ ঢাকা পড়েছে এবং আচার-বিচারের সংস্কারের ভিতর দিয়ে পাকে পাকে ধর্মের নামে কাম্য কর্মের যে চাপ এসে জাতিকে অবসন্ন করে ফেলেছে, যুক্তি বুদ্ধি যতই দেখানো যাক না কেন, তথা-কথিত বিজ্ঞ এবং প্রবীণদের মন থেকে

সে পাক ছাড়ান বড়ই কঠিন; এজন্য তরুণদেরই এগিয়ে আসতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার সময় তথাকথিত এই প্রবীণের দল তাঁর ধর্মকে ধরতে পারেনি; এজন্য উদ্ধবের মত শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী কত দুঃখ করেছেন। তিনি বলেছেন, লোকে কেবল বাইরের আচার-বিচার নিয়েই মেতে থাকলো; শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেমের আগুনে জ্বালালেন, তা দিয়ে অন্তরকে একটুও তপ্ত করলো না। বাইরে যত যা করলো, অন্তর থাকলো এদের সমান দুর্বল হয়ে। মহাভারতে আমরা দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল এই তরুণদেরই দল। এজন্য একান্ত আত্মীয় স্বজন যারা, তাদের সঙ্গে তরুণদের বিরোধ ঘটেছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মানবতার উদার আদর্শকে তারা সংকীর্ণ সংস্কারের বেদীমূলে বিসর্জন করতে রাজী হয়নি। শ্রীকৃষ্ণের সেই আহ্বান আজ এসেছে; ধর্মের নামে এদেশে কেবল কর্মকাণ্ডই সার হয়েছে; জীবন দিয়ে সেটাকে সত্য করবার মত প্রেরণা সমাজে আজ জাগছে না। একদিকে দারিদ্র্যের বেদনা ও হাহাকার অন্যদিকে ধর্মের নামে অনাচার সমাজকে দুর্বল করে ফেলেছে। সত্য ধর্মের যারা পূজারী, তাদের আজ এগিয়ে আসতে হবে। শ্রীকৃষ্ণই এই তরুণদের হলেন নেতা; তিনি গীতার অনুপ্রেরণায় তাদের বলীয়ান করে তুললেন। শ্রীকৃষ্ণ পুরাতন হননি, আর তাঁর গীতাও পুরাতন হয়নি; পুরাণ হলেও এ আদর্শ নিত্য-নূতন হয়ে রয়েছে এবং থাকবেও। ভারতে যে ধর্মের কথা বলছি তার সনাতনত্ব এইখানে। যুগোচিতভাবে সে ধর্মের পরিবর্তন ঘটবে না, এ হিসেবে এ ধর্ম সনাতন নয়, যুগোচিত সকল পরিবর্তনের বহিরঙ্গের ভিতর দিয়ে যা নিহিতার্থরূপে থাকবার মত সামর্থ্য রাখে তাই হচ্ছে এদেশের ধর্মের সনাতনত্বের অর্থ। সে অর্থ হচ্ছে প্রেম—কাম নয়। ধর্মের নামে যেখানে কাম দেখা দেয়, ইতর স্বার্থের সংকীর্ণ আবর্জনায় মনের দৈন্য বাড়ে, কেবল খুৎ খুৎ করে চলার বাতিকই বড় হয়ে উঠে, সে অধর্ম। এই অধর্ম থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করবার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলা হয়েছিল; ভাগবতের ঋষিকুন্তী দেবীর মুখ দিয়ে এ সত্যটি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন অবিদ্যা এবং কামকর্ম্মের পীড়নে এ জগতের লোক ক্লেশ পাচ্ছিল। নিজের নিষ্কাম জীবন-লীলার ভিতর দিয়ে প্রকৃত ধর্ম্মকে মানব সমাজের উদ্দীপ্ত করে তুলবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। তিনি অপ্রকট হলেও তাঁর জীবনের প্রেরণা সত্য হয়েই আছে এবং তিনি অনুশাসিতাস্বরূপে মানব সমাজকে সাম্যের অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। যে শাসন বাইরে শাসন, তা দেশ, কাল এবং সমাজের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তা কোনদিন বিশ্বমানবের সমস্যার সমাধান করতে পারে না, আর সাম্যও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, কিন্তু অনুশাসন আত্মাকে আশ্রয় করে শাসনভয়ের গণ্ডীকে ডিঙিয়ে ভাবের দ্বারা শাসন, প্রাদেশিকতাকে ডিঙিয়ে সকল দেশ এবং সকল জাতির মনের মানকে আপ্যায়ন করে শাসন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের ভিতরে এই শাসন রয়েছে, এজন্য প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বমানবতা এবং সার্বভৌম আদর্শ আমাদের জীবনে এই তত্ত্বকে আশ্রয় করেই সত্য হয়ে উঠতে পারে। ভাদ্র মাসের আকাশকে আচ্ছন্ন করে একদিন মেঘ জমে উঠেছিল, দুষ্ট রাজশক্তির পীড়নে জেগেছিল দিকে দিকে হাহাকার, সেই দুর্যোগময়ী রজনীতে কংসের কারাগারে দেবশিশুর আবির্ভাব ঘটেছিল; কারাকক্ষের দুর্ভেদ্য অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাঁর অভয় হাসিতে—ভয় নাই, আমি এসেছি। আজকার জগৎজোড়া এই মহাদুর্যোগের দিনে সে অভয়বাণী কি আমরা নিজেদের অন্তরে সত্য করে পাব না? নইলে ভরসা কোথায়? আসুরিক পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে; হিংসার প্রতিকারে হিংসার আগুন বিশ্বজগতের হয়েই জ্বলে উঠবে। আজ কে মানুষের ব্যথার কথা শুনবে, মানব মহিমাকে সেবা এবং ত্যাগের পথে সত্য করে তুলবে। কে বলবে, আমি রাজা নই, দেখ না রাজাদের ভয়ে আমি সমুদ্রের ধারে গিয়ে লুকিয়েছি, আমি রাজা হতে চাইনে, দেখছ না, আমি নিজে রাজা হতে পারলেও উগ্রসেনকে রাজপাট ছেড়ে দিয়েছি। আমি কাঙাল, আমি কাঙালের বন্ধু, যেখানে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত—সেখানেই আমার স্থান। আমাকে রাজা বলে, আমাকে পণ্ডিত মনে করে, আমাকে দেবতা বা গন্ধর্ব মনে করে, যক্ষ বা দানব এমন কিছু মনে করে, তোমরা কেউ দূরে থেকো না। আমি দীনের বন্ধু, আমি তোমাদেরই একজন—এই বলে মনে করো। আমাকে বড় বলো না, আমাকে বড় বললে আমি বড় ব্যথা পাই। আমি তোমাদের সকলের। গীতার দেবতার এই যে পরিচয় আমরা রুক্মিণী দেবীকে সম্বোধন করে ভাগবতে এবং গোবর্ধন-ধারণের পর বৃন্দাবনের গোপগণকে সম্বোধন করে বিষ্ণুপুরাণে তাঁর মুখ থেকে পাই, এই পরিচয়ই তো বাঙলা দেশে মহাপ্রভুর জীবনে ব্যক্ত হয়েছিল। আপনারা সকলে সেই পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জানুন, চিনুন এবং তাঁকে আপনার করে নিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মানবধর্মকে সমাজ-জীবনে মূর্ত্ত করে তুলুন। পরাধীনতার সমস্ত ভয় এবং গ্লানি দেশের বুক থেকে দূর হয়ে যাক। মনে রাখবেন, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অন্তর্নিহিত এই সত্যকে আশ্রয় করেই আমরা আমাদের জাতীয়-জীবনের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হবো। আর এটিও তলিয়ে বুঝতে হবে যে, ভারতের জাতীয়-জীবনের এই সমস্যার সঙ্গে বিশ্বমানবের সমগ্র সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে। ভারতবর্ষ যতদিন দুর্বল থাকবে, ভারতবর্ষে যতদিন ত্যাগের ধর্ম্ম মানবসেবার পরম মহিমায় প্রদীপ্ত হয়ে বৈপ্লবিকভাবে বিস্তার না করবে, ততদিন পর্যন্ত প্রবলের পীড়ন এবং গীতার কথায় শত আশা পাশে বদ্ধ অন্যায়ের পথে অর্থ সঞ্চয়কারীদের শোষণও জগতে চলবে। আমরাই আঢ্য, আমরাই অভিজন, আমরাই হর্তাকর্তাবিধাতা এই আসুরিক প্রবৃত্তিরই ততদিন জগতে উদ্দাম তাণ্ডব চলবে। এই মনোভাব উৎখাত করবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের উদ্ভব হয়েছিল। আজ জগৎব্যাপী পশু-পিপাসার আগুন জ্বলে উঠেছে। এমন দিনে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জন্ম এবং কর্মকে মর্ম্মে গ্রহণ করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমরা যদি তা করতে পারি, তবে নিজেরাও বাঁচব এবং জগৎকেও মৃত্যুর পথ থেকে রক্ষা করা হবে। শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান নয়, বেদের ভাষায় বলা চলে এই পৃথিবীতে যজ্ঞের "সুঅপ্" অর্থাৎ মধুধারা সঞ্চার করবার জন্যেই মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণলীলার মধুরতর তান বাঙলাদেশে বেজে উঠেছিল। বৈকুণ্ঠের দেবতা ধরণীর ধূলোতে নেমে এসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মদিনে নিশীথের মেঘমালার ডাকে বিপ্লবের যে ছন্দ সাগরের তালে জাতির চিত্তকে দোলা দিয়েছিল, আজ আবার সেই গর্জন মরা জাতির প্রাণে স্পন্দন তুলুক *

---

* গ্রাম যোগাশ্রম সংঘের সভায় 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা।

রঙ্গজগৎ

'নীলাঙ্গুরীয়'—ইস্টার্ন টকীজের চিত্র। কাহিনী—বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়; সংগীত পরিচালনা—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়; সংগীত পরি- দেবী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, দেববালা, লতিকা, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, মলিনা, [illegible]রাণী প্রভৃতি।

সম্প্রতি বাঙলা চলচ্চিত্রে একটা খুব শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে: আমাদের পরিচালক এবং প্রযোজকমণ্ডলী ক্রমাগত কাহিনীর জন্যে সাহিত্যিকদের দ্বারস্থ হচ্ছেন। ভাল গল্প যে চলচ্চিত্রের প্রাণ-শক্তি এটা তাঁরা বুঝতে শিখছেন। তাই গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসখানিকে চিত্রে রূপান্তরিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন, তখনই ভেবেছিলাম এটা আশার কথা। ছোট হাসির গল্প-লেখক হিসাবে বিভূতিবাবু সুপ্রসিদ্ধ; উপন্যাস রচনায় নীলাঙ্গুরীয় তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর চিরাচরিত হাসির স্থান নীলাঙ্গুরীয়তে সীমাবদ্ধ। হাসি অপেক্ষা অশ্রুরই প্রাধান্য এখানে বেশী। নীলাঙ্গুরীয় ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী।

একজন নরম সরল শিক্ষিত প্রাইভেট টিউটর কি করে এক ব্যারিস্টারের ছোট মেয়ের গৃহশিক্ষক হয়ে গেল এবং পরে সেই ছাত্রীর দিদির প্রেমে পড়ে কি করে তার জীবনে ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে এল নীলাঙ্গুরীয় তারই করুণ কাহিনী। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে নীলাঙ্গুরীয়ের [illegible] প্রায় প্রতিটি চরিত্রই ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী। মাস্টার শৈলেন ত ব্যর্থ প্রেমিক, নায়িকা মীরার বিপরীত ধর্মী বাবা এবং মার দাম্পত্যজীবনের মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেছে, মীরার নিজের জীবন ব্যর্থ প্রেমের একটি নিদর্শন, শৈলেনদের বাল্যসঙ্গিনী সৌদামিনীর [illegible] একটি [illegible] ট্র্যাজেডি—তারপর, আছে ব্যারিস্টার বাড়ির খৃস্টান মালী ইমানুয়েলের প্রেমের ব্যর্থতা। এই বিরাট ব্যর্থতার পটভূমিকায় শৈলেন এবং মীরার ব্যর্থতাই ফুটে উঠেছে সব চেয়ে বেশী—তারপরই স্থান হচ্ছে সৌদামিনীর। মাস্টার শৈলেন নিজের অলক্ষ্যে মীরাকে প্রাণ সমর্পণ করে বসেছিল—সচেতন হয়ে দেখলে যে মীরা এবং তার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। মীরার মনেও অনুরাগ ছিল—কিন্তু অভিজাতগোষ্ঠী মীরার পক্ষে নীরবে আত্মসমর্পণ করা ছিল অসম্ভব। কিছুটা কাছে এসে আবার হঠাৎ দূরে সরে যাওয়াই ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য; এর মধ্যে আত্মনিগ্রহের কামনা যতটা ছিল——পরকে পীড়া দেওয়ার কামনা তার চেয়ে কম ছিল। হৃদয় নিয়ে এই লুকোচুরিই মীরা শৈলেনের জীবনে ব্যর্থতা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীটি গভীর মনস্তত্বপূর্ণ।

পরিচালনায় গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কোন অভিনবত্ব কিংবা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। তবে মোটামুটি দেখতে গেলে তাঁর পরিচালনাকে খারাপ বলা চলে না। তিনি মূল কাহিনীটি যথাযথ পর্দার গায়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমতা বজায় রাখতে পারেননি। [illegible] একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া, তিনি 'সনাতন' রচনার নামে যে লেখকের উপর অবিচার করেননি এতেই আমরা খুশি। [illegible] ব্যতিক্রম দুটির উল্লেখ করছি। খৃস্টান মালী ইমানুয়েলের যে করুণ রূপটি আমরা মূল উপন্যাসে পাই, পর্দার গায়ে সেটি ভালভাবে প্রতিফলিত হয়নি। ইমানুয়েলের চরিত্রে হাসির খোরাক আছে বৈকি! তবে হাসিটাই তার মূল কথা নয়। হাসির আড়ালে চাপা আছে একটা করুণ ইতিহাস। পর্দার গায়ে ইমানুয়েলের এই করুণ দিকটা অবহেলিত হয়েছে বলা চলে। দ্বিতীয়ত, বইটার শেষাংশ ব্যর্থতার ইতিহাস—কিন্তু পর্দার গায়ে কাহিনীটিকে গুণময়বাবু যে কিভাবে শেষ করেছেন, সেটা রহস্যময়ই [illegible] গেছে। তিনি এটাকে মিলনান্ত করেছেন, না বিয়োগান্ত করেছেন—সেটা রহস্যময়ই রয়ে গেল। বইখানির স্বাভাবিক পরিণতি [illegible] দিকে। তবে মোটামুটি তাঁর পরিচালনা ভালই হয়েছে। সাধহয় চিত্র-নাট্য রচনার দোষেই ছবিটার প্রথম অংশ যেরূপ ভাল হয়েছে, দ্বিতীয়াংশ সেরূপ চিত্তাকর্ষক হয়নি। গুণময়বাবুর অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন বেশ ভাল হয়েছিল।

[illegible] ভূমিকায় মলিনা দেবী বেশ সহজ অভিনয় করেছেন। তাঁর কথাবার্তা চলন অভিনয় এবং গান আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে। নায়কের ভূমিকায় ধীরাজ অসাধারণ অভিনয় না করলেও তাঁর অভিনয় মন্দ হয়নি। নিকৃষ্টরূপী জহর গঙ্গোপাধ্যায় এবং ব্যারিস্টাররূপী ছবি বিশ্বাস ভালই অভিনয় করেছেন। মীরার মার ভূমিকায় দেববালা অত্যন্ত সুন্দর অভিনয় করেছেন। মীরার ছেলেবেলার অংশে লতিকার অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছে। সৌদামিনীরূপে রেণুকা রায় উচ্চশ্রেণীর অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। অন্যান্য ভূমিকা চলনসই। নীলাঙ্গুরীয়র আলোকচিত্র গ্রহণ ভাল হয়েছে—কিন্তু শব্দ গ্রহণ উচ্চাঙ্গের হয়নি। সুবল দাশগুপ্তের সংগীত পরিচালনা বেশ উচ্চাঙ্গের হয়েছে।

পুস্তক পরিচয়

বিদ্যাসাগর কলেজ ম্যাগাজীন—গ্রীষ্ম সংখ্যা; প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক জিতেশচন্দ্র গুহ।

প্রধানত কলেজের ছাত্রদের পরিচালনাধীনে কলিকাতার কলেজসমূহ হইতে যে কয়েকখানা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগর কলেজ ম্যাগাজীন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলোচ্য সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, অধ্যাপক জে ক চৌধুরী, মিঃ ওয়ার্ডস ওয়ার্থ অধ্যাপক জিতেশ গুহ এবং সুশ্রুত মুখুজ্যের সারগর্ভ রচনা আলোচ্য সংখ্যার ইংরেজী সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাঙলা বিভাগে শ্রীগোপালরঞ্জন রায় সুনীলকুমার দত্ত, প্রাণবল্লভ সরকার, মধুসূদন দাস, অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র সাধু, রাজশেখর রায়, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহাদের প্রবন্ধ এবং কবিতা বিশেষভাবেই উপভোগ্য হইয়াছে। আমরা বিদ্যাসাগর কলেজ ম্যাগাজীনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শীল্ড গাইড ১৯৪৩, প্রকাশক—প্রিমিয়ার পাবলিসিটি সোসাইটি; মূল্য ॥০।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পাবলিসিটি এজেন্টস মেসার্স প্রিমিয়ার পাবলিসিটি সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত "শীল্ড গাইডের" আর নূতন করিয়া পরিচয়ের আবশ্যক নাই। বর্তমান সংখ্যাটি তাঁহাদের প্রকাশিত "শীল্ড গাইডের" একাদশ অবদান। আই, এফ, এ ফুটবল শীল্ড প্রতিযোগিতা ও ফুটবল খেলা সম্বন্ধে নানাপ্রকার তথ্যে পরিপূর্ণ, সুচিন্তিত সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রবন্ধে, উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গচিত্রে সমুজ্জ্বল এই পুস্তকখানি কেবল যে ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিগণের নিকট আদৃত হইবে এমত নহে পরন্তু ইহা আবালবৃদ্ধের নিকটও সমানভাবেই আদৃত হইবে।

খেলাধুলা—

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্তমানে ফাইনাল খেলাটাই বাকী আছে। এই খেলায় ইস্টবেঙ্গল ও পুলিশ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। তবে এই খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল বিজয়ী হইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল সহজেই ইস্টবেঙ্গল দলের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে, ইহা সকলেই কল্পনা করিয়াছিলেন। এমন কি তিনদিন পুলিশ দলের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা হইবার পরও কেহই আশা করিতে পারেন নাই যে পুলিশ দল বিজয়ী হইবে। কারণ, তিনদিনই মোহনবাগান দল পুলিশ দলকে তীব্র আক্রমণ দ্বারা বিপর্যস্ত করিয়াছে এবং খেলার অধিকাংশ সময়েই পুলিশ দলের গোলের সম্মুখে বল রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। গোল করিবার বহু সহজ সুযোগও লাভ করিয়াছে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, আক্রমণভাগের খেলোয়াড়গণ সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও গোল করিতে পারেন নাই। তিনদিন খেলায় যে দল প্রাধান্য প্রকাশ করিল সে দল শেষদিন অর্থাৎ চতুর্থ দিনে জয়ী হইবার জন্য নিশ্চয় আপ্রাণ চেষ্টা করিবে ও খেলায় বিজয়ী হইবে। কিন্তু চতুর্থ দিনের খেলাতেও দেখা গেল মোহনবাগান দল পূর্ব তিনদিনের খেলারই পুনরাবৃত্তি করিল। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়গণ ফাঁকা গোল সম্মুখে পাইয়াও গোল করিতে পারিলেন না। পুলিশ দল খেলার সূচনায় একটি পেনালটীর সুযোগ পাইয়া একটি গোল করিয়া বসিল। খেলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মোহনবাগান দল গোল পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। সারাক্ষণ আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত পুলিশ দল খেলায় বিজয়ীর সম্মানলাভ করিল। লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল খেলায় পরাজিত হইল। চারিদিন খেলায় প্রাধান্য লাভ করিয়া খেলায় পরাজয় বরণ করিতে ইতিপূর্বে আই এফ এ শীল্ডের প্রতিযোগিতায় কখনও দেখা যায় নাই। এই বিষয় মোহনবাগান দল নূতন রেকর্ড করিয়াছে সন্দেহ নাই।

এইবার লইয়া ইস্টবেঙ্গল দল পর পর দুই বৎসর শীল্ড ফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা লাভ করিল। পুলিশ দলের তৃতীয়বার খেলিবার সৌভাগ্য হইল। ইতিপূর্বে ১৯৩৭ সালে ও ১৯৩৯ সালে পুলিশ দল ফাইনালে উন্নীত হয় ও ১৯৩৯ সালে শীল্ড বিজয়ী হয়।

বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন

বাঙ্গালী বালক উৎসাহিগণ মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয়, এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সম্প্রতি 'বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন' গঠিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে এইরূপ একটি এসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার পূর্বেই উহার অস্তিত্ব লোপ পায়। সুতরাং পুনরায় 'বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন' গঠিত হইয়াছে, এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে অনেকেই আশঙ্কা করিতে থাকেন—উক্ত এসোসিয়েশন পূর্বের ন্যায় গঠিত হইয়া কোন কিছু না করিয়াই লোপ পাইবে। কিন্তু নবগঠিত বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ যে রীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে ঐরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই এসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতায় তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। এই তিনটি কেন্দ্রে মুষ্টিযুদ্ধ কৌশল নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাহাতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি কেন্দ্র পরিচালনা করিবার জন্যও কমিটি গঠিত হইয়াছে। বিশিষ্ট মুষ্টিযোদ্ধাগণ এই সকল কেন্দ্রে প্রদর্শনী মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় যাহাতে যোগদান করেন তাহারও চেষ্টা হইতেছে। অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও খরিদ করা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—সকল কেন্দ্র কার্যকারী হয় তাহার দিকে বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের বিশেষ দৃষ্টি আছে। সুতরাং এই এসোসিয়েশন বুদবুদের ন্যায় প্রকাশ লাভ করিয়া বিলীন হইয়া যাইবে, ইহা কল্পনা করাও অন্যায় হইবে। তবে এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এসোসিয়েশনের সুনাম ও অস্তিত্ব ব্যায়ামোৎসাহিগণের সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর বিশেষভাবেই নির্ভর করিতেছে। ব্যায়ামোৎসাহিগণ দলে দলে এই সকল কেন্দ্রে যোগদান করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন গত বৎসর হইতেই একটি আচ্ছাদিত কোর্ট নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের এক কার্যকারী সমিতির সভায় এই বিষয় আলোচনা হইয়াছে। আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীযুত এস কে বসু তাঁহার ১০নং রাজা নবকিষণ স্ট্রীটস্থ প্রাঙ্গণে এই কোর্ট নির্মাণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। স্থান পাওয়া গিয়াছে,—অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ উৎসাহী ক্রীড়ামোদিগণের সাহায্য ব্যতীরেকে পাওয়া সম্ভব নহে। আমরা আশা করি বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এই সাহায্য সকল ক্রীড়ামোদীর নিকট হইতেই পাইবেন। ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের সহিত যে সকল ধনী লোক জড়িত আছেন তাঁহারাও এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মুক্তহস্তে দান করিবেন ইহা বলাই বাহুল্য।

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ "সাটলকক্" বা খেলিবার বল সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। ব্যাডমিণ্টন খেলা ভারতেরই খেলা সুতরাং সেই খেলার জন্য বৈদেশিক নির্মিত "সাটলককের" মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা খুবই অবিবেচনার কার্য হইত।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৭ই আগস্ট

উত্তর আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আজ প্রাতে মার্কিন বাহিনী মেসিনায় প্রবেশ করিয়াছে এবং সিসিলির যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। বার্লিন হইতে এক বিশেষ ইস্তাহারে এক্সিস বাহিনীর সিসিলি ত্যাগের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

অনাহারে বা অল্পাহারের ফলে রাস্তায় মুমূর্ষু অবস্থা পতিত লোকদের চিকিৎসার জন্য গভর্নমেণ্ট কলিকাতায় যে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদনুযায়ী গতকল্য কলিকাতায় ৫০ জনকে রাস্তা হইতে তুলিয়া লইয়া হাস-পাতালে ভর্তি করা হয়। ইহাদের মধ্যে ৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হইবার পর মারা যায়।

মাদারীপুরের ১৫ই আগস্ট তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, গত তিন সপ্তাহে তথাকার বিভিন্ন রাস্তায় ১০টি মৃতদেহ পাওয়া যায়।

বহরমপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, আজিম-গঞ্জ রেলস্টেশনের নিকট একটি অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণকায় মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

"গভর্নমেণ্ট বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি বন্ধ করেন নাই; এতৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য" কেন্দ্রীয় পরিষদে ডাঃ ব্যানার্জি, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত ও মৌলবী আবদুলগণি তিনটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, সভাপতি সেগুলি বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন।

১৮ই আগস্ট

অদ্য কলিকাতায় এ আর পি কর্মিগণ অনাহারে মৃতপ্রায় ৯৩ জন লোককে বিভিন্ন রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লইয়া হাসপাতালে প্রেরণ করেন। ইহাদের মধ্যে ৯ জন পরে মারা যায়।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, যমুনা নদীতে প্লাবন হওয়ায় প্রায় ২৫ খানি গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে।

১৯শে আগস্ট

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথ হইতে এ আর পি কর্মিগণ অনাহারে মুমূর্ষু ১৮১ জন নরনারীকে কুড়াইয়া লইয়া হাসপাতালে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ১৩ জন হাসপাতালে ভর্তি হইবার পর এবং ৭ জন হাসপাতালে যাইবার পথে মারা যায়।

নাটোরের এক সংবাদে প্রকাশ, নাটোর শহরে ও মহকুমায় খাদ্য-সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। গতকল্য নাটোর স্টেশনে তিনজন ও শহরে দুইজন অনাহারে মারা গিয়াছে।

কলিকাতাস্থ সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি কণ্ট্রোলার অব পারচেজ মেজর এইচ এইচ বিগিল ও গভর্নমেণ্ট কণ্ট্রাক্টর অনিল লাহিড়ী ভারত সরকারকে প্রতারণা করিবার ষড়যন্ত্র, উৎকোচ গ্রহণ ও তাহাতে সহায়তা করার অভি-যোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সরকার পক্ষ অভিযোগ প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই।

২০শে আগস্ট

আগামী ২৮শে আগস্ট হইতে বাঙলা সর-কার দেশের সর্বত্র ধান ও চাউলের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং ধান ও চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। আউশ ধান উঠিলে যে-সমস্ত অঞ্চলে ধান বাড়তি হইবে বলিয়া জানা যাইবে, সেই সমস্ত অঞ্চল হইতে বাঙলা সরকার ধান ও চাউল ক্রয় করিবেন বলিয়াও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাঙলা দেশ হইতে ধান ও চাউল রপ্তানি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গত ৫ দিনে কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তা হইতে প্রায় ১২০টি মৃতদেহ সরান হইয়াছে। শহরের রাস্তায় অনশনে মৃতপ্রায় ১৬০ জন লোককে অদ্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইহাদের মধ্যে ১৯ জন মারা গিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টার হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অভিযাত্রী মার্কিন নৌবাহিনীর নিকট সিসিলির উত্তরে অবস্থিত এওলিয়ান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দুইটি দ্বীপ লিপারী ও স্ট্রম্বোলী আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহার ফলে এওলিয়ান দ্বীপপুঞ্জের যাবতীয় দ্বীপ মিত্রপক্ষের অধিকারে আসিল।

মস্কোস্থ রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, খারকভের দক্ষিণে তুমুল লড়াইয়ে সোভিয়েট সৈন্যরা বেশ কিছুটা স্থান অধিকার করিয়াছে।

২১শে আগস্ট

ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, মার্কিন ও কানাডিয়ান সৈন্যরা এলুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কিস্কা দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। নৌ-বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপানীদের পক্ষ হইতে বিনা বাধায় কিস্কা অধিকৃত হইয়াছে।

কুইবেকের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, কুইবেক সম্মেলনে ব্যাপক সমর পরিকল্পনা রচনা শেষ হইয়াছে। প্রকাশ, জার্মানীকে পূর্ব রণাঙ্গন হইতে সৈন্য সরাইতে বাধ্য করার জন্য রাশিয়া ক্রমাগত যে দাবী করিতেছে, তাহা পূরণের জন্য সর্বত্র জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে এক্সিসের উপর অবিরত চাপ দেওয়া হইবে। চীনকে আরও বেশী পরিমাণ ধন ও সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করা হইবে।

অদ্য কলিকাতার রাস্তা হইতে মৃতকল্প ৪৮ জন লোককে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে ৬ জন বেহালা হাসপাতালে মারা গিয়াছে এবং ২ জন ক্যাম্পবেল হাসপাতালের পথে মারা গিয়াছে।

উলুবেড়িয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, রাউতো গ্রামে খাদ্যাভাবে সম্প্রতি চারিজন লোক মারা গিয়াছে।

বাঙলা সরকার অদ্য ভারতরক্ষা আইন অনু-সারে এক আদেশ জারী করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন ট্রেন যাত্রীর তাহার সঙ্গে লগেজ হিসাবে আড়াই মণের অধিক খাদ্যশস্য বাঙলা হইতে বাহিরে রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

কলিকাতা শহরে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য আগস্ট মাসের শেষভাগে ২০০শত সরকারী দোকান খোলা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরেই অবশিষ্ট সরকারী দোকানগুলি খোলার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সরকারী দোকান খোলা হইলে কলিকাতা শহরে 'রেশন কার্ডের' সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হইবে।

২২শে আগস্ট

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ৫০ দিন ধরিয়া অবিশ্রাম সংগ্রামের পর সোভিয়েট বাহিনীর অভিযান কোন কোন অঞ্চলে শ্লথ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। স্মোলেনস্ক হইতে খারকভ পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গনের সর্বত্র গ্রীষ্মকালীন অভি-যানের সর্বাপেক্ষা কঠোর অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে।

প্রথমে যেরূপ মনে হইয়াছিল, খারকভে জার্মানদের প্রতিরোধ এক্ষণে তদপেক্ষা কঠোর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। সোভিয়েট ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, গ্রীষ্মকালীন অভিযানে ৫ই জুলাই হইতে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ জার্মান সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

মিত্রপক্ষের উত্তর আফ্রিকাস্থিত হেড কোয়ার্টার হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সিসিলির যুদ্ধে এক্সিস পক্ষের পাঁচ লক্ষ সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে।

মিত্র পক্ষের বিমান বাহিনী নেপল্স ও অন্যান্য স্থানে পুনরায় আক্রমণ চালায়।

মস্কো রেডিও কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে যে, মঃ লিটভিনফকে যুক্তরাষ্ট্রস্থিত সোভিয়েট দূতের পদ হইতে অবসর দিয়া তাঁহার স্থানে মঃ আন্দ্রে গ্রোমিকোকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

২৩শে আগস্ট

জার্মান নিউজ এজেন্সী সরকারীভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্মানরা খারকভ ত্যাগ করিয়াছে। উক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছে, গতকল্য রাত্রে জার্মানরা প্রতিপক্ষের বিনা চাপেই পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী খারকভ নগরী পরিত্যাগ করে। সংঘর্ষ এড়াইবার কৌশল করায় জার্মানদের ব্যূহ অনেক ছোট করিতে হইয়াছে। মস্কোয় সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, খারকভ অধিকৃত হইয়াছে।

কুইবেক হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন, ইউরোপীয় রণাঙ্গনে এক্সিসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযানের যে পরি-কল্পনা রচিত হইয়াছে, তাহাতে খুব সম্ভব জেনারেল আইসেনহাওয়ারকেই মার্কিন বাহিনীর অধিনায়কস্বরূপে বলকানের মধ্য দিয়া অভিযান পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে এবং আপাতত এইরূপ ঠিক হইয়াছে যে, বৃটিশ বাহিনীকে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি ইউরোপের নিম্নভূমি অঞ্চলে অভিযান চালাইবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতা ক্যাম্পবেল হাসপাতালে ৩৯ জন অনশনক্লিষ্ট লোককে ভর্তি করা হয়। অদ্য বেহালা এ আর পি হাসপাতালে সাতজন অনশনক্লিষ্ট লোক মারা গিয়াছে।

কলিকাতার মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা কুইবেকে মিঃ চার্চিল এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট নিম্নোক্ত এক তার প্রেরণ করিয়াছেন:—খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা-বশত কলিকাতা নগরী ও বাঙলা দেশে অতিশয় দুর্গতি দেখা দিয়াছে। দেশের সমগ্র জনসমষ্টির জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে এবং লোকে অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং জগতের অন্যান্য দেশ হইতে অনতিবিলম্বে জাহাজযোগে খাদ্যশস্য প্রেরণের ব্যবস্থা করার জন্য অনশনক্লিষ্ট মানবতার নামে আবেদন জানাইতেছি।

দেশ

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন　　সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ]　শনিবার ১৮ই ভাদ্র, ১৩৫০ সাল। Saturday, 4th September, 1943.　[৪৩শ সংখ্যা

সাময়িকপ্রসঙ্গ

বঙ্গে ঘোর দুর্দশা

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথাই আমরা শুনিয়াছি, দেশের সে অবস্থা প্রত্যক্ষ করি নাই। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্রের তৎসম্পর্কিত বর্ণনা আমাদের চোখের সম্মুখে আজ ভাসিয়া উঠিতেছে। ঐশ্বর্যশালী কলিকাতা নগরীর পথ অস্থিচর্মসার নরনারীর দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। এ যেন ভিখারীর হাট, ভিখারীর মেলা। অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালরাশি রাজপথে সঞ্চরণ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। অন্নহীনের আর্তনাদ জীবনের শেষ-নিশ্বাসের সঙ্গে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। কলিকাতার রাজপথে আজ দেশের লোকের যে দুর্দশা দেখিতেছি, সেই দুরবস্থা বাঙলা-জোড়া; কলিকাতার রাজপথে নিরন্নের দলের যেমন হাহাকার উঠিতেছে; বাঙলার শহরে শহরে সর্বত্র সেই হাহাকার। এ অবস্থার প্রতিকার কি? ভারত গবর্নমেণ্টের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়া বাঙলা দেশের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় আমাদের মনে কোন আশার সঞ্চার হয় নাই। তিনি প্রধানত বাঙলা দেশের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে যত অপরাধ প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টসমূহের উপর চাপাইয়া ভারত গবর্নমেণ্টের কার্যের সমর্থন করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন। ভারত গভর্নমেণ্ট এই প্রদেশে যেসব খাদ্যশস্য পাঠাইতেছেন, সেগুলি কেমন করিয়া কোথায় উধাও হইতেছে, তিনি তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। আমাদের পক্ষেও অবশ্য ইহা রহস্যের বিষয়; এ কৌতূহল নিবৃত্তির কার্যকর পথ কি অবলম্বন করা হইতেছে, আমরাও তাহা জানিতে চাই। আমরা ইহাও জানিতে চাই যে, চাউলের দর বাঁধিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে বাজার হইতে চাউল অদৃশ্য হইতেছে, এই সমস্যা মিটাইবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন। শুধু দর বাঁধিয়া দিলেই এ সমস্যার সমাধান হইবে না। তাঁহারা নির্দিষ্ট মূল্যে যদি বাজারে মাল সরবরাহ বজায় না রাখিতে পারেন, তবে যে চোরাবাজার দমন করিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, প্রাণের দায়ে পড়িয়া দেশের লোককে সেই চোরাবাজারেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। সরকারী আইনের আরক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করিয়াই লাভখোরের দল নিজেদের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে থাকিবে। বাহির হইতে যত খাদ্যশস্য আসিতেছে, সবই যদি মন্ত্রবলে উধাও হইতে থাকে এবং বাজারে তাহা না আসে, তবে লাভখোরদের ব্যবসা বন্ধ হইবে না। বাঙলার খাদ্যসচিবের যত শাসানি, সে সব এ পর্যন্ত যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, তেমনই হইবে। খবরের কাগজে সরকারী বিজ্ঞপ্তির বাঁধা দরে দেশের লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে না; অধিকন্তু লোকের নৈরাশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছি যে, বাঙলার বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য কি ভারত সরকার, কি বাঙলা সরকার—কোন পক্ষই একটা ব্যাপক কর্মপ্রণালী লইয়া এখনও কাজ করিতেছেন না। তাঁহারা সাময়িকভাবে সমস্যাকে চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদের উক্তি হইতে এতৎসম্পর্কে ভারত সরকারের নির্দিষ্ট কোন কর্মপ্রণালীর আভাস আমরা পাই নাই। বাঙলা সরকারও যে দেশব্যাপী একটা ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া কাজ করিতেছেন, আমরা এ পর্যন্ত তাহার পরিচয় পাইতেছি না। তাঁহারা চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন; কিন্তু এই সঙ্গে দেশের লোকের অন্ন-সংস্থানের দায়িত্ব যদি তাঁহারা গ্রহণ না করেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য যোগাইবার ভার তাঁহারা যদি না লন, তবে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত কোন অর্থ হয় না। যাহারা চাউলের ব্যবসা করে, তাহারা যদি সরকারী দরে চাউলের ব্যবসা না চালায়, তবে দেশের লোক কোথায় যাইবে? সমগ্র বাঙলা দেশে অচিরেই এই সমস্যা বড় হইয়া উঠিবে। বাঙলার খাদ্যসচিব সরকারী দোকানের সাহায্যে কলিকাতা শহরের খাদ্য-সমস্যা সমাধান করিবার একটা পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু চাউলের দর বাঁধিয়া

দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে পরিকল্পনার সুবিধা যাহাতে শহরবাসী পায় তেমন ব্যবস্থা করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। শহরে সামান্য যে কয়েকটি সরকারী দোকান হইয়াছে, সেগুলিতেও ইহার মধ্যে নির্দিষ্ট সব মাল মিলিতেছে না। তাহা ছাড়া কলিকাতা শহরই বাঙলা দেশ নয়; এবং বাঙলা দেশের সমস্যার সমগ্রভাবে সমাধানের উপায় যদি না করা হয়, তবে ধনীর শহর এই কলিকাতাকেও স্বাস্থ্য-বিধানের বেড়া দিয়া আর্থিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। কলিকাতায় রেশনিংয়ের ব্যবস্থা কতদিনে কার্যকর হইবে, আমরা জানি না; স্বাস্থ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দীর পরিকল্পিত চারশত সরকারী দোকান এখনও অনাগত ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিতেছে। সরকারী দোকানে যদি খাদ্যশস্য সব সময় মিলে কলিকাতা শহরের সমস্যা এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কতকটা মিটিতে পারে আমরা ইহা স্বীকার করি; কিন্তু সেই সঙ্গে সমগ্র বাঙলা দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমরা এ সম্বন্ধে বারংবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি এবং ইহাও বলিতেছি যে, পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় আর নাই; এখন পাকা ব্যবস্থা করার প্রয়োজন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সে ব্যবস্থা সফল করিবার মত সংকল্প এবং সঙ্গতি লইয়া সরকারকে অগ্রসর হইতে হইবে। সে দিক হইতে নিজেদের ঘাঁটি পাকা করিয়া না লইয়া যদি তাঁহারা কাজে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন, তবে অতীতের মত তাঁহাদের সব বজ্র-আঁটুনী দুই দিন পরেই ফস্কা গেরোতে পরিণত হইবে। তাঁহারা সমস্যার গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করুন, ইহা ছাড়া তাঁহাদিগকে বলিবার মত কথা আমরা আর কিছু সাজাইয়া গোছাইয়া যোগাড় করিতে পারিতেছি না। বাঙলার অর্থনৈতিক অবস্থা আজ বিপর্যস্ত, গ্রাম্য-জীবন ধ্বংস হইতে বসিয়াছে; সমাজ-ব্যবস্থা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। শ্রমিক এবং কৃষক- ইহারা সমাজের মেরুদণ্ড। আজ তাহারা দলে দলে পেটের ক্ষুধার তাড়নায় ভিটা ছাড়া হইতেছে। পূর্ববঙ্গে কোন কোন অঞ্চলের কৃষকেরা বাঙলা দেশ ছাড়িয়া আসামের দিকে ছুটিতেছে। যাহারা এখনও বাঙলা দেশের মাটির মায়া ছাড়িতে পারে নাই, তাহারাও ঘরবাড়ি ছাড়িয়া যে পারিতেছে কলিকাতায় আসিতেছে আর যাহাদের অর্থ-সামর্থ্যে কুলাইতেছে না তাহারা নিকটবর্তী শহরে গিয়া অন্নভিক্ষার আর্তনাদ তুলিতেছে। বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই; অধিকন্তু বর্তমান অবস্থায় তাহা বিপজ্জনকও বটে। ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার এ বিষয়ে সুনির্ধারিত কর্মপ্রণালী অবলম্বন করুন; প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহের সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের বিরোধ বা বিতর্কে শাসনতান্ত্রিক তত্ত্ব বা তৎসম্পর্কিত মাহাত্ম্য যাহাই থাকুক না কেন, তাহা লইয়া মাতিয়া থাকিবার মত মনের অবস্থা দেশের লোকের আদৌ নাই। নিরন্ন বাঙলাকে অন্ন-সংস্থানের দ্বারা শাসকবর্গের যোগ্যতার সত্যকার পরীক্ষা দিতে হইবে—কথার সান্ত্বনায় উদরের জ্বালা প্রশমিত হয় না।

খাদ্য সরবরাহের প্রশ্ন

বাঙলা দেশে যে খাদ্যশস্য আছে কিংবা আউস ধান যাহা উঠিয়াছে, তাহাতেই বাঙলার অভাব মিটিবে এমন বিশ্বাস আমরা রাখি না। ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্য-সচিব বাহির হইতে খুব বেশী সাহায্য পাইবার মত ভরসা দেন নাই। বাঙলা দেশের এ বিপদে সাহায্য না করার জন্য তিনি উদ্বৃত্ত প্রদেশগুলির গভর্নমেণ্টসমূহের নিন্দা-বাদ করিয়াছেন; তিনি বলেন উদ্বৃত্ত প্রদেশ-গুলি নিজেদের প্রয়োজন মিতব্যয়িতার সঙ্গে মিটাইয়া ঘাটতি প্রদেশগুলিতে খাদ্য-দ্রব্য প্রেরণের নীতি গ্রহণ করিলে সমগ্রভাবে পূর্ব অঞ্চল রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সরবরাহের প্রশ্ন প্রথমে দেখা দেয়। মাল বণ্টন করিতে হইলে মাল-গাড়ির প্রয়োজন। শ্রীবাস্তব মহাশয় বাঙলা সরকারকে খোঁচা দিয়া বলিয়াছেন যে, ২৭শে আগষ্টও রেল-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে জানাইয়া-ছেন যে, যে সব মালগাড়ি বাঙলা দেশে মাল আমদানীর জন্য পাওয়া যাইতেছে, সেগুলিও যথাযথভাবে কাজে লাগানো হইতেছে না। পক্ষান্তরে পাঞ্জাবের মন্ত্রীরা ক্রমাগতই এই কথা বলিতেছেন যে, ভারত গভর্নমেণ্টের মালগাড়ির সম্বন্ধে কুব্যবস্থা করিবার জন্যই ঘাটতি প্রদেশগুলির সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। সর্দার বলদেও সিং কিছুদিন পূর্বে স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছিলেন যে, বাঙলা দেশের দুর্দশার প্রতিকার করিবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট যদি সত্যই আন্তরিকতাসম্পন্ন হন, তবে মালগাড়ির সুব্যবস্থা করা তাঁহাদের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পাঞ্জাবের রাজস্ব-সচিব স্যার ছোটুরাম সেদিনও বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট বাঙলা দেশের জন্য জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ২১৪,৬৫৪ টন গম খরিদ করেন, ভারত গভর্নমেণ্ট এ পর্যন্ত তাহা হইতে ৬২,০০০ টন মাল চালান দিবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীও ভারত সরকারের ত্রুটির কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার যদি গাড়ির ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং বাঙলা সরকার লাভখোরদের দমন করিতে সমর্থ হন, তবে বাঙলা দেশের দুর্দশার লাঘব হওয়া সম্ভব। এই ধরণের বিতণ্ডার মধ্যে আমরা কি বলিব বুঝিতেছি না; মোটের উপর আমরা একটা ডামাডোলের মত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেছি। একে অপরের উপর দোষ চাপাইবার চেষ্টায় আছেন, এদিকে বাঙলা জুড়িয়া নিরন্নের হাহাকারে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা ভারত সরকারকে এই সোজা কথাটা বলিতে চাই; আমাদের কথা এই যে, তাঁহারা এ সম্বন্ধে নিজেদের দায়িত্ব কিছুতেই এড়াইতে পারেন না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে ধুয়া এক্ষেত্রে তুলিয়া তাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কার্যত সে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে তাঁহারা কতটা মর্যাদাদান করিয়া থাকেন, আমাদের জানা আছে। ভারতরক্ষা বিধানের দোহাই দিয়া এক কলমের খোঁচায় তাঁহারা সবকিছু করিতে পারেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা করিতেও কিছুমাত্র কসুর করিতেছেন না; অথচ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বড় বড় বুলি ছাড়িতেছেন, বাঙলা দেশের নিরন্ন লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখে খাদ্য-সংস্থান করিবার বেলায়—বাঙলা দেশের নরনারী, শিশু আজ অন্নাভাবে অসহায় হইয়া রাস্তায় পড়িয়া মরিতেছে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার বেলায়; এই ধরণের যুক্তি আমরা শুনিতে চাহি না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ঠাট ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ুক; বাঙলা দেশকে আজ বাঁচাইতে হইবে, এই কর্তব্যই বড় এবং সামরিক প্রয়োজনের চেয়ে এ প্রয়োজন কম কিছু নয়। এ সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের মনে কোন ভ্রান্তি থাকে এবং তজ্জনিত ঔদাসীন্য থাকে, তাহা তাঁহারা দূর করুন এবং সাগরপারে ভারত-শাসন সম্পর্কিত মূল নীতির নিয়ন্তাদেরও জানাইয়া দিন। সামরিক প্রয়োজন এবং তজ্জনিত সমস্যা কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই আজ দেখা দেয় নাই। সম্মিলিত পক্ষের সমগ্র দেশেই এ সমস্যা দেখা দিয়াছে; কিন্তু ভারত বর্তমানে অন্নাভাবে যেমন বিপন্ন, এক চীন ছাড়া সম্মিলিত পক্ষের কোন দেশে তেমন সমস্যা দেখা দিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। চীনের সমস্যাও দেখা দিয়াছে প্রধানত বহির্জগৎ হইতে তাহার সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া; কিন্তু ভারত বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়! এখনও সম্মিলিত পক্ষের সকল দেশ হইতেই ভারতে খাদ্যশস্য আমদানী করা সম্ভব

হইতে পারে; কিন্তু কেন তাহা করা হইতেছে না? মানবতার প্রশ্ন আমরা তুলিতে চাহি না; ভারতের এ সমস্যা সমাধানের সামরিক দিক হইতেও প্রয়োজন রহিয়াছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে ইহা উপলব্ধি করিতে বলিতেছি।

সাহায্য ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

সরকার কলিকাতা হইতে নিরন্ন আশ্রয়প্রার্থীদিগকে মফঃস্বল অঞ্চলে সরাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন; এজন্য ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুরের কয়েকটি স্থানে তাঁহারা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। আমরা ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, শহরবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার যেমন প্রয়োজন আছে, সেইরূপ মফঃস্বলের স্বাস্থ্যহানি না ঘটে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আমাদের মতে নিরন্ন অবস্থায় যাহারা বাহির হইয়াছে, তাহাদের অনেকেরই ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে; বিভিন্ন দলে ইহাদিগকে বিভক্ত করিয়া প্রথমতঃ ইহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা কর্তব্য এবং যাহারা পীড়িত বা দীর্ঘদিন অনশনের জন্য যাহাদের শরীরযন্ত্র অপটু হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের রীতিমত শুশ্রূষা করা প্রয়োজন; খাদ্যাভাবেই যে ইহাদের মৃত্যুমুখে পতিত হইবার ভয় রহিয়াছে, এমন নয়, যথাযথভাবে খাদ্য গ্রহণ না করার ফলেও অনেকে মারা যাইতেছে। ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুরা দুধের পরিবর্তে কঠিন খাদ্য খাইয়া মরিতেছে; আমরা আশা করি, সরকার এবং যে সব দাতব্য প্রতিষ্ঠান নিরন্নের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইবে। মারোয়াড়ী সাহায্য সমিতি, বঙ্গীয় সেবাসমিতি প্রভৃতি দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানের এই দুর্দিনে যেভাবে সেবাকার্যে অগ্রসর হইয়াছেন, সেজন্য তাঁহারা সমগ্র জাতির ধন্যবাদের পাত্র। যদি বিশিষ্ট মহানুভব ব্যক্তিদের অর্থসাহায্যে পুষ্ট হইয়া এই সব প্রতিষ্ঠান সেবাকার্যে অগ্রসর না হইতেন, তবে কলিকাতা শহরের অবস্থা আরও শোচনীয় হইত বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম, বাঙলা দেশের বাহিরেও এ সম্বন্ধে সাড়া জাগিয়াছে। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু প্রমুখ নেতৃগণ বিপন্ন বাঙলাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের মতে এই সব সেবাকার্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হইলে ভাল হয় এবং বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে সেবাকার্য সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন; এজন্য প্রত্যেক গ্রামে স্থানীয় সেবাব্রতী কর্মীদিগকে লইয়া সঙ্ঘ গঠিত হওয়া দরকার। কারণ শহরকে বাঁচানই বড় কথা নয়, দরকার বাঙলার গ্রামসমূহকে বাঁচান। শহরের লোকদের চেয়ে গ্রামের অধিবাসীদের দুর্দশা অনেক বেশী। যাঁহারা শহরে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা গ্রামবাসীদের দুর্দশা ধারণা করিয়াও উঠিতে পারিতেছেন না। এই সেবাব্রতের দায়িত্ব আজ দেশপ্রেমিক কর্মীদের উপর পড়িয়াছে। এ কর্তব্য যদি আমরা পালন করিতে পরাঙ্মুখ হই, তবে মনুষ্যত্বের দাবী করিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। রুদ্র-দেবতার বজ্রপাতে আমাদের ধ্বংস হইয়া যাওয়াই ভালো। চোখের উপর দেশের লোকে অনাহারে ছটফট করিয়া মরিতেছে, ইহা দেখিয়াও ইহার প্রতিকারে যাহাদের অন্তরে মনুষ্যত্ব বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে না, তাহাদের জীবন পশুর জীবন। তাহাদের বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ?

ইঁহারা কাহারা

ভারত সরকারের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব পাঁচ দিন কলিকাতায় থাকিবার পর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। দিল্লীতে রওনা হইবার পূর্বে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন, —'গত নভেম্বর মাসে আমি যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলাম; বিভিন্ন মতাবলম্বী সকলকেই আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, বাঙলা দেশে খাদ্য-সংকটের সম্ভাবনা আছে কি না; তখন কাহারও মনে কোনও সন্দেহ ছিল বলিয়া বোধ হয় নাই; সুতরাং বাঙলা দেশে খাদ্যের অভাব হইবে না, এই ধারণা লইয়া আমি গিয়াছিলাম। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আমরা সকলেই ভুল করিয়াছি। এস্থলে ভারত সরকারের খাদ্যসচিব মহোদয়কে সবিনয়ে আমাদের নিবেদন এই যে, যিনি বিভিন্ন মতাবলম্বী, যাহাদের কাছে বাঙলা দেশের খাদ্য-সমস্যা ঘটিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইঁহারা কাহারা? দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় যাঁহারা, তাঁহাদের সংগে এ বিষয়ে তিনি কোন আলোচনা করিয়াছিলেন কি? প্রকৃতপক্ষে কিছুদিন পূর্বে স্যার আজিজুল হক ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে মৌলবী ফজলুল হকের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া যেমন বাঙলা দেশের সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে স্যার জওলাপ্রসাদও সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এ ধরণের মোৎফারাক্কা ফাঁকা কথার কোন মূল্য নাই। বাঙলা দেশে যখন যুদ্ধের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে এবং খাদ্যশস্যের টান সকল দিক হইতে পড়িয়াছে, তখন সমস্যার কারণ যে রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে গভীর তথ্যানুসন্ধানের বা বিশেষ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। স্যার জওলাপ্রসাদ সকলকে জড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সকলের কথা তুলিয়া নিজেদের কর্তব্যলঙ্ঘনজনিত ত্রুটি এড়ান যায় না। ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে, ভারত গভর্নমেণ্টের দপ্তরের উঁচু আসনে বসিয়া তাঁহারা একান্ত অনুচিত রকমে ভুল করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই ভুলের জন্যই বাঙলা দেশের বর্তমানে এমন দুর্দশা। যুদ্ধজনিত সমস্যার গুরুত্ব বুঝিয়া যদি তাঁহারা অন্যান্য সভ্য দেশের সরকারের মত সময়োচিত সতর্কতা একটু অবলম্বন করিতেন, তবে বাঙলা জুড়িয়া এমন শ্মশানতুল্য অবস্থার সৃষ্টি হইত না। পরাধীন ভারতবর্ষেই এমন ভুল হওয়া সম্ভব এবং এ ভুলের কোন কৈফিয়ৎ নাই। স্যার জওলাপ্রসাদ এ সম্পর্কে নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করিয়া নীরব থাকিলেই ভালো করিতেন।

পরলোকে রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব

গত ১৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রাক্তন সভাপতি রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বাঙলার বর্তমানের এই নিদারুণ দুর্দশার দিনে দেব মহাশয়ের ন্যায় একজন প্রবীণ ত্যাগব্রতী, উদার হৃদয় একনিষ্ঠ স্বদেশ-সেবককে হারাইয়া আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। দেব মহাশয়ের সহিত আমাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, তাঁহার পরলোকগমনে আমরা ব্যক্তিগতভাবে স্বজনের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতেছি। দেব মহাশয়ের জীবন স্বদেশের স্বাধীনতার অগ্নিময় প্রেরণায় উদ্দীপ্ত ছিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথকে তিনি তাঁহার রাজনীতিক গুরুস্বরূপ মনে করিতেন; কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য বরণের পথকেই তিনি জাতির মুক্তি পথস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া আপোষ নিষ্পত্তির পথ তিনি শ্রেয় মনে করেন নাই এবং স্বদেশের স্বাধীনতার পরম প্রয়োজনে নীতি বিশেষের গোঁড়ামীও তাঁহার জীবনে ছিল না। পরাধীন দেশের দেশসেবক কর্ম্মীদের চিরন্তন পুরস্কার হইল নির্যাতন এবং লাঞ্ছনা। দেব মহাশয় জীবনে সে পুরস্কার প্রচুরভাবেই লাভ করিয়াছিলেন; গত বৎসর জুন মাসে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও দেশের রাজনীতিক সাধনার সহিত তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

- শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী -

চিত্রশিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

যে কোন একটি দিন

আশ্রম-জীবনের এক বছরের অভিজ্ঞতার একটা আভাস দিলাম: এখন এই অভিজ্ঞতাকে আরও একটু স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি। এবারে ওখানকার জীবনের যে কোন একটি দিনের বিবরণ দেওয়া যাক্।

খুব ভোরে আমাদের উঠিতে হইত; উদ্বোধনের জন্য একটা ঘণ্টা বাজিত। শীতকালে আর ভোর নয়, দিবালোকের স্বল্পতা পূরণের জন্য যখন উঠিতে হইত—তখন রীতিমত অন্ধকার আকাশে তখনো তারা আছে। খুব ছোট ছেলেরা কিছুক্ষণ পরে উঠিত। বয়সের কম-বেশি অনুসারে ছাত্ররা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, আদ্যবিভাগ বয়স্ক ছেলেরা; মধ্য বিভাগ, অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ছেলে; শিশু বিভাগ একেবারে ছোটর দল।

শয্যা ত্যাগ করিয়া হাত মুখ ধুইবার পালা। তারপরে পালাক্রমে ছেলেদের নিজের নিজের ঘর ঝাড়ু দিতে হইত, আশে-পাশে পরিষ্কার করিতে হইত। তারপরে মিনিট পনেরো সারিবন্ধভাবে ব্যায়ামের সময়। ব্যায়ামের পরে স্নান; স্নানের পরে উপাসনা। উপাসনার সময়ে প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে মিনিট দশেকের জন্য নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে হইত। কে কি ভাবিবে তাহার কোন নির্দেশ ছিল না; যাহার যা খুশী ভাবিত। দিনের মধ্যে দশ বিশ মিনিট নিস্তব্ধ হইয়া বসিবার শিক্ষাটাও বড় কম নহে। সন্ধ্যাবেলাতেও আবার উপাসনার পালা ছিল, তখন অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে। তখন যে ছোট ছেলেরা সবাই একেবারে নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিত এমন মনে করিবার হেতু নাই, কারণ হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য হইতে ছিটে-গুলির মতো কাঁকর আসিয়া হয়তো এক-জনের মাথায় আঘাত করিল। সে নিরুপায়ের উপায় কাপ্তেনের শরণাপন্ন হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, কাপ্তেন কাঁকর ছুড়ছে। ধ্যানরত কাপ্তেন কর্তব্য ভুলিবার লোক নয়, সে হাঁকিয়া উঠিল, এখন চুপ করো, উপাসনার পরে নালিশ করো। অন্ধকারে আসামী সনাক্ত করণ সহজ নয়, কাজেই ব্যাপারটা ওখানেই মিটিয়া যাইত। ফলে সান্ধ্য-উপাসনার অন্ধকারে কাঁকরকে ছিটেগুলির কাজে ব্যবহারের আর অবসান ঘটিত না।

উপাসনার পরে সকলকে এক সঙ্গে দাঁড়াইয়া উপনিষদের একটা মন্ত্র পাঠ করিতে হইত। সকাল বেলাকার মন্ত্রটি আমার বড় ভালো লাগিত না। তাহাতে নীতি শিক্ষার ভাবটা বড় বেশি প্রত্যক্ষ।



ঘণ্টাতলা

সন্ধ্যাবেলার মন্ত্রে কোনরূপ শিক্ষাদানের চেষ্টা ছিল না বলিয়াই মনকে তাহা অসীমের মধ্যে অত্যন্ত অনায়াসে নিক্ষেপ করিত। ছোট্ট একটি মন্ত্রে বিশ্ববোধের এমন সহজ অনুভূতি আর দেখি নাই। তারপরে জল খাওয়ার পালা—সকলকে সারিবন্ধ হইয়া নিজের বাটি হাতে রান্নাঘরের দিকে যাইতে হইত।

বলা বাহুল্য প্রত্যেক কাজের জন্য ঘণ্টা বাজিত। ঘণ্টার ধ্বনি-বৈচিত্র্য শুনিয়া কোন্ পর্ব চলিতেছে বুঝিয়া লইতে হইত। কোন বার হয় তো ঘণ্টা বাজিল ২ : ৩; কোনবার বা হয়তো বাজিল ৩ : ৩ কোন-বার বা হয়তো বাজিল ঢং ঢং শব্দে অনর্গল; আর ৪ : ৪ রবে ঘণ্টা বাজিলে বুঝিতে হইবে—কোন একটা বিপদ ঘটিয়াছে, খুব সম্ভবত কোথাও আগুন লাগিয়া গিয়াছে। কোন কাজ আমাদের যথেচ্ছভাবে করিবার উপায় ছিল না; প্রত্যেক কাজের জন্যই কাপ্তেনের নির্দেশে সারিবন্ধভাবে দাঁড়াইতে হইত। সারিবন্ধ ভাবে দাঁড়ানোর নাম ছিল—লাইন করা। উপাসনার জন্য লাইন, জল খাইতে যাইবার জন্যও লাইন; ভাত খাইতে যাইবার জন্যও লাইন; লাইন ছাড়া এক পা চলিবার উপায় ছিল না।

প্রথম দিকে ছাত্র-সংখ্যা যখন অল্প ছিল তখন রান্নাঘরে বাটিতে জল খাবার সাজানো থাকিত; কোনদিন বা লুচি, কোনদিন বা শিঙাড়া। প্রত্যেকে এক এক বাটি তুলিয়া লইত, কেহ একাধিক বাটি লইয়াছে, এমন শুনি নাই। জল খাওয়ার পরে ও ক্লাস আরম্ভ হইবার আগে আশ্রমের ছোট বড় ছাত্র অধ্যাপক সকলে একত্র হইত; গানের দল সময়োচিত একটি গান করিলে সকাল বেলাকার ক্লাশ আরম্ভ হইত। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া সুরের স্বস্তিবাচন গ্রহণ করিয়া মনকে কর্মারম্ভের জন্য প্রস্তুত করিত। কিন্তু মাঝে মাঝে হাস্যকর কাণ্ড ঘটিত। একবারকার কথা আমার মনে আছে। একজন অবাঙালী অতিথি দন্তধাবন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। সংগীত, কলা প্রভৃতি জটিল শিল্পের অত সূক্ষ্ম কারুকার্যের ধার তিনি ধারিতেন না। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধুতির জমিন বিচার করিবার এমন পরিপূর্ণ অবকাশ আর কোথায় পাওয়া যাইবে। তিনি বাঁ হাতে দাঁতন ঘসিতে ঘসিতে অগ্রসর হইয়া ডান হাতে একজনের ধুতির জমিন ঘসিয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। গানের দল তখন গাহিয়া চলিয়াছে—

'কর্ম যখন প্রবল আকার
গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয়-প্রান্তে হে জীবননাথ, শান্ত চরণে
এসো।'

গানের পরে সকালবেলার ক্লাশ আরম্ভ হইত। ৪৫ মিনিট করিয়া এক একপর্ব, এমন ৫।৬টা পর্ব। তারপরে আবার ঘণ্টা, আবার লাইন, এবারে মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা।

আমরা যখন প্রথম যাই তখন নিরামিষ ভোজন প্রচলিত ছিল, তবে ডিম আমিষের পর্যায়ে ছিল না। তারপরে এক সময়ে আমিষ ভোজন প্রবর্তিত হইল, পরে পুনরায় নিরামিষ প্রবর্তিত হইল; এখন আবার আমিষ ভোজন প্রবর্তিত হইয়াছে। ফল কথা, নিরামিষ ভোজনকে কোনদিনই ওখানে ধর্মের অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয় নাই, কেবল সুবিধা অসুবিধার মানদণ্ডের

দ্বারা বিচার করিয়া কখনো গৃহীত, কখনো বর্জিত হইয়াছে।

প্রথম আমলে শরৎবাবু পাকশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সময়ে খাওয়ার যেমন সুবিধা ছিল, শাসন তেমনি কড়া ছিল। যথাসময়ের পরে রান্নাঘরে উপস্থিত হইলে খাইতে না পাইবার আশঙ্কা ছিল। তিনি বলিতেন, সকলকে যথাসময়ে আসিতে হইবে, কাহারো জন্য 'আলাহিদা' ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তৎপূর্বে 'আলাহিদা' শব্দ শুনি নাই, ঐ শব্দটিতে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

দুপুরবেলা খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ এ-ঘরে ওঘরে গল্প গুজব করিতে যাওয়া চলিত। কিন্তু ঘরে ফিরিবার ঘণ্টা বাজিলেই আপন আপন জায়গায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। ঘণ্টা দুই পাঠ ও বিশ্রামের পরে বিকাল বেলা আবার ক্লাশের ঘণ্টা পড়িত। বিকালে তিন, চারটা পর্বের বেশী হইত না।

ক্লাশ শেষ হইলে নিজ নিজ ঘর ঝাড়ু দেওয়া; আবার ঘণ্টা, আবার লাইন, জল খাওয়া। জল খাওয়া শেষ হইলে আবার ঘণ্টা, আবার লাইন—তারপরে খেলিবার পালা।

শীতকালে ক্রিকেট, অন্য সময় ফুটবল; ফুটবল খেলাই বেশি জমিত। সপ্তাহে সাতদিনই যে খেলা হইত তাহা নয়; একদিন সকলকে ড্রিল শিখিতে হইত; আর একদিন জঙ্গল পরিষ্কার বা ওই জাতীয় কোন কাজ করিতে হইত। বলা বাহুল্য শেষোক্ত কাজ দুটি জনপ্রিয় ছিল না; অনেকেই ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিত। আমার তো খেলাটাও হাস্যকর বোধ হইত, কাপ্তেনের পাল্লায় পড়িয়া নিতান্ত বাধ্য না হইলে কখনো যে খেলিয়াছি তাহা মনে হয় না। আশ্রমে পাহাড় নামে যে মাটির ঢিবিটা পরিচিত, সেটা কাটিয়া পুকুরটা বুজাইবার একটা প্রয়াস বহুকাল ধরিয়া চলিতেছিল। বিকাল বেলা পালাক্রমে ছেলেরা ঐ স্তূপটা কাটিয়া পুকুর ভরাট করিতে চেষ্টা করিত। আমাদের আগের ছেলেরাও ইহা করিয়াছে, আমরাও করিয়াছি, বোধ করি, এখনকার ছেলেরাও করিতেছে। কিন্তু কাজ এত সামান্য পরিমাণে হইত যে, পাহাড়ের গম্ভীরতা ও পুকুরের গভীরতা দুটিরই কিছুমাত্র লাঘব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যে-কাজে মানুষের কল্পনা উদ্বুদ্ধ না হয় তাহা পণ্ডশ্রম, তাহা এক প্রকার জুলুম মাত্র—এই কাজটা সম্বন্ধে আমার এই ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

খেলার পরে হাত পা ধুইয়া, আবার উপাসনা। উপাসনার পরে গল্প গুজব, আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্য খানিকটা সময়—এটার ভদ্র নাম—বিনোদন পর্ব। বড় ছেলেরা ছাড়া রাত্রে কেহ পড়িতে পাইত না, কোন না কোন প্রকার বিশ্রম্ভ ব্যাপারে যোগ দিতে হইত। এই সময়ে নানা রকম সভাসমিতি হইত, কোনদিন বা ছোটখাটো অভিনয় হইত, কিংবা কোন অধ্যাপক গল্প বলিতেন।

জগদানন্দবাবু বেশ মজলিশি রসিক লোক ছিলেন। গল্প বলিবার তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ছিল; গল্পের আখ্যানের চেয়ে ব্যাখ্যানের উপরেই তিনি বেশি নির্ভর করিতেন। তিনি ডিটেকটিভের গল্প বলিতেন, বানাইয়া বলিতেন কি পড়া-গল্প, বুঝিতে পারিতাম না।

ক্ষিতিমোহনবাবুরও গল্প বলিবার অসামান্যতা ছিল। তিনি নিপুণ হাস্য-রসিক; শব্দকে মোচড় দিয়া অপ্রত্যাশিত রস বাহির করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। ছেলে বুড়ো সকলেই সমানভাবে তাঁহার গল্পে আনন্দ পাইত।

অথচ, জগদানন্দবাবু ও ক্ষিতিমোহন বাবু দুজনেই স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতির লোক। হাস্যরসিক লোক স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির; যথার্থ হাস্যরসের মধ্যে একটা গভীরতা আছে। যে সব লোককে আমরা চলিত ভাষায় আমুদে লোক বলি, তাহাদের স্বভাবে গভীরতার অভাব। আর গভীরতার অভাবের ফলেই তাহারা হাস্য-রসিক না হইয়া হাস্যকর মাত্র হইয়া থাকে।

নেপাল বাবু Les miserables গল্পটা আদ্যন্ত বলিয়াছিলেন, আমার মনে আছে। নগেন বাবুর গল্পের পালাও বেশ জমিত। স্বর্ণলতার নাট্যরূপ যথোপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী সহকারে তিনি বলিয়া যাইতেন—'গদাধর চন্দ্রের' অভিনয়ে দর্শকদের হাসি আর থামিতে চাহিত না।

বিনোদনের পরে আহার, আহারান্তে বৈতালিক দলের গান, পালাক্রমে একদিন ছেলেরা, একদিন মেয়েরা। বৈতালিক শেষ হইয়া গেলে আশ্রম নিদ্রা-নীরব হইয়া যাইত, কেবল পরীক্ষার্থীদের ঘরের আলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাইত, অবশেষে সেগুলিও কখন নিভিয়া যাইত।

এই দিন-সূচীতে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। সকাল পাঁচটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত, দৈহিক ব্যায়াম হইতে মানসিক আনন্দ পর্যন্ত, চিহ্নিত পর্বের ও নিয়মের দ্বারা একেবারে ঠাসা ভর্তি, কোথাও যেন নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই।



শান্তিনিকেতনের সন্নিকটস্থ বাঁধ

প্রথমে দূর হইতে কেবল কাগজে কলমে দেখিলে ঐরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু বাস্তবে ঠিক তাহার বিপরীত। নিয়মের ঠাস-বুনানির ফলে আনন্দের ক্ষেত্র হয়তো সঙ্কীর্ণ হয়, কিন্তু সেই পরিমাণে তাহার রসের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। পাথরের চাপ চারিদিকে পড়ে বলিয়াই উৎস ঊর্ধগামী। এই নিয়মচর্যা সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার ব্যাপার হইতেছে কবির বাল্য বয়সের অভিজ্ঞতা। যাঁহারা জীবন-স্মৃতি ও ছেলেবেলা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন বাল্যকালে কবির জীবন সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত নিয়মের কি বেড়া জালেই না বেষ্টিত ছিল! আমার বিশ্বাস কবির বাল্যকালের এই নিয়ম-শৃঙ্খলাই শান্তি-নিকেতন আশ্রমের ছাত্রদের জীবনে আরোপিত হইয়াছে।

শহরের মধ্যে হইলে নিয়মের এই আতিশয্য হয়তো পীড়াদায়ক হইত, কিন্তু শান্তিনিকেতনের প্রান্তর-লক্ষ্মীর স্নিগ্ধ-শুশ্রূষার মধ্যে নিয়ম পালন কখনো কঠিন মনে হয় নাই। অন্ততঃ আমার অভিজ্ঞতা তো তাই বলে।

কাপ্তেনগণ

এবারে কাপ্তেনদের কথা বলিব। কাপ্তেনদের আমরা কি রকম ভয় করিতাম, তাহা আগে বলিয়াছি। শুধু আমরা কেন, এমন অনেক কর্তব্যনিষ্ঠ কাপ্তেন ছিল, যাহাদের অধ্যাপকরা পর্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাদের কথার প্রায়ই অন্যথা করিতেন না। কিন্তু সব কাপ্তেন যে সমান ছিল এমন নয়। কাজ-ফাঁকি-দেওয়া কাপ্তেন ছিল; নিয়ম-ভঙ্গে পরোক্ষে প্রশ্রয় দেয় এমন কাপ্তেন ছিল, তৎসত্ত্বেও মোটের উপরে ইহাদের দ্বারা ছাত্র অধ্যাপক সকলেরই প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল। আর সবচেয়ে ভীতিজনক কাপ্তেন ছিল তাহারাই যাহারা সাধারণ ছাত্র হিসাবে নিয়মভঙ্গের গুরু। চোরকে চৌকিদারের কাজ দিলে নাকি তাহারা কার্য সুনির্বাহ হইয়া থাকে। চৌকিদার চোর হওয়ার চেয়ে চোর চৌকিদার হওয়া বোধ করি অধিকতর নিরাপদ। এই কাপ্তেনদের প্রতাপ বড় কম ছিল না। তাহারা এক রকম আমাদের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা ছিল বলিলেও চলে। কাপ্তেনরা ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে দাঁড় করাইয়া দিতে পারিত, হাঁটু গাড়িয়া রাখিতে পারিত, অন্যের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করিয়া দিতে পারিত, জল খাওয়া, এমন কি ভাত পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। তাহারা কোন বালকের নামে সর্বাধ্যক্ষের কাছে বারংবার রিপোর্ট করিয়া তাহাকে আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিতেও পরোক্ষে সমর্থ ছিল। এমন অপ্রতিহত প্রতাপ যাহাদের তাহাদের ভয় না করিয়া উপায় কি?

ছাত্রদের মধ্যে যাহারা প্রবল স্বভাবতই তাহারা কাপ্তেনদের লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিত। তেমনি দুর্বল, বিপদের ছায়া দেখিবামাত্র কাপ্তেনের শরণাপন্ন হইত। সব ইস্কুলেই গুণ্ডা প্রকৃতির ছাত্র থাকে, তাহারা দুর্বলদের মারপিট করে। এখানেও তেমনি ছিল। কোন গুণ্ডা ছাত্রকে আক্রমণোদ্যত দেখিবামাত্র দুর্বল ছেলেটি চীৎকার করিয়া উঠিল। বিপদে



আম্রকুঞ্জ

পড়িলে, স্বভাবতই নাকি ভগবানের নাম জিহ্বাগ্রে আসে। আমাদের আসিত কাপ্তেন শব্দটি! দুর্বল ছেলেটি চীৎকার করিয়া উঠিল—'কাপ্তেন!' ভগবান সর্বব্যাপী হইলেও সর্বদা যে প্রত্যক্ষভাবে বিপদ-উদ্ধারে অবতীর্ণ হ'ন, তাহা নয়, কিন্তু এ বিষয়ে কাপ্তেনরা ভগবানের চেয়েও অধিকতর ফলপ্রদ ছিল। 'কাপ্তেন' শব্দটি শুনিবামাত্র, হয় তো গাছের আড়াল হইতে, নয় তো মাটির ঢিবির আড়াল হইতে সশরীরে আবির্ভাব। এই সব অসম্ভব স্থান হইতে যাহারা কাপ্তেনের অভ্যুদয় দেখিয়াছে তাহারা স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙিয়া নৃসিংহ মূর্তির উদয় কিংবা জালে-পড়া কলসী হইতে ধূম্র-দৈত্যের নির্গমন কখনও অবিশ্বাস করিবে না।

আহারে বসিয়া খুব গোলমাল চলিতেছে, এমন সময়ে স্বারপ্রান্তের ছেলেটির মুখ হইতে অর্ধোক্ত মাত্র বহির্গত হইল—'কাপ্' অমনি প্রকাণ্ড ঘর মুহূর্তে মন্ত্র-শান্ত হইয়া গেল। আমাদের শয়নে, ভোজনে, আসনে, ব্যসনে কাপ্তেনের অস্তিত্ব সর্বব্যাপী ছিল—এমন কি কোন কোন ভীরু প্রকৃতির ছেলে স্বপনে পর্যন্ত সংকটত্রাণের জন্য কাপ্তেনের নাম ফুকারিয়া উঠিত।

কাপ্তেনদের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। প্রত্যেক ঘরে তিন চারটি ভাগ, প্রত্যেক ভাগে একজন কাপ্তেন। তাহাদের উপরে প্রত্যেক ঘরে একজন করিয়া কাপ্তেন। তিন চারখানি ঘর মিলিয়া একটি বিভাগ, একজন বিভাগীয় কাপ্তেন। আর তিনটি বিভাগ মিলিয়া—সমস্ত আশ্রম;—সকলের উপরে জেনারেল কাপ্তেন বা অধিনায়ক। চীনের প্যাগোডা যেমন থাকে থাকে উঠিয়া গিয়া চূড়ার উপরে উত্থিত-থাবা ড্রাগন মূর্তি শোভমান, তেমনি আমাদের কাপ্তেন পর্যায় থরে থরে বিন্যস্ত—সকলের উপরে ছাত্র স্বরাজের অধিদেবতা স্বয়ং অধিনায়ক। চীনের ড্রাগনের প্রতাপ শুনিয়াছি মাত্র, দেখি নাই; জেনারেল কাপ্তেনের প্রতাপ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা—একেবারে মর্মান্তিকভাবে প্রত্যক্ষ।

বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অধিনায়ক যখন সমস্ত কাপ্তেন পরিবৃত হইয়া শোভা পাইত, তখন সর্বশক্তিমান এই নাতি ক্ষুদ্র-দলটি দেখিয়া মনে হইত অস্টারলিজের যুদ্ধের প্রারম্ভে স্বয়ং নেপোলিয়ান বুঝিবা সেনাপতিবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান।

সমস্ত কাপ্তেন-পদই নির্বাচনমূলক ছিল। কোন পদের স্থায়িত্ব সপ্তাহান্তিক, কোন পদের পক্ষান্তিক, কোনটার বা মাসান্তিক। ছেলেদের ভোটের উপরে নির্ভর করিলেও অধিকাংশ সময়ে কর্তব্য-নিষ্ঠ কাপ্তেনরাই নির্বাচিত হইত।

আমাদের সমবয়স্কদের মধ্যে কড়া মেজাজের কাপ্তেন ছিল শ্রীহট্টের 'শশীন্দ্র-সিংহের পুত্র শশধর। আর একজন ছিল কালিকচ্ছর 'মহেন্দ্র নন্দীর পুত্র সাধক। গোবিন্দ চৌধুরী বলিয়া একজন ছিল। আর সবচেয়ে ভীতি উৎপাদক ছিল নরভূপ রাও। সে খাস নেপালী। মুখ গোল, চোখ ছোট, চুল ছাঁটা; বেঁটে, মোটা, ফর্সা। একে নেপালী অর্থাৎ সামরিক জাতি, তার উপরে কেহ কেহ নাকি তাহার বাক্সে এক-খানা 'কুকরি' দেখিয়াছে,—তা'ছাড়া নেপালের জঙ্গলে প্রত্যেক দিন বিকালে বাঘ শিকার করিয়া তাহারা খেলা করে—এই গল্পই তাহার আদেশ পালিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। নরভূপকে চাকর বাকর, এমন কি আশে পাশের গাঁয়ের লোক পর্যন্ত ভয় করিত। মুখে মুখে তাহার নামটা বিকৃত

হইয়া গিয়াছিল, কেহ বলিত নরভূত, কেহ বলিত নরভুক্।

শশধর সিংহ এখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি ডিগ্রি লইয়া সেখানেই স্থায়ী-ভাবে বাস করিতেছে। কাপ্তেন হিসাবে তাহাকে কি রকম ভয় করিতাম তাহার একটা গল্প এখনো মনে আছে।

তখন আমাদের বয়স বছর তেরো চোদ্দ হইবে। শশধর বোধ করি বরের কাপ্তেন। চার পাঁচজনে মিলিয়া আমাদের ছোট একটি দল ছিল, নিরাপদভাবে নিয়ম ভঙ্গ করাই ছিল আমাদের পেশা। একদিন আমরা গোটা চার পাঁচ হাঁসের ডিম জোগাড় করিয়া ফেলিলাম। কাজটা যত সহজ মনে হইল তত সহজ নয়। প্রথমত কাছে পয়সা রাখিবার হুকুম ছিল না, কাজেই পয়সার পরিবর্তে বিনিময় প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সাঁওতাল ছেলেরা ডিম বেচিতে আসিত। খান দুই পুরানো ধুতি দিয়া ডিমগুলি সংগৃহীত হইল। খুব সম্ভব নিজেদের ধুতি দিই নাই—রোদে মেলিয়া দেওয়া বহু ধুতি ছিল, তারই খান দুই দিয়া ফেলিলাম।

তারপরে সমস্যা ডিমগুলি খাওয়া যায় কি প্রকারে? রান্নাঘরের বাহিরে অন্য কোন খাদ্য গ্রহণের হুকুম ছিল না। আর ডিম তো কাঁচা খাওয়া চলে না—তার জন্য সরঞ্জাম অনেক প্রকার চাই। প্রথমদিন কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া মাঠের মধ্যে গর্ত করিয়া ডিম কয়েকটি পুঁতিয়া রাখিলাম। ঘরে আনিবার উপায় নাই—কাপ্তেনের সর্বভেদী দৃষ্টি আছে। সারা-রাত্রি ডিমের চিন্তায় ঘুম হইল না; কোন কুক্কুট মাতাও বোধ করি ডিমের জন্য এমন দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটায় না।

পরদিন আমরা মরীয়া হইয়া উঠিলাম। আজ ডিমগুলি ভাজিয়া খাইবই খাইব—তাহাতে অদৃষ্টে যাহাই থাক্। প্রয়োজন হইলে শশধর কাপ্তেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিব।

সেদিনটা ছুটি ছিল—উঠিয়াই দেখিতে গেলাম ডিম অটুট আছে কিনা? ভগবান মঙ্গলময় সন্দেহ নাই—ডিমের নিটোলে একটিও টোল পড়ে নাই। সেখানে আমাদের কার্যনির্বাহক সমিতি বসিল। আমি সভাপতিরূপে প্রশ্ন করিলাম—সিদ্ধ না মামলেট? অনেক বিতর্কের পরে স্থির হইল সিদ্ধ করা সহজ, কিন্তু মামলেট খাইতে অনেক ভাল। ইহার পরিণাম যখন বিপদজনক তখন স্বাদুতর খাদ্য খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব মামলেট করাই সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু মামলেট করিতে হইলে তেল চাই নুন চাই, লংকা চাই উনুন চাই তৈজস চাই—এক অদম্য আকাংক্ষা ছাড়া আমাদের আর সব জিনিসেরই যে অভাব।

তখন সভাপতির আদেশে চার জন সদস্য চার দিকে বাহির হইয়া পড়িল—সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহের উদ্দেশে। সেদিন কতজনের যে কত জিনিস হারাইল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এমন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সরঞ্জাম সংগ্রহ শেষ হইল। স্নানের তেল হইতে খানিকটা তেল রান্না-ঘর হইতে ভৃত্যদের সাধ্য সাধন করিয়া একটু লংকা ও নুন, কার যেন একটা কেরো-সিনের ডিবে, অন্য কারো একটা এলু-মিনিয়মের বাটি ও চামচ। কিছু দূরে মাঠের মধ্যে একটা মাটির ঢিবি ছিল তার পাশে একটা শিরিষ গাছ—সেখানে গিয়া পাঁচজনে পাঁচটি ডিমের পাঁচটি মামলেট ভাজিয়া খাইতে হইবে। পাঁচজনে তো রওনা হইলাম। মনে হইতে লাগিল সকলেই যেন আমাদের দিকে চাহিতেছে, প্রত্যেকের চাহনিতেই যেন একটা বিশেষ অর্থ। আমরা চলিতেছি কিন্তু বাঁশ-ঝোপের আড়ালে ও কাহার মাথা? ভগবান তোমার পরম কারুণিক বিশেষণ কি একে-বারেই শূন্য গর্ভ? যত সত্য কি তোমার ও ন্যায়বিচারক উপাধিটা? আসন্ন ভর্জিত ডিম্বের চরম মুহূর্তে শশধর কাপ্তেনকে সম্মুখে না আনিয়া ফেলিলে এই বিশ্ববিধানের এমন কি ক্ষতি হইত? হায়, হায় ও-যে আর কেউ নয়—স্বয়ং শশধর—ডিমের ভাগ দিলেও ও-যে টলিবে না! এমন নীরস লোককে কেন তোমার সৃষ্টি বিধাত! নাঃ, ভগবান্ যে পরম কারুণিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই—শশধর কাপ্তেন অন্যদিকে চলিয়া গেল।

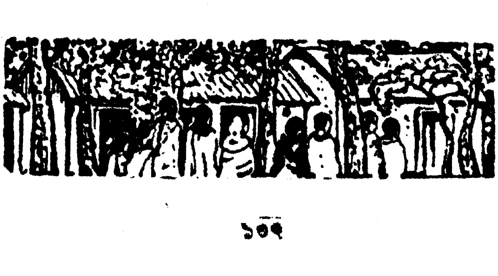
শিরিষ গাছের আড়ালে ডিবের আগুনে কাঁচা তেলে মামলেট ভাজা শেষ হইল। পাছে এই আগুন হইতে ধূমকেতু উঠিয়া শশধরকে ইসারা করে—সে ভয় ছিল, কারণ জলস্থল, জীবজড় সমস্তই যে আমাদের প্রতিকূল সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

বহু দুঃখের তাপে ভর্জিত সেই মামলেট যখন মুখে দিলাম—স্বর্গের অমৃত যে ইহার চেয়ে মধুর তাহার প্রমাণাভাব। সেই মামলেটের স্বাদে হঠাৎ মনে এমন একটা উদারতা অনুভব করিলাম যে, তখন শশধরকেও আয়ত্তের মধ্যে পাইলে বোধ করি ক্ষমা করিতে পারিতাম। এই অভিজ্ঞতার ফলে আজ পর্যন্ত আমার কাছে উপাদেয়তম খাদ্য—মামলেট কিঞ্চিৎ কাঁচা তেলে ভাজা।

আশ্রম-জীবনে কাপ্তেনদের শাসন মোটের উপরে ভালো করিয়াছে কি মন্দ করিয়াছে, নিশ্চয় করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। সর্বদা কাপ্তেনদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকাতে ব্যক্তিগত উদ্যম যেন কিছু কমিয়া যায় অন্তত আমার যেন গিয়াছে। টিকিট-ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইতে হয় হয় পিছন হইতে কাপ্তেনের আদেশ যে ধ্বনিত হয় নাই—ততক্ষণ পিছনের লোক ঠেলিয়া-ঠুলিয়া টিকিট করিয়া চলিয়া যায়।

তেমনি আবার দিনের মধ্যে আট দশ বার লাইন করিতে করিতে লাইন ব্যাপারটা খুব অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন খাদ্য নিয়ন্ত্রণের দিনে দোকানের সম্মুখে লোক-জন যখন বাঁকা-চোরা লাইন করে তখন আমি মনে মনে হাসি, এ সবে আমরা বাল্য-কাল হইতে শিক্ষিত। প্রয়োজন হইলে জ্যামিতির সরল রেখার মত লাইন গড়িয়া তুলিব। আক্ষেপের আবশ্যক নাই শীঘ্রই লাইনে দাঁড়াইতে হইবে কিন্তু মনে আশংকা হইতেছে—এবারেও পিছনের লোক ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া আমার আগেই শোয়া সের চাল মাপিয়া লইয়া খসিয়া পড়িবে।

(ক্রমশ)



বিদুষী ভার্যা

- শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় -

পূর্বানুবৃত্তি

প্রার্থিত অনুমতি লাভ করিয়া ব্রিজ-বিহারী দিবাকরকে ধন্যবাদ দিয়া পিছন ফিরিয়া শয়ন করিলেন। রামভরোখাও প্রভুর পদসেবায় নিযুক্ত হইল।

সদ্য বিবাহিত বলিয়া ঠিক না বুঝিলেও, দিবাকর এবং যূথিকা যে নববিবাহিত দম্পতি তাহা ব্রিজবিহারী অনুমান করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাহাদের বিশ্রম্ভালাপের সুযোগকে যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলেন, এবং নিদ্রিতও যে হইলেন তাড়াতাড়ি, তাহার জানান দিলেন প্রগাঢ় নাসিকাধ্বনির ঘোষণার দ্বারা।

দিবাকর ও যূথিকার মধ্যে কথোপ-কথন আরম্ভ হইল, কিন্তু আলাপ জমিল না। ক্রমশই তাহা বেশী বেশী খণ্ডিত এবং সংক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল উভয়ে বাহিরের অস্পষ্ট এবং দ্রুতাপসরমান দৃশ্যাবলীর দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া দিবাকর যে প্রস্তাব করিল তাহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে যূথিকারও মনের মধ্যে কোনো সন্দেহ রহিল না

দিবাকর বলিল, "এখন থেকে লুধিয়ানা পর্যন্ত সময়টার যদি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার করতে চাও যূথিকা, তা হ'লে এস এই সময়ে আমরা খাওয়াটা সেরে নিই; আর, তারপর যদি সম্ভব হয় খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়াও যাক। যখনই হোক, এ দুটো ব্যাপারে যখন খানিকটা সময় দিতেই হবে, তখন এই দুঃসময়ের মধ্যেই সেটা চুকিয়ে দেওয়া ভাল। আর খাওয়ার পক্ষে এটা যে খুব অসময় হবে না, তার প্রমাণ আমার পেটের মধ্যে দেখা দিয়েছে।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল; তাহার পর টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া একটা প্লেটে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া স্বামীর সম্মুখে স্থাপন করিল।

বিস্মিত হইয়া দিবাকর বলিল, "তোমার?"

যূথিকা বলিল, "তুমি খাও, পরে এই প্লেটেই আমি নেবো অখন।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "না, কিছুতেই তা হবে না। হয় এক প্লেটে এক সঙ্গে; নয়, দুই প্লেটে এক সময়ে।"

অগত্যা যূথিকা শেষোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী দুই প্লেটের ব্যবস্থাই করিল।

আহার-পর্ব শেষ হইলে উভয়ে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, ব্রিজবিহারী সিং যথাপূর্ব নাসিকাধ্বনি করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু দুর্নিবার নিদ্রাকর্ষণ হেতু রামভরোখা লালের প্রভুসেবার নিরবচ্ছিন্নতা মাঝে মাঝে ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

পাশের দিকের বেঞ্চে যূথিকার এবং মাঝখানের বেঞ্চে নিজের শয্যা রচনা করিয়া দিবাকর যূথিকাকে শয়ন করিতে বলিল। পরে ল্যাভেটরির বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়া কামরার আলো নিভাইয়া দিয়া সে নিজেও শুইয়া পড়িল। ঘষা কাঁচ ভেদ করিয়া আসা স্তিমিত আলোকের মৃদু প্রভার জন্য কক্ষ একেবারে নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল না।

অতি দ্রুতগতির ছন্দ তুলিয়া পাঞ্জাব মেল তখন পরিপূর্ণ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই ছন্দের গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে এবং মৃদুমন্দ দোলায় দুলিতে দুলিতে দিবাকর এবং যূথিকা দুই-জনেই অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

(৭)

সুগভীর নিদ্রার মধ্যে দিবাকর হয়ত-বা কোনো সুখ-স্বপ্নেই নিমগ্ন ছিল, এমন সময়ে রূঢ় ধাক্কার তাড়নায় জাগ্রত হইয়া শুনিল, 'বাবুজি, বাবুজি' বলিয়া কেহ তাহাকে ঠেলিতেছে। ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সম্মুখে রামভরোখাকে দেখিয়া ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেয়া হুয়া?"

"হামারা বাবু সাহেব গির্ গয়ে' বাবুজি!"

"গির্ গয়ে'! কাঁহা গির্ গয়ে'?"

যে বেঞ্চে ব্রিজবিহারী শয়ন করিয়া ছিলেন তাহার পাশের জানালা দেখাইয়া রামভরোখা বলিল, "উ ঝরোখা দে-কর একদম ময়দানমে!" তাহার পর 'আরে বাপরে, বাপরে, বাপ! সত্যানাশ হুয়া!' বলিয়া ভুক্ ভুক্ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল

এক লম্ফে আলার্ম-চেনের নিকট উপস্থিত হইয়া দিবাকর সজোরে চেন টানিয়া ধরিল।

সর্বনাশ! মাঠে পড়িয়া গিয়াছেন' স্বপ্নের ঘোরে না-কি? পাগল-টাগল নয় ত! অথবা, আত্মহত্যার সংকল্প কি-না, তাই বা কে বলিতে পারে।

ঘুম ভাঙিয়া যূথিকাও উঠিয়া বসিয়া-ছিল; বলিল, "টেলিগ্রাফের পোস্ট গুণতে আরম্ভ কর; পেছিয়ে আসবার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।"

"তুমি গোণো যূথিকা!" বলিয়া দিবাকর ব্যগ্রকণ্ঠে রামভরোখাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেৎনা বক্ৎ গির গয়ে'?"

রামভরোখা বলিল, "তুরন্ত্ বাবুজি, কোই এক মিন্ট্ ভি নহি হোগা। স্বপ্নাকে বাবুসাহেব তড়াক্‌সে বিছৌনা পর উঠ্ বৈঠিন; বস্, ফৌরণ ধড়াকসে বাহর গির পড়িন্! ধোখা লাগ্ গিয়া বাবুজি, ধোখা লাগ্ গিয়া।" বলিয়া 'আরে, বাপরে, বাপরে, বাপ! সত্যানাশ হুয়া!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহা হইলে স্বপ্নই! হায়, হায়, নিতান্ত ভ্রান্ত-বশে ভদ্রলোক হয়ত-বা প্রাণ হারাইলেন!

আর্তকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "এমন দুর্ঘটনা ঘটবে জানলে কে গাড়িতে স্থান দিত! মাগো, এ কি অশুভ কাণ্ড!"

চেন টানার সংগে সংগেই গাড়ির গতি দ্রুতবেগে মন্দ হইয়া আসিতেছিল। সহসা এক সময়ে ঘ্যাঁচ করিয়া থামিয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে খুট করিয়া দরজা খোলার শব্দ হইল, এবং পর মুহূর্তেই ল্যাভেটরি হইতে বাহির হইলেন উপস্থিত ঘটনার নায়ক। স্বয়ং ব্রিজবিহারী সিং!

উৎকট বিস্ময়ে দিবাকর, যূথিকা এবং রামভরোথা তিনজনেই অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল। ব্রিজবিহারীকে দেখিয়া তাহারা যেরূপ চমকিত হইল, বোধ করি ব্রিজবিহারীর প্রেতমূর্তি দেখিলেও ততটা হইত না।

সকৌতূহলে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রিজবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৌন্ চীজকা হল্লা হ্যায় বাবুজি! ময়দান পর গড়ীভি খড়ী হুয়ী কে'ও?"

আর, খড়ী হুয়ী কে'ও! ক্রুদ্ধ-বিরক্ত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "অরে, আপকা চাকর ত' হামকো একেবারে মজায়া! আপ বাথরুমমে থা, আর আপকা চাকর হামকো ঘুম ভাঙ্গাকে বোলা, আপ স্বপন দেখকে জানলা দেকর বাহারমে গির গিয়া। কাজেই হাম চেন টানকে গাড়ি থামায়া। এখন পঞ্চাশ টাকা দণ্ড লাগেগা তো!"

দিবাকরের কথা শুনিয়া বিহ্বলতায় এবং উৎকণ্ঠায় ব্রিজবিহারীর দুই চক্ষু কপালে উঠিল।

রামভরোথা তখন অদূরে মেঝেতে বসিয়া আনন্দে এবং ভয়ে 'হায়রে দাদা! হায়রে দাদা!' করিয়া কাৎরাইতেছিল। ক্রুদ্ধ ব্রিজবিহারী সবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমে তাহার পৃষ্ঠে একটি পদাঘাত করিলেন; তাহার পর রুষ্টকণ্ঠে বলিলেন, 'হারামজাদ্ নিশাখোর! হামনে তুমকো হফিম খানেকো মনা কিয়াথা, ইয়া নহি? অব নিকাল্ পচাশ রুপৈয়া জরমানা!' তাহার পর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "স্বপন হামি দেখিনি বাবুজি, ঐ নিশাখোর হারামজাদাই দেখেছিল। নীদ টুটে বিছানাতে হামাকে না দেখে মনে করেছিল, হামি খিড়কি দিয়ে ময়দানে গিরে গেছি।"

ব্যাপারটা হইয়াছিলও অবিকল সেইরূপ। হঠাৎ এক সময়ে নিদ্রা এবং নেশা হইতে জাগ্রত হইয়া রামভরোথা তাহার প্রভুকে শয্যার উপর বসিয়া থাকিতে দেখে। পরমুহূর্তেই সে কিন্তু ঘুমাইয়া পড়ে এবং তাহার অব্যবহিত পরে ব্রিজবিহারীর ল্যাভেটরির দরজা দেওয়ার শব্দে জাগ্রত হইয়া শয্যার উপর ব্রিজবিহারীকে না দেখিয়া মনে করে, তিনিই শব্দ করিয়া বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন।

দিবাকরের দুই হস্ত চাপিয়া ধরিয়া ব্রিজবিহারী সানুনয়ে বলিলেন যে, পঞ্চাশ টাকা দণ্ড একান্তই যদি দিতে হয় ত' তিনিই তাহা বহন করিবেন; কারণ এ ব্যাপারে অপরাধ যদি কাহারো থাকে ত' তাহা সম্পূর্ণ রামভরোথার; এবং দিবাকরের যদি কিছু অংশ থাকে ত' তাহা ব্রিজবিহারীর নিকট হইতে প্রচুর ধন্যবাদের পাওনা।

দিবাকরের অভিজাত মন কিন্তু এ প্রস্তাব পছন্দ করিল না। মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "কি আশ্চর্য! আমি চেন টানা, আর আপনি জরিমানা দেবেন? না, তা কিছুতেই হয় না। দেনা যদি হয় ত' আমিই দেবো।"

যূথিকা বলিল, "এ কথার বিচার পরে করলে চলবে। গার্ড এলে যা বলতে হবে এখন সেইটে ঠিক ক'রে রাখা দরকার। জরিমানা কিছুতেই দেওয়া হবে না। যে অবস্থায় চেন টানা হয়েছে, আইনের চোখে তাতে কোনো অপরাধ করা হয়নি।"

এ কথার সারবত্তা সম্বন্ধে দিবাকর এবং ব্রিজবিহারী সিং একমত হইলেন; কিন্তু কথাটাকে ভাল করিয়া গুছাইয়া লইবার পক্ষে যথেষ্ট সময় পাওয়া গেল না। নীচে লাইনের পাশে গার্ডের গাড়ি হইতে গার্ড এবং এঞ্জিন হইতে জন দুই খালাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের কণ্ঠস্বর এবং গাড়ির ব্রেক ও চাকা ঠিক করিবার জন্য হাতুড়ি পেটার শব্দ শোনা গেল।

পরমুহূর্তেই দরজার গবাক্ষপথে দেখা দিল ইংরেজ গার্ডের ঔৎসুক্যপূর্ণ মুখ। গম্ভীর স্বরিৎকণ্ঠে সে বলিল, "Hullo what's up here? Is there any accident? (কি ব্যাপার এখানে? কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে না কি?)

নিমেষের জন্য দিবাকর একবার ব্রিজবিহারীর মুখের দিকে চাহিল। সেখান হইতে সাড়া বাহির হইবার কোনো লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া গার্ডের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "Not much." (বেশি নয়।)

"What not much?" (কি বেশি নয়?)

"Accident." (দুর্ঘটনা।)

"Who pulled the chain? You?" (কে চেন টেনেছিল? আপনি?

স্বীকৃতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "I." (আমি।)

অভিজ্ঞ গার্ড বুঝিল, ব্যাপারটা একেবারেই গুরুতর নহে। দিবাকরের ইংরেজি ভাষার দারিদ্র্য অতিক্রম করিয়া প্রকৃত ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করিতে সময় লাগিবে, সে কথা বুঝিতেও তাহার বাকি রহিল না। ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া সকল কথা শেষ করা সম্ভব নহে উপলব্ধি করিয়া সে বলিল, 'May I come in?' (ভেতরে আসতে পারি?)

দরজার চাবি খুলিয়া দিয়া কামরার ভিতর দিকে মুখ নাড়িয়া দিবাকর গম্ভীর মুখে বলিল, "Come" (আসুন)।

নীচে খালাসিদের কাজ শেষ হইয়াছিল। তাহাদিগকে এঞ্জিনে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিয়া গার্ড অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সহসা অতর্কিতভাবে এই ঘটনাচক্রের উদ্ভবে দিবাকরের মেজাজ একেবারে তিক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার চরম পরিণতি পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডের কথা মনে করিয়া সে একটুও কাতর হয় নাই। সে ত' সুটকেস হইতে যে-কোনো মুহূর্তে পাঁচখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া দিলেই চুকিয়া যায়। কিন্তু যত বিপদ হইয়াছিল যূথিকার কথা ভাবিয়া। কিছু পূর্বে জরিমানা দেওয়ার বিরুদ্ধে যে সুদৃঢ় অভিমত সে প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে বিনা প্রতিবাদে জরিমানা প্রদান করিলে

(শেষাংশ ১৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্ট্র্যাটেজী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে জাপানীদের অভিযান প্রধানত দুমুখী চলে। প্রথমে তারা দক্ষিণমুখী অগ্রসর হয়। সেই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ, পূর্ব-চীন সাগরে আধিপত্য বিস্তার এবং মালয় দখল করা। তাতে সাফল্য লাভের পর তারা পশ্চিমে ব্রহ্মদেশের দিকে এক বাহু এবং পূবে ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের দিকে আর এক বাহু বিস্তার ক'রে দ্বীপের পর দ্বীপ দখল করে। পূর্বদিকের বাহু গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার কাছে উপস্থিত হয় এবং পশ্চিম দিকের বাহু ব্রহ্মদেশ জয় ক'রে ভারতের পূর্বপ্রান্তে এসে দেখা দেয়। সম্প্রসারণের কাজ শেষ ক'রে জাপানীরা মূল এসিয়াখণ্ডে নিজেদের শক্তি সংহতির দিকে মন দেয়। সাংহাই থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত স্থলভাগে পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্যে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জুন এবং জুলাই মাসে তারা চীনে পুনরায় আক্রমণ শুরু করে।

পার্ল পোতাশ্রয়ে জাপানীরা মারাত্মকভাবে ঘা না দিলেও মিত্রপক্ষ প্রশান্ত মহাসাগরে ঠিক কি করত বলা কঠিন। কা'রও কারও অবশ্য ধারণা যে, পার্ল পোতাশ্রয়ে ঘা না খেলে মার্কিন ব্যাটল্‌শিপগুলি সিঙ্গাপুরে আসত, ম্যানিলায় বিমানবাহী জাহাজ ও বড় ক্রুজারগুলি প্রেরিত হ'ত এবং ব্যাপকভাবে সাবমেরিন আক্রমণ চলত। কিন্তু তা'হলেও মনে হয়, প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানকে অবরোধ এবং নৌ-যুদ্ধে আহ্বান করা ছাড়া মিত্রপক্ষের আর কোন সমরপরিকল্পনা ছিল না। যুদ্ধের ফলাফল দৃষ্টে একথা এখন বলা চলে যে, মিত্রপক্ষ তখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যে পরিমাণ স্থলসেনা ও বিমানবল রেখেছিল তদ্দ্বারা আক্রমণ চালিয়ে আগেই জাপানের সমর-পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেওয়া সম্ভব হত না। * গতীয় যুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে জাপানীরা প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে নেমেছিল, আর মিত্রপক্ষ ছিল স্থিতযুদ্ধের নীতিতে নির্ভরশীল। স্থল, নৌ ও বিমান বলের সমাবেশে জাপানীরা যখন ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এল মিত্রপক্ষের সৈন্যরা তখন ফিলিপিন, মালয় এবং ওলন্দাজ অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জে বিচ্ছিন্নভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল; তাদের লড়াইটা হল খানিকটা অবরুদ্ধ দুর্গের সৈন্যদের লড়াইয়ের মতো। বলা বাহুল্য, কোন সমর-পরিকল্পনা না থাকায়ই মিত্রপক্ষের এরূপ যোগাযোগের অভাব ঘটেছিল।

পূর্বেই বলেছি, আক্রমণ শুরু করতে হলে সামরিক অবস্থানের দিক দিয়ে মিত্রপক্ষের প্রথমে যথেষ্টই সুবিধে ছিল। জাপানী দ্বীপপুঞ্জের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্যে তাদের ঘাঁটির অভাব হত না। অস্ট্রেলিয়া থেকে হংকং পর্যন্ত সরবরাহপথ তাদের একরূপ উন্মুক্ত এবং নিরাপদই ছিল। সময় থাকতে ঘাঁটিগুলিকে সুরক্ষিত না করায়ই তাদের বিপদ ঘটে। একটির পর একটি ঘাঁটি হারিয়ে ক্রমশই তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফরমোসা এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী প্রত্যেকটি ঘাঁটিই দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। পর পর সেইগুলি বেয়ে উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে যেমন নেমে আসা যায়, দক্ষিণ হতে উত্তর দিকেও তেমন উঠে যাওয়া চলে। সেই শ্রেণীবদ্ধ ঘাঁটিগুলির সাহায্যে জাপানের ওপরও আক্রমণ চালানো যায়, আবার জাপান থেকেও অগ্রসর হয়ে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত আক্রমণ করা চলে। সুমাত্রা দখলের পক্ষে মালয়ের অবস্থানও ঠিক একই রূপ। তারপর একটু উত্তরে সরে এলে থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। কেবল ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারা কোন ঘাঁটির মূল্য নিরূপিত হয় না; ঘাঁটিগুলির কিরূপ সামরিক শক্তি থাকে এবং কি উদ্দেশ্যে সেগুলিকে ব্যবহার করা চলে তারই ওপর আসল মূল্য নির্ভর করে। সেইগুলি আক্রমণ চালাইবার উপযোগী অগ্রবর্তী ঘাঁটিও হতে পারে, আবার প্রতিপক্ষকে অবরোধ করার পক্ষে সুবিধাজনক ঘাঁটিও হতে পারে। তাছাড়া কেবল সরবরাহ প্রেরণের জন্যেও কোন কোন ঘাঁটি ব্যবহার করা চলে; এই শ্রেণীর ঘাঁটিতে বিপক্ষ সহজেই আক্রমণ চালাতে পারে। কিন্তু জাপান যতগুলি ঘাঁটি দখল করেছে তার সবগুলিই আক্রমণের সহায়ক হয়েছে। একটি ঘাঁটি দখল ক'রে সেখান থেকে সে আর একটি ঘাঁটিতে লাফিয়ে পড়বার সুবিধে পেয়েছে। জাপান যে সুবিধে পেয়েছে, মিত্রপক্ষের সেই সুবিধে থাকা সত্ত্বেও জাপানকে আক্রমণ করা বা তাকে ঠেকাবার কোনো সুষ্ঠু সমর-পরিকল্পনা না থাকায় তারা তা' কাজে লাগাতে পারে নি।

স্থলযুদ্ধে মিত্রপক্ষের তুলনায় জাপান দ্বিগুণ সৈন্য নিয়োজিত করেছিল। মার্কিন, ফিলিপিনো, অস্ট্রেলিয়, বৃটিশ, ভারতীয়, ওলন্দাজ এবং মালয়ী সৈন্যদের তুলনায় জাপানী বাহিনী সামরিক শিক্ষায় ও সংগঠন শক্তিতে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ ছিল। মিত্রপক্ষের বাহিনীতে দেশী সৈন্যের তুলনায় গোরা সৈন্যের অনুপাত ছিল এইরূপঃ—ফিলিপিনে প্রতি ৩ জন দেশী সৈন্যে ১ জন গোরা, মালয়ে আধাআধি এবং ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অনুমান প্রতি ১০ জন দেশী সৈন্যে ১ জন গোরা। সর্বত্রই মিত্রপক্ষের সৈন্যদের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল, একমাত্র মালয়ের অবস্থা সম্ভবত একটু ভালো ছিল। বিমানবলের অভাবও সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। ফিলিপিনের যুদ্ধে মার্কিন ও ফিলিপিনো সৈন্যরা কার্যত বিমানবলের কোন সাহায্যই পায় নি, একমাত্র দুর্বল গোলন্দাজ বাহিনীর ওপর নির্ভর ক'রে তাদের সেখানে যুদ্ধ চালাতে হয়। ব্রহ্মদেশের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। মালয় এবং ব্রহ্মে জাপানীরা উন্নততর কৌশলে গতীয় যুদ্ধ চালায়; বিশেষভাবে মালয়ে তারা অকস্মাৎ প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে উপনীত হয়ে আক্রমণ চালাবার কৌশল অবলম্বন করে। জঙ্গল-যুদ্ধে জাপানী সৈন্যরা বিশেষভাবে অভ্যস্ত ছিল এবং সেজন্যেই মালয়ে তারা সহজেই জয়লাভ করতে সক্ষম হয়।

জাভার ভাগ্য নিরূপিত হয় কার্যত নৌ ও আকাশযুদ্ধে। সেখানে জাপানী স্থলসেনার অবতরণের পর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই মিত্রপক্ষের আত্মরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সুতরাং দেখা যায়, কোথাও জাপানী বাহিনীকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আধুনিক যন্ত্রযুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তেমন কোন বড় রকমের যুদ্ধ করতে হয় নি। মাত্র শ'দেড়েক ট্যাঙ্ক নিয়ে জাপানীরা সমগ্র মালয় অভিযান শেষ করে। একমাত্র সিঙ্গাপুর দখলের জন্যে তাদের কিছু ব্যাপকভাবে কামান ব্যবহার ও বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করতে হয়েছিল। অস্ত্রবল বেশী প্রয়োগ না করলেও জাপানী সৈন্যরা যে সর্বত্র মরিয়া হয়ে লড়াই করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে তারা যুদ্ধ চালিয়েছে। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে অস্ত্রবলের চেয়ে জাপানী রণকৌশলেরই তারিফ করতে হয় বেশী।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে জাপানীরা যতটা তৎপরতা দেখিয়েছে চীনে কিন্তু ততটা পারে নি। সমগ্র প্রশান্ত

* The main idea of Allied strategy was doubtless to immobilize the Japanese forces by defensive and naval operations. But such a Maginot policy in the Pacific was bound to fail even without the crippling blow at Pearl Harbour. —*The Great Offensive—by Max Werner.*

মহাসাগরীয় এলাকায় স্থলযুদ্ধে জাপানের যত সৈন্য নিয়োজিত হয় চীনে তার চেয়ে বেশী সৈন্য তাকে রাখতে হয়েছিল। চীনে জাপানীদের কোন "ব্লিৎসক্রীগ" হয়নি। চীন তাকে বিলম্বিত যুদ্ধে বাধ্য করেছে। চীনের বিস্তীর্ণ এলাকা, যথেষ্ট জনবল, যুদ্ধে চীনাদের দৃঢ়তা, জনযুদ্ধের নীতি এবং চীনা বাহিনীর অদ্ভুত ভৌগোলিক জ্ঞানই জাপানী "ব্লিৎসক্রীগ"-এর পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযানে জাপ বাহিনীর যে রণকৌশল বিস্ময়কর বলে মনে হয় চীনে দেখা যায় তা' স্তিমিত; অথচ জাপানের তুলনায় চীনের অস্ত্রবল কত কম। আরো একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় এবং চীনে এক সঙ্গে বড় রকমের আক্রমণ চালায় নি। কেবল তাই নয় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ থেকেই চীনে জাপানীদের তেমন কোন বড় আক্রমণ হয় নি। সম্ভবত জাপান তখন হতেই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত হতে থাকে। তারপর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযান শেষ ক'রে জাপান ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় চীনযুদ্ধে জোর দেয়। এবার জাপানের প্রধান উদ্দেশ্য হয় কিভাবে সাংহাই থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত এক মহা-এসিয়াটিক রেলপথ স্থাপনের পথ নিষ্কণ্টক করা যায়। এই রেলপথ স্থাপন না করতে পারলে জাপান থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত একমাত্র জলপথেই ভার, রসদ ও সৈন্য সরবরাহ করা চলে। এতগুলি অধিকৃত স্থান রক্ষা করতে হলে একমাত্র জলপথের ওপর নির্ভর করা জাপানের পক্ষে নিরাপদ নয়; কাজেই সে এসিয়ার পূর্ব উপকূলভাগ দিয়ে সরাসরি একটা সরবরাহপথ খোলার প্রয়াস পায়। দক্ষিণ চীন সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত না করতে পারলে তা' অসম্ভব এবং জাপান যে সেই উদ্দেশ্যেই ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে নবোদ্যমে চীন অভিযান আরম্ভ করে সেকথা আগেই বলেছি।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপান আকাশে আধিপত্য লাভ করে এবং তার ফলেই জয়লাভের পথ সুগম হয়। অথচ এই আধিপত্যলাভের জন্যে জাপানকে যে খুব বিপুল সংখ্যক বিমান সেখানে নিয়োজিত করতে হয়েছিল এমন নয়: মিত্রপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই সে আধিপত্যলাভে সক্ষম হয়। বিমানবল বৃদ্ধির কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক বছর পিছিয়ে পড়ে এবং তারই জন্যে তাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়। এসব হিসেব করেই জাপান যুদ্ধে নামে। জাপানীরা ফিলিপিনে ২০০ থেকে ৩০০, মালয়ে ৫০০ থেকে ৬০০, ব্রহ্মে ৪০০ থেকে ৫০০ এবং জাভায় ৩০০ থেকে ৪০০-এর মতো বিমান নিয়ে যুদ্ধ জয় করে। আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের হিসেবে এই বিমানবল তেমন বিশেষ কিছু নয়; কিন্তু মিত্রপক্ষের বিমানবলের এতই অভাব ছিল যে, এই অল্পসংখ্যক বিমান নিয়েও জাপানীরা সর্বত্র আকাশে প্রাধান্য লাভ করে এবং তারই ফলে জাপানের নৌ ও স্থলসেনা বিদ্যুৎগতিতে ঘাঁটির পর ঘাঁটি দ্বীপের পর দ্বীপ এবং দেশের পর দেশ দখল করতে সক্ষম হয়। বিমানবল প্রয়োগে দুটি প্রধান বিষয়ে জার্মানির সঙ্গে জাপানের মিল দেখা যায়; প্রথমত, স্থলসেনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং দ্বিতীয়ত, প্রতিপক্ষের বিমানঘাঁটিতে হানা দিয়ে ভূতলেই তাদের অধিকাংশ বিমান ধ্বংস বা অকেজো করা। ফিলিপিন, মালয় এবং জাভায় তা'রা এই কৌশল অবলম্বন ক'রে বিশেষ সফল হয়।

এবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। প্রথমেই বলা দরকার নৌ-শক্তি সম্বন্ধে চিরাচরিত চিন্তাধারায় জাপান বিষম ঘা দিয়েছে। নৌ-যুদ্ধে পরাজিত না হয়েও প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের পরাজয় হয়েছে এবং নৌ-যুদ্ধে না জিতেও জাপানীরা সেখানে জয়লাভ করতে পেরেছে। নৌবলে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার ক'রেও প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানীদের যুদ্ধজয় করতে অসুবিধে হয় নি। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ভেবেছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলকায় জাপানের সঙ্গে কখনো যুদ্ধ বাধলে সেই যুদ্ধ প্রধানত জলেই হবে এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তারা জাপানের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করেছিল। তাদের ধারণা ছিল, নৌ-যুদ্ধের ফলাফলের দ্বারাই চূড়ান্ত জয়পরাজয় নির্ধারিত হবে কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছে যে এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রশান্ত মহাসাগরে নৌ-যুদ্ধ কার্যত ভিন্ন রূপ নেয়। যথার্থ নৌ-যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় প্রশান্ত মহাসাগরে তা' হয় নি। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের ফলাফল ব্যাটলশিপের সঙ্গে ব্যাটলশিপের লড়াই দ্বারা নির্ণীত না হয়ে হয়েছে অন্য ভাবে।

মার্কিন নৌবহর যাতে প্রশান্ত মহাসাগরবক্ষে স্বাধীনভাবে বেশীদূর বিচরণ না করতে পারে জাপানীরা প্রথমেই তার চেষ্টা করে: ক্রমশই মার্কিন নৌবহরের বিচরণক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসে। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়ে মার্কিন নৌ-বহর কার্যত বিশেষ কিছু করবার সুবিধে পায়নি। সেখানেও ৩১শে জানুয়ারী জাপানীরা বোমা ফেলে। তার ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যেখানে যথার্থ যুদ্ধ চলে তার দু'হাজার মাইলের মধ্যেও মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলি আসবার সুযোগ পায়নি। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় জাপানী নৌবহর একরূপ একচেটে ব্যবস্থা করে নেয়। অবশ্য মিত্রপক্ষের কোন যুদ্ধজাহাজই সেখানে ছিল না এমন নয়; কিন্তু মার্কিন নৌ-বহরের প্রধান শক্তিকেই জাপানীরা আসল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। মিত্রপক্ষের ঘাঁটিগুলি হারাবার ফলেই মার্কিন নৌ-বহরের গতিবিধি এভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এসিয়াটিক নৌ-বহরের ভূতপূর্ব অধিনায়ক অ্যাডমিরাল হার্ট ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ এ সম্পর্কে বলেন:—

> "নিরাপদ ঘাঁটি পেলেই নৌ-বল একমাত্র কার্যকরী হতে পারে। এরূপ ঘাঁটিগুলি হারাবার ফলেই প্রশান্ত মহাসাগরে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।"

এদ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, নিছক নৌ-নীতির ওপর নির্ভরশীল মিত্রপক্ষের স্ট্র্যাটেজির চেয়ে নৌ-বাহিনীর সহায়তায় দ্বীপ দখলের জন্যে স্থলসেনা প্রেরণের জাপানী স্ট্র্যাটেজিই প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় অধিকতর কার্যকরী হয়েছে।

পার্ল পোতাশ্রয়ে মার্কিন নৌ-বহরের ক্ষতি এবং শ্যাম উপসাগরে 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ও 'রিপালস' ডুবির ফলে মিত্রপক্ষ যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে একথা সত্য; কিন্তু তা না হলেও যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের ফলাফল একেবারে অন্যরূপ হয়ে দাঁড়াত এমন কথা বলা চলে না। একে জাপানীদের বিমানবলে প্রাধান্য ছিল, তদুপরি তারা খুব তাড়াতাড়ি মিত্রপক্ষের ঘাঁটিগুলি দখলে এনে তাদের ব্যাটলশিপগুলিকে একরূপ নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় পর পর কয়েকটি নৌ-যুদ্ধ হয়। নৌ-বাহিনীর পাহারায় জাপানী স্থলসেনা সেখানে অবতরণের চেষ্টা করে এবং মিত্রপক্ষের নৌ-বাহিনী তাতে বাধা দেয় এবং তাই নিয়ে উভয়পক্ষে নৌ-যুদ্ধ বাধে। মাকাসার প্রণালী এবং লাম্বক প্রণালীর দু'টি নৌ-যুদ্ধেই মিত্রপক্ষ জয়ী হয়, জাভা সাগরের নৌ-যুদ্ধে জাপানীদের কাছে ওলন্দাজ নৌবহর এবং খান কয়েক মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের পরাজয় ঘটে। প্রথম দু'টি যুদ্ধে জয়ী হয়েও কিন্তু মিত্রপক্ষ জাপানীদের অবতরণ ঠেকাতে পারেনি। তারপর জাভা সাগরের যুদ্ধে সমগ্র ওলন্দাজ

অধিকন্তু পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে যায়।

কোন্ পক্ষের কত জাহাজ ডুবেছে তা দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-যুদ্ধের গুরুত্ব ঠিক পরিমাপ করা যায় না; ঘাঁটি দখল এবং লক্ষ্যস্থলে জাপানীদের উপনীত হতে পারা না পারা দিয়েই তার গুরুত্বের যথার্থ পরিমাপ করা যেতে পারে; কারণ ঘাঁটি ও দেশ দখলই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য; মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলিকে সাগরগর্ভে প্রেরণের দিকে তাদের প্রধান দৃষ্টি ছিল না। জাপানীরা তাদের সৈন্যাবতরণে কোথাও ব্যাটল্‌শিপ নিয়োজিত করেনি। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি নিউগিনীতে জাপানী ঘাঁটিগুলির ওপর মিত্রপক্ষ আক্রমণ চালায় এবং তাতে জাপানের কতগুলি জাহাজ ডোবে। সেখানেই সামরিক অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন সূচিত হয়; মিত্রপক্ষের বিমান বাহিনী জাপানী নৌ-বাহিনীর ওপর আক্রমণ শুরু করে এবং তারপরই মে ও জুন মাসে প্রবাল সাগর এবং মিডওয়েতে মিত্রপক্ষ এই রণকৌশলে যুদ্ধ চালায়।

প্রবাল সাগর ও মিডওয়েতে যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, উভয় পক্ষের যুদ্ধজাহাজে কোন সংঘর্ষ হয়নি; এক পক্ষের বিমান অপর পক্ষের যুদ্ধ-জাহাজ আক্রমণ করে। এটা নৌ-যুদ্ধের একটা নতুন রূপ। আটলাণ্টিক মহাসাগরে বা ভূমধ্যসাগরে ঠিক এই শ্রেণীর কোন নৌ-যুদ্ধ হয়েছে বলে শোনা যায়নি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-যুদ্ধে বিমান বাহিনীই নৌ-বহরের প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবাল সাগর এবং মিডওয়ের যুদ্ধে মার্কিন নৌ ও বিমান বাহিনী বিশেষ তৎপরতা দেখায় এবং সেখানেই তারা এক নতুন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। জাপানীদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়; মিডওয়ের যুদ্ধে জাপানীরা যথেষ্ট নৌ-বল হারায়; বিশেষ ক'রে তাদের বিমানবাহী জাহাজের ক্ষতিটাই মারাত্মক। কিন্তু এই দু'টি নৌ-যুদ্ধেই জাপানীদের পরাজয় হওয়া সত্ত্বেও প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের ফলাফল যে পরিবর্তিত হয়ে গেল এমন নয়। জাপানীরা ঘাঁটিগুলি আগলেই বসে রইল। তারা কিছু সমরোপকরণ হারিয়ে বিজয়লাভের মূল্য দিল মাত্র।

অতএব দেখা যায় বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলি নৌ-যুদ্ধের ওপর প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের জয়-পরাজয় একান্তভাবে নির্ভর করে না এমন কি বিমানবলের সাহায্যে নৌ-যুদ্ধ চালালেও তদ্দ্বারা চূড়ান্ত ফললাভ করা অসম্ভব। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় জাপানকে পরাজিত করতে হ'লে নৌ, বিমান ও স্থলসেনার সমবায়ে মিত্রপক্ষকে হৃত ঘাঁটিসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্যে লড়তে হবে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে গুয়াদালকানার বুনাগোনা এবং মুণ্ডার যুদ্ধে মিত্রপক্ষ তিন বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পরিচয় দেয়। জাপানীরা যে কৌশলে দ্বীপসমূহ দখল করে মিত্রপক্ষের সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থারও সেই কৌশলই অবলম্বন করেন। তা ছাড়া উক্ত এলাকায় মিত্রপক্ষের বিমানবলেরও প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হ'লে মিত্রপক্ষের দিক থেকে কেবল বিচ্ছিন্নভাবে দ্বীপ দখলের নীতি অবলম্বন করলে চলবে ব'লে মনে হয় না। জাপানের সরবরাহপথ যতদিন নিরাপদ থাকবে ততদিন সেও উক্ত এলাকায় শক্তিবৃদ্ধি করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে এবং তাতে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের অবসান শীঘ্র করতে হলে সর্বাগ্রে জাপানীদের সুদীর্ঘ সরবরাহপথে ব্যাপক আক্রমণ চালানো একান্ত আবশ্যক। তিনভাবে এই আক্রমণ চালানো সম্ভব: (১) স্থলঘাঁটি থেকে বিমান হানা; (২) বিমানবাহী জাহাজ থেকে বিমান হানা এবং (৩) অবাধ সাবমেরিন-আক্রমণ। স্থলঘাঁটি থেকে জাপানীদের সরবরাহপথে আক্রমণ করতে হ'লে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী মূল এসিয়াখণ্ডের ঘাঁটিগুলি পুনরুদ্ধার এবং চীনে প্রচুর বিমানবল ও সমরোপকরণ প্রেরণ করা দরকার। আর বিমানবাহী জাহাজ থেকে বিমান হানা এবং সাবমেরিন আক্রমণ চালাতে হ'লে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঘাঁটিগুলি ফিরে দখল করা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ জাপান যেমন একসঙ্গে মূল এশিয়াখণ্ডে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অভিযান চালাবার পরিকল্পনা করেছিল মিত্রপক্ষকেও ঠিক তেমনই সমর-পরিকল্পনা করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের প্রারম্ভে মিত্রপক্ষের যথেষ্ট ঘাঁটি ছিল কিন্তু বিমানবল তেমন ছিল না; ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের বিমানবল যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তাদের এখন ঘাঁটির অভাব। কেবল নৌবল ও বিমানবলের সাহায্যে ঘাঁটি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়, সেজন্যে দরকার যথেষ্ট স্থলসেনার। এই স্থলসেনার সমাবেশক্ষেত্র হিসেবেই আজ অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ চীন, এলাস্কা এবং এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। মূল এসিয়ার পূর্ব প্রান্তিক ঘাঁটিগুলি পুনরুদ্ধার এবং চীনের সঙ্গে স্থলপথে যোগসূত্র স্থাপন করতে হ'লে মিত্রপক্ষের পুনরায় ব্রহ্মদেশ দখল করতেই হবে এবং ব্রহ্মদেশের অভিযান ভারতবর্ষ থেকে চালানো ছাড়া উপায় নেই। কাজেই সামরিক বিচারে ভারতবর্ষের অবস্থান আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনেকখানি তার ওপর নির্ভর করছে।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের অবস্থায় জাপান আর এখন নেই। সুবিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে সেখানে সে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। জনবল ও অর্থনৈতিক শক্তি তার যথেষ্ট বেড়েছে। অতএব জাপানকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে হ'লে মিত্রপক্ষকে আজ প্রচুর সামরিক বল নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কেবল সামরিক বল থাকলেই চলবে না, তার সঙ্গে সুষ্ঠু সমর-পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি থাকা চাই। নিছক সামরিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে আধুনিক সার্বিক যুদ্ধ চলে না। "গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজি" নিরূপণে সামরিক ও রাজনৈতিক উভয়বিধ দূরদৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক। এ সম্বন্ধে শ্রীমতী জরোথী উড়মান তাঁর 'An A B C of the Pacific' নামক পুস্তকে* যা লিখেছেন তার খানিকটা উদ্ধৃত করেই [illegible] আমার বক্তব্য শেষ করব। তিনি লিখেছেন:—

"সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ নীতির [illegible] গুরুত্ব আছে। অতীতের ইতিহাস থেকে তা বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। অতীতের জন্যে বৃথা আপশোষ করে অবশ্য লাভ নেই—কিন্তু একথাও ঠিক যে, অতীতের ভিত্তি ক'রেই বর্তমান গড়ে উঠেছে। অতি বড় গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীর মনেও বোধ হয় এ প্রশ্ন না উঠে পারে না যে, ফিলিপিনোরা বাটান উপদ্বীপ রক্ষার জন্যে অতটা লড়লো আর মালয় উপদ্বীপে জাপানীরা গুরুতর রকমের কোন বাধাই পেল না। এখানে বীরত্বের কথা তুলে লাভ নেই, কারণ বীরত্ব কোনো জাতিবিশেষের একচেটে জিনিস নয়। কেবল অস্ত্র ও সরবরাহের অভাবেই এমন হয়েছে একথাও বলা চলে না; কারণ চীনারা নানাপ্রকার অসুবিধের মধ্যেও প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ ল'ড়ে আসছে।

"আক্রান্ত হবার মাত্র এক সপ্তাহ বাদে বা সিঙ্গাপুরের পতন হ'ল কেন? ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা বাটাভিয়া থেকে যে প্রবন্ধ পাঠান তাতেই এই প্রশ্নগুলির উত্তর মেলে। তিনি লেখেন, 'মস্কো নগরী রক্ষার জন্যে মস্কোবাসীরাই উদগ্রীব ছিল। [illegible]

---

* উল্লিখিত বইখানি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; কাজেই তখনও পর্যন্ত চীন যুদ্ধ পাঁচ বছরেই ছিল।

পুরের অবস্থা তার বিপরীত। সিংগাপুরের সাত লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধের উদাসীন দর্শকমাত্র ছিল, এই যুদ্ধকে তারা নিজেদের যুদ্ধ ব'লে মনে করতে পারেনি।......মানুষের শক্তি যে কম ছিল এমন নয়, কিন্তু সেই শক্তিকে উজ্জীবিত ও সংহত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মালয়ে গতানুগতিকতা ছেড়ে এমন নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল যা প্রেরণা আনতে পারে। সেই দেশের লোকের জীবনধারার সংগে গবর্ণমেণ্টের কোনো গভীর যোগাযোগ ছিল না। চীনাদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম ও সোভিয়েট আদর্শে উদ্বুদ্ধ দু'একটি চীনা দল ছাড়া এসিয়াবাসীদের অধিকাংশই আগাগোড়া এই যুদ্ধের দর্শকমাত্র ছিল।..'

'সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ শক্তির বিপর্যয়ের অনেক কারণ রাজনৈতিক সমস্যা। এমন কি সাম্রাজ্যবাদেরও বাঁচবার শেষ অবলম্বন এই নয় যে শাসিত দেশ থেকে শাসক দেশ কি পরিমাণ টাকা আনতে পারে; বা এও একটা বড় কথা নয় যে, সেখানে গোটা কয়েক স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে এবং 'নেটিভ' জাতগুলো য়ুরোপীয়দের বাইবেল পড়তে শিখেছে। আসল বিচার্য বিষয় হ'ল স্থানীয় লোকদের স্বার্থরক্ষা এবং তাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হয়েছে কিনা।

"এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ শাসন তেমন কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বৃটেনবাসীরা এই মনোভাব নিয়ে শাসনকার্য চালিয়েছে যে, তারা অপেক্ষাকৃত হীন জাতিগুলিকে শাসন করছে, বৃটেনবাসীদের যেন জন্মই হয়েছে উন্নততর জাতি হিসেবে অর্থাৎ তারা শ্রেষ্ঠ হ'তে বাধ্য। তারা এভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে যাতে কৃষ্ণকায় জাতিকে শোষণ ক'রে শ্বেতকায় জাতি ধনী হয়, অবশ্য কৃষ্ণকায় রাজন্য-বর্গকে হাতে রাখবার জন্যে তাদের সংগে গলায় গলায় ভাব দেখাতেও তারা কসুর করেনি। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ উপ-নিবেশ দপ্তরের একজন বিশিষ্ট কর্তা স্যার সামুয়েল উইলসন বলেছিলেন, 'মালয়ের রাজন্যবর্গের অধিকার, কর্তৃত্ব এবং মর্যাদা রক্ষা করা সর্বদাই বৃটিশ নীতির একটা প্রধান অংগ হওয়া উচিত। কিন্তু এত ক'রেও কৃষ্ণকায় রাজন্যবর্গকে যে কেনা যায়নি তার প্রমাণ মালয়-অভিযানে যথেষ্ট মিলেছে। যেসকল মহারাজা আজ জাপানীদের প্রচার-কার্য করছেন কেদা-র মহারাজা তাঁদের মধ্যে একজন। ত্রেংগানুর ভূতপূর্ব সুলতানের পুত্র এখন তাঁর মোটর গাড়ির সামনে জাপানী নিশান উড়িয়ে চলেন।

".....কেবল এই নয়। এসিয়াবাসীরা যখন পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের জন্যে য়ুরোপ এবং আমেরিকায় যায় তখন তারা সেখানে সকলের সংগে সমব্যবহার পায়; কিন্তু স্বদেশে ফিরলেই তাদের যত বিড়ম্বনা—শ্বেতকায় জাতির শাসন এবং শিক্ষিত এসিয়াবাসীর ভাগ্যে যত উঞ্ছ চাকুরী। তাদের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তারা স্বাধীনতা ও সমদর্শিতা সম্বন্ধে যে সকল নীতিবাক্য শোনে সেগুলি তাদের স্বদেশবাসীদের পক্ষে প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয় না। জাতীয় আন্দোলনসমূহকে দমন করা হয়; এমন কি চীনের কোমিংটাং দল পর্যন্ত মালয়ে অবৈধ ছিল, জাপানীরা যখন জহোরএ এগিয়ে আসে মাত্র তখন উক্ত দলের নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মালয়ে রবার চাষে হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। জাপানীদের প্রতিরোধ করার জন্যে সেইসব ভারতীয় শ্রমিকদের কাছে যখন অফিসাররা আবেদন জানান তখন এদিকে ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে ঠেকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট এমন গলাবাজী শুরু করেন যে অফিসারদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তাতে কোথায় মিলিয়ে যায়। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে স্কোয়াড্রনের পর স্কোয়াড্রন বিমান পাঠিয়ে যে ফল পাওয়া যেত, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিলে তা বোধ হয় তার চেয়ে কম ফলপ্রসূ হ'ত না। যারা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তারাই সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করত।......

* * * * *

"এসিয়াবাসীদের অধিকার স্বীকার সম্বন্ধে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কি নীতি অবলম্বন করবেন তার ওপর প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। চিরকাল না হ'লেও সাময়িকভাবে কিছু-কালের জন্যে যে লক্ষ লক্ষ এসিয়াবাসী জাপ-অধিকৃত দেশসমূহে ও দ্বীপপুঞ্জে থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই সমস্ত স্থানে এমন সব প্রতিষ্ঠান রয়েচে—যেমন থাইল্যাণ্ডে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ—যে সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জাপানীরা প্রচারকার্যের সুবিধে পাচ্ছে এবং 'বৃটিশ পীড়নকারীদের' বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে তারা ভারতীয় ও বর্মীদের আহ্বান করছে। অধিকৃত দেশগুলি থেকে জাপানীদের বিলকুল তাড়িয়ে দেওয়া হবে, একমাত্র এই ঘোষণাবাণী দ্বারা বোধ হয় সেই সব দেশের অধিবাসীদের মধ্যে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে পূর্ণোদ্যম জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে না। তারা অবশ্য চীনা ও সোভিয়েটবাসীদের আত্ম-রক্ষার আদর্শ দেখে খানিকটা প্রেরণা পাবে; কিন্তু তা অধিকতর শক্তিশালী হবে যদি তাদের প্রাণে এ বিশ্বাস আনা সম্ভব হয় যে, বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করবে না, বিদেশী ঋণের সুদ বাবদ লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড আর তাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে না এবং যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই লণ্ডন ও ওয়াশিং-টনের শিল্প ও বাজার রক্ষার জন্যে আবার এসিয়াকে শোষণ করবার দাবী উঠবে না।"

ভারতবর্ষ মিত্রপক্ষের আজ একটি প্রধান ঘাঁটি। ভারতের জনমত ফ্যাসিস্টবিরোধী। এই ফ্যাসিস্টবিরোধী মনোভাবকে জোর আনা সক্রিয় ক'রে তোলবার দায়িত্ব রয়েচে বৃটিশ তথা সমগ্র মিত্রশক্তির হাতে। সাম্রাজ্যবাদের মোহমুক্ত হয়ে রক্ষণশীল বৃটিশ শাসকগণ যদি ভারতের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করেন এবং মিত্রপক্ষ যদি ভারতের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন, তবে ভারতবাসীদের প্রাণে নিশ্চয়ই নতুন প্রেরণা আসবে এবং তাতে তাদের যুদ্ধোদ্যম বহুলাংশে বেড়ে যাবে। কেবল ভারত-বাসীরাই নয় সেই দৃষ্টান্ত দেখে জাপ-অধিকৃত দেশগুলোর অধিবাসীরাও উৎসাহিত হয়ে উঠবে এবং তার ফলে মিত্রপক্ষের জয়ের পথ অবশ্যই সুগম হবে। এজন্য চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী।

মোট কথা, সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধজয় কর যাবে কি ভাবে এবং কোন পথে এটাই এক মাত্র ভাববার বিষয় নয় যুদ্ধ জয় কেন এব কাদের জন্যে—এই প্রশ্নের উত্তরটাও আজ মিত্রপক্ষের কর্তাদের অকপটে খুলে বল দরকার।

রাধারাণী

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

রসরাজ গোঁসাই নাম রেখেছিল মেয়ের মৃগনয়নী। চেহারাখানা সত্যিই দেখবার মত; সাধারণত বোষ্টমের ঘরে ওরকম মেয়ে দেখা যায় না। রসরাজ বলত—বুঝলি, আমার ঘরে স্বয়ং রাধারাণী এসেছেরে! দেখছিস না কি রকম চোখ দুটো, আহা!"

সেই মৃগনয়নী আজকাল পরিচিত মেগন ব'লে! নারাণপুর আখড়ার রসরাজ বোষ্টমের নাম জানে না এ অঞ্চলে এমন লোক নাই, বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছিল, সারা-শরীরটায় বহু বছরের পরিবর্তনের দাগ। সুগৌর চামড়াটা ভাঁজে ভাঁজে কুঁচকে গিয়েছে। গলার কণ্ঠিটা আলগা হয়ে গিয়ে নাড়াচাড়ার সংগে তাল দেয়।...

মেগনের কণ্ঠীবদল হয়েছিল কবে তা মনে পড়েনা। বাবার মুখে সে শুনেছিল মাত্র, কে না কে শ্রীচরণ গোঁসাইএর সংগে কণ্ঠীবদল হয়েছিল। কবে কোন একরাত্রে সে বার হয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে তা মেগনের মনে পড়ে না। রসরাজও তারপর থেকে আর মালাচন্দনের নাম করেনি, তার মতে নাকি কারুর দুবার বিয়ে হতেই পারে না। শাস্তরে বাধে তাই বোধ হয় আর হয় নি।

বাহাদুর মেয়ে বলতে হবে বৈকি। একটা আখড়ার নিত্যসেবা অতিথ-ফকীর জমি-জারাদ তদারক করা, শিষ্যসাথী দেখা, সব কিছুই মেগন তার বাবা মারা যাবার পর থেকে চালিয়ে নিয়ে আসছে এবং বেশ ভালভাবেই। অবশ্য এ নিয়ে একআধজন দুচার কথা বলাবলি করে বৈকি। যাদের বলা স্বভাব তাদের মুখে হাত দেওয়াও যা, উপরের দিকে থুথু ফেলাও তাই, ঘুরে আবার গায়েই পড়ে।

...আখড়ার সকলের তখনও ঘুম ভাঙেনি, নিঝুম ঘোড়ানিমের গাছটার উপর থেকে রাতের স্বল্পান্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে ওটা মিলিয়ে যেতে চাইছে অসীম শূন্যতার বুকে। রাস্তার ধারে বড় শিরীষ গাছটা'র চিরল পাতাগুলো প্রভাতের স্পর্শ পেয়ে আঁখি-মেলে চাইতে শুরু করেছে। সবুজ সতেজ মাধবীলতামণ্ডপে নিদহারা পাখীর কাকলি নিস্তব্ধ আখড়া ভরিয়ে তুলেছে।

গোবর ছড়ার বালতীটা নামিয়ে রেখে মেগন ডাকতে শুরু করে "মাধি, ও মাধি! বলিহারী ঘুম বাবা! কুম্ভকন্নের মত নাক ডাকিয়ে আখড়া মাথায় তুলবি নাকি?"

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বার হয়ে এল মাধবী—বাইরে প্রভাতের সাড়া দেখে বেকুবের মত বলে ওঠে "ওই যাঃ—আগে ডাকনি দিদি, বড় গোঁসাই কি বলবে?"

চোখ মটকিয়ে মেগন জবাব দেয় "আ মরণ। কেষ্ট গেল বেষ্ট গেল সকাল বেলায় বড় গোঁসাই। মুয়ে আগুন তোর।"

মাধবীর আপন বলতে কেউ নেই। মেগনই তাকে এনে আশ্রয় দিয়েছে বছর কয়েক আগে...খেতুরের মেলায় গিয়েছিল। বৈষ্ণবের বিখ্যাত মেলা, পদ্মার তীরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে। কোন বিগত দিনে মহাপ্রভুর লীলা মাহাত্ম্য হয়ত সেখানে প্রেমের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল। সারাটি ধূলিকণা তার ধন্য হয়েছিল সেই পরম-পুরুষদের পাদস্পর্শে, সারাটা আকাশ বাতাস ভরে উঠেছিল নরদেবতার দেহ সৌরভে; আজও সে স্থান পবিত্র।

কি একটা সামান্য কায নিয়ে মাধবী সেখানের একটা আখড়ায় থাকত। সবে উঠতি বয়স, যৌবনের উন্মত্ত জোয়ার দেহ-যমুনার কানায় কানায় দিকহারা তুফান তুলে-ছিল।...মন্দিরের সেবাইত বৃদ্ধ জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে; একদিন নিশীথ রাত্রে......

এটা নাকি প্রায়ই ঘটে থাকে—পুরোনো—কিন্তু মাধবীর কাছে এটা নূতন ঘৃণ্য। সারাটা মনপ্রাণ চেয়েছিল নিজেকে বাঁচাবার জন্য...রাত্রে শোবার সময় চোখবুজে হাত-জোড় করে মন্দিরের গৌরাঙ্গমূর্তি'র সেই সিন্দুররঞ্জিত পাথানাতে মনে মনে মাথা ঠুকত "ঠাকুর রক্ষা কর রক্ষা কর। না হয় আমাকে পদ্মার জলে ডুবিয়ে দাও...আমি বাঁচতে চাইব না। কক্‌খনো না!"

...এমনি একদিনে দেখা পেয়েছিল মেগনের।

প্রথম দিন দেখেই খুব ভাল লেগেছিল। ম্লান মুখখানাতে একটা শান্তশ্রী। বাঁশীর মত টিকালো নাকে রসকলিটা মানিয়েছে চমৎকার। অমনি নাক নাহ'লে আবার রসকলি সাজে। যেন ঐ মন্দিরের রাধা-রাণী।

সে সব অনেক দিনের কথা। তারপর থেকেই মাধবী এই আখড়ায় এসেছে।

মাধবী কাপড়টা গাছকোমর করে মন্দির পরিস্কার করতে থাকে। ওদিকে মেগন পুজোর ফুল তুলতে ব্যস্ত। এ সময়টা তাদের নিঃশ্বাস পড়ে না, এত কায! এর পরেই আবার বেরুতে হবে মাধুকরীতে... নিজেকে হীন করে অপরকে দান করবার সৌভাগ্যটুকু দেবার প্রথা ওদের মধ্যে চলে আসছে।...

গেরুয়া রংএর সেলাই করা ঝুলিটা কাঁধে নিয়ে খঞ্জনী দুটো ঠিক করতে করতে মেগন বলে ওঠে, "দূর মুখপুড়ী—তুই আবার মাধুকরীতে যাবি কি? আখড়ার কায নাই? এত কায করবে কে?"

অভিমানভরা কণ্ঠে মাধবী জবাব দেয়—"ধাত্তাই, আমার বেলায় কেবল একটা ওজর! কেনে ভিক্ষেয় বার হলে মানের হানি হবে?"

জিবটা ঝক্‌ঝকে দাতের ফাঁক দিয়ে একটু বার করে বাধা দেয় মেগন—'হাঁ—হাঁ বলতে নাই মুখপুড়ী। আমাদের আবার মান?"

যাদব চক্কোত্তীর বাড়ি গিয়ে সময় অনেক-খানিই কেটে যায় মেগনের। চক্কোত্তী মহাশয়ের মা সাবেকী মানুষ,—বলে বসেন "ওরে মেগন একটা মহাজনী পদ গা না বাছা। তোর মুখে লাগে খাসা—আহা যেন অমিত্তি!"

চক্কোত্তী মশায়ের চার বৎসরের খোকাকে আদর করছিল মেগন। আদরটা একটু অন্য রকমের; সম্বন্ধটাও বেশ জমকাল কিনা।—বরকে ছেড়ে দিয়ে মেগন পদাবলী শুরু করে—"আমি মরণ লাগিয়া সব তেয়াগিনু জীবনেরে যদি পাই—"

সমঝদার শ্রোতা র'য়েছেন কাছেই! কারণে অকারণে কাপড়ের খুঁটটা চোখে ঘসতে থাকেন—"আহা! অমেত্ত!"

সহসা উঠে আসবার উপায় নাই। খোকা কাপড়টা টেনে ধরে নিজের অধিকার জানাতে ছাড়ে না।

ও বর, ছেড়ে দাও এইবার।

বরের কোন কেয়ার নাই, আপন মনে মেগনের রসকলিটা খুঁটতে থাকে—কোল থেকে নামাতে গেলে কান্না আরম্ভ করে।

"দেখছ দিদিমা, আমার বর আমার কোলে চড়ে, তোমার বরকে তুমি কোলে করতে না?"

মেগনের কথায় দিদিমা হাসতে থাকেন।

"চললাম গো বর—কাল আবার আসব! দেখি মুখ দেখি—ওকি মুখ লুকোলে চলবে না—দাও একটা চুমু দাও—আঃ!"

খোকাকে দিদিমার কোলে দিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল মেগন।

ভাদ্রের চনচনে রোদ—চারিদিক ভরে তুলেছে। দিগন্তের বুকে এই 'মইধরা' হামিরহাটী। রামপুরের ছায়াঘেরা গাঁগুলোর মাথায় তাম্রাভ আকাশ—রোদের তাপে থর থর করে কাঁপছে। অশরীরী ধরণীর তৃষ্ণা আকাশে বাতাসে...ক্রন্দসীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস-

ধ্রুপে বাতাসের সঙ্গে আবেদন জানিয়ে যাচ্ছে! তালগাছের মাথায় সোনালী রংএর তালগুলো থরে থরে সাজান। তেঁতুল গাছটায় ঘন সবুজের ছোপ লেগেছে।

"এত দেরী যে গো দিদি?"

বাঁধান নিমগাছের নীচে বসে কপালের ঘামে ভেজা চুলগুলো সরাতে সরাতে মেগন জবাব দেয়—"দেরী কোথা দেখলি তুই? এখনও ভোগই হয়নি। চল্ কাপড়-চোপড় কেচে আসবি।"

ভরা দুপুর বেলায় কানাইকে এখানে দেখে মেগন অবাক হয়ে যায়! ঝাঁকড়া কোঁচকান চুলগুলো বাতাসের স্পর্শ পেয়ে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে। হাতে একটা দা, আর খানিকটা বাঁশ। ঠিক বাঁশ নয়—কঞ্চির মোটা একটা 'পাব'! সামনেই মেগনকে দেখে সে হকচকিয়ে গেল, যেন একটা সাপই দেখেছে সামনে! কোন রকমে ধাক্কাটা সামলে নিয়ে, দাটা অকারণে নাড়াচাড়া করে আমতা আমতা করে ওঠে—বাঁশিই হবে একটা—কোথাও আর পেলাম না!

"আখড়ার বেওয়ারিশ ঝাড় কাটতে এসেছ? কেমন?"

চুলগুলোতে হাত বুলিয়ে ঠিক করে নিয়ে উত্তর দেয়—"না, না, এমনি, বলেই নিতাম, বাঁশটা ফেটে গিয়েছে কিনা?"

আস্তে আস্তে সরে পড়ে!

......ঐ একটি কুলাঙ্গার! নবীন ঘোষের বরাতটা নেহাৎ মন্দ। ঘরে জমি-জায়গাও কম নয়, চারখানা হালের চাষ, মরাই বেঁধেছে ঘরে। কিন্তু হলে কি হয়—ছেলেটি একবারে বেমাদাতা! ছেলেবেলা থেকে আদর পেয়ে পেয়ে আদুরে ছেলের যা হয়! সব-কিছু অনাছিষ্টি বিদ্যে আয়ত্তাধীন তার!

নবীন ঘোষ তাই দুঃখ করে—"আমার এক তরকারি, তাও নুনে পোরা—ওটা আর মানুষ হবে না।"

......সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। পাড়াগাঁয়ের সন্ধ্যা নীলাম্বরীর গায়ে চুমকি বসান মেঘের মত আকাশটা ঝকমক করছে! পত্রহীন সজনে-জেওলা গাছের মাথায় জমাট আঁধারের আনাগোনা! রাস্তার দু'ধারে জলকচু, কালকাসিন্দের বন! হলদে হলদে ফুলগুলো আঁধার আলো করতে চাইছে তাদের হৃদয় উজাড় করে, কিন্তু পারছে না। তাই বোধ হয় ঝরে পড়ে আপনা থেকেই। বেনুবনের শব্দে নীরবতা যেন প্রকটিত হয়ে ওঠে দীর্ঘভাবে—গাছের মাথায় এক-একটা দমকা বাতাস, জানিয়ে যায় অসীম শূন্যে বিপ্রলব্ধা ধরিত্রীর দীর্ঘশ্বাস।

......মেগন আসছে তাঁতিপাড়া থেকে। কি একটা কাজে গিয়েছিল। রাস্তার কানাইকে দেখে সরে যায় দু'পা। "পথ ছাড়!"

পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কানাই। মুখটা বেশ দেখা গেল না তবে পা দুটো যে কি রকম বেচাল ধরেছে, তা দেখলেই বোঝা যায়। জড়িতকণ্ঠে উত্তর দেয়—"মাইরী আর কি? না ছাড়লেই নয়—"

কোন রকমে একটা 'টাউরী' খেয়ে দেহ-খানা সামলিয়ে নেয়!

"মদ খেয়েছো তুমি?"

মেগনের মুখের কাছে হাতটা এনে যাত্রা-দলের সখী-প্যাটার্নে ঘুরিয়ে বলে ওঠে—"ছি-ছি রাধে, কানাই কি আর মাল খায়? ননী খেয়েছে!"

......হাতটা নেড়ে সুর করে গেয়ে ওঠে—"ভাঁড় ভেঙেছে—দই খেয়েছে—মুখ পুঁচেছে বাথানে এ-এ"

বন্ধমাতাল!

ও-পাড়ার গোলোককে নিয়ে কোন রকমে তাকে আখড়ায় নিয়ে এল—সারা পথ অশ্রাব্য গালিগালাজ দিতে দিতে এসেছে!

বড় গোঁসাই রাধানাথ আর অনেকে এটাকে বেশ ভালভাবে নিতে পারলে না—মেগনের আড়ালে "নাক তোলা অনেকবারই হ'ল!"

বাঁধানো নিমগাছটার নীচে কানাই পড়ে পড়ে বমি করে চলেছে!

মাধবীও বলতে ছাড়ে না। মেগনকে জলের ঘটিটা এগিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—"তোমার যত বিটকেলি কাণ্ড দিদি? ঐ মাতালটাকে—"

লাল করমচার মত চোখ দুটো মেলবার বৃথা চেষ্টা করে মাধবীর উদ্দেশে গেয়ে ওঠে—

"না কর না কর ধনি এত অপমান—
বিদুষী হইয়া কেন একে দেখ আন...!
ফাগবিন্দু দেখিয়া...আ—

এ নীলু অধিকারীর দলের গায়েন। চৌদ্দসিকে রাত। তেল-তামাক ছাড়া! বুঝেছ! ......"না কর—না কর......"

মেগন ধমক দিয়েও থামাতে পারে না! কিছুক্ষণ পর আপনা থেকেই ঘুমিয়ে পড়ে!

......ভোর হয়ে গিয়েছে! কানাই ঐ পশ্চিমের ঘরে তখনও ঘুমুচ্ছে অসাড়ে, ঘুমের ঘোর বোধ হয় তখনও কাটেনি। সরল—সুন্দর মুখখানা কচি পদ্মপাতার মত ঢলঢলে, চোখ দুটো বুজে রয়েছে। মুখের উপর বিশৃঙ্খলভাবে বাবরীকাটা লম্বা চুল-গুলো ছড়িয়ে পড়ে তার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে! নূতন যারা মদ খেতে ধরে, তারা কি মুখের দীনতাকে সৌন্দর্যের আবরণে ঢাকতে পারে না? মেগনের কেমন ভাল লাগে ওর মুখের দিকে চাইতে—ও-খুব সুন্দর—চোখ দুটো. !!

ওদিকে বড় গোঁসাইয়ের গলার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি গোবর জড়ার বালতীটা হাতে নিয়ে বার হয়ে গেল। বুকটা তখনও ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। সূর্যটা অত লাল কেন, ও-বুঝি হাসছে তার দিকে চেয়ে।

বৈশাখী পূর্ণিমার আর দেরী নাই: আখড়াতে উৎসবের দিন আসছে ঘনিয়ে! রসরাজ গোঁসাই থাকতে এই সময় কি ধুমধামটাই না হ'ত। লোকজন, অতিথ-ফকীর, কাঙালী ভোজন, কীর্তন অনেক কিছু! এখনও যে হয় না তা নয়—তবে অনেকটা কম!

বড় গোঁসাই রাধানাথ সকালে বেরিয়ে গিয়েছেন শিষ্যদের কাছে। মাধবী ও মেগনের অবসর নাই। নানা কাজ। মন্দির সংস্কার করা, ঝোপ-জঙ্গলগুলো পরিষ্কার করানো, নানা ব্যাপার।

...বাগানের নির্জন কোণ দিকটায় মেগন লাউগাছতলায় জল দিচ্ছে। হঠাৎ কার ডাকে সামনের ঝোপটার দিকে চাইল।

"কিগো রাধারাণী!"

বড় পুকুরের পাড়ের ঐ ঝোপগুলোর দিকে চেয়েও কিছু দেখতে পায় না। কানাই তার দিকে চেয়ে টিপে টিপে হাসছে। বার হয়ে এসে বলে ওঠে—"না, রসকলিই কাট আর যাই কর কেষ্টপ্রেম তোমার এখনো হয়নি রাধে!"

ডান হাতটা কাত করে উপরের দিকে ঠেলে গেয়ে ওঠে—

ওরে—পরলে তিলক মালা ঝোলা—
মিছেই কি তোর হরি মেলে—"

মেগন ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে—"চুপ চুপ, কেউ শুনতে পাবে। মাধবী এখুনি এসে পড়বে। যাও তুমি—দোহাই তোমার, কেউ দেখে ফেলবে।"

কানাই বিরক্ত হয়ে যায়—

ধুত্তোর—অরসিকে রসের কথা—
পান্তা ভাতে ঘি—
বুড়ো বরের বুড়ি কনে
কোথায় মেলে কি?'

মেগন হাসি চাপতে চাপতে বলে ওঠে—"আমরণ, তোমার লেগে মাথা খুঁড়ে মরব নাকি?"

ও-পাশের রাংচিতির বেড়ার আড়াল থেকে কে যেন সরে গেল। শুকনো পাতায় একটা মস মস শব্দ তুলে, ভীরু পদক্ষেপে সেখান থেকে চলে গেল!

মেগন তাড়াতাড়ি করে পা বাড়ায় আখড়ার দিকে। উঠোনে গোবর দেওয়া সারা হয়নি, মাধবীটা যে কোথায় যায় যখন তখন!

মেয়েরা বিশেষত সামান্য একটু জিনিসকে বেশ গভীরভাবে নিয়ে থাকে, সে মেগনই কি আর মাধবীই কি!

পাথরের থালাখানাতে ভাত চটকাতে চটকাতে মাধবী বলে ওঠে—"দিদি—বাই

বল আর তাই বল, তোমাদের কেষ্টঠাকুর কিন্তু বড় রসিক!"

—"মরণ আমার! তা কি তুই আজ জানলি, ...ও-যে রসিক নাগর—সারা বৃন্দাবন—"

গম্ভীরভাবে হাসি চাপতে চাপতে মাধবী জবাব দেয়—"হুঁ, তাই দেখছি—কানাই নামেরই গুণ!"

বাঁ-হাত দিয়ে তার গালে একটা ছোট্ট ঠোণা মেরে বসে মেগন—"আ মর—মুখপুড়ীর ধাষ্টোমি দেখ না—"

আখড়ার আসর জমে উঠেছে! নীচের মস্ত উঠোনে সামিয়ানা টানিয়ে আসর করা হয়েছে। নীলু অধিকারীর যাত্রাদল—চাকলার মধ্যে নামকরা। 'কলংকভঞ্জন' পালা যা গায়—নির্দয় পাষাণেরও নাকি বুক ফেটে ঝরণা গড়িয়ে পড়ে। তবে সেটা সত্যি কি না জানি না, তবে কিন্তু বড় গোঁসাই খেতুরের উদ্ধব দাস, রামকেলীর গোবিন্দ বাবাজি, কারুর চোখই শুকনো নয়! রাধা সত্যিই বড় দুখিনী—ননদী, শাশুড়ী, আর ঐ স্বামী—সান্ত্বনার ঠাঁই কোথাও নাই.....

বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ! তিনিও কি এত অসহায়! কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়ান তারও ভাগ্যলিপি, হয়ত ভক্তের কাছে তিনি ক্রীড়নক মাত্র!

কানাই করছে শ্রীকৃষ্ণের পার্ট—মানিয়েছে যেন ছবির শ্রীকৃষ্ণ! অমনি মুখ, অমনি চাউনি, মায় বাঁকা হাসিটুকু পর্যন্ত। সবচেয়ে ভাল তার ভগবানদত্ত কণ্ঠস্বর! বনের পশু-পাখী সবকিছু ভুলে যায়! মেগনের চোখটা ছল ছল করে ওঠে, মাধবীর মনে পড়ে যায় হারানো দিন-গুলোর কথা। বাবা ছিল তখনও বেঁচে, কত আদর করত তাকে! চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে।

......আর কিছুক্ষণ কানাইয়ের কোন সিন নাই। ক্লান্ত ঘর্মাক্ত দেহ নিয়ে সে এসে বসেছে নির্জন ঘাটটার ধারে। ঠাণ্ডা জলো হাওয়া শির শির করে বইছে, সারাটা মন শান্তিতে ভরে তোলে!

"কেষ্টঠাকুর নাকি? একলা যে?"

পিছন ফিরে মেগনের কথার জবাব দেয় কানাই—"কি আর করব বল,—রাধারাণী, তুমিই ত তাড়িয়ে দিলে—"

মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে—"ফের ঐ কথা, আমার বয়ে গেছে তাড়িয়ে দিতে!"

হালকা বাতাস মসৃণ জলরাশির বুকে ফুটিয়ে তোলে অসংখ্য কুঞ্চন রেখা। কাল জামরুল গাছটার পাতাগুলো নিশাচর পাখীর আগমনে ঝটপট করে আর্তনাদ করে ওঠে। বাতাবীলেবু ফুলের সুবাসে আকাশ বাতাস ছেয়ে গিয়েছে!

ধীরে ধীরে মেগন বলে ওঠে—"আচ্ছা তুমি কোনদিন কেষ্টঠাকুর দেখেছ? ওকি, মুখের কাছে মুখ আনছ কেন?"

নির্লিপ্ত কণ্ঠে কানাই বলে ওঠে—"ভয় নাই গো রাধারাণী, দেখছিলাম তুমি আমার মত মদ মারতে শুরু করলে কি না? যে রকম আবোল-তাবোল বকছ!"

কানাইয়ের হাতখানা পিঠের উপর থেকে নামিয়ে দিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—"আ মরণ, কথার ছিরি দেখ না! তোমার মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে—"

কানাই তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়ল। সিন আছে তার এইবার! শিরীষ গাছের পাতায় বাতাস ব্যর্থ আঘাত করে চোখ মেলাতে পারে না! বউ কথা কও ডেকে চলেছে নিশীথ রাতে, তবুও ওর ঘুম ভাঙবে না!

একটা দমকা বাতাস মেগনের মুখে-চোখে পরশ বুলিয়ে যায়—নরম গালের উপর, অদৃশ্য বাতাস রেখে যায় ক্ষণিকের চুম্বন রেখা!

হঠাৎ মেগন কাকে দেখে চমকে ওঠে। মূর্তিটা সিঁড়ির পিছন থেকে তাড়াতাড়ি সরে গেল! মেগন ডেকে ওঠে—"কে? কে?"

তাড়াতাড়ি করে তার কাছে এসে মেগন চমকে ওঠে! সামনে সে যেন কার প্রেতাত্মা দেখেছে, কিছু বলে না। মাধবীর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে আখড়ার দিকে পা বাড়াল......মাধবীর অজ্ঞাতেই!

আবার ধরণী জেগে ওঠে। সোনার কাঠির পরশে পুবোলী আলোর ঝরণাদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। পুকুরের পাড়টা, কাল জামরুল গাছটা। ঐ লাইনের ধারে গাছগুলো আবার জেগে ওঠে! উঁচু শিরীষ গাছের পাতা-গুলোর ঘুম ভেঙে গিয়েছে পাখীর কাকলিতে। রাত্রির গাম্ভীর্য—তার প্রিয়ার ঘুম বোধ হয় ভাঙাতে পারেনি। দিনের অমলিন হাসি তার রিক্ত হৃদয় ভরিয়ে তুলেছে কানায় কানায় আনন্দের স্পর্শে!

আবার সেই মাধুকরী! পুবপাড়াটা ঘুরে আসছে, এমন সময় কালো নাপিতদের বাগানটার পাশেই দেখা কানাইয়ের সঙ্গে, একটু মধুর ঝিলিক অজ্ঞাতেই মেগনের মুখখানা রাঙিয়ে তোলে। মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি করে চলে গেল, ভয় হয়—কেউ কোথায় ছিল নাকি! মাগো! কি লজ্জাটাই হয়েছিল!

মাধবীর মুখের হাসি কোনদিন অমলিন দেখেনি মেগন! হাসির ভঙ্গীতে জীবনের দুঃখকে নরম করে নেবার ক্ষমতা ওর আছে—তাই বোধ হয় ও-মুখপুড়ী এত সুন্দর!

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর সারাটা আখড়া কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে। বাইরে ফাঁকা মাটির বুকে রোদটা কেমন দাউ দাউ করে নৃত্য করে। ভাষাহীন বাণীতে পুকুরের জলটা ঘাটের ধারে কি যেন লিখে দিয়ে যায়। পরক্ষণেই আবার মুছে যায়। সামনের নিমগাছটা থেকে একটা ফিঙে একদৃষ্টে ওদের দুজনার দিকে চেয়ে রয়েছে। ওটা বোধ হয় পুরুষ হবে নইলে এত বেহায়া হয়!

মাথায় চুলগুলো বাঁধতে বাঁধতে মাধবী বলে ওঠে—"এসো খোঁপা করে দিই, বেশ লাগবে—কেষ্টঠাকুর আবার—"

মুখটা চেপে ধরে মেগন—"মর্, মুখপুড়ী, যম নেয় না তোকে—যা বলছি তাই কর, এলো খোঁপা বাঁধবি তুই—দে আমার ও আপদগুলোকে মাথায় জড়িয়ে দে কোন রকমে। ভাল হ'ত একেবারে নিশ্চেদ করে দিতে পারলে—"

"তাহ'লে আর রক্ষে আছে দিদি—কানাই রেগে......!"

মেগন শূন্য অর্থহীন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে! এরা সবাই নানা কথা বলে—ভাবে! সেদিন বড় গোঁসাই প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছিল কথাটা, আখড়ার মালিক হলেও দেবোত্তর সম্পত্তি এটা—এখানে ও-রকম চলবে না, এমনকি, মালা-চন্দনও না। তার ঘর বাঁধবার আর পথ নাই! তবে কি সে—! না, না, সে আর ভাবতে পারে না—মাথাটা ঐ রোদের তাপে যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে! রসরাজ গোঁসাইয়ের মেয়ে সে—বাপের নাম—তার হাতেগড়া আখড়া নষ্ট করবে না, বাবার নাম ডোবাবে না—এখানের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর স্পর্শ মেখে রয়েছে......নিজের সবকিছু দিয়েও সে এর সম্মান রক্ষা করবে...করবে! কি ভাপসা গরম! আকাশটা কেমন ধোঁয়াটে! ঐ সাদা পালকের মত হালকা টুকরো মেঘ-গুলোর ওপারে কে যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—একটা মস্ত সমুদ্র—সুনীল বারিরাশি!

তার চমক ভাঙে মাধবীর ডাকে! ব্যাকুল-ভাবে সে বলে ওঠে—"রাগ করেছ দিদি! কি বলতে কি বললাম......তুমি আবার কি মনে করলে......"

"না রে না—আমি আবার মনে করব কি?"

......রাত্রির একটা মাদকতা আছে...! মানুষ যখন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পায় না...তার পশুত্ব তখন অজ্ঞাত কারণে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—অন্ধকারের মায়া এমনি ভীষণ!

নির্জন বাগানের মাঝে বাতাস গাছের পাতায় পাতায় লুকোচুরী খেলতে খেলতে বয়ে যাচ্ছে!—একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক রজনীকে গভীরতর করে তুলেছে!—ওদের কি ঘুম নাই...দল পাকিয়ে

ভিযান শুরু করেছে ওরা অন্ধকারের মধ্যে—উপরে নীচে চারিদিকে!

কি একটা পাশ দিয়ে ছুটে গেল, মেগন চমকে উঠে কানাইএর দিকে সরে যায়! মেগনকে আশ্বাস দেবার ছলে আরও নিবিড়-ভাবে কাছে টানতে যায় কানাই! কি নরম ওর হাত দুখানা।

"একটা কথা রাখবে—যদি রাখ তবে বলব!"

তখন কানাইকে রাজ্য চাইলে বোধ হয় দিয়ে দেবে এমনি অবস্থা, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ রাখব বল!"

"উঁহু, দিব্যি কর আমার গা ছুয়ে!" নিটোল নরম হালকা হাতটা এগিয়ে দেয় কানাইএর দিকে।

"কেমন মনে রাখতে হবে কিন্তুক, না হলে আমি মরে যাব"।

দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করে ওঠে—"হাঁ হাঁ কানাই এমন ছেলে নয়—হাতীকা দাঁত মরদকা বাত"—মেঘনের উষ্ণ নিশ্বাস তার কাপোলতল ছাপিয়ে তোলে—সারাটা শরীর কাঁপতে থাকে আবেশে!

রাত্রির ঘন অন্ধকার তখন গাছের মাথায় রচনা করেছিল স্থায়ী বসবাস।

আঘাতটা যে এরকমভাবে আসবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি কানাই। নবীন ঘোষও এতে আনন্দিত হয়েছিল। রসরাজ গোঁসাই ছিল তার বাল্য বন্ধু, সুতরাং মেগনের কথায় মত দিয়েছিল অনায়াসে—তাছাড়া কানাই আবার সংসারী হবে—আবার ভালভাবে ঘরকন্না করবে, এত তার সুখেরই কথা!

আখড়াতে বিয়ের পর্ব চুকে গিয়েছে, লোকজন, কাঙালী খাওয়ান প্রভৃতি কাজকর্ম বেশ ভালভাবেই হয়েছে—বড় গোঁসাই মেগনের কোন সাধই অপূর্ণ রাখেনি।

সাধারণ মেয়েকে বিয়ের পর দেখায় আরও সুন্দর অনেক গুণে। সিঁথিতে রক্তিম সিন্দুর রেখা—হাতে শঙ্খবলয়—তারা যেন কোন মহিমময়ী দেবী অংশ...যার কাছে মানবের পশুত্বের ঘটেছে পরাজয়। ঐ সৌন্দর্যের দীপ্তি নাই—জ্যোতি আছে!

মেগনের আশা মেটে না। বার বার দেখতে থাকে...তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু...তাড়াতাড়ি করে নিজেকে সামলিয়ে নেয়। মাধবীও তাই দিদিকে প্রণাম করতে গিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে!

কানাই আর আখড়াতে আসতে পারে না, মেগনের সংগে কোন সম্বন্ধই তার থাকবে না—সে নিজেই এ শপথ করেছে মেগনের গা ছুয়ে...আর তার জন্যই মাধবীর সংগে হয়েছে তার বিবাহ, নিজের হাতে এত বড় সর্বনাশ কেউ বড় একটা করে না!... কার সর্বনাশটা—কানাই-এর না মেগনের তা ঠিক বুঝলাম না!...বিয়ের ঘটকালী হয়েছে মেগনের চেষ্টাতেই!...

মাধবী—খেজুরের সেই মাধবী আজ পাল্কী চড়ে শ্বশুরবাড়ি গেল। নবীন ঘোষ বউমাকে কোথায় রাখবে তার ঠিক পাচ্ছে না, খেজুরের প্রেমানন্দ বোষ্টমের মেয়ে তার ঘরে যাচ্ছে...এ যে তারই সৌভাগ্য...মহা ধূমধাম করে বরকনে বার হয়ে গেল—মুখুজ্যে পাড়ার আড়ালে আর তাদিকে দেখা গেল না—!

আখড়াটা হয়ে গিয়েছে জনশূন্য। চারি-দিকে এঁটো পাতা...ভাঙা গেলাস ছড়ান—কয়েকটা কুকুর নিবিষ্ট মনে সেগুলোকে ঘেঁটে চলেছে!...ঘেটুবনে কাল একটা ভ্রমর... অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছে!...ঐ পুকুরের ঘাটের ধারে...!

...বুকটা যেন 'ধক' করে ওঠে—কোন এক রাত্রের অস্পষ্ট কাহিনী...নূতন রূপ নিয়ে চোখের সামনে দেখা দেয়...আকাশটা যেন কাঁপছে ঐ গাছগুলো, সামনের উঁচু রাস্তাটা...সব কিছু যেন ঝাপসা হয়ে আসছে তার সম্মুখ থেকে...গলার কাছে কি যেন একটা ভারি ভারি ঠেকে...

...কোমল গণ্ডদেশ বয়ে ঝর ঝর করে বাঁধহারা অশ্রু ঝরতে থাকে...তাড়াতাড়ি করে সেখান থেকে চলে গেল ভিতরের দিকে!

* * * *

দুপুরের রোদ তখনও পাকে নি! গাছের মাথায় পাখীগুলো বসে জটলা পাকাতে তখনও দেরী আছে! পুকুরে তখন পান-কৌড়ী, জলহাস ডুব দিতে শুরু করে নি!...

মেগনকে দেখে যাদব চক্রোত্তীর মা বিস্মিতকণ্ঠে বলে ওঠেন..."ও কিরে, তোকে যে আর চেনা যায় না মেগন, কদিন আসিস নি! ভাল আছিস ত!"

"ভাল...আছি দিদিমা—!...কই গো আমার বর কই?"

...পাশেই বর বসে একটা কদমার সদ্ব্যবহার করছে...চিনির রসে একাকার হয়ে...! পেটের উপর দিয়ে ঝরছে চিনির রস! কোন ভ্রূক্ষেপ নাই—চুষে চলেছে!... মেগনের চেহারাখানা দেখে তার হাত দুটো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঠাকুমার কোলে মাথ গুজে বলে ওঠে "না-না আমি যাব না—তোল বল হব না—বল হব না"...মাথাটা নাড়তে থাকে!

মেগনকে দেখলে আর সত্যিই চেনা যায় না—মাথার রেশমের মত নরম চুলগুলো একেবারে কেটে ফেলেছে...শীর্ণ মুখে সামান্য একটু 'রসকলি'!

দুপুরের খর রোদ...বাতাসে কাঁপছে থাকে দিকে দিগন্তে! ক্লান্ত মধ্যাহ্নে...কে যেন গেয়ে চলেছে ঐ ছায়া ঘেরা পথটা ধরে-

"আমি বাঁচিব কিসের লাগি
যে বিনে তিলেক পারি না রহিতে
সে হ'ল পরানুরাগী।
বল কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙিনা দিয়া!"

...সুরটা যেন কোন অশরীরী মায়ায় মানুষের হৃদয় দ্বারে আঘাত করে!

...মেগন 'মাধুকরী' শেষ করে আজকের মত আখড়ায় ফিরে যাচ্ছে।

সাহিত্য সংবাদ

সন্ধিপুরে পল্লী সমিতি সাহিত্য শাখার উদ্যোগে ২য় বার্ষিক প্রবন্ধ এবং গল্প প্রতি-যোগিতা (১৩৫০ সাল) অনুষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক বিভাগে ১ম পুরস্কার একটি রৌপ্য কাপ ও ২য় পুরস্কার একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। রচনা পাঠাইবার শেষ-তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ সাল।

প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীকে যোগদান করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যাইতেছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে যে কোন একটির সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং বর্তমান অন্নসমস্যার পটভূমিকায় পল্লীর কোন একটি বেদনা-করুণ কাহিনী সম্বন্ধে গল্প লিখিতে হইবে।

(১) বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে মাইকেলের দান। (২) বাঙলা সাহিত্যে হিউমার। (৩) বর্তমান অন্নসমস্যা এবং আমাদের জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বিশেষ কিছু জানিতে হইলে পত্র লিখুন। রচনা পাঠাইবার ঠিকানা:—সম্পাদক, সন্ধিপুর পল্লী সমিতি, পোঃ ইলাহিপুর, জেলা হুগলী।

বন্যাপীড়িত নরনারীদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ

যে সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত নরনারীদের সাহায্যকল্পে চিকিৎসা-কেন্দ্র খুলিয়াছেন তাঁহাদের প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য এড্‌কো লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রস্তুত ঔষধাদি বিনামূল্যে দান করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-দিগকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে বলা যাইতেছে। **Secy. Adcco Ltd. P. B. 10408, Calcutta.**

চাষ করি আনন্দে

শচীন কর

একদিন আমাদের খাদ্যতালিকায় শাকপাতা তরিতরকারীর একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং আহারটা যে শ্রেণীরই হোক না কেন, তার সংগে একটুখানি শাকসবজির সংযোগ না থাকলে সে আহার কখনো সম্পূর্ণ বলে গণ্য হতো না। সেদিন শাকপাতা নিয়ে ভাইটামিনের চুলচেরা বিচার হয়ত হয়নি, কিন্তু শাকপাতা তরিতরকারী যে একটা সাত্ত্বিক আহার, সে কথাটা খুব ফলাও করেই প্রচার করা হয়েছিল। তরিতরকারী মানুষের জীবনধারণের পক্ষে শুধু যথেষ্ট বলেই গণ্য হতো না, বরং জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় যাঁরা জীবন উৎসর্গ করতেন, তাঁদের পক্ষে নিরামিষ আহারটাই প্রশস্ত বলে গণ্য হতো। তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে শাস্ত্রাধ্যয়নের আদর্শ একদিন এদেশেই প্রচার করা হয়েছিল। এই সমস্ত কারণেই শাকপাতা তরিতরকারীর প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা জন্মেছিল এবং তরিতরকারীবিহীন আহার যে পরিপূর্ণ নয়, তারই প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে, নিমন্ত্রণ বাড়ির ভোজন সমারোহের মধ্যে একটু শাক, একটু ছেঁচকি, একটু বেগুন বা পটল ভাজা নিয়ে আহার আরম্ভের রীতি এখনো লুপ্ত হয়ে যায়নি। এই রীতি তরিতরকারীর প্রতি আমাদের সেই সনাতন আকর্ষণকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। শাক আর পটল ভাজা অবশ্য পাতের কোণেই পড়ে থাকে—কেননা তৎক্ষণে ভেটকীর ফ্রাই নিয়ে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু হয়ে যায়, তবু এই নিরামিষের স্পর্শটুকুকে একবারে বরাদ্দ থেকে বাদ দেওয়া হয় না।

তারপর একদিন এলো—যখন বাইরের পৃথিবীর সংগে যোগাযোগের ফলে আমাদের জীবনধারার অনেক রীতিনীতিই গেল বদলে এবং সেই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া আহারের রুচিতেও অনিবার্য হয়ে উঠল। এই সব রুচি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই এলো সিংহলী মালাই কারি, এলো মোগলাই খিচুড়ী, ফরাসী ফ্রাই এবং আরও যে কত কি, তা লিখতে গেলে সে এক মহাকাব্য হয়ে দাঁড়ায়। ভোজন ব্যাপারে মুখরোচক খাদ্য খাওয়ার কোন দামই নেই, একথা বলা চলে না; কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল আহার্যকে একবারে বাদ দিয়ে শুধু রসনা তৃপ্তিকেই প্রাধান্য দিলে সে ভোজন কু-ভোজনেরই পর্যায়ে পড়ে। আমরা বাঙালীরা বিশেষ করে এই কুভোজনের প্রতিই শ্রদ্ধাবান হয়ে পড়েছি। শাকপাতটা তাই দরিদ্রের খাদ্য উপকরণের নামান্তর মাত্র হয়ে দাঁড়াল; পলতার ঝোল বা নানান তরিতরকারী সংযুক্ত সুক্তোনি নেহাৎ কবরেজের নির্দেশ ছাড়া আর মুখে উঠে না; আলু রইলেন শুধু মাছ-মাংসের সাথী হয়ে বা শুধু "দমে" দামী হয়ে। নিত্যকার খাদ্য তালিকায় ডাল ভাত মাছের ঝোলের পর যেটুকু সামান্য তরিতরকারীর ব্যবস্থা হলো, তা শুধু চ-বৈ-তু-হির মত পাদপূরণেই সার্থক হয়ে রইল, তার আর নিজস্ব কোন দামই রইল না। তরিতরকারীবিহীন খাদ্যের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া আমাদের স্বাস্থ্যের উপর এলো, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করার সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। চিকিৎসা বিশারদদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বছরে মাথা পিছু অন্তত দু'শ আটাশ পাউণ্ড তরিতরকারী স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কতকটা অভাব আর কতকটা আমাদের দূরদৃষ্টির শোচনীয়তার জন্যে—সে স্থলে মাথা পিছু মাত্র তিরিশ পাউণ্ড শাকসবজি আমাদের বার্ষিক বরাদ্দে স্থান পেল। সুতরাং আমাদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য দৈবকেই একমাত্র দায়ী করা চলে না।

মাছ-মাংস, দধি-দুগ্ধে তরকারীর অভাব আংশিকভাবে অবশ্যই মেটে। কিন্তু এই দরিদ্র দেশে মাছ, মাংস, ডিম, দুগ্ধে প্রয়োজন মেটাবার আশা একমাত্র স্বপ্নেই সম্ভব। মাছ বহুদিন থেকেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল—সম্প্রতি তা অপ্রাপ্য হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। যা এখনও বা পাওয়া যাচ্ছে, তা সংগ্রহ করার মত অর্থবল সর্বসাধারণের নেই। দুগ্ধের প্রতি উদ্বাহুরিব বামন তো বহুদিন থেকেই হয়ে আছি। শিশুকে পর্যন্ত পিটুলিগোলা জল দিয়ে ছলনা করতে হয়, সেখানে বয়স্কদের দুগ্ধাকাঙ্ক্ষা বাতুলতারই নামান্তর মাত্র! তারপর সম্প্রতি পেট পুরে খাওয়ার একমাত্র উপকরণ শুধু চারটি ভাত, তারও হলো অভাব। যুদ্ধের দরুণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আমাদের চালের বরাদ্দেও খানিকটা ঘাটতি পড়েছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অতঃপর কাজেকাজেই জীবন ধারণের জন্য শাকপাতা তরিতরকারীর উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। অবস্থার চাপে হলেও শাকসবজির প্রতি আমাদের রুচি যদি আবার নতুন করে জন্মে, তবে সেটাকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করার কোনই হেতু নেই—কেননা স্বাস্থ্যের দিক থেকে এই পরিবর্তনে আমাদের উপকারই হবে বেশী। অবশ্য এই অভাব অনটনের বাজারে তরিতরকারীর অফুরান জোগান হচ্ছে, আর তা একবারে মাটির দরে বিকোচ্ছে, একথা ভাববার কোন কারণ নেই। দই, দুধ, মাছ মাংস অন্যান্য খাদ্যের মতো তরিতরকারীও দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই কৃষিপ্রধান দেশে একটুখানি শ্রম স্বীকার এবং দৃষ্টিভঙ্গীর একটু অদলবদল করলে শাকসবজিটা আমরা সহজেই লাভ করতে পারি। তাতে নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, কিছু অর্থ বাঁচে এবং ঐ সংগে দেশের এবং দশেরও উপকার করা হয়। গভর্নমেন্টের খাদ্যশস্য বাড়িয়ে তোলার প্রচারনীতির গোড়াকার কথাও বুঝি তাই।

ব্যাপকভাবে উন্নত ধরণের শাকসবজি এ দেশের চাষীদের হাতে কখনো উৎপাদিত হয়নি এবং তার মূলে রয়েছে কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে চাষীদের শোচনীয় অজ্ঞতা এবং এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিদারুণ অর্থাভাব। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিত্যকার প্রয়োজনীয় আলু, পটল, বেগুন, সীম, লাউ কুমড়ো, উচ্ছে, ঝিঙে, পালং, গাজর, টমাটো প্রভৃতি তরকারীর জোগান একদিন চাষীরাই দিয়ে এসেছে। আমাদের খাদ্যসমস্যার, এই জটিলতার দিনে চাষীরা বর্তমানে অল্পবিস্তর বেশী জমিতে তরিতরকারীর চাষে মন দিয়েছে এবং এদিক থেকে সরকারী প্রচারনীতিও যে অনেকখানি সাহায্য করেছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। উপযুক্ত জমি, বীজ এবং উন্নতধরণের চাষাবাদের শিক্ষা পেলে একদিন অবস্থার আরও উন্নতি হবে, এই আশা নিতান্ত দুরাশা নয়।

কিন্তু তবু চাহিদার উপযুক্ত পরিমাণ তরকারীর জোগান এখনও বাজারে হচ্ছে না। জমিতে যা উৎপন্ন হচ্ছে, তা আবার উপযুক্ত যানবাহনের অসুবিধের জন্যে যথাযথ বিলি-বণ্টন হচ্ছে না। অতর্কিতে কোন অবস্থার বিপর্যয়ে যা কিছু এখনও সুলভ, তা রাতারাতি দুর্লভ হয়ে উঠা অসম্ভব নয়। সুতরাং সব দিক থেকে

বিবেচনা করে খাদ্যশস্যের চাষাবাদের উন্নতি করা আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। শুধু চাষীদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে থাকলেই চলবে না, একথা বলাই বাহুল্য। গ্রামে গ্রামে পতিত জমির অভাব নেই। সেই সমস্ত জমি আলু, পটল, সীম, বেগুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি তরকারীর একটা না একটার পক্ষে নিশ্চয়ই উপযোগী, আর ঐসব জমি শুধু চাষীর হাতেই নয়, অন্যদের হাতেও আছে। প্রায় প্রত্যেকের বাড়ির আনাচে কানাচে লাউ, কুমড়ো, পুঁই-মাচার জমির অভাব নেই। শাকসবজি ছাড়া সহজলভ্য ফলমূল যেমন পেঁপে, কলা, শশা প্রভৃতির চাষের উপযুক্ত জমিও শুধু নিজেদের ঔদাসীন্যে বন-জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে আছে।

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাবে যে, নাগরিকদের তরফ থেকে এই চাষাবাদের সম্মিলিত চেষ্টায় কোনই কর্তব্য নেই। নাগরিক জীবন যাঁরা যাপন করেন, মাটির সঙ্গে যাঁদের সংস্রব একবারে ছিন্ন হয়ে গেছে, তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু শহরের মাঝখানে বা উপকণ্ঠে ফালি ফালি হয়েও যেসব জমি পতিত পড়ে আছে, তার সম্মিলিত আয়তন কত বিঘে হতে পারে, তা অনুমান করা সহজ নয়। তারপর আছে বাগবাগিচা আছে বাগানবাড়ি এবং সে সবও শুধু এক দুই বিঘে জমি নিয়ে নেই। মানুষের জীবনে ফুলের দাম অবশ্যই আছে এবং আমাদের যান্ত্রিক জীবনের কর্মপ্রবাহের মধ্যে একটুখানি নিষ্কৃতির নিঃশ্বাসের জন্য বাগানবাড়ির প্রয়োজনও একবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের জীবনে খেয়ে বেঁচে থাকার সমস্যাটাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে; সুতরাং এই বৃহৎ প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের ছোটখাটো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবীকে আজ দাবিয়ে রাখতে হবে।

সুতরাং কথাটা অত্যন্ত স্থূল এবং শ্রুতিকটু হলেও বেল, যুঁই, টগর, গোলাপের বাগানে আজ বীট, পালং, গাজর, টমাটোর চাষের কথাই আগে বলতে হয়। বাগানবাড়ির আইভিলতার স্থানটা আজ লাউডগার দখলে গেলে হয়ত চোখ জ্বালা করবে—কিন্তু পেটের জ্বালা কমবে। এই দুর্মূল্যের বাজারে যাঁরা সক্ষম, তাঁরা যদি নিজেদের প্রয়োজনীয় শাকসবজি নিজেদের বাগানে উৎপন্ন করতে পারেন, তাহলে শুধু যে অর্থ বাঁচবে তা নয়, ঐ সঙ্গে স্বাস্থ্যও বাঁচবে এবং দুর্দিনের সম্বল হিসেবে একটা মূল্যবান সঞ্চয়ের ব্যবস্থাও হয়ে থাকবে। তা ছাড়া যাঁদের জমিজিরেত নেই, এই ব্যবস্থায় তাঁদের ভাগেও যৎকিঞ্চিৎ ভূমি-লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য একবারে দুর্লভ হয়ে থাকবে না। জমির মালিকদের আংশিক প্রয়োজনও যদি নিজেদের ক্ষেত্রজাত শাক-সবজিতে পূর্ণ হয়, তাহলে বাজারে যা স্বাভাবিকভাবে আমদানী হচ্ছে, তা থেকে খানিকটা বাঁচবে এবং সেইটেই যাঁদের জমি নেই, তাঁদের ভাগে যেতে পারবে অপেক্ষাকৃত সহজে এবং সস্তায়।

কোন্ শ্রেণীর তরিতরকারীতে কোন্ শ্রেণীর ভাইটামিন কতটুকু আছে, সে আলোচনা এখানে নিরর্থক, কেননা এ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ধারণা প্রায় সব্বাইরই আছে। তারপর কোন্ শ্রেণীর জমি কোন্ শ্রেণীর শাকসবজির পক্ষে প্রশস্ত, সে আলোচনাও অবান্তর, কেননা কৌতূহলী ব্যক্তিমাত্রেই সে তথ্য অতি সহজেই সংগ্রহ করতে পারেন। আপাতত মাটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার শিক্ষাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষা। এই সর্বগ্রাসী খাদ্য-সংকটের দিনে আমাদের জীবনধারণের অতি উপযোগী ও সহজলভ্য ফলমূল, শাক-সবজির অভাব মাটির অপব্যবহারে যেন না ঘটে, সে সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সচেতন হওয়ার কথাটাই বড় কথা। যেখানেই মাটির যতটুকু সংস্পর্শ আছে, সম্ভব হলে সেখানেই অল্পবিস্তর যা হোক কিছু একটা শাকসবজির চাষ আজ সর্বতোভাবে দেশের এবং দশের পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

বিদুষী ভার্যা

(১৩৯ পৃষ্ঠার পর)

তাহার নিকট বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠাহানির আশঙ্কা আছে। অথচ, প্রতিবাদ করিতে গেলে যে-পরিমাণ ইংরেজিতে কথোপ-কথন চালাইবার শক্তির প্রয়োজন, তাহার ত একান্ত অভাব! সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর সম্মুখে একজন গার্ডের সহিত ইংরেজিতে তর্ক-বিতর্ক করিতে না পারিলে, অথবা বাধ্য হইয়া সহসা এক সময়ে স্বল্পায়ত্ত হিন্দি ভাষার আশ্রয় লইতে হইলে আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না।

দিবাকর ভাবিল, এ পর্যন্ত সে ইংরেজিতে দুই একটা কথার দ্বারা যেটুকু কথোপকথন চালাইয়াছে, তাহা হইতে তাহার ইংরেজি জ্ঞানের দীনতা হয়ত যূথিকা ধরিতে পারে নাই। কারণ, প্রথমত, সৌভাগ্যক্রমে যূথিকা নিজেই ইংরেজি জানে না; এবং দ্বিতীয়ত, এতাবৎ যে-সকল প্রাথমিক কথাবার্তা হইয়াছে, তাহার উত্তর সংক্ষেপে দুই-এক কথায় দেওয়া চলে। কিন্তু এইবার গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া জাঁকাইয়া বসিয়া গার্ড যখন জরিমানার কথা তুলিবে, তখন চেন টানিয়াও জরিমানা হইতে অব্যাহতি পাইবার যুক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সূক্ষ্ম তর্কজালের অবতারণা করা আবশ্যক, তাহার ভাষা ত আর দুই একটা ইংরেজি বাক্য হইতে পারে না! সেই নিরতিশয় দুঃসময়ে তাহার শোচনীয় বিমূঢ়তা লক্ষ্য করিয়া যূথিকা নিঃসন্দেহে যে-কথা মনে করিবে তাহা কল্পনা করিয়া দিবাকরের মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

এঞ্জিনে পৌঁছিয়া খালাসীরা আলো দেখাইলে গার্ড সবুজ আলো দেখাইয়া হুইস্‌ল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল, তাহার পর হ্যাণ্ডল্ ঘুরাইয়া দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ক্রমশ

ইউরোপীয় পরিস্থিতি ও কুইবেক সম্মেলন

শ্রীপণ্ডিত

কুইবেকে ইঙ্গ-মার্কিন সেনানায়কদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষ হইয়াছে। বৈঠকের শেষে যে সকল বিবৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে মোটামুটিভাবে একথাই বোঝা যায় যে, এক্সিস পক্ষের বিরুদ্ধে সকল দিক হইতে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হইবার বেশী বিলম্ব নাই। সঠিক কি পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে, রণক্ষেত্রেই তাহা প্রকাশ হইবে।

এ সময় ইউরোপের সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অবস্থা মিত্রপক্ষের পক্ষে অপ্রত্যাশিতভাবে অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে। মুসোলিনীর পতনের ফলে ইতালীতে ফ্যাসিস্ট-নীতির অবসান কোন ক্রমেই ঘটে নাই। অন্তত ইতালীর বর্তমান গভর্নমেণ্টের অনুসৃত নীতি সে-কথা বলে না। ইতালী এখনও ফ্যাসিস্টপন্থী — ডিক্টেটরীয় নীতি এখনও উহার প্রধান অবলম্বন। মার্শাল বদোলিও শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণের পর সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন, "যুদ্ধ চলিতে থাকিবে।"

কিন্তু ব্যক্তি-প্রধান ডিক্টেটরীয় নীতি যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রধানত গড়িয়া উঠিয়াছিল, দীর্ঘদিন পূর্বে যিনি বীরদর্পে রোম নগরীতে প্রবেশ করিয়া আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার অপসারণের ফলে ইতালীর আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কোন দৌর্বল্য আসে নাই, এমন কথা মনে করা ভুল।

তথাপি বদোলিও ইতালীতে ফ্যাসিস্ট-নীতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন এবং তজ্জন্য হয়ত সমগ্র ইতালীতে তিনি রক্তস্রোত বহিতে দিতেও আপত্তি করিবেন না। দীর্ঘদিন রোম-বার্লিন যে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা হইতে আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন হইতে গেলে হয়ত বদোলিওর প্রভুত্বও সেখানে থাকিবে না। সিসিলি অভিযানের অবসানে মিত্রপক্ষ যতই ইতালীর মূল ভূভাগের দিকে অগ্রসর হইতে যাইবে, ততই ইতালীর আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিক্ষণেই নড়িয়া উঠিবে এবং অবশেষে একদা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। মোট কথা, ইতালীতে আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র-বিপ্লব এবং তাহার ফলে "রোম অভিযানের" পূর্বাবস্থার পুনরায় আবির্ভাব অসম্ভব নহে—একান্তভাবে তাহা স্বাভাবিক। সমগ্রভাবে অবস্থাটা মিত্রপক্ষের অনুকূলেই যাইবে। কেন মুসোলিনীর পতন হইল, কেন গর্ভাদিনের রাষ্ট্রপতি মুসোলিনী আজ বন্দি-জীবন যাপন করিতেছেন—রাজনৈতিক দর্শনের দিক হইতে কথাটা চিন্তা না করিলেও বোঝা যায় ইতালীর বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী এবং তাহা আসন্ন। যে সামরিক দায়িত্ব ইতালীকে জার্মানির সহিত একসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এবং যাহাকে অবলম্বন করিয়া ফ্যাসিস্ট-ইতালী পৃথিবীতে আধিপত্য রক্ষার আশা করিয়াছিল, তাহা আজ মিথ্যা হইতে চলিয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা, উভয়ই এ সম্ভাবনার ইঙ্গিত করিতেছে। কাউণ্ট সিয়ানোর আকস্মিক পলায়নও সেই কথাই



কাউণ্ট সিয়ানো

বলিতেছে। যিনি একদা মুসোলিনীর দক্ষিণ হস্তরূপে ইতালীর পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করিয়া আসিয়াছেন এবং যাঁহাকে ইতালীর অন্যতম কর্ণধাররূপে সকলেই জানিত, তাঁহার এ আকস্মিক পলায়নের পশ্চাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কোন প্রতিক্রিয়া না থাকিলেও আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রিক অব্যবস্থাকেই দায়ী করিতে হয়। সে অবস্থা নিশ্চয়ই এক্সিসের অনুকূল নহে।

কাউণ্ট সিয়ানোর পলায়নের সংবাদ ঘোষিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেই প্রকাশ পাইয়াছে, বুলগেরিয়ার রাজা বোরিস আততায়ীর গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছেন। বল্কান রাষ্ট্রে যাঁহারা নাৎসীদের পোষকতা করিয়া আসিয়াছেন, রাজা বোরিস তাঁহাদের অন্যতম। অবশ্য, কোন কোন সংবাদে বলা হইয়াছে, রাজা রোগভোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, রোগভোগের সংবাদটা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাই গুলীর আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বল্কানের এই বিশিষ্ট ব্যক্তির হত্যার পশ্চাতেও সেখানকার ক্রমবর্ধমান অশান্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে। বল্কান-রাষ্ট্রপুঞ্জের আভ্যন্তরীণ অশান্তি হিটলারের রুশ-অভিযানের সহায়ক তো নহেই, বরং উহা এক বৃহৎ বিপর্যয়েরই আভাস দিতেছে। কুইবেক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বল্কানের মধ্য দিয়াই মার্কিন বাহিনী ইউরোপে অবতরণ করিতে যাইবে। এখানে যদি দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করিতে হয়, তবে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা বিশেষভাবেই প্রয়োজন; কিন্তু সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও অশান্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। রুশ রণাঙ্গনে ভীষণ মরণ-সংগ্রামে লিপ্ত হের হিটলারের পক্ষে নিশ্চয়ই ইহা আশার কথা নহে।

সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপের উত্তরপ্রান্তে ডেনমার্কে জার্মানদের সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংবাদ এবং ডেনমার্কের রাজার সিংহাসন ত্যাগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইতালীর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বল্কানে অশান্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ায়ও চাঞ্চল্য, ইহার সমস্তটা মিলিয়া একটা গুরুতর কিছুরই আভাস দিতেছে। ভৌগোলিক দিক হইতে ডেনমার্কের অবস্থানও এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে। মিত্রপক্ষ পশ্চিম ইউরোপ বা বল্কানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার সিদ্ধান্ত যতই ঘোষণা করুন না কেন, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার মধ্য দিয়া তাহাদের অগ্রসর হইবার সম্ভাবনাকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সেদিক হইতে জার্মানির এ সতর্কতার হয়ত একটা কৈফিয়ৎ আছে। কিন্তু ডেনমার্কস্থিত জার্মান বাহিনীর প্রধান সেনাপতির স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাপত্রে বলা হইয়াছে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, ডেনিশ গভর্নমেণ্ট ডেনমার্কে শৃঙ্খলা রক্ষায় সমর্থ হইতেছেন না। মিত্রপক্ষের চরেরা যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। ফলে, সমগ্র ডেনমার্কে সামরিক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইল।"

জার্মান সেনাপতি ডেনমার্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কোনরকম জল্পনা-কল্পনার

অবকাশ রাখেন নাই। সুস্পষ্টভাবেই তিনি বলিয়াছেন, এক্সিসবিরোধী' কার্যকলাপ সেখানে বিশেষভাবেই প্রসার লাভ করিয়াছে। অবস্থাটা এক্সিসের অনুকূল ত নহেই,



ডেনমার্কের রাজা ক্রিশ্চন।

বরং অত্যন্ত শোচনীয় এক ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ডেনমার্ক এত-দিন এক্সিসকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, কাঁচা মাল ও শিল্পসম্পদ সরবরাহ করিয়া জার্মান সমর-যন্ত্রের ক্ষুধা মিটাইয়াছে — কিন্তু আজ সেখানে এ অবস্থার কেন সৃষ্টি হইল, তাহার পূর্ণ ইতিহাস বলা আজ সম্ভব হইবে না। রাজ-নৈতিক দিক হইতে অশান্ত ডেনমার্ক নাৎসীদের বিদ্বেষের হেতু হইয়া উঠিতেছে। সে অশান্তির অবসান ঘটাইবার মত রাজ-নৈতিক দর্শন এক্সিসের নাই।

তাই, শক্তিশালী সমর-যন্ত্রের পক্ষে প্রতি-দিন নূতন বিপদ ও নূতন সমস্যার আবির্ভাব ঘটিতেছে।

সুইডেনের সহিতও জার্মানির নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোথায় যেন ঘুণ ধরিয়াছে। ইতিপূর্বে সুইডিস-জার্মান চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়া সুইডেনের মধ্য দিয়া জার্মান সৈন্যবাহী ট্রেণ চলাচল নিষিদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি জার্মান মহলে খবর পাওয়া গেল, "নিষিদ্ধ অঞ্চলে" সুইডিস জেলে-নৌকা-



রাজা বরিস

গুলো চলাফেরা করিতেছে এবং তাহাতে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইয়া "শত্রু"কে সাহায্য করা হইয়াছে। জার্মান নিউজ এজেন্সী সুইডিস সংবাদপত্রগুলির দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তির জন্য ভর্ৎসনা করিয়াছেন এবং একথাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, "জার্মানির ধৈর্যেরও সীমা আছে।" জার্মানির ধৈর্যের যে সীমা আছে, ডেনমার্কের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই তাহার প্রমাণ।

পূর্বোক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া হয়ত জার্মানি সুইডেনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে না। কিন্তু একথা ঠিক, সুইডেনের দিকেও জার্মানিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক এ-সকল পরিস্থিতির মধ্যে জার্মান বাহিনীকে রুশ রণাঙ্গনের এক-একটি ঘাঁটি ত্যাগ করিয়া আসিতে হইতেছে। সমগ্র রোষ্টভ আজ জার্মান কবলমুক্ত, খারকোভে আজ রুশ বাহিনী সুপ্রতিষ্ঠিত। লালফৌজ কোথাও আস্তে আস্তে, কোথাও প্রচণ্ডবেগে অগ্রসর হইতেছে। নাৎসী বাহিনী আজ সমগ্র শক্তি দিয়া এই "বন্যা প্রবাহকে" ঠেকাইতে চাহিতেছেন— কিন্তু অপরদিকে পশ্চাদ্‌ভাগে আজ নাৎসী দুর্গের ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ ইউরোপে, বল্কানে, ডেনমার্কে আজ এ অবস্থা সুস্পষ্ট। পূর্ব রণাঙ্গনে রুশ বাহিনীর কাছেই জার্মানির চরম পরাজয় ঘটিবে অথবা ইউরোপে অতি-দর্পভরে প্রতিষ্ঠিত লৌহ-দুর্গের নীচেই নাৎসী সমর-যন্ত্র এবং নাৎসী দর্শনের সমাধি ঘটিবে, পৃথিবীর মানুষের কাছে আজ সে কৌতূহলই বড় হইয়া উঠিয়াছে।

দাবী

সমরজিৎ বসু

ওগো পথযাত্রী
তুমি চিররাত্রি
জ্বালাইয়া দিও লাল মশালের আলো
ওদের কবরশালায়
ঐ দূর বাঁকে যাঁহারা গিয়াছে
আরো যাঁরা পথে যাবে
রজনী শেষের তারায়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার রহস্য

জন্মাষ্টমীর এই রাত্রিতে মায়েরা আমার নিকট থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা সম্বন্ধে কিছু শুনতে চেয়েছেন। আমাকে এক রকম ধরে আনা হয়েছে। এই সভায় যাঁদের এমন আকুতি, তাঁদের প্রতি আমার প্রণতি নিবেদন করছি। একথা বড়ই কঠিন কথা, ভাবে ডুবে, তবে এ সম্বন্ধে কোন কিছু বলা যায়। জন্মাষ্টমীর রাত্রে মথুরার আকাশে সাগরের তালে যে গান বেজেছিল, সে গানের সুর অন্তরে প্রচুর করে না পেলে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, এই যে জন্ম, এ কার জন্ম? যিনি অজ বা জন্মরহিত, তাঁর জন্ম কেমন করে হতে পারে, আর হলেও সে জন্ম কেমন জন্ম এবং সে জন্মের কর্মই বা কি? প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, হাঁ জন্ম হতে পারে এবং হয়ে থাকে, নইলে গীতার কথা মিথ্যে হয়ে যায়। শুধু গীতার কথাই বা কেন, সব শাস্ত্রের কথাই মিথ্যায় পরিণত হয়। জ্ঞানের দিক থেকে বড় বড় তর্কের কথা উঠতে পারে, সে তর্কের ধারা সাধারণত এই যে, তিনি নিত্য, জগৎ-ই তাঁর মূর্তি, যিনি নিত্য, দেহে তাঁর পরিচ্ছিন্ন প্রকাশ একি সম্ভব, জগৎ-ই যাঁর মূর্তি, বিশেষ উপাধিতে তাঁর এমন প্রকাশ কখনও হতে পারে না। যাঁরা ভক্ত, তাঁরা সাধারণত এসব তর্কের ভিতর যেতে চান না; তবে তাঁদের পক্ষের কথা এই যে, তিনি নিত্য হলেও আমার কাছে তখনই তিনি নিত্য যখন তাঁর আনন্দঘন মূর্তিতে তিনি প্রকটিত; জগৎ তাঁর মূর্তি হলেও যতদিন পর্যন্ত আমি তাঁর শ্রীমূর্তির মাধুর্যে ডুবে না যাচ্ছি, ততদিন এ জগৎ ভেদ-জ্ঞানের দৈন্যের দ্বারা আমাকে ক্লিষ্ট করবে। ভালবাসা ত্রিভঙ্গীকে আশ্রয় করেই উদ্গত হয় এবং অঙ্গ ছাড়া ত্রিভঙ্গী আসতে পারে না। সুতরাং ভগবানকে যদি ভক্তির পথে পেতে হয়, তবে ত্রিভঙ্গীযুক্ত অঙ্গ, অর্থাৎ তাঁর রসময় দেহের গঠনের অনুধ্যানও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জগৎটা যখন আছে, তখন জগতের কর্তাও একজন কোথাও আছেন, যাঁর এই জগৎ বা যাঁর দ্বারা এই জগৎ চলছে কিংবা যিনি এই জগতের কারণস্বরূপে আছেন, এসব অনুমানের রাজ্যে প্রকৃত ভক্তির প্রবেশের অধিকার নাই। এসব অবস্থাই সন্দেহ এবং সংশয়ের অবস্থা। যেখানে সন্দেহ এবং সংশয়, সেখানে নিত্যবস্তুর সত্তা পরোক্ষ মাত্র, অর্থাৎ আমার কাছে নিত্য নয় যুক্তিতর্ক যতই চালাই না কেন। সুতরাং সন্দেহ সংশয়ে আচ্ছন্ন মানুষকে নিজের প্রত্যক্ষ প্রসাদের দ্বারা পুষ্ট করবার জন্যে এবং অভীষ্টতত্ত্বকে উদ্দীপ্ত করবার উদ্দেশ্যে ভগবানকে এ জগতে আসতে হয়; অন্য কথায় অবতীর্ণ হতে হয়। এতে তিনি পরিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, বা আমাদের মত তিনিও জরা-মরণশীল প্রকৃতির অধীন হন, এ কেবল আমাদের মর্ত-বুদ্ধিগত সংস্কার মাত্র; আমরা আমাদের দেহের পরিচ্ছিন্নতাই ভগবানের উপর আরোপ করতে চাই। এ ধারণা আমাদের সংস্কারগত ধারণা বা অহংকৃত ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভগবানের কৃপাকে স্বীকার না করলে এমন ধারণা কিছুতেই দূর হয় না এবং কৃপার স্পর্শ জীবনে একটু পেলে শ্রীভগবানের অপরিচ্ছিন্ন মূর্তিরও অন্তরে স্ফূর্তি হয় এবং তখন ভক্তির উদ্রেক হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে কুমারগণের স্তবে আমরা এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেখতে পাই। তাঁরা বলেছেন, এতদিন পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব শুধু আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, আজ তোমার মূর্তি দেখে তা সত্য হ'ল। আমাদের চিত্তে তোমার ভক্তিরস উথলে উঠে সব মধুর হয়ে গেল। এতে এই কথাই বলা হ'ল যে, যেখানে মূর্তি নাই, সেখানে ভক্তিও থাকতে পারে না। ভগবানের সে মূর্তি পরিচ্ছিন্ন নয়, সকল স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তির মূলে রয়েছে সেই মূর্তি, আর সকল প্রকাশ বা ব্যক্তির মূলে রয়েছে সেই অভিব্যক্তি। নইলে সবই আমাদের মনঃকল্পনা, অধ্যাস বা অনুমান মাত্র; চিরমাত্র এবং চিন্ময় নিত্যতত্ত্ব হ'ল সেই মূর্তি। ভগবান একজন প্রবীণ গম্ভীর ব্যক্তি হয়ে জগতের বাইরে বৈকুণ্ঠধামে এই মূর্তিতে বসে থাকেন, এ নয়; তিনি প্রেমময়; সেই স্ব প্রেমের স্বভাব-ধর্মকে আশ্রয় করে তিনি এই জগতে দেহধারণ করে আবির্ভূতও হয়ে থাকেন।

এখন প্রশ্ন উঠবে এই যে, দেহ যখন তিনি কোন সময় ধারণ করেন তখন সে দেহ তাঁর ছিল না বলতে হবে এবং বিভিন্ন যুগে যদি বিভিন্ন দেহধারণ করতে হয়, তবে প্রয়োজন মিটবার সঙ্গে সঙ্গে সে সব দেহও থাকে না; সুতরাং এই দিক থেকে সে দেহসমূহও মর্ত দেহই হ'ল। এ প্রশ্নের উত্তর তো গীতায় রয়েছে, তাঁর এই দেহ চিন্ময় দেহ, স্বেচ্ছারূপ দেহ। আমরা যেমন দেহের অধীন, তাঁর দেহ তেমন নয়। আমরা দেহের অধীন, তার অর্থ এই যে, আমার দেহ সম্বন্ধে আমি আমার স্বাতন্ত্র্য নাই; অন্য কথায় আমার দেহ আমারই নয়; তাই এ দেহ আমার পক্ষে অনিত্য; কিন্তু ভগবানের দেহ; আর তিনি এক, এজন্য তাঁর দেহ নিত্য। তাঁর এই দেহগত বিভিন্নতা শুধু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্কের অভাবে এবং ভাবের দৃষ্টিলাভ হলে এই বিভিন্নতা কেটে গিয়ে বিভিন্ন অবতারের ভিতর দিয়ে সেই পরম ভাব অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন আনন্দঘন রসমূর্তিরই অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। যুগসম্পর্কিত 'বাদ' আর ভক্তের দৃষ্টিতে তাঁর স্বরূপ তত্ত্বের অনুভব সম্বন্ধে কোন বাধা সৃষ্টি করে না।

এই দিক থেকে অন্যান্য লীলায় এবং কৃষ্ণ-লীলার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে। ঋষিরা বললেন, তুমি তির্যক, নগ খগ সরীসৃপ দেব দৈত্য বিভিন্ন রূপে দেহধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছ, কিন্তু সে-সব অবতারের মধ্যে 'বাদ' রয়েছে, অর্থাৎ মানুষের পক্ষে আত্মীয়তার নির্বিবাদ ছন্দ সে-সব অবস্থায় মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে নাই। তুমি এমন লীলা কর, যাতে তোমাকে মানুষ আত্মীয়তার নির্বিবাদ সূত্রে একান্তভাবে লাভ করতে পারে। জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে যে প্রার্থনাধ্বনি আকাশে বাতাসে বেজে উঠেছিল, তাতে আমরা এই সুরই শুনতে পাই। তোমার নিজ স্বরূপ এই জগতে ব্যক্ত কর— গুণময়ী প্রকৃতির এ অন্ধকার দূর করে তোমার নিজের মধুর রূপে তুমি দূর থেকে নিকটে এস। এসো তুমি—নিজ রূপ নিয়ে এসো। তুমি বিধাতা থাকলে হবে না, বিশ্বের জনিতা থাকলে চলবে না—সে তো ব্যবধান; তুমি বন্ধু হয়ে এসো। আমার প্রাণেন্দ্রিয় মনের সকল আকিঞ্চনকে রসধারায় সিঞ্চন করে ধরে পাবার, বুঝে পাবার, মধ্যে এস। নলকুবের মণিগ্রীব ও যমলার্জুন ভঙ্গের পর কৃষ্ণলীলার এই রহস্যই ব্যক্ত করলেন। তাঁরা বললেন, তুমি অন্য অনেকবার আবির্ভূত হয়েছ, কিন্তু সে সব আবির্ভাব 'ভবায় বিভবায় চ' জন্ম এবং মরণের পরোক্ষতার ছন্দেই মানুষের চিত্তকে দোলা দিতে সমর্থ হয়েছে; তার মধ্যে নিত্যবস্তুকে সত্য করে ধরা যায় নি; কিন্তু এবার তুমি মানুষের সকল রকম অর্থের পরম পুরুষার্থ নিয়ে ব্যক্ত হয়েছ— নিত্য তত্ত্বে মূর্তি ধারণ করেছ। কথাটা বোঝা একটু কঠিন, অল্পের মধ্যে হলেও ভেঙ্গে বলার চেষ্টা করবো। অন্যান্য অবতারে তিনি যে দেহ ধারণ করেছেন, তা কি তাঁর নিজের দেহ নয়, সে রূপ তাঁর স্বরূপ নয়? একথার উত্তর এই যে, দেহ বা রূপ, আমরা যাই বলি না কেন, এতো তাঁর শক্তি; অন্যান্য অবতারে সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করবার মতো শক্তি বা রূপই তাঁর ব্যক্ত হয়েছিল, তাঁর নিজ স্বরূপটি ছিল পরোক্ষ বা গোপন; তাঁর নিজ শক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন। এ অবতারে তাঁর নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ হলো, তাঁর স্বশক্তি জগতে উন্মুক্ত হলো। এখানে নিজ শক্তিটি কি বোঝা দরকার। নিজ শক্তি বলতে আমরা সেই শক্তিই বুঝি, যে শক্তি সব সময়ই শক্তিমানের সঙ্গে অন্বিত; অর্থাৎ কোনরূপ অবস্থাবিপর্যয়ে সে শক্তির ব্যতিরেক ঘটে না। 'মৃগমদ, তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ।' ভগবানের এই শক্তি কোন্ শক্তি; এ দেশের সাধকেরা বললেন, 'রসো বৈ সঃ'। তিনি কেবলানুভবানন্দ স্বরূপ এবং আনন্দময়ী শক্তিই তাঁর স্বশক্তি। অন্যান্য অনেক শক্তি তাঁর অবশ্য আছে; কিন্তু সে সব শক্তির বহু ভাব আছে, এসব বহুভাবকে তিনি 'নিজ শক্তি যোগাৎ' ব্যক্ত করেন। তাঁর এই বহুভাবই অপরাপ্রকৃতির মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছে; তাঁর এই বহু-ভাবের মধ্যে মানুষে তার স্বভাব তত্ত্ব পায় নি; তাঁর আনন্দময়ী পরাপ্রকৃতির সঙ্গেই মানুষের স্বভাবগত সম্বন্ধ রয়েছে। অপরা প্রকৃতির চাপে অভিভূত মানুষকে অভাবের ভিতর থেকে স্বভাবে সংস্থিত করবার জন্যে তাঁর নিজের আনন্দময়ী শক্তির প্রভাব প্রকটিত করবার জন্যেই প্রার্থনা করা হয়েছিল; অন্য কথায় যে লীলায় অপরাপ্রকৃতির এ ব্যবধানকে অতিক্রম করে মানুষ তাঁকে বন্ধুস্বরূপে পায়, তাই চাওয়া হয়েছিল। মানুষের প্রকৃতি অপরা-প্রকৃতির অন্তরগত যে নিহিতার্থ তৃষ্ণা বা কামের পথে নিরন্তর খুঁজছে; সেই অর্থকে মানুষের দৃষ্টিতে বা অনুভূতিতে অনন্তর বা ব্যবধানবিহীন করবার জন্যে যে রস প্রয়োজন, তাই প্রকট হয়েছিল এই কৃষ্ণলীলায়। অপরা-প্রকৃতির কামছন্দগত কলি বা বিরোধের ভাবকে ভাসিয়ে দিয়ে এই লীলায় মানুষের কাছে প্রেম ছন্দ মূর্ত হয়ে উঠলো। মানুষ অভাব ছেড়ে তার স্বভাব পেলো এই লীলার অনুধ্যানে।

অপরাপ্রকৃতির রাজসিক ছটা জগতের সূর্য মানুষের চোখে উন্মুক্ত করছিল; তার ফলে সূর্যদেব কলাকাষ্ঠাদিরূপে মরণের দিকেই

মানুষকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। জগতে বহুভাবের উদ্ভাসক এই সূর্যের বর্ণ বিস্ফুরণ প্রভাবের মূলে যে এক শক্তি রয়েছে, ঋষিদের মতে 'পরব্রহ্ম' সেই নিত্যভাবের খেলা এই লীলায় উন্মুক্ত হলো। বিশ্বের আত্মসাত্মক অনুপপত্তির দিক থেকে এই লীলার আগ্রহে মানুষ প্রত্যক্ষতার ঊর্ধ্বে মাধুরীর রাজ্যে প্রবেশ করলো। রূপ রস সব সত্য হলো এ লীলাকে আশ্রয় করে মানুষের জীবনে এবং অপরাপ্রকৃতির অভিভাবকে অতিক্রম করে সে জীবনকে নিত্য এবং সত্য করে পেলো। কৃষ্ণের জন্ম বলতে তাঁর এই নিজ শক্তি বা আনন্দময়ী প্রকৃতিতে অপ্রাকৃত মধুরিমার প্রকাশই বুঝতে হবে। এই দিক থেকে বিচার করেই এ দেশের রসিক সাধকগণের উপলব্ধি এই যে, বৃন্দাবনেই তাঁর জন্ম হয়েছিল; বসুদেবের-দেবকীর কারাগৃহে হয়নি; কংসের দেবকী তাঁর ঐশ্বর্যই দেখেছিলেন, তাঁকে প্রকৃতির পর বা অতীততত্ত্ব বলেই বুঝেছিলেন; বিশ্বপ্রকৃতিতে উদ্ধৃত তাঁর মাধুরীকে তাঁরা অব্যবহিতভাবে কোলে নিয়ে অব্যবহিত ভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হননি; সুতরাং অনুমানকে অতিক্রম করে প্রত্যক্ষতার প্রভাব প্রত্যক্ষ করে স্নেহের উপযুক্ত রীতি বা মিষ্টতা তাঁরা আস্বাদন করে উঠতে পারেন নি, অথচ তাঁর নিজ শক্তি বা হ্লাদিনীর ক্রিয়াই হলো এই। নিজ শক্তিতে অধিষ্ঠিত দেহের ক্রিয়া যখন কংস-কারাগারে হয়নি, তখন সেখানে তিনি দেহ নিয়ে আবির্ভূত হননি; এজন্যই ভাগবতের সাধক বলেন, দেবকী সুতের অপ্রাকৃত মাধুরী বৃন্দাবনেই পৃথিবীতে বিস্তার করলো; সুতরাং দেবকীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল এটি কথার কথা ছাড়া কিছুই নয়। স্নেহের-প্রেমের অন্য কোন বিশ্বের অপরাপ্রকৃতি উদ্ভাসিত করলো যে হাসি যে রূপ দেখেছে তাঁর বৃন্দাবন-ভূমিতে যে সেখানে তাঁকে জীবনে নিত্য করে পাবে—সত্য করে পাবে, জড়প্রকৃতির এই অভিভবাত্মক গতিশীলতার ভিতরই রসের রীতি ধরতে সমর্থ হবে। জগতের হাটে কোলাহলের বিড়ম্বনা আর তোমার কাছে থাকবে না তোমার কানে বেজে উঠবে কলগান; বিশ্বপ্রকৃতির যত অভিব্যক্তি তোমার কানে সুমধুর গীতি হয়ে বাজবে। যে জগতে আজ তুমি একবিন্দু আনন্দের আস্বাদ পাচ্ছ না, সেই জগৎ জুড়ে আনন্দের লহরীর মধ্যে তুমি নিমগ্ন হবে। এই দিক থেকে কৃষ্ণলীলা তাঁর স্বরূপ লীলা; এ লীলা আশ্রয় করলে সকল সময়ে, সর্ব অবস্থাতেই অনন্য বা অনংশায়িত বল লাভ হয়। বেদ এবং উপনিষদের সাধনতত্ত্ব এই লীলার অনুধ্যানেই মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠে। বিশ্বের সুর মাধুর্যসূত্রে নিজের মধ্যে ভরপুর করে পাওয়া যায়। ভূ, ভুব স্ব যাঁর রূপের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে তাঁকে অন্তরে বিগ্রহ-তত্ত্বে একান্তভাবে পেয়ে অন্য লোক খুঁজবার প্রয়োজন একেবারে কেটে যায়; অন্য কথায় নাম ছেড়ে লাভ হয় পরিপূর্ণ প্রেম বা সর্বত্র অখণ্ড এবং অবিনশ্বর মাধুর্যসূত্রে আত্মোপলব্ধি। কৃষ্ণতত্ত্ব এইরূপ অখণ্ডতত্ত্ব ও নিত্যতত্ত্ব এবং এ তত্ত্ব অতি গূঢ়তর বলে সাধকেরা নির্দেশ করেছেন। এই তোমায় দেহের গঠন যাঁর মূর্তি দেহের সম্বন্ধে বা দেহাত্মবুদ্ধিতে মর্ত সংস্কার এড়িয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর দিব্য জন্ম এবং কর্মকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাঁর অমর্ত মূর্তির ধারণা করবার মত প্রত্যয় প্রবাহের স্পর্শ মানুষ অন্তরে সহজে লাভ করতে পারে না। তাঁকে মর্যাদা দিয়ে, তাঁকে বড় করে, প্রকৃতপক্ষে তাঁকে দূরেই রাখে, ধরে আনতে সমর্থ হয় না, মানুষের এ দুর্বলতা রয়েছে। বাঙলা দেশের বড় সৌভাগ্য, মহাপ্রভুর লীলায় এই দুর্বলতা দূর হলো। তিনি কৃষ্ণের এই স্বরূপতত্ত্বকে সকলের কাছে তাঁর প্রেমময় লীলার বিভঙ্গী মাখিয়ে উন্মুক্ত করলেন। তাই বাঙলার সাধক বলেছেন, 'গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সেই সে ভকতি অধিকারী।' তাই জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে যাঁর আবির্ভাব হলো, তাঁকে জানতে হলে, চিনতে হলে এবং ইতিহাসের পরোক্ষতাকে অতিক্রম করে জীবনে তাঁকে নিত্য করে পেতে হলে, মহাপ্রভুর লীলার অনুধ্যানের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। অনুস্মরণের ছন্দে হৃদয়ের দ্বার খুলে দিতে হয়। অন্য পথে দেবকীসুতকে পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু দেবকীসুতকে পাওয়া মানুষের পক্ষে পরম অভীষ্ট পাওয়া নয়। বিষ্ণুর পরম পদ পাওয়াই বেদের ঋষিরা মানুষের পক্ষে পরম প্রয়োজন বলে অভিহিত করেছেন। দেবকীসুতের পদাম্বুজের মাধুরী বৃন্দাবনেই উন্মুক্ত হয়েছে, যাতে মানুষের সকল তাপ জুড়োয়; এবং সেই পাদপদ্মে একান্ত আত্মনিবেদনেই সত্যের সঙ্গে নিরবদ্য সংযোগ ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার আশ্রয়ে নিত্যমাধুর্য আস্বাদন করবার যোগ্যতা মানুষের রয়েছে। আমরা যদি তা আস্বাদ করতে পারি, তবেই আমাদের মানব-জন্ম সার্থক হবে; জীবনের মধ্যে অমৃতত্ব পেয়ে আমরা মরণকে অতিক্রম করতে সমর্থ হব। মরণের পরে এ সমস্যা মিটবে, এমন ধারণা নিয়ে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ দেশের সাধকেরা পরোক্ষবাদমূলক এমন আত্মপ্রবঞ্চনাকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। প্রত্যক্ষতার পরম বল কৃষ্ণলীলার অনুধ্যানের মধ্যে রয়েছে,—আছে প্রেম; নচেৎ কোনভাবেই কালপাশ এড়াবার উপায় নাই। *

* কালীঘাটে মহিলাদের সভায় 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার অনুলিপি।

প্রথম কবিতা

শ্রীমহেন্দ্র নাথ

নিস্তব্ধ আদিম রাত : মোরা দুটি অরণ্যের প্রাণী।
বহ্নি-বিলাসিনী সন্ধ্যা লুকায়েছে আঁধার বিবরে;
পাখিরা ঘুমায়ে জাগে বাধাহীন স্বর্ণ বাসুচরে,
তারার ক্রন্দন শোন, কালো রাতে হে মোর কল্যাণী।

কোন্ সে সমুদ্র হতে উঠিয়াছি আমরা দুজনে!
প্রবাল-স্বপন-ঘেরা ছিলো কি সমুদ্র সেদিন!
প্রথম জাগিল কবে চোখে তব স্বপন রঙীন,
স-ফেন ঊর্মির খেলা আজো দেখি তোমার নয়নে!

পাণ্ডুর সূর্যের রঙ নিভে গেছে মেঘের ছায়ায়।
ফ্যাকাশে চাঁদের আলো লক্ষ শত তারার ক্রন্দন;
স্বপ্নিল চোখের ভাষা—অহেতুক পক্ষ বিধূনন
মূক যদি হয় হোক্; মুক্ত পক্ষ পাখি যদি গায়।

আদিম স্বপনে আজো কাটে রাত—মৌনী নীল রাত :
প্রলাপী সমীরে কাঁপে, হে আদিমী, মুখর আগামী;
আজো কি কোটরে র'বে? পাঠাবে না নিঃশংক প্রণামী,
অজস্র আলোক নিয়ে যদি আসে সোনালি প্রভাত!

কথা শোন, কথা কও—তুমি মোর উত্তরসাধিকা।
তোমার সমুদ্র-চোখে সৃজনের উদ্বেল বিলাস,
প্রভাতী পাখির গান, পূর্বাশার আলোক উচ্ছ্বাস,
কবোষ্ণ শোণিত স্রোতে জ্বালাইবে লক্ষ বহ্নিশিখা;—

অজস্র প্রাণের সুর। সহস্রের ঘর্মাক্ত মিছিল,
মহার্ঘ, দুর্লভ লাগি' অভিযাত্রী লক্ষ পদাতিক;
বিষণ্ণ শিবির পড়ে'—ধেয়ে চলে বলিষ্ঠ সৈনিক
যে-পথে তাদের চলা, যদিও তা' বন্ধুর—পিচ্ছিল।

লোহ-পদধ্বনি শুনি : তুমি শোন! শুনিবেই জানি।
তবু ভাঙিবে না তব নিরুদ্বেগ একান্ত স্বপন!
সর্পিল পথের বাঁকে—শিলালিপি, শোণিত ভাষণ
মোদের দেখাবে পথ দুর্যোগের প্রহেলিকা হানি'।

নিস্তব্ধ আদিম রাত : মোরা দুটি অরণ্যের প্রাণী :
প্রভাতী আলোর গান—রক্তরাঙা আলোর স্বপনে
অতন্দ্র প্রহর যায়; তপোভংগ নিভৃত শয়নে
তারার ক্রন্দন শোন, কালো রাতে, হে মোর কল্যাণী!

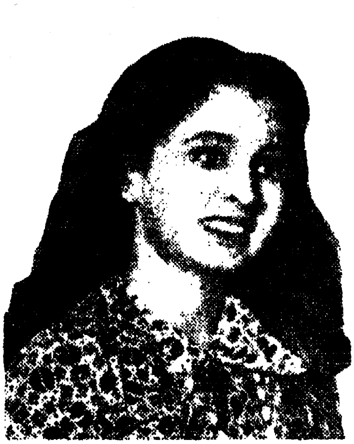
রঙ্গজগৎ

দাবী

নিউ টকীজের নূতন চিত্র। প্রযোজক: কে, তুলসান; কাহিনী, সংলাপ ও সংগীত রচয়িতা: প্রেমেন্দ্র মিত্র; পরিচালক: ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়; সুরশিল্পী: রাইচাঁদ বড়াল; চিত্রগ্রহীতা: জগৎ রায় চৌধুরী ও পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়; ভূমিকায়: পদ্মা দেবী, মণিকা গাঙ্গুলী, পূর্ণিমা, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, ডি জি, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, ফণি রায় প্রভৃতি।

বাঙলা চলচ্চিত্র পরিচালনা ক্ষেত্রে "দাবী"র পরিচালক ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বাঙলার সুপরিচিত হাস্যরসিক অভিনেতা ডি জি নামে যিনি দর্শক সমাজের কাছে অধিকতর খ্যাত) নতুন ত ননই—বরং বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তবে আজ পর্যন্ত তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবনে তিনি আমাদের একখানি উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ চিত্রও দিতে পারেন নি—এটা খুবই দুঃখের বিষয়। বাঙলা উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রে গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তু থাকা সাধারণত অলিখিত আইন বিশেষ। অথচ ডি জি'র প্রতিভা একেবারে বিপরীতমুখী বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। তাই হাস্য-রসের চিত্রেই আমরা সাধারণত তাঁর প্রতিভার সন্ধান পেয়েছি। তবু তিনি এ পর্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তুসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করেছেন এবং ব্যর্থও হয়েছেন। কিন্তু 'দাবী' চিত্রখানি দেখে আমরা পরিচালক ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের অভিমত পাল্টাতে বাধ্য হয়েছি। বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর হ'লেও তিনি এই নতুন চিত্রখানিতে তাঁর কৃতিত্বের বিশিষ্ট ছাপ এঁকে দিতে পেরেছেন: তাঁর এতদিনের ব্যর্থতা সার্থক হয়ে উঠেছে এই একখানি মাত্র চিত্রে।

'দাবী'র সার্থকতার জন্যে কাহিনী, সংলাপ এবং সংগীত রচয়িতা প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেকটা কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। পর্দার গায়ে একটি সহজ সরল কাহিনীকে সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে দেখে দর্শক সাধারণ সন্তুষ্ট না হয়ে পারেন না। কোথাও অনাবশ্যক ঘটনার মারপ্যাঁচে সস্তা স্টান্ট্ সৃষ্টি করে দর্শকদের চমৎকৃত করে দেবার প্রচেষ্টা নেই। কাহিনীটি মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও, গাঢ় হৃদয়াবেগপূর্ণ বিষয়টি দর্শকদের কাছে বলিষ্ঠ আবেদন নিয়ে হাজির হয়। আমাদের মতে ইতিপূর্বে বাঙলা চিত্রে 'দাবী' অপেক্ষা বলিষ্ঠতর কোন প্রেমের চিত্র দেখেছি বলে মনে হয় না। আমাদের চলচ্চিত্রে সাধারণত ইনিয়েবিনিয়ে দীর্ঘায়িত যে সব প্রেমচিত্র চিত্রিত করা হয়, তার সঙ্গে সাধারণত বাঙালী সমাজ-জীবনের কোন সম্পর্কও যেমন থাকে না, তেমনি প্রেমের চিত্র হিসেবেও সেগুলো হয় অস্বাভাবিক। বিবাহে পিতার সম্মতি না পেয়ে রায় বাহাদুরের কন্যা বেরিয়ে এল ডাক্তার শিশিরের সাথে—প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে এসে দাঁড়াল পথের ধুলোয়। নিজের প্রেমে



'দাবী' চিত্রে মণিকা গাঙ্গুলী

মহিয়সী এই নারীর জীবন বেশ ভালই কাটছিল, কিন্তু তার স্নেহ-প্রবণ অথচ জেদী পিতা কন্যার এই অপরাধ এত সহজে ক্ষমা করতে পারলেন না। তাঁর কুটচক্রী নায়েব হীরালাল রায়-বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ডাক্তার শিশিরকে জব্দ করার ভার নিল এবং শেষ পর্যন্ত সে সার্থকও হ'ল। মিথ্যার জাল পেতে রুগী হত্যার অপরাধে ডাক্তার শিশিরকে অভিযুক্ত করা হ'ল এবং শেষ পর্যন্ত বিচারে তার দশ বৎসর কারাদণ্ড হ'ল। এতটা রায় বাহাদুর কল্পনাও করতে পারেন নি—দুঃখের দিনে তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে মেয়ের পাশে এসে দাঁড়াতে চাইলেন। কিন্তু অভিমানিনী কন্যা পিতার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে তার স্বামীর ভালো মানুষ বৃদ্ধ কম্পাউন্ডারের সাথে চলে এল শহরে। সুমিত্রা তখন অন্তঃস্বত্ত্বা। সুমিত্রা এবং বৃদ্ধ কম্পাউন্ডার হরিহর অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে লাগল শিশিরের প্রত্যাবর্তনের আশায়—এদিকে রায় বাহাদুরের মনেও পুঞ্জীভূত হ'তে লাগল অনুতাপ। সুমিত্রার একটি কন্যা হ'ল। শেষ পর্যন্ত এই কন্যা মিনুর মারফতই পিতাপুত্রী এবং শ্বশুর জামাইয়ের মিলন হ'ল। কাহিনীর মধ্যে দু-এক জায়গায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি যে না আছে, তা নয়; কিন্তু প্রচলিত বাঙলা চলচ্চিত্রের কাহিনীর সঙ্গে তুলনায় সে অস্বাভাবিকতা অত্যন্ত কম।

অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান যদি কারও প্রাপ্য হয়, তবে সেটা কুমারী মণিকা গাঙ্গুলীকেই দিতে হয়। চিত্রোপযোগী চেহারা ও অভিনয়-প্রতিভায় এই মেয়েটি বাঙলা চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'দাবী'র শেষাংশ প্রধানত এরই অভিনয় গুণে রস-ঘন হয়ে উঠেছে। বাঙলার দর্শক সমাজ ইতিপূর্বেও দু'একটি চিত্রে তার অভিনয় ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু 'দাবী'তে তার অভিনয় আগেকার সব অভিনয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। কুমারী মণিকা যে ভবিষ্যতে বাঙলা চলচ্চিত্রে যশস্বিনী অভিনেত্রী হতে পারবে—সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। 'দাবী'র বিশেষত্ব এই যে, মোটামুটি সব অভিনেতা অভিনেত্রীই সুঅভিনয় করেছেন। সুমিত্রার ভূমিকায় পদ্মা দেবী সুন্দর তেজোদীপ্ত অভিনয় করেছেন। কিন্তু ১৮ বছরের ব্যবধানেও পদ্মা দেবীর রূপ-সজ্জার কোন পরিবর্তন না করাটা বিসদৃশ ঠেকেছে। সরল হৃদয় তেজস্বী স্পষ্টবক্তা ডাক্তার শিশিরের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য আশাতীত ভাল অভিনয় করেছেন। রায় বাহাদুরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের মর্যাদাদীপ্ত সুষ্ঠু অভিনয় 'দাবী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের সব চেয়ে বেশী বিস্মিত করে দিয়েছেন কম্পাউন্ডার হরিহরের ভূমিকায় স্বয়ং ডি জি। তিনি ছিলেন চিরকাল হাস্যরসের অভিনয়ে সুপটু; কিন্তু 'দাবী'তে পরোপকারী সরল প্রাণ গ্রাম্য কম্পাউন্ডার বৃদ্ধ হরিহরের ভূমিকায় তিনি সংযত সুষ্ঠু অভিনয় করে সকলেরই বিস্ময়োদ্রেক করেছেন। মিনুর ভূমিকায় পূর্ণিমা যথেষ্ট অবকাশ না পেলেও সুঅভিনয় করেছেন। ফণি রায়ের অভিনয় খুব স্বাভাবিক হয়েছে। হীরালালের ভূমিকায় অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় মন্দ অভিনয় করেন নি। অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকা চলনসই।

'দাবী'র সংগীত পরিচালনায় রাইচাঁদ বড়াল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মিনুর মুখে প্রথম গানটি উল্লেখযোগ্য। 'দাবী'র আলোকচিত্র গ্রহণ মাঝে মাঝে ভাল হয়েছে।—যেমন রাত্রি বেলায় নব দম্পতি শিশির ও সুমিত্রার শয়ন গৃহের আলোকচিত্রণ ধরা যাক্। বাইরে প্রবল বৃষ্টি—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শয়ন গৃহে প্রদীপ নেবানো—জানালার পাশে হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নবদম্পতি। এইখানে ক্যামেরায় আলোছায়ার খেলা সুন্দর ফুটে উঠেছে। আলোকচিত্রের অনুপাতে শব্দ গ্রহণ ভাল হয় নি। শব্দ গ্রহণ আরও উন্নত স্তরের হওয়া উচিত ছিল।

দেশ

সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ২৫শে ভাদ্র, ১৩৫০ সাল। Saturday, 11th September, 1943 [৪৪শ সংখ্যা

সাময়িকপ্রসঙ্গ

কার :কোথায়

ঙলা দেশের সর্বত্র অন্নাভাবে হাহাকার; চাদে এমন হাহাকার এদেশের লোকের অনেকটা গা-সহা হইয়া গিয়াছে; াং এদেশের উপরওয়ালাদের অনেকের ইহ বাহ্য। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভারত গভর্নমেন্টের হোম সেকে- মিঃ কনরন স্মিথের বক্তৃতাতেই ইহার পাওয়া গিয়াছে। তিনি বাঙলা নিদারুণ অবস্থাকে স্বীকার করেন র মতে এই সব নাটকীয় ভঙ্গীতে করা রাজনীতিক উদ্দেশ্য া প্রচারকার্য মাত্র; কিন্তু কথা লিকাতার রাস্তায় এই যে অভিযান ইহাও কি মায়া বা সূত্র-ক্রীড়ার মত ব্যাপার; তার বিভিন্ন হাসপাতালে অনাহার-নিত মৃত্যুর যে হিসাব প্রত্যহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, সে সবও কি মিথ্যা--না, এ-সব মৃত্যু মৃত্যুর হিসাবে ধর্তব্য নয়? অন্নাভাব এবং তজ্জনিত হাহাকার এদেশের একদল লোকের চিরদিনই আছে, এদেশের শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত দায়িত্বসম্পন্ন কোন কোন ব্যক্তির মুখে এমন যুক্তি এখনও আমরা শুনিতেছি—কিন্তু অন্নাভাবে—এইভাবে মানুষের মৃত্যু ইহাও কি গতানুগতিক-ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে এবং কোন সভ্য গভর্নমেন্টের পক্ষে তাহা কর্তব্যের পরিচায়ক হইতে পারে? বিহারের গভর্নর স্যার টমাস রাদারফোর্ড বাঙলা দেশের নূতন গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙলা দেশের কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বে বিহারের গভর্নররূপে তিনি সেদিন রাঁচীতে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "বাঙলায় যাহা ঘটিতেছে, বিহারে যাহাতে সেরূপ না ঘটে সর্বপ্রযত্নে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আমি একান্তভাবে এই আশা করি যে, আমাদের এই প্রচেষ্টায় ব্যবসায়ী মহলের নিকট হইতে আমরা সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিব। চাউলের মূল্য হ্রাস করিয়া আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ নাগাৎ মোটা চাউলের পাইকারী মূল্য প্রতি মণ ৯, টাকা এবং মাঝারী চাউলের পাইকারী মূল্য প্রতি মণ ১০, টাকা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।" স্যার টমাস যদি বাঙলার গভর্নররূপে এই-রূপ ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিতে পারেন, তবে আমরা তাঁহার জয়গান করিব। কিন্তু শুধু কথায় এখন আর আমরা সান্ত্বনা পাই না; কারণ চাউলের মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে এ পর্যন্ত উপরওয়ালা-দের তরফ হইতে যত প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটিও একটুও কাজে আসে নাই। এ ক্ষেত্রে ইহাও বিবেচ্য যে, চাউলের দর কমান অর্থ, সরকারী খাতাপত্রে কিংবা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে কমানোই নয়; কম দরে সাধারণে বাজারে চাউল পায়, এই-ভাবে কমানো দরকার; তাহা হইবে কি? বাঙলা দেশের খাদ্যসচিব চাউলের দর ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সরা-সরি কমাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি দর বাঁধিয়া দিয়াছেন; কিন্তু সে দরে বাঙলা দেশের কোথাও চাউল পাওয়া যায় না; অধিকন্তু চাউলের দর বাঁধিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে চাউল বহু স্থানেই বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় সরকারী বিজ্ঞপ্তির বাঁধা দর পড়িলেই দেশের লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে কি? আমরা পূর্বেই বহুবার বলিয়াছি এবং বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহাদের একটু জ্ঞান আছে, তাঁহারা ত এ কথা বুঝিতেই পারেন যে, গভর্নমেন্ট যদি তাঁহাদের নির্দিষ্ট দরে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা না রাখেন, তবে কলমের চেরা সহিতে দ্রব্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণের কিছুমাত্র মূল্যই থাকে না। কোন ব্যবসায়ী নির্ধারিত মূল্যে চাউল দিতে অস্বীকার করিলে থানায় জানাইতে হইবে; ইহা তো বুঝা গেল; কিন্তু এক বেলা চাউলের জন্য যাহাদিগকে দোকানে দোকানে ঘুরিতে হয়; অনাহারে পুলিশের কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাহাদের উদরান্নের সংস্থান হয় না বরং সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা বিশেষ-ভাবে বিপর্যস্ত হইবার ভয়ের কারণ ঘটে।

সরকারী বিবৃতিতে দেখা যাই-তেছে বাঙলা দেশের কয়েকটি জেলাকে উদ্বৃত্ত জেলা বলিয়া

ঘোষণা করিয়া বাঙলা সরকার সেই সব জেলা হইতে "আউস" ধান ক্রয় করিবার জন্য এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। উদ্বৃত্ত জেলা নির্ধারিত করিবার এই সিদ্ধান্ত কোন্ ভিত্তিতে করা হইল, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই; কারণ, ঐ সব জেলায় চাউলের মূল্য এখনও সরকারী সর্বোচ্চ মূল্যের অপেক্ষা অনেক বেশী রহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে চাউল সংগ্রহ করাই দুর্ঘট হইয়াছে। তারপর সরকার এইভাবে চাউল ক্রয় করিয়া কি করিবেন? সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে ঐ সব চাউল সরবরাহ করা হইবে। এ ব্যবস্থা সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে যে, দেশবাসীর অন্নসংস্থানের ভার যদি সরকার গ্রহণ করেন, তবেই জনসাধারণ এ ব্যবস্থার সার্থকতা সহজভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। আমাদের মতে সমগ্র বাঙলা দেশকে "দুর্ভিক্ষপীড়িত" অঞ্চল ঘোষণা করিয়া সরকারের তাহাই করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে; নতুবা সাময়িক এবং আংশিক জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থায় বাঙলা দেশের এমন ব্যাপক সমস্যার কিছুতেই সমাধান হইতে পারে না। বাঙলা সরকার সত্যই যদি এ সমস্যার সমাধান রাখিতে চাহেন, তবে সরবরাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে পাকা বন্দোবস্ত করিয়া অবিলম্বে এইদিক হইতে তাঁহাদিগকে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। নতুবা দেশের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হইয়া উঠিবে; সরকারী বিধি-ব্যবস্থার ত্রুটির ফাঁকে কেহ কেহ অবশ্য লাভবান হইবে; কিন্তু সমগ্র জাতি তাহাতে রক্ষা পাইবে না। বাঙলার সমস্যা আজ একটা জাতির জীবন-মরণের সমস্যা এবং সে সমস্যা সমাধানের জন্য আনাড়ীর মত পরীক্ষা চালাইবার অবসর নাই।

শহর হইতে লোকাপসরণ

সুদীর্ঘকাল খাদ্যাভাবে বিপন্ন হইয়া বাঙলার গ্রাম অঞ্চল হইতে অনশনক্লিষ্ট জনতা বাঙলার রাজধানী ধনী এবং বিলাসীর শহর কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ইহাদের আশা ছিল, অন্তত এখানে আসিয়া তাহারা না খাইয়া মরিবে না; কিন্তু তাহাদের আশা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। কতকগুলি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইতে ইহাদিগের কষ্টের লাঘব করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাই করা হইয়াছে; কিন্তু এইভাবে শুধু বে-সরকারী চেষ্টায় এ সমস্যার সম্পূর্ণ প্রতিকার করা সম্ভব নয়; শহরের বিভিন্ন অন্নসত্রে ইহাদের কতক অংশের অন্নের কিছু সংস্থান হইলেও, ইহারা আশ্রয় পায় নাই; যথোচিত চিকিৎসা বা শুশ্রূষা লাভ করে নাই। ইহার ফলে ইহাদের অনেকে শহরের রাজপথেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কেহ কেহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার পরও মারা গিয়াছে। কিন্তু সভ্য এবং শিক্ষিতের শহর এই কলিকাতা, এখানকার স্বাস্থ্যবিধান পলকা। গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র এবং বুভুক্ষিত জনতার চাপে সে বিধান ভাঙিগয়া পড়িবার ভয় আছে; তাই ইহাদিগকে বাহিরে সরাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেদিন বাঙলার রাজস্বসচিব সাংবাদিকদের এক সভায় এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্ধারিত পরিকল্পনা আমাদের নিকট উপস্থিত করেন। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে শহরবাসীর দিক হইতে এ সম্বন্ধে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার অপেক্ষা আশ্রয়প্রার্থীদের দিক হইতে আমরা এই সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি। সহরবাসীদের নিরাপত্তা কিংবা নির্ঝঞ্ঝাট হইবার প্রশ্ন এক্ষেত্রে আমরা মানবতার বিরোধী মনে করি। আমরা জানি, গ্রাম অঞ্চল হইতে ক্রমাগত যদি এইভাবে নিরন্ন জনশ্রেণী শহরের অভিমুখে ক্রমাগত আসিতেই থাকে, তবে গ্রামসমূহ ধ্বংস হইবে। চাষ-আবাদ সব বিপর্যস্ত হইবে। অন্নসত্রে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা একটা জাতির সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। এ অবস্থায় যাহাতে ইহারা নিঃশঙ্কচিত্তে নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহের ভরসা পাইয়া গ্রামে ফিরে, এমন ব্যবস্থা করা দরকার। রাজস্বসচিব আমাদের নিকট সেদিন যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকটি স্থানে ক্যাম্প খুলিয়া সাময়িকভাবে এই নিরন্নের দুঃখ লাঘব করিবারই প্রস্তাব রহিয়াছে; কিন্তু এমন সাময়িক ভিক্ষান্ন বিতরণের দ্বারা এ সমস্যার প্রতিকার হইবে না। এই সব নরনারী যাহাতে নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তেমন দীর্ঘকালীন এবং ব্যাপক সাহায্য পরিকল্পনা অবলম্বন করা সরকারের পক্ষে প্রয়োজন। যদি তেমন ব্যবস্থা না করা হয়, তবে বাঙলা দেশের জনসাধারণের একটা বড় অংশ ভিখারীতে পরিণত হইবে এবং তাহাদের আর্তনাদ শহরের অধিবাসীদের কর্ণে পৌঁছিয়া তাঁহাদের হয়ত নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইবে না, কিন্তু সমগ্র বাঙলা দেশের আকাশ-বাতাস সে আর্তনাদে প্রপীড়িত হইবে।

বাঙলায় খাদ্য সরবরাহ

পাঞ্জাব সরকারের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ এস এন বক সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাব হইতে ৬ শত টন চাউল বাঙলাদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সেজন্য মাল গাড়িও মিলিয়াছে। তিনি ইহাও বলিতেছেন, পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট বাঙলাদেশের অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা বাজরা, জোয়ার, গম, সংগ্রহ করিয়া বাঙলাদেশে যতটা পারেন চালান দিতে চেষ্টা করিবেন; ব্যবস্থা যদি কার্যকর হয় এবং ঐ সব মাল আকস্মিক গতিতে উধাও না হইয়া যায়, তবে সুখের বিষয়; কিন্তু বাঙলার বাহির হইতে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে খাদ্য শস্য প্রেরণের সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। এই সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। পাঞ্জাবের আর্য প্রতিনিধি সভা সম্প্রতি জানান যে, তাঁহারা মাল গাড়ির সুবিধা পাইলে অবিলম্বে বাঙলাদেশে একশত গাড়ি চাউল পাঠাইতে পারেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা মাল গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। আমরা জানিতে পারিলাম, বাঙলাদেশের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কাছে সরাসরি মাল পাঠাইতে হইলে ছাড়পত্র পাইবার এবং মাল গাড়ি যোগাড় করিবার পক্ষেও বিশেষ অসুবিধা হইতেছে না; কিন্তু কোন বেসরকারী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নামে মাল পাঠাইবার বেলাতেই এই সব অসুবিধা দেখা দিতেছে। এই ক্ষেত্রে সরকারী এবং বেসরকারী এই পার্থক্য সৃষ্টির কোন কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কলিকাতা সহরে এবং বাঙলাদেশের অন্যান্য স্থানে বেসরকারী দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যে কোন সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছেন, যদি সে কাজ না চলিত, তবে আজ বাঙলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করিত। এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙলা সরকা ইহাও অবগত আছেন যে, বাঙলা সরকার কর্তৃক চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধান প্রবর্তিত হইবার পর খাদ্য শস্যের অভাবে এই সব সেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাহায্য কার্য- পরিচালনা করা ইতিমধ্যেই কঠি হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় বাহি হইতে যাহাতে এই সব প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে খাদ্যশস্য সাহায্য লাভ করিতে পারে, তেমন ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে কর্তব্য আমরা ইহাও জানিলাম যে, পঞ্জাব হইতে বাঙলাদেশে খাদ্যশস্য চালান দিবার জন মাল গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে না পারিয়া পাঞ্জাবের ব্যবসায়িগণ শস্যে পরিবর্তে নগদ টাকা সাহায্য পাঠাইবা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন; কিন্তু

বাঙলাদেশের প্রয়োজন বর্তমান খাদ্যের—"নিক্ষিপ্য হি মুখে রত্নং ন কুর্যাৎ প্রাণ ধারণং"। বাঙলাদেশকে খাদ্য যোগাইয়া বাঁচাইতে হইবে; এজন্য 'আমাকে মাল গাড়ির ব্যবস্থা যদি এখনও করা সম্ভব না হয়, তবে বাঙলা গভর্নমেণ্ট এবং ভারত গভর্নমেণ্ট উভয়কেই তজ্জন্য দায়ী হইতে হইবে।

পরলোকে কুমুদিনী বসু

গত ১৯শে ভাদ্র শনিবার শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলাদেশ একজন বিশিষ্ট মহিলা-কর্মী ও বিদুষী সাহিত্যসেবিকাকে হারাইল। গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে আমরা জাতীয় জাগরণের নানা ক্ষেত্রে তাঁহার কর্মশক্তির পরিচয় পাইয়াছি। এই সময় তিনি "সুপ্রভাত" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। এই কাগজ বাঙলা উগ্রপন্থী স্বাধীনতাবাদীদের মুখপত্র ছিল। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্তা বসুর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লিখিত 'শিখের বলিদান' ছোট বই হইলেও এক সময় বাঙলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হইত; তাঁহার লিখিত 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী', 'মণিমালা', 'সমাধি' প্রভৃতি পুস্তকও বেশ সমাদর লাভ করিয়াছিল। দেশহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাঙলার নারী সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কার্য্যে তাঁহার অক্লান্ত শ্রম ও উৎসাহ স্বদেশবাসীর কাছে তাঁহাকে স্মরণীয় রাখিবে। আমরা তাঁহার শোকতপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

যুদ্ধের চতুর্থ বৎসর—

বর্তমান যুদ্ধ ঘোষণার চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ হওয়ার দিনে সম্মিলিতপক্ষের বাহিনী ইতালী আক্রমণ করিয়াছে। যুদ্ধের এই চতুর্থ বর্ষের শেষভাগে সম্মিলিতপক্ষ আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এই কথা বলা যায়। এই বৎসর রাশিয়ার সীমান্তে প্রবেশ, বেলগোরড, খারকভ, কারাচেন, ট্যাগানরগ, ইয়েলনিয়া জার্মানির হস্তচ্যুত হইয়াছে। মুসোলিনী ইতালীর রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন এবং সিসিলী সম্মিলিত পক্ষের করতলগত হইয়াছে। জাপানীদের সঙ্গে সংগ্রামেও সম্মিলিতপক্ষ বিশেষভাবে মার্কিন কয়েকটি ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছে। এলুইসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইতে জাপান বিতাড়িত হইয়াছে। আত্তু এবং কিস্কা দ্বীপ এখন মার্কিন সেনাদের দখলে। ইহা ছাড়া মুণ্ডার উড়ো-জাহাজের ঘাঁটি জাপানীদের হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং নিউ-জর্জ্জিয়া দ্বীপ হইতে জাপানীরা বিতাড়িত হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের গতি বর্তমানে সম্মিলিত পক্ষের সুবিধার দিকে, কিন্তু ইহার ফলে যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে আসিয়াছে এবং জার্মানির পরাজয় আসন্ন হইয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ ইহা মনে করিতেছেন না; পক্ষান্তরে এমন কথাই আমরা শুনিতেছি যে, জার্মানির আত্মরক্ষা করিবার মত ক্ষমতা তো রহিয়াছেই, অধিকন্তু ১৯৪৪ সালে সুবিধা পাইলে সে আক্রমণাত্মক নীতিও অবলম্বন করিতে পারে। তাহার সে সুবিধা দেখা দিবার মত সম্ভাবনা কোন দিক হইতে আছে কিনা, এ সম্বন্ধে বিচার করিলে এই কথা বলা চলে যে, রাশিয়ার চাপেই জার্মানিকে প্রধানতঃ কাবু হইয়া থাকিতে হইতেছে; রাশিয়ার আক্রমণাত্মক নীতির শক্তি বৃদ্ধি করাই জার্মাণিকে দুর্ব্বল রাখিবার বা অন্য কথায় ভবিষ্যতের সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখিবার সুনিশ্চিত উপায়। কুইবেকের সম্মেলনে এই সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বোঝা যায় না, তবে রয়টারের সংবাদে জানা যাইতেছে, রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজ ও মার্কিনের যতটা মতভেদ ছিল, এখন তাহার চেয়ে মতভেদ অনেক কম। রয়টারের এই সংবাদেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, মতভেদ এখনও রহিয়াছে এবং তাহা প্রধানত রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া। সামরিক বিষয়ে ইংরেজ ও মার্কিনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পূর্ণভাবেই মতের মিল আছে। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ মার্কিণ সংবাদপত্রসেবী মিঃ জেমস ষ্টুয়ার্ট হার্ট এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে, জার্মানরা দুমুখো চাল চালিতেছে। তাহারা এদিক হইতে দেখাইতে চাহিতেছে যে, রাশিয়ার সঙ্গে তাহাদের সন্ধি হইয়া যাইতে পারে, অন্য দিকে তাহারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, ইংরেজ এবং মার্কিনের সঙ্গে তাহাদের সন্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১লা মে ষ্ট্যালিন একটি বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে জার্মানদের এই চালের কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল, সম্মিলিত পক্ষের কোন শক্তিই জার্মানদের এই টোপ গিলিবে না। কিন্তু সামরিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তনশীল; মে মাসের কথা, সেপ্টেম্বরের অবস্থার সঙ্গে খাপ না খাইতেও পারে, কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে সম্মিলিত পক্ষের মতের ঐক্য সকল দিক হইতে প্রতিষ্ঠা করাই সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন।

ছাত্র সমাজের জাগরণ—

নিরন্নের আন্নদান সেবার কর্তব্য প্রতিপালনের দিকে বাঙলার ছাত্র সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণা প্রত্যেক দেশেই ছাত্র সমাজের অন্তরকে প্রথমে স্পর্শ করে এবং সেই সূত্রে সমাজের সর্বাংশে তাহা বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সেবাব্রতের এই আদর্শ আজ তরুণদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করুক—এবং এই দুর্দৈবের চাপে সংকীর্ণতার যত দৈন্য ও দুর্বলতা জাতির অন্তর হইতে দূরে হইয়া যাউক, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। ভিক্ষাবৃত্তির পথে এ সমস্যা মিটিবে না। আমরা জানি এবং অন্নসত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা ও এই ব্যাপক সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা কিছুমাত্র নাই; কিন্তু মানবতার প্রবৃত্তি ঐসব পথের ভিতর দিয়া যদি স্ফূর্ত্তি পায়, তবে সে দিক হইতেও জাতির একটা বড় লাভ আছে। বাঙলার ছাত্র সমাজ আজ সেই মানবতার বাণীই এই অবসন্ন জাতির প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া তুলুন। চোখের সামনে মানুষ অনাহারে এবং বিনা শুশ্রূষায় প্রাণ ত্যাগ করিবে, অথচ তাহার প্রতীকার হইবে না, এ জাতিকে এমন কলঙ্কের বোঝা যেন আর বহন করিতে না হয়।

উদরপূর্তির উপকরণ

কলিকাতার রাস্তায় নিরাশ্রয়দিগকে যে মণ্ড জাতীয় খাদ্য প্রদান করা হইতেছে, বাঙলার খাদ্য-বিভাগ হইতে, তাহার পাক-প্রকরণ এবং বিতরণের একটা পরিমাণ নির্দেশ করা হইয়াছে। বাঙলা সরকার এই নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন যে, মণ্ড জাতীয় এই তথাকথিত খিচুড়ী দিনে একবার দিতে হইবে এবং সিগারেটের কৌটার তিন টিনের বেশী যেন কাহাকেও দেওয়া না হয়। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের জয়েণ্ট সেক্রেটারী সম্প্রতি এই খাদ্যের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ খাদ্যে জলই বেশীর ভাগ থাকে, ক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে যে পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তাহার তিনভাগের একভাগও উহাতে থাকে না। আমরা খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নহি; তবে ক্ষুধিতের পক্ষে উপযুক্তভাবে যে ঐরূপ খাদ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে না, ইহা আমরা চোখের উপরই দেখিতে পাইতেছি। আমরা দেখিতে পাই, ঐ খাদ্য গ্রহণ করিবার পরমুহূর্তেই একমুষ্টি অন্নের জন্য রাস্তায় রাস্তায় আশ্রয়প্রার্থীরা আর্তনাদ করিতে থাকে। কলিকাতা শহর হইতে আশ্রয়প্রার্থীদিগকে গ্রামে অপসারিত করিবার পরও সম্ভবত তাহাদিগকে সরকারী ব্যবস্থা অনুসারে এইরূপ খাদ্য বিতরণ করা হইবে, তৎপূর্বে আমরা কর্তৃপক্ষকে ইহার ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং শরীর পোষণের যোগ্যতা সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

- শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী -

চিত্রশিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

[৬]

ছাত্র স্বরাজ

এই বিদ্যালয়ে একটি আদর্শ ছাত্র-স্বরাজ প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক বৎসরে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সে সময়ে ছাত্রদের কি পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের স্বাধীনতার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল; শিক্ষক, অভিভাবক, এমনকি ছাত্রগণও এই সংকীর্ণতার পরিপোষক ছিল। এরূপ অবস্থায় সহজেই অনুমেয়—এই ছাত্র-স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথকে কি পরিমাণ বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

'ডিসিপ্লিন' শব্দটাতে একটা মোহজনক ঝঙ্কার আছে, সে ঝংকার অনেকটা বন্দীশালার লোহার শিকলের ঝংকারের অনুরূপ। জীবনে ডিসিপ্লিনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু ইহা যখন উপলক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে পরিণত হয় তখন এমন বালাই আর নাই। কিন্তু উপলক্ষ্য কোন্ অগোচরে যে লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল তাহা দেখিবার মতো সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রায়ই থাকে না—ফলে ভৃত্য মনিবের স্থান অধিকার করিয়া দাসরাজত্ব স্থাপন করিয়া বসে।

ইহার একটা উদাহরণ আমার চোখে বহুবার পড়িয়াছে। আধুনিক বিদ্যালয়ে দুপুরেবেলার রোদে ভরা-পেটে, ঘুম-ভরা চোখে ছাত্ররা বটগাছ-তলায় দাঁড়াইয়া ড্রিল করে। ড্রিল মাস্টারের অবস্থাও তদনুরূপ। কৃশ, রুগ্ন, মুখে চোখে বিরক্তি, পায়ে এক জোড়া চটি, এমন বিসদৃশ ড্রিলমাস্টার যে কোথা হইতে সংগৃহীত হয় তাহা একমাত্র কর্তৃপক্ষেরাই জানেন। এই ছাত্র ও শিক্ষক অসরল রেখায় দাঁড়াইয়া তালে তালে হাত-পা নাড়ে, গল্প গুজব করে, হাসি-ঠাট্টা করে—এবং ছাড়া পাইবা মাত্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আবার ইস্কুলের কোঠায় ফিরিয়া যায়। সমস্ত ব্যাপারটার প্রতি তাহাদের নিছক বিরক্তি, অবিশ্বাস, ধিক্কার ও ঘৃণার ভাব। এদিকে শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ পরম নিঃসন্দেহে বৈদ্যুতিক পাখার তলে বিরাজমান থাকিয়া মনে করেন যে, এই ব্যাপার দ্বারা দেশের প্রতি, বালকদের বর্তমান স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ চরিত্রের প্রতি তাঁহারা কর্তব্য সমাপন করিতেছেন। এমন মূঢ়তা অল্পই দৃষ্ট হয়, উপলক্ষ্য লক্ষ্য হইয়া উঠিবার ইহা একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

বস্তুত বাঙালী ছাত্রের জীবনে এই ড্রিল উপলক্ষ্যও নয়। ইংরেজ ছাত্র যখন ড্রিল শেখে, তখন সে ভাবী সামরিক শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। ড্রিল তাহাদের পক্ষে সত্যই উপলক্ষ্য। আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন উদ্দেশ্যই নাই—তবু কাগজ-কলমে খাঁটি থাকিবার জন্য মাধ্যাহ্নিক ড্রিলের এই বিরক্তিকর অবতারণা।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ডিসিপ্লিন বিষয়ে নানারূপ বাধার সম্মুখীন হইলেন। শিক্ষকদের তো তিনি গড়িয়া-পিটিয়া তৈরি করেন নাই, তাহারা পুরাতন ছাঁচেই মানুষ। ডিসিপ্লিন শব্দটাতে তাঁহারা অভ্যস্ত! তাঁহারা দেখিলেন, এখানে ডিসিপ্লিন কই! এমন কি ইঁহাদের চাপে প্রথম প্রথম কবিকে অনেক পরিমাণে স্বমতের সাময়িক পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। বস্তুত আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম আমলে ডিসিপ্লিনের যেন কিছু কড়াকড়ি ছিল।

এই ডিসিপ্লিন বাতিক কতদূর হাস্যকর হইতে পারিত তাহার একটি দৃষ্টান্ত আজও ভুলি নাই। আশ্রমে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পাঠ্য পুস্তক প্রভৃতির একটি দোকান ছিল। সেখান হইতে একবার আমরা আমাদের পাঠ্যপুস্তক পাইলাম। বইখানা রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কাব্যের একটা পূর্বতন সংস্করণ—ইহাতে বিদায়-অভিশাপ ও চিত্রাঙ্গদাও সংযোজিত ছিল। বইখানা পাইয়া দেখিলাম ইহার একটা অংশ মোটা সূতা দিয়া সেলাই করা। ব্যাপার কি? প্রথমেই আমরা সূতা কাটিয়া নিষিদ্ধ অংশ, অর্থাৎ বিদায় অভিশাপ ও চিত্রাঙ্গদা পড়িয়া ফেলিলাম। ও দুটির অর্থও যেমন বুঝিলাম না তেমনি সেলাই করিবার অর্থও বুঝিতে পারিলাম না। সে সময়ে ভক্তিযোগপড়া দুর্দান্ত নীতিপরায়ণ কয়েকজন প্রবীণ যুবক শিক্ষক আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল ওই দুইটি কাব্য পড়িলে আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া উঠিবে। তাঁহাদের সম্বন্ধে দুটি প্রশ্ন আজিও আমার মনের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা নিজেরা কি ওই কাব্য দুটি বুঝিয়াছিলেন? আর ওই দুখানির লেখক সম্বন্ধে তাঁহাদের আন্তরিক অভিমত কি?

যাই হোক্, এই সমস্যার কবিজনোচিত সমাধান রবীন্দ্রনাথ করিলেন। ডিসিপ্লিন একেবারে ঘুচিল না, কিন্তু তাহার ভার শিক্ষকদের হাত হইতে লইয়া সর্বতোভাবে ছাত্রদের হাতে তিনি তুলিয়া দিলেন। ইহার প্রধান উপকার এই হইল যে, পরের হাতের শাসনে অব্যাহতি পাওয়ায় শাসনের গ্লানি যেন অন্তর্হিত হইল। ইহাতেও কম বাধা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হয় নাই। কিন্তু এজন্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া যায় না, দেশের মধ্যেই তখন এ বিষয়ে প্রতিকূলতা ছিল। ছাত্ররা নিজেদের শাসন করিবে, কি আশ্চর্য! বিজ্ঞজনেরা ইহাকে কবির একটা খেয়াল বলিয়া মনে করিল। কবি যে unpractical তাহার যেন আর একটা নূতন প্রমাণ মিলিল। ঘরে-পরে বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি ছাত্রদের ভার প্রায় ষোল আনা ছাত্রদের হাতে তুলিয়া দিলেন। কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এতখানি স্বাধীনতা আর কখনো দেওয়া হইয়াছে কি না, জানি না। ইহাই প্রকৃত ছাত্র-স্বরাজ।

ছাত্রদের কার্য পরিচালনার জন্য একটি সভা ছিল—ইহার নাম আশ্রম সম্মিলনী। ইহাকে ছাত্রদের পার্লামেন্ট বলা যাইতে পারে। সমস্ত ছাত্রই ইহার সদস্য। সকলে মিলিয়া একটি কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচিত করিয়া দিত। এই সমিতিই প্রকৃতপক্ষে শাসনকর্তা। সম্মিলনীর একজন সম্পাদক থাকিত। কাপ্তেনগণ ভীতিকর ছিল বলিয়াছি—আবার এই সম্পাদক কাপ্তেনগণের পক্ষেও ভীতিকর ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে—আশ্রম সম্মিলনীর প্রথম সম্পাদক ছিলেন সরোজরঞ্জন চৌধুরী।

নিয়ম প্রস্তুত করিয়া দেওয়া ছিল সম্মিলনীর মুখ্য কর্তব্য; এবং যে সব নিয়ম প্রস্তুত হইতেছে সেগুলি যথাযথভাবে

পালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিত কার্য-নির্বাহক সমিতি।

গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য একটি বিচার সভা ছিল। সম্পাদক ও কাপ্তেনগণ বিচারক। রাত্রে আহারান্তে কোন নিভৃত স্থানে বিচার সভা বসিত। বিচার সভায় কাহারো নাম প্রেরিত হইয়াছে শুনিলে মুখ শুকাইয়া যাইত। যে কাপ্তেন ছাত্রদের আতঙ্ক, যে সম্পাদক কাপ্তেনগণের আতঙ্ক, বিচারসভা সেই আতঙ্কস্রষ্টাদের ঘনীভূত দুঃস্বপ্ন!

আবার প্রত্যেক দিন পালাক্রমে চার পাঁচজন ছাত্র অতিথিদের পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত হইত। অতিথি পরিচর্যার যাবতীয় ভার ছিল তাহাদের উপরে।

আমার আশ্রমবাসের শেষের দিকে একাদিক্রমে তিন চার বছর ধরিয়া আমি সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলাম। তখন আমি আধা মাস্টার—আধা ছাত্র। আশ্রমের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সম্মিলনী তাল রাখিতে পারে নাই বলিয়া আমি পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করিলাম। অনেক তর্ক-

আমার ভীরু মন কোন দিন সাড়া দেয় নাই। ওর মধ্যে বোধ করি সাহিত্যটাই সব চেয়ে নিরীহ ছিল, তাই কোনদিন নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে সেই দিকেই ভিড়িয়া পড়িলাম। আমার ব্যক্তিগত সাহিত্য-চর্চার ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন নাই। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া কি-ভাবে ছাত্রদের সাহিত্যের দিকে টানিয়া লইত তাহা লেখাই আমার উদ্দেশ্য। বস্তুত এই স্মৃতি গ্রন্থকে আমার জীবনী বলিয়া গ্রহণ করিলে পাঠক ভুল করিবেন।



মাসে আশ্রম সম্মিলনীর দুটি অধিবেশন হইত। অমাবস্যার রাত্রে একটি, পূর্ণিমার রাত্রে একটি। ওই দুইদিন বিকালবেলা অনধ্যায় থাকিত। অমাবস্যার সভায় কেবল কাজের কথা হইত। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিলে তিনি সভাপতি হইতেন। ছাত্ররা বিতর্ক করিত, ভোট দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইত। ছাত্রেতর সকলে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন।

পূর্ণিমার অধিবেশন আনন্দোৎসবের। গান, বাজনা, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি হইত। আশ্রমের ছোট বড় সকলেই এই আনন্দের অংশভাক্ ছিল।

প্রত্যেক দিন একজন ছাত্র পাকশালার অধ্যক্ষকে সকল প্রকার কাজে সাহায্য করিত। সেদিন ক্লাসের পড়া হইতে তাহার ছুটি।

বিতর্ক এবং অধিবেশনাদির পরে পুরাতন Constitution আমূল পরিবর্তিত হইল —এখন যে Constitution চলিতেছে তাহা আমার সম্পাদকতাকালে প্রবর্তিত।

সাহিত্য-চর্চা

সাহিত্য-চর্চার দিকে যে আমি কি করিয়া ভিড়িয়া পড়িলাম তাহা আজ আর আমারও মনে নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মনে কোন পূর্ব সংস্কার ছিল না, কাজেই প্রথম অঙ্কুরোদ্গম যে এখানেই ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শান্তিনিকেতনে বালকচিত্তকে চারদিক হইতে জাগাইয়া তুলিবার নানা আয়োজন ছিল। খেলাধুলা, লেখাপড়া, সংগীত-নৃত্য, আবৃত্তি অভিনয়, সেবা-শুশ্রূষা এবং চিত্র ও সাহিত্য। খেলা-ধুলার মত অতি-পৌরুষোচিত ব্যাপারে

আমার স্মৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া শান্তি-নিকেতনের কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। এ জন্য যে কোন ছেলের কাহিনী লইলেই চলিত, তবে নিজের স্মৃতি নিজের কাছে স্পষ্ট বলিয়া সুবিধার খাতিরে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। আর আমি সাধারণ মাপের বালক ছিলাম বলিয়া এই স্মৃতি-কথাকে শান্তিনিকেতনের সাধারণ অভিজ্ঞতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সাহিত্য-সভা সাজাইবার কাজ দিয়া আমার সাহিত্য জীবন শুরু করি, সাহিত্য রচনা দিয়া নয়। সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সাহিত্য-সভা শান্তিনিকেতন-জীবনের একটি অঙ্গ ছিল। ফুল লতা-পাতা দিয়া সভা সাজাইয়া ছেলেরা নিজেদের রচনা পড়িত, নূতন শেখা গান গাহিত। কিন্তু

বড় ছেলেদের সভার কেন্দ্রে ঘেঁসিতে পারিতাম না, দূরে হইতে দর্শকরূপে দেখিতে হইত; দর্শকরূপেও যে সব বুঝিতে পারিতাম তাহা নয়। এমন নিষ্ক্রিয় নির্বোধ দর্শক সাজিয়া থাকিতে বেশি দিন মন চাহিল না। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া ছোটদের সাহিত্য সভার আয়োজন করিয়া ফেলিলাম। আশ্রমের বাগানে ফুল লতাপাতার অভাব ছিল না; যতখুশি ভাঙিয়া আনিয়া ঘর সাজাইলাম, কিন্তু রচনা! সে তো আর প্রকৃতির দান নয় যে যত্র তত্র অজস্র ফুটিয়া থাকিবে! সেজন্যও খুব বেশি বেগ পাইতে হইল না। রবীন্দ্রনাথের শিশুকাব্য পাঠ্য ছিল, সেই কাব্য মালঞ্চে ডাকাতি করিয়া কবিতা লিখিত হইল। তিনটি ছত্র বা কবির, চতুর্থ ছত্রটি কবিযশোলিপ্সুর! ধরিবার কেহ ছিল না, কারণ শ্রোতা ও লেখক প্রায় সকলেই কবি যশোপ্রার্থী। পরিণত বয়সে আজও সেই কাজ করিতেছি; রবীন্দ্রনাথের কাব্যমালঞ্চের চোর কবি সাজিয়া সুরঙ্গ কাটিয়া চলিয়াছি, কিন্তু হায়, সেদিনের বালক শ্রোতাদলের পরিবর্তে আজ চারিদিকে সতর্ক কোটাল সমালোচনার দণ্ড হাতে পাহারায় নিযুক্ত। তবে সান্ত্বনা এই যে, কবিও যেমন রবীন্দ্রনাথের ভাব-চোর, তেমনি সমালোচকও যে দণ্ডের আঘাত করিতেছে তাহাও রবীন্দ্রনাথের। তবে কবিরা নাকি নিরীহ মার খাইয়া স্বীকার করে, আর সমালোচকেরা হয় সম্পাদক, নয় প্রকাশক—মার খাইলেও বুঝিবার মত চামড়ার বেদনাগ্রাহিতা অনেকদিন তাহাদের চলিয়া গিয়াছে।

সেই বালককালের সভা-পর্বের একদিনের কথা আমার মনে আছে। সেটা ছিল চৈত্র মাসের সন্ধ্যা, ছেলেরা খেলিতে গিয়াছে, আমরা দুই বন্ধুতে হাসপাতালের বাগানে সভার জন্য ফুল তুলিতেছি। কে জানিত ফুল তুলিতে তুলিতে কখন বিনিসূতায় মানুষে মানুষে হৃদয়ের গ্রন্থি পড়িয়া যায়, সাহিত্য ও বন্ধুত্ব একসূত্রে গ্রথিত হইয়া ওঠে। সেই ঘটনার ত্রিশ বছর পরে দৈবাৎ সেদিনকার সঙ্গীর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শুধাইলাম অমুক কোথায়? তাহার দাদা বলিল, আঙিনায় দেখো, নূতন মোটর কিনিয়াছে, তাই লইয়া বোধ করি ব্যস্ত। আঙিনায় গিয়া নূতন মোটর দেখিলাম, আর দেখিলাম মোটরের তলা হইতে নিষ্ক্রান্ত দুইখানা পা, বাকি মানুষটা গাড়ির তলায় অদৃশ্য হইয়া বোধ করি ইসক্রুপ আঁটিতেছে। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। সে উত্তর দিল—তুমি! বড়ই বিসদৃশ লাগিল—সেদিনের সেই ফুল-তোলা আর আজকার ইসক্রুপ আঁটা! তবে তাহার পক্ষে সৌভাগ্যের এই যে সে সাহিত্যিক হয় নাই, কাজেই নিজের মোটর চড়িয়া বেড়ায়, অবশ্য আমার কৃতিত্বও কম নয়, কলিকাতায় হাজার হাজার মোটর থাকা সত্ত্বেও আমি এখনো মোটর চাপা পড়ি নাই। যদি কোন দিন হাজরা রোডের মোড়ে মোটর চাপা পড়ি, তবে তাহার সেদিনকার অবস্থায় আর আমার দুরবস্থায় বিশেষ প্রভেদ থাকিবে না—গাড়ির তলা হইতে শরীরের ভগ্নাংশ মাত্র দৃষ্ট হইবে। কৌতূহলী পথিকের দল জমিয়া গিয়া কত প্রকার মন্তব্য করিবে। কেহ বলিবে বাঙাল, কেহ বলিবে মাতাল, কিন্তু কেহই জানিতে পারিবে না লোকটা সাহিত্যিক ছিল! সাহিত্যিকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের নয়।

অল্পদিনের মধ্যেই সকলে কবি বলিয়া জানিয়া ফেলিল—বলা বাহুল্য, নিজের 'রয়টারের' কাজ নিজেই করিতাম। এখন ঠিক তার উল্টা। আধুনিক কবিতা চলিত হইবার পরে আমি যে কবি তাহা সযত্নে গোপন করিতে চেষ্টা করি, হঠাৎ অপরে কবি বলিয়া আমার পরিচয় দিলে ভাবিতে চেষ্টা করি কখনো তাহার কোন উপকার করিয়াছি কি না!

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনার নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। কালিদাসবাবু বলিয়া আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি কবিতা লিখিতেন। তাঁহাকে দিয়া আমাদের কবিতা সংশোধন করাইয়া লইতাম। সংশোধন কথাটার অপপ্রয়োগ হইল—কারণ কোনক্রমে গোটা তিন চার লাইন লিখিয়া লইয়া যাইতে পারিলেই তিনি একটা নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখিয়া দিতেন। সেটা যে আমার নিজের কবিতা নয়—কখনো সে তিলমাত্র সন্দেহ মনে উদিত হইত না।

তারপরে কেমন করিয়া জানি না রবীন্দ্রনাথের কানেও কথাটা পৌঁছিল যে আমি কবিতা লিখি। তিনি আমার কবিতা দেখিতে চাহিলেন। সেদিনকার মনের ভাব আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। শুধু এইটুকু মনে আছে যে সেদিন ক্লাসে গেলাম না। অন্য ছেলেরা ঈর্ষামিশ্রিত সম্ভ্রমের চোখে আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি দুপুরে বেলায় শালগাছের তলায় একটা উই-ঢিপির পাশে বসিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলাম। উই-ঢিপির পাশে কেন বসিয়াছিলাম তাহা ঠিক বলিতে পারি না, বোধ করি, তখন বাল্মীকি শব্দটার অর্থ নূতন শিখিয়াছি। রবীন্দ্র-বন্দনা করিয়া একটা কবি-প্রশস্তি লিখিয়া ফেলিলাম। কয়েকটা ছত্র এখনো মনে আছে—

সেই মহা গীত ছন্দে, সেই মহা তালে
তুমি গাহিয়াছ গান, ঊষা সন্ধ্যাকালে,—

শেষের ছত্রটা—

শুনো গুরুদেব তব শিশুদের গীতি।

তারপরে সলজ্জভাবে কবিতাটি লইয়া গুরুদেবের সমীপে চলিলাম। তিনি শান্তিনিকেতনের দোতলায় থাকিতেন। তখন তিনি বৈকালিক জলযোগে বসিয়াছেন—সময় নির্বাচনটা হয়তো একেবারে আকস্মিক ছিল না। কবিতাটি লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে দিলাম, তিনি এক পলকে পড়িয়া লইয়া হাসিলেন। তারপরে এক প্লেট 'পুডিং' আমার হাতে তুলিয়া দিলেন। পুডিং অতি উপাদেয় খাদ্য সন্দেহ নাই—কিন্তু হায়, আমি কি ইহার জন্যই আসিয়াছি? আমি কি ইহার জন্যই সর্পসঙ্কুল বল্মীকস্তূপের পাশে বসিয়া দুপুরে রোদে ঘামিতে ঘামিতে কবিতা লিখিয়াছি!

পুডিং শেষ করিলাম। কিন্তু কই প্রশংসা তো করিলেন না। আমি উসখুস করিতেছি দেখিয়া আমাকে আরও রস পিপাসু মনে করিয়া এক প্লেট আনারস দিলেন। আনারস বীতরস ও পুডিং তিক্ত মনে হইল। আর বসিয়া থাকা অনর্থক মনে করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। (ততক্ষণ টেবিলের খাদ্যও শেষ হইয়া গিয়াছে।) চলিয়া আসিবার আগে প্রণাম করিলাম, তিনি চুল ধরিয়া একটু টানিয়া দিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ভাবিতে লাগিলাম, কবিতাটার প্রশংসা কেন করিলেন না! কবিতাটা যে প্রশংসার যোগ্য হয় নাই—এই সহজতম সমাধান কিছুতেই ভাবিতে পারিলাম না।

হঠাৎ মনে হইল ঠিক! ঠিক! আমি কি নির্বোধ! এ কবিতায় যে তাঁহার প্রশংসা ছিল, তিনি কি করিয়া ইহাকে প্রকাশ্যে প্রশংসা করিবেন। তাইতো! তখনি ম্লানপ্রায় আকাশ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পৃথিবীতে কালোর কলিযুগ শেষ হইয়া আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইল! মনে হইল তাঁহার মুখে একটা প্রচ্ছন্ন প্রশংসার আভাসও যেন দেখিয়াছি। হায়রে আমার বালক মনের অনভিজ্ঞতা! সে প্রচ্ছন্ন প্রশংসা যে পুডিং প্রস্তুতকারক পাচকের উদ্দেশে—তাহা কি তখন বুঝিয়াছি!

ক্রমশ

শঙ্করের বিবাহ

শ্রীসুকুমার রায় এম এ

শংকরের এ বিবাহ হইতে পারে না এরূপ জানিলাম।

আমি দিল্লীতে ইণ্টারভিউ দিতে রওনা হইলাম চাকুরীর জন্য। আরও বিশেষ একটি দায়িত্ব লইয়া আসিয়াছিলাম। ছেলেবেলা হইতে আমি ও শংকর একসংগে পড়িয়াছি। কিন্তু আমি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত রহিলাম, শংকর দিল্লীতে আসিয়া চাকুরী আরম্ভ করিল। শংকর মা বাপের বড় বাধ্য ছিল। সহসা একদিন পত্র লিখিল যে সে দিল্লীতেই বিবাহ করিবে। মা বাপ বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, তাহার ভাইবোনেরাও সমালোচনা করিল। আরও শুনিলাম যে দিল্লীতেই আমার পিসতুত ভায়ের স্ত্রী শংকরকে যাদু করিয়া একাজে রতী করাইয়াছেন। অনেক নালিশ শুনিলাম। আমি শংকরের ও তাহার বাড়ির সকলের মধ্যবর্তী ব্যক্তি হইয়া পড়িলাম এবং সংগে সংগে আমার দায়িত্বজ্ঞানের স্নায়ুগুলি চাড়া দিয়া উঠিল। দিল্লী আসিবার পথে পণ করিয়া আসিলাম—শংকরকে কিছুতেই এ বিবাহ করিতে দিব না। ইহাই আমার দিল্লী অভিযানের আর এক উদ্দেশ্য।

এতকাল বাঙলাদেশ ছাড়িয়া আর কোথাও যাওয়ার কোনও সুযোগ ঘটে নাই। এ উপলক্ষে বাঙলার বাহিরে সমস্ত ঐতিহাসিক শহরগুলিকে দেখিবার আগ্রহে মনের ভিতরে এক অজানা আনন্দ সাড়া দিয়া উঠিল। তুফান মেল বৈকালের সমস্ত সবুজ প্রকৃতির মধ্য দিয়া গতি ও দ্রুত পরিবর্তনের সংগে সংগে দৃশ্যগুলিও পরিবর্তিত করিয়া দিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সবুজ ক্ষেত্রগুলি অদৃশ্য হইল। বাঙলাদেশ পার হইতে আরও কয়েক ঘণ্টা বাকি। মনটাও হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিল। ইহার পর সন্ধ্যার অন্ধকারেও চাহিয়া আছি, গতিটাকে অনুভব করিতেছি শুধু, কাব্য করি নাই। ইণ্টারক্লাসের কামরায় চাপাচাপি করিয়া বসিয়া আছি। ভিতরে কতপ্রকারের আলোচনা চলিতেছে, কাহারও প্রতি লক্ষ্য নাই।

পরদিন ভোর হইতেও দেখি উদ্দামবেগে তুফান মেল ছুটিয়া চলিয়াছে। বুঝিতে পারিতেছি বাঙলার ক্ষেত্র পার হইয়া অন্য ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি, বিহারও পার হইয়া গিয়াছি। এলাহাবাদও অতিক্রম করিয়া চলিলাম, কানপুর, ফতেপুর, আলিগড় আরও কত কি। ট্রেণের গতিটা রক্ত চলাচলের সংগে এক হইয়া গিয়াছে। আধা হিন্দিতে কাহারও কাহারও সংগে কিছু কিছু আদান প্রদান করিতে পারিতেছি। দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রের তেজ তখন আতপ্ত উদ্দাম বায়ুর সংগে মিশিয়া ট্রেণের কামরার ভিতর দিয়া হানাহানি করিতেছে। কি একটা জংসন হইতে শুনিলাম আগ্রা যাইবার জন্য ভিন্ন লাইন। আগ্রা নামটিতে মন উসখুস করিয়া উঠিল। কিন্তু গাড়ি বেশীক্ষণ দাঁড়াইল না। গাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়াছিলাম। সহসা একজন বাঙালী বলিলেন, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

বলিলাম, দিল্লী।

বেশ, তুমি এই কামরাতেই চলে যাও। কথা বলতে বলতে যেতে পারবে।

তা বেশ, বলিয়া একটি বাঙালী মেয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল, সংগে সংগে ট্রেনও ছাড়িয়া দিল। আমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই যে এ ট্রেনে আসা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতিশয় আগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। পরনে একটি সাদাসিধা শাড়ি; হাতে সরু আঙুলের চাপে ধৃত দুই একটি বাঙলা ও ইরেজী আধুনিক নভেল ও বাঙলা পত্রিকা। দুইটি সোনার চুড়ি মণিবন্ধ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নাতিদীর্ঘ তাহার দেহ এবং তাহাতে কান্তি ও কমনীয়তার পরিপূর্ণ বিকাশ আছে। নিটোল মুখের উপরে বড় দুটি কালো চোখ দেখিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম, এত সরল অথচ এই নবীনতার মধ্যে যাহা আছে তাহা সকলেরই মনকে আকর্ষণ করিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাচ্ছেন?

নিউদিল্লী। আগ্রা থেকে আসচি। আপনি?

আমি কলিকাতা থেকে আপাতত নিউদিল্লীতেই যাচ্ছি। এ স্টেশনে বুঝি আপনার কেউ থাকেন?

তা নয়। টুণ্ডলা থেকে চেঞ্জ করে আগ্রাতে যেতে হয়। আমি আগ্রা থেকেই এলাম। ভাল, নিউদিল্লীতে থাকবেন কোথায়? আমার পিসতুত ভায়ের ওখানে। নাম—হিতেনবাবু।

ওফ্, দিদির ওখানেই যাবেন।

দিদি কে?

হিতেনবাবুর স্ত্রী।

তার সংগে আপনার সম্পর্ক আছে দেখতে পাচ্ছি।

হাঁ, বিলক্ষণ। আমার দিদি—বন্ধু।

ভাল, তা হলে আপনার সংগেও আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব হোল।

তিনি শুধু হাসিলেন এবং সে হাসিতে কপোলতলের যে টোলটি দেখিলাম তাহা মোনালিসার স্মিতহাস্যের সংগে তুলনা করিব কি? অনেক বকিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি, কি উদ্দেশ্যে—সব। কখনো আবার তাহার মুখ হইতে শুনিতে লাগিলাম এই দিল্লী প্রবেশ পথের দৃশ্যগুলির ইতিহাস। নিরুদ্বেগে বহু সময় অতীত হইয়া গেল। দিল্লীতে পৌঁছিলাম। স্টেশনে আমার জন্যও লোক উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বাবার সংগেই তিনি গেলেন। যাইবার সময়ে একটি নমস্কারে আমার অন্তরকে অভিনন্দিত করিয়া রাখিয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্তের দেখা ও কয়েক মুহূর্তের বিচ্ছেদের একটা সূক্ষ্ম ব্যথা আছে কি? রুষ দেশের গল্পলেখক চেকভের একটি ছোট গল্পে পড়িয়াছিলাম, গল্পের নায়ক জীবনে শুধু দুইবার—একবার স্টেশনে এবং দ্বিতীয়বার সাইবেরিয়ার গ্রামে—অপূর্ব সুন্দরী নারীর দেহে সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দুইবারেই তাঁহার মনে এক অব্যক্ত বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। আমার মনে একবার সে কথাও জাগিয়া উঠিল। নামটিও যে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখি নাই। সে হইল আমার মনেরই অনুভূতি মাত্র।

অনেককাল পিসতুতো ভাইদের খবর রাখিতাম না। তাঁহারা দিল্লীতেই থাকেন। অজিত স্টেশনে ছিল। শুনিলাম সেজদা আজকাল রেলওয়ে বোর্ডে বড় চাকুরী করেন। বাংলোয় পৌঁছিতেই বৌদিদি সযত্নে আমাকে গ্রহণ করিলেন, আদর-আপ্যায়নে পথকষ্ট ভুলাইয়া দিলেন। তাঁহার সংগে এই প্রথম পরিচয়, কিন্তু যেন কতকালের দেখাশুনা। অতিশয় রূপময়ী একজন গৃহিণী তিনি, কোন বিষয়ে আতিশয্য নাই, চঞ্চলতা নাই, শুধু চোখের ও মুখের ভঙ্গিতে একটি অপূর্ব সযত্ন স্নেহও বিগলিত কমনীয়তা।

কথায় কথায় বলিলেন, এখানে আমিই অজিতের ও শংকরের গার্ডিয়ান, আর তুমি যদি চাকুরী পেয়ে দিল্লীতে থাকো, তবে ভাই তোমারও হবো। বড় ভাল লাগে এই প্রভুত্ব। শংকর প্রথমে এসে আমার কাছেই ছিল, আমাকে মেনেও নিয়েছে।

অজিত বলিল, এ যে অক্ষমের প্রভুত্ব বৌদি।

বৌদি বলিলেন, ক্ষমতা জিনিসটা যে

তোমাদের উপরওয়ালাদেরই আছে একথাও স্বীকার করিনে। তোমরা চাকুরী যার করো ঘরে বসে তাদের চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করো। কিন্তু আমি একটা নোটিশ জারী করলে, দূরে গিয়ে আমাকে গালাগালি করতে কখনো পারবে না।

তা আমরা পারি না। কিন্তু অন্য লোকে কখনো করে থাকে। উদাহরণ দিচ্ছি। শঙ্করের বিয়ে ব্যাপারে শঙ্করের মামা একটা হিল্লে করতে এসে যখন বললেন অজিতের বৌদিঠাকরুণই শঙ্করকে যাদু করেছে, তখন তুমি তোমার প্রভুত্বটা কেমন ভেবেছিলে বৌদি?

আমি তো শঙ্করকে বিয়ে করতেই হবে বলে দিইনি। বিয়েতে নিজের খুশী।

কিন্তু তোমার নামে দুর্নাম রটবে মনে করে শঙ্কর তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কথা ছেড়ে নিজেই বাবার মতামত চেয়ে পাঠিয়েছেন।

বৌদি আমাকে বলিলেন, দেখ একবার। বিয়েতে আমার নাম দুর্নামের কি এসে যায়। যেখানে খুশী হোক। আমি ওর মামাকে বাধা দিয়েছিলাম, তিনি চেয়েছিলেন ওপর-ওয়ালার মেয়ের সঙ্গে শঙ্করের বিয়ে দিতে।

তা ভালই করেছ বৌদি। কিন্তু, মামা-বাবু রটিয়েছেন, তুমি শঙ্করকে এবং আমাকে ভেড়া করে রেখেছ।

আহা আমার ভেড়া রে! একটা আদেশ পালন করবার নামটি নেই, আবার ভেড়া! —হাসিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে তাঁহার যে মেয়েটা ও ছেলেটা ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বইপত্র ছুঁড়িয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, তাহাদের ধমকাইয়া বাথ-রুমে পাঠাইয়া দিলেন। চাকরকে ডাকিয়া আমার বেডিং ইত্যাদি গুছাইতে বলিলেন। অজিত বলিতে লাগিল, বৌদি জানো না, তোমার হাতে ভেড়া হওয়ার চেয়েও ওপর--ওয়ালার মন জুগিয়ে চাকরী করা কত বিভিন্ন প্রবৃত্তির পরিচায়ক। একটি স্বর্গ, আর একটি নরক। নয় শঙ্করের মামা নিজের চাকুরীর সুবিধে করবার জন্যে— ঐ একটা ধিঙ্গি মেয়ের সঙ্গে শঙ্করের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন?

চাকুরী এত জঘন্য ব্যাপার?

জঘন্য।

না বাপু—তুমি ব্যবসাই করো। কিন্তু পরেশ এসেছে দূরদেশ থেকে ইণ্টারভিউ দিতে—একে ঘাবড়ে দিও না।

ইহার পরে এক মুহূর্তে আমার কোট, টুপি ইত্যাদি আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিলেন। পকেট হইতে চাবি লইয়া সুটকেস খুলিয়া একটি তোয়ালে বাহির করিয়া দিলেন ও ধুতি কুঁচাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, বলিলেন, যাও চান সেরে এসো।

এখানে পা দিয়াই শঙ্করের বিবাহ সম্বন্ধে যে একটু আভাস পাওয়া গেল তাহাতে আমার মনটা একটু ব্যস্ত হইল। শঙ্করের এ বিবাহে কি মতামত ছিল না? কিন্তু শঙ্করের সঙ্গে আমার দেখা হইল না। একথাও বোধ হয় সত্য নয় যে, বৌদি উঁহাকে এ বিবাহে ব্রতী করাইয়াছেন।

খাবার খাইতে বসিলাম টেবিলে, সঙ্গে বৌদির মেয়ে ও ছেলে বসিল। দুজনা আমার দিকে চাহিতেছে আর ভাবিতেছে। সন্তু পুঁটির কানে কি বলিল, পুঁটি আড়-চোখে চাহিয়া একটু হাসিল। এমন সময় বৌদি কয়েকটি লুচি লইয়া আসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকে আদেশ করিয়া আসিলেন অন্যান্য খাবার তাড়াতাড়ি আনিতে।

বৌদি বলিলেন, পরেশ তোমাদের কাকা হ'ন জান তো? পুঁটি মার দিকে ঘেঁসিয়া বসিল।

সন্তু বলিল, আমাদের আরও কাকা আছেন জানিনি তো।

বৌদি বলিলেন, বুড়োমি ছাড়ো সন্তু— যা বলি তাই শোন, নয় মার খাবে।

সন্তু চুপ হইল। বৌদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কে বড় আর ছোট কে? এদের খবরই আমি জানিনে।

বৌদি বলিলেন, ও রামো! ওরা আমার পেটের কেউ নয়। ওটা তোমার বড়দার— আমার ভাসুরের মেয়ে, আর ওটা আমার দেওর তোমার সতীশদার ছেলে। ছেলেটা ভারি বজ্জাত আর মেয়েটা মাতৃহারা, তাই ও দুটো আমার ভাগে ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন। ও দুটো আবার আমাকে মা বলে, যতই বলি আমাকে জেঠী আর কাকী বলবি—ততই ওদের রাগ।

ছেলেটা উঠিয়া আসিয়া বৌদিকে বিষম কীল লাগাইয়া দিল এবং এই কথায় ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিল। এমন সময়ে অজিত আসিল লাঠি বাগাইয়া। মেয়েটা বৌদির বুকের কাছে চাপিয়া বসিয়া ছল ছল দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাহিয়া লইল। তাহারা কেহই আর খাবার খাইবে না। সন্তুকে বৌদি টানিয়া বসাইলেন। বলিলেন, হতভাগা কীল মেরে আমার পিঠ ভেঙ্গে দিলি।

সন্তু বলিল, কেন পরের কাছে তুমি এ সব কথা বলে বেড়াও—তুমি মা নও! তোমাকে তো কক্‌খনো আমি মা বলে ডাকতে চাইনে।

পর কে? পরেশ কাকা যে!

আমি ও সব বুঝি নে।

মেয়েটা আস্তে বলিল, আমার মা নেই তো কি হয়েছে? আমার সে কথা তোমাকে বলতে নিষেধ করে দিচ্ছি।

বৌদি বলিল, মা-এর জন্যে কাঁদতে পারিস না বলেই ত লোকের কাছে ওরকম বলে থাকি।

তুমি মলে তবে কাঁদব।

তা বেশ। শিগ্‌গীর মরব।

সন্তু পুঁটিকে ঘুসী দেখাইয়া বলিল, খবরদার।

বৌদি হাসিলেন, বলিলেন, আমার ইচ্ছা ওদের সত্যিকার সেণ্টিমেণ্ট বা ভাব-গুলো ঠিক ভাবে বিকাশ পেয়ে উঠুক। তা হলেই ওরা ঠিক মানুষ হবে।

দেখিলাম বৌদির মনে একটা অপূর্ব চিন্তা ক্ষমতাও রহিয়াছে। যে ভাবনা মানুষকে দূরদৃষ্টি দান করে তাই যেন ভ্রূযুগলের মধ্য দিয়া ঈষৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কথার ভঙ্গিতে একটি মুন্সীয়ানা আছে যে জন্য কথাটি বলিলে ভাবিতে হয় এবং গ্রহণ করিতেও হয়।

একটি দিন বিশ্রামে ও গল্পে কাটিয়া যায়। সহসা কাজের ফাঁকে পরদিন ভোরে বৌদি আসিয়া বলিলেন, শঙ্করের সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি?

অজিত বলিল, ওর ওপর কাজের চাপ পড়েছে।

আমি বলিলাম, শঙ্কর বুঝে নিয়েছে, এলে পরেই আমার সঙ্গে ওর ঝগড়া হবে।

বৌদি জিজ্ঞাসা করিলেন, কারণটি কি?

ওর বাড়ি থেকে কেউ এলো না কেন, একথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বললাম, এখানে আসতে কারও অভিরুচি নেই, আর আমিও নিয়ে আসতে ইচ্ছা করিনি।

এ বিয়েতে বুঝি কারও মত নেই?

আমারও না।

কেন বলত?

কারণ, বাবা মা ভাই বোনের মতামত না নিয়ে সকলকে উপেক্ষা করে নিজেই যে সিদ্ধান্ত করেছে, তাতে সকলকে অবহেলা করা হয়েছে, এজন্যে।

বৌদি চুপ রহিলেন। কতক্ষণ পর বলিলেন, কিন্তু তোমাদের অমতের পূর্বে একটি কথা জিজ্ঞেসা করতে চাচ্ছি। তোমরা সে মেয়েটিকে জানো কি?

আমি বলিলাম, কাকে? শঙ্করের সেই বিয়ের কনেকে? জানিনে,—জানতেও চাইনে।

বৌদি কতক্ষণ নীরব থাকিয়া অজিতকে বলিলেন, কাল বিকেলে আমরা সকলে কুতুবে যাব। শঙ্করকে বলে এসো আর যাদের খবর দেবার আমিই পাঠাবো।

আদরে-যত্নে ও শান্তিতে আমার দিল্লীতে আসিবার সমস্ত উদ্দীপনা যেন ধন্য হইল। ভাবিলাম, এতকাল কেন বৌদিকে জানি নাই। দুই দিনে তাঁহার সঙ্গে এত আন্তরিক

হৃদ্যতা স্থাপিত হইবে ধারণারও অতীত।

দু'দিন পরে দুপুরবেলা আমরা কুতুবের যাত্রী। বৌদি ও অজিত একটি সিটে বসিয়াছে এবং আমি একলা একটি সিট দখল করিয়াছিলাম। শুধু পুটি আমার সঙ্গে বসিয়া। বাসে তেমন ভিড় ছিল না। একজন মহিলা উঠিয়া আসিলেন। অজিত আমার পাশেই বসিবার জন্য ইসারা করিতে মেয়েটি নিসঙ্কোচে বসিয়া পড়িল।

ওফ্‌ আপনি যে!

আমি চিনিতে পারি নাই। ইনি সেই—যাঁহাকে ট্রেনের কতকটা পথ সহযাত্রীরূপে পাইয়াছিলাম এবং যাঁহার কথা আমার মনেও ছিল। তাঁহাকে যেন আবার কাছে পাইলাম। বলিলাম, তাইতো।

আর বলিতেও পারিলাম না। চলতি পথে এবার আমারই পাশে তাঁহাকে পাইয়া কি বলিতে হইবে ভুলিয়া গিয়াছি।

বৌদি বলিলেন, নমিতা তুমি একে চেন দেখতে পাচ্ছি।

নমিতা বলিল, হাঁ চিনি।

বলিলাম, বৌদি বুঝি ভেবেছেন এ'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আমাকে অবাক করবেন। তার আগেই আমার সে সৌভাগ্য হয়েছে।

বৌদি বলিলেন, তাহলে আমার আর বলবার কিছুই নেই।—বৌদি তাঁহার সঙ্গী ছেলে ও মেয়েকে সাবধান করিতে লাগিলেন।

নমিতা বলিল, আপনার না ইণ্টারভিউ ছিল? কেমন হলো?

ভালই হয়েছে।

ক'দিন থাকবেন?

জানিনে।

চাকুরী পেলে তো থাকতে হবে।

চাকুরী পাবো না বলে বোধ হচ্চে।

ইণ্টারভিউতে ভাল হয়েছে যখন, তখন আপনারই হবে বলে মনে হয়।

আপনি বুঝে গিয়েছেন যে, ও-সব ভাল-মন্দতে চাকুরী হয়। তা হয় না।

তা বটে।

বলিলাম, আপনি বুঝি দিল্লীতেই থাকেন?

হাঁ, কি ক'রে বুঝলেন? আমার সামান্য পরিচয়েই আপনার সঙ্গে এসে নিঃসংকোচে বসে গিয়েছি, এজন্যে? বিদেশে নিয়ম নাস্তি। বাঙলাদেশে সমাজ আছে, বিচার আছে। আমরা আচার-বিচারের অতীত।

বাস্তবিক এ কথাটিই ভাবছিলাম।

আবার বলিল, আমাদের বাড়ি যেন দিল্লীই হয়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে দিল্লী-সিমলা করছি বাবার সঙ্গে। আর কখনো বা একটু চেঞ্জ।

বাঙলায় গিয়েছেন কখনো?

গিয়েছিলুম—দুবার। একবার কলকাতায়, আর একবার আমাদের দেশের গ্রামে।

কেমন লেগেছে?

লেগেছে বড় ভাল। চমৎকার! মনে মনে ভাবি, সেই বাঙলাদেশে বসেই যদি মানুষ হতাম, তা'হলে জীবনের পরিপূর্ণতা আসতো।

বলিলাম, আবার বাঙলাদেশের মেয়েরা অনেকে ভাবে যে, সমাজের থেকে দূরে সরে গিয়ে যদি থাকতে পারত, তবে তাদের পক্ষে ভাল হতো। বাঙলার পল্লীর সামাজিক অবস্থা আপনি জানেন?

ভেবেছেন নভেল আর কবিতা পড়েই বাঙলাদেশকে ভাবি। তা নয় জানবেন। দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালী জীবনকেও চোখের সামনে দেখতে পাই। সামাজিক জীবনের কথা চিন্তা করি। ভাবি, নিশ্চয় ভগবান একটা কিছু বাঙলায় দিয়েছেন, যেজন্যে অমৃতের উপলব্ধি এই বাঙলায় বসে বিষ মন্থন করেই সম্ভবপর হ'তে পারে।

ভাবিলাম, বাঙলা হইতে অনেক দূরে আসিয়া বাঙলার আবহাওয়া হইতে বঞ্চিত মহিলার নিকট হইতে এ কি কথা শুনিলাম। বাঙলাদেশের দিকে মনটা ছুটিয়া আসিল দ্রুতবেগে। এমন সময়ে আমাদের বাস্‌ আসিয়া কুতুবে লাগিল। আমরা নামিয়া পড়িলাম। মিনারের পথে প্রবেশ করিবার প্রথম মুহূর্তে যাহা দেখিলাম, তাহা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কিন্তু আমার সঙ্গীদের নিকটে তাহা অস্বাভাবিক কিছুই নহে। আকাশটা সামান্য পরিমাণে মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল ও কিছুটা বৃষ্টিও বর্ষিত হইয়াছিল—যাহা নাকি দিল্লীতে অস্বাভাবিক ব্যাপার। সামনে তিনটি ময়ূর পক্ষরাজি বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নমিতা বলিল, বাঙলাদেশ থেকে মেঘ নিয়ে এসে পড়েছেন কিনা, তাই ওরা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

কথাটি শুনিতে বড় ভাল লাগিল; কিন্তু যেন একটু লজ্জা আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিল। কোথায় কুতুবের স্থাপত্য, পৃথিবরাজের মন্দিরের নিদর্শন, লৌহস্তম্ভ, প্রাক্তন কারুশিল্প, ইতিহাস—সমস্ত হইতে দূরে আমার মন কিনা সামান্য ময়ূরের দিকে ছুটিয়াছে। অগ্রসর হইয়া আসিলাম। ইহার পর কে কুতুবের ওপরে যাইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। অজিত বলিল যে, তাহার ওপরে উঠিবার আগ্রহ আজকাল আর নাই। কারণ, অসংখ্যবার সে ওপরে গিয়াছে। বৌদি বলিলেন, তাঁহার অসুস্থতার জন্য তিনিও মিনারের সিঁড়ি ভাঙ্গিতে যাইবেন না। সন্তু কাহারও বলিবার পূর্বেই উধাও হইয়াছে। বৌদি সন্তুর উদ্দেশে গালি দিয়া মেয়েটিকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া লইয়া বলিলেন, তোমরাই ঘুরে এসো, আমরা ততক্ষণে ডাক-বাংলোতে কাটলেট ও চা'এর বন্দোবস্ত করি।

নমিতা বলিল, ঐটিই দিদির উপযুক্ত কাজ, নয় কি?

আমার সংকোচ বুঝিয়া নমিতা বলিয়া ফেলিল, আসুন—আমার ওপরে যাওয়ার অভ্যাস হয়েছে। ঘাবড়াবেন না—আজ আমি মেয়ে নই; আজ যেন দিল্লীর বাদশাদের বংশধর কুতুবুদ্দিনের স্তম্ভের মূল্য পরীক্ষা করতে এসেছি।

বৌদি চলিয়া গেলে নমিতা বলিল, দাঁড়ান। চেয়ে দেখুন, এটা সম্পূর্ণরূপেই মুসলিম স্থাপত্যের একটা বৃহত্তম নিদর্শন, মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কখনো কিংবদন্তী বলে, ওই যে কারুকর্মের ভেতরে পদ্ম দেখতে পাচ্ছেন, ওতে প্রমাণিত হয়, পূর্বে হয়ত এ মিনারটি হিন্দুরাই করেছিলেন। শুনা যায়, সংযুক্তা সূর্য নমস্কার করবার জন্যে প্রত্যহ ওপরে উঠে যেতেন। কিন্তু সে সব আর চলে কি না, তাও জানি না। গবেষণা এ সম্বন্ধে যাই করুন, আমরা শুধু অনুভব করতে চেষ্টা করি।

সমুচ্চ এই ইমারতের দিকে তাকাইয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল। আর সেই বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে নমিতার কণ্ঠের শব্দগুলি আসিয়া অপূর্বভাবে অর্থবোধক হইয়া উঠিল। কী অপূর্ব কারুকর্ম এই সুউচ্চ সৌধকে এমনি করিয়া স্থাপন করিয়া রাখিতে পারিয়াছে! মানবের কত বৃহত্তর সাধনা এই মিনারটির সৃজনের মধ্যে আছে। কী অপূর্ব কৌশলে পাথরগুলিকে সজ্জিত করা হইয়াছে এবং সুডোল, সুকোণবিশিষ্ট করিয়া পাথর কাটা হইয়াছে। এক মুহূর্তে সেই মনটি এই সৃজনীশক্তিকে কল্পনা করিতে চাহে। শুধু ভাবিলাম, অপূর্ব, চমৎকার!

নমিতা বলিল, কল্পনার চক্ষে চলে গিয়েছেন বুঝি কত শতাব্দী পূর্বের দৃশ্যপটে, ভাবছেন বুঝি যে কতকগুলি লোক একত্রিত হয়ে মাপজোখ করে এই স্থাপত্যকে অবিস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

আমি বলিলাম, সত্য করে বলব আমি কি ভাবলুম।

বলুন।

ভাবছি, প্রথম তৈরী হবার পর কে এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছেন, পেছনে পরিচারিকার দল। অলিন্দে ও গবাক্ষে সুগন্ধি ছড়িয়ে আছে। নীচে রাজার সমগ্র প্রজাবৃন্দ। বহু দূর দেশ থেকে এসে এই সৌধকে চেয়ে দেখছে। তারা ভাবতেও পারেনি স্রষ্টার চেয়ে এ সৃষ্টি কত বড়। আরও ভাবছি এবং অনুভব করছি সেই রাজকন্যার কথা।

নমিতা হাসিয়া বলিল, সত্যি, আপনি খুব সহজ লোক। এত সহজ করে মনের কথা কেউ বলেনি কোন দিন। অনেকবারই এই কুতুবে এসেছি, কত বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু সবাই এই স্থাপত্যের কথা বলে। চলুন আজ তা হলে আমিই সেই পরিচারিকা ও সঙ্গিহীনা রাজকন্যা।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, কিন্তু আপনি বন্ধুহীনা ন'ন আজকে।

চলুন একেবারে ওপরে গিয়ে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমবে। অবশ্য সূর্য তো নেই। মেঘকে সাক্ষী করব।

তা বেশ।

সিঁড়িতে পা দিয়া দু'পা উঠিয়া কিছুটা গন্ধ ও অন্ধকার মনের ভিতরের ভাবটাকে যেন চাপা দিয়া রাখিল। কতকটা দূরে উঠিয়াই নমিতা দাঁড়াইয়া পড়িল, কী ভাবচেন বলুন। প্রশস্ত সিঁড়ি এর পর ছোট হয়ে যাবে আর বলতে পারবেন না।

—কিন্তু তাবলে বন্ধুকে হারাবার ভয় বোধ হয় সেখানে নেই।

একথা সত্য। কোথায় গেল অলিন্দের রাজকুমারীরা, কোথায় বা সেই কস্তুরীর সুগন্ধ। পদস্থাপনের সেই আসন, প্রতি ধাপের ওপরের আচ্ছাদন?—বন্ধু না হলে হাঁপিয়ে উঠতাম, ভাবতাম এতবড় কারুকর্ম শুধু কতকগুলি পাথরের সজ্জা মাত্র।

নমিতা বলিল, ঠিক বলেছেন বন্ধু।

এই সময়ের মধ্যেই আমরা প্রথম তলায় আসিয়া পেীছিলাম। একটু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। নমিতা বলিতে লাগিল, ঐতিহাসিক ব্যতীত এ সমস্ত স্থপতিশিল্প উপভোগ করা যায় না। আবার সকলের সঙ্গে এসে তেমন জমেও না। কারণ, মনের ভাবটাকে প্রকাশ না করা পর্যন্ত গতি নেই। কিন্তু প্রকাশ করবামাত্র আর একজন তাকে অর্থবোধক করে ধরবে, তবে ত আনন্দ।

অব্যক্তকে সত্যকরে প্রকাশই হোল আর্ট, আর যিনি আর্টিস্ট, তিনি প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না।

নমিতা হাসিয়া বলিল, একটু সিরিয়াস হয়ে পড়লেন যে!

তাইত—আমি লজ্জিত হইলাম। বলিলাম, দেখুন দিল্লীতেই আমার একটি বন্ধু আছেন, তাকে শঙ্কর বলে ডাকি, চেনেন তাকে?

নমিতা আমার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, হাঁ, চিনি মনে হচ্ছে। দিদির ওখানেই দেখেছি তাঁকে। তিনি ইতিহাসের ছাত্র। বড় ভাল করে বলতে পারেন এই ইতিহাসকে; একেবারে প্রাণ ঢেলে দিয়ে।

হাঁ, সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। আপনার বলবার ভঙ্গী দেখে আজ আমার মনে হচ্ছিল তারই কথা।

মনে হইল নমিতার মুখে একটি লজ্জার আবরণ আসিয়া পড়িল, বলিল, তাহলে কি বলতে চান, আমি তাঁর কাছ থেকে বলবার ভঙ্গীটি চুরি করেছি।

আঃ না, সে কথা নয়। শুধু ভাবছিলাম, শঙ্কর যদি সঙ্গে থাকত তবে কত কথাই সে বলতে পারতো।

শঙ্করবাবু কি আপনার বিশেষ বন্ধু?

হাঁ আমার বিশেষ বন্ধুই বটে।

তিনি আজ এলেন না কেন?

ওর সঙ্গে একটি বিষয় নিয়ে বিশেষ বোঝাপড়া হবে।

বিষয়টি জানবার জন্যে আমার বড়ই Curiosity হচ্ছে, নয় আমার কোনও প্রয়োজন নেই। জানেন ত' ঔৎসুক্য ব্যাপারটাই মেয়েদের সবচেয়ে বেশী।

বলতে আপত্তি আমার মোটেও নেই। শঙ্কর এখানে বিয়ে করছে, বাড়ির সকলেই ওর বিরুদ্ধ মত পোষণ করে—শুধু এই কথাটি জানিয়ে যাওয়াই আমার দায়িত্ব।

ওফ্, তাই বুঝি! বেচারীকে বড়ই বিপদে ফেলবেন বলে মনে হচ্ছে। যে মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে হচ্ছে, তাকে আমি চিনি। বলব তার কথা আপনাকে?

বলুন।

তৃতীয় তলায় উঠিয়া আবার বাহিরের দিকে কতকটা উঁকি মারিলাম। তখন নীচের সুসজ্জিত বাগানটি ও ডাকবাংলো সবই ছোট হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে দিল্লীর অদূরে প্রান্তরের চড়াই উৎরাই, ভাঙ্গা মসজিদ দু'একটি, পুরানো মন্দির—এক নিমিষে দেখিয়া লইলাম। তখন পর্যন্ত কুতুবের যাত্রীরা পাশ কাটাইয়া সিঁড়ি দিয়া অবরোহন করিতেছিল। সিঁড়িগুলি ক্রমশ ছোট হইয়া আসিতেছে এবং পথটাও কিছু সংকীর্ণ। অন্ধকারেও এখন যেন কিছু আলোক পাইতেছি।

সংকীর্ণ পথে আবার উঠিয়া চলিলাম। নমিতা বলিল, যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সে বড় সহজ মেয়ে নয়, বুঝলেন?

কি করে জানেন?

জানি আমি তাই বলি। অবশ্য আপনাকে বলে আমি যদি এ বিয়ে ভেঙে দিতে সাহায্য করি তবে সে কলঙ্ক আমাকে বইতে হবে। শঙ্করবাবু ভাল লোক—আত্মসচেতনতাও ওর আছে। বলতে পারেন বেশ। কিন্তু আমার সঙ্গে সহজে পরিচয় হয়নি। আপনার সঙ্গে যেমন, ঠিক তেমনও নয়।

সংকীর্ণ পথে এবার গা-ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছিল। অপরিচয়ের সমস্ত বন্ধন টুটিয়াও গিয়াছিল। আমরা অতি নিকটে একান্তে, আর কুতুব উপভোগের বিস্ময়-রসে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলাম। সহসা নমিতা দাঁড়াইয়া বলিল, বন্ধু এবার দাঁড়াবেন একটু। আমরা পথের শেষে এসে পড়েছি।

আরও সংকীর্ণ পথে কাছাকাছি দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, আপনি বুঝি পরিশ্রান্ত হয়েছেন।

শ্রান্ত নই। তবে পথ শেষের আনন্দ একটা উপভোগ করবার বস্তু। কুতুব-মিনারের উচ্চে সংকীর্ণ সীমাবিশিষ্ট ছাদটির উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। উপরেই মেঘসমাবৃত আকাশ, আর অনেক নীচে কুতুবের ডাকবাংলোটি এবং নূতন একআধটা সামান্য বাগান, সকলই ভৌগোলিক রেখার মতন দেখাইতেছে। অনেক দূরে দৃষ্টি যায়, কিছু নিম্নের চড়াই উৎরাই আর ভগ্ন মন্দির ও পুরানো মসজিদগুলি খুব ভাল করিয়া বুঝা যায় না। সন্তু উপরে আসিয়া বসিয়াছিল। আমরা আসিতেই বলিল, কাকু এখান থেকে যদি কেউ লাফিয়ে পড়ে, তা হলে কি হবে বলতে পারো?

হাঁ, পারি।

বলো দিকিন।

হবে আমসত্ত্ব।

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলাম। তারপর নীচে চাহিয়া বৌদি ও অজিতকে খুঁজিতে লাগিলাম। ঠিক বুঝিতে পারা গেল না, কে বা কাহারা কোথায় বসিয়া আছেন। সন্তু এবার নামিয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমাদের অপেক্ষা না করিয়া সিঁড়ি গুনিতে গুনিতে আবার নামিয়া চলিল।

এবার আকাশ সাক্ষী করবেন কিংবা নরলোক—দেখুন। আমরা স্বর্গের অর্দ্ধ-পথে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমি অবাক হইয়া চাহিয়া একবার নমিতার মুখটি দেখিলাম। এমন একটা স্বভাবের স্ফুরণ বোধহয় আর কাহারও চোখে ও মুখে দেখি নাই। পাশাপাশি বসিলাম—বিশ্রামের উপলক্ষে। বলিলাম, বলুন সেই মেয়েটির কথা, যার সঙ্গে শঙ্করের বিয়ে হবে।

নমিতা বলিল, বন্ধু রসভঙ্গ করলেন। সে মেয়ে বড় ভালো নয়, এ পর্যন্ত বলাই ভালো। নয় নিন্দা হবে। —আচ্ছা তবু শুনুন বলে যাচ্ছি। প্রকাশ করবেন না কখনো। সে মেয়ে প্রেমপত্র লিখেছে অনেককে। তারই একজন প্রার্থী এই কুতুবে এসে আত্মহত্যা করেছিল।

ঘটনা কি সত্যি?

সত্য না হলেই-বা আপনি সে মেয়ের দোষ দেবেন কেমন করে? কারণ, যে ব্যক্তি

মরেছে, সে ব্যক্তি একবার প্রেমিকার মনটি খুঁজেও দেখে নি যে, সে সত্যি কি চায়।

কি চায় সে?

জানিনে। হয়ত আমাদের মত ঘরের মেয়ে হতে চায়। হয়ত ভাবে যে, বাঙলা দেশে গিয়ে সুখে দুঃখে বাঙালী পরিবারের ভাসুর দেবর শ্বশুর শাশুড়ীর মধ্যে বসে এক অপূর্ব সংসারের স্বাদ লাভ করবে। তবে সত্যি অন্য মেয়ে এসব চায় কিনা, বলতেও পারি না। দিল্লীর অনেকেই বাঙলার গ্রামের ম্যালেরিয়াকে ভয় পায়। সমাজের আচার ও নীতিকে মেনে নিতে পারে না।

আপনি কি পছন্দ করেন?

আমি যে কোন নতুন অভিজ্ঞতাকে পছন্দ করি, সাগ্রহে পেতে চাই,—আমি বাঙলা দেশকে পেতে চাই। দিল্লীতে থেকে থেকে আমার মন শুধু দূরেই ছুটে যায়।

বলিলাম, দিল্লীতে আপনার মতো এমন মনে-প্রাণে বাঙালী মেয়ে আছে, এ-তো আমার জানা ছিল না।

ইহার পর আমরা নীরবে কতকটা পথ নামিয়া আসিলাম। নমিতা আবার বলিতে লাগিল, একটা কথা কি জানেন, সংসারে কোন মেয়ের চাওয়াটা ঠিক এক রকমের নয়। সবার চেয়ে সবারই কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে।

বলিলাম, বন্ধু এবার আপনি একটু সিরিয়াস হয়ে পড়লেন যে।

পড়লুম সত্যি। কেন জানেন, সত্য কথা বলতে কি, কাকেও আমার পেতে হবে, নয় আমি বাঁচবো না—এরকমের একটা ভাব আমার মনে কখনো আসে না। এজন্যেই জীবনে কেউ আমার মনে তেমনভাবে ছাপ কাটে নি। তবে সুবিধা-অসুবিধা, হ্যাঁ, সে একটা বিবেচনার বিষয়। আমাদের ঊষাদিদি অবিবাহিতা, এই বয়েস পর্যন্ত মাস্টারী করে যাচ্ছেন। জীবনে বিয়ের অভাব অনুভব করেন নি বলেছেন। যখন বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন আরও বলেন, যা পাওয়া যায় নি, তা ছেড়েও দিন বেশ চলে যাচ্ছে। বিয়ের প্রয়োজনকে তিনি স্বীকারও করেন না।

আপনি কি সেই ঊষাদি'র সাগরেদ।

মোটেও না। আমার ব্যাপার স্বতন্ত্র। যদি কিছু অনুভব করি, বলে ফেলি, কিন্তু সবই সহজ করে নিই। কোনওটার জন্যে প্রাণ দিতে পারি না। ভালবাসতে গিয়ে প্রাণমন সমর্পণ করে নিষ্কৃতি পাওয়ার মত ভাব আমার ভেতরে আসে না।

আসবে বন্ধু। দিন আসবে, তখন আপনি পারবেন। বাঙলা দেশে যাবেন, দেশকে ভাববেন, সমাজকে ভাববেন—সব হবে আপনার। দিন আসবে।

আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষয় হোক।

ধীরে ধীরে অনেকটা পথ নামিয়া আসিয়াছি। কেহ কেহ পাশ কাটাইয়া উপরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করি নাই। ধীরে ধীরে পথটা প্রশস্ত হইয়া আসিল। বলিলাম, আমাদের বন্ধুত্বের মূল্য কোথায়, সেইটা আজ ভাববো। আপনার কথা ভাববো। ভাববো আরও অনেক কথা। তাহার হাতটিকে টানিয়া লইয়া বলিতে ইচ্ছা হইল।

নমিতা সিঁড়িতে দাঁড়াইতে না দিয়া সহসা আমাকে টানিয়া সে প্রথম তলার প্রশস্ত বারান্দায় লইয়া গেল; এই যে আপনার শংকরবাবুর যার সংগে বিয়ে হবে—সেই মেয়েরই প্রেমে হতাশ হয়ে একটি ছেলে এখান থেকে লাফিয়ে পড়ে মরে গেল।

সে কিছু বললে না?

না। কিছুই না। বলে, এসব সেণ্টিমেণ্টাল পাগলামো আজকাল চলে না। ছেলেটা মলো, কিন্তু মেয়েটা সেটা অনুভবই করলো না।

এই রকমের মেয়ের সংগে শংকরের বিয়ে আমি ঘটতে দেব না।

কিন্তু, ধরুন সে মেয়ে আমার মতন একজন মেয়েই তো বটে।

কিন্তু আপনি স্বতন্ত্র।

তা থাক। নমিতা বলিয়া গেল। শংকর বাবু যে আবার পড়ে মরবার লোক নয়। সেজন্য মেয়েটি শংকরবাবুকে পছন্দ করেছে।

আবার কুতুবের সিঁড়ি বাহিয়া বন্ধুর সংগে নামিয়া আসিলাম। কখন যে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়াছিলাম, বুঝি নাই। তিনি শান্ত ছিলেন। শুধু একটু হাসি তাহার মুখের অপূর্ব শ্রীকে আরও মহিমান্বিত করিয়াছিল। বন্ধু আমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করাইয়া দিয়াছিল, যেন আমাদের আজিকার এই আনন্দ ও আলোচনার অংশমাত্রও কেহ না পাইতে পারে। ইহা হইবে আমাদেরই নিজস্ব গোপন বস্তু। যেন সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে। আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলাম, একথা বাহিরে প্রকাশ পাইবে না কখনো। যে সহজ প্রাণটির স্পর্শ আমি পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার অন্তর এক অপূর্ব অকারণ পুলকে জাগ্রত হইয়া উঠিল। জীবনের এক শুভমুহূর্তে এই বান্ধবীর স্পর্শ আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সেদিন কুতুব হইতে ফিরিলাম। সারারাত্রি চোখে ঘুম ছিল না। আরও কতক্ষণ মিনারের উপরে বসিয়া থাকিতেও পারিতাম। আরও কত কথা শুনিতে পারিতাম। নমিতার কথাগুলি বাঁশির সুরের মত তখনো কানে বাজিতেছিল। সে বাঙলা দেশের পাখি, বাঙলাতেই উড়িয়া যাইতে চাহে। কিন্তু, কি তাহার পরিচয়—কাহাকেও তো জিজ্ঞাসা করি নাই। শুধু নাম জপিয়াছি। বৌদিকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যদি কিছু ভাবেন! কিন্তু, ভাবিলেও কি? তিনি ত বৌদি। তাঁকে ত সব কথাই বলিতে পারি—সমস্ত মনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা। তবে কি সত্যই নমিতাকে আমি চাহিতেছি। নমিতা আমাকে ভাবিয়াছে কি না জানি না। তবে বন্ধুত্বের যে অন্তরঙ্গতা পাইয়াছি, তাহা কি অন্য কোথাও পাওয়া যায়। বন্ধুও সকলেই হয়, পিতাপুত্র, ভাই-ভাই, ভাই-বোন, সমপাঠী, আর সহকর্মী—কিন্তু একি অপূর্ব বন্ধুত্বের আস্বাদন, শুধু সারারাত্রি তাহাকে না ভুলিতে পারিয়া অক্লান্ত মনে ভাবিলাম। আগ্রহের উগ্রতায় পাগলের মত তাহাকে যেন সমগ্র শয্যাময় খুঁজিতে লাগিলাম।

পরদিন ঘুম হইতে জাগিবার পর বৌদি আসিয়া বলিলেন, সুপ্রভাত! ঘুম হলত' ঠাকুরপো।

হোল, কিন্তু স্বপন-ময়।

কেন?

বলতে পারব না। তবে কোনও একজনার কথা ভেবে ভেবে। আমার মন ও হৃদয় রূপান্তরিত হয়েছে শুধু সেজন্যে।

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, কার স্পর্শে বলতো! নমিতাকে কেমন লাগলো?

সমস্ত লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলাম, বলতে পারবো না! তাকে আমি চাই, তাই বোধ হয় ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

বৌদির মুখটি গম্ভীর হইল, বলিলেন, সত্যি বলছো তো? ওর সংগে তোমার কোথায় পরিচয়?

ট্রেনে। আগ্রা থেকে দিল্লীর পথে।

বৌদি হতাশার সুরে বলিলেন, হা ভগবান! এত দূরে তুমি যাবে আমি ভাবি নি। ওর সংগেই যে শংকরের বিয়ে ঠিক করেছি আমি। শংকর কিন্তু এ বিষয়ে নির্লিপ্ত।

দুইবার শুধু বলিলাম, "তাহলে, তাহলে", তারপর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। বৌদি আমার দিকে চাহিয়াই চায়ের বন্দোবস্ত করিতে গেলেন। আমি শুধু ভাবিলাম। ভাবিলাম—যে কথাগুলি নমিতা শংকরের সম্পর্কে জানাইয়াছিল। কিন্তু, নমিতা আমার চোখে আরও সুন্দর ও অপূর্ব হইয়া দাঁড়াইল।

সহসা যেন একটা ভাবনা আমাকে কুতুব-মিনারের উপর হইতে নীচে ফেলিয়া দিল। অনেক ভাবিলাম, আনুপূর্বিক সমস্ত কথা

(শেষাংশ ১৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নদীবক্ষে

শ্রীশান্তি পাল

যাঁহারা প্রাচীন লোকদিগের মুখে বাঙলা দেশের সেকালের কথা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই শুনিয়া থাকিবেন যে, সে-যুগের তুলনায় এ-যুগের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ। সে-যুগে পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা ও কুস্তির আখড়া ছিল। লোকে দৌড়-ঝাঁপ, পথ-চলা, সাঁতার-খেলা, বাইচ-খেলা, এ-সব রীতিমত অভ্যাস করিত। নদীর ধারে ধারে যাঁহাদের বাড়ি, তাঁহারা দাঁড়টানা, হালধরা রীতিমত অভ্যাস করিত। তখনকার দিনে এই বাঙলা দেশে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ব্যায়ামের স্পৃহা নিত্য জাগরিত ছিল। এমন কি মেয়েদের মধ্যেও কুস্তি, লাঠিখেলা, সাঁতার প্রভৃতি নিয়মিতভাবে অনুশীলিত হইত। আমরা পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবারণার্থে প্রাচীন সংবাদপত্র হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(১৪ই মে ১৮২৫।২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

"মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তি লড়াই।—২৬শে বৈশাখ, শনিবার বৈকালে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল তদ্বিবরণ।

কতকগুলিন প্রকৃষ্ট বলিষ্ঠ লোক ঐ স্থানে আসিয়াছিল তাহারা দুই দুই জন এক এক বার মল্লযুদ্ধ করে প্রথমে হাতাহাতি পরে মাতামাতি মাকামাকি ঝাঁকাঝাঁকি হুড়াহুড়ি দুড়াদুড়ি ঠাসাঠাসি কষাকষি ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি শেষে গড়াগড়ি ঝড়াঝড়ি উল্‌টাপালটি লপটালপটি করিয়া বড় শক্তাশক্তির পর একজন জয়ী হয় তাবৎ লোক তাহাকে সাবাসি সাবাসি বলিয়া উঠে এই মত প্রায় ৩০ জন লোকের যুদ্ধ দেখা গেল।

এই মল্লযুদ্ধের বিশেষ শুনিলাম যে যত লোক সে স্থানে যুদ্ধ করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক অনেক টাকা পায় যে লোক পরাজিত হয় সে যত পায় যে ব্যক্তি জয়ী সে তাহার দ্বিগুণ পায়। এই মত এই লড়াই চৈত্র মাসে আরম্ভ হইয়াছে শুনিতে পাই যে আষাঢ় মাস পর্যন্ত হইবেক ইহা প্রতি শনিবারে হয়। এই আনন্দজনক ব্যাপারে অধ্যক্ষ শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র ও চিৎপুরনিবাসি শ্রীযুত নবাব সাহেবেরা দুই জন ও শ্রীযুত মেজর কেমিল সাহেব ও শ্রীযুত পামর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র সরকার এঁহারা সর্বিস্ক্রিপসিয়ান অর্থাৎ চাঁদা করিয়া কতকগুলি টাকা জমা করিয়াছেন তদ্দারা ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে ইহা দর্শনে এতদ্দেশীয় এবং ইংলণ্ডীয় ভদ্রলোক অনেকে গিয়া থাকেন আর অপর লোকও অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে।"

(৭ এপ্রিল ১৮২৭।২৬ চৈত্র ১২৩৩)

"কুস্তি লড়াই।—সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটা নিবাসি শ্রীল শ্রীযুত দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকা প্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে তরস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই ২ জন এক ২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতো বালিকাদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন কিন্তু যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পরাজয়ী হইলে গণ্ডগোল করিবার উদ্যোগ করে কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়ের শাসনেতে কেহ কোন বিবাদ করিতে পারে না।"

সংবাদপত্রে সেকালের কথা।

এ-যুগে যদিও বহুস্থানে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষগণ এবং পল্লীর ব্যায়ামপ্রিয় উদ্যোগী কর্মিবৃন্দের সহায়তায় ব্যায়ামাগার, সন্তরণাগার, বাইচ-সংঘ স্থাপিত হইয়াছে, তবুও দেখা যাইতেছে যে, মাত্র এক শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দৈহিক ব্যায়ামের অভ্যাস চলিত হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোক এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ইহা খুবই লজ্জার কথা। পৃথিবীতে বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে, যে জাতি দৈহিক শক্তিতে যত বড়, সে জাতির প্রাধান্য তত বেশী। আমরা বাঙালীরা দৈহিক কারণেই অবনত জাতি বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছি। তাই আজ আমরা পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে সর্বত্রই প্রহৃত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও অপমানিত হইতেছি। এই নিন্দার হাত হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় ব্যাপকভাবে নানাবিধ ব্যায়ামের প্রবর্তন ও প্রচার করা।

বাইচ ও দাঁড়টানা এদেশে প্রচলিত ব্যায়ামের মধ্যে সহজসাধ্য ও দেহ গঠনের একান্ত উপযোগী। বর্তমান প্রবন্ধে বাঙলার বাইচ ও দাঁড়টানা সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা এই বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মানুষ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া এই দাঁড়টানা অভ্যাস করিয়াছে। মাটির সহিত মাটির যোগ যেখানে জলের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, মানুষ সেইখানে সাঁতার কাটিয়া—একেলা কিম্বা দল বাঁধিয়া, মালপত্র লইয়া, ভেলা, নৌকা, ডোঙা, শাল্‌তি প্রভৃতির সাহায্যে পুনরায় যোগ সংস্থাপন করিয়াছে। মানুষের স্বভাব এই যে, সে যেমন করিয়া পারে প্রকৃতিকে জয় করিবেই। মানুষ এই প্রয়োজনের বাধ্যবাধকতাকে আজ খেলার আনন্দে পর্যবসিত করিয়াছে। এই প্রয়োজনীয় দাঁড়টানা ব্যাপারটাকেও সে খেলা বা ব্যায়ামের পর্যায়ভুক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সে যুগে দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতের প্রধান পথ ছিল নদী। তখনকার দিনে বাষ্পীয়পোত, স্টীমার বা স্টীমলঞ্চ প্রভৃতি ছিল না। কাজে কাজেই নানা ধরণের নৌকাতেই জলপথগুলি সর্বদাই ভরিয়া থাকিত। নদী বহুল বাঙলাদেশে গ্রামের প্রায় সকল গৃহস্থেরই দুই-একখানি করিয়া ডোঙা ডিঙ্গি, অথবা পান্‌সী-নৌকা থাকিত। বাড়ির ছেলে-মেয়েরাই দাঁড় টানিত, হাল ধরিত। দাঁড়-টানার গুণে তাহাদের বাহুর মাংসপেশীগুলি লোহার মত শক্ত হইত। বুক কচ্ছপের পিঠের ন্যায় মজবুত হইত। তাহারা স্বাস্থ্যবান ও নির্ভীক ছিল; ঢেউয়ের গর্জন শুনিয়া মূর্ছা যাইত না; তাহারা ঝড়তুফানের সঙ্গে লড়াই করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইত না। নদীর মাঝখানে কুমীর দেখিয়া কাঁদিয়া ককাইয়া উঠিত না। হায়! সে বীর্যবান স্বাস্থ্যবান বাঙালী সন্তানেরা আজ কোথায়!—"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।—আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগেরি মাথায় নাচি।"—এ কি শুধু কাব্যেই রহিয়া গেল!

তখনকার দিনে নৌকার আকার-প্রকার বহু রকমের ছিল। গলুইয়ে কত রকমের কারুকার্য, পালে কত রং কত নক্সার বাহার থাকিত! কত বিচিত্র নাম! এক এক নৌকায় বারো দাঁড়, পঁচিশ দাঁড়, পঞ্চাশ দাঁড়, একশো দাঁড় পর্যন্ত ব্যবহার করা হইত। ডাকাতেরা সরু সরু লম্বা 'ছিপ' ব্যবহার করিত। যোদ্ধারা 'কোষা' ব্যবহার করিত। অভিজাত সম্প্রদায়েরা 'বজরা' বা 'ভাউলে' প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। সেই সকল নদীগামী ও সমুদ্রগামী নৌকাগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। যে নৌকাগুলি নদীবক্ষে ব্যবহার করা হইত তাহাদের 'ক্ষুদ্র' 'মধ্যমা' 'ভীমা' 'চপলা' 'মন্থরা' এবং যেগুলি সমুদ্রগামী ছিল তাহাদের 'দীর্ঘিকা' 'তরণী' 'গামিনী' 'প্লাবেনী' ও 'ধারিণী' বলা হইত। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগরের সপ্তডিঙ্গা 'মধুকর' হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী-চৌধুরাণীতে বাঙলার 'বজরা' 'ছিপ' ও

তাহার দাঁড়ি-মাঝি বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। সে কাহিনী রোমাঞ্চকর হইলেও অসম্ভব নহে। যথাঃ—

"প্রথমে তুলিল ডিঙা নাম মধুকর।
সুবর্ণে নির্ম্মান সে ডিঙ্গার ছৈ-ঘর॥
আর ডিঙ্গা তোলে তার নাম দুর্গাধর।
আখণ্ডল প্রায় তাহে বৈসে সদাগর॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম শঙ্খচূড়।
আশী গজ জল ভাঙ্গে গাঙ্গের দর কূল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে চন্দ্রপান।
যাতে ভরা দিলে হয় দুকূল সমান॥
আর ডিঙ্গাখান তুলে নাম ছোটমুঠী।
সেই নায়ে ভরা চাল বায়াম্ন পউটি॥
আর ডিঙ্গাখান তুলে নাম শুয়োরেখী।
দুপুরের পথ যায় মালুমে কাঠ দেখি॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে নাটশালা।
তাহাতে দেখয়ে সবে গাবরের মালা॥"

আর একটি স্থলে পাইঃ—

প্রথমে করিল সজ্জ দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ
আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ
মকর আকার মাথা, গজমুক্তার বাতা
মানিকে করিল চক্ষুদান।
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর মাঝখানে ছইঘর
পাশে গড়া বসিতে গাবর
দুসারি বসিতে পাট উপরে মালুমে কাঠ
পাছে গড়ে মানিক ভান্ডার।
গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী নামে যার গুয়োরেখী,
আর ডিঙ্গা নামে রণজয়
অপরূপ রূপ সীমা গড়ে ডিঙ্গা নরভীমা
গড়িল পঞ্চম মহাকায়।
গড়ে ডিঙ্গা সর্ব্বধারা হীরামুখী চন্দ্রকরা
আর ডিঙ্গা নামে নাটশালা,
বাছিয়া কাঁঠাল শাল গড়ে দণ্ড কেরোয়াল
ডিঙ্গা শিরে বান্ধিল মড়েলা"

—মকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

এই সমুদ্রগামী নৌকাগুলি বৃহৎ বৃহৎ পাল এবং মাস্তুলযুক্ত ছিল। কোন কোন নৌকায় চার পাঁচটি পর্যন্ত পাল ও মাস্তুল থাকিত। ঐ নৌকাগুলি এরূপ কৌশলে দুই তিন স্তর তক্তা দিয়া নির্মিত ছিল যে, সমুদ্রের প্রচণ্ড ঝড়-তুফান ইহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিত না। যদি কোন অংশ অকস্মাৎ ভাঙিয়া যাইত, তবে অপর অংশের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো সম্ভবপর হইত। সমুদ্রগামী এই সকল নৌকার কক্ষের সমাবেশ অনুসারে তাহাদিগকে 'সর্ব্বমন্দিরা' 'মধ্যমন্দিরা' ও 'অগ্রমন্দিরা' বলা হইত। শেষোক্ত নৌকাগুলি সাধারণত গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে যাতায়াত করিত। এই সকল নৌকাতে প্রায় দেড় হাজার হইতে দুই হাজার পর্যন্ত লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত। সাঁচী স্তূপের ভাস্কর্যের মধ্যে এবং অজন্তা গুহার প্রাচীরচিত্রে এতদ্দেশীয় নৌ-শিল্পের অনেক নিদর্শন আছে। ঐ সকল চিত্র হইতে সেযুগের নৌ-শিল্প যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

সে যুগের বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের ও সৎসাহসের কত কাহিনী ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাঙালী বৌদ্ধ-ধর্ম-প্রচারকেরা, ঐ ধর্ম প্রচারকল্পে সুদূর চীন, জাপান, কোরিয়া ও তৎসংলগ্ন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে যে গমন করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অতীশ-দীপাঙ্কর, শীলভদ্র প্রমুখ যে সমস্ত বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম প্রচারক বাঙালী পন্ডিতগণের অসাধারণ পান্ডিত্য এবং যশোগৌরব একদিন বৌদ্ধজগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল —তাঁহাদের কীর্তি-কাহিনী সমুদ্রপথেই পূর্ব এসিয়ার এই সব দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। জাপানে 'হোরিজু' নামক পরম পবিত্র মন্দিরে প্রাচীন জাপানী পুরোহিতগণের যে সকল ধর্মোপদেশ রক্ষিত আছে, তাহার কতক অংশ একাদশ শতাব্দীর বাঙলা অক্ষরে লিখিত। যবদ্বীপের 'বরবুদর' মন্দিরে যে সকল ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখিতে পাই, তাহাতে এই বাঙলাদেশের কলাশিল্পীর হস্ত-পরিচয় অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্দির গাত্রে যে সকল কারুকার্য, শিল্প-চাতুর্য এবং রসবৈচিত্র্যের আদর্শ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এক সময় এই বাঙলাদেশের অধিবাসীরা সুন্দর সুন্দর নৌকা নির্মাণ করিয়া এবং সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া দক্ষিণে সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কবি বলিতেছেনঃ—

"এক ছেলে তোর পেরিয়ে সাগর
পেঁছে সুদূর 'সুমাত্রা'য়,
তারার আঙুলে দেখিয়ে দিত পথ।
পণ্য বোঝাই কিস্তিগুলি
দুলত ঢেউ-এর দোল-দোলায়
হাজার দাঁড়ি গাইত 'সারি' গৎ!"

বন্দনা—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনসামঙ্গলের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বলিতেছেনঃ—

"যখন বাণিজ্যে যায় চান্দ সদাগর।
পাঁচ মাস গর্ভে তখন বালা লখিন্দর॥
সনকারে ডাক্যে চান্দ বলেন আপনে।
সাবধান হয়ে তুমি থাকহ ভুবনে॥
সিংহলের মুখে সাধু চলে শীঘ্র গতি।
বাহ বাহ বলে নৌকা কিবা দিবারাতি॥
ছয় পুত্র লয়ে চান্দ শীঘ্র গতি চলে।
উপনীত হইল গিয়ে পাটন সিংহলে॥
নৌকা লাগাইল সাধু সমুদ্র কিনারে।
মনের কৌতুকে সাধু নামিল সত্বরে॥"

আকবর বাদশাহের সময়ে বাঙলাদেশে বিশেষত পূর্ববঙ্গে নৌ-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় স্বাধীন ভুঁইয়ারা ধীরে ধীরে সকলের অজ্ঞাতসারে একটি বিরাট নৌবহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যে সময়ে মোগল সেনাপতি মানসিংহ ঢাকায় রাজকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন সে সময় 'শ্রীপুরে,' 'বাকলা' ও 'চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বাঙালীর নৌবহর নির্মাণ কার্য পুরোদমে চলিতেছিল। শ্রীপুরের ভুঁইয়া কেদার রায় ঐ নৌবহর গঠন কার্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক রণতরী তাঁহার পোত নির্মাণশালায় সর্বদাই প্রস্তুত রাখিতেন। কথিত আছে যে, তিনি ঐ রণতরীর সাহায্যে ১৬০২ খৃঃ অঃ মোগলদের হস্ত হইতে 'সন্দ্বীপ' উদ্ধার করিয়া ঐ দ্বীপের শাসনভার পর্তুগীজ 'কার্ভালো' সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। কেদার রায়কে বহুবার প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠকগণ এ বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন। রাজা মানসিংহ বাঙালী ভুঁইয়াদের স্বাধীনতা হরণ এবং ক্ষমতা চূর্ণ করিবার জন্য কি পর্যন্ত না চেষ্টা করিয়াছিলেন! সেই উদ্দেশ্যে তিনি মান্দারায়কে একশত রণতরী দিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। অপর দিকে কেদার রায় পাঁচশত রণতরী লইয়া 'যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি' রবে মান্দারায়কে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কেদার রায়ের ভাগ্যদেবী বিমুখ ছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি এক জ্বলন্ত গোলার আঘাতে আহত হইয়া অল্পকালের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। অধিনায়ক বিহনে কেদার রায়ের নৌবহর পর্যুদস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। হায়! আজ সে রামও নাই আর সে অযোধ্যাও নাই! বাঙালী আজ সর্বহারা! লক্ষ্মীছাড়া! আজ আমাদের হস্তে রণতরী তো দূরের কথা, সে রকম একখানি জেলে ডিঙি পর্যন্ত নাই!

এই প্রসঙ্গে বাঙলার আরও দুই একজন স্বাধীন ভুঁইয়ার কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। একজন রাজা প্রতাপাদিত্য রায় আর একজন রাজা রামচন্দ্র রায়। বাকলার পোত-নির্মাণশালার প্রতিষ্ঠা শেষোক্ত ব্যক্তির অক্ষয় কীর্তি। সে যুগে সে পোত-নির্মাণশালা এবং বাঙালীর বিরাট নৌবহরের কথা বাঙলার তথা ভারতের সর্বত্রই একটা বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। রামচন্দ্রের পুত্র কীর্তিনারায়ণও পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি বীর্যবান জলযুদ্ধবিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বংশের মর্যাদা এতটুকু ম্লান হইতে দেন নাই। তিনি বাঙলাদেশ হইতে ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে সকল ফিরিঙ্গি মেঘনার উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেছিল, তিনি তাহাদের সে স্থান হইতে সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ও বাঙালী নৌ যুদ্ধচাতুর্যের যথেষ্ট পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

তিনি 'সাগরদ্বীপ' বা 'চ্যাণ্ডিক্যানে' নৌ যুদ্ধের উপযোগী পোতসকল সর্বদাই সুসজ্জিত রাখিতেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে সৈন্যেরাই রণতরী নির্মাণ কার্য এবং জল-যুদ্ধে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। 'দুধালি,' 'জাহাজঘাটা,' 'চাকসিরি'তে রাজা প্রতাপাদিত্য নৌ নির্মাণের স্থান ও ঘাঁটি স্থাপন করিয়া শত শত সমুদ্রগামী নৌকা নির্মাণ এবং মেরামত করাইতেন। দেবী-চৌধুরাণীর 'বজরা' বা 'ছিপ'এর কথা কাহারও অবিদিত নাই; সুতরাং এতদ্-সম্পর্কে বেশী কথা বলিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। এখন আধুনিক কালের কথায় ফিরিয়া আসা যাউক।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, কলিকাতার উপ-কণ্ঠের বাইচ-সঙ্ঘগুলির মধ্যে চাতরা, উত্তরপাড়া, বরাহনগর স্পোর্টিং প্রভৃতি সঙ্ঘগুলি বাইচের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করে। বরাহনগর স্পোর্টিং-এর বয়স-কাল অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ইহা ১৯০২ খৃঃ অঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই বৎসরই সমিতির সদস্যেরা উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত 'এন হালদার কাপ' এবং 'হালদার ফ্ল্যাগ কমপিটিশন' জয় করেন। ইঁহারা ফ্ল্যাগ কমপিটিশনে ১ মিঃ—৫৫ সেঃ সময়ের মধ্যে ভাগীরথীর আড়পার অতিক্রম করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। বলা বাহুল্য সেই দিন হইতে সমিতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এতদ্ব্যতীত ইঁহারা কয়েকবার 'লীগ' ও 'শীল্ড' জয় করেন। ১৯০২ খৃঃ অঃ-র পূর্বে বরানগরের যে পুরাতন বাইচ-সঙ্ঘ ছিল, তাহার সভ্যেরাও চন্দননগরে হিন্দুমেলার প্রবর্তিত বাইচ-প্রতিযোগিতায় 'চ্যাম্পিয়ান' হন। সেই প্রতি-যোগিতায় স্বর্গীয় স্বপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে পেণ্টু গাঙ্গুলী হাল ধরিয়াছিলেন। মিঃ কটনের পৌরোহিত্যে কাশীপুর হইতে উত্তরপাড়া পর্যন্ত যে দীর্ঘপথ বাইচ-প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেও বরানগর স্পোর্টিং জয়লাভ করে। ঐ প্রতিযোগিতায় স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল দাঁ মহাশয়ের প্রদত্ত রজত-নির্মিত একখানি নৌকা পারিতোষিক স্বরূপ বরানগর স্পোর্টিং পায়। সে সময় সমিতির যে-সকল অবৈতনিক 'হালী' ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সতীশবাবুর আবার 'দাঁড়ি' হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি আছে। বরানগর পল্লীতে বরানগর স্পোর্টিং ছাড়া বেনেটোলা, কুটীঘাট প্রভৃতি আরও দুই-তিনটি বাইচ-সঙ্ঘ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

উত্তরপাড়া লীগ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম

১৯১৭	এমারল্ড স্পোর্টিং ক্লাব
১৮	আড়িয়াদহ রোয়িং ,,
১৯	লক্ষ্মীনারায়ণ ,, ,,
২০	আড়িয়াদহ রোয়িং ক্লাব
২১	লক্ষ্মীনারায়ণ রোয়িং ক্লাব
২২	লক্ষ্মীনারায়ণ রোয়িং ক্লাব
২৩	খেলা হয় নাই
২৪	বরানগর স্পোর্টিং ,,
২৫	লক্ষ্মীনারায়ণ রোয়িং ,,
২৬	আড়িয়াদহ ,, ,,
২৭	আড়িয়াদহ ,, ,,
২৮	লক্ষ্মীনারায়ণ ,, ,,
২৯	আগড়পাড়া বয়েজ ইউনিয়ন
৩০	লক্ষ্মীনারায়ণ রোয়িং ক্লাব
৩১	বালী রাধানাথ রোয়িং ,,
৩২	খেলা হয় নাই
৩৩	খেলা হয় নাই
৩৪	খেলা হয় নাই
৩৫	চাতরা ,, ,,
৩৬	বরানগর ,, ,,
৩৭	বেনিয়াটোলা ,, ,, (কলিকাতা)
৩৮	লক্ষ্মীনারায়ণ রোয়িং ক্লাব

এক সময় এ দেশের যুবকদের মধ্যে বীরত্বসূচক ব্যায়ামের চর্চা যে দেশের সর্বত্রই অনুশীলিত হইত, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আমরা পাই। উত্তরপাড়া, বালী ও বরাহনগরের যুবকদের আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়া কোন্নগরের যুবকেরা ১৮৬০ খৃঃ অঃ "কোন্নগর-বাইচ এসোসিয়েশন"-এর প্রতিষ্ঠা করেন। সন্তরণবিশারদ স্বর্গীয় ললিতমোহন বসু মহাশয় কতকগুলি স্থানীয় উৎসাহী যুবকের সহায়তায় মহা আড়ম্বরের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। ভাগীরথীর উপকূলস্থ কোন্নগরের দ্বাদশ মন্দিরের ঘাট সেই দিন স্থানীয় যুবক-বৃন্দের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ললিতবাবুর অক্লান্ত উদ্যম এবং আন্তরিক চেষ্টায় বাইচ খেলা কোন্নগর এবং কোন্নগরের উপকণ্ঠের পার্শ্ববর্তী গ্রাম-সমূহের তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। তরুণেরা উদ্বুদ্ধ হইয়া দলে দলে সেই দেশীয় বীরত্বসূচক জলক্রীড়ায় যোগদান করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, উঁহাদের আদর্শে প্রবুদ্ধ হইয়া বালী, আড়িয়াদহ, চাঁপদানী ও দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথীর কূলে কূলে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। ঐ যজ্ঞের ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সত্যপ্রসন্ন (?) তিনি একাকীই অগ্নিহোত্রী হইয়া ঋত্বিকের কর্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। সে কি উৎসাহ! সে কি অধ্যবসায়। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ব্যয়ভার সত্যপ্রসন্নবাবু এবং সমিতির কোন কোন সদস্য হাসিমুখে বহন করিতেন। যেখানেই অভাব-অনটন প্রকট হইত, সেইখানেই সত্য-প্রসন্নবাবু মুক্তহস্তে তাহা পূরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

যতদূর জানা যায় যে, খাস কোন্নগরে কোন বাইচ-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নাই। যত কিছু অনুষ্ঠান-আয়োজন সে সময় বালীতেই সংঘটিত হইত। কোন্নগরের দাঁড়ি-মাঝিরা সকলেই বালীতে গিয়া স্ব স্ব সঙ্ঘের শক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেন। ঐ প্রতিযোগিতায় 'কোন্নগর-বাইচ-এসো-সিয়েশন' বহুবার নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। সে সময় বালীতে নিছক বাইচ প্রতিযোগিতা ছাড়াও অন্যান্য স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়ামের চর্চা পল্লীর সর্বত্রই অনুশীলিত হইত। স্বাস্থ্যরক্ষা করা, শরীরের বল বৃদ্ধি করা এবং সেই বল সৎকার্যে ব্যয়িত করা তখনকার দিনে বাঙলার তরুণদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। তখনকার দিনে যুবকেরা মানুষের কোন বিপদে, "দাদা মার—পালিয়ে আয়" বলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন না। আবশ্যক হইলে তাঁহারা সৎকার্যের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একালে যে যুবকদের এরূপ সৎসাহস নাই, তাহা অস্বীকার করি না। তবে তাহাতে একটু লোকদেখানো আতিশয্যের প্রাবল্যই বেশী, অর্থাৎ এখন আমরা যাহা কিছু করি, তাহা একটু ঘটা করিয়া করি।

এই প্রসঙ্গে আমরা কোন্নগরের বাইচ-সঙ্ঘের সভ্যদের একটি সৎসাহসের পরিচয় এখানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রসঙ্গটি এই যে, একদিন রাত্রের নিবিড় অন্ধকারে দুইখানি চাউল বোঝাই বৃহৎ 'কিস্তি' চাঁপদানীর সম্মুখে ভাগীরথীর মাঝখান দিয়া যাইতেছিল। এমন সময় অকস্মাৎ একদল ডাকাত সেই 'কিস্তি' আক্রমণ করিয়া চাউল লুণ্ঠন করিয়া পলাইতে চেষ্টা করে। মুহূর্তের মধ্যে এ সংবাদ কোন্নগরের বাইচ-সঙ্ঘের যুবকদের কর্ণগোচর হয়। তখন তাঁহারা দ্বাদশ মন্দিরের ঘাটে জটলা করিতেছিলেন। মাঝি-দের আর্তনাদে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ দুই-তিনখানি পানসী জলে ভাসাইয়া ঘটনাস্থলে ছুটিয়া গেলেন এবং ডাকাতদের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া কয়েকজন নিমজ্জমান

আহত মাঝিকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঘাটের আরও নৌকা আসিয়া জড় হইল। ডাকাতেরা বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন বাইচ-সঙ্ঘের সভ্যদের হাতে দস্তুর মত নিগৃহীত হইয়া ধরা পড়িল। এই বীরোচিত সৎ-সাহসে মুগ্ধ হইয়া সরকার বাহাদুর সমিতির যুবকদের পুরস্কৃত করিলেন। সে আজ পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বের কথা।

"কোন্নগর-বাইচ-এসোসিয়েশন" ১৮৬০ খৃঃ অঃ হইতে ১৯০০ খৃঃ অঃ পর্যন্ত এই চল্লিশ বৎসর টিঁকিয়া ছিল। কিন্তু উৎসাহী কর্মিবৃন্দের অভাবে সমিতির কার্যতৎপরতা কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়। ১৯০৪ খৃঃ অঃ হইতে ১৯১৭ খৃঃ অঃ পর্যন্ত সমিতির কার্যাবলী আবার পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। হরিশ মিত্র, ক্ষেত্র ঘোষাল, মতি চট্টোপাধ্যায়, নবীন মিত্র, মোহিত দেব, চুণী গঙ্গোপাধ্যায়, ধনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ সদস্যেরা সেকালে দাঁড়ি ও হালী হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তি সমিতির উন্নতিকল্পে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে সমিতির মৃত্যু ঘটিল। ১৯১৮ খৃঃ অঃ হইতে 'কোন্নগর-বাইচ-এসোসিয়েশনের' নাম চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। এইখানেই বাঙালীর সমিতি-জীবন সুপ্রকট হইয়া উঠিল। ইহাই আমাদের জাতীয়-চরিত্র! এ কলঙ্ক কি আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারিব না! 'আমি' বাদ দিয়া 'আমরা' বলিতে শিখিব না! 'জাত' বা 'দল' বাদ দিয়া 'জাতি' বলিতে শিখিব না!

* * * * *

আমরা ডাঙার মানুষ হইলেও জলের সহিত আমাদের চিরদিনের সম্পর্ক। জলকে আমরা ছাড়িতে পারি না। পৃথিবীতে এমন কত লোক আছে, যাহাদের জীবনের বেশীর ভাগ সময় জলের উপরেই নানা বিপদ-আপদের মধ্যে কাটাইতে হয় এবং জলের দৌলতেই নিজেদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে হয়। এই দাঁড়-ধরা বা হাল-ধরা জানা থাকিলে, জলে বিপদের সময় যে কত কাজে লাগে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাতে শুধু যে স্বাস্থ্য-লাভ হয় তাহা নহে, বিপদের সময় শক্তি ও সাহস পাওয়া যায়। পরকে বাঁচাইবার জন্য, বিপন্ন ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য, বাঙলার যুবকদের এই বিদ্যা আয়ত্ত করা উচিত। কলিকাতা এবং ভাগীরথীর কূলে কূলে শহর ও গ্রামগুলিতে এই জন্য শত শত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। সেখানে রীতিমত শিক্ষক রাখিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে দাঁড়-টানা ও হাল-ধরা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, অন্যদিকে শত শত আর্তের রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। আমাদের দেশে বর্তমান যুগে নানা অস্বাভাবিক কারণে আমাদের সমাজ-শৃঙ্খলার যে অব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে—সিনেমা, থিয়েটার, নাচগান, জলসার উন্মাদ মাতামাতিতে, যাহার ভয়াবহ প্রকাশ আমরা প্রতিদিন স্বচক্ষে দেখিতেছি, স্বাস্থ্য-চর্চা সুপ্রচারিত হইলে এই উদ্দামতা অনেকটা প্রশমিত হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আশা করি, আমরা দাঁড়-টানা ও হাল-ধরার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছি। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই কামনা করি যে, বাঙলা দেশে—এই জলের দেশে তরুণেরা দাঁড় টানিতে ও হাল ধরিতে শিক্ষা করিবে।

শঙ্করের বিবাহ—

(১৬৭ পৃষ্ঠার পর)

—যাহা আমার কুতুব-ভ্রমণের সমস্ত সিঁড়ি-পথটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে নমিতা, শঙ্করের জন্যই এ সংসারে আসিয়াছে। তবুও ভাবিলাম তাহার কথার ভঙ্গি, তন্ময় হইয়া ভাবিলাম। কিন্তু আর নয়, হোক এ-বিয়ে শঙ্করেরই সঙ্গে। মাসীমাদের কাছে পরদিন যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, তাহার মর্মানুবাদ দিলামঃ—

"শঙ্করের এ বিবাহ হবে নিশ্চয়ই, বাঙলা দেশে ওদের দেশের বাড়িতে হবে—স্থির করা হোল; পরেশ।"

চাকুরী, ইণ্টারভিউ—সমস্ত চিন্তা হইতে দূরে যাহা আমার মনটা গভীরভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল—তাহা হইতেছে আমার বন্ধু নমিতা ও শঙ্করের সঙ্গে তাহার বিবাহে আমার দায়িত্ব।

বিদুষী ভার্য্যা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৮

ব্রিজবিহারী সিং যে বেঞ্চে বসিয়াছিল, তাহার উপর উপবেশন করিয়া গার্ড অবিলম্বে দিবাকরের বহু-আশঙ্কিত অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিল।

নোট বুক খুলিয়া দিবাকরের নাম, ধাম, ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া তীক্ষ্ণনেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"When there was no accident, what made you pull the chain?" (দুর্ঘটনাই যখন ঘটেনি, তখন কিজন্য আপনি চেন টেনেছিলেন?)

রামভরোখার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দিবাকর বলিল,—

"That servant made" (ঐ চাকরটা করিয়েছিল।) তাহার পর ব্রিজবিহারী সিংকে দেখাইয়া বলিল,—

"Master of servant" (চাকরের মনিব।)

যতটা শোচনীয়ভাবে দিবাকর ইংরেজি বলিতেছিল, হয়ত তাহার ইংরেজি ভাষার জ্ঞান ঠিক ততটা শোচনীয়ই ছিল না। ইংরেজি ভাষার জ্ঞান এক বস্তু, এবং ইংরেজি বলিবার শক্তি অন্য বস্তু। কেবলমাত্র উপদেশগত জ্ঞান লইয়া সন্তরণে অনভ্যস্ত ব্যক্তি অকস্মাৎ জলে পড়িলে যে অবস্থা হয়, দিবাকরেরও কতকটা সেই অবস্থা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, যূথিকার উপস্থিতি তাহার বিমূঢ়তাকে আরও খানিকটা বাড়াইয়া দিয়াছিল। যূথিকার অসাক্ষাতে ব্যাপারটা ঘটিলে হয়ত ঐ ইংরেজ গার্ডেরই সহিত সে আর একটু ভাল ইংরেজি বলিতে পারিত। অক্ষমতাপ্রসূত সঙ্কোচ মানুষকে আরও অক্ষম করিয়া তোলে।

গার্ড বলিল,—"What did that servant do?" (চাকরটা কি করেছিল?)

দিবাকর বলিল,—"That servant told me his master fell" (চাকরটা আমাকে বলেছিল তার মনিব পড়ে গেছে।) বলিয়া জানালার দিকে দুই হস্ত ঘুরাইয়া পড়িয়া যাইবার সঙ্কেত করিল।

"Then?" (তারপর?)

"Then I pulled chain." (তারপর আমি চেন টানলাম।)

"But, as a matter of fact, the gentleman was safe in the compartment?" (কিন্তু বস্তুত, ভদ্রলোকটি নিরাপদে কামরার মধ্যে ছিলেন?)

মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল,—"Not compartment, bathroom." (কামরায় নয়, বাথরুমে।)

গার্ড বলিল,—"And you pulled the chain without looking into the bathroom?" (আর আপনি বাথরুম না দেখে চেন টেনেছিলেন?)

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দিবাকর বলিল,—

"Yes. But where time? No time." (হ্যাঁ, কিন্তু সময় কোথায়? সময় ছিল না।)

গার্ড বলিল,—"I am sorry Babu, you have failed to make out a case of exemption." (দুঃখের সঙ্গে বলছি বাবু, আপনি অব্যাহতি পাবার উপযুক্ত যুক্তি দেখাতে পারেন নি।)

উগ্রকণ্ঠে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল,—"What exemption?" (কি অব্যাহতি?)

গার্ড বলিল,—"Exemption from paying the fine. I am afraid, you shall have to pay the penalty." (জরিমানা দেওয়া থেকে অব্যাহতি। আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে জরিমানা দিতে হবে।)

এতক্ষণ ইংরেজিতে কথা কহিয়া দিবাকরের মেজাজ কিছু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; তদ্ভিন্ন, যূথিকার সামনে একজন ইংরেজ গার্ডের সহিত সমানে ইংরেজিতে উত্তর-প্রত্যুত্তর চালাইয়া যূথিকার মনে একটা শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে মনে করিয়া সে বিশেষভাবে উৎসাহিতও বোধ করিতেছিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—

"Never pay! No fault, why pay?" (কখনো দেব না। অপরাধ করিনি, কেন দেব?)

ঈষৎ দৃঢ়কণ্ঠে গার্ড বলিল,—"If you don't pay, I shall be obliged to place the matter in the hands of the Railway Police." (আপনি যদি না দেন তাহ'লে ব্যাপারটা আমি রেলওয়ে পুলিশের হাতে দিতে বাধ্য হব।)

তাচ্ছিল্যের সহিত একদিকে মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল,—

"Place. I don't care." (দেবেন, আমি গ্রাহ্য করিনে।)

নব-পরিণীতা স্ত্রীর কাছে বাহাদুরি দেখাইবার প্রলোভনে দিবাকর এই ভয়-প্রদর্শনও উপেক্ষা করিল বটে, কিন্তু গার্ডের কথার মধ্যে পুলিশ শব্দের উল্লেখ শুনিয়া ব্রিজবিহারী সিং-এর মুখ শুকাইল। প্রত্যক্ষভাবে চেন-টানা অপরাধের সহিত জড়িত না হইলেও অন্তত সাক্ষীরূপে গার্ড তাঁহাকে টানিতে পারে, এ আশঙ্কা তাঁহার হইল; এবং তাহার ফলে যদি তাঁহাকে পুলিশের হস্তে আটকাইয়া পড়িতে হয়, তাহা হইলে জরুরি কার্য তো পণ্ড হইবেই, অধিকন্তু পরিণামে ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াইলে অব্যাহতি লাভের পূর্বে কতটা কর্মভোগ করিতে হইবে, কে জানে!

প্রধানত নিজের বিপন্ন অবস্থা স্মরণ করিয়া ব্রিজবিহারী সিং দিবাকরের অব্যাহতির জন্য সকাতর অনুরোধের দ্বারা গার্ডকে চাপিয়া ধরিলেন। চোস্ত উর্দু ভাষায় দিবাকরের অপরাধ ক্ষালনের সপক্ষে ক্ষণকাল নানাপ্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া অবশেষে দিবাকরের হইয়া সনির্বন্ধে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

মাথা নাড়িয়া গার্ড জানাইল, ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ক্ষমা লাভের উপযুক্ত নহে, সুতরাং সে নিরুপায়।

গার্ডের কথা শুনিয়া দিবাকর কতকটা নিজের মনে গজ গজ করিতে লাগিল,—

"Astonishment! I thought he fell, so pulled chain. Still not pardon! If this not pardon, then what pardon let me hear?" (আশ্চর্য! আমি মনে করেছিলাম উনি পড়ে গেছেন, তাই চেন টেনেছিলাম, তবু

ক্ষমা নেই! এতে যদি ক্ষমা না থাকে তাহলে কিসে আছে শুনি?)

কি মনে করিয়া বলা কঠিন, হয়ত বা দিবাকরের অনিপুণ ইংরেজির জন্যই তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া, গার্ড বলিল,—

"Look here Babu, you just make a statement of your case in writing, and sign it. I shall see if I can do anything for you." (শুনুন বাবু, আপনি আপনার ঘটনার একটা বিবরণ লিখে সই করে আমাকে দিন। দেখি, আপনার জন্যে যদি কিছু করতে পারি।)

গার্ডের কঠিন মন ঈষৎ দ্রবীভূত হইয়াছে বুঝিয়া দিবাকর প্রথমে আনন্দিত হইল, কিন্তু ঘটনার বিবরণ লিখিয়া দিবার প্রস্তাবের কথা স্মরণ করিয়া দুশ্চিন্তায় সেটুকু আনন্দ অপসৃত হইতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না। ভুল ইংরেজি বলার একটা সুবিধা এই যে, শব্দের পক্ষ বিস্তার করিয়া সে ভুল মহাব্যোমের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশাইয়া যায়; কিন্তু কাগজের উপর লিখিত ভুল মসীর কলঙ্কে পাকা হইয়া লেখকের অক্ষমতার সাক্ষীস্বরূপ সুদীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। তাছাড়া, দুই চারিটা শব্দ অবৈয়াকরণসূত্রে গাঁথিয়া হয়ত'-বা কোনো প্রকারে সংক্ষেপে কথা কওয়া চলে; কিন্তু লিখিত বাক্যের ক্রিয়া-কারক-বিভক্তির অপরিহার্য নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে সে সংক্ষিপ্ততার সুযোগ দুর্লভ।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দিবাকর কতকটা অনুনয়ের স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল,—

"What necessity of I writing? I don't write. You know all, you write." (আমার লিখবার দরকার কি? আমি লিখব না। আপনি সব জানেন, আপনি লিখে নিন।)

মাথা নাড়িয়া গার্ড বলিল,—

"My writing won't do Sir, you shall have to write." (আমার লিখলে চলবে না মশায়, আপনাকে লিখতে হবে।)

"Please Mr. Guard!" (গার্ড মহাশয়!)

সুমিষ্ট তরল কণ্ঠের সুস্পষ্ট নির্ভুল উচ্চারণে চকিত হইয়া গার্ড, দিবাকর এবং ব্রিজবিহারী সিং তিনজনেই একত্রে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

বিনীত উৎসুক কণ্ঠে গার্ড বলিল, "Yes madam"? (বলুন ম্যাডাম?)

যূথিকা বলিল,—

"Suppose, I write out the statement on behalf of my husband, and he signs it,"—won't that do?" (ধরুন, আমি যদি আমার স্বামীর হয়ে বিবরণটা লিখে দিই, আর তিনি সই করেন,—তাহলে হবে না কি?)

উৎফুল্লমুখে গার্ড বলিল,—

"Certainly that will do madam." (নিশ্চয় হবে ম্যাডাম।)

যূথিকা বলিল,—

"Thank you very much. Wait a moment please, I shall do it forthwith. (বহু ধন্যবাদ! অনুগ্রহ করে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। এক্ষুণি করে দিচ্ছি।)

আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যূথিকা বাঙ্কের উপর হইতে একটা য়্যাটাশে-কেস পাড়িল। তৎপরে তাহার ভিতর হইতে লিখিবার প্যাড ও কলম বাহির করিয়া পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে এবং তদনুরূপ পরিচ্ছন্ন ভাষায় সমস্ত ঘটনার একটি পরিপূর্ণ বিবৃতি লিখিয়া পরিশেষে বর্তমান ক্ষেত্রে চেন-টানার অপপ্রয়োগের দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের সপক্ষে অকাট্য যুক্তি-তর্ক স্থাপিত করিল।

উঠিয়া গিয়া দুই পৃষ্ঠা বিবরণী দিবাকরের হস্তে দিয়া যূথিকা বলিল, "হয়েছে কি-না পড়ে দেখ।"

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে যূথিকার লেখার উপর দৃষ্টি রাখিয়া রুদ্ধগভীর স্বরে দিবাকর বলিল, "হয়েছে।" সত্যসত্যই সে কিছু পড়িল কি-না, তাহা ভগবানই বলিতে পারেন।

কলমটা দিবাকরের হস্তে দিয়া যূথিকা বলিল, "এখানে একটা সই করে দাও।"

সই করিয়া দিয়া দিবাকর কলম এবং কৈফিয়ৎ যূথিকাকে প্রত্যর্পণ করিল।

লিখিত কৈফিয়ৎটা গার্ডের হস্তে প্রদান করিয়া যূথিকা বলিল,—

"I hope this will be sufficient?" (আশা করি, এই যথেষ্ট হবে।)

মনোযোগ সহকারে সমস্তটা পড়িয়া উৎফুল্ল মুখে গার্ড বলিল,—

"Yes madam, this is quite sufficient. You have put your case very nicely, and your argument seems to be extremely convincing." (হ্যাঁ, ম্যাডাম, এ নিশ্চয় যথেষ্ট হয়েছে। আপনি ভারি চমৎকারভাবে আপনার কেস্‌টি বিবৃত করেছেন, আর আপনার যুক্তি-বিচার খুব জোরালো হয়েছে।)

তাহার পর কাগজ দুইটা ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া বলিল,—

"I can almost assure you that there won't be any further trouble." (আমি বোধহয় আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, আর কোনো গোলযোগ হবে না।)

"Thank you Mr. Guard."

সুমিষ্ট কণ্ঠে যূথিকা বলিল, (ধন্যবাদ মিস্টার গার্ড।) তাহার পর কলম ও লিখিবার প্যাড য়্যাটাশে-কেসে তুলিয়া রাখিয়া বাহিরের অস্পষ্ট চলমান দৃশ্যাবলীর দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

যূথিকা যে একটা বিশেষ রকম সুবিধা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ব্রিজবিহারী সিং ইংরেজি না জানিয়াও অনুমানে তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইংরেজি ভাষায় দুই-চারটা সম্ভবত মামুলি কথার প্রয়োগে যূথিকা যে কঠিন প্রস্তর অনায়াসে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে গলাইল,—মনে পড়িল, কিছু পূর্বে মার্জিত উর্দু ভাষার সুনির্বাচিত শব্দনিচয়ের প্রভাবে তিনি তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। যথেষ্ট পুলকিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত বাণীর মর্মার্থ সর্বান্তঃকরণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রিজবিহারী মনে মনে বলিলেন, সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই!

লুধিয়ানায় গাড়ি আসিয়া থামিতেই গার্ড নামিয়া গেল। যাইবার সময়ে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,

"Good-bye madam." (নমস্কার ম্যাডাম।)

যূথিকা বলিল, "Good-bye." (নমস্কার!)

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া গাড়ির গাত্র সংলগ্ন রিজার্ভ কার্ড লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া গার্ড যূথিকাকে জিজ্ঞাসা করিল

"Travelling up to Howrah, I think?" (হাওড়া পর্যন্ত যাচ্ছেন মনে করতে পারি?)

যূথিকা বলিল,—

"Yes, right up to Howrah." (হ্যাঁ, একেবারে হাওড়া পর্যন্ত।)

গার্ড বলিল, "গুড-বাই।"

যূথিকা বলিল, "গুড-বাই।"

কুলির মাথায় সুটকেস ও হোল্ড-অল চাপাইয়া ব্রিজবিহারী সিং দিবাকরের

হাতে একটা ছাপা কার্ড দিয়া বলিলেন, "এই কার্ডে হামার লুধিয়ানার 'পতা' আছে বাবুজি, যদি দণ্ড লাগে তো হামাকে জরুর জানাবেন। লেকিন মালুম হচ্ছে, মাঈর হিকমতে হামলোক দণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে গেছি। আপনি আর হামি কুছু করতে পারলাম না বাবুজি, লেকিন মাঈ বেফিকির করে দিলেন। মাঈর দেহে ভগবতীর অংশ আছে বাবুজি, মাঈ শক্তির ভাণ্ডার আছেন।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। তৎপরে পুনরায় বলিলেন, "সিবায় উসকে আওর ভি বাৎ আছে। হামি তো ইংরেজি সমজি না বাবুজি, তবভি মালুম হোয়, আপসে মাঈ ইংরেজীভি জাস্তি বোলে'।"

দিবাকর কোনো কথার উত্তর না দিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

ব্রিজবিহারী সিং বলিলেন, "আচ্ছা বাবুজি নমস্কার। নমস্কার মাঈ।"

যুক্তকরে যূথিকা বলিল, "নমস্কার সিং জি।"

৯

ব্রিজবিহারী সিং নামিয়া গেলে দরজায় চাবি দিয়া একটা এণ্ডির চাদরে দেহ আকণ্ঠ আবৃত করিয়া দিবাকর শুইয়া পড়িল। ক্ষণকাল হইতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বায়ু শীতল হইয়াছিল, শুধু সেই জন্যই সে চাদর ঢাকা দিল তাহা মনে করিলে ভুল করা হইবে।

গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত যূথিকা নীরবে বসিয়াছিল। গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইতেই নিজের বেঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া দিবাকরের পাশে একটু স্থান করিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "উঃ! বাঁচলাম! মনের ভেতর থেকে একটা ভার বেরিয়ে গেল!" তাহার পর বাম হস্ত দিয়া দিবাকরের দক্ষিণ স্কন্ধ ঈষৎ নাড়িয়া বলিল, "ওঠ।"

কোন কথা না বলিয়া দিবাকর একটু পাশ ফিরিবার উপক্রম করিল।

পুনরায় দিবাকরকে নাড়া দিয়া যূথিকা বলিল, "শুনছ? উঠে বসো!"

আর একটু পাশ ফিরিয়া গভীর কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এখন আমি ঘুমুবো।"

যূথিকা বলিল, "এখন ত' সাড়ে দশটাও হয়নি, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে কি হবে। উঠে বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

দিবাকর কোনো উত্তর দিল না।

"রাগ করেছ?"

উত্তর নাই।

"ক্ষমা করবে না?"

দিবাকর নিরুত্তর।

এক মুহূর্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "শোনো। উঠবে ত' ওঠ, নইলে আবার তোমাকে চেন টানতে হবে। এবার অবশ্য গার্ডকে জরিমানা দেবার ভয় থাকবে না, কারণ এবার সত্যিসত্যিই একজন প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে লাফিয়ে পড়বে।"

চাদর সরাইয়া দিবাকর গোঁজ হইয়া উঠিয়া বসিল; তাহার পর ভারি গলায় বলিল, "তোমরা সব করতে পার!"

যূথিকা বলিল, "তোমরা কারা? সব মেয়েরাই? না, যেসব মেয়ে পাশ-টাশ করেছে, তারা?"

বিরক্তি-বিরস কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "বলতে পারিনে!"

যূথিকা বলিল, "পার। তুমি বলতে চাচ্ছ, যেসব মেয়েরা পাশ করেছে, তারাই সব করতে পারে। আচ্ছা, তারা যদি সব করতে পারে, তাহ'লে তারা ভালবাসতেও পারে,—স্বামীকেও, স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিকেও; এমন কি, স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি বাদ দিয়ে শুধু স্বামীকেও।"

দিবাকর বলিল, "কিন্তু মুর্খ স্বামীকে নয়।"

যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ, মুর্খ স্বামীকেও। তুমি জান না, পাশ-করা মেয়েরা ভারি সাংঘাতিক দল,—তারা সব করতে পারে।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কী পাশ তুমি করেছ? ম্যাট্রিকুলেশন করেছ?"

যূথিকা বলিল, "করেছি।"

"আই-এ?"

"করেছি।"

"বি-এ?"

"তাও করেছি।"

শুনিয়া দিবাকরের ভ্রুযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ন দৃষ্টি ক্ষণকাল গাড়ির মেঝের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার পর যূথিকার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "আর কিছু করেছ? এম-এ?"

যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ, এম-এ পাশও করেছি।"

চাদরটা একদিকে গুটাইয়া পড়িয়াছিল, দুই হাতে তাহার দুই প্রান্ত টানিয়া লইয়া সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া দিবাকর পুনরায় শুইয়া পড়িল।

ঝুঁকিয়া পড়িয়া দিবাকরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যূথিকা বলিল, "এম-এ পাশ করেছি, তাতে এমন কি ব্যাপার হয়েছে? এম-এ পাশ যখন করেছি, তখন তোমার হিসেবে ত' আমি বাঘ; তোমার ত' বন্দুক আছে, দেশে ফিরে গিয়ে আমাকে গুলী করে মেরো। তারপর কোনো পাঠশালা থেকে একটা দ্বিতীয় ভাগ-পড়া মেয়ে ধ'রে বিয়ে কোরো। সে শুধু তোমাকেই ভালবাসবে; তোমার ধন-সম্পত্তিকে একটুও বাসবে না।"

দিবাকর কোনো উত্তর দিল না, নিঃশব্দে শুইয়া রহিল।

ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া থাকিয়া যূথিকা উঠিয়া গিয়া একটা দরজার খড়খড়ি তুলিয়া দিল; তাহার পর জানালার উপর দুই বাহু স্থাপন করিয়া বাহিরে অল্প মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইল।

সহসা একটা নূতন পথ পাইয়া সুতীব্র বর্ষার কনকনে জোলো হাওয়া সবেগে প্রবেশ করিয়া সমস্ত কক্ষের বায়ু-মণ্ডলকে চকিত করিয়া দিল।

চাদরের ফাঁক দিয়া সেই নবাগত কন্-কনানির অল্প একটু স্পর্শ পাইয়া দিবাকর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; তাহার পর দ্বারের নিকটে যূথিকাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "ওখানে কি করছ?"

যূথিকার নিকট হইতে কোনো সাড়া আসিল না।

শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যূথিকার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দিবাকর পুনরায় সেই প্রশ্ন করিল, "এখানে কি করছ?"

মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কিছু করছি না।"

"তবে জানলা খুলে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

"মাথাটা দপ্‌দপ করছিল, তাই একটু হাওয়া লাগাচ্ছি।"

দিবাকর বলিল, "সে কাজ ত' বেঞ্চে বসেও করতে পারতে!" বলিয়া দরজার ছিট-কানিটা লাগানো আছে কি-না একটু নত হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

যূথিকা বলিল, "অত ভয় পেয়ো না ; দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব না। তোমার বিষয়-সম্পত্তির ওপর আমার যথেষ্ট লোভ আছে ; কিছুকাল তা ভোগ করতে হবে।" তারপর বেঞ্চে গিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, "শোন। তোমার যদি মনে হয় যে, পাশ-করা মেয়েকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে জেনেও আমার পাশ করার কথা তোমাকে না জানিয়ে বিয়ে ক'রে আমি অপরাধ করেছি, তাহলে আমার বিচার ক'রে আমাকে দণ্ড দাও!"

এ বিষয়ে তাহার অভিভাবকগণেরও যে তাহার প্রতি প্রবল নিষেধ ছিল, আত্মদোষ লঘুকরণার্থে তাহা প্রকাশ না করিয়া যূথিকা সমস্ত দায়িত্ব নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিল।

যূথিকার সম্মুখে অপর বেঞ্চে উপবেশন করিয়া দিবাকর বলিল, "কি দণ্ড দেবো বলো?"

"যা তোমার উচিত মনে হয়, তা সে যত কঠোরই হোক্।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে নিঃশব্দ বেদনাময় হাসি ফুটিয়া উঠিল ; বলিল, "কি লাভ হবে তাতে বলতে পারো?"

যূথিকা বলিল, "অপরাধীকে দণ্ড দিলে অপরাধের প্রতিবাদ করা হবে।"

"কিন্তু এ অপরাধ কেন তুমি করলে যূথিকা? একথা কেন তুমি আমাকে বিয়ের আগে জানিয়ে দিলে না? তারপর যা হবার, তা হ'ত।"

দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "বিশ্বাস করবে, কেন জানাই নি?"

দিবাকরের মুখে পুনরায় পূর্বের মত বেদনার্ত হাসি দেখা দিল ; বলিল, 'বিশ্বাস? বিশ্বাস করতে ত' আর সাহস হয় না। বিশ্বাস ত' দিদিকেও করেছিলাম। তবু বল,—বিশ্বাসই না হয় করব।"

যূথিকা বলিল, "জানালে পাছে তোমাকে না পাই, সেই ভয়ে জানাইনি।"

দিবাকর বলিল, "না-হয় না-ই পেতে। কী এমন লোভের জিনিস আমার মধ্যে পেয়েছিলে তুমি, যার জন্যে সহজ পথে চলতে ভয় পেলে?"

যূথিকা বলিল, "তুমি আমার মধ্যে যা পেয়েছিলে, আমিও ঠিক তাই পেয়েছিলাম। বিশ্বাস কর আমাকে, তোমার মধ্যে শুধু তোমাকেই পেয়েছিলাম।"

আর কিছু না বলিয়া দিবাকর চুপ করিয়া রহিল।

যূথিকা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, বিয়ের আগে একথা তোমাকে জানাই ; কিন্তু কেন জানাইনি, এখনই সেকথা শুনলে। গাড়িতে তোমার সঙ্গে একা হ'য়ে পর্যন্ত একথা তোমাকে না জানিয়ে মুহূর্তের জন্যেও স্থির হতে পারছিলাম না। অমৃতসর পৌঁছবার আগেই সমস্ত কথা জানাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ স্টেশন এসে পড়ল, আর আমাদের কামরায় বৃদ্ধ ভদ্রলোককে স্থান দিতে হ'ল, তাই জানাতে পারলাম না। তারপর যে অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হ'ল, হয়ত তা ভগবানেরই ব্যবস্থা ব'লে আমার মনে হয়েছিল। মনে কোরো না নিজের ইংরেজি-বিদ্যে জাহির করবার জন্যে অথবা জরিমানা বাঁচাবার জন্যে আমি গার্ডের সঙ্গে কথা কয়েছিলাম। যে কথাটা তোমাকে কি ভাবে জানাব ব'লে মনে মনে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করছিলাম, গার্ডকে উপলক্ষ ক'রে সেই কথাটাই মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল। গার্ডের সঙ্গে কথা কইবার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি যে, আমি কথা কইব। নিজের গলার শব্দে নিজেই চমকে উঠেছিলাম।"

এবারও দিবাকর কিছুই বলিল না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "সব কথা তুমি জানার পর আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, এখন তুমি যা করতে হয় কর।" তাহার পর সহসা সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া দুই হস্ত দিয়া দিবাকরের দুই হস্ত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার কথা শোন। এম-এ পাশ ক'রে সামান্য যা শিখেছি, তা যদি ভোলবার হ'ত, তাহলে এই মুহূর্তেই সমস্ত ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু বিশ্বাস করো আমাকে, এ জিনিস তোমার কাছে এত তুচ্ছ যে, এ না ভুললেও চলে।"

ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করিয়া যূথিকার হাত ছাড়াইয়া দিবাকর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর কেস্ হইতে সেতার ও এসরাজ বাহির করিয়া নিজে এসরাজ রাখিয়া যূথিকার হস্তে সেতারটা দিয়া বলিল, "নাও, খানিকক্ষণ বাজাও। কথা পরে হবে।"

সেতারে একটা মৃদু ঝঙ্কার দিয়া যূথিকা বলিল, "কি বাজাবো?"

"সেদিনকার সেই জয়জয়ন্তী।"

সহসা একটা প্রবল ঝঙ্কারের মধ্য দিয়া সেতার ও এসরাজে জয়জয়ন্তী রাগিনীর আলাপ আরম্ভ হইল।

স্তব্ধ অন্ধকারময়ী ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পাঞ্জাব মেল উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে ; স্টেশনের পরে স্টেশন হু-হু করিয়া পিছাইয়া যাইতেছে ; ক্রমশ রাত্রি গভীর হইয়া আসিল ; কিন্তু তখনো সেই করুণ মধুর জয়জয়ন্তী রাগিনীর আলাপে বিরতি মানিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না।

* * * *

তৃতীয় দিবসের প্রাতে পাঞ্জাব মেল ধীরে ধীরে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিতেছিল। দিবাকর মুখ বাড়াইয়া দেখিল প্ল্যাটফর্মের উপর নিশাকর দাঁড়াইয়া আছে।

গাড়ি নিকটে আসিতেই ঈষৎ উদ্বিগ্ন-মুখে নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এত শীগ্‌গির ফিরে এলে যে?"

কামরার ভিতর দিকে মুখ নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া দিবাকর বলিল, "এ'র জন্যে।"

সবিস্ময়ে নিশাকর বলিল, "কার জন্যে?" পরমুহূর্তে গাড়ি থামিতেই দরজা খুলিয়া কামরায় প্রবেশ করিল এবং সম্মুখে যূথিকাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকরের দিকে ফিরিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে দৃষ্টিপাত করিল।

দিবাকর বলিল, "বউদিদি। প্রণাম কর?"

আশ্চর্যান্বিত হইয়া নিশাকর বলিল, "বউদিদি? তার মানে?"

দিবাকর বলিল, "বউদিদির মানে দাদার বউ।"

(শেষাংশ ১৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বর্তমান যুদ্ধ এবং স্পেন

বসুবন্ধু শর্মা

বর্তমানে ইউরোপে অক্ষ-শক্তিবিরোধী যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপস্থিত হতে চলেছে। লক্ষণ দেখে স্পষ্টই মনে হচ্ছে যে এ-যুদ্ধের গতি বর্তমানে অক্ষশক্তির অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছে না। তাঁর সমগোত্রীয় ডিক্টেটর ভ্রাতাদের এই ক্রমিক অবনতি দেখেও স্পেনের রাষ্ট্রনায়ক জেনারেল ফ্রাঙ্কো কেন তাঁদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হচ্ছেন না? অথচ একথা অনস্বীকার্য যে হিটলার এবং বিশেষ করে মুসোলিনির সাহায্যেই তিনি গৃহ-যুদ্ধে জয়লাভ করে স্পেনের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেছেন। বিগত চার বৎসরের মধ্যে কত-রকম বিচিত্র যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে—কিন্তু এ-যুদ্ধের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নিরপেক্ষতা-নীতি অটুট আছে। হিটলার বিজয়ের পর বিজয় লাভ করেছেন—পররাজ্যলোভী মুসোলিনি এসে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। জেনারেল ফ্রাঙ্কো তখনও যেমন নিরপেক্ষতার সমর্থক ছিলেন, আজ যখন মুসোলিনির পতন হয়েছে এবং সারা ইউরোপে মিত্রশক্তির আসন্ন অভিযান-আশঙ্কার ছায়া পড়েছে, তখনও তিনি তেমনি নীরবই আছেন। মিত্রশক্তি ইউরোপীয় অভিযান শুরু করলে এবং হিটলারের ভাগ্য-বিপর্যয় সম্ভাবনা দেখা দিলে জেনারেল ফ্রাঙ্কো কি তাঁর মত বদলিয়ে জার্মানির পক্ষাবলম্বন করবেন? স্পেনের আভ্যন্তরীণ সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা আলোচনা করলে মনে হয় যে অক্ষশক্তির পক্ষাবলম্বন করে মিত্র-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করার মত সামর্থ্য তাঁর নেই।

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর যুদ্ধ ঘোষণার পথে অন্তর্বিপ্লব বিচ্ছিন্ন স্পেনের অপরিসীম দারিদ্র্য একটি প্রবল প্রতিবন্ধক। স্পেন এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে একটি বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হবার পর স্পেনের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলভারেজ ডেলভায়োকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাঁর দেশ কি রপ্তানী করতে পারবে; জবাবে তিনি নিষ্ঠুরভাবে বলেছিলেনঃ "মৃতদেহ। আমরা রপ্তানী করতে পারি এরূপ আর কোন জিনিসের কথাই আমি জানি না। একমাত্র মৃতদেহই স্পেনে যথেষ্টের অধিক আছে।"

সরকারী হিসাব থেকে এই নিষ্ঠুর কথাগুলোর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। বার্সেলোনার শাসনকর্তা স্বীকার করেছেন যে, দুইলক্ষ লোক কম খেয়ে থাকে এবং প্রায় বারো হাজার লোক অনশনে মারা গেছে। নিরপেক্ষ দেশের হিসাব থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। রকফেলার সমিতির পক্ষ থেকে অ্যালেক্সিস্ ক্যারেল যুদ্ধকালীন পরিপুষ্টির অভাব নিয়ে গবেষণা করছেন; তিনি বলেছেন যে, মানবজীবন রক্ষার জন্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে যে পরিমাণ খাদ্য গুণ এবং পরিমাণের দিক থেকে একান্তই প্রয়োজনীয়, তার এক চতুর্থাংশ মাত্র বেশীর ভাগ স্পেনের অধিবাসী পেয়ে থাকে। তবু যে স্পেনবাসীরা বেঁচে আছে সেটা তাঁর মতে জীববিজ্ঞানের অভিযোজন মতবাদেরই (Theory of adaptation) সত্যতা প্রমাণ করে; অবশ্য একথা অস্বীকার্য যে স্পেনে লক্ষ লক্ষ এমন লোক আছে যাদের জীবন্ত না বলে মৃত বললেই ভাল হয়। রকফেলার সমিতির আরেকজন সভ্য ডাঃ জ্যানি বলেন যে, জাতির বেশীর ভাগ লোক এত দুর্বল যে "স্প্যানিশ্ ফ্লু"-র (এক প্রকারের জ্বর) আবির্ভাব হলে মধ্যযুগের 'কালো মৃত্যু'র (Black Death) মত মহামারীর সৃষ্টি হবে।

এই দুঃখময় পরিপ্রেক্ষিতেই স্পেনের রাজনীতির মূল সূত্রগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। স্পেনের প্রকৃত রাষ্ট্রনেতা হচ্ছে অনশন। এই অনশনই অন্তর্বিপ্লবে বিজিত জনগণকে বিপ্লব করতে দেয় না। তারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং দুর্বল। কিছুকাল পূর্বে মন্ত্রীসভার যে পরিবর্তন হয়েছিল, তার মূল কারণ ছিল এই দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। সেরানো সুনারকে মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দিয়ে স্পেনীয় গভর্নমেণ্ট ইংরেজ-গভর্নমেণ্টের সাহায্য ও সহানুভূতি পাবার আশা করেছিলেন। স্যার স্যামুয়েল হোর ভরসা দিয়েছিলেন যে মিত্রশক্তি স্পেনে আরও খাদ্য পাঠাতে পারেন—তবে ডন্ গ্যামন (স্পেনে সুনার এই নামেই অভিহিত) যদি মন্ত্রীসভায় থাকেন, তাহলে ইংলণ্ড, অ্যামেরিকা এবং স্পেনের পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্কের কোন উন্নতি হবে না।

সুনারকে বাদ দিলে অর্থনৈতিক অবরোধের পূর্ণ অবসান হবে কিনা নিশ্চিতরূপে না জেনেই ফ্রাঙ্কো যে তাঁকে পদচ্যুত করেছিলেন, তার পিছনে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত মিঃ ওয়েডেলের কৃতিত্বপূর্ণ কূটনীতি। স্পেনের মন্ত্রীসভায় পরিবর্তন সাধনের কয়েকদিন পূর্বে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সরকারীভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, যুদ্ধের শেষে মিত্রশক্তি স্পেনের পুনর্গঠনে সাহায্য করবেন। ফ্রাঙ্কোর অনুসারী ব'লে বিখ্যাত বিশ জন লোককে পুয়ের্টো রিকোতে নাগরিক অধিকার দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট মৌনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা স্পেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পরিবর্তন চান না—তাঁরা স্পেনের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন দাবী করেন। তাছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র থেকে অ্যামেরিকান চিকিৎসকদেরও স্পেনে পাঠানো হয়েছে—তাঁরা অনাহারজনিত টাইফাসের প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। অ্যামেরিকার সংবাদবিষয়ক চলচ্চিত্রে স্পেনের জাতীয় উৎসবাদি প্রদর্শিত হয়েছে—এইভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর প্রচারকার্যে সাহায্য করা হয়েছে। এ-সবই করা হয়েছে একটা বিশেষভাবে বিবেচিত ব্যাপক নীতির অংশ হিসাবে; যুক্তরাষ্ট্রের অভিমত এই যে, আদর্শগত ঐক্যের জন্য স্পেনকে দূরে সরিয়ে রাখার চেয়ে বর্তমান যুদ্ধজয়ের জন্য তার সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক নিরপেক্ষতা রক্ষা করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এই নীতির ফলে স্পেনে অক্ষশক্তির প্রভাব কমে গেছে। শুধু স্পেনে নয়—দক্ষিণ অ্যামেরিকার রাষ্ট্রসমূহেও এই নীতি খুব সার্থক প্রতিপন্ন হয়েছে। মধ্য এবং দক্ষিণ অ্যামেরিকায় অনেকেরই ফ্রাঙ্কোর প্রতি সহানুভূতি আছে—বিশেষ করে রক্ষণশীল দলের। ফ্রাঙ্কোকে দূরে সরিয়ে না রেখে যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেণ্ট এই অঞ্চলের রক্ষণশীল দল সমূহের আস্থাভাজন হয়েছেন এবং তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ফ্রাঙ্কোর পক্ষে অক্ষশক্তির সমর্থক ফ্যালাঙ্গ দলের প্রভাব মুক্ত হওয়া উচিত। সর্বশেষে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি এবং উত্তর আফ্রিকার ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক সকলেরই বিদিত।

অন্তর্বিপ্লবের ফলে স্পেনে মাত্র একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী লাভবান হয়েছে—আর মধ্যবিত্ত, শ্রমিক এবং কৃষকশ্রেণী পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী দরিদ্র হয়েছে; এটা ফ্যালাঞ্জিস্টদের পক্ষে শাপে বরের মত হয়েছে। তাদের পত্রিকাগুলো ধীরে ধীরে চরমপন্থী হয়ে উঠছিল—তারা তাদের ছাব্বিশ দফা দাবী কার্যে পরিণত করতে চাইছিল। ফ্যালাঙ্গ নেতাদের বক্তৃতার সঙ্গে ভূতপূর্ব সাধারণতান্ত্রিক নেতাদের বক্তৃতার কোন বিভিন্নতা ছিল না। বিপরীত রাজনৈতিক মতবাদের লোকদের উপর একই সামাজিক সমস্যাসমূহ

চাপানোর চেষ্টা চলছিল এবং ফ্রাঙ্কোর গভর্নমেণ্ট যে সব অন্যায় অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন—তাদের বিরোধিতা করা হয়েছিল। ফলে ফ্রাঙ্কো তাদের কিছুটা দাবী মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি দরিদ্রদের দুবেলা আহারের বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং Auxilio Social নামে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে স্পেনের সর্বব্যাপি দুর্দশা আংশিকভাবে মোচনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই সব সংস্কার যথেষ্ট হয়নি। ধনীরা চোরাবাজারের দৌলতে যথেষ্ট খাদ্য পেত—আর দরিদ্ররা কাগজে-কলমে রেশন পেত বটে—কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ভাগ্যে সেটা জুটত না; রুটি তেল চাল প্রভৃতি সাধারণ খাদ্যদ্রব্য চোরাবাজারে চড়া দামে বিক্রী হ'ত। ঠিক বাঙলা দেশের বর্তমান খাদ্য-পরিস্থিতির মত। একটি বক্তৃতায় ফ্রাঙ্কো ধনীদের এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, তারা যদি আরও বেশী বিবেচনা না দেখায়, তবে একটা নতুন বিপ্লব আবার দেখা দেবে। মেক্সিকোতে আলভারেজ ডেলভায়োর নেতৃত্বে, চিলিতে ভূতপূর্ব সাধারণতান্ত্রিক মন্ত্রী সোরিয়াসার নেতৃত্বে এবং বুয়েনস এয়ার্সে ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রী বার্সিয়ার নেতৃত্বে কয়েকটি নির্বাসিত রাজনৈতিক দলের একত্রীভবন স্পেনে অভিনন্দিত হয়েছিল। নৈরাজ্যবাদীরা বিদ্রোহের ভয় দেখাচ্ছিল; যুদ্ধ-মন্ত্রী ভ্যারেলাকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই সব ঘটনার ফলেই ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ সম্ভাবনা দূর করার জন্যে ফ্যালাঞ্জিস্টদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর ফলেই সুনার প্রভৃতি মন্ত্রিসভার ফ্যালাঞ্জিস্ট সভ্যেরা বিতাড়িত হয়েছিলেন।

ফ্রাঙ্কো ফ্যালাঞ্জিস্টদের ক্ষমতা-মুক্ত হয়ে হয়ত মিত্রশক্তির প্রীতিভাজন হয়েছেন—তবে জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব অনেক কমে গেছে। তাঁর গভর্নমেণ্ট বর্তমানে বেয়নেটের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাঁর অবস্থা অনেকটা জার্মানিতে, হিটলারের ক্ষমতা-প্রাপ্তির পূর্বে ফন প্যাপেনের মত। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থায় ফ্যালাঞ্জিস্টরা যদি প্রভাব হারিয়ে ফেলে—তবে সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট এবং গণতান্ত্রিক দল আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এবং আবার স্পেনে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। অবশ্য বর্তমানে উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত মিত্রশক্তি সে বিদ্রোহ প্রতিরোধ করতে পারেন। বর্তমানে স্পেনের রাষ্ট্রনীতির উপর গণতান্ত্রিক দেশ-সমূহের অক্ষশক্তিবিরোধী যুদ্ধের প্রভাব অনেক বেশী। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ভাগ্য বর্তমানে মিত্রশক্তির সঙ্গে নিবিড়ভাবে বিজড়িত বলেই মনে হয়। এই জন্যই জেনারেল ফ্রাঙ্কো বর্তমান যুদ্ধে এ পর্যন্ত নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করে আছেন এবং যতদিন এই যুদ্ধ মিত্রপক্ষের অনুকূলে থাকবে, ততদিন তিনি এই নীতিই অনুসরণ করবেন।

বিদুষী ভার্যা

(১৭৫ পৃষ্ঠার পর)

নিশাকর বলিল, "তা জানি,—কিন্তু—"

সহাস্যমুখে যূথিকা বলিল, "এর মধ্যে আর কিন্তু নেই ঠাকুরপো, সত্যিই আমি তোমার বউদিদি। তোমার দাদা লাহোরে গিয়ে হঠাৎ আমাকে বিয়ে করেছেন।"

বিস্ময় যতখানিই উগ্র হউক না কেন, এ কথার পর নিশাকরকে তাড়াতাড়ি নত হইয়া যূথিকার পদধূলি গ্রহণ করিতে হইল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকরের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "কি ব্যাপার বল ত'?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "কেন, দুঃখিত হচ্ছিস্ নাকি?"

নিশাকর বলিল, "না, না, দুঃখিত হব কেন? খুশিই হচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ লাহোরে পৌঁছেই—আমাদের না জানিয়ে শুনিয়ে—"

দিবাকর বলিল, "কি করি বল্। তুই এক ম্যাট্রিকুলেশন পাশ-করা মেয়ে নিয়ে এমন ভয় দেখালি আমাকে যে, লাহোরে গিয়ে হঠাৎ আমার মনের মত একটি মেয়ে পেয়ে টপ্ ক'রে বিয়ে করে ফেললাম। দু'দিনে শেষ তারিখে বিয়ে, টেলিগ্রামে খবর দেবার সময়ও ছিল না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া নিশাকর মনে করিল, সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া দিবাকর একটি অশিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। নিজেও সে যূথিকাকে দেখিয়া খুশি হইয়াছিল; বলিল, "তা বেশ করেছ। কবে বিয়ে হ'ল?"

কুলিরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিনিস-পত্র তুলিতেছিল; দিবাকর বলিল, "গত বুধবারে। বাড়ি চল্, ধীরে-সুস্থে সব শুনবি।"

ক্রমশ

হিসাব

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাদের চোখে ঝিলিমিলি ঝিলিমিল্
কত যে রাত্রি গান গেয়ে গেয়ে যায়,
কামনা-নিবিড় ক্লান্ত হাতের বন্ধনী শেষ হ'লো,—
প্রেয়সী, এবার অনায়াসে তুমি নিদ্রা যাইতে পারো!
আমি জানালায় আকাশ ধরিয়া রাখি,
বিশ্ব ঘুমায়, অজ্ঞাত কত গ্রহ-তারা উঁকি দেয়,—
পাষাণ-চাপানো চোখের পাতায় স্বপ্ন আনিয়া কহি,—
সুদূরে বন্ধু ভালো আছি—ভালো আছি!
পথিক নেবুলো—অসমাপিকার দল
বিরাট আশায় উজ্জ্বলতর কাঁপে,—
দেহের সেতারে তুলিছ তখন কামনার ঝঙ্কার,
প্রেয়সী, আমারে কোথা নিয়ে যেতে চাও?

স্বপ্ন দেখেছি নির্জন ঘন বন—
স্তব্ধ তাপস জটাভারনত বিশাল বনস্পতি,
আর দেখিয়াছি শ্বাপদের কোলাহল,—
বাঘেদের চোখে হিংস্র রাত্রি জ্বলে!
প্রেয়সী, আমারে একটু ভাবিতে দাও,
অতি সহজেই গ্রহণ ক'রো না ডাক,
তোমার রাজ্যে অতি সহজেই সম্রাট্ ক'রো না-কো,
কী জানি কখন গ'ড়ে দেবো এক দ্বিতীয় তাজমহল!
আভরণ-ভরা তোমার স্মৃতিটি নিয়া
আগামীকালের পথে পথে আমি চলিব না ভারবাহী,
হিসাবের পর নেবো না হিসাব, হবো না কুসীদজীবী,
ভাগ্যের পায়ে শুধু ব'লে যাবো,—বিধাতা বুদ্ধ নহে,
বুদ্ধ জমানো হিসাবের খাতাগুলি!

কঙ্কালের অভিশাপ

অমূল্য পাল

অমাবস্যা রাত্রি। জঙ্গলটার পাতায় পাতায়, গাছে গাছে অন্ধকার যেন এ'টে রয়েছে। আকাশের তারাদের ক্ষীণ আলো এ অন্ধকার ভেদ করে মাটিতে পে'ৗছতে পারে না। রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ সেই অন্ধকারে জঙ্গল-পথে অগ্রসর হলেন। তাঁর সঙ্গে বে'টে চেহারার পাঁচজন অনুচর। রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। পুরোপুরি সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ-ঋজু তাঁর আকৃতি। গৌরবর্ণ। উন্নত নাসিকার নিচে মোটা গোঁফ জোড়া তাঁর মুখেচোখে নির্মমতার ছাপ এ'কে দিয়েছে। তাঁর পরিধানে রক্ত পট্ট-বস্ত্র; গায়ে অর্ধচক্রাকারে রয়েছে অনুরূপ উত্তরীয়। অনুচরদের প্রশস্ত বক্ষদেশ উন্মুক্ত। পরনের বস্ত্রখণ্ড আঁট করে বাঁধা। কোমরে ঝুলছে খর্বাকৃতি ধারালো অস্ত্র।

সানুচর রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ জঙ্গলের গভীর স্থানে এসে পে'ৗছলেন। সম্মুখে একটা জরাজীর্ণ মন্দির। গভীর জঙ্গলে এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে এই ভগ্নমন্দিরটি কোন পর্বতের ভগ্নাংশ বলেই মনে হয়। রাতে তো দূরের কথা সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল দিন-দুপুরেও কেহ এমন স্থানে আসতে সাহস পায় না। কিন্তু রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদকে এখানে আসতে হয় গায়ে অন্ধকার ঢেকে, কাত্যায়নীর নির্মাল্য গ্রহণান্তে অনুচরদের গোপন কর্মে পাঠাবার জন্যে। পনর বিশ ক্রোশের মধ্যে এমন একজন শিশুও নেই যে রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদের নিষ্ঠুর কীর্তি কল্পনা করে শিউরে না ওঠে। কিন্তু রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ ভয়কে জয় করেছে। গভীর জঙ্গলের হিংস্র পশুগুলো যেন তাঁর দেহের গন্ধ পেয়ে দূরে লুকিয়ে থাকে। কোথা থেকে একটা শেয়াল মাঝে মাঝে একটানা সুরে ডাকছিল।

কড়াতে হাত পড়তেই মন্দিরের দরজা খুলে গেল। পূজারী দরজা খুলে আবার আসনে গিয়ে বসলেন। রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ উন্নত-মস্তকে কাত্যায়নীর উজ্জ্বল কালো পাথরের মূর্তির সম্মুখে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। মন্দিরের দোর গোড়ায় বলিষ্ঠ বে'টে ধরণের মানুষ পাঁচটা হাঁটু গেড়ে বসেছিল।

পূজারী নিবিষ্টচিত্তে কাত্যায়নীর পূজো সাঙ্গ করলেন। আজ তাঁকে রাত জেগে আরও দুবার পূজো করতে হবে। এখন হ'ল প্রাথমিক পূজো। এর পর রাত্রি দ্বিপ্রহরে বলির পূজো। তারপর রাতের শেষ প্রহরে রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদের শিশু পুত্রের কল্যাণার্থে পূজো। কাল তার নামকরণ-উৎসব, আজ তাই পূজোর এত ঘটা।

পুরোহিত সবাইকে কারণ-সলিল বিতরণ করলেন। মাথার খুলি করে অনুচরেরা ভক্তিভরে তা পান করল। তাদের হাতে দেবীর নির্মাল্য রাঙা জবা গুজে দিয়ে পূজারী বললেন, তোদের অভীষ্ট পূর্ণ হোক। তাদের অভীষ্ট নরদেহ সংগ্রহ করা। কারণ-সলিলের ক্রিয়ায় তাদের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পূজারীর আশীর্বাদ-গ্রহণান্তে তারা অন্ধকার পথে মিশে গেল। মন্দিরের পিছনে যে-জায়গাটায় গাছ ঘন সন্নিবেশিত নয়, সেখানে শত শত নরদেহ ভূপ্রোথিত করা হয়েছে। নরদেহ প্রোথিত হয়ে সেখানে যে কঙ্কালে পরিণত হচ্ছে, তার বাইরে কোন প্রকাশ নেই। এত নিপুণ-ভাবে সেখানে রাখা হয়। রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ নামে জমিদার, কিন্তু তাঁর প্রধান বৃত্তি লুণ্ঠন-কার্য। তাঁর অগোচরে সবাই তাঁকে বলে দস্যু। কত লোকের অর্থ-অলংকার জমা আছে তাঁর ঘরে। কত লোকের প্রাণ গিয়েছে তাঁর অনুচরদের নৃশংস হস্তে। কিন্তু কোন চিহ্ন পর্যন্ত মেলে না। কোন সাক্ষী তো নয়ই! তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে লোকে শুধু হয় পরাজিত। আর অভিশাপ হানে। শুধু ভগবানের মুখের দিকে চায়।

দূরে রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদের গড়-বাড়ি। চতুর্দিক পরিখাবেষ্টিত। বাড়িতে প্রবেশ করবার জন্য আছে শুধু একটা চওড়া সাঁকো, যা প্রয়োজন হলে নিমেষেই নষ্ট করে ফেলা যায়।

রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ যখন কাত্যায়নীর মন্দির হতে এসে বাড়িতে প্রবেশ করলেন, তখন চারদিক শান্ত, নিঝুম। আগামীকল্যের উৎসব-আয়োজনে এতক্ষণ দাস-দাসীরা ব্যস্ত ছিল। এখন সবাই হয়েছে বিশ্রামে নিমগ্ন। শুধু দালানের একটা কক্ষে আলো দেখা যায়। রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর ঘুমন্ত শিশু-পুত্রের কাছে বসেছিল কন্যা শিবানী। কাত্যায়নীর মন্দির থেকে সধবাকে শিশু-পুত্রের জন্য আশীর্বাদ বহন করে আনতে হবে, শিবানীকে পিতার সঙ্গে যেতে হবে কাত্যায়নীর মন্দিরে। তাদের মা অসুস্থা।

রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ ঘরে প্রবেশ করে একবার শিশু-পুত্রের মাথায় হাত বুলালেন। তারপর শিবানীকে বললেন, ঘুম পেয়েছে মা? আর বেশি রাত হবে না। একটু পরেই আমরা মন্দিরে যাব। কিন্তু মা মনে রাখিস, মন্দিরের পথঘাট যেন প্রকাশিত না হয় তোর বাপের জীবন যেন বিপন্ন না হয় রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ কক্ষান্তরে চলে গেলেন।

শিবানীকে অত্যন্ত চঞ্চল দেখাচ্ছিল সে ক্ষণে ক্ষণে তাকাচ্ছিল জানালা দিয়ে বাইরে, ফুলবাগানের দিকে। তার বিবাহ হয়েছিল বছরখানেক আগে পার্শ্ববর্তী এক জমিদারের পুত্রের সঙ্গে। কিন্তু তা শ্বশুরের ধমনীতে বইছে টাটকা জমিদারের রক্ত। একটু কিছুতেই চন চন করে ওঠে অতএব বিবাহ রাত্রিতে রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদে সামান্য এক ত্রুটিতে দুই পরিবারের বিবা শুরু হ'ল লাঠালাঠিতে। পরিসমাপ্তি হ চিরকালের ছাড়াছাড়িতে। শিবানীকে বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে ঘর-সংসা করতে যেতে দেওয়া হয়নি।

কিন্তু প্রায় রাতেই, বিশেষ করে অন্ধকার রাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয় রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদে উদ্যানে সবার অলক্ষ্যে। নানা বিপদ মাথায় করেও শিবানীর স্বামী আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। অনেকবার তাকে রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদের অনুচরদের হাতে পড়তে হয়েছে কিন্তু শ্বশুরের নামেই জামাতার হয়েছে মুক্তি। তাদের যখন মিলন হয় তখ পথের দুর্যোগ, আপদ-বিপদ নিয়ে চলে কত গল্প, কত হাসি-ঠাট্টা। রুদ্রেন্দ্রপ্রসা দের কানে এ সব পে'ৗছতে পারে না তা হলে শিবানীর রক্ষে নেই। শিবানীর স্বামী নূতন করে বিবাহ করেনি।

শিবানী ভাবে, আজ রাত অধিক হয়ে গেছে। না, আজ আর আসবার সম্ভাবনা নেই। কাল এ বাড়িতে উৎসব, জামাত নিমন্ত্রিত হয়নি। অভিমানে সে হয়তো আজ আসবে না। তার ভারাক্রান্ত হৃদয় হতে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

কাত্যায়নীর মন্দিরে পূজো হচ্ছিল, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূজো। রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদের অনুচরেরা যে পথিককে ধরে এনেছিল সে সুন্দর যুবা পুরুষ। তার হাত-পা-মুখ দৃঢ়বদ্ধ। মন্দিরের পাশের কক্ষে তাকে রাখা হয়েছিল। সে বন্ধন মুক্ত হবার জন্য বার বার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে ফলে, তার হাতপা'র মাংস পেশী ফুলে উঠেছে। সে চীৎকার করে কি যেন বলতে চায়। কিন্তু তার মুখের দৃঢ় বন্ধন তাকে রেখেছে বাক্যহীন করে। শুধু একটা অস্ফুট গোঙানী শোনা যায়। সে বুঝতে পেরেছে তার মৃত্যু প্রত্যাসন্ন। তবু সে না জানি কি জানাতে চায়। তার উত্তেজিত দেহ

থেকে ঘর্ম নির্গত হয়ে জামা কাপড় লেপটে ধরেছে। বাইরে মশালের আলোর নীচে অনুচরগুলো কারণ-সলিল পানে মত্ত। খালি মাথার খুলিগুলো মাঝে মাঝে শূন্যে নিক্ষেপ করে তারা খেলা করছিল। তারা আনন্দে অধীর। এর পর রুধিরে নৃত্য করবে।

মন্দিরের পূজারী হুংকার দিয়ে উঠলেন। অনুচরদের মত্ততা ছুটে গেল। তারা দ্বারপথে মাথা বের করে প্রেতের মত মন্দিরের দিকে তাকাল। পূজারী ইংগিত করলেন।

অনুচরেরা যুবাপুরুষকে পূজারীর সম্মুখে নিয়ে এল। অন্ধকার ঘরে এতক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে সে হয়েছিল অবসন্ন। তবু সে শেষবারের মত পশ্চাদ্‌বদ্ধ হাত টেনে খুলতে চেষ্টা করলে। হাত কেটে রক্ত বেরল। কিন্তু সে হল ব্যর্থ। একটা জোয়ান মানুষ এসে জোর করে তাকে বসিয়ে দিলে। যুবাপুরুষ তখন প্রায় মূর্ছিত। তার চোখের সামনে একটা তীক্ষ্ম চকচকে খাঁড়া পাষাণ মূর্তির বেদীমূলে রাখা হয়েছিল। পূজারী যুবাপুরুষের সারা দেহে পবিত্র জল ছিটিয়ে দিলেন। কিন্তু তার উদাম দমে গেল যুবাপুরুষের নোয়ানো মাথায় ফুলবেলপাতা দিতে গিয়ে। তার ঘাড়ের উপরে একটা লম্বা কাটা দাগ কিসের! দাগটা শুকিয়ে দুমড়িয়ে কালো হয়ে ফুলে রয়েছে। পূজারী আবার প্রখর দৃষ্টিতে দেখলেন। মুখ বিকৃত করে বললেন, না হবে না। নিয়ে যাও। মত্ত অনুচরেরা যুবাপুরুষকে হিঁচড়ে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর জোর করে তাকে ঠেলে দিল বায়ুহীন কক্ষে, অন্ধকারের মুখে। জীর্ণ লোহার দরজাটা ঝন্‌ঝন্‌ করে বন্ধ হল।

শিবানী ও রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ এলেন মন্দিরে। পূজারী হাত তুলে বিমর্ষ বদনে বসে আছেন। কন্যা ও পিতা প্রণাম সেরে উঠতেই পূজারী বললেন, হল না রুদ্র। দেবী রুষ্টা হয়েছেন। বিস্মিত রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পূজারী উত্তর দিলেন, দেবী নিখুঁত গ্রহণ করেন। তোমার অনুচরেরা যাকে ধরে এনেছে সে নিখুঁত নয়। সুতরাং পুজো পণ্ড হল। রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, তা কি হয় প্রভু! আমার বুকের রক্ত দিয়ে পুজো দেব। মাকে প্রসন্না করব। আপনি পুজোর আয়োজন করুন। রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ অধীর হয়ে উঠেছেন। পূজারী বললেন, এ পুজো তোমার পুত্রের মংগলার্থে, হাঁ তোমার রুধিরে চলতে পারে। কিন্তু নিজের রক্ত দিয়ে রাক্ষসী মায়ের লালসা বাড়িও না, রুদ্র। তাতে তোমার অমংগল হবে। রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে কি করা যায়, প্রভু? পূজারী চিন্তান্বিত হলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, এই রাতে আর কোথা থেকে সংগ্রহ করবে! আচ্ছা, যাকে আনা হয়েছে, তাকে তোমরা দেখে এস। যদি ওতে চলে। তোমাদের মন খুঁতখুঁত না করলেই হল।

শিবানী রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদের কন্যা, তার ভয়-ভীতি নেই। সেও পিতার সংগে গেল। আগে পথ দেখিয়ে চলল মশাল হাতে অনুচর। দূরে একটা শেয়াল চীৎকার করছিল।

খোলা দরজায় পা দিতেই শিবানী অস্থির হয়ে উঠলে। স্নেহহস্তে অনুচরের হাত থেকে মশালটা কেড়ে নিয়ে সে প্রায় দৌড়ে গেল উবুড়-হয়ে-পড়া মানুষটার কাছে। আলো নামিয়ে সে দেখতে পেলে, হাত-পা-মুখ বদ্ধ অবস্থায় প্রস্তর কঠিন মেঝের উপর থুবড়ে পড়ে আছে একজন যুবাপুরুষ। ঘামে তার রেশমী জামা-কাপড় ভিজে গেছে। অনড়দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে শিবানী কপাল বুক হাত দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে হাত তুলে আনলে—সব ঠাণ্ডা, একেবারে হিমশীতল। সে কাঁপতে কাঁপতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার অর্থহীন দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। তবু তার অবিশ্বাস! এবার সে যুবাপুরুষের হৃদ্‌পিণ্ডের উপর হাত রাখলে। একেবারে নিথর, নিস্পন্দ। শিবানী তার বাবার মুখের উপর অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলে, বাবা, এ যে আমার স্বামী।

সেই চীৎকারে নির্মম রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ, এমন-কি তার উন্মত্ত পিশাচ অনুচরগুলো পর্যন্ত চমকিত হয়ে উঠল। সেই চীৎকার বায়ুহীন কক্ষে বাধা পেয়েও প্রতিধ্বনিত হল দূরে গাছে গাছে, পাতায় পাতায়। সমস্ত জংগলটা যেন নড়নড়িয়ে উঠল। সেই চীৎকার গিয়ে অনুকম্পিত হল যেন ভূপ্রোথিত মানুষগুলোর ঘুমন্ত আত্মীয়-স্বজনের অন্তরে।

অকস্মাৎ রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ একটা সকরুণ, কিছুক্ষণস্থায়ী, ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। সারা জংগল যেন কেঁপে উঠল। বাইরে অনেকগুলো মানুষ যেন একসংগে হাসছে, অট্টহাসি। ভূপ্রোথিত কংকালগুলো আজ বুঝি জেগে উঠেছে! আজ তাদের অভিশাপ পূর্ণ হল। রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মনের জোরে সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফলে মূর্ছিতা কন্যার কাছে এগিয়ে এলেন।

*   *   *   *   *

আকাশে অজস্র তারা চিকমিক করছে। তারই আবছা আলোয় ছায়ামূর্তির মত কতগুলো লোক নীরবে রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদের বাড়ির ফুলবাগানের মধ্যস্থলে শিবানীর স্বামীর মৃতদেহ সমাহিত করল। তারপর সেখানে শ্যামল দূর্বার চাপ লাগিয়ে ফুল-গাছগুলো যেমন ছিল তেমন করেই রাখা হল। সবার অজান্তে শিবানীর সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে নিল তার পিতা, রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ।

শিশুপুত্রের নামকরণ-উৎসব স্থগিত রইল। পরদিন সংবাদটা কানে কানে প্রচারিত হল, গুরুদেবের হঠাৎ আদেশ পেয়ে কাল রাতেই রুদ্রেন্দ্রপ্রসাদ কাশীবাসে চলে গেছেন। সংগে গেছে শিবানী।

সব চাঁদ আজি চাঁদ নহে মোর

তারাকুমার ঘোষ

সব চাঁদ, আজি, চাঁদ নহে মোর
সব ক্ষণ নহে ক্ষণ,
জীবনে আমি যে জেনেছি একটি রাতি'।
বসন্ত বনে সেদিন আমার ছিল যে আমন্ত্রণ,
হৃদয়ে জ্বালান রঙীন একটি বাতি।

সব বাস আজি বাস নহে মোর শুধু সেই বাসখানি
আজিও জীবনে রচিছে নিশীথ ভাতি।

সব জনা মোর জন নহে ওগো যদিও রয়েছে কাছে
আমি জানি মোর হৃদয় তীরেতে কেবা।
কার মঞ্জীর অধীর আকুলি হৃদয়তন্ত্রে বাজে,
কেমন দীপ্ত অরুণ আলোকে দিবা।
কার হস্তের মধুর পরশে জ্বলেছে হৃদয়ে দীপ
সকল শিরায় মদিরার পরশন।
সেই যে আমারে করেছে মধুর অতুল মোহন শিব
কবে পুনরায় পাব তার দরশন?

"তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ"

শ্রীরমানাথ রায়

পূর্ব নিবন্ধে আমরা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩ নং শ্লোকের আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে আমরা দেখাইয়াছি, "প্রকৃতিকে নিগ্রহ করা সম্ভব নয়, কারণ জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেই প্রকৃতির অনুযায়ী চলিতে বাধ্য"—এই বাক্যের যথার্থ অর্থ কি? এইবার পরবর্তী ৩৪নং শ্লোকের আলোচনা করিব। শ্লোকটিঃ—

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে
রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ
'তয়োর্ন' বশমাগচ্ছেত্তৌ
হ্যস্য পরিপন্থিনৌ'।"

অর্থঃ—ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে কোনটিতে ইন্দ্রিয়সমূহের অনুরাগ এবং কোনটিতে বিদ্বেষ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। এই রাগদ্বেষের বশীভূত তুমি হইও না; ইহারা জীবের শ্রেয়োলাভের বিঘ্নকারী। এখানে বলা হইল, ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ের প্রতি, ইন্দ্রিয়ের কোনটিতে "রাগ" (আসক্তি) কোনটিতে "দ্বেষ" (বিরক্তি) স্বাভাবিক তবু তুমি এই 'রাগ' 'দ্বেষের' বশীভূত হইও না। কথাটা শুনিবামাত্রই মনে হয়, বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের 'রাগ' এবং 'দ্বেষ' যদি স্বাভাবিকই হয়, তবে তাহার বশীভূত হইও না, কথাটা অযৌক্তিক নয় কি? তাছাড়া পূর্ব-শ্লোকে বলা হইয়াছে—মানুষ মাত্রই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে বাধ্য,—তাহা হইলে প্রকৃতিই ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রিয়বস্তুর প্রতি আসক্ত এবং অপ্রিয়বস্তুর প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিবে, তাহাও ঠিক, কাজেই 'রাগ' 'দ্বেষের' বশীভূত হইও না—কথাটা পূর্ব শ্লোকের সঙ্গেও বিরোধ বাধাইতেছে না কি? স্থূল দৃষ্টিতে এইরূপই মনে হয় এবং হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে বিচার করিয়া যথার্থ সত্য অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে, ভগবান অবশ্যই স্ববিরোধী কথা বলেন নাই এবং বলা সম্ভবও নয়।

এইবার আমরা সাংখ্য, বেদান্ত এবং গীতার সাহায্যে পৃথক পৃথক ভাবে কথাটির বিচার করিব, এবং দেখাইতে চেষ্টা করিব, এর যে কোনটির দৃষ্টিভঙ্গী নিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, ফল একই, অর্থাৎ ভগবান স্ববিরোধী কথা বলেন নাই।

প্রথমে এ বিষয়ে বেদান্ত কি বলে দেখা যাউক। ব্রহ্ম কি—এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব সূত্র করিলেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"

যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ, তিনি "ব্রহ্ম"। এখানে এক-মাত্র কারণ বলাতে নিমিত্ত উপাদান কারণ-ও তিনিই—অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি বহুবিধ—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে", ব্রহ্ম যে শক্তির সাহায্যে নিজে অবিকৃত থাকিয়া জীব ও জগৎ রূপে পরিণত হন, তাহারই নাম "মায়া", ভাষান্তরে "প্রকৃতি" বা "প্রধান।" এই মায়া শক্তি ব্রহ্মের আত্মভূতা শক্তি, ইহা শ্রুতিপ্রমাণ সিদ্ধ—"দেবাত্মশক্তিম্ স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম" ইত্যাদি। ব্রহ্ম মায়া শক্তির সাহায্যে নিজেকে বহুরূপে—জীব ও জগত-রূপে বিস্তার করিলেন বটে,—কিন্তু তাহাতেই, অর্থাৎ জীব ও জগৎরূপেই পর্য-বসিত হইয়া যান নাই—তদতীতরূপেও তিনি রহিলেন, অতএব একরূপে তিনি সৃষ্ট জগতে সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, অন্যরূপে তদ্রূপে থাকিয়াও তদতীত। ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা যুগপৎ,—একের অভাবে অন্যের আবির্ভাব—তাহা নহে। ব্রহ্মের এই যে অতীতরূপ ইহা নির্গুণরূপ। সকল রকম কার্যকারণ সম্বন্ধের মূল হইয়াও তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া স্বরূপে বর্তমান। মায়া-শক্তির কোন কাজই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যদিও মায়া তাঁহার স্বরূপগত অন্তর্ভুক্ত শক্তি। সাপের দাঁতে বিষ আছে, তদ্দ্বারা অন্যের অনিষ্ট বা প্রাণনাশ হইলেও তাতে সাপের কিছু হয় না; এও তদ্বৎ। জীবজগৎ ব্রহ্ম হইলেও তাঁহার অংশ—এই অংশ অর্থ পৃথক খণ্ড নহে—শক্তিরূপ অংশ, কাজেই অভিন্ন। ব্রহ্মের অভিন্ন চিদংশই জীব এবং ব্রহ্মের ন্যায় জীবও স্বরূপতঃ দ্বিরূপ বিশিষ্ট। একরূপে জগতের সর্বত্র ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ—অন্যরূপে এই উভয়রূপের অতীতরূপ। এই উভয়রূপই যুগপৎ অব-স্থিত। মুক্তজীব এই উভয়রূপতা অনুভব করিতে পারে। তখন দেখে সেই একরূপে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে—অন্যরূপে সুখ দুঃখ ভোগের অতীতরূপে বর্তমান থাকিয়া কিছুই করিতেছে না,—শুধু দ্রষ্টামাত্র। কিন্তু বদ্ধজীব এই উভয়রূপতা—তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না। শুধু ভোক্তারূপে নিজেকে অনুভব করে। কিন্তু সাধনা অর্থই হইল, ব্রহ্মের ন্যায় স্বরূপানু-ভূতিতে পূর্বোক্তরূপ দ্বিরূপে স্থিত হওয়া। শ্লোকে যে আছে "তুমি" "রাগ' "দ্বেষের" বশীভূত হইও না—এখন দেখিতে হইবে এই "তুমি" কে? এই "তুমি" জীবের স্বরূপ। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, মুক্তজীবই স্বরূপে স্থিত হইয়া ব্রহ্মের ন্যায় ভোক্তা ও দ্রষ্টা এই উভয়রূপতা অনুভব করে। কাজেই ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ীভূত বস্তুসমূহে ইন্দ্রিয়ের "রাগ" "দ্বেষ" স্বাভাবিক হইলেও স্বরূপস্থিত জীব তদতীতরূপে বর্তমান থাকিতে পারে। এই অবস্থায় গুণ এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য জীব স্বরূপকে বিচলিত বা বিকৃত করিতে পারে না। তাই এখানে সখা শিষ্য বীরবর অর্জুনকে, ইন্দ্রিয়বর্গের স্বভাবিক ধর্ম যে তাহার স্বরূপ নহে এবং ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব কার্য করিয়া গেলেও যে তদতীতরূপে বর্তমান থাকিয়া জাগতিক সকল কর্মই করা যায় এবং ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্মানু-সারে বস্তু বিশেষের প্রতি "রাগ" এবং "দ্বেষ" থাকিলেও—তাহাদের "বশীভূত" না হওয়া যে সম্ভব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে তাহাই বলিলেন।

গীতার সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার হয় কিনা, এইবার আমরা তাহাই দেখিব। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান অর্জুনকে বলিলেন, আমার স্বরূপ বিষয়ে যাহা কিছু জানিবার তাহা তোমাকে বলিতেছি এবং তাহা জানিলে,—শ্রেয় লাভ বিষয়ে তোমার আর কিছুই জানিবার বাকী থাকিবে না। তার পর বলিলেন, আমার দুই প্রকার প্রকৃতি আছে, এক "পরা" আর এক "অপরা"—শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ। দৃশ্যমান এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎ এবং মন বুদ্ধি অহংকার আমার "অপরা" প্রকৃতি এবং জীব আমার "পরা" প্রকৃতি। স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু বস্তু আছে, আমার এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে উদ্ভূত জানিবে—কাজেই মূলে আমিই সকলের উৎপত্তিস্থান এবং প্রলয়েও সবই আমাতেই প্রবেশ করে। সূত্রে মণিগণের ন্যায় সমস্ত জগৎ আমাতেই গ্রথিত আছে। অথবা অধিক আর কি বলিব—আমিই একাংশের দ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছি। এক কথায় —আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক যাহা কিছু—তাহাও আমা হইতে উদ্ভূত, কিন্তু "ন ত্বহং, তেষু" আমি তাহাদের মধ্যে স্থিত,—(আবদ্ধ) নহি—যদিও "তে ময়ি" তাহারা আমার মধ্যে স্থিত আছে। অন্যত্র আছে, অব্যক্তরূপী আমার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, চরাচর সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত আছে, কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ নহি অর্থাৎ ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও বর্তমান আছি। তারপরই আবার বলিলেন—চরাচর সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত আছে বলিয়াছি সত্য, কিন্তু আমার

মূল স্বরূপ ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আছে—কাজেই সেখানে ইহারা নাই, পরন্তু এইরূপ হইয়াও ভূত সকলকে আমিই উৎপন্ন ও বর্ধিত করিতেছি। এই যে আশ্চর্যভাব ইহাই আমার ঈশ্বরীয় শক্তি। সর্বত্র কার্য কারণরূপে থাকিয়াও যে তদতীতরূপে তিনি বর্তমান আছেন এবং তাঁহার এই দ্বিরূপতা যে যুগপৎ—স্পষ্টরূপেই এখানে তাহা বলিলেন। জীব তাঁহার পরা প্রকৃতি এবং জীবরূপে তিনিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন,—বলাতে জীব ও ঈশ্বরে অভিন্নতাই প্রতিপন্ন হয়। এই অভিন্নতা অংশাংশী সম্বন্ধে। জীব অংশ ঈশ্বর অংশী। জীব অনু, ঈশ্বর বিভু—কিন্তু গুণে জীবও স্বরূপত বিভু। ক্ষুদ্রদর্পণে যেমন অনন্ত আকাশ প্রতিভাত হয়—জীব গুণে যে বিভু—তাহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের ন্যায় জীবের দ্বিরূপত্বও নিত্যসিদ্ধ। বদ্ধাবস্থায় জীব তাহার এই দ্বিরূপতা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু মুক্ত জীব—স্বরূপে স্থিত হওয়ায়—যুগপৎ এই দ্বিরূপে অবস্থিত হইয়া—কার্য কারণরূপে জগতের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়াও তদতীতরূপে বিরাজমান থাকে। ঐ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের কার্যসমূহ আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না;—কাজেই ইন্দ্রিয় সকলের বস্তু বিশেষে "রাগ" এবং বিদ্বেষ স্বাভাবিক হইলেও জীবস্বরূপে তদতীতরূপ হওয়ায় তাহার বশীভূত হওয়ার কোন কথাই হইতে পারে না। সিদ্ধ সাধকও তখন ভগবানেরই ন্যায় বলিতে পারেন—যদিও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাবসমূহ আমাতে রহিয়াছে, তবুও আমি এই সকল গুণের কার্যে আবদ্ধ নহি, কিংবা ইহারা আমার স্বরূপকে বিকৃত বা বিচলিত করিতে পারে না। তাই তো ভগবান ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥১৪।২২

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণাবর্তন্তে ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥

হে পাণ্ডব (সত্ত্ব গুণের ধর্ম) জ্ঞানের প্রকাশ, (রজো গুণের ধর্ম) কর্মে প্রবৃত্তির উদয় (তমো গুণের ধর্ম) মোহ, এই সকলের মধ্যে যে কোনটির উদয় হউক না কেন কিছুতেই যাহার দ্বেষ এবং সেই সকল নিবৃত্ত হইলেও যিনি ইহার কোনটিরই উদয় ইচ্ছা করেন না, এবং উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত হইয়া গুণের দ্বারা যিনি বিচলিত হন না, গুণই কর্মেতে বৃত্তিযুক্ত হইতেছে এইরূপ ধারণা করিয়া যিনি আপনাতে স্থির থাকেন, তিনিই গুণাতীত। অতএব ত্রিগুণাতীত পুরুষ যে দ্বিরূপে স্থিত হইয়া গুণের কার্যে বিচলিত হয়েন না,—তাহা ভগবান স্পষ্টই এখানে বলিলেন এবং গীতার অন্যত্রও আছে :—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্বশঃ।
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥

এই শ্লোকেও দেখা যাইতেছে, প্রকৃতির গুণের দ্বারাই কার্য হইয়া থাকে, জীব মিথ্যা অহংকারের বশীভূত হইয়াই, নিজেকে ঐ কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে। ঐরূপ মনে না করিয়া, যিনি নিজেকে এইরূপ মনে করিতে পারেন—গীতার ভাষায়—

"তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥"

হে মহাবাহো যে পুরুষ এই তত্ত্ব অবগত আছেন যে গুণ ও তৎকার্যভূত কর্ম, উভয় হইতেই তিনি ভিন্ন—ইহারা তাহার নহে, তিনি (কর্মকালে) মনে করেন যে গুণাত্মক ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ের প্রতি বৃত্তিসম্পন্ন হইতেছে, তিনি নিজে ইহাদের পরিচালক অথবা কর্তা নহেন; এই মনে করিয়া তিনি কখনো কর্মে আসক্তচিত্ত হন না" তিনিই যথার্থ দর্শী। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে "রাগ" "দ্বেষের" বশীভূত হইও না কথাটা অর্জুনের স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তদবস্থায় স্থিত হইবার জন্য বলা হইয়াছে, যে অবস্থায় স্থিত হইলে, অর্জুনের অবস্থায় ও গীতার ভাষায় বলা যাইবে—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

উপরি উক্ত ভগবৎ বাক্যই যখন সার সত্য এবং তদনুযায়ী আত্মজ্ঞ জীব যখন সব কিছু করিয়াও কিছু করেন না। তখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের "রাগ" "দ্বেষ" স্বাভাবিক হইলেও তাহাতে অর্থাৎ এই "রাগ" "দ্বেষে" তত্ত্বজ্ঞের বশীভূত না হওয়া সম্ভব, তাহা শাস্ত্র এবং যুক্তিসংগত বলিয়াই মনে করিতে হইবে এবং ভগবৎ বাক্য যে স্ববিরোধী নয়—তাহা বলাই বাহুল্য।

এইবার সাংখ্য মতে বিচার করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। পুরুষ সান্নিধ্যেই প্রকৃতি কার্যশীলা,—কিন্তু স্বরূপত পুরুষ নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপ। চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মক জগতের সংগে প্রত্যাগাত্মা জীবের কোন সম্বন্ধ না না থাকিলেও সান্নিধ্য বশতঃ তাহাতে মিথ্যাকল্পে আত্মবুদ্ধি করিয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়—এবং দুঃখভাগী হয়। আত্মা স্বরূপত গুণ বর্জিত হইলেও প্রকৃতি সান্নিধ্যে—কেন নিজেকে সগুণ বলিয়া মনে করে,—তাহা বুঝাইবার জন্য স্ফটিক ও জবাকুসুমের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। শুদ্ধ স্ফটিক যেমন জবাকুসুমের সান্নিধ্যে রঞ্জিত দেখায়, কিন্তু স্বরূপত বিশুদ্ধই থাকে,—প্রকৃতির গুণ সান্নিধ্যে পুরুষও নিজেকে তদ্বৎ মনে করে। আসলে কিন্তু পুরুষ শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য মুক্ত স্বভাব। —প্রকৃতির কার্যের সংগে তার কোনই যোগ নাই—"শরীরাদি ব্যতিরিক্তঃ পুমান্" (সাংখ্য ১ অঃ ১৯ সূ) পুরুষ—আত্মা শরীরাদি প্রকৃতিবর্গ হইতে পৃথক্। কিন্তু তবু সান্নিধ্য বশতঃ যে অনাত্ম প্রকৃতি-বর্গে আত্ম বুদ্ধি হয়—এবং তৎফলে যে বন্ধন হয় —তাহার কারণ সাংখ্যকার বলিলেন—"বন্ধো বিপর্যয়াৎ"। (৩য়ঃ ২৪ সূত্র)

বিপর্যয় অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া মনে করা, অনাত্মকে আত্ম বলিয়া ভ্রম করা—ইহাই বিপর্যয়—মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। এখন বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় বলিতে যাইয়া সূত্রকার বলিলেন—"জ্ঞানান্মুক্তি" (৩য় অঃ ২৩ সূত্র) জ্ঞান হইতেই মুক্তি। এই জ্ঞান অর্থ, প্রকৃতি বর্গ হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থিত স্বীয় স্বরূপের জ্ঞান। এই পার্থক্য-জ্ঞানই যথার্থ-জ্ঞান—এবং তাহাতেই মুক্তি। কি ভাবে এই জ্ঞান লাভ করা যায়?—তদুত্তরে বলা হইয়াছে —"তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি-ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ" (তৃতীয় অঃ ৭৫ সূত্র) পুনঃ পুন আত্মতত্ত্ব চিন্তা এবং আমি দেহ নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি ইত্যাদি ক্রমে প্রকৃতিবর্গের সহিত সংগত্যাগরূপ ধ্যান হইতেই বিবেকজ্ঞান সিদ্ধ হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ের প্রিয় বস্তুর প্রতি "রাগ" এবং অপ্রিয় বস্তুর বিদ্বেষ স্বাভাবিক হইলেও তাহার সংগে স্বরূপত নির্গুণ চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের কোনই সম্বন্ধ নাই। কাজেই তুমি "রাগ" "দ্বেষের" বশীভূত হইও না,—বলিতে যাইয়া এখানে ভগবান চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে পৃথক্ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব অর্জুনের স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—কারণ স্বরূপজ্ঞানে প্রকৃতির কার্য হইতে নিজেকে পৃথক্ বোধ করাই তো সাংখ্যজ্ঞান;—তাই সাংখ্যকার বলিলেন :—

"অসংগয়েং পুরুষঃ"

আধুনিক উপন্যাসে হাস্যরস *

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এম এ

গত কয়েক বছর থেকে আমরা লক্ষ্য করছি বাঙ্‌লা কথাসাহিত্যের ধারা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। আধুনিক সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনা কৌশল ও বলবার ভঙ্গির ওপর বেশী মনোযোগ দিচ্ছেন বিষয়বস্তুর চেয়ে, অর্থাৎ কেমন করে বলা হল এইটিই বড় কথা তাঁদের কাছে, অথচ কি বলা হল সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। এক কথায় তাঁরা বড় বেশী aesthete হয়ে পড়ছেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল intellectual snobbery, যে কারণে কোনও কোনও আধুনিক সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের দেবদাসের মতো উপন্যাসকেও sobstuff বলে অভিহিত করেছেন। উপন্যাসে tragedyর সুর থাকলেই তা হবে sobstuff, আবার লঘু হাস্যচঞ্চল comedy হলেও তার কোনও মূল্য থাকবে না। প্রভাতকুমারের মতো উচ্চ শ্রেণীর গল্প লেখকও নাকি ভবিষ্যতের কষ্টিপাথরে মেকী বলে প্রমাণিত হয়ে গেছেন। যাই হোক, এসব রসবোধহীন সমালোচকের কথা ছেড়ে দিলেও, একথা সত্য যে আধুনিক বহু সাহিত্যিকই আর ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না তাঁদের উপন্যাসে। ঠিক তেমনই সরস হাস্যকৌতুকও (humour) আর বিশেষ আমল পাচ্ছে না তাঁদের কাছে। ফলে তাঁদের উপন্যাস অত্যন্ত নীরস হয়ে পড়ছে। কেউ কেউ আদি রসের অবাধ পরিবেশন করে সে নীরসতা অতিক্রম করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ সফল হয় নি এঁদের কেউ। কারণ তাতে যে মাত্রাজ্ঞান ও সামঞ্জস্য জ্ঞানের প্রয়োজন তা এঁদের কারুর নেই।

তাই একটা জিনিস অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছি, এই সব অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কেউ একখানা উল্লেখযোগ্য ভাল উপন্যাস লিখতে পারলেন না। শরৎচন্দ্রের পর বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে কয়খানা ভাল উপন্যাস লেখা হয়েছে—যেমন দিদি, শশিনাথ, পথের পাঁচালী, দোলা, পথিক প্রভৃতি—তার একখানাও তাঁদের কারুর হাত থেকে বেরয় নি, বেরিয়েছে রবীন্দ্র-শরৎ-পন্থী ঔপন্যাসিকদের হাত থেকেই। উপেন্দ্রনাথ রচনার ধারা হিস্যাবে রবীন্দ্র-শরৎ-পন্থী। তাই তাঁর হাত থেকে আমরা অতীতেও যেমন অনেকগুলি ভাল বই পেয়েছি, এখনও তেমনি পাচ্ছি।

রসই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য; সেই রসের বৈচিত্র্য এবং মাত্রাজ্ঞানই সাহিত্যের উৎকর্ষের মাপকাঠি। করুণ রস, হাস্যরস প্রভৃতি প্রধান রসগুলিকে ছেঁটে ফেলে কেবল আদিরস নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে রস সৃষ্টির বৈচিত্র্যই শুধু কমে যায় না, মাত্রাজ্ঞানের সীমাও ছাড়িয়ে যায়। আসল কথা, চাই সত্যিকারের রস সৃষ্টির ক্ষমতা। এই রস অচল, ঐ রস সচল এ বিচার ঔপন্যাসিকের নয়। যে কোনও রস নিয়েই ভাল ঔপন্যাসিক উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখতে পারেন। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' বা 'পরিণীতা' তাদের নিজের রস বিচারের দিক দিয়ে 'দেবদাস' বা 'চন্দ্রনাথে'র চেয়ে খাটো নয়।

এতো কথা বললাম শুধু এইটুকু জানাতে যে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের লেখায় হাস্যরস (humour) মোটেই স্থান পাচ্ছে না। হাস্যরস কথাটার প্রয়োগ করলাম শুধু যোগ্যতর কথার অভাবে—আমি বলতে চাই লঘু সরস সাহিত্য যা পড়লে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠে। ইংরেজী humour কথাটার প্রতিশব্দ বোধ হয় বাঙলায় নেই—তাই অভাবে পড়ে হাস্যরস কথাটার প্রয়োগ করতে হল। প্রসাদ রস কথাটা হয়তো humour অর্থে বাঙ্‌লায় চালান যেতে পারে, সুধীগণ বিবেচনা করবেন। আপাতত humour কথাটাই প্রযোজ্য, তাতে ভুল করবার সম্ভাবনা কম থাকবে।

প্রাচীনপন্থী লেখকদের মধ্যে যাঁরা humourist বলে নাম করেছিলেন, তাঁদের লেখাও আর আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। কেদারবাবুর লেখনী ক্ষীণস্রোত, পরশুরাম নীরব, একমাত্র বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের গল্পে আমরা সরস লঘু humourএর সাক্ষাৎ পাই। তাই প্রবীণ ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথের 'ছদ্মবেশী'তে তাঁর পূর্বতন 'অমলতরু'র যুগের লঘু humourএর দেখা পেয়ে ভারি ভাল লাগল। উপন্যাসপ্লাবিত বাঙ্‌লা সাহিত্যে উপন্যাসের অভাব নেই, কিন্তু এমন একটি লঘু সরস ও চিত্তাকর্ষক উপন্যাস বহুদিন পড়ি নি, একথা বলতে পেরে ভারি আনন্দ পাচ্ছি। উপেন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে এমন একটি মনোমুগ্ধকর যাদু আছে যে একবার পড়তে বসলে শেষ না করে থাকা যায় না। এক শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কোনও ঔপন্যাসিকের এই গুণটি নেই। সাধারণত আমরা উপন্যাসের চিত্তাকর্ষকতা গুণকে বিশেষ মূল্য দিই না। কিন্তু Viscount Bryce প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের মতে উপন্যাস বা অন্য যে কোনও পুস্তকের ঐটিই সর্বাপেক্ষা বড় গুণ।

'ছদ্মবেশী' উপন্যাসটি 'অমলতরু'র মতো কয়েকজনের সকৌতুক ষড়যন্ত্রের ফল। উদ্ভিদ্ বৈজ্ঞানিক অবনীশ মিত্র যখন সুলেখা দত্তকে বিবাহ করে, তখন সুলেখার দিদি লাবণ্য ও ভগিনীপতি প্রশান্ত সেই বিবাহে কার্যগতিকে উপস্থিত হতে পারে নি। তারা তখন এলাহাবাদে থাকত। বিবাহের পর তারা অবনীশ ও সুলেখাকে এলাহাবাদে তাদের সঙ্গে কয়েকদিন যাপন করবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে। তারা অবনীশকে চিনত না, এই সুযোগে অবনীশ তাদের বাড়ির ড্রাইভারের কাজ গ্রহণ করে এবং অবনীশের পরিচয়ে সুবিমল নামে তার এক বন্ধু এলাহাবাদে লাবণ্যদের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। এই সময়ে লেখক সুকৌশলে সুবিমলকে অন্যত্র বাস করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন; না হলে অনর্থ ঘটত। কিন্তু সেখানেও অনর্থ ঘটল। সেই বাড়ির একটি মেয়ে বসুধা সুবিমলকে ধরে বসল উদ্ভিদ্ বিদ্যার কয়েকটি পাঠ নেবার জন্যে। সুবিমল পদার্থবিদ্যার লোক, উদ্ভিদ্ বিদ্যার বিন্দুবিসর্গও জানে না। এইখানে লেখক চমৎকার রস সৃষ্টি করেছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুবিমলকে সবই স্বীকার করতে হল ও তাতেই তার ভাগ্যে বসুধা লাভ ঘটল।

মোটামুটি ঘটনাটি এই। কিন্তু মধ্যে লেখক যে একটি লঘু tragedyর সুর এনেছেন তাতে উপন্যাসটির রস আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। শেষের দিকে আবার সুবিমল-বসুধার কাহিনীতে মন পুনরায় উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

চরিত্রগুলি সুচিত্রিত এবং সজীব। বইখানি শেষ করবার পর মনে হয় যেন এদের কোথায় দেখেছি, এরা একান্ত পরিচিত—দেখা হলেই "এই যে অবনীশবাবু, ভাল তো," বলে অভিবাদন করতে হবে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ছাড়া এমন সজীব চরিত্র আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। উপেন্দ্রনাথের সৃষ্ট চরিত্রগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা প্রত্যেকেই যথার্থ ভদ্র মন নিয়ে চলাফেরা করে। অন্যায় যদি কিছু করে তো সেটা নিতান্তই খেলার ছলেই করে, তাই তাঁর উপন্যাস শেষ করে মনের মধ্যে কোনও ক্ষত খচ্‌খচ্ করে না—সমস্ত মন বেশ একটি অমায়িক আনন্দে প্রসন্ন হয়ে উঠে। লেখার এ প্রসাদ গুণ সত্যিই দুর্লভ, বিশেষ করে আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে।

মনস্তত্ত্ব মূলক গুরু সাহিত্যে উপেন্দ্রনাথের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বহুপূর্বেই, তাঁর 'শশিনাথ' প্রকাশিত হবার পর থেকে। শরৎচন্দ্রের লেখার কথা বাদ দিলে 'শশিনাথে'র মতো এমন চমৎকার উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর নেই। কিন্তু লঘু সরস সাহিত্যেও যে তাঁর স্থান অতিশয় উচ্চে, তা প্রমাণ করেছে 'অমলতরু', 'রাজপথ' প্রভৃতি গ্রন্থ। 'ছদ্মবেশী' তাঁর সেই খ্যাতি আরও উজ্জ্বল করে তুলবে।

ছাপা, বাঁধাই উত্তম। বর্তমান দুর্মূল্যতার দিনে চমৎকার অ্যান্টিক কাগজে ছাপা এত বড় বইয়ের দাম আড়াই টাকা অল্পই হয়েছে বলতে হবে। আমরা আশা করি বইখানি বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে পঠিত হবে এবং বাঙালী পাঠকবর্গ আধুনিক সাহিত্যের নীরস ও রুচিবহির্ভূত অপাঠ্য উপন্যাসের বদলে এমন একখানি সুন্দর সরস বই পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবেন।

* ছদ্মবেশী (উপন্যাস)ঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ১৬৫ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতাস্থিত জয়শ্রী পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। ২৬২+৬ পৃষ্ঠা। মূল্য মাত্র আড়াই টাকা।

সার্দিনিয়ায় অবতরণ করিয়াছে। ওয়াশিংটনে এই সংবাদ সমর্থিত হয় নাই।

কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ১৮৩ জন অনশনপীড়িতকে ভর্তি করা হয়। এই দিন বিভিন্ন হাসপাতালে এইরূপ ৩৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়

৫ই সেপ্টেম্বর

ইতালীর মূল ভূখণ্ডে বাগনারা ও মেলিতো মিত্রবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। মিত্র-বহিনী সমগ্র রণাঙ্গন জুড়িয়া অগ্রসর হইতেছে। আলজিয়ার্স রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, অষ্টম আর্মির হস্তে দুই সহস্র এক্সিস সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ ইতালীয়ান। বাগনারা পালমীর উপকণ্ঠে অবস্থিত। জেনারেল মণ্টগোমারী রেজ্জো হইতে মিত্রবাহিনী পরিচালনা করিতেছেন। এইরূপ অনুমিত হয় যে, মার্শাল কেসেলরিং দক্ষিণ ইউরোপে মিত্রপক্ষের অভিযান প্রতিরোধে নিযুক্ত এক্সিস বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং তৎসহ জেনারেল রিখতোফেন সেনাপতিমণ্ডলীর কর্তা ও প্রিন্স পিয়েডমণ্ট ইতালীয়ান বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন।

মস্কোর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ডনবাসের মধ্যস্থল দিয়া এক্ষণে সংগ্রাম প্রসার লাভ করিতেছে এবং গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করিয়া জার্মান বাহিনী পিছু হটিয়া যাইতেছে।

স্বদেশী যুগের অন্যতম বিশিষ্টা মহিলা-কর্মী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু গত শনিবার শেষ রাত্রে তাঁহার ৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা বসু স্বনামধন্য স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা ছিলেন।

বাঙলাদেশে খাদ্যশস্য সরবরাহ সম্পর্কে অদ্য উড়িষ্যা ও বাঙলার মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তদনুযায়ী উড়িষ্যা বাঙলাদেশকে ৪ লক্ষ মণ ধান সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছে।

অদ্য ১৩৭ জন অনশনপীড়িতকে কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং হাসপাতালসমূহে এইরূপ ৩০ জন অনশনক্লিষ্টের মৃত্যু হয়। অদ্য শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে ২১টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয়। গতকল্য নগরীর পথ হইতে ২৫টি মৃতদেহ অপসারণ করা হইয়াছিল।

যশোহরের সংবাদে প্রকাশ, যশোহরে অনশনক্লিষ্ট ১৩ জন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। জিয়াগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, গত ১লা সেপ্টেম্বর একজন ভিক্ষুকের মৃত্যু হইয়াছে এবং আজিমগঞ্জ হইতে প্রায় ১০ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৬ই সেপ্টেম্বর

দক্ষিণ ইতালীতে বৃটিশ ও কানাডিয়ান অভিযাত্রী বাহিনী ক্যালাব্রিয়া উপদ্বীপে নিজেদের ঘাঁটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিয়াছে। সিলিকা হইতে সান স্টেফানো এবং রেজ্জো পর্যন্ত স্থানে শত্রু-ব্যূহকে তাহারা দশ মাইল পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে।

ক্যালাব্রিয়া উপকূল হইতে ১০ মাইল দূরবর্তী সানস্টেফানো মিত্রবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। জার্মান নিউজ এজেন্সী জানাইয়াছেন যে, ইতালীয়ান ও জার্মান সমরনায়কগণ পরিকল্পনানুযায়ী দক্ষিণ ক্যালাব্রিয়া হইতে সরিয়া গিয়াছে।

আর্তেমভস্ক দখল করা হইয়াছে বলিয়া মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। বার্লিন হইতে জার্মান নিউজ এজেন্সী জানাইতেছেন, রুশেরা ট্যাংক বাহিনীর সাহায্যে কিরোভের পশ্চিমে জার্মান ব্যূহে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রিয়ানস্কের ৬০ মাইল উত্তরে এবং স্মলেনস্কের ১১০ মাইল পূর্বে কিরোভ অবস্থিত।

জার্মান নিউজ এজেন্সী জানাইয়াছেন যে, ডোনেৎস অববাহিকা অঞ্চলে জার্মান ব্যূহের সংকোচ সাধন কার্য কয়েক দিন হয় চলিয়াছে। রুশ ট্যাংক বাহিনী ডনবাস অঞ্চলের প্রধান জার্মান ঘাঁটি স্ট্যালিনোর দশ মাইলের মধ্যে আসিয়া পেঁৗছিয়াছে।

বাঙলার নবনিযুক্ত অস্থায়ী গবর্নর স্যার টমাস রাদারফোর্ড অদ্য প্রাতে বিমানযোগে দিল্লী হইতে কলিকাতায় আসিয়া পেঁৗছেন। অপরাহ্ণে তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

চতুর্থ বার্ষিক সাহিত্য এবং শিল্প প্রতিযোগিতা

বিষয়—সর্বসাধারণের জন্য (পুরস্কার রৌপ্য এবং স্মৃতিপদক)। **প্রবন্ধ**—বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ মনীষী কে ও কেন? (তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার দৃষ্টান্ত ও সমালোচনা)। **গল্প**—সামাজিক, অলৌকিক কিংবা অভিনব ঘটনা অবলম্বনে যে কোন গল্প। **আলোকচিত্র**—(ফটোগ্রাফী) যে কোন ছবি।

দ্রঃ—বিস্তৃত বিবরণের জন্য প্রয়োজন হইলে সম্পাদকের সহিত পত্রবিনিময় করিতে পারেন। চিত্র প্রবন্ধাদি পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৫০ সাল।

তৃতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :—

প্রবন্ধ—(পুরুষ বিভাগ) ১ম শ্রীঅনুপম চট্টোপাধ্যায় (দেওঘর)। (মহিলা বিভাগ) ১ম শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ (কলিকাতা)।

গল্প—১ম শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য (কলিকাতা)।

কবিতা—১ম শ্রীমৃণালকান্তি রায় (হুগলী, মহেশতলা)।

আলোকচিত্র—১ম শ্রীক্ষুদিরাম রক্ষিত (বাঁকুড়া)।

শ্রীনীহার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, বেলাবাগান বালক সংঘ, পোঃ আঃ বৈদ্যনাথ, দেওঘর।



দেশ

সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ ।   শনিবার, ১লা আশ্বিন ১৩৫০ সাল। Saturday, 18th September, 1943.   [৪৫শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙলার অবস্থা

স্যার জগদীশপ্রসাদের নাম সকলেই জানেন। কিছুদিন তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত ছিলেন। বাঙলা দেশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন—

ফরিদপুরের একটি লঙ্গরখানায় আমি একজন লোককে কুকুরের মত খাদ্য লেহন করিতে দেখি। প্রত্যহ পথিপার্শ্ব হইতে মৃতদেহ এবং অনশনক্লিষ্ট রুগ্ন নরনারীকে অপসারিত করা হইতেছে। একজন লোক খাদ্যান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া কালেক্টরের আদালতের দ্বারে উপস্থিত হয় এবং তথায় সিঁড়িতে পড়িয়া মারা যায়। তাহার মৃতদেহ অপসারণ করিবার সময় এক কোণে আড়ষ্টভাবে উপবিষ্ট একটি নারী একটা পুটুলী ঠেলিয়া দিয়া বলে,—"এটাও লইয়া যাও।" ঐ পুটুলীতে তাহার সন্তানের মৃতদেহ ছিল। আমাদের নিকট অবশ্য এই বর্ণনায় নূতনত্ব কিছুই নাই। কলিকাতার মত ধনীর শহরে অবস্থান করিয়াও আমরা অনুরূপ ঘটনা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি, মফঃস্বলের অবস্থার কথা না বলাই ভাল। আমাদের এমন সংবাদ প্রচারের প্রয়োজন না থাকিলেও বাঙলা দেশের বাহিরের লোকের পক্ষে সে প্রয়োজন রহিয়াছে। এই ধরণের সংবাদ প্রচারের ফলে বাঙলা দেশের প্রকৃত অবস্থা বাহিরের লোকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে এবং চারিদিক হইতে বর্তমান বিপদে বাঙলাদেশকে সাহায্য করিবার জন্য মানবতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাঙলা সরকার ইহার মধ্যে হঠাৎ এ সম্বন্ধে নূতন মতিগতি অবলম্বন করেন। তাঁহারা কলিকাতা শহরে যে সব নরনারী অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে কিংবা রুগ্ন অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত হইতেছে, সরকারীসূত্র হইতে তাহাদের সংখ্যা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। মঙ্গলবারের দৈনিক সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে, বাঙলা সরকার প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক শহরের বিভিন্ন হাসপাতালের মৃত্যু সংবাদ এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে ভর্তি করার খবর পুনরায় প্রকাশ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন এই যে, এই সংবাদ প্রকাশ কোন্ প্রয়োজনে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল?* মামুলী যুক্তি অনুসারে এক্ষেত্রেও যদি ভুল বুঝিয়া করা হইয়া থাকে, তবে এমন ভুল হয় কেন? প্রচার বিভাগের ডিরেক্টরের এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, যে সব ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার অধিকাংশই অবহেলার দরুণ রোগ কঠিন আকার ধারণ করায় ঘটিয়াছে। নিশ্চয়ই মৃত্যুর গুরুত্ব লাঘব করিবার পক্ষে এ যুক্তি খাটে না এবং ডিরেক্টার মহাশয় যে মূল্যবান্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেজন্য বিশেষ গবেষণা করিবারও প্রয়োজন ছিল না। শহরের আশ্রয়প্রার্থীদের দুর্দশা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, অবহেলার দরুণ রোগ কঠিন আকার ধারণ করিয়া এই সব নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইল কেন। যথাসময়ে ইহাদের শুশ্রূষা, খাদ্য দান এবং আশ্রয় বিধান করিলে নিশ্চয়ই ইহারা এভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। বাঙলাদেশের রাজধানী কলিকাতায় যাহারা আশ্রয় লইয়াছে, তাহারাই যদি এইভাবে যথাসময়ে শুশ্রূষা ও খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা অবলম্বন না করার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে মফঃস্বলে যে কি অবস্থা ঘটিতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। উৎকট রকমের অস্বাভাবিক না হইলে

মফঃস্বলের অনশন সম্পর্কিত অবস্থার বিশেষ কোন সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশ আজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। মানুষ পোকা-মাকড়ের মত অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; মৃত্যুর ভয়াবহ লীলা আজ যেভাবে এই অভিশপ্ত দেশে দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুল্য ঘটনা বিরল। এই অবস্থার প্রতিকার হইবে কিনা জানি না; কিন্তু যদি না হয়, তবে বাঙ্গালী সমাজের দুই তিন পুরুষ একত্র ধ্বংস হইয়া যাইবে। বাঙলার ব্যাপক অঞ্চল জনহীন অরণ্যে পরিণত হইবে।

কার্যকর ব্যবস্থার পথ

আমরা বহুপূর্বে শুনিয়াছি, একবার ফরিদপুরে প্রবল অন্নাভাব দেখা দেয়; তথাপি স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট 'দুর্ভিক্ষ' বলিতে রাজী না হইয়া বলেন,—'গাছে এখনও পাতা আছে, স্ত্রীলোকও কুলত্যাগ করে নাই, সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয় নাই। কিন্তু বাঙলার অবস্থা আজ অবর্ণনীয়। স্যার জগদীশেরই ভাষায় বলিতে হয়, স্মরণযোগ্য কালের মধ্যে বাঙলা দেশে এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা যায় নাই। বাঙলার খাদ্য-সচিব বলিয়াছেন যে, তিনি দুর্ভিক্ষ ঘোষণা না করিলেও দুর্ভিক্ষাবস্থা স্বীকার করিতেছেন এবং সেই ভিত্তিতে সাহায্যমূলক কর্মনীতি নির্ধারণ করিতেছেন। কিন্তু স্যার জগদীশ সম্প্রতি যে বিবৃতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি বলেন, সরকারী অন্নসত্রসমূহে যে পরিমাণ খাদ্য মণ্ড বিতরণ করা হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা মানুষকে বাঁচানো চলে না। এই সামান্য আহার্য দিয়া লোকের যন্ত্রণাই বাড়ানো হইতেছে। স্যার জগদীশের এই বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার পর দেখিতেছি বাঙলা সরকার সরকারী অন্ন-সত্রসমূহে মণ্ড বিতরণের পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দিয়াছেন; কিন্তু দেশের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যাঁহাদের প্রত্যক্ষভাবে পরি-চয় থাকিবার কথা তাঁহাদের পক্ষে এজন্য বাহির হইতে পরামর্শ পাওয়া প্রয়োজন হইল কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। আমাদের মতে দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং জনসেবক কর্মীদের সঙ্গে সরকারের এই ক্ষেত্রে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কাজ করা প্রয়োজন। দেশ সেবার ক্ষেত্রে যাঁহারা ত্যাগের পরিচয় প্রদান করিয়া-ছেন, তাঁহারাই বর্তমানের এই সমস্যার দিনে আন্তরিকভাবে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগে সমর্থ হইবেন এবং তাঁহারাই দেশের সকল শ্রেণীর জনসাধারণের আস্থাবান ব্যক্তি। মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানের সাহায্য কেন্দ্রগুলির পরিচালনা ব্যাপারে ইহাদের সম্পর্ক থাকিলে সেগুলি সুপরিচালিত হইবে; কারণ স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে কার্যকর অভিজ্ঞতা ইঁহাদের রহিয়াছে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বাঙলাদেশের রাজনীতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা কর্তব্য। বাঙলার নবনিযুক্ত গভর্নর স্যার টমাস রাদারফোর্ডের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইবে, আমরা ইহা আশা করি। প্রকৃতপক্ষে দলগত রাজ-নীতির পথ বর্তমানে বড় নয়; দেশের লোককে রক্ষা করিবার কর্তব্যই সর্বপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। রাজনীতিক বন্দীদের সম্বন্ধে আমলাতান্ত্রিক সংস্কার মন হইতে দূর করিয়া দেশকর্মিগণকে আজ দেশের সেবার সুযোগ প্রদান করা হউক এবং ইহা-দের সাহায্য বাঙলার গ্রামে গ্রামে নিরন্নের রক্ষা সম্পর্কে সেবাকার্য সম্প্রসারিত করা হউক; তবেই এক্ষেত্রে অব্যবস্থা, কুব্যবস্থা এবং সর্বোপরি লাভখোরদের মনোবৃত্তি ও দুর্নীতি সম্পর্কে নানারূপ যে সব অভি-যোগ উঠিতেছে, সেগুলির কারণ দূর হইবে। পক্ষান্তরে দেশসেবা এবং জন-সেবার প্রেরণা যাঁহাদের অন্তরে নাই, তাহা-দের দ্বারা এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে জনসাধারণের মনে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ, সংশয় এবং অভিযোগের কারণ থাকিবেই; কিছু দিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে।

শহরের সমস্যা

বাঙলার খাদ্যসচিব ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আগস্ট মাসের শেষভাগেই কলিকাতা শহরে শতাধিক সরকারী কন্ট্রোল দোকান খোলা হইবে; এই ঘোষণা কতটা কার্যে পরিণত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সরকারী কোন বিজ্ঞপ্তি অতঃপর প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু সামান্য যে কয়েকটি সরকারী দোকান আছে, সেই কয়েকটিতেও যথারীতি জিনিস-পত্র পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, মাল সরবরাহেরই যদি সুব্যবস্থা না থাকে, তবে এই সব কন্ট্রোলের দোকান বা রেসনিং বা আধা-রেসনিংয়ের পরিকল্পনারও কোন মূল্যই নাই। শহরবাসীদের পক্ষে ক্রমেই জীবনযাত্রা দুর্বহ হইয়া উঠিতেছে। বাজারে চাউল মিলে না, ডাল মিলে না, আটা নাই, ময়দা নাই—চিনি, মিছরি তো দুর্লভ বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। সরিষার তেল বহু দোকান ঘুরিয়াও সংগ্রহ করা কঠিন; ইহার উপর কয়লার সমস্যা তো ক্রমেই নিদারুণ হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর বস্ত্র সমস্যা। সম্প্রতি সরকার হইতে এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে যে, ১৫ই সেপ্টেম্বরের পর হইতে সরকার কর্তৃক নির্বাচিত কলিকাতার ৩৬টি দোকানে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়েরর একেবারে আড়ং সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। অনেক আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া এই বিপুল সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচয় বিজ্ঞপ্তির শেষ-ভাগে পাওয়া গেল। সে সরবরাহের স্বরূপ এই যে, প্রত্যেক পরিবার নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট এ আর পি'র পড়চা দেখাইয়া, ইহার পূর্বে যে কাপড় লইয়াছে, তাহা হিসাবে ধরিয়া তিনখানা করিয়া কাপড় ক্রয় করিতে পারিবে। সে তিনখানার মধ্যেও একখানা শিশুদের পরিধেয়-প্রমাণ হওয়া চাই। স্ট্যান্ডার্ড কাপড় সরবরাহ করিয়া পূজার বজারে কাপড়ের অভাব দূর করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে এই ধরণের বিবৃতি আমরা ইতিপূর্বে পাঠ করিয়া-ছিলাম। দেখা যাইতেছে দেশের বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের সে ব্যবস্থাও যথারীতি বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ায় পরিণত হইল।

বিধানের সার্থকতা

সরকারী সর্বোচ্চ মূল্য নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে চাউলের মণ ২৬৲ টাকা হইবার কথা; কিন্তু সে কথা লোকের পক্ষে কাজে কিছু মাত্র আসে নাই। এ পর্যন্ত মফঃস্বলে কোথায়ও বাজারে সরকারের নির্ধারিত দরে চাউল পাওয়া যাইতেছে না; অধিকাংশ স্থানেই বজার হইতে চাউল একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। শহরের লোকদের কোনরকমে দিন গুজরানো চলিতেছে; কিন্তু মফঃস্বলের লোকদের দুর্দশার অন্ত নাই। গরীব যাহারা তাহাদের কথা উল্লেখ না করাই ভালো; মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরাও অন্নাভাবে উত্তরোত্তর ভগ্নদেহ হইয়া পড়িতেছে এবং এইভাবে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। সরকারী অন্নসত্র ক্বচিৎ কোথায়ও টিম টিম করিয়া শুধু সরকারী দাতব্যের রীতি রক্ষার মত চলিতেছে; কিন্তু দেশব্যাপী দুরন্ত অন্ন-সমস্যার সমুদ্রে সে পাদ্যার্ঘ্যেরই তুল্য। বাঙলা দেশ জুড়িয়া নিরন্নের খাদ্য সংস্থানের কার্যকর এবং ব্যাপক পরিকল্পনা এখনও কিছুমাত্র কার্যকর দেখা যাইতেছে না। কলিকাতা শহরে কতকগুলি দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমস্যার যথাসাধ্য সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-প্রণালী বাঙলা দেশের মফঃস্বলে যথোপযুক্তভাবে সম্প্রসারিত হয় নাই; এপথে বিঘ্নও অনেক রহিয়াছে; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সহিত রেলপথে সংযোগসূত্রের কেন্দ্রস্থল এই

কলিকাতা শহরেই খাদ্য সরবরাহের সুবিধার অভাবে বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কার্যে ইতিমধ্যেই নানাভাবে অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে: এরূপ অবস্থায় বাঙলা দেশের সুদূর মফঃস্বলে খাদ্যশস্য লইয়া গিয়া সাহায্যকার্য পরিচালনা করা কত কঠিন, সহজেই বুঝিতে পারা যায়; প্রকৃতপক্ষে সরকার যদি নিজেরা এসম্বন্ধে ষোলআনা দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তবে এমন ব্যাপক সমস্যার সমাধান কিছুতেই হইতে পারে না। দেশের লোকের প্রাণরক্ষা করিবার দায়িত্ব প্রত্যেক দেশের গভর্নমেণ্টের প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এদেশে তাহা কেন হইবে না, আমরা বুঝিতে পারি না; অবিলম্বে বাঙলা দেশকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়া গভর্নমেণ্টের সেই দায়িত্ব নিজেদের উপর গ্রহণ করা উচিত। সম্প্রতি এই দায়িত্ব সম্পর্কে বাঙলা গভর্নমেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট এই উভয়ের মধ্যে একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে; আমরা বাহির হইতেও তাহার বেশ একটু আভাস পাইতেছি। আমরা কখনও শুনিতেছি ভারত গভর্নমেণ্ট বাঙলা দেশের ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন, কখনও শুনিতেছি, এই তদন্তের সুবিধা করিবার জন্য ভারতরক্ষা বিধানের ৯৩ ধারা জারী হইবে, কখনও শুনিতেছি বাঙলা দেশে নূতন একজন ফুড কমিশনার নিযুক্ত হইতেছেন এবং ব্রেয়ার সাহেব ছুটি ছাড়িয়া এজন্য পুনরায় কাজে যোগ দিবেন। কেহ কেহ এমন কথাও বলিতেছেন যে, বাঙলা দেশের নবনিযুক্ত গভর্নর স্যার টমাস রাদারফোর্ড সংকল্পশীল ব্যক্তি। তিনি পাকাপোক্ত রকমে বাঙলার বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। এই সব আলোচনা, গবেষণা, বিবৃতি, বিজ্ঞপ্তি আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র সান্ত্বনার কারণ সৃষ্টি করে না। বাঙলা দেশের খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দী দিল্লী ও লাহোর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেদিন যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আগামী-কল্যের সম্বন্ধেও আমাদের পক্ষে সুনিশ্চিত কিছু ভরসা করা সম্ভব হয় না। আমরা অবিলম্বে কাজ চাই। বাহির হইতে আজ যে খাদ্যদ্রব্য আসিতেছে, তাহাতে যদি বাজারে দর না কমিয়া উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে তাহা হইলে যে শস্য ভবিষ্যতে আসিবে তাহাতেও যে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে এমন সম্ভাবনা কোথায়? এরূপ অবস্থায় শুধু দর কমাইলে চলিবে না; দেশের লোকের খাদ্য সংস্থানের ভার প্রত্যক্ষ-ভাবে সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, বাঙলা দেশে অতি ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; সোজাসুজি ইহা ঘোষণা করা হউক এবং দুর্ভিক্ষ কমিশনারের ন্যায় একজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া দেশে-সর্বত্র খাদ্য-সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করা হউক। এসম্বন্ধে আর বিলম্ব করিবার সময় নাই।

বাঙলা সরকারের বাজেট—

গত ২৮শে ভাদ্র মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট নূতন করিয়া উপস্থিত করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকারের নির্দেশের ফলে কি শাসনতান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেওয়াতে অকালে পুনরায় বাজেট উপস্থিত করিতে হইল, সে আলোচনা আমরা এখানে করিতে চাহি না। নূতন বাজেটের প্রতি লক্ষ্য করিলে ঘাটতির পরিমাণ দেখিয়া চমকিত হইতে হয়। ঘাটতির পরিমাণ ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। অর্থসচিবের মতে এই ঘাটতির দুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্য যোগান এবং দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষজনিত দুর্দশা নিবারণকল্পে গভর্নমেণ্টের বর্ধিত ব্যয়। ঘাটতির কারণ বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না; কিন্তু গভর্নমেণ্টের যে ব্যয়ের জন্য যে ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে বা দাঁড়াইবে অনুমান করা যাইতেছে, তাহাতে দেশের বর্তমান দুর্দশা কতটুকু দুর্দশা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে বা হইতে পারে ইহাই বিবেচ্য। আমাদের মতে এ পর্যন্ত সরকার যে ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে দেশের দুর্দশার প্রকৃত সমাধানের পক্ষে কার্যকর কোন পরিকল্পনাই রূপ পরিগ্রহ করে নাই, বাজেটে যে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে, তাহাও তেমন ব্যবস্থা কার্যকর করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে বাজেটে ব্যাপক তেমন কোন পরিকল্পনার সুস্পষ্ট পরিচয়ও পাওয়া যায় না। ইহার উপর বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য বিক্রয়-কর এবং কৃষি আয়কর এই দুইটি নূতন করা বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙলা দেশের উপর এখন নূতন কর বসাইলে তাহার যত চাপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরই গিয়া পড়িবে। এরূপ ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য দাবী করাই অর্থসচিবের কর্তব্য ছিল; কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে নীরব। প্রকৃতপক্ষে এই বাজেট আমাদের মনে কোন আশাই সঞ্চার করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতের ভাবনাই আমাদিগের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ফলেন পরিচীয়তে

ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব সেদিন লাহোরে সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে বাঙলা দেশের বর্তমান খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে বলেন যে, সত্যই বাঙলায় দুরন্ত রকমে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। আগামী তিন মাসে এই সংকট অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে। স্যার জওলাপ্রসাদ এই সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বপ্রযত্নে ব্রতী হইয়াছেন, এইরূপ সংকল্প প্রকাশ করিয়া বলেন, এ জন্য খাদ্য শস্য হস্তগত করা, ধার করা এমন কি চুরি করিতেও তিনি দ্বিধা করিবেন না। এ সব অবশ্য ভাষারই উচ্ছ্বাস, কাজে কতটুকু দাঁড়ায়, আমরা তাহাই দেখিবার জন্য উৎ-কণ্ঠিত রহিলাম। এ পর্যন্ত তো ইহাই দেখিতে পাইতেছি যে, ভারত গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থা, বাঙলা সরকারের বিধি এবং বিধান এ সব সত্ত্বেও দেশের অবস্থার একটুও উন্নতি ঘটিতেছে না বরং উত্তরোত্তর অবস্থার গুরুত্বই পরিবর্ধিত হইতেছে। শহর ও মফঃস্বল সর্বত্রই অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বে-সরকারী প্রতি-ষ্ঠানগুলি যদি সাহায্য কার্যে সক্রিয় না থাকিত, তবে অন্নাভাবে মৃত্যুর সংখ্যা আরও অনেক বেশী হইত। এ অবস্থার প্রতিকার কোথায় এবং কতদিন পরে—দিকচক্রবালে সুদূরেও তো কোন আশারই আভাষ পাওয়া যাইতেছে না।

‘দেশ’ শারদীয়া সংখ্যা

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

পূর্বাপর বৎসরের ন্যায় এই বৎসর শারদীয়া সংখ্যা ‘দেশ’ সাধারণ সংখ্যার মধ্যে গণ্য হইবে না। ইহা পৃথক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হইবে। অতএব বাৎসরিক এবং ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণ শারদীয়া সংখ্যার ‘দেশ’ সাধারণ সংখ্যা হিসাবে পাইবেন না। তাঁহাদিগকে পৃথক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে।

মূল্য ৷৵০ আনা

ডাক মাশুল ৵৫; রেজিস্ট্রী ডাকযোগে ৷/৫ ভিঃ পিতে বই পাঠান হইবে না।

এখন হইতেই অগ্রিম মূল্য দিয়া নাম রেজেস্ট্রী করিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

— শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী —

চিত্রশিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

[৭]

নীচে নামিয়া দেখি ফলাফল জানিবার জন্য অন্য ছেলেরা জুটিয়া গিয়াছে। সকলে সমস্বরে শুধাইল—কি বলিলেন? কি বলিলেন? এ প্রশ্নের জন্য তো প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু ভাষজ্ঞান থাকিতে অপ্রস্তুতই বা হইব কেন? তিনি যাহা বলেন নাই, কোন কবিকে যাহা কখনো বলিবেন না—সেই সব প্রশংসা-বাক্য শুনাইয়া দিলাম। শেষে অবান্তরভাবে বলিলাম, পুডিং ও আনারসের কথা; আমার বন্ধুদের দেখিলাম প্রশংসার চেয়ে পুডিং ও আনারস সম্বন্ধেই কৌতূহল বেশি! বেরসিকের দল! মনে মনে স্থির করিলাম, এ লোকের সম্বন্ধে প্রশংসা-মূলক কবিতা আর কখনো লেখা হইবে না। সে প্রতিজ্ঞা আমি এ পর্যন্ত পালন করিয়া চলিয়াছি। তাঁহার তিরোভাবের পরে সমস্ত বাঙালী কবি যখন কবিতায় শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছিল, আমিই বোধ হয় একমাত্র কবি, যে কোন কবিতা লেখে নাই। আমি নিশ্চয় জানি, এজন্য তিনি স্বর্গ হইতে আমাকে অজস্র আশীর্বাদ করিয়াছেন।

তারপরে বড় হইলাম; বড়দের সাহিত্য-সভায় স্থান পাইলাম এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রসাদে দেশী মাল ছাড়িয়া বিদেশী চোরাই মাল আমদানী করিয়া গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পড়িতে শুরু করিলাম। প্রত্যেকটি রচনাতেই যে বাঙলা সাহিত্যে যুগান্তর ঘটিতেছে, এই ধারণা ক্রমে ক্রমে মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

গুরুদেব শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে সভায় আমন্ত্রণ করিতাম এবং তিনিও আগ্রহ সহকারে সভাপতি-রূপে যোগ দিতেন। সেদিন সভায় তিল ধারণের স্থান থাকিত না। যে-সব লেখকদের সাহস অল্প এবং কাণ্ডজ্ঞান বেশি, তাহারা সেদিন সভায় রচনা পড়িত না, কিন্তু আমি অকুতোভয়! আমার দুঃসাহস যেমন বেশি ছিল, পিঠের চামড়াও তেমনি পুরু ছিল, অবিকম্পিত কণ্ঠে গল্প, কবিতা যেদিন যাহা জুটিত পড়িয়া দিতাম। রবীন্দ্রনাথের ধৈর্য হৈমালয়িক; তিনি নীরবে সমস্ত শুনিতেন এবং শেষে সমালোচনা করিতেন। কি মারই না খাইয়াছি! কঠোর সমালোচনা দ্বারা আমার যুগান্তকারী রচনাগুলিকে তিনি তছনছ করিয়া দিতেন। সেরূপ ভর্ৎসনা একবার শুনিলে বাঙলা দেশে এমন লেখক অল্পই আছেন, যাঁহারা বৈতরণীর স্রোতে কলম ভাসাইয়া সাহিত্যিকসন্ন্যাস না গ্রহণ করিবেন। আমি ক্ষতবিক্ষত পৃষ্ঠে ঘরে ফিরিয়া আত্মপ্রশংসার প্রলেপ লাগাইতাম এবং এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই পুনরায় নূতন যুগান্তকারী রচনা লইয়া সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতাম।

এক দিনের ঘটনা আমার মনে আছে। সেবার একটা গল্প ফাঁদিয়াছিলাম। সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, গল্পটা এমনভাবে আরম্ভ হইয়াছে, যেন অনেক আড়ম্বর করিয়া রেলে চড়িয়া বোম্বাই যাত্রার মতো, কিন্তু অকালে অকস্মাৎ শ্রীরামপুরে আসিয়া রেল-কলিশন ঘটিয়া সব শেষ হইয়া গেল। মনে ভাবিলাম, কিছুই তাঁহার ভালো লাগিবে না। সেদিনের পুডিং ও আনারসের কথা মনে পড়িয়া যাইত! সেদিন তবু সান্ত্বনার জন্য বাস্তব রস ছিল, আর আজ ছোট বড় সকলের সম্মুখে এমন মার! এখন বুঝিতেছি, এই সব নিদারুণ আঘাতে আমাদের সাহিত্যিক রুচি তৈরি হইয়া গিয়াছিল। প্রথম রচনা লিখিয়াই বাহবা, বেশ হইয়াছে শুনিবার দুর্ভাগ্য যাহাদের হয়, তাহারা বড়লোকের আদুরে দুলালের মত—প্রথম প্রকৃত আঘাতেই একান্ত অসহায় অনুভব করে। এখন যখন পাঠকেরা আমার লেখা সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রকাশ করে তাহারা হয়তো ভাবে লোকটা এইবার লেখা ছাড়িয়া দিলে বাঁচা যায়, তখন আমি মনে মনে হাসিয়া ভাবি, তোমাদের সমালোচনা তো শিখণ্ডীর বাণ, আমি স্বয়ং গাণ্ডীবীর বাণ সহ্য করিয়াছি—এমন শক্ত আমার প্রাণ।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা মনে আছে। তখন আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ-করা বিশ্বভারতীর ছাত্র। বিশ্বভারতীর ছাত্রদের একটি সাহিত্য-সভা ছিল। সেবার অধিবেশন হইল উত্তরায়ণে—স্বয়ং গুরুদেবের উপস্থিতিতে। শ্রোতার সংখ্যা বেশি ছিল না; Dr. Winternitz ও Dr. Lesney উপস্থিত ছিলেন। পাঠ্য প্রবন্ধ একটিমাত্র, রবীন্দ্রনাথের উপরে কালিদাসের প্রভাব—লেখক আমি। মনে হইল আমার বক্তব্য অকাট্য যুক্তি দ্বারা অছিদ্র করিয়া বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সমালোচনায় বলিলেন, তাঁহার উপরে কোন কবির বিশেষ কোন প্রভাব নাই: তাঁহার কবি-মন হাঁসের পাখার মতো, তাহাতে বাহিরের প্রভাব জলের মত গড়াইয়া পড়ে। কিন্তু আমার অবস্থা অন্যরূপ, আমার কপাল বাহিয়া তখন ঘাম গড়াইয়া পড়িতেছিল—সেটা মাঘ মাস। হায় হায়, ঘরে-পরে আর কোথাও আমার মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না—ইউরোপ হইতে পণ্ডিতরা আসিয়া আমার দুরবস্থা দেখিয়া গেল!

সেদিনের পরে অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিনকার প্রবন্ধের বক্তব্য সম্বন্ধে আমার মত দৃঢ়তর হইয়াছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের উপরে যে দুইখানি কাব্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, সে দুখানি কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা। উপনিষদের প্রভাবও তাঁহার উপরে এত বেশি নয়। ইহা আমার সুচিন্তিত, দৃঢ়ভিত্তি অভিমত। এ বিষয়ে যে কোন লোকের সঙ্গে দীর্ঘকাল তর্ক চালাইতে আমি প্রস্তুত—কেবল যাঁহার সঙ্গে পারিতাম না, তিনি আজ নাই।

সেই অল্প বয়সেই Euripides এর Medea নাটকের একটা সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, তখন গ্রীক সাহিত্যের অপর গ্রন্থ পড়ি নাই। রবীন্দ্রনাথ এমন ছেলেমানুষি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সে-উপদেশ ষোলআনা মানিয়া চলিতে হইলে লেখাই ছাড়িয়া দিতে হয়। কথাটা সর্বতোভাবে অনুসরণ করিতে পারি নাই—কিন্তু পথনির্দেশ হিসাবে মনে থাকিয়া গিয়াছে।

তখনো ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি নাই। আশ্রমে বিদ্যুতের আলো স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে, সেজন্য পথের পাশের ডালপালা কিছু কিছু কাটিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। বনলক্ষ্মীকে এরূপভাবে অঙ্গহীন করা, তাহাও আবার বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য, আমাদের মনে বড় আঘাত করিল। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার উপস্থিতিতে সভায় পড়িলাম। আমার অজ্ঞতা যে প্রশান্ত সাগরিক অতলস্পর্শ—তাহা বুঝিবার বুদ্ধি কি আমার ছিল। যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কবি, তাঁহাকে প্রকৃতির প্রতি সজাগ করিবার আমার প্রগল্‌ভ প্রয়াস! যথোচিত তিরস্কারের কর্ণমর্দন পাইলাম।

আমার সাহিত্যের সঙ্গীদের মধ্যে দুএকজন সুন্দর লিখিত। একজনের নাম সতীশ রায়। ইনি পরলোকগত কবি সতীশ রায় নহেন। সতীশের মতো কবিতা লিখিব—ইহাই আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। তাহার মতো লিখিতে পারিতাম না বলিয়া অন্তর

অনুসরণ করিতাম। সতীশ স্বেচ্ছায় সাহিত্যের দীপ নিভাইয়া না দিলে নিজের আলোকে বঙ্গসাহিত্য-মঞ্চ আলোকিত করিতে পারিত।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া যখন আমি বিশ্বভারতীর ছাত্ররূপে পুরাতন রঙ্গমঞ্চে নূতনভাবে অবতীর্ণ হইলাম, তখন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাইবার সৌভাগ্য ঘটিল। আমি নাটক লিখি জানিয়া আমাকে নাটক লিখিয়া আনিবার জন্য একটা গল্প বলিয়া দিলেন। আমি খুব দ্রুত লিখিতে পারিতাম, এখনো দ্রুত ছাড়া লিখিতে পারি না, মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কলম যেন ছুটিতে অসমর্থ। আমি তিন চার দিনের মধ্যে একখানা নাটক লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। পড়িয়া তিনি মুখে মুখে করিতেন? এজন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি কোন স্নেহের দাবী যে করিতে পারি তাহা নয়। নিশ্চয় আরও বহু লেখকের রচনা লইয়া এমন সংশোধন তিনি করিয়াছেন। আসল কথা তাঁহার অতি প্রচুর সাহিত্যিক শক্তির বিকাশের ইহাও অন্যতম পন্থা। এই তুচ্ছ কাজের দ্বারাও তিনি যেন নিজের শক্তিকে নূতনভাবে লাভ করিতেন। আমার পক্ষে এ সাহায্যের নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এই যে, তাঁহার নিজের পক্ষেও প্রয়োজন ছিল। শিলাখণ্ড খুদিয়া ভাস্কর মূর্তি গড়ে, সে আবশ্যক কি কেবল শিলাখণ্ডেরই? আমি তাঁহার হাতে শিলাখণ্ডের মতো অবান্তর—আমার পরিবর্তে যে কেহ হইলেই চলিত—আর আমিও তো একক ছিলাম না।

পরে যখন বড় হ'ল দেখি অশোক নয়—গাব গাছ। তারপরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তোকেও অশোকগাছ বলে লাগিয়েছি, বোধ করি গাবগাছ!

গুরু 'বোধ করি' শব্দের দ্বারা আর কেন ক্ষীণ আশা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা। আমি যে নিতান্তই সাহিত্যিক গাবগাছ। সাহিত্যের বামুন পাড়ায় আমার স্থান নাই, গ্রামান্তের অন্ত্যজদের মধ্যে আমার স্থিতি! ইতিমধ্যেই সমালোচক কাকের দল আমার ফল চাখিয়া ধিক্কারের স্বরে কা কা রবে ব্যর্থতা প্রচার করিতেছে। এ-ফল সাহিত্যিক ভোজে লাগিবার নয়। কেবল সম্পাদক সুধীবরেরা মাসিকের জাল মাজিবার জন্য ব্যবহার করিবে; কেবল প্রকাশকেরা সংসার-সিন্ধু পার হইবার জন্য নৌকা তৈরি



শান্তিনিকেতনের খোয়াই

কিছু পরিবর্তন করিয়া দিলেন এবং খাতাখানা নিজের কাছে রাখিয়া দিয়া পুনরায় লিখিয়া আনিতে বলিলেন। পুনরায় লিখিয়া দেখাইলাম। আবার কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়া তৃতীয়বার লিখিতে বলিলেন। তৃতীবার লিখিয়া দেখাইলাম—এবারে স্বহস্তে কাটাকুটি আরম্ভ করিলেন। কাটিয়া, পরিবর্তন করিয়া, স্বয়ং কিছু লিখিয়া একরূপ দাঁড় করাইলেন। নাটক রচনা শিক্ষার ইহাই আমার একমাত্র শিক্ষানবিশি। ইহাতে আমার চোখ খুলিয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ কেন নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া অপরিণত লেখকের রচনা সংশোধন

কিন্তু এই উপলক্ষে আমার যে লাভ হইল, তাহা পৃথিবীতে একান্ত দুর্লভ। এক এক সময় মনে হইত বোধ করি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আমার মধ্যে কোন সাহিত্যিক সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়াছে—আবার পরমুহূর্তেই তাঁহার কথায় আশা-প্রদীপ নিভিয়া যাইত। এক দিনের কথা বলি—আশ্রমের একটি ইঁদারার ধারে একটি গাব গাছ আছে। একদিন তাঁহার সঙ্গে আমি সেখান দিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ তিনি গাব গাছটির কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

জানিস্, এক সময়ে এই গাছের চারাটিকে আমিই খুব যত্ন করে লাগিয়েছিলাম, আমার ধারণা ছিল এটা অশোকগাছ। তার-

করিয়া এই ফল রাশিকৃত পাড়িয়া লইয়া নৌকায় রং করিবে। আর দু'চারজন অনভিজ্ঞ পাঠক ফলের রঙে আকৃষ্ট হইয়া গলাধঃকরণ করিতে গিয়া গলায় বাধাইয়া ফেলিবে। সেই সংকটের মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করিবে—এ-ফল আর খাওয়া নয়। ফল নামিয়া গেলেই আবার গাবতলায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমি যে গাবগাছ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঋষি-কবির দৃষ্টি মিথ্যা হইবার নয়। কিন্তু গাবগাছ কি কেবল একটি—সমস্ত বাগানই যে গাবগাছে ভরিয়া গেল।

রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবল তিরস্কারই পাইয়াছি—এমন মনে করিবার কারণ নাই—কখনো কখনো প্রশংসাও

করিয়াছেন; সে প্রশংসা ব্যক্তিগত স্নেহের দ্বারা অতিরঞ্জিত, বিশ্রদ্ধক্ষণের উদারতার দ্বারা স্ফীত, কাজেই সে-সব প্রকাশযোগ্য নয়। কিন্তু একবার একটি মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাহা বলা যাইতে পারে। কোন পত্রিকায় আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, কি কারণে জানি সেটা তাঁহার ভালো লাগিয়া গেল। আমি উত্তরায়ণে দেখা করিতে গেলে কবিতাটার প্রশংসা করিলেন। উত্তরায়ণ হইতে আশ্রমে ফিরিবার পথে যাহার সঙ্গে দেখা হইল তিনিই বলিলেন কবিতাটি বড় ভালো হইয়াছে। ইনি বলিলেন, উনি বলিলেন, তিনি বলিলেন; অমুক বলিল, তমুক বলিল, সমুক বলিল—আহা কবিতাটি বড় উপাদেয়। কি করিয়া যেন তড়িৎবেগে বিনা তারে সম্প্রচার হইয়া গিয়াছে কবিতাটি গুরুদেবের ভালো লাগিয়াছে। ইহার আগে কেহ কখনো আমার কবিতার প্রশংসা করে নাই। তাহাদের বড় দোষ দেওয়া যায় না। সাহিত্য-সভায় তিরস্কারের তাঁহারা যে প্রত্যক্ষ সাক্ষী!

মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত ফরমাইস করিতেন। তখন পূজার ছুটি—ছেলেরা বাড়ি গিয়াছে। আমরা অল্প কয়েকজন আশ্রমে আছি। সেদিন রাত্রে কোজাগরী পূর্ণিমা। বিকালবেলা আমাকে বলিলেন—আজ রাত্রে কোজাগরী উৎসব হবে—একটা কবিতা লিখে আন্।

অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পছন্দসই কবিতা লিখিয়া ফেলা সহজ কাজ নয়, কিন্তু কাজটিকে আরও দুরূহ করিবার জনাই যেন বলিয়া দিলেন কবিতার প্রধান মিলগুলি যেন 'লক্ষ্মী' শব্দের সঙ্গে মেলে। কাজের দুরূহতা কাজ শেষ হইয়া গেলে তবেই মানুষ বুঝিতে পারে—এখন সেই ফরমাইস চিন্তা করিতেও ত্রাস উপস্থিত হয়—কিন্তু তখন সত্যিই অনুরূপ একটি কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম এবং আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার পছন্দ হইয়া গেল। সেদিনকার তারা-নেভা কোজাগরী পূর্ণিমার আলোয় উত্তরায়ণের ছাদে যে ক্ষুদ্র উৎসব সভাটি বসিয়াছিল তাহাতে গান হইল, রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা পড়িলেন, আমার কবিতাটিও পঠিত হইল। কবিতাটির দুটি ছত্রে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে—

ঘুমাক সকলে, আমরা ক'জনই
উত্তরায়ণে জাগিব রজনী—

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পরে শেলি ও কীট্সের কবিতার ইন্দ্রজালে বন্দী হইলাম। শেলির কাব্যের চিরচঞ্চল, নিরুদ্দেশ-গতি, খেয়ালরূপী, রঙের তুফানলাগা, অস্থির সীমানা, অতীন্দ্রিয়, অনির্বচনীয় মেঘলোকে যেন বিলীন হইয়া গেলাম। আবার কীট্সের কাব্যের পুষ্পঘন, তমঃসুরভিত, লুপ্তপন্থা, অজস্র উদ্ভিদ্, কোকিলাকুল ইন্দ্রিয়-আতুর অরণ্যের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিলাম। Endymion-এর সুন্দরবনে অনেকক্ষণ যে পথ হারাইয়া গিয়াছে, সম্মুখেও যে পথ নাই, সে হুঁস কি ছিল। আর পথের কি প্রয়োজন? বাহির হইবার জন্য? এমন মনোরম বনভূমি ছাড়িয়া কে বাহির হইতে চায়? ইহার শাখায় শাখায় ফুলের কি অভাবিত বিকাশ, ইহার নীড়ে নীড়ে বিহঙ্গের কি উল্লাস, পদ্মসনাথ সরসীতে অপ্সরীদের কি বিহার, মসৃণ পল্লবের পিচ্ছিল চিক্কণে জ্যোৎস্নার কি তির্যক পদস্খলন, বনভূমির বহুল সৌগন্ধ্য যেন স্পর্শযোগ্য, উপত্যকার কাশ্মীরী আবহাওয়া যেন কাশ্মীরী দোশালার মত দুঃসহ রভসে সকরুণ! Endymion-এর বনভূমি ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় কে বাহির হইয়া আসে? কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগিল Keats-এর Nightingale-এর প্রতি কবিতা। কাব্য-সংসারে ইহাই আমার প্রিয়তম কবিতা। প্রকৃতপক্ষে এই কবিতাটি আমার মনের উপরে সোনার কাঠির কাজ করিল—আজিও তাহার কাজ শেষ হয় নাই। শেলির মেঘলোকে আজ আর প্রতিষ্ঠা পাই না, কিন্তু Keats-এর বনভূমি পদতলে তেমনি অচল।

অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন সাহিত্য-গুরুর আশ্রম হইতে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক কেন হয় নাই, বিশেষ সেখানকার ছাত্রদের মধ্য—হইতে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়—তবু চেষ্টা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাঙলা দেশ হইতেই খুব উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের উদ্ভব হইয়াছে কি? বাঙলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শতকরা কয়জন ছাত্ররূপে গত চল্লিশ বৎসরে শান্তিনিকেতন গিয়াছে? এক একজন যুগাবতার সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা যুগের সমস্ত সাহিত্যিক সম্ভাবনাকে নিঃশেষে পান করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়া যান—দুর্বলতরদের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। রবীন্দ্রনাথ সেইরকম একজন বিরাট পুরুষ!

রবীন্দ্র-বনস্পতি বাঙলা দেশের চিত্তের সমস্ত রস শুষিয়া পুষ্পপল্লবে, ফলে ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। এই বনস্পতির তলদেশে যে সমস্ত দুর্ভাগ্য সম্ভাবিত বনস্পতির জন্ম, তাহাদের প্রাণরসের আর প্রত্যাশা কোথায়? বর্তমান বাঙলা দেশের অনেক সাহিত্যিকই হইলেহইতেপারিত বনস্পতি। এদেশের চিত্তভূমিতে প্রাণের খোরাক স্বল্প, রবীন্দ্রনাথের পানীয় জুটাইতেই তাহা নিঃশেষ; অন্যরা মরুভূমির তৃষ্ণা বহিয়া বেঁটে আগাছা হইয়া সাহিত্যিক জন্ম শেষ করিতে বাধ্য। তবে দু'একটি বুদ্ধিমান পরগাছা ও লতা এই মহা বনস্পতিকে আশ্রয় করিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বাকাশে শাখাবাহু প্রক্ষেপ করিয়া দেবলোকের উদ্দেশে ভুঁড়ি মারিতেছে বটে। দেবতাদের ভ্রূক্ষেপ নাই, বনস্পতির অসীম ধৈর্য, মাঝে হইতে কোন কোন পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটিতেছে।

বাঙলা দেশের পক্ষে যদি ইহা সত্য হয়, তবে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যিকদের পক্ষে ইহা ত্রিগুণিত সত্য। বাঙালী জাতির একজন হিসাবে, বাঙালী সাহিত্যিক হিসাবে, শান্তিনিকেতনের ছাত্র হিসাবে—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাহাদের উপরে ত্রিগুণিত; এত নিবিড় প্রভাব কাটাইয়া স্বকীয়তার ভাবলোকে উপস্থিত হইতে হইলে চরিত্রের যে বলিষ্ঠতার প্রয়োজন—বাঙালীদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। শান্তিনিকেতন হইতে কখনো কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক হইবে না—এমন ভবিষ্যদ্বাণী দুঃসাহসিক; তবে বিনা সাহসেও অনায়াসে বলা চলে যে, রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাঙলা দেশে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের উদ্ভব যদি কঠিন হয়, তবে শান্তিনিকেতন হইতে তাহার উদ্ভব কঠিনতর। ক্রমশ



বিদুষী ভার্যা

- শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -

(পূর্বানুবৃত্তি)

১০

ট্যাক্সি করিয়া যাইতে যাইতে নিশাকর বলিল, "আমাদের বাসায় না গিয়ে, চল দাদা, প্রথমে একবার বিজয়দাদাদের বাড়ি যাওয়া যাক্।"

বিজয় পূর্বোক্ত 'মাধুরী বউদিদি'র স্বামী।

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কেন, এখন সেখানে গিয়ে কি হবে?"

সহাস্যমুখে নিশাকর বলিল, "বউদিদি প্রথম আসছেন, বরণ-টরণ মাঙ্গলিক কাজ কিছু হবে না?"

দিবাকর বলিল, "ক্ষেপেছিস তুই? তার জন্যে বিজয়দাদাদের বাড়ি যাবার কোনো দরকার নেই; মাঙ্গলিক যা কিছু, তা মনসা-গাছায় গিয়ে হবে।"

যূথিকা বলিল, "তোমার বাড়িতে প্রবেশ করাই আমার প্রথম আর সব চেয়ে বড় মাঙ্গলিক হবে ঠাকুরপো; মনসাগাছায় যা হবে তা দ্বিতীয়।"

যূথিকার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "ধন্যবাদ বউ-দিদি! এত বড় সৌভাগ্য থেকে আমার বাড়িকে বঞ্চিত করতে গিয়ে ভারি ভুল করছিলাম। আপনি মনে করিয়ে দিলেন, সে জন্যে ধন্যবাদ।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দিবাকর বলিল, "আপনি কি রে নিশা?"

নিশাকর বলিল, "তবে?"

"তুমি। এ কি মাধুরী বউদিদি যে, আপনি?"

সহাস্যমুখে নিশাকর বলিল, "তা বটে।"

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পাশ দিয়া যাইবার সময়ে ট্যাক্সি থামাইয়া নিশাকর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল।

বিস্মিত হইয়া দিবাকর বলিল, "এখানে নামলি যে?"

প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া নিশাকর বলিল, "একটু বোসো তোমরা, মিনিট দশেকের মধ্যে আসছি।" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ক্ষণকাল পরে কুলির মাথায় একটা ডালা করিয়া এক রাশ ফুল, দুই ছড়া মালা এবং একটা আম্র শাখা লইয়া নিশাকর দেখা দিল; তাহার পর কুলিকে পয়সা দিয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিয়া বলিল, "চলো।"

দিবাকর বলিল, "এ সব কি হবে রে নিশা?"

নিশাকর হাসিমুখে বলিল, "সেটা পরে প্রকাশ পাবে।"

দিবাকর বলিল, "ফুল ভাল জিনিসই, মালাও মন্দ নয়, কিন্তু আম্রশাখার কোনো অর্থ বোঝা যাচ্ছে না।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া নিশাকর নীরবে বসিয়া রহিল।

মিনিটখানেকের মধ্যে ট্যাক্সি নিশাকরদের গলির ভিতরে প্রবেশ করিল।

অল্প দূর অগ্রসর হইয়া নিশাকর বলিল, "বাঁ হাতে ঐ সাদা বাড়ি।"

ধীরে ধীরে গাড়ি নিশাকরদের বাড়ির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

নিশাকর ড্রাইভারকে বলিল, "খুব জোরে জোরে আট দশবার হর্ন দাও, চাকররা যাতে শুনতে পায়।"

ভোঁ ভোঁ করিয়া হর্ন বাজিতে লাগিল।

যূথিকার দিকে চাহিয়া নিশাকর মৃদু-স্বরে বলিল, "আপাতত এইটেই শঙ্খধ্বনি বলে মেনে নাও বউদিদি।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মুখে নিঃশব্দ মিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

হর্নের শব্দ শুনিয়া ভৃত্য বসন্ত এবং পাচক চণ্ডী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়াছিল। জিনিসপত্র নামাইবার জন্য উভয়কে আদেশ দিয়া যূথিকা এবং দিবা-করকে একতলার বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া নিশাকর বলিল, "মিনিট দশেক তোমাদের একটু কষ্ট করে এখানে বসতে হবে দাদা; এখনি আমি আসছি।"

কপট বিরক্তির সুরে দিবাকর বলিল, "কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করলি নিশা? কি মতলব তোর বল দেখি?"

যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর বলিল, "বিয়েতে ত ফাঁকি দিয়েছ; এখন থেকে কিন্তু কিছুদিন তোমাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে আমাদের হাতে। একটি কথা বললে চলবে না।" তাহার পর যূথিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "এটা কি আমার অন্যায় আব্দার হচ্ছে বউদিদি?"

হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "না, না, একটুও অন্যায় নয়; এ তোমার সম্পূর্ণ legitimate claim।" (ন্যায়-সঙ্গত দাবী।)

"শুনলে ত? আর একটি কথা বোলো না।" বলিয়া সহাস্যমুখে ঈষৎ দৃপ্তনেত্রে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর প্রস্থান করিল। কিন্তু যাইবার সময় যূথিকার কথার মধ্যে ইংরেজি শব্দ দুইটির ব্যবহার এবং প্রয়োগ-সৌষ্ঠব লক্ষ্য করিয়া সে বেশ একটু বিস্মিত এবং চিন্তিত হইয়া গেল। ইংরেজি লেখা-পড়া বিশেষ কিছু না জানিয়া যাহারা শুধু শুনিয়া শুনিয়া দুই চারিটা ইংরেজি শব্দ সঞ্চয় করিয়া নিজে-দের কথার মধ্যে ব্যবহার করে, 'legitimate claim' তাহাদের শব্দ ভাণ্ডারের মধ্যে স্থান পাইবার মতো সামান্য নহে। অথচ, দিবাকর যাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে তাহার সম্বন্ধে হিসাব মত ধারণা করিতে হইলে 'legitimate claim'কে সহজে সে ধারণার সহিত খাপ খাওয়ানো কঠিন। কিন্তু আপাতত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি কাজ করিবার আছে যে, এ সমস্যা সমাধানের কোনও চেষ্টা না করিয়াই নিশাকর প্রস্থান করিল।

দিবাকরের অভিসন্ধি এবং উপদেশ অনু-যায়ী যূথিকা তাহার কথার মধ্যে ইংরেজি ভাষার দুর্কোন প্রয়োগ করিয়াছিল। নিশাকর প্রস্থান করিলে দিবাকর হাসিয়া বলিল, "ঠিকই হয়েছে; এবার কিন্তু আর একটু বেশি পরিমাণে চালিয়ো।"

যূথিকা বলিল, "আচ্ছা, ঠাকুরপোকে তুমি ছেলেমানুষীর কথা বলছিলে, কিন্তু আমা-দেরও কি এটা ছেলেমানুষীই হচ্ছে না?"

দিবাকর বলিল, "না, না, যূথিকা, তোমার কথা হয়ত স্বতন্ত্র; কিন্তু আমার পক্ষে এ ঠিক ছেলেমানুষী নয়। তোমার লেখা-পড়ার খবর পেতে পেতে সেদিন গাড়িতে আমার যে-রকম খুশি হয়ে ওঠা উচিত ছিল, নিশাকে দিয়ে সেইটে দেখে আমি খুশি হতে চাই।"

স্বামীর পক্ষে এ ব্যাপারটা নিতান্ত স্থূল জিনিস নহে, পরন্তু অন্তরের কোনো একটা গভীর অনুবেদনার যোগ আছে বলিয়া যূথিকা আর কিছু বলিল না।

বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া বসন্তকে এবং চণ্ডীকে ডাকিয়া নিশাকর বলিল, "বুঝতে পারছ চণ্ডী?—লাহোর থেকে বড়-বাবু বিয়ে করে এসেছেন। এখন চট্ করে

যা-হয় একটু বরণ-টরণের ব্যবস্থা করতে হবে তো?"

দিবাকরের সহিত যূথিকাকে দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া, চণ্ডী এবং বসন্ত নানা কল্পনা-জল্পনায় নিযুক্ত ছিল, এমন সময়ে নিশাকরের কথা শুনিয়া তাহারা বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চণ্ডী বলিল, "বিয়ে করে এসেছেন! কই, আগে ত কিছু জানা যায়নি ছোটবাবু?"

নিশাকর বলিল, "সে সব পরের কথা, এখন তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব ব্যবস্থা কর। তোমার পুজো হয়েছে?"

চণ্ডী বলিল, "আজ্ঞে না, এখনো হয়নি।"

"তা হলে ত চন্দন বাটা আছে?"

"আজ্ঞে, আছে।"

"ধূপ দীপ ত আছেই?"

ঘাড় নাড়িয়া চণ্ডী বলিল, "আছে।"

খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "বেশ কথা। ওপর থেকে বসন্তকে দিয়ে ছোট গালচেখানা আনিয়ে উঠানের মধ্যিখানে এমন ক'রে পাতাও যাতে বর-কনে পূর্বমুখ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমের শাখা এনেছি, তা দিয়ে একটা জলপূর্ণ ঘট তার সামনে স্থাপন কর। আর, বরণের জন্য এনে রাখ এক পাত্র ফুল, এক ঘটি জল, ধূপ, দীপ, মালা আর চন্দন।"

তৎপর হইয়া চণ্ডী বলিল, "এ আমি এখখুনি করে ফেলছি।"

বসন্ত তাড়াতাড়ি উপর হইতে গালিচা লইয়া আসিয়া পাতিয়া দিল।

নিশাকর বলিল, "এবার ওপর থেকে গ্রামোফোনটা এনে ডানদিকে টুলের ওপর রাখ বসন্ত।"

গ্রামোফোন আসিলে নিশাকর তাহাতে দম দিয়া পিন পরাইয়া রাখিল; তাহার পর উপর হইতে তালিম হোসেনের আশাবরী রাগিণীর বিখ্যাত সানাইয়ের রেকর্ডটা আনিয়া লাগাইয়া দিল। ইত্যবসরে চণ্ডী ঠাকুর বরণের ব্যবস্থা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিল।

আয়োজনাদির দিকে প্রসন্ন নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর বলিল, "সব ত একরকম হল, শুধু একটা শাঁখ হলেই চমৎকার হোত।"

বসন্ত বলিল, "তার জন্যে ভাবনা কি ছোটবাবু, এক্ষণি আমি পাশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি।" বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট দুই তিনের মধ্যে শাঁখ লইয়া ফিরিয়া আসিল।

নিশাকর বলিল, "শাঁখ ত এল, কিন্তু বাজায় কে?

বসন্তর হাত হইতে শাঁখটা লইয়া চণ্ডী বলিল, "আমি বাজাতে জানি, আমি বাজাব।"

খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "বেশ তুমিই বাজিয়ো। আর দেখ বসন্ত, আমি ইসারা করলেই তুই গ্রামোফোনটা খুলে দিবি। আগে থাকতে খুলিসনে, তিন মিনিটের মধ্যে আমাকে বরণ শেষ করতে হবে।"

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে নিশাকর বৈঠকখানা ঘর হইতে দিবাকর এবং যূথিকাকে লইয়া আসিয়া গালিচার উপর পাশাপাশি দাঁড় করাইল; এবং পরক্ষণেই তাহার নিকট হইতে ইঙ্গিত লাভ করিয়া সানাই এবং শঙ্খ একযোগে বাজিয়া উঠিল। মূল্যবান শক্তিশালী গ্রামোফোন যন্ত্রের কল্যাণে স্বপ্নময়ী আশাবরী রাগিণীর সুর এবং তানের বিচিত্র জাল রচনা করিয়া বর্ষাদিনের সেই স্তিমিত প্রভাতকে উৎসবময় করিয়া তুলিল।

শ্বেত চন্দনের পাত্র হইতে চন্দন লইয়া নিশাকর প্রথমে বরবধূর ললাট চর্চিত করিল; তাহার পর উভয়ের কণ্ঠে মালা দুইটি পরাইয়া দিয়া যথাক্রমে দীপ, জলপাত্র এবং পুষ্প দিয়া উভয়কে অভিনন্দিত করিল; তৎপরে নত হইয়া উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া যূথিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে আমাদের লক্ষ্মীহীন ঘরে লক্ষ্মীর আসনে অধিষ্ঠিত হবার জন্যে সাদরে এবং সসম্মানে আবাহন করছি বউদিদি। তোমার পুণ্যে আমাদের গৃহ পবিত্র হোক্। তুমি আমাদের দুই ভাইকে সংযুক্ত কর; সুখী কর। এই আবাহনের আয়োজন অতি সামান্য; কিন্তু তাই বলে তুমি যেন মনে কোরোনা যে, এর আন্তরিকতা অসামান্য নয়।"

নিশাকরের এই স্বকল্পনাপ্রসূত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান এবং আবাহন বাণী যেন কোনো মন্ত্রবলে অকস্মাৎ একটা পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি করিয়া ক্ষণকালের জন্য সকলকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল।

"ঠাকুরপো।"

নিশাকর চাহিয়া দেখিল, যূথিকার মুখে হাস্য, কিন্তু চক্ষু দুটি অশ্রুতে চক্‌চক্ করিতেছে।

যূথিকা বলিতে লাগিল, "এর আন্তরিকতা যে অসামান্য, সে কথা কি ভুল করবার উপায় আছে ঠাকুরপো? এর পর হয়ত মনসাগাছায় অনেক কিছু ব্যাপার অনেক সমারোহের সঙ্গে ঘটবে। কিন্তু এ তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি, সে-সব কথা যদিও বা কোন দিন ভুলে যাই, তোমার আজকের এই অভ্যর্থনার স্মৃতি চিরদিন মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তোমাকে আজ আমি একান্ত মনে এই আশীর্বাদ করি ঠাকুরপো, তুমি আজ আমাকে যে গৌরব দান করলে, অপাত্রে তা দিয়েছিলে বলে কোনদিন যেন তোমাকে পরিতাপ করতে না হয়।"

দিবাকর হাসিমুখে বলিল, "আর আজকের এই চমৎকার অনুষ্ঠানে আমি তখন বাধা দিতে যাচ্ছিলাম বলে আমি তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি নিশা!"

উৎফুল্ল স্বরে নিশাকর বলিল, "সাধু!"

গ্রামোফোন থামিয়া গিয়াছিল। রেকর্ডের অপর দিকটা চালাইয়া দিবার জন্য বসন্তকে আদেশ দিয়া যূথিকা ও দিবাকরকে লইয়া নিশাকর দ্বিতলে উপস্থিত হইল।

ঘণ্টাখানেক পরে চা-পানের পর পূর্ব দিকের বারান্দায় বসিয়া তিনজনে কথোপকথন হইতেছিল।

দিবাকর বলিল, "দিন তিনেকের মধ্যে দিদিরা এখানে এসে পৌঁছবেন। সেই আনন্দে আমাদের মনসাগাছায় যাবার দিন স্থির করে ফেলা দরকার।"

নিশাকর বলিল, "আজই সেটা করে ফেলে চিঠিপত্র দিয়ে সন্ধ্যার গাড়িতে বসন্তকে মনসাগাছায় পাঠিয়ে দিতে হবে।"

যূথিকা বলিল, "আগে থেকে কিছু না জানিয়ে তোমাকে আজ যেমন একটা pleasant surprise (সানন্দ বিস্ময়) দেওয়া গেল, মনসাগাছাতেও তেমনি দিলে হয়।"

চমকিত হইয়া নিশাকর বলিল, "মনসাগাছায় surprise দেবার কথা না হয় পরে ভাবা যাবে, কিন্তু আমাকে surprise দেওয়ার ত এখনো শেষ হয়নি দেখছি! তুমি ইংরেজি জান না কি বউদিদি?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "কেন বল দেখি?"

নিশাকর বলিল, "তখন legitimate claim বললে, এখন pleasant surprise বলছ!"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "ও, সেই কথা বলছ? কিন্তু তার দ্বারা ত সে কথা conclusively proved (নিঃসংশয়ে প্রমাণ) হয় না ঠাকুরপো।"

অপলক নেত্রে এক মুহূর্ত যূথিকার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অল্প অল্প ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে নিশাকর বলিল, "না, না, নিশ্চয়ই হয়। তার দ্বারা না হলেও, এই conclusively proved-এর দ্বারাই conclusively proved হয়।" তাহার পর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি ব্যাপার বল ত দাদা?"

দিবাকর প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ বাহির করিয়া নিশাকরের হাতে দিল।

তাড়াতাড়ি ভাঁজ খুলিয়া নিশাকর দেখিল যূথিকা মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা প্রথম শ্রেণীর ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট।

দিবাকরের পক্ষে একজন ম্যাট্রিক পাশ মেয়েকে বিবাহ করা এমনই অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, চোখের উপর অমন একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ থাকিতেও গভীর বিস্ময়ে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এ যূথিকা মুখোপাধ্যায় তুমিই নাকি বউদিদি?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "হ, কি করে বলব ভাই, আমি ত' যূথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কতকটা নিজের মনে নিশাকর বলিল, "সে ত' মাত্র দিন চারেকের কথা।"

বিস্ময়ের প্রথম অভিভূতি হইতে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বেই চকিত স্বরে নিশাকর বলিয়া উঠিল, "এ আবার কি?"

নিঃশব্দে দিবাকর আর একটা ভাঁজ-করা কাগজ নিশাকরের দিকে আগাইয়া ধরিয়াছে।

ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটখানা টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া দিবাকরের নিকট হইতে ভাঁজ-করা কাগজখানা লইয়া নিশাকর তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখিল, যূথিকা মুখোপাধ্যায়ের নামেই প্রথম শ্রেণীর আই এ সার্টিফিকেট।

টেবিলের একটা দেরাজ টানিয়া দিবাকর তাহার ভিতর হাত ঢুকাইবার চেষ্টায় আছে লক্ষ্য করিয়া নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "ওর মধ্যেও কিছু আছে নাকি?"

"এর মধ্যে যা আছে পকেটে ঠিক তা ধরে না!" বলিয়া দিবাকর দেরাজের ভিতর হইতে একটা গোল করিয়া পাকানো বান্ডিল বাহির করিয়া নিশাকরের হাতে দিল।

তাড়াতাড়ি পাক খুলিয়া নিশাকর দেখিল, যূথিকা মুখোপাধ্যায়ের নামে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া বি এ পাশ করিবার ডিপ্লোমা।

এবার আর কোন কথা না বলিয়া সে নিঃশব্দে দিবাকরের দিকে দক্ষিণ হস্ত আগাইয়া দিল।

দেরাজের মধ্যে উঁকি মারিয়া আর একটা পাকানো কাগজ বাহির করিয়া দিবাকর নিশাকরের হস্তে প্রদান করিল।

বলা বাহুল্য, ইহা যূথিকার ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম এ পাশ করিবার ডিপ্লোমা।

এম এ ডিপ্লোমাখানা পড়িতে পড়িতে তাহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই নিশাকর ধীরে ধীরে দিবাকরের দিকে পুনরায় হাত বাড়াইয়া ধরিল।

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "তোর লালসা ত' বড় কম নয় নিশা! এর পর আবার কি চাস্? বি এল-এর ডিপ্লোমা? না, বি-টির?"

গম্ভীর মুখে নিশাকর বলিল, "স্বপ্ন-জগতে সব কিছুই সম্ভব। আমার বিশ্বাস, আমি এখন স্বপ্ন-জগতে অবস্থান করছি। জামাইবাবুর টেলিগ্রাম থেকে আরম্ভ করে এই এম্-এ ডিপ্লোমাখানা পর্যন্ত সবটাই হয়ত একটা একটানা স্বপ্ন।"

দিবাকর বলিল, "স্বপ্ন নয়; কিন্তু স্বপ্নের মতই আশ্চর্য।"

নিশাকর বলিল, "আর, সুস্বপ্নের মত মনোহর।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকর বলিল, "সে কথা ঠিক বলেছিস। আমারও এক-এক সময়ে সেই রকমই মনে হয়। ওরে নিশা, আমার কপালে এম্-এ পাশ করা বউ রয়েছে, আর তুই একটা ম্যাট্রিক পাশকরা মেয়ে আমাকে গছিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলি! ম্যাট্রিক পাশ-করা মেয়ের সাধ্য কি যে, আমার মত তিনবার ফেল-করা মানুষকে সহ্য করে। তার জন্যে দরকার, তোর বউদিদির মত এম্-এ পাশকরা মেয়ে।"

এই নির্বিকল্প ক্ষমাশীলতার সাদর বাক্য শুনিয়া পুনরায় যূথিকার দুই চক্ষু সজল হইয়া আসিল। অবাধ্য চক্ষুকে দিবাকর এবং নিশাকরের দৃষ্টিপথের অন্তরাল করিবার জন্য সে নতমস্তকে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমাগুলো গুছাইতে আরম্ভ করিল।

"বউদিদি?"

মুখ না তুলিয়াই মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "কি ঠাকুরপো?"

"আজ আর একবার আমি তোমাকে আবাহন করব। এবার কিন্তু লক্ষ্মীরূপে নয়; এবার সরস্বতীরূপে আমার পড়বার ঘরে।"

অবাধ্য অশ্রু যূথিকার নেত্রে অবাধ্যতর হইয়া উঠিল।

"কিন্তু তার আগে চট্ করে একবার আমি ঘুরে আসতে চাই।"

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এখন আবার কোথায় যাবি নিশা?"

নিশাকর বলিল, "বউ দেখবার জন্যে বিজয় দাদাদের নিমন্ত্রণ করে আসি; আর মাধুরী বউদিদিকে বলে আসি, 'আমার কপালে এম-এ পাশ-করা বউদিদি রয়েছে মাধুরী বউদিদি, আর আপনি একটা ম্যাট্রিক পাশ-করা মেয়ে গছিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন!"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, এবং সেই অবসরে যূথিকার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বৃহত্তর হইয়া ভূমির উপর ঝরিয়া পড়িল।

১১

নিশাকরের নিকট হইতে দুইখানা পত্র লইয়া সেই দিনই সন্ধ্যাকালে বসন্ত মনসাগাছা রওয়ানা হইল, এবং পরদিন প্রাতে তথায় পৌঁছিয়া সমস্ত গ্রামবাসীকে একেবারে চকিত করিয়া দিল। পত্র দুইটি ম্যানেজার রাসবিহারী দত্ত এবং প্রসন্নময়ীর নামে। উভয় পত্রের বক্তব্য প্রায় একই,—বরবধূর অভ্যর্থনার জন্য যেন বিশেষরূপ সমারোহের ব্যবস্থা করা হয়।

সে সময়ে ম্যানেজার মনসাগাছায় ছিল না; একটা বিস্তৃত জমির নূতন বন্দোবস্তের জন্য ক্রোশ দেড়েক দূরবর্তী নন্দীপুর কাছারীতে অবস্থান করিতেছিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাড়াতাড়ি স্নান এবং জলযোগ সারিয়া নিশাকরের চিঠিসহ বসন্ত দ্রুতগতিতে নন্দীপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। যাইবার সময়ে একটা চরকি বাজির মত সমস্ত গ্রামের ভিতর দিয়া আঁকা বাঁকা পথে চক্র দিতে দিতে, এবং বাকের খুমেলপার ছড়িতে ছড়িতে দেখিতে দেখিতে সে গ্রামের সীমান্ত দেশ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। সদর নায়েব মধুসূদন ঘোষাল পথশ্রমক্লান্ত বসন্তর পরিবর্তে একজন পাইক দ্বারা ম্যানেজারের নিকট চিঠি পাঠাইবার সংকল্প করিতেছিল। কিন্তু এত বড় সংবাদটা স্বয়ং প্রকাশ করিয়া ম্যানেজারকে যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত করিয়া দিবার বাহাদুরি হইতে বসন্ত নিজেকে কিছুতেই বঞ্চিত করিল না। নন্দীপুরে ম্যানেজারকে চিঠি দিয়া অদূরবর্তী বালিচক গ্রামে ভগ্নীপতির গৃহে উপস্থিত হইবে, এবং তথায় সমস্ত দিনমান অতিবাহিত করিয়া রাত্রের গাড়িতে ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তাহার কার্যকল্পনা। দুইজন চাকর এবং যূথিকার জন্য একজন পরিচারিকা নিযুক্ত করাইয়া সে আসিয়াছে; গৌরীদের কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্বেই তাহাকে তথায় পৌঁছিতে হইবে। স্টেটের বহুদিনের সে বিশ্বস্ত ভৃত্য; নিশাকর বিদেশে একা থাকে বলিয়া সে কলিকাতায় তাহার কাছে থাকে।

দিবাকরের আকস্মিক বিবাহের সংবাদের সহিত গ্রামে এ কথাও রটিয়া গেল যে, যে কন্যা প্রায় বিনা নোটিশে মনসাগাছার জমিদার গৃহের জ্যেষ্ঠা পুরলক্ষ্মী হইয়া আসিতেছেন, তিনি বঙ্গদেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসিনী, এবং ইংরেজি সাহিত্যে এম্-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা।

মনসাগাছার ইতিবৃত্তে এ পর্যন্ত কোন গৃহস্থকন্যা অথবা গৃহস্থবধূ ম্যাট্রিকুলেশনও পাশ করে নাই। পাশ করিতে পারিলে পুরুষদেরও মধ্যে নিশাকরই এবার সর্বপ্রথম

বি-এ পাশ করিবে। সুতরাং এরূপ অননুকূল পরিসরের মধ্যে সহসা একজন এম-এ পাশ-করা মেয়ের জমিদারবধূ হইয়া আসা সমস্ত গ্রামবাসীর নিকট এমন বে-আন্দাজভাবে খাপছাড়া ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল যে, তাহারা যে বেশ একটু জব্দ করিয়া বিস্মিত হইবে, তাহারও ঠিক বাগ পাইতেছিল না। তথাপি ম্যানেজারের অফিস হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতিরত্নদের খিড়কির পুকুর পর্যন্ত সর্বত্র কথাটা আন্দোলিত হইতে লাগিল; এবং সেই সকল আন্দোলনের মধ্যে কোন এক সময়ে এমন কথাও শুনা গেল যে, বাঙলা ভাষা এবং বাঙলা শাড়ির ব্যবহারে পাঞ্জাব দেশের মেয়েটি প্রায় ততখানিই অনভ্যস্তা, যতখানি অনভ্যস্তা মনসাগাছার মেয়েরা উর্দু ভাষা এবং পেশোয়াজের ব্যবহারে। কেহ কেহ এ কথা বলিতেও ছাড়িল না যে, প্রয়োজন স্থলে মেয়েটি উর্দুর পরিবর্তে ইংরেজিতে কথা বলে, এবং পেশোয়াজের পরিবর্তে বিলাতি গাউন পরিধান করে।

এই সকল কথার সত্যতার প্রমাণে উৎসুক হওয়া অপেক্ষা নির্বিবাদে বিশ্বাস করার মধ্যে এমন একটা সহজ পুলকের আস্বাদ আছে যে, গ্রামবাসীদের মধ্যে কে কত বিস্মিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে যেন একটা প্রতিযোগিতা পড়িয়া গেল।

কিন্তু কয়েক দিন পরে আলোকে বাদ্যে আতস বাজিতে সমস্ত গ্রামকে চকিত করিয়া উজ্জ্বল আলোকমালা শোভিত জমিদার গৃহের পুরদ্বারে উপনীত হইয়া যূথিকা যখন তাহার বিচিত্র কারুকার্যখচিত শিবিকা হইতে নির্গত হইল, তখন তাহাকে অবলোকন করিয়া সেই গ্রামবাসীরাই একটা উগ্রতর বিস্ময় এবং নৈরাশ্যের নূতন আঘাতে বিমূঢ় হইয়া গেল। হাই হীল্ বিলাতি জুতার পরিবর্তে তাহার শুভ্র নগ্নপদে অলক্তরাগ; মুখে উর্দু অথবা ইংরেজি বাক্যের পরিবর্তে সুমিষ্ট হাস্য-বিধৌত খাঁটি বাঙলা ভাষা; এবং পরিধানে পাঞ্জাবী পেশোয়াজের পরিবর্তে হাল্কা হেলিওট্রোপ রঙের মূল্যবান বেনারসী শাড়ি। দেহ মনের পরিপূর্ণ প্রকাশে উচ্ছলিত বাঙলা দেশের কল্যাণী বধূর কমনীয় শ্রী।

এম-এ পাশ-করা পাঞ্জাবী বধূর প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া প্রসন্নময়ীর উদ্বেগপীড়িত মন কতকটা আশ্বস্ত হইল।

পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী হেমেন্দ্রনাথ সপরিবারে লাহোর হইতে কলিকাতায় আসিয়া মিলিত হইয়া বরবধূর সহিত মনসাগাছায় উপনীত হইয়াছিল।

বরণ সমাপ্ত হইলে এক সময়ে গৌরী জনান্তিকে প্রসন্নময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বউ পছন্দ হয়েছে ত' পিসিমা?"

প্রসন্নময়ী বলিলেন, "এমন ঘর আলো-করা সুন্দরী বউ, পছন্দ হবে না আবার, খুব পছন্দ হয়েছে; কিন্তু—"

স্মিতমুখে গৌরী বলিল "তা হলে আর কিন্তু কি পিসিমা?"

প্রসন্নময়ীর মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিলেন, "এম-এ পাশ করা বিদ্বান মেয়ে, মুখখু পাড়াগেঁয়ে পিসশাশুড়ীকে পছন্দ হবে কি-না, সেই কথাই ভাবি।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া গৌরী বলিল, "না, না, পিসিমা, সে ভয় কোরোনা। তোমাকে যদি পছন্দ না হয় তা হলে বৃথাই যূথিকার এ ঘরে আসা, আর বৃথাই তার এম্-এ পাশ-করা। কিন্তু যূথিকা আমার জানা মেয়ে, ওকে আমি চিনি; ওর আকৃতি দেখে আজ তুমি যেমন খুশি হয়েছ, ওর প্রকৃতি দেখেও ঠিক তেমনি খুশি হবে।"

এ কথার সত্যতার সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রমাণ লাভ করিতে প্রসন্নময়ীর বিলম্ব হইল না; এবং যে প্রমাণ তিনি লাভ করিলেন, তাহা অপর কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গে নহে, নিজেরই ব্যাধিবিধুর দেহের নিরলস পরিচর্যা লাভের মধ্যে। কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি গৌরীকে বলিলেন, "মিছে ভয় করেছিলাম গৌরী, বউমার প্রকৃতি অমন সুন্দর আকৃতিকেও হার মানায়। ব্যবহার দেখলে কে বলবে, ও মেয়ে এম্-এ পাশ করেছে!"

প্রসন্নময়ীর কথা শুনিয়া খুশি হইয়া গৌরী বলিল, "তা নয় পিসিমা। ব্যবহার দেখলে কে বলবে, ও মেয়ে এম্-এ পাশ করেনি।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

গৌরীর কথার মর্ম উপলব্ধি করিয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "তাই বটে। বউমাকে দেখে লেখাপড়ার ওপর শুধু ভয়ই গেল না, শ্রদ্ধাও হল।"

এইরূপে দেখিতে দেখিতে দিকে দিকে যূথিকার বিজয় অভিযান আরম্ভ হইল। আত্মীয় কুটুম্বেরা পরিতুষ্ট হইল, দাস-দাসিগণ বশীভূত হইল। পাড়া প্রতিবেশিগণ প্রশংসা করিল। শত্রুপক্ষীয়েরা মুখ লুকাইল, এবং আশ্রিত অনুগতের দল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গভীর রাত্রে দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের ঘর হইতে নির্গত এসরাজ ও সেতারের সুনিবিড় ঐক্যতান প্রতিদিন দিবাকরের অকুণ্ঠিত প্রসক্তির সাক্ষী হইতে লাগিল। উৎসবান্তে সংসার যখন ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল, তখন দেখা গেল যূথিকাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে প্রসন্নতা উচ্ছল হইয়াছে।

একই দিনে একত্রে হেমেন্দ্র, গৌরী এবং নিশাকর লাহোর এবং কলিকাতা প্রত্যা-বর্তনের জন্য প্রস্তুত হইল।

যাইবার পূর্বে নিশাকর এক সময়ে দিবাকরকে একান্তে বলিল, "দাদা, আর ত' গোলমাল থাকবে না, এখন থেকে প্রতিদিন বৌদিদির কাছে একটু একটু ইংরেজি পোড়ো।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে প্রসন্ন হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল "ঠাট্টা করছিস নিশা?"

গভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নিশাকর বলিল, "না, না, ঠাট্টা করছিনে, সত্যিই বলছি। এত বড় জমিদার তুমি,—ক্রমশ জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার,—এমন কি কখনো হয়ত বা লাট সাহেবের সঙ্গে কথা কইতে হবে; ইংরেজি না জানলে চলবে কেন তোমার?"

দিবাকর বলিল, "তুইও ত' জমিদার,—তুই কথা কইবি।"

"আমি কেন জমিদার হতে গেলাম? আমি ত' জমিদারের ছোট ভাই। না, না, ঠাট্টা নয় দাদা,—বউদিদির মতো একজন মাস্টার রাখতে গেলে মাসে মাসে তোমার দুশো আড়াই শো টাকা খরচ পড়ত। এমন সুযোগ ছেড়ো না; পোড়ো।"

দিবাকর বলিল, "তুই পড়িস।"

নিশাকর বলিল, "আমি ত' পড়বই। বউদিদির সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে, এবার পুজোর ছুটিতে এসে অনার্সের বইগুলো এক সঙ্গে পড়ে একবার ভাল করে ঝালিয়ে নিতে হবে।"

দিবাকর বলিল, "তা নিস্। আমার কিন্তু পড়তে নেই। স্ত্রীর কাছে লেখাপড়া শিখলে মানুষে ভেড়া হয়, তা বুঝি জানিস নে?"

"না, তা জানিনে। কিন্তু বউদিদির মত স্ত্রীর কাছে শিখলে ভেড়া মানুষ হয়, তা জানি।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকরের চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। "তুই আমাকে ভেড়া বলছিস না-কি নিশা?" অধর প্রান্তে কিন্তু কৌতুক হাস্যের অনাবিল দীপ্তি।

সহাস্যমুখে নিশাকর বলিল, "তা কখনো বলতে পারি তোমাকে? ভেড়ার তুলনা দিয়ে শুধু বউদিদির শক্তির তুলনা করছিলাম।"

ঠিক সেই সময়ে অপর এক কক্ষে যূথিকার নিকট বিদায় গ্রহণকালে হেমেন্দ্র-নাথ বলিতেছিল, "যদিও অনুমানে বুঝতে বিশেষ বাকি নেই, তবুও যাবার দিন তোমার কাছ থেকে কথাটা পাকাভাবে জেনে যেতে চাই যূথিকা।"

সকৌতূহলে যূথিকা বলিল, "কি কথা দাদা?"

"তোমার এম্-এ পাশ এখন সম্পূর্ণভাবে নিষ্কণ্টক হয়েছে ত'? দিবাকরের ম্যাট্রি-মোনিয়াল পীনাল্ কোডে এখন ত আর তা অপরাধ বলে স্থান অধিকার করে নেই?"

হেমেন্দ্রর প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ আরক্ত

(শেষাংশ ২০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অহঙ্কার ভাল না মন্দ

...হারের জন্য বোধ হয় অপেক্ষা করিতে হইবে। ... সকলেই একবাক্যে অহঙ্কারের নামে চোরের ...পে অসংখ্য অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ...কে অপদস্থ করিবেন; এরূপ অবস্থায় ...র পক্ষ সমর্থন করা কত কঠিন, সহজেই ...ঝিতে পারেন। কয়েকটি কথায় আমি সেই ...ন কাজটিই আজ করিতে উদ্যত হইয়াছি।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রকারগণ বলেন, অহঙ্কারের উপর আমাদের এতটা অবিচার করা উচিত নয়; কারণ বেচারা তিরস্কারার্হ তো নয়ই; বরং একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের প্রতি ভগবানেরই উহা পুরস্কার এবং অহঙ্কারের জন্য আমরা মানুষ, আমরা সত্যই অহঙ্কার করিতে পারি। তাঁহারা বলেন, অহঙ্কার দোষের নয়; অহঙ্কারের জন্য অহঙ্কার না করাই দোষের এবং অহঙ্কারের জন্য এই অহঙ্কার তখনই আমরা করিতে পারি, যখন অহঙ্কারের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হই। তাঁহারা বলেন, বেচারাকে আগেই দোষী করিও না, আগে তোমার জন্য সে কি করিতেছে এবং কি করিতে যাইতেছে, তাহা দেখ।

অহঙ্কারের কাজটা কি? অল্প কথায় বলা যায় স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত রাখা। শত দুঃখপ্রতি-ঘাতের মধ্যে সে আমার স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত রাখিতেছে। আত্মীয়ের আপ্যায়ন মধুর সুরে আমাকে বলিতেছে, সব গিয়াছে যাউক, তুমি আছ; সকলে মরিয়াছে তুমি মর নাই; সুতরাং ভয় কি, আগাইয়া চল। অহঙ্কারের এই অভয় আশ্বাসে আমি নিত্য পুষ্ট এবং তুষ্ট হইতেছি। এই আশ্বাস যদি না পাইতাম, প্রতি মুহূর্তে দুঃখের আঘাত সহ্য করিয়া এই জীবনের বোঝা বহন করিতে পারিতাম না। বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া নিজেকে টানিয়া চলিতে পারিতাম না; অহঙ্কারই যেন আমাকে আগলাইয়া অক্ষত রাখিতেছে। জড় প্রকৃতি বিপর্যয়শীল; বিপর্যয়শীল এই জড় প্রকৃতির উপর আমি যে প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা পাইয়াছি, সে এই অহঙ্কারেরই মাহাত্ম্যে; জড় প্রকৃতির সব আঘাত কাটাইয়া এই অহঙ্কারই আমার ভিতর নিত্য সত্যের আশ্রয় দিতেছে। আমি আছি—আমি আছি, এই বাণী যখনই আমি ভিতর নিকট হইতে শুনি, তখনই আমার সকল দুঃখ দূর হয়। বিষয় সম্পর্কে অর্থাৎ জীবন-যাত্রার পথে যত বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিতেছে, এই অহঙ্কারই আমার ঘাড় হইতে সে-সব বোঝা নিজের মাথায় লইয়া আমাকে সোজা রাখিতেছে। এমন আমার আত্মীয় যে অহঙ্কার, সত্যই কি তাহার জন্য অহঙ্কার করিতে পারি না?

আমার জীবনের উপর অহঙ্কারের এই যে আত্মীয়তার প্রভাব বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা অহঙ্কারের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতা ছাড়া কাহারও স্বরূপতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। আত্মীয়তাই রূপকে উদ্দীপ্ত করে। এই পথে আমরা যে অহঙ্কারকে এত দূরে দূর করিয়া তাড়াইতে চাহিতেছি, বৈষ্ণবেরা তাহার মধুর রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই অহঙ্কারকে বন্দনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, আত্মানন্দ অনুভূতির জন্য যিনি শক্তির ঊর্মিমালা আমার মধ্যে ন্যস্ত করিতেছেন সেই সঙ্কর্ষণ দেবকে নমস্কার করি।

তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, কি অপূর্ব তোমার করুণা। এ জগতের যাত্রাপথে আমার বোঝা দিন দিন ভারী হইতেছে; এ বোঝা আর কেহই ঘাড়ে করে না। সকলেই আপনাকে বাঁচাইয়া দূরে দূরে ফাঁকে ফাঁকে থাকে এবং আমাকে ভাঁড়াইয়া নিজের নিজের কাজটি বাগাইয়া লইবার চেষ্টা করে; কিন্তু তুমি কোনদিনই আমাকে ত্যাগ কর নাই। আমার বোঝা যতই ভারী হউক না কেন অম্লানবদনে আত্মীয়তার বাহু বাড়াইয়া দিয়া সে বোঝা নিজের মাথায় লইয়াছ। কৃপাময় তুমি, জগতের যত বোঝা সব তোমার মাথায় প্রেম মহিমায় সর্ষপের মত তুচ্ছ হইয়া যায়।

তাঁহারা অহঙ্কার-তত্ত্বের এই অধিদেবতাকে বিজ্ঞানমাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি আমার পক্ষে পরোক্ষ নহেন, প্রত্যক্ষ। তাঁহার জন্য আর সাধ্য-সাধনা করিতে হয় না। তিনি অযাচিতভাবে আমাকে আসিয়া আলিঙ্গন দান করেন। উত্তম অধমের বিচার তাঁহার কাছে নাই; তাঁহার প্রসন্ন মুখের উদ্ভাসিত হাসি সকলের জন্যই সমভাবে উন্মুক্ত। এমন যে আমার আপনার, তাঁহার জন্য সত্যই কি অহঙ্কার করিতে হয় না?

এখন প্রশ্ন হইবে এই যে, এতো সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা; স্থূলের বোঝা বহন করিতেই এখন আমরা ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছি; সূক্ষ্মের দিকে নজর দিবার মত অবসর আমাদের কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর বৈষ্ণবগণের মতে এই যে, অহঙ্কারের জন্য যদি অহঙ্কার করিতে পার, তবেই তোমার পক্ষে চিরন্তন অবসর জুটিবে। কথাটা অবশ্য একটু গভীর। এক্ষেত্রে এই সত্যটি তলাইয়া বুঝিতে হইবে যে, অহঙ্কারের জন্য অহঙ্কার করার অর্থই হইল—আমার অন্তরে অহঙ্কারতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে কৃপারস অজস্র ধারায় প্রবাহিত হইতেছে সেই কৃপারই স্বীকৃতি এবং সেই কৃপাময় দেবতার জন্য অহঙ্কার। অন্য কথায় তাঁহার স্বজনত্বের স্বীকৃতিতেই আমার অহঙ্কার। আর জগৎজোড়া যে হাহাকার, আমার চিত্তের যত দৈন্য বা বিকার এই স্বজনের অভাবে। যে মন আজ মরীচিকা-ভ্রান্ত মৃগের মত তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিয়া ফিরিতেছে। এই স্বজনের উদার লীলা উপলব্ধি করিলে সেই মৃগপর্ণ হইয়া দাঁড়াইবে অর্থাৎ অভয়ত্বে প্রতি-ষ্ঠিত হইবে। অহঙ্কারের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিবার অর্থই হইল এই অভয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকারকে লাভ করা।

এই অভয়ত্ব-স্বীকৃতির কথার দ্বারা অহঙ্কার-তত্ত্বের একান্ত অবদানকে অভিব্যক্ত করা হইল না। এই অভয়ত্ব জিনিসটা কি; শুধু ভয় ভাঙা, না, সকল ভয়কে তুচ্ছ করিবার মত এমন কিছু পাওয়া? এ প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু শুধু ভাষায় বলা চলে যে, অহঙ্কারতত্ত্বের অন্তর্নিহিত আপ্যায়ন উপলব্ধি, ভয় ভাঙা তো নয়ই ভয়কে জয় করা বা তাহার অপেক্ষা আরও একটু আগাইয়া ভয়কে তুচ্ছ করিবার মত কোন কিছু পাওয়াও নয়। সে অবস্থায় সকলকে আপনার করিয়া পাওয়া। ইহার গূঢ় অর্থ হইল এই যে, সকলকে স-কলভাবে পাওয়া অর্থাৎ কলায় কলায় পূর্ণ করিয়া পাওয়া; কারণ সেই বস্তুই আমরা আপনার করিয়া পাই, যে বস্তু পূর্ণ-ভাবে পাই। আংশিক পাওয়া আপনার করিয়া পাওয়া নয়; সেখানে সন্দেহ রহিয়াছে, সংশয় রহিয়াছে; তেমন পাওয়াতে বুক ভরে না।

এই স-কল পাওয়া বা অন্য কথায় সংকল্পের রাজ্যে যাওয়া সাধনতত্ত্বের কথা। এখানে কল-গানের কথা আসিয়া পড়ে। সাধক ছাড়া সাধারণের পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন ব্যাপার। বিশেষত সংক্ষেপে তাহা বলা চলে না; কিন্তু তবু কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। কথাটা হইল এই যে, যে জগৎসংসারে যত কিছু বস্তু সবই শব্দ; বায়ুমণ্ডলে বাহিত এই শব্দ-তরঙ্গকেই আমরা বিভিন্ন ভঙ্গী অনুসারে বিভিন্ন বস্তু সংজ্ঞা দিয়া থাকি। কিন্তু আমরা যেভাবে এই শব্দরাজী গ্রহণ করিতেছি তাহাতে আমাদের শব্দের নিহিতার্থ লাভ হয় না; চেষ্টা ব্যর্থ হয় মাত্র। আমরা অর্থহীন শব্দসংঘাতের কোলা-হলের মধ্যেই যেন কাল কাটাইতেছি। বৈষ্ণব-শাস্ত্রকারগণ বলেন, সংকর্ষণতত্ত্ব অধিগত হইলে আমরা নিয়তার্থ হইতে পারি; অর্থাৎ সব শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হই; অভাব বাড়ান কোলাহলের রাজ্য হইতে কলগানের ভাবময় রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হই। আর কলগানের সেই যে রাজ্য, সেই তো আনন্দময় বৃন্দাবনভূমি। ভাগবতের ঋষি বলেন, সংকর্ষণকে সহায় করিতে পারিলে পৃথিবীর সরিৎশৈলবনোদ্দেশেই কৃষ্ণের গোধন চারণ দর্শন হয় এবং বেণুরব শ্রুত হয়। সেই কলগানে কান ডুবাইয়া দিয়া সাধক বিশ্বপ্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত শব্দরাজীর উদার ছন্দ আস্বাদ করেন; সে আনন্দগান গভীর হইয়া তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বাজে।

কিন্তু এখানেও শেষ কথা নয়; ইহারও উপরে আছে। সেই আনন্দগান তবে হৃদয় জুড়িয়া বাজার অর্থ কি? সাধকগণ বলেন, হৃৎকর্ণ দিয়া সে গান পান করা; বাঙলার সাধকগণ অধিকতর গূঢ় উপলব্ধি সূত্রে বলিলেন, "শ্রবণ অঞ্জলি ভরি অধর অমৃত করে পান।" শ্রবণ অঞ্জলি ভরিয়া যাহার অধর অমৃত পান করিতে হয়, সে যে কেমন সুন্দর, কত মধুর, একথাও কল্পনা করুন।

বৈষ্ণব সাধকগণ ইহারও উপরে গেলেন। তাঁহারা বলেন, যাঁহার কটাক্ষপাতে কৃষ্ণের বাঁশীতে এমন মধুর সুর উঠে, সংকর্ষণ কৃষ্ণের প্রণয়মহিমা রাসেশ্বরী সেই রাধারাণীর 'ভ্রাজৎ দৃগন্ত নটনকে উন্মুক্ত করে।' 'অনন্ত বৈকুণ্ঠ—অনন্ত অবতার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহ সবার আধার যিনি তাঁহাকে এই জগতের ধূলা-বালিতে নামাইয়া, একাধারে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল-লীলার আস্বাদন জীবের পক্ষে সম্ভব করেন। প্রেমসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্তা সেই রাম রোহিণীনন্দন। অধমতারণ কাঙালের ঠাকুর নিত্যানন্দরূপে লীলা করিলেন এবং জগতের বহু কর্মকোলাহলে, বহু শাস্ত্রের বহুকুতো বিব্রত জীবকে ভগবানের নামে মতি দিয়া কলগানের রাজ্যে প্রবেশ করিবার রসের রীতি ধরাইয়া দিলেন; অন্য কথায় স্বকীয়

তত্ত্বের স্বরূপ কৃপাশক্তির সঙ্গে মানুষের মনকে যুক্ত করিয়া তাহার বোঝা ঘাড়ে লইলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রকার অহংকারতত্ত্বের অন্তর্নিহিত এই সত্যকে অনেক উপরে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কথা হইল এই যে, সমস্ত ক্রিয়াশক্তিই ভগবানের নিকট হইতে আসে। অহংকারতত্ত্বের স্বরূপ এই সংকর্ষণ হইলেন ভগবানের ক্রিয়া-শক্তি। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তি 'ক্রিয়া শক্তি প্রধান সংকর্ষণ বলরাম, প্রাকৃত অপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্মাণ।' তাঁহারা বলেন 'একোহং বহুস্যাম্' ভগবানের এই যে স্ব মাধুর্য আস্বাদন লীলা ইহা সংকর্ষণ তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া হয়। এ লীলা অবশ্য নিত্য লীলা; কোন সময় হইতে ইহা আরম্ভ হয়, এ কথা বলা চলে না। এই হিসাবে এ লীলা "অসৃজ্য," কিন্তু 'যদ্যপি অসৃজ্য এই চিচ্ছক্তি-বিলাস সংকর্ষণ কৃপায় হয় তাহার প্রকাশ।" বৈষ্ণবের ভগবান লীলাময় ঃ লীলা যখন আছে, তখন তাঁহার ক্রিয়াও আছে এবং শ্রুতিও এই সিদ্ধান্তই স্বীকার করেন। ভগবানের এই যে ক্রিয়া এ ক্রিয়া কেমন ক্রিয়া? রায় রামানন্দের মুখে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর পাই। "রায় কহে কৃষ্ণ হন 'ধীর-ললিত' নিরন্তর কাম ক্রিয়া তাঁহার চরিত।" এইখানেই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপ শক্তি বা স্বমাধুরীস্বরূপিণী শ্রীরাধার সেবা করিতেছেন এবং শ্রীরাধাও নিরন্তর কৃষ্ণের সর্ব কাম পূর্ণ করিবার সেবা কামনা করিতেছেন। সেবার এই সমসূত্রের ভিত্তিতে অন্যোন্যবিলাসের এই অহংকারকে আশ্রয় করিয়া, বৈষ্ণবের ভাষায় এই পীঠস্থান বা গর্ব-পার্যঙ্কের উপর রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা চলিতেছে। এক্ষেত্রে আসন বা পীঠ হইতেছেন মূল সংকর্ষণ তত্ত্ব। বৈষ্ণব উপনিষদের মতে কৃষ্ণ এক এক বশী এবং সর্বগ: কিন্তু যুগলতত্ত্বের ভিতর দিয়া না গেলে তিনি ভজনযোগ্য হন না। পীঠস্থ তাঁহাকে ভজনা করিলে, তবে মানব শাশ্বত শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। জীবনকে ভাব রসে বা প্রেম রসে পূর্ণ করিয়া স্বকীয় স্বরূপতত্ত্ব অনুভব করিতে পারে। অন্য কথায় মানুষের সকল কামনা সার্থকতা লাভ করে। বৈষ্ণবের মতে এ জগতের মধ্যেও সকল ক্রিয়া-শক্তি স্বরূপে সেই সংকর্ষণ তত্ত্বই কাজ করিতেছেন। সকল ক্রিয়া-শক্তি মিলনের সংবেদনে সার্থকতা লাভের অভিমুখে নিরন্তর সঞ্চারিত হইতেছে। বিভিন্ন কায়ব্যূহের ভিতর দিয়া সেবা স্বরূপে সেই সংকর্ষণের কাজ চলিতেছে। মিলনের ছন্দে বিশ্ব প্রকৃতির ভিতর দিয়া এই যে রসময়ী গীতি উঠিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিবার মত শ্রুতি মানুষের মধ্যে রহিয়াছে; অহংকারের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইলেই তাহার পক্ষে এই শ্রুতি জাগে। অহংকার স্বরূপে যিনি কৃপা শক্তি সঞ্চারে নিত্য স্মৃতি উদ্দীপ্ত রাখিয়া যিনি আমাকে সঞ্জীবিত রাখিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইলেই বিশ্বের সমস্ত ছন্দ আমার মধ্যে স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে। একান্ত এই কৃপা শক্তির সম্পর্ক অবলম্বন করিয়া যে ছন্দ জাগে, সেই ছন্দের সূত্রে বিশ্বের সর্বত্র ক্রিয়া-শক্তিরূপে অনুস্যূত আনন্দ ধারার সঙ্গে আমাদের সংযোগ হয়, প্রতিকূলতা দূর হইয়া অনুকূলতার ভাব সর্বত্র উপলব্ধি হইয়া থাকে, অনিষ্টের অধ্যায় কাটিয়া গিয়া ইষ্টতত্ত্বের প্রকাশ হয়। তখন আমাদের অহংকার সার্থকতা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখন বুঝিতে পারি, "আছি আমি একান্তই আছি, মহাকাল দেবতার অন্তরের অতি কাছাকাছি মহেন্দ্র মন্দিরে। জাগ্রত জীবন লক্ষ্মী পরায় বিজয় মাল্যখানি উত্তমিত শিরে।" আমার ভিতর থাকিয়া নিত্য যিনি এই কৃপা-শক্তি বিকীরণ করিয়া প্রকৃতপক্ষে আমার প্রাণ-ক্রিয়া পরিচালনা করিতেছেন, আমরা সবই বুঝি, সবই জানি, কিন্তু কৃপা শক্তির এই সান্নিধ্য-ক্রিয়াকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। সে কৃপা শক্তিকে অস্বীকার করিয়া, তাহাকে পরোক্ষ করিয়া জড় জগতের প্রত্যক্ষতার মধ্যে অন্ধতার গ্লানি বহন করিয়া মরি। আমরা বাহিরে বহু কথা শুনিয়া শ্রুতিকে বিপ্রতিপন্ন করি; কিন্তু অতি নিকটে তাঁহার কথায় আমাদের কান যায় না। ঋষিরা তাই বলিলেন, "নানুধ্যায়াৎ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগাল্পয়নং হি যৎ" বহু কথাতে অন্তরের রাজ্যে লইয়া যাইও না, "আত্মানম্ একম্ জানথ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ", অন্য কথা ছাড়িয়া এক আত্মাকেই জান, অর্থাৎ আপ্যায়নময়ী বাণীর ভাবে সকল গ্লানিকে ডুবাইয়া দাও। এই ভাবময়ী বা ছন্দোময়ী বাণীই মনকে স্পর্শ করিয়া প্রত্যক্ষতার প্রত্যয় প্রবাহের বলে তুষ্ট এবং পুষ্ট করিতে সমর্থ হয় এবং মানুষকে অভয়ত্ব প্রদান করিয়া তাহার স্বরূপ তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। অনুভূতির মূলে চিত্তকে ডুবাইয়া নিত্য স্থিতির রাজ্যে লইয়া যায়। বিশ্বের প্রাণধর্মের মধ্যে তখন আমার প্রকৃত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ঘটে। বিশ্ব প্রকৃতির উপাধিগত জড়ত্ব আমার দৃষ্টি হইতে সরিয়া গিয়া নিরুপাধিক আনন্দ লীলাই উন্মুক্ত হয়। এই অবস্থায় সেবা ছাড়া জীবনে আর কিছু থাকে না এবং মন মাধুর্যের স্বরূপ তত্ত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে এই যে, আমাদের অহঙ্কার তত্ত্বে যে কৃপাশক্তির নিত্য আনন্দের আপ্যায়ন চলিতেছে সেই মহাকারুণ্য মহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে ভগবানের চিন্তা যিনি মধুর করিয়া দেন তাঁহার আশ্রয় লইতে হইবে। ভগবানের চিন্তা আমাদের কাছে মধুর হইলে অহঙ্কারের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব আমাদের মধ্যে স্ফূর্ত হইবে। তখন যে অহঙ্কারকে লইয়া আমরা এত অহঙ্কার করি, তাহা সার্থক হইবে। ভগবানের চিন্তা মধুর করিবার অর্থ কি, এখানে ইহা একটু বিবেচনা করা দরকার। মধুর শব্দের অর্থ এদেশের আলঙ্কারিকগণ এইভাবে করিয়াছেন, যাহাতে মানুষের মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের সন্ধানাত্মক ক্রিয়া একান্ত ভাবে স্বচ্ছন্দ হয়, এমন রসই মধুর—মধুর রস সকল ভরা রস। ভাগবতের ঋষিরাও বলিয়াছেন যে, মানুষের চিন্তার সঙ্গে ভগবানের প্রেমের লীলাকে মাখাইয়া না দিতে পারিলে মনের গ্লানির নিরসন হয় না এবং মনের গ্লানির নিরসন না হইলে সাধন ভজনের কোন অর্থই নাই। সংকর্ষণ তত্ত্বের ভিতর দিয়া মনের গ্লানির নিরসনাত্মক মাধুর্যের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় এবং নিয়তার্থ হইয়া ভগবৎতত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। ভগবানের যে ক্রিয়াশক্তির যোগে মানুষ বুঝিতে পারে যে তিনি আমাদের সঙ্গে সব সময় আছেন এবং আমাদের সকল ভার বহন করিতেছেন, সেই ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে ভগবান মধুর হইয়া উঠেন। তাঁহার আত্মীয়তার গভীরতা উপলব্ধি করিবামাত্র মানুষ তাহাকে প্রাণে প্রাণে পাইবার জন্য উত্তাপ বোধ করে এবং সেই তাপের প্রভাবেই ভাবের উদ্ভব হয় এবং ভাবের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সকল তত্ত্ব উন্মুক্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন, "ন চাভাবয়তঃ শান্তি" অশান্তস্য কুতঃ সুখম্; ভাবযুক্ত না হইলে শান্তি নাই এবং শান্তি না হইলে সুখ কোথায়? সংকর্ষণ তত্ত্বের আশ্রয়ে ভাবের মধ্যে সাধকের ভগবৎ সেবার নিত্য সুখের অনুভূতির রস-রীতির সঙ্গে সংযোগ ঘটে। সে সুখের স্বরূপ কি? বৈষ্ণব সাধকদের মতে "হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে সুখ আস্বাদন, হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।" এ অবস্থায় ভগবানের আনন্দময়ী লীলা শক্তির অন্তরে লাভ করিয়া মানুষেও লীলার রাজ্যে অর্থাৎ আনন্দধামে ভগবানের সেবার রসে ডুবিয়া যায়। তাহার পক্ষে শোক, দুঃখ বা মরণ কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় স্বর্গলোক, ইন্দ্রলোকের প্রশ্ন আর কিছুই নাই, উর্দ্ধাধঃ পরিব্যাপ্ত আনন্দের রাজ্য সাধকের পক্ষে উন্মুক্ত হয় এবং এই জগৎই বৃন্দাবন ধাম হইয়া পড়ে। রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয়ের ভাষায় সমস্ত জগতে রোমাঞ্চ সঞ্চারক প্রেম লীলার স্পর্শে সাধক তখন পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকেন। মানুষের জীবনের এইখানেই সার্থক। ভগবান উদ্ধবকে এই আস্থা লাভ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া বলিলেন, মানুষের শরীরে আমাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। মানুষ আমার ধর্ম বা আমার ভাব আশ্রয় করিয়া আত্মস্থ পরমানন্দ-স্বরূপ আমাকে সম্যকরূপে লাভ করিতে পারে। ভগবানের এই আত্মস্থ ভাবকে উন্মুক্ত করাই আকর্ষণের স্বরূপ তত্ত্ব। আমাদের অহঙ্কারের অন্তঃস্তলে এমন যে মহাকারুণ্য মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল, নিত্যানন্দের লীলায় তাহাই প্রকট হইল। ভগবানের একান্ত আত্মীয়তার সরস ভঙ্গীযুক্ত কৃপামূর্তি আমাদের কাছে পরিস্ফুট করিয়া তিনি সকলকে কোলে তুলিয়া লইলেন। আমরা বাঙালীর এমন প্রেমের ঠাকুরকে আমাদের মধ্যে পাইয়া ধন্য হইয়াছি; শুধু আমরা কেন, জগৎ ধন্য হইয়াছে। পতিত ও অবজ্ঞাত সকলের পায়ে নিজকে বিকাইয়া দিয়া যিনি আমাদের সকল ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিতেছেন, আসুন আমরা সকলে সেই মূল সঙ্কর্ষণতত্ত্ব নিত্যানন্দকে বন্দনা করি এবং অহঙ্কারের পুরস্কার প্রাণে লইয়া সকল তিরস্কারকে অতিক্রম করি।

'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা হইতে অনূদিত।

'সময়ে ঐ হেরি পথ'

শ্রীহাসিরাশি দেবী

বাবুদের বাড়ির রথ; মস্ত পিতলের রথ; সর্বাংশে তার বাবু-বংশের পূজার আভিজাত্য ফুল-চন্দনের রেখায় রেখায় সুপরিস্ফুট।

সেই রথ আজ আবার এক বৎসর পরে চলেছে বাবুর বাড়ির জীর্ণ দেউড়ির মরচে ধরা লোহার ফটক উন্মুক্ত করে...কৃষ্ণচূড়া গাছের তলা দিয়ে,—ভিজে মাটির পথে চাকার চিহ্ন এঁকে।

ভগবতী এসে দাঁড়ালো ওমনি একটা ঝাঁপালো গাছের তলায়।

মাটি ভিজে। পথ ভিজে; গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকেও অল্প অল্প জল ঝরছিল সারাদিন। তবু ঐ রথলাক্ষা উপলক্ষ্য করেই পথের এপাশে ওপাশে জমে উঠেছে দু' দশ-খানা গ্রামের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন অবস্থার মেয়ে-পুরুষের একত্র সমাবেশ। এদিকে ওদিকে বসেছে দুই একখানা দোকান—চিঁড়ে, মুড়কি, বাতাসা দুই একটা চিনেমাটির পুতুল, কি দু' চারটে কাচের চুড়ির বাক্স নিয়ে। তেলেভাজাও বসেছে।

রথ চলেছে।

নহবৎখানার ভাঙা প্রাচীর, অতিথশালার উঠোন পার হয়ে, সদর দেউড়ি পেছনে ফেলে এইবার এইদিকে আসবে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলা দিয়ে।

পাতুর চোখ জলে ভরে ওঠে......

"ঠাকুর, ঠাকুর গো.... এ-চোখের জল কি শুকোবে না?"

আঁচলে চোখ মুছেই কিন্তু সে শক্ত হয়ে উঠলো পাশের দিকে তাকিয়ে। সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তার ভাইয়েব স্ত্রী কেদাত্তি।

কেদাত্তি তাকালো ওর দিকে,—ঠোঁটের কোণে তার চাপা হাসি। রথের দিকে তাকিয়ে হাত দু'খানা জোড় করে কেদাত্তি যেন নিজের মনেই বলে চললো—"অপরাধ নিও না বাবা, হেই বাবা জগন্নাথ! তোমার দোহাই......"

ভগবতী নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে,—সামনে দিয়ে রথ চলে গেল দেখতে দেখতে; চমকে মুখ ফেরাতেই দেখলে কেদাত্তি তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দুই এক পা এগিয়ে এসে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলে—"হ্যাঁ লা ভগবতী, তু' মেলেচ্ছ না কেরেস্তান, যে সামনে দিয়ে রথ চলে গেল, তবু একবার মাথাডারে পর্যন্ত নোয়ালি না! —আবাগি! ঠাকুর দেবতারে অবহেলা?"

ভগবতী গর্জন করে উঠলো—"আমার খুশি, আমি মাথা নোয়াই আর না নোয়াই তু' গালাগাল দিবি কেনে? আমাথে গালা-গাল দিবার তু' কি অধিকারী লিকিন?"

—"বটে!"—

কেদাত্তির চোখের দৃষ্টি আরও ভীষণ হয়ে উঠলো; যেন সে এইমাত্র ভগবতীর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে ক্রুদ্ধ বাঘিণীর মত। পড়তোও হয়তো,—কিন্তু চারিদিকের অবস্থা বুঝে নিজেকে সামলে নিলে; তারপরে কোনও উত্তর না দিয়েই সে জায়গা ছেড়ে চলে গেল পথের অন্যদিকে, একা ভগবতী সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ স্তম্ভিত-ভাবে। তারপর পায়ে পায়ে চুপড়ি-ভরা কাচের চুড়ির দিকে এগোতে এগোতে প্রশ্ন করলে—"ভালো চুড়ি আছে লিকিন? —বেশ ভালো ঝক্‌ঝকে রুপোলি চুড়ি?"

"তা আর নাই—প'রলে তুকে বেশ মানাবে ভগবতী, ঐ গোল গোল সুন্দর হাত দু'খানায় আর মানাবে না? যা, পরগিয়ে কেনে—!"

মুখ ফিরিয়ে ভগবতী দেখলে বক্তা বাবু-দের গোমস্তা স্বয়ং বামাপদ। বামাপদর মুখে হাসি, চোখে কথায় ভরা দৃষ্টি।

উত্তরে ভগবতীও হাসলো একটু,—

"কিন্তু পয়সা?"

"তুর আবার পয়সার অভাব?—"

"তা থাকবে কেনে? তুমি যে আমার নামে তালুক কিনে রেখেছ!"

হঠাৎ অদূরের একটা গণ্ডগোলে ওদের সরস কণ্ঠস্বর ডুবে গেল; মুহূর্তে, ভীত, সন্ত্রস্ত জনারণ্যের মধ্যে থেকে ছুটে এলো একটা দড়ি-ছেঁড়া বলদ; এক ঘায়ে ভগবতীকে পাশের ইঁট-গাদায় আছড়ে ফেলে—আবার সে জনারণ্যে মিশে গেল।

ভগবতী আত্মরক্ষার সময় পেলে না, চীৎকারও বা'র হ'ল না তার মুখ থেকে ......রক্তাক্ত চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য দেখলে তাকে সযত্নে দুটি বলিষ্ঠ বাহুর ওপোর তুলে নিচ্ছে একটি অচেনা, অজানা মানুষ।

ভগবতী তাকে এর আগে এ গাঁয়ে দেখেনি।

কয়েক মাস আগের কথা।

জোড়হাট স্টেশনে নেমে, ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে যে পথটা খানা-ডোবা আশে পাশে রেখে, বন-বাদাড় পার হয়ে সামনের গ্রামখানায় মিশেছে,—সে গ্রামের নাম খ্যাংরাপোতা।

চৈত্রের মাঝামাঝি।

আগে-পাছে পুলিশ প্রহরী নিয়ে যে ছেলেটি সেই খ্যাংরাপোতা গ্রামের একটা ভাঙা বাড়িতে আশ্রয় নিলে,—তার নাম লালমোহন।

নির্দিষ্ট বাসস্থানে উপস্থিত হয়ে লাল-মোহন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে বসে রইল, তারপরে কতকগুলো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে এনে, তিনখানা ইঁট সাজিয়ে রান্না চড়ালে সেদিনের মত; সে-রাতের মতও সেই ঘরেরই একটা পাশ পরিষ্কার করে বিছানাও পেতে ফেললে গোটা দুই কম্বল বিছিয়ে।

সারারাত্রি কেটে গেল নির্জন নদীতীরের সেই ভাঙা বাড়িতে, আরস্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে। বাড়ির চারিপাশে আমবাগান, কবে কার সখের আমবাগান, আজ যুগ-যুগান্ত ধরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে আগাছার মধ্যে দিয়ে। তারি আশ্রয়ে বাস করে নানা বন্য জন্তু।

লালমোহনও হ'লো তাদেরই প্রতিবেশী; তবু সে মানুষ, তাই ওইটুকুর মধ্যেই কেবল নিজেকে পারলে না আবদ্ধ করে রাখতে, ছড়িয়ে পড়লো মানুষের মধ্যে, মানুষের মধ্যে থেকেই সে উদ্ধার করলে ভগবতীকে।

ভগবতী চোখ মেললো.........

ভাঙা ঘরের চাল দিয়ে তারার আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, একপাশে জ্বলছে একটা ধূম-ধূসর হ্যারিকেন; তার স্বল্পালোকে চারিদিকের অন্ধকার যেন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

বাইরে থেকে ভগবতীর ভাই বেণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"ভগবতী কেমন আছে বটে রে?"

ভাইবৌ কেদাত্তি নীরস স্বরে জবাব দিল—"থাকা-থাকির কি আছে, কি হবে বটে উর! উ-সব লচ্ছার মেয়েমানুষের মরণ আছে লিকিন? তা নইলে শ্বশুর ঘর যেতে না যেতে স্বোয়ামীডেরে খেয়ে এসে বসলো এইখেনে?"

বেণী এবার রুখে উঠলো—"চুপ করে যা কেনে' হারামজাদি, লয়তো এক লাথিতে তুর দাঁতের পাটি উড়িয়ে দিব, জানিস? সময় নাই, অসময় নাইক'—আমার একটা বুন মাত্তর,—তার নামে তু' যা-তা বলবি কেনে? কেনে বলবি শুনি? এই আজই যদি ঐ লজরবন্দী বাবু ইখানে না থাকতো তো পেরানডা কুন বাঁচাতো উর, —কুন মরদের বাচ্ছা আইছিল উরে সেই যোমের হাতেথে বাঁচাতে, বোল্......"

উত্তরে একটা কেদাত্তি তিনজনের শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করলে মুহূর্তে—"বটে রে খানেখারাপে,—আয় তবে এগিয়ে আয়, কে কার দাঁত ভাঙে দেখি, আয়—"

এর পরে প্রত্যহ যা হয়, অর্থাৎ চেঁচা-মেচি, গালাগালি এবং দাপাদাপি শুরু হ'ল সমস্ত উঠোন জুড়ে।

"আঃ মাগো—!"

স্বর্গগতা জননীকে স্মরণ করে অসহায় ভগবতীর চোখ বেয়ে আজ জলের ধারা নামলো।

মা তার স্বাধ্বী ছিল; সারা গাঁয়ের মধ্যের কেউ তার মায়ের চরিত্রে আজও দোষারোপ করতে পারে না; কিন্তু সেই মায়ের মেয়ে হয়ে আজ সে কোন্ পথে গিয়ে দাঁড়ালো! এ-পথে যে প্রত্যহ বহু পথিক যাতায়াত করে। কেমন করে বুঝবে সে......এ-পথের কোন্ পদচিহ্নটি তার জীবনে স্মরণীয় হয়ে উঠবে!

মনের গতি চিরদিন কারো সমান তালে চলে না, একথা ভগবতীও বুঝলো একদিন, যেদিন বেণী তাকে স্পষ্ট জানালে—"দেখ, ভগবতী, তুর লেগে চিরদিন তো আর আমি বউডোর সংগে কাজিয়া করে কাটাতে পারি না। তার চেয়ে তু' কেনে অন্য কুথাও ঘর বাঁধগে যা—আমিও এ জন্‌ালা এড়াই।"

ভগবতী যেন অকুল সমুদ্রে হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার দেখলে; তারপর কেঁদে গিয়ে পড়লো বাবুদের কাছারীবাড়ি,—বামাপদর কাছে।

—"বাবু—"

"কে রে, ভগবতী? কেনেরে? তুর চোখে জল কেনে? হয়েছে কি?

কাছারীবাড়ি তখন প্রায় নিস্তব্ধ; শুধু চুণ-বালি খসা কার্নিশের মাথায় বসে কয়েকটা কবুতর বিশ্রাম করছে।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে বামাপদ উঠে পড়লো দুপুরের বিশ্রাম-শয়ন ছেড়ে। ডাকলে—"ভগবতী—।"

আঁচলে চোখ মুছে ভগবতী বললেঃ "তুমি বাবুদের গোমস্তা, আমাদের,—ছোট-লোকদের ভালো-মন্দ বিচের ক'রবার ভার তুমার হাতে,—তুমি ইয়ের যথাথ বিচের করো, —এই বু'লছি বাবু,...ই-আমার মাথার দিব্যি নাগে—"

বামাপদ উঠে এসে দাঁড়ালো, একেবারে ওর সামনাসামুনি ঃ

"কি বলছিস্—বল্ কেনে—"

"কেদাত্তি আর বেণীতে মিলে আমাথে তাড়িয়ে দিয়েছে,—'না' করেছে ঘরকে ঢুকতে। বু'লছে—অন্য কুথাকে ঘর বাঁধগা যা।—দোহাই তুমাদের যথাথ বিচের করো,— কুথাকে যাব আমি বাপের ভিটে থাকতে?"...

"ও, এই কথা—!"

বামাপদর মুখে হাসি দেখা গেল; বিচিত্র হাসি।

"তু' কেনে আমার উখেনে চল্ না ভগবতী—"

অবহেলায় ভগবতীর লাল টুকটুকে ঠোঁট দু'খানি, কেঁপে উঠলো—

"হ্যাঁ, সেদর ভাই যারে জায়গা দিলে না, তাথে আবার......"

"তু বিশ্বেস কর ভগবতী, আমার কথায় বিশ্বেস কর, দ্যাখ্, বৌটা ক-বে মরেছে! ছেলেমেয়ে কটাকে নিয়ে হাল্লাক হয়ে মরছি; তু চ; কেনে, দু'ট্যা ভাতও ফুটাবি, নিজের পেট্ থানও আটকাবে নাঃ—"!

পাতু এত দুঃখেও হাসলোঃ—

"ভাত ফুটাব আমি, আর খাবে তুমরা? আমি হল্যাম বাগ্দীর মেয়ে, আর তুমরা হ'লে জাতে কৈবর্ত, জাত যাবে না আমার ভাত খেলে?

বামাপদ হাসলো এবার, প্রাণখোলা হাসি... "হ্যাঃ—জাত! দু'পাঁচটা টাকা খরচ করতে পারলে জাত আপনার আপনি হেঁটে আসবে, বুঝলিরে ক্ষেপি,?..."

ভগবতী ভাবতে লাগলো।...ভাবতে ভাবতে চোখের সম্মুখ থেকে মুছে গেল বামাপদ'র ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট দেহ—কুৎসিত আকাঙ্ক্ষায় তীব্র দৃষ্টি...উজ্জ্বল মুখ,—তার জায়গায় ভেসে উঠলো নদীতীরের ঐ নির্জন ভাংগা বাড়িটা,...আর তারই কোনও ভাংগা ঘরের বাসিন্দা লালমোহনের মুখ, তার সবল দীর্ঘ দেহ।

ভগবতী চমকে ওঠে...

—না, না, না। ঠাকুর, তাকে যেন কোনও দিন বাগ্দীর মেয়ে ভগবতীর কাছে এনো না...সে যেন বেঁচে থাকে, ভগবতীর পাঁক ঘাঁটা স্পর্শ এড়িয়ে সে যেন বেঁচে থাকে।...

বামাপদ এগিয়ে এলো, একখানা হাত ওর কাঁধে রেখে ডাকলে, "ভগবতী—"

শিউরে উঠে' ভগবতী বামাপদ'র হাতখানা সরিয়ে দিলে; তারপরে "ভেবে দেখবো" বলে যে পথে এসেছিল, ঝড়ো হাওয়ার মত দ্রুত-পদে সেই পথেই অদৃশ্য হলো।

ফিরে ডেকে বামাপদ তার সাড়া পেলে না।

একবছর ঘুরে গেল আবার,—দেখতে দেখতে বামাপদ'র জীবনেও বর্ষার পর বসন্ত এলো আবার একটি নববিবাহিতা কিশোরী বধূর আগমনে। বেণীর সংসারও হেসে উঠেছে একটি নবজাত শিশুর সংস্পর্শে।... কেদাত্তির আনন্দ ধরে না...কিন্তু ভগবতী এগ্রামে নাই, একবছর আগের সেই যে একটি দিনে বাবুদের কাছারীবাড়ির বারান্দা থেকে বিদায় নিয়েছিল, তারপর থেকে আর তাকে কেউ এগ্রামে দেখে নি।...

একবছর পরের আবার সেই রথটানার দিন;—আবার সেই বিভিন্ন গ্রামের নরনারীর সমাবেশ, সেই দু'চারখানা দোকান,...সেই সব।

বামাপদ চলেছে রথের আগে আগে।...

প্রবাসী বাবুদের অভাবে সেই আজ সমস্ত জমিদারীর মালিক, তার হাতেই গঠন হচ্ছে প্রজা-উৎপীড়নের নূতন পন্থা।...গ্রামবাসী তাই তাকে দেখলে একটা আতঙ্কের দৃষ্টিতে।...

রথ আবার আসছে সেই ভাঙা নহবৎ-খানা, অতিথিশালার উঠোন পার হয়ে।...

চলতে চলতে বামাপদ দাঁড়াল হঠাৎ...; পথের পাশে দাঁড়িয়ে ও কে?

অতীতের অবহেলা যেন আজ নতুন করে' বামাপদকে কশাঘাত করলে।

প্রশ্ন করলে—"কে ঐখানে? ভগবতী নয়?"

ভগবতী এগিয়ে এলো, নিরাভরণ হাত দু'খানা বাড়িয়ে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে তারপরে বামাপদ'র কথার উত্তর দিলে—

"হ্যাঁ, আমিই।...তুমরা ভালো আছো বাবু?—"

"ভালো!—হ্যাঁ ভালো বইকি। তারপরে তু' এখন আছিস কোথায়?"

ভগবতী একটু হাসলো; নদীপাড়ের কোনাকুনি আঙুল তুলে বললেঃ

"ঐদিকের শহরে—; একটা ভালো কাজ পেয়েছি বাবু, একটা হাসপাতালের কাজ।... আজ রথের দিন...তাই ছুটি নিয়েছি তুমাদের সংগে একবার দেখাশুনো করবো বুলে—।

ভগবতীর দৃষ্টি যেন সে জনারণ্যে কাকে খোঁজ করে এলো।

"ও—" বলে বামাপদও তাকে ফেলে এগিয়ে চললো; আজ তার দাঁড়াবার সময় নাই—সবদিকেই কাজ। তবু সেই কাজের মধ্যে থেকেও মনে হলো—যে ভগবতী একদিন তাঁর সম্মুখ থেকে বিদায় নিয়েছিল, এ যেন সে নয়,—আর কেউ।...

রথ এগিয়ে এসেছে;...ঐ, ঐ, ঐযে...

ভগবতী আজ মাটিতে মাথা নুইয়ে প্রণাম করলে নিরশ্রু চোখে।

"জগন্নাথ! রথের ঠাকুর! কই, কই—তুমি কোথায়?..."

আকাশে আজ মেঘ নাই, বৃষ্টিও ঝরছে না সকাল থেকে। কৃষ্ণচূড়া গাছের তলা দিয়ে রথ এগিয়ে এলো। ভগবতীর আহ্বানে সে মূর্তি উত্তর দিলে না, কিন্তু তার সমস্ত বুকখানাকে কাঁপিয়ে কে যেন সেই একবছর আগের জনকোলাহলের মধ্যে থেকে উত্তর দিলেঃ—

"আছি, আছি, আমি আছি।"...

ভগবতীর চোখের সম্মুখ থেকে মুছে গেল বামাপদ, লালমোহন আজকাল এই লোক-জনের মেলা-মেশা, তার জায়গায় ভেসে উঠলো কতকগুলি অনাথ আতুরের অসহায় মুখ, কাতর দৃষ্টি। সে উঠে দাঁড়ালো।

স্যাণ্ডেল মশাই

শ্রীরমণীমোহন পাল

সকালে বাইরের ঘরে বসে আফিসের এক তাড়া কাগজ দেখছি, এমন সময় রাস্তা থেকে কে ডেকে উঠলো, "গোবিন্দ বাড়ি আছ?"

বিরক্ত হয়ে বাইরে আসতেই মূর্তিমান কন্দর্পস্বরূপ স্যাণ্ডেলকে নজরে পড়লো।

স্যাণ্ডেল, কি বলে,—তারিণী সান্যালকে চেনেন না? সে কি? দুর্গাপুরের সকলেই ত তাকে জানে। তাকে দেখতে রোগা, লম্বা,—মুখে বসন্তের দাগ, মাথাটা দেহের তুলনায় একটু মোটা। তাই ছেলেরা তাকে রাগায় সুপুরী গাছ বলে, কেউ বা বলে স্যাণ্ডো। পায়ে খড়ম আর হাতে লাঠি নিয়ে শব্দ করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলে। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, সব সময়েই মুখে খক্ খক্ কাশি, আর অনবরত থুথু ফেলে ফেলে রাস্তা ভিজিয়ে ফেলবার জোগাড়।

সকালবেলা এ রকম কন্দর্পের দর্শনে মনটা সঙ্কুচিত হল। আমি কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন, "গোটা আষ্টেক পয়সা দিতে পার ভাই? এ লোকটার দাম মিটিয়ে দিই। তোমায় পরে দিয়ে দোব।"

স্যাণ্ডেলের সামনে এক ঝাঁকা তরিতরকারি মাথায় নিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে আর স্যাণ্ডেল এক হাতে একটা বড় লাউ, অন্য হাতে একছড়া মর্তমান কলা ও বগলে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লাউএর ভারে একদিক নীচু হওয়ায় দৃশ্যটা উপভোগ্য হয়েছিল। মুখে হাসিও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মুখের হাসি, পয়সার কথা শুনে অন্তর্হিত হল।

বেশ জানতুম যে তারিণীকে পয়সা দিলে আর ফিরে পাব না, সেইজন্য শুষ্কমুখে বললুম, "বিলক্ষণ, আমরা যে আপনার ব্যাঙ্ক।"

তারিণী মুখে একটু দেঁতো হাসি টেনে এনে বললে, "হেঁ হেঁ, যা বলেছ।"

ব্যাগ থেকে পয়সা বার করে তারিণীর হাতে দিয়ে ফিরে আসছি, এমন সময়ে শুনতে পেলুম লোকটা বলছে, "এ-কি চোরাই মাল যে চার পাঁচ গণ্ডা পয়সার জিনিস আট পয়সায় দোব? জিনিস ফিরিয়ে দিন ঠাকুর। বউনির সময় মহা ঝঞ্ঝাট হল দেখছি।"

পিছন ফিরে তাকাতেই স্যাণ্ডেল বললেন, "দাও ভাই গোবিন্দ, আর চারটে পয়সা। তা না হলে ব্যাটার খাই মিটবে না দেখছি।"

আটটা ত গেছে, আবার চারটে যেতে বসেছে। ওদিকে সে লোকটার চীৎকার ক্রমশ বাড়ছে। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আর চারটে পয়সা বার করে দিয়ে ঘরে এলুম।

কম পয়সা পেয়ে লোকটা গজ গজ করে বললে, "আর কোন্ ব্যাটা স্যাণ্ডেলকে জিনিস বিক্রী করে দেখ্‌ব।"

এর পর আর কাগজে মন দিতে পারলুম না।

আর একদিন আফিস থেকে দ্রুত হেঁটে চলেছি—ট্রেণ ধরব বলে। পাশের দোকান থেকে আবশ্যকীয় কয়েকটা জিনিস কিনে ট্রেণে চাপতেই মনে পড়ে গেল—ছোট ছেলেটার প্যাণ্ট কেনা হয়নি। তখন ফেরবার সময়ও আর নেই। অগত্যা ক্যানভাসারের আশায় বসে রইলুম। হঠাৎ দেখি—স্যাণ্ডেল মশাই হন্তদন্ত হয়ে একটা কুলির সঙ্গে আসছেন। কামরায় ঢুকে মোট নিরাপদ জায়গায় রেখে পকেটগুলো তাড়াতাড়ি খুঁজে তিনি আর্তনাদ করে বললেন, "এই যাঃ, আমার ব্যাগ; নিশ্চয়ই পকেট মেরেছে।"

ট্রেণের আরোহীরা ত হক্‌চকিয়ে গেল। আমিও প্রথমটা অবাক হয়েছিলুম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল যে স্যাণ্ডেল ট্যাঁক ছাড়া আর কোথাও পয়সা রাখেন না। আর তাঁর ঊর্ধতন কোন পুরুষেই ব্যাগ ব্যবহার করেনি।

কুলি পয়সার তাগিদ দিতেই তিনি খেঁকিয়ে বলে উঠলেন, "আমার যথাসর্বস্ব গেল আর তুই বেটা তোর চার ছটা পয়সার জন্য চেঁচিয়ে মরছিস?"

কিন্তু খোট্টা কুলির মনে দয়া হল না। সে তাঁর মোট ধরে টানাটানি শুরু করলে।

স্যাণ্ডেলমশাই তখন কাতর-চোখে ট্রেণের আরোহীদের দিকে তাকাতে লাগলেন। ইচ্ছেটা এই যে যদি কেউ তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে সাহায্য করে।

স্যাণ্ডেলের অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। কি হয় দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি আমাকে আবিষ্কার করে ফেললে।

স্যাণ্ডেলমশাই তখন উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "আরে গোবিন্দ যে, ভাগ্যিস্ তোমার দেখা পেলুম তা না হলে এ-কুলি ব্যাটার কাছে অপমান হতে হত দেখছি। ছটা পয়সা ধার দাও ত ভাই।"

এদিকে ট্রেণে ক্যান্‌ভাসার উঠেছে। প্যাণ্ট কিনতে হবে, কাজেই পয়সা নেই একথা বলাও চলে না। এমন সময় ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা বাজল, কুলিটাও মহাসোরগোল জুড়ে দিল।

তারিণীর লোক চেনবার ক্ষমতা আছে দেখছি। এক গাড়ি লোকের সামনে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে তাকে যে বিমুখ করতে পারব না তা সে জানত।

অগত্যা মনে মনে বিরক্ত হয়ে তাঁকে পয়সা দিয়ে দিলুম।

গাড়ি চলতে শুরু করল। প্যাণ্ট কিনব বলে ক্যানভাসারকে ডেকে প্যাণ্ট দেখছি, অমনি ওধার থেকে স্যাণ্ডেলমশাই বলে উঠলেন, "প্যাণ্ট কিনছ বুঝি গোবিন্দ! ঐ সঙ্গে নেড়ীর একটা ফ্রক কিনো ত ভাই। ব্যাটারা আমার পকেট খালি করে দিয়েছে।"

আর সহ্য হল না। কোন রকমে দ্বিধা কাটিয়ে বললুম, "আমার কাছে বেশী পয়সা নেই।"

তারিণী মুখখানাকে নিস্পৃহভাব দেখিয়ে বললেন, "দেখ ফ্রকওলা, বালী ষ্টেশনে একটু দাঁড়িও, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে জোগাড় করে দেব।"

আমি বুঝতে পারলুম যে কোথা থেকে পয়সা আসবে। সুতরাং প্যাণ্ট কিনে চুপচাপ বসে রইলুম।

এহেন তারিণী স্যাণ্ডেল মরেও আবার জ্বালাতে এল। তোমরা ভাবছ, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় সংস্করণ আর কি? কিন্তু মোটেই তা নয়। শোন তবে ব্যাপারটা।

শনিবার আফিস থেকে সকাল সকাল বাড়ি ফিরছি, এমন সময় খবর শুনলুম যে স্যাণ্ডেলমশাই মারা গেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারলুম—কাল সকালে গঙ্গার টাট্‌কা ইলিশ গোটা চারেক কিনে পাড়ার সন্তোষ দত্ত যখন শ্বশুর বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করছে, তখন টেলিগ্রাম এল যে তার মেয়ে হঠাৎ কলেরায় মারা গেছে। মেয়েই যখন নেই তখন মাছ পাঠান চলে না। আর চারটে ইলিশ তারা খেতে পারে না, বিশেষত আবার মেয়ের শোক ত আছে। সন্তোষ দত্ত মাছ নিয়ে কি করা যায় ভাবছে, এমন সময় স্যাণ্ডেল মশাই খবর পেয়ে উপস্থিত। খানিকটা দুঃখে সমবেদনা জানিয়ে, আর মোহমুদ্গর থেকে দুএকটা শ্লোক আউড়ে, সময় বুঝে মাছ কিনতে চাইলে। স্যাণ্ডেলকে মাছ বিক্রী করা চলে, কিন্তু পয়সা পাওয়া যাবে না; কাজেই সন্তোষ দত্ত স্যাণ্ডেলকে একটা মাছ দিয়ে বললে, "ওর আর দাম দিতে হবে না ঠাকুর। আপনাকে ওটা খেতে দিলুম।"

তারিণী তাকে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেলেন।

এদিকে তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কয়েকদিন আগে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে রেখে এসেছিলেন। খুব খুশি হয়ে একাই তিনি প্রায় দেড়সের ওজনের সেই ইলিশটাকে শেষ করলেন। তারপর কাল রাত্রি থেকে ভেদবমি শুরু হল। বেলা নটা দশটার সময় একবার ডাক্তার এসেছিল বটে, কিন্তু তখন আর injection দেবারও সময় ছিল না। দুপুরের দিকে পাড়ার কয়েকজনে তাঁকে দাহ করতে নিয়ে গেছে।

বাড়ি এসে চেয়ারে বসে জলখাবার আর চা খেতে খেতে তারিণীর কথা ভাবছি। *এখন তাঁর লোকঠকান ব্যবসাকে করুণার* চক্ষে দেখছি আর মনে হচ্ছে যে অভাবে না পড়লে হয়ত সে ভাল লোক হতে পারত। তার প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা ধীরে ধীরে অনুকম্পায় পরিণত হল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে হয়ত জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে ভাবছি, এখন সময়ে "বল হরি হরিবোল" আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলুম যে শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এল। আমার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে এল।

মাঝরাতে একটা চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে থেকে কে যেন আমায় ডাকছে, "গোবিন্দ ভায়া বাড়ি আছ ?"

আরে, এ যে স্পষ্ট তারিণীর গলা। পাশের বিছানায় শুয়ে স্ত্রী ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছে আর ছোট্ট খুকীটা যেন কিসের ভয়ে আঁতকে উঠে কান্না জুড়ে দিলে। মেয়েরা মানুষ দেখে না বলে গলার আওয়াজ শুনে তাদের চেনে। সেও বুঝতে পেরেছে— বাইরে যে ডাকছে সে তারিণী।

তবে কি তারিণী......?

চুপচাপ শুয়ে রইলুম। রাস্তায় সেই চির-পরিচিত খট্‌খট্ শব্দ আর কাশি শুনে বুঝলুম যে, যে এসেছিল সে চলে যাচ্ছে।

পরদিন সকলের মুখেই এক কথা। স্যান্ডেল নাকি কাল রাতে তাদের নাম ধরে ডেকেছে।

আমরা সকলে গ্রামের আটচালায় জড় হলুম।

হরি খুড়ো বললেন, "যারা তারিণীকে দাহ করতে গিয়েছিল তাদের ডেকে নিয়ে আয়।"

ডাকতে আর হল না। ভীড়ের মধ্য থেকে থেকে বেরিয়ে এল—মানুকে, ধীরু, গণশা আর পট্‌লা—চারটে ডানপিটে ছেলে। তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে, মাথার চুল উস্কখুস্ক। শুনলুম তাদের বাড়ি নাকি ঢিলও পড়েছে।

মাণকে বললে, "পঞ্চু অধিকারী এসে বেল এগারটার সময় খবর দিলে যে, স্যান্ডেল মরে গেছে। সে আমায় লোক নিয়ে যেতে বললে। কলেরার মড়া, কেউ যেতে চায় না। অনেক কষ্টে তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম। ঘরের একপাশে পঞ্চু দাঁড়িয়েছিল আর একপাশে একটা ছোট খাটিয়ায় একটা পাতলা কাঁথার ওপর স্যান্ডেলকে মরে পড়ে থাকতে দেখলুম। খাট আনবার হাঙ্গামা না করে সেইটেকে একটু বেঁধে নিয়ে চারজনে দাহ করতে চলেছি। তারপর সেই যে যেখানে পাকুড় আর বটগাছ ঝুরি নাবিয়ে রাস্তার ওপর ছড়িয়ে আছে, তার তলা দিয়ে যাবার সময় খাটখানা ভয়ানকভাবে দুলে উঠল। পট্‌লার চীৎকার ও একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখি যে স্যান্ডেল খাটের ওপর বসে, তার চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল টক্‌টক্ করছে, দু'কশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বিকট গর্জন করে সে তার দুখানা হাত বার ক'রে পটলাকে ধরতে যেতেই আমরা খাট ফেলে ছুট। একথা এ পর্যন্ত কাকেও বলিনি, পাছে লোকের মনে ভয় আসে।"

মাণকের কথা শুনে একটা অজানা আশংকা সকলের মন ভরে গেল।

পঞ্চু অধিকারী একপাশে চুপটী করে বসেছিল। তার মুখে এক মুখ গোঁফ দাড়ি থাকায়, মুখ দেখে তার মনের ভাব সহজে বোঝা যায় না। সে বললে, "কাল সকালে কয়েকটা পয়সার তাগাদা করতে গিয়ে দেখি যে, স্যান্ডেল মশাইএর কলেরা হয়েছে। ভয়ে পালিয়ে আসছি, এমন সময়ে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বললেন, 'ওরে অধিকারী, পালাসনি। বাড়িতে কেউ নেই যে এক ফোঁটা জল দেয়। তুই আমার ধর্মপুত্তুর। একটু জল দিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয় বাবা।' আমি বললুম, 'সে কি ঠাকুর, আমি কি আপনাকে জল খাওয়াতে পারি, তাহলে নরকেও যে আমার স্থান হবে না।' আমার কথা শুনে স্যান্ডেল মশাই কাতর-স্বরে বললেন, 'ওরে পঞ্চা, আমি মরে গেলে তুই যে ব্রহ্মহত্যার পাতক হবি। মহা সমস্যায় পড়লুম। অবশেষে জল খাইয়ে ডাক্তার ডেকে আনলুম। তখন শেষ হয়ে গেছে। তারপর মণিবাবুকে খবর দিয়ে সেইখানে রইলুম। কি বলব বাবুরা, আমি ত এক-জন রোজা, তবু আমার গাটা যেন ছম্ ছম্ করছিল। একে শনিবার, তায় আবার অমাবস্যা, তার ওপর আবার অনেকক্ষণ মড়া একলা পড়েছিল। এ নিশ্চয়ই দানোয় পেয়েছে।"

রোজার মুখে দানোর নাম শুনে অনেকেরই গা শিউরে উঠলো।

হরিখুড়ো সকাতরে বললেন, "বাবা পঞ্চু তুমি ত ভূতের রোজা। তোমাকে এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।"

সকলেই হরি খুড়োর কথায় সায় দিল।

পঞ্চু তখন উদ্ভট কতকগুলো নাম আওড়ে বললে, "দানোপাওয়া ভূতকে তাড়াতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এতে খরচও হবে বিস্তর, আপনারা পারবেন কি ?"

টাকার মায়া কে না করে, তবু অপঘাতে মৃত্যু কেউ চায় না। কাজেই অনেকে কি রকম খরচ হবে জানতে চাইলে।

পঞ্চু তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বললে, "গ্রামের মাঝখানে একটা বিরাট হোম করে গ্রামবন্ধন করতে হবে। তাতে প্রায় শ'খানেক টাকা খরচ হবে। আর যারা গ্রামের বাইরে যান, তাদের প্রত্যেককে একটা করে কবজ ধারণ করতে হবে। 'দানো-তাড়ন' কবজের প্রত্যেকটার দাম প্রায় পাঁচ টাকা।"

প্রায় একশ' লোক গ্রাম থেকে কোন না কোন কাজে বাইরে যায়। তাদের সকলের পীড়াপীড়িতে গ্রামবন্ধন প'চাত্তর টাকা ও কবজের দাম তিন টাকা আট আনায় ধার্য হল।

আটচালার সামনের মাঠে দুপুর থেকে ভারে ভারে নানা প্রকারের জিনিস আসতে লাগলো। অধিকারী স্বয়ং রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে তত্ত্বাবধান করছিল। তারপর যজ্ঞ শুরু হল। কতপ্রকার ভঙ্গী ও মন্ত্র-পাঠ হতে লাগলো। সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সকলের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা বলে ধনী-দরিদ্র সকলেই এক-স্থানে মিলেছিল।

মহাসমারোহে যজ্ঞ শেষ হতে অধিকারী হোমের ভস্ম ঘি দিয়ে মেখে সকলের কপালে ফোঁটা দিয়ে দিলে। গ্রামের মেয়েরা সিধে আর পয়সা দিলে প্রচুর।

কবচ বিক্রী শুরু হতেই মেয়েরা আগে তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য কিনতে শুরু করে দিলে। দেখতে দেখতে একশ' কবজ বিক্রী হয়ে গেল। অথচ যাদের প্রকৃত দরকার, তাদের বেশীর ভাগ এখনও কবজ পায় নি।

অধিকারী তার অন্তরের হাসি গোঁফ-দাঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে যথাসম্ভব গম্ভীর-ভাব দেখিয়ে হাত জোড় করে বললেন, "আমার কবচ আর তৈরী নেই। আজ সারা রাত ধরে জেগে আপনাদের জন্য তৈরী করে রাখব। কাল সকালে নিশ্চয়ই পাবেন। কবজ ছাড়া কেউ যেন গ্রামের বাইরে যাবেন না।"

সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে যে যার ঘরে গেল। আজ আর কারও মনে ভয় নেই।

গভীর রাতে অধিকারীর বাড়ি থেকে একটা গোলমাল আসতে লাগলো। নিস্তব্ধ রাত্রে রুদ্ধ চাপা কণ্ঠস্বরে অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মেয়েরা ত কেঁদে ফেলে বললে, "আহা অমন পরোপকারী লোকটা বুঝি ভূতের হাতে মারা পড়লো।"

গ্রাম বন্ধন হওয়ায় লোকের মনে ভূতের ভয় কমেছিল। কয়েকজন লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে অধিকারীর বাড়ির দিকে চললো।

অল্পদূর যেতেই তারা মারামারির শব্দ শুনতে পেলে। মনে হল কে যেন কিছু নিয়ে কাকে আঘাত করলে ও সঙ্গে সঙ্গে 'বাবা রে মরে গেলুম রে' বলে একবার চীৎকার করে সব চুপচাপ। তারপর একটা ছায়ামূর্তি অধিকারীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

অধিকারীর বাড়ির সামনে আসতেই একটা গোঁঙানি শব্দ শোনা গেল। এরা তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে ভেতরে গেল। সকলের মনে একটা দারুণ উৎকণ্ঠা। বোধ হয় ডাকাতে অধিকারীকে মেরে সব লুঠ-পাঠ করে নিয়ে গেছে।

ঘরের মধ্যে একটা দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেখা গেল। তার পাশের মেঝেটা রক্তে লাল হয়ে গেছে। তাকে চিৎ করে ধরতেই সকলে ভয়ে দশ হাত পেছিয়ে গেল। সে মুখে গোঁফদাড়ির চিহ্নও নেই। ঘরের মধ্যে যে পড়ে আছে সে স্যাণ্ডেল।

নাড়া পেয়ে আর অনেকগুলো আলো চোখে পড়ায় স্যাণ্ডেল চোখ মেলে চাইলে। তারপর ওদের ভয়ার্ত মুখ দেখে আস্তে আস্তে বললে, "ওরে আমি তারিণী, দানো পাইনি। পণ্ডা অধিকারীর পরামর্শে ভূত হতে গিয়ে আমার এই দশা। অনেক টাকার লোভ দেখালে, সামলাতে পারলুম না। উঃ মাগো! একটু জল।"

লোকগুলো এখন বুঝতে পেরেছে যে স্যাণ্ডেল মরেনি। একজন তার মুখে জল দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "অধিকারী কোথায়?"

স্যাণ্ডেল বললে, "সে টাকা নিয়ে পালিয়েছে। আমাকে বলেছিল, 'সে যা টাকা পাবে তার অর্ধেক আমায় দেবে।' আজ রাতে টাকার কথা বলায় সে বেমালুম বললে, 'একটা পয়সা মিলবে না। এখনই এ গ্রাম ছেড়ে চলে না গেলে দানো বলে পুড়িয়ে মারব।' আমি রেগে তাকে আক্রমণ করতেই সে আমার মাথায় লাঠি দিয়ে মারে।"

মানুকের এখনও সন্দেহ যায় নি। সে বললে, "তবে কাল মরেছিলে কি করে আর বাঁচলেই বা কিরূপে?"

স্যাণ্ডেল সখেদে বললে, "সবই অধিকারীর ফন্দী। সে একটা অষুধ খেতে দিয়েছিল। সেটা খেতেই অজ্ঞান হয়ে যাই। তারপর তোমরা যখন কাঁধে তুলে নিলে, তখন জ্ঞান ফিরে এল। অধিকারী একখানা ছুরি দিয়েছিল, তা দিয়ে খাটের দড়ি কেটে নিজেকে মুক্ত করি। তারপর সুবিধা বুঝে মুখে লাল রঙ্ লাগিয়ে তোমাদের ভয় দেখাই।"

তারপর স্যাণ্ডেলকে 'ফার্স্ট-এড্' দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এদিকে কয়েকজন অধিকারীর খোঁজে বেরিয়েছিল। তারা কেউ তার সন্ধান পেলে না।

বিদুষী ভার্যা

(১৯৬ পৃষ্ঠার পর)

মুখে মৃদু কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "মনে ত' হয়, নেই।"

প্রসন্ন মুখে হেমেন্দ্র বলিল, "তোমার যখন মনে হয় নেই, তখন নিশ্চয়ই নেই। এ বিষয়ে আমার চেয়ে গৌরীর বিশ্বাসের জোর অনেক বেশী ছিল। তোমার এম-এ পাশ করা লুকিয়ে রেখে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে আমি যখন মনে মনে ভয় পেতাম, গৌরী জোরের সঙ্গে বলত, বিয়ে হয়ে গেলে তুমি অনায়াসে দিবাকরকে দিয়ে তোমার এম্-এ পাশ করা হজম করিয়ে নিতে পারবে।"

কিন্তু সেইদিন রাত্রে শয্যাগ্রহণ করিবার পূর্বে দিবাকর যখন কথায় কথায় বলিল, "যূথিকা, নিশা আজ আমাকে উপদেশ দিয়ে গেল, প্রত্যহ তোমার কাছে একটু করে ইংরেজি শিখতে; আর বলছিল, তোমার মত স্ত্রীর কাছে লেখাপড়া শিখলে ভেড়াও মানুষ হয়।" তখন সহসা যূথিকার মনে হইল, কিছু পূর্বে অপরাহ্ণকালে হেমেন্দ্রনাথের প্রশ্নে 'মনে ত' হয়, নেই' বলিয়া সে যে আশ্বাস দিয়াছিল, হয়ত তাহা নির্ভুল হয় নাই। কোন কোন কঠিন রোগ বাহ্যত একেবারে সারিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও কখনো কখনো যেমন তাহার বীজ দেহের মধ্যে দমিত হইয়া থাকে, কিন্তু লুপ্ত হয় না,—মনে হইল, হয়ত তাহার স্বামীর মানসিক ব্যাধিও ঠিক সেইভাবে একেবারে লুপ্ত না হইয়া মনের কোন গভীর গোপন কোণে দমিত হইয়া আছে।

যূথিকার নির্বাক বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া দিবাকর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "অত চিন্তিত হবার কারণ নেই তোমার। ঠিক ভেড়া বলেনি, ভেড়ার মতন বলছিল।" তাহার পর নিশাকরের সহিত তাহার যে সকল কথা হইয়াছিল, যথাযথ বিবৃত করিয়া বলিল, "তোমার উপর নিশার যে-রকম শ্রদ্ধা আর ভক্তি, তাতে বোধ হয় তাকে লক্ষ্মণ দেওর বলতে পার।"

যূথিকা বলিল, "নিশ্চয় পারি। ঠাকুরপোর মধ্যে লক্ষ্মণের অনেক লক্ষণ আছে।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "আর, আমার মধ্যেও রামচন্দ্রের কতক লক্ষণ আছে। প্রথমত লক্ষ্মণের আমি বড় ভাই; দ্বিতীয়ত হাতে ধনুর্বাণের বদলে টোটা-বন্দুক; আর তৃতীয়ত, বুদ্ধিতে রামচন্দ্রের মতই বোকা।"

যূথিকা বলিল, "রামচন্দ্র ত' বোকা ছিলেন না।"

দিবাকর বলিল, "নিশ্চয় ছিলেন। বিনা অপরাধে যিনি স্ত্রীকে অগ্নি পরীক্ষা করিয়ে নির্বাসন দেন; তারপর সতীত্বের নিখুঁত প্রমাণ পেয়ে বাড়ি ফিরিয়ে এনে কয়েকজন প্রজার অন্যায় আব্দারে আবার নূতন করে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে বলে পাতাল-প্রবেশ করান, তিনি বোকা ছিলেন না ত' কি? সেইজন্যই ত' বোকা মানুষকে লোকে বোকা-রাম বলে।"

ফিকা হাসি হাসিয়া যূথিকা বলিল, "আমার রামচন্দ্র কিন্তু তেমন নন; অপরাধিনী স্ত্রীকে তিনি নির্বাসন দিয়ে আসেন নি, ক্ষমা করে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।"

কিছুক্ষণ হইতে আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা বড় রকম বৃষ্টি বাদলের আয়োজন চলিতেছিল। দিবাকর বলিল, "ঐ আসে ঐ অতি-ভৈরব হরষে, জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ রভসে, ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা। থামাও যূথিকা, রামায়ণের তুলনা। চল, শুয়ে শুয়ে বর্ষার গান শোনা যাক।"

"চল।"

রামায়ণের তুলনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া যূথিকা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। (ক্রমশ)

একটি গল্প

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"আমার কথা শুনে তোমার মনে হচ্ছে হেঁয়ালী। কিন্তু হেঁয়ালীর লেশ নেই ওর মধ্যে। তোমাকে পরিষ্কার করে বলি।" কথায় একটা ছেদ টানিয়া নীরেন ম্লান মিষ্ট হাসি হাসিল। তাহার স্বভাব-উজ্জ্বল দুই চোখে তখন স্বপ্নের কুয়াসা নামিয়াছে।

চৈত্রের অন্ধকার মধ্যরাত্রি। তাহারই মধ্যে ট্রেন হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসের সঙ্গে ঝলকে ঝলকে কত বিচিত্র গন্ধ আসিয়া কামরাখানা ভারাতুর করিয়া তুলিয়াছে। তারাভরা অন্ধকার আকাশ পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই অন্ধকার মধ্য নিশীথে চলন্ত ট্রেনের বিজলী আলোতে উজ্জ্বল মধ্যম শ্রেণীর ছোট কামরাখানা যেন স্বপ্নের মত সত্য। প্রত্যক্ষ—তবু কত অস্পষ্ট ও অদ্ভুত। অনিল আর নীরেন ছাড়া কামরাটিতে আর কোন আরোহী নাই। গত স্টেশনটিতে এইমাত্র তাহারা উঠিল।

স্টেশনে আসিয়া অবধি নীরেন চুপ করিয়া গিয়াছিল ; অথচ অতিমাত্রায় বকা তাহার স্বভাব। বোধ হয় অতিরিক্ত কথা বলা স্বভাব বলিয়াই সে মাঝে মাঝে চুপ করিয়া যায়। অনিল বন্ধুর এ স্বভাব জানে। সে বলে—নীরু তখন জাগিয়া স্বপ্ন দেখে। সে তাই তাহাকে আর বিরক্ত করে নাই।

ট্রেনে উঠিয়া নীরু ধীরে ধীরে একটি আসনের প্রান্তদেশ অধিকার করিয়া বসিয়া নীরবেই বাহিরের অবয়বহীন অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। হয়তো তারার স্বল্প আলোর ঝাপসা অস্পষ্ট বহিঃরাজ্যের অধিবাসীদের সহিত পরিচয় করিতে চায়। অনিল প্রাণধর্মী মানুষ—আরামে নিদ্রা যাইবার জন্য বিছানা পাতিতে লাগিল। হঠাৎ বিছানার ওদারকে চঞ্চলভাবে সঞ্চরমান দৃষ্টি বিছানা ছাড়িয়া কাঠের দেওয়ালের গায়ে আবদ্ধ হইয়া গেল। সে কুতূহলী হইয়া কি দেখিতে লাগিল। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে স্বপ্নাচ্ছন্ন বন্ধুকে জাগ্রত করিয়া ডাকিল—নীরু, মজা দেখ!

জাগিয়া যে স্বপ্ন দেখে তাহার স্বপ্ন ভাঙান শক্ত, স্বপ্নাবিষ্টভাবেই কোন কৌতূহল প্রকাশ না করিয়াই নীরেন বলিল—'কি মজা?'

—দেখ!

নীরু দেখিল এবং একবার নড়িয়া উঠিল তারপর স্বাভাবিকভাবেই আবার স্থির হইয়া বসিল।

বন্ধুর এত কাব্যিকতা অনিলের ভাল লাগিল না। সে বলিল তোমার আশ্চর্য লাগছে না? আমি তোমার হাতের লেখা ভাল করে চিনি। আমি হলপ করে বলতে পারি—লেখাটা তোমার হাতের ; আরও বড় প্রমাণ এই যে, নামটা তোমারই। অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটাতে তোমার হাতের টান স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অনিল লেখাটাকে আবার মনোযোগ দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।

পূর্বের মতই স্বাভাবিক কণ্ঠে নীরেন উত্তর দিল—আশ্চর্য আর কি! আমিই যখন লিখেছি, তখন আর আমি আশ্চর্য হব কেন? ধর—আমারই নাম আমিই লিখেছি।

অনিল আশ্চর্য হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

অল্প হাসিয়া নীরেন পূর্বের কথার জের টানিয়া বলিল—"লেখাটা আমারই হাতের লেখা—তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে তোমার একটা ভুল হয়েছে। ওখানে যে নীরেনের নাম লেখা আছে সে তোমার বন্ধু নীরেন নয়। তবে ওটা আমারই নামের দ্বিতীয় সংস্করণ।"

অনিল কিছুই বোঝে নাই। সে আশ্চর্য হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও বন্ধুর শেষের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল।

নীরেন হাসিল। বলিল—"তোমার কাছে হেঁয়ালী মনে হচ্ছে। আচ্ছা তবে পরিষ্কার করে বলি শোন।"

ঠিক এক বৎসর পূর্বে এই চৈত্র মাসেই, তুমি এই কামরাটার যেখানে বসিয়া আছ সেইখানে বসিয়া এমনি মধ্যরাত্রেই এই ট্রেনেই গিয়াছিলাম। আর নামটা লিখিয়াছিলাম সেই রাত্রিতে। আজ স্টেশনে আসিয়া অবধি সেই কথাই মনে হইতেছিল। আমার সেই চিন্তারই পরিণত অবস্থায় যখন আমারই হাতের লেখা আমি আবার দেখিলাম, আমি মোটেই আশ্চর্য হই নাই। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সেটা নিতে পারিলাম।

এই ট্রেন ভ্রমণের সঙ্গে আমার জীবনের একটি অতি ব্যথাতুর এবং মধুর কাহিনী জড়িত হইয়া আছে। ঠিক এবার যেমন করিয়া মধ্যরাত্রে স্টেশনের প্লাটফরমে বসিয়াছিলাম, গতবারও ঠিক এমনি দিনেই এমনি করিয়াই স্টেশনে বসিয়া কাটাইয়াছিলাম। আজিকার রাত্রিটা কেমন, যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, স্টেশনে কেমন লাগিয়াছিল, কোন্ ফুলের গন্ধ পাইয়াছিলাম তাহা আমি বলিতে পারিব না, যদিও এইমাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে সেখানে ছিলাম। তবে বোধ হয় সে সময়টা গত বৎসরের সেই চৈত্রের মধ্যরাত্রির মতই ছিল। যদিও না ছিল তবুও আমার তেমনিই লাগিয়াছে, কারণ তেমনি লাগিতেছে মনে করিতে ভাল লাগিয়াছে। দীর্ঘ এক বৎসর পূর্বের সেই চৈত্র রাত্রিটি আমার কাছে আজিকার এই প্রত্যক্ষ বর্তমান অপেক্ষাও অনেক বেশী প্রত্যক্ষ।

যাক্—স্পষ্ট মনে আছে—চৈত্র মাস। গরম পড়িয়াছে বেশ। মধ্যরাত্রিতে গরম কাটিয়া ঠাণ্ডা বাতাস ঝলকে ঝলকে বহিতেছে। বাতাসের সঙ্গে কোন একটা মিষ্ট ফুলের গন্ধ। সে গন্ধটাকে আমি বড় ভালবাসি, সেই রাত্রে তাহারা আমাকে সেই আনন্দ-সম্ভার পাঠাইয়াছিল বলিয়াই ভালবাসি। তবে এত কথা তখন মনে হয় নাই। পরে যাহা ঘটিল তাহাই সেই অতি সাধারণ রাত্রিটিকে আমার কাছে অপূর্ব সুন্দর করিয়া তুলিল। তাই আমি সেই রাত্রিটির স্মৃতিটিকে একটি পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ মুক্তার মালার মত গাঁথিতে গিয়া তাহার কিছু পূর্বের প্রতিটি গন্ধও দৃশ্যকে আমি আমার স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া তুলিয়া সেই নিটোল মুক্তাটির পাশে পাশে গাঁথিয়াছি।

মধ্য রাত্রি। আজিকার মতই সেদিন এমনি আকাশ অন্ধকার ছিল, ঠিক এমনিই আকাশে লাখো লাখো তারা ফুটিয়াছিল। আমি আমার টিনের সুটকেশটার উপর বসিয়া ট্রেনের জন্য বিরক্তিভরে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু জানো অনিল, আজ আমার সে রাত্রির বিরক্তিব্যাকুল প্রতীক্ষা বলিয়া মনে হয়। সে রাত্রে আমি যেন কাহারও জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

তারপর আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে ট্রেন আসিল। তারপর কিছুক্ষণ গোলমাল, হট্টোগোল। আজও আমার সে বিচিত্র কোলাহলের রূপটি স্পষ্ট মনে আছে। অনেকক্ষণ ট্রেন দাঁড়ায়। তাই কিছুক্ষণের মধ্যে কোলাহল থামিল, অধিকাংশ যাত্রীই আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। আমার মধ্যম শ্রেণীর টিকিট, কিন্তু তবু আমি তখনও উঠিতে পারি নাই। প্রত্যেক কামরা দেখিয়াই মনে হয় যাত্রী নাই, খালি। কিন্তু উঁকি মারিলেই বুঝিতে পারি, সকলেই ঘুমাইতেছে, গাড়ি বোঝাই, ভর্তি। এমন সময় শুনিলাম—হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনিলাম—তরুণ

মসৃণ নারীকণ্ঠে কে সস্নেহে কপট ক্রোধে বলিতেছে,—"নীরু, দপাদাপি করো না দুষ্টুমী করো না, লক্ষ্মী ছেলে, উঠে এসো!" মনে হইল আমাকেই যেন সে কণ্ঠে আহ্বান করিল! আমার নাম ধরিয়াই তো ডাকিল! আর—আর এমনি করিয়াই তো কে যেন কবে আমাকে কপট ক্রোধে স্নেহমধুর শাসন করিত! কে? কে? আমার মা? মায়ের কণ্ঠস্বর তো এমন ছিল না। ঠিক এমনি—ঠিক এমনি কণ্ঠস্বর কাহার ছিল! মনে মনে খুঁজিলাম, পাইলাম না। সাগরের সূর্যকরস্পর্শহীন গভীর জল তলে মুক্তা সঞ্চয় করিতে গিয়া, বিফল হইয়া প্রচণ্ড ভীতিতে ডুবুরী যেমন করিয়া পলাইয়া আসে, আমার চেতনা তেমনি তাহা বাহির করিতে না পারিয়া হাঁপাইয়া উঠিল।

তবে তখন আর মন লইয়া চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। সবুজ আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ট্রেন ছাড়িবে। এক মুহূর্ত পূর্বে যে কণ্ঠ আমাকে আহ্বান করিয়াছে, তাহারই আদেশ পালন করিলাম। সেই কামরাতেই উঠিয়া পড়িলাম। সেই কামরাই এই কামরা।

এ কামরার কথা আর কি বলিব! তবে সে রাত্রিতে এটিকে সত্য মনে হয় নাই, মনে হইয়াছিল এ যেন পুরো স্বপ্নের দেশ। আর কোন কিছুর সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। সেই স্বপ্নের ছায়া আজও আমার মনে আছে, তাই আজ পুরা স্বপ্ন মনে না হইলেও, এই স্বল্পালোকিত কাঠের কুঠরিখানাকে অর্ধ সত্য মনে করিতে কষ্ট হইতেছে না।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। আমার ভাগ্য ভালই বলিতে হইবে। কামরায় লোক বিশেষ নাই। ওদিকের বেঞ্চে কয়জন শুইয়া গভীর নিদ্রামগ্ন। যেখানায় আমরা বসিয়া আছি সেখানা খালি। আমি এখানায় আসিয়া সুটকেশটা রাখিয়া, তুমি যেখানে বসিয়া আছ সেইখানে বসিলাম। তারপর চাহিয়া দেখিলাম আমার পাশের বেঞ্চখানাতে প্রায় বছর চল্লিশের এক বিরাটকায় স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক শুইয়া। আর ওপাশের বেঞ্চখানাতে একটি মহিলা অর্ধেক শুইয়া, অর্ধেক বসিয়া বছর পাঁচ ছয়ের একটি স্বাস্থ্যবান প্রিয়দর্শন বালকের পিঠ চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছেন। বুঝিলাম যাঁহার সন্তানের শাসনকে আমি আমাকেই আহ্বান ভাবিয়া এ কামরায় উঠিয়াছি, ইনিই সেই আহ্বানকারিনী। শরীরের আয়তন ও প্রসারই কেবল দেখিতে পাইলাম। ব্যাঙ্কের ছায়ায় তাঁহার মুখ দেখা গেল না। অল্প মোটা, এবং মাথায় ছোট। কেবল হাতের সোনার চুড়ির উপর আলো পড়িয়া সেগুলো জ্বলজ্বল করিতেছে। তাঁহাকেই একদৃষ্টে দেখিতেছিলাম, যদি মুখখানা দেখা যায়। গলার স্বর শুনিয়া কেমন মনে হইয়াছিল। ছেলের পিঠের উপর তাঁহার হাতখানা পড়িবার দীর্ঘ মন্থরতায় বুঝিলাম, তাঁহারও ঘুম আসিতেছে। তবে তাঁহার ঘুম আসিতে পারে। কিন্তু চঞ্চল হইয়া দুলিতে দুলিতে ট্রেন চলিয়াছে, আর সেই চাঞ্চল্যের খেলায় ছোট শিশুটি যোগ না দিয়া কি করিয়া ঘুমাইবে! সে অকস্মাৎ উঠিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল—'আমার বাঘ কোথায়?' মায়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। মা কি উত্তর দিতেই ছেলে আবার শুইয়া পড়িল। মহিলাটি উঠিলেন ছেলেকে ভালো করিয়া শোয়াইবার জন্য। এবার তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম। এ কি! এ মুখ যে আমি দেখিয়াছি, কোথায় দেখিয়াছি! স্মৃতির প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে আর একখানি মুখ মনে জাগিয়া উঠিল—এ মুখ কাহার মনে পড়িল। হেনা, এ হেনা। হ্যাঁ, ঐ তো ডান গালে সেই কালো আঁচিল। ঐ আঁচিল লইয়া তাহার সহিত কত হাস্য-পরিহাস করিয়াছি। আর ভুল নয়। দশ—না বার বছর পূর্বের হেনার মুখে অমনিই আঁচিল ছিল। এ হেনারই মুখ। সে নিদ্রালু চোখ দুইটি খুলিয়া ছেলেকে কোলে করিয়া সস্নেহে তাহাকে তুলিয়া শোয়াইয়া দিল। সেই বিস্ফারিত বড় বড় চোখের অমনি ভঙ্গী আমি হেনা ছাড়া আর কাহারও দেখি নাই। এ হেনাই—অন্য কেহ নয়।

এই হেনা—আমার বারো বৎসর পূর্বের হেনা! তখন হেনার বয়স কত আর, বোধ হয় আঠারো উনিশ বৎসর! যে হেনার জন্য আমার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল, সেই হেনাকে আমি চিনিতে পারিলাম না। মনে মনে বড় দুঃখ হইল। এমনি আমার মন! পরক্ষণেই সান্ত্বনা পাইলাম মানুষের মন কি এমনি সোজা, শক্ত—যে জীবনের কক্ষপথ হইতে কেহ দীর্ঘকাল সরিয়া গেলেও তাহাকে ভুলিবে না! তেমনটি হইলে কি বাঁচা চলিত? আর তাহা ছাড়া হেনারও তো পরিবর্তন কম হয় নাই! তাহার বেশ পরিবর্তন হইয়াছে। সে অবশ্য কোন কালে রোগা ছিল না, তাহার উপর মাথায় একটু খাটো বলিয়া তাহাকে রোগা বোধ হইত না। দোহারা স্বাস্থ্য তাহার বরাবরই ছিল। তবে এখন সে বেশ মোটা হইয়াছে। বোধ হয় সে প্রচুর সুখে ও শান্তিতে আছে। ছয় বছর আগে হইলে হয়তো তাহার সুখ-শান্তির কথা ভাবিয়া ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইতে পারিতাম। কিন্তু সেদিন, বার বৎসর পর পূর্বপরিচিত কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া তেত্রিশ বৎসর বয়সে আর রগ হয় নাই, বরং বেশ খুশিই হইয়াছিলাম। হেনা সুখে আছে—সে খুব সুখের কথা।

আমার বার বৎসর পূর্বের হেনা-সংক্রান্ত সকল কথা মনে ভীড় করিয়া আসিল। তাহার সহিত প্রথম দিন সাক্ষাৎ ও আলাপ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ দিনের দেখার কথা পর্যন্ত একমুহূর্তে ছায়াছবির মত মনের উপর দিয়া তরতর করিয়া বহিয়া গেল। তাহাকে প্রথম দিন দেখার ও তাহার সহিত প্রথম পরিচয়ের প্রতিটি কথা আমার মনে পড়িল। সেদিন রবিবার ছিল। দুপুরবেলা একখানা বইয়ের জন্য বোনের ঘরে ঢুকিয়াই একটি অপরিচিতা তরুণীকে বোনের সহিত গল্প করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। চলিয়া যাইতেছিলাম, যাইতে যাইতে শুনিলাম মেয়েটি আমার বোনকে বলিতেছে—"কে রে? তোর দাদা বুঝি? তা চলে যাচ্ছেন কেন ডাক ওঁকে। ওঁর হয়তো কোন দরকার ছিল।" বোন ডাকিল, আমি ফিরিলাম। ঘরে গিয়া বইখানা লইয়া তাড়তাড়ি চলিয়া আসিতেছি, আমার বোন ডাকিল—"দাদা, এস হেনার সঙ্গে আলপা করিয়ে দি।" আলাপ হইল। দেখিলাম—শান্ত, গম্ভীর, শ্যামলা রঙের একটি ষোল সতের বছর বয়সের মেয়ে। দেখিতে এমন কিছুই নয়, নিতান্ত সাধারণ। কেবল চোখগুলো বড় বড়। গালে একটা আঁচিল। মেয়েটি যখন চায় তখন নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে চায়। তবে অধিকাংশ সময় ঘাড় হেঁট করিয়াই থাকে। সব কিছু মিলিয়া অতি সাধারণ শান্ত প্রকৃতির মেয়ে একটি। বেশ লাগিল। আলাপের মধ্যে জানিতে পারিলাম—আমার বোনের সহিত এক স্কুলে পড়ে, সেইবারই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। আমাদের পাশের বাড়িতেই তাহারা আসিয়াছে। আমার বোনের সঙ্গে প্রায় মাসখানেক পূর্বে আলাপ হইয়াছে। সব জানিয়া 'খুব খুশি হইয়াছি' এই কথাটি বলিলাম। সব মিলিয়া মেয়েটিকে বেশ লাগিল।

কিন্তু এই পর্যন্তই। বেশ লাগার বেশী আর কিছু লাগে নাই। তাহার পর হেনার সহিত, হেনাদের বাড়ির সকলের সহিত খুব আলাপ হইল। চমৎকার লোক সকলেই। হেনা আসিত, যাইত, আমাদের সহিত কথা কহিত, গল্প করিত, হাসিত, কখনও আমার পড়ার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিত, গল্পের বই লইয়া যাইত। তাহার সহিত কত গল্প, কত ঠাট্টা করিয়াছি, তাহাকে বই পড়িতে দিয়া তাহার পড়া হইলে বইটা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তাহাকে সাহিত্য সম্বন্ধে কত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়াছি,

তারপর ক্রমে জীবন সম্বন্ধে কত গম্ভীর মতামত দিয়াছি, শেষে হাস্য-পরিহাসে কথা শেষ হইয়াছে। আমার কথা শুনিতে শুনিতে সে কখনও হাসিয়াছে, কখনও গম্ভীরভাবে দুই একটা মন্তব্য করিয়াছে, অধিকাংশ সময় চুপ করিয়া শুনিয়াছে। এই দীর্ঘদিনে সে যে অতি সাধারণ মেয়ের চেয়ে অন্যান্য পাঁচজনের চেয়ে বেশী মনযোগ দাবী করিতে পারে একথা কখনও মনে হয় নাই। তবে একটা জিনিস বুঝিয়াছি—হেনার চরিত্রে একটি সুকুমার সুষমাবোধ আছে, আর সেটিকে জীবনে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহার উপর তাহার চরিত্রের শান্ত, সংযত, নিঃসঙ্কোচ রূপটি আমার বড় ভাল লাগিত। কথাবার্তা সে বলিত কম, উচ্ছ্বলতা তাহার চরিত্রে নাই। জীবনে তাহার লীলাময় কলস্রোতের মুখরতা নাই, তাই আমার মনে হইত যে, তাহার জীবনে আনন্দের স্রোতটি গূঢ় ভঙ্গীতে জীবনের তলদেশে ফল্গুর মত বহিতেছে। তাই তাহাকে বেশ লাগিত।

আমাদের বাড়ির এক পাশের বাড়িতে থাকিত হেনারা, অপর পাশের বাড়িতে থাকিত বীরেশরা। বীরেশের সহিত আমার আলাপ অনেক দিনের। আমারই সমান সমান পড়িত। ভাল ছেলে। তাহাদের সহিতও হেনাদের যথেষ্ট আলাপ। হেনারা আসার অনেকদিন পর বীরেশরা এ বাড়িতে আসিয়াছে। বীরেশও হেনাকে ভাল করিয়াই জানে। একদিন কথায় কথায়, হেনাকে আমি যেমন বুঝিয়াছি তাহাকে বলিলাম। সেও হাসিয়া সায় দিল।

এমনি করিয়াই দিন যাইতেছিল। অকস্মাৎ হেনার সহিত আলাপের এক বৎসর পর সমস্ত উলট-পালট হইয়া গেল। জানো, অনিল, আজ এই তেত্রিশ বছর বয়সে সে-দিনটার সম্বন্ধে কি মনে হয় জানো? যেন কয়েক মুহূর্তের ভূমিকম্পে আমার সমস্ত অতীতটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিঃশেষে মিলাইয়া গেল। জীবনে সুখের সম্বন্ধে, জীবনের সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল সব মুছিয়া গিয়া নূতন আলোকে সমস্ত জীবনটা প্রতিভাত হইল।

যাক্—সেদিনের কথাই বলি। শরীরটা একটু খারাপ হইয়াছিল, কলেজ যাই নাই। চৈত্রের দ্বিপ্রহর। চুপ করিয়া দরজার দিকে পিছন করিয়া শুইয়া খোলা জানালা দিয়া তীব্র রৌদ্রালোকিত আকাশের দিকে তাকাইয়াছিলাম। পাতলা পাতলা সাদা রঙের মেঘ ধীরে ধীরে আনমনে ভাসিয়া চলিয়াছে। যেন তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই। ঐ সাদা মেঘের ছায়া যেন আমার মনেও আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হইতে লাগিল—যেন জীবনের কোন অর্থ নাই, প্রয়োজন নাই। শূন্যে পরিণামের দিকে অকারণে যেন ভাসিয়া চলিয়াছি। এমন সময়ে কপালে অতি শীতল করস্পর্শে চমকিয়া উঠিলাম। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম হেনা দাঁড়াইয়া, কপাল হইতে হাত সরাইয়া লইয়া শান্ত-মুখে শান্তকণ্ঠে বলিল,—'আপনার জ্বরের মত হয়েছে শুনলাম, তাই।' সে আমার দিকে বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। চৈত্রের তীব্র উজ্জ্বল মেঘের আলো তাহার চোখে পড়িয়া চোখগুলা হীরকখণ্ডের মত জ্বলিতেছে। সে চোখে কি কিছু ইঙ্গিত ছিল?—আমি আজও বুঝিতে পারি নাই। আমার সমস্ত অতীত মিলাইয়া গেল, ভবিষ্যৎ যেন নাই। যেন অনন্তকাল ক্ষয়িত হইতে হইতে আজ এই শেষ বিন্দুতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, পর মুহূর্তেই তাহার সমাপ্তি ঘটিবে। আর সেই সময়ের চূড়ার শেষতম বিন্দুতে ভয়ঙ্কর একাকীত্বের সম্মুখে আমি আর হেনা মুখোমুখী দাঁড়াইয়া। কম্পিত হাতে তাহার হাত ধরিয়া কম্পিত-কণ্ঠে তাহাকে বলিলাম,—"তোমাকে আমি ভালবাসি হেনা। আজ নয়, যেদিন থেকে তোমায় দেখেছি সেই দিন হতে তোমায় ভালবাসি। ভেবেছিলাম তোমায় বলব না। আর না বলে পারলাম না।" সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া তাহাকে আমার প্রথম ও শেষ প্রেম নিবেদন করিলাম। সেদিন অকস্মাৎ মহাসমারোহে দুর্জয় প্রেম আসিয়া আমাকে ভাসাইয়া দিল। মুহূর্ত পূর্বে তাহার অস্তিত্বের কল্পনাও করি নাই। কিন্তু হেনাকে কথাটা বলিয়াই অনুভব করিলাম যেন এই দীর্ঘদিন তাহাকে ভালবাসিয়াছি। সে ভালবাসা আমার অজ্ঞাতে ফল্গুর মত আমার মনের অবচেতনে বহিতেছিল, আজ অকস্মাৎ সেই প্রেমের প্রবল ও সত্য প্রকাশ হইল। যদি তাই না হইবে, তবে সে কথা তেমন করিয়া বলিলাম কেন?

হেনা কেমন অদ্ভুত শান্ত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সে শান্ত সংযতভাবে, ধীরে ধীরে আমার হাত হইতে তাহার হাত দুইখানা ছাড়াইয়া লইল। তাহার হাতের ঘামে আমার উষ্ণ হাত দুই-খানা সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। সে কিন্তু চলিয়া গেল না, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল—"কিন্তু ভাল করলেন না নীরেন দা। অনেক কষ্ট পাবেন আপনি।"

আমি প্রত্যুত্তরে আরও অনেক আবেগ-বিহ্বল বাদানুবাদ করিলাম। কি বলিয়াছিলাম তাহার কিছুই মনে নাই। সে যাইবার সময় দরজার কাছ হইতে ফিরিয়া শুধু বলিয়া গেল—"আপনি বড় দুষ্টু।"

তাহার প্রথমের ঠাণ্ডা কথাগুলায় যে ধাক্কা খাইয়াছিলাম, তাহার শেষের ছোট্ট কথায় তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল। আমার শরীরের শিরায় শিরায় সেই ছোট্ট কথাটি আগুন ধরাইয়া দিল। আমি সে আগুনে পুড়িয়া গেলাম।

যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল। আমি ভাসিয়া গেলাম। সে স্রোত হইতে আত্মরক্ষা করিবার মত সাধ্য আমার ছিল না, ইচ্ছারও বোধ হয় অভাব ছিল। আমার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম—আমার মধ্যে এত বৈচিত্র্য, জীবনে এত বৈচিত্র্য! এত সুখ, এত দুঃখ, এত আনন্দ, এত বেদনা আমার জন্য সঞ্চিত হইয়া ছিল! এত পাইবার শক্তি আমার আপনার মধ্যে ছিল! আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আর হেনা? তাহাকে লইয়াই তো যত বিপত্তি! অতি সাধারণ মেয়ে হেনা আজ আমার চোখে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি মুহূর্তে তাহার নব নব রূপ দেখিতেছি। এত রূপ তাহার মধ্যে ছিল? কোথায় লুকান ছিল? আমার এত কিছু অনুভবের মূলে তো সে-ই। তাহাকে বুঝিতে পারি না। তাহাকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না। মুখ একেবারে নির্বাক। এ সম্বন্ধে সে একেবারে নীরব। কথা বলে যেটুকু সেটুকু তাহার চোখ। আর সেই নীরব ভাষাময় দৃষ্টি হইতে এ মুহূর্তে যে বার্তা সংগ্রহ করিয়া সুখী হইয়া উঠি পর মুহূর্তের দৃষ্টিতে তাহা ভাঙিয়া গিয়া বেদনায়, হতাশায় মন ভরিয়া উঠে। আবার চোখের চঞ্চল বিদ্যুচ্ছটায় নূতন আশা জাগে, আবার ভাঙিয়া যায়। আমি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম। সে আমার সর্বনাশ করিয়া দিল। আমার সব সুখ, সব আশা তাহার কটাক্ষ-চ্ছটায় পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল।

এক একবার মনে হইয়াছে সে আমার দুর্বলতা লইয়া খেলা করিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার চোখে যে দৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহাতে সে সন্দেহের জন্য নিজেকে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত করিয়াছি। কিন্তু তাহার উপর ক্রমে অভিমান ও ক্রোধ জমিতে লাগিল। এক একবার মনে হইয়াছে—শান্ত, গম্ভীর হেনার চরিত্রের সমস্ত কৌতুক, লীলাচাঞ্চল্য তাহার অবচেতনের গভীরে অবদমিত হইয়া কোন গোপন ধারায়, তাহার অজ্ঞাতে প্রবাহিত হইয়া বহিয়া চলে, এমনি এমনি ক্ষেত্রে সে আপনার অবরুদ্ধ উৎস-মুখ ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। সে হয়তো আমাকে ভালবাসে। এবং আমার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া অমনি নির্মম

লীলায় তাহার প্রেম প্রকাশ পায়। কিন্তু এভাবে কতদিন চলিবে? ইহার অবসান ঘটাইতেই হইবে। আমি মনে মনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলাম। তারপর একদিন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

তারপর নির্জন ঘরে, উদ্বেল বক্ষে, চঞ্চল পদে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ এবং বোঝা-পড়া কিরূপে করিতে হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। হেনা আমাকে ভালবাসে, নিশ্চয়ই ভালবাসে। আজ আর কোনও কথা নয়, কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব না, একেবারে তাহাকে বুকে টানিয়া লইব। আমাদের উভয়ের মধ্যের ছলনার সমস্ত আবরণ খসিয়া পড়িবে, প্রেমের সত্য আলোকে তাহাকে চিনিয়া লইব। তাহার মাথা সুখে আমার বুকে অবনমিত হইয়া পড়িবে, তাহার চোখ মুদিয়া আসিবে, চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে, দীর্ঘ নিশ্বাসে আমার বুক পুড়িয়া যাইবে। আমার সকল উৎকণ্ঠা শান্ত হইবে। আমি চঞ্চল পদে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

কিছুক্ষণ পরেই দ্বারে ছায়া পড়িল। যাহাকে সর্বান্তকরণে কামনা করিতেছিলাম সে আসিয়াছে। হেনা ঘরের মধ্যে আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—চোখে জিজ্ঞাসার দৃষ্টি, কেন তাহাকে ডাকিয়াছি। আমি কিছু বলিলাম না। শুধু তাহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলাম। সে ধীর পদে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে কাছে আসিল। মার্জনা করিও বন্ধু; আমি কোন কথা না বলিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে আমার বুকে টানিয়া আনিলাম। আমার সবল আকর্ষণে সে আমার বুকের উপর আসিয়া পড়িল। তাহাকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে গেলাম। আমি আমার উৎসুক ওষ্ঠ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম। আমার ওষ্ঠ আর নামিত হইল না। তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে না, দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়িতেছে না, তাহার চোখও মুদিয়া আসিল না, তাহার মাথাও সুখের ভারে আমার বুকের উপর অবনমিত হইয়া পড়িল না। তাহার পরিবর্তে, ক্ষীণ প্রতিবাদের ভঙ্গিতে তাহার মাথা তোলা, সে আমার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বড় বড় কালো বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কী ভয়ার্ত, অসহায় দৃষ্টি! আর পারিলাম না। বুঝিলাম—ভুল করিয়াছি, বড় ভুল করিয়াছি। আগা-গোড়া ভুল করিয়াছি। অঙ্ক ভুল করিয়া যেমন মনে হয় শ্লেটখানা মুছিয়া ভুলের ইতিহাসটাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিই, তেমনিই অসহায় বেদনায় আমার সারা মনটা মোচড় দিয়া উঠিল—যদি কোন ক্রমে এই আগা-গোড়া ভুলটাকে মুছিয়া ফেলিতে পারি। হেনার মুখের দিকে চাহিয়া বেদনায় মমতায় লজ্জায় আমার সমস্ত দেহমন শিহরিয়া উঠিল। সে আমাকে কত বিশ্বাস করে, আর আমি সেই বিশ্বাসভঙ্গ করিতেছি—এই কথা তাহার ভয়ার্ত দৃষ্টিতে লেখা। মন আমার বার বার বলিতে লাগিল—ইহাকে ভালবাসি, ইহাকে আমি ভালবাসি। কী করিয়া ইহার ক্ষতি করিব! তাহার কম্পিত ওষ্ঠের উপর আমার তপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠ আর নামিল না। তাহাকে আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া ইঙ্গিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। সে অস্থির লঘু পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। আমার ঠোঁট দুইটা তখন অবরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে থাকিয়া থাকিয়া বাঁকিয়া যাইতেছে। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম হেনার কম্পিত দেহের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সম্মান ও আনন্দ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখন আমার বয়স বোধ হয় একুশ বৎসর। সেই তরুণ বয়সে আপনার কর্মের জন্য গোপনে সেদিন যথেষ্ট অশ্রুপাত করিয়াছিলাম।

তারপর প্রায় মাসখানেকের বেদনাময় ইতিহাস। অতি গভীর হতাশায়, নিরানন্দে, মানুষের সঙ্গ প্রায় পরিত্যাগ করিয়া একাকী কাটাইয়াছিলাম। বিশেষ করিয়া সেই একমাস হেনাকে এড়াইয়া চলিয়াছি, তাহাকে একদিন দেখি নাই পর্যন্ত। জানো অনিল—সেই এক মাস আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা বেদনাময় সময় গিয়াছে। সেই এক মাস ভাল করিয়া খাই নাই, ভাল করিয়া ঘুমাই নাই, এমন কি যে পড়াশুনো আমার এত প্রিয়, তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সে এক মাস যত কাজ করিয়াছি, সব করিয়াছি কলের পুতুলের মত; মন ছিল না, ইচ্ছা ছিল না—শুধু দেহখানা আপনার ধর্মে চলিয়াছে। কলেজ গিয়াছি, বেড়াইয়াছি, বন্ধুদের দেখিয়াছি, কথা বলিয়াছি, কিন্তু মনে কিছুই গ্রহণ করি নাই। সে একমাস জীবনের সহিত গভীরতম বিচ্ছেদের মধ্যে কাটিয়াছে। সে একমাস একটা শূন্যতা অবসাদ আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। আর আমার অহঙ্কার ক্ষয়িত হইতে হইতে শেষ হইয়া গেল।

হেনার সহিত দেখা হইল এক মাস পর। হেনাই ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। বুঝিলাম—হেনা আমার লজ্জাকে আপনার ঘাড়ে চাপাইয়া আমাকে মুক্ত করিতে চায়। না গেলেই পারিতাম। কিন্তু গিয়া ভালই করিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার অহঙ্কার পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু না—সেদিনও পর্যন্ত কিছু অহঙ্কার ছিল। মনে বোধ হয় এই এক মাসের প্রায়শ্চিত্ত অর্জিত পবিত্রতার অহঙ্কার ছিল। সেটুকুও সেদিন সন্ধ্যায় গেল।

সন্ধ্যার সময় হেনাদের বাড়ি গেলাম। হেনাকে পাইলাম ছাদে, একা আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে। আমিও গিয়া আলিসার ধারে দাঁড়াইলাম। সে আমাকে দেখিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল,—"এতদিন আসেন নি কেন?" উত্তর দিলাম না। উত্তর তো কিছুই ছিল না। আবার জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম, "এমনিই!" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—"একটা কথা বলি। যদি তোমার আপত্তি না থাকে হেনা, আমি তোমায় বিয়ে করব।" হেনা উত্তর দিল না। চুপ করিয়া রহিল। আমার সহিত প্রথম আলাপের পর হেনার বাবা নাকি খুব মুগ্ধ হইয়া আপনার বাড়িতে আমার সহিত হেনার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু অতি সামান্য অথচ দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক বাধা ছিল। তাই আর কথা বাড়ে নাই। সেই কথা স্মরণ করিয়া বলিলাম—"বাধা যা আছে, তা দূর করা কঠিন হবে না।" হেনা নিরুত্তরেই রহিল। আমারও বলার কথা ফুরাইয়া ছিল—আমিও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

এমন সময় বীরেশ আসিল। সে আমাদের দুইজনকে দেখিয়া বলিল—"এই যে তোমরা দুজনেই আছ। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।" তাহার বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে আমরা উভয়েই জানিতাম। আমি কথা বলিবার কিছু একটা পাইয়া নড়িয়া চড়িয়া দাঁড়াইলাম, হেনা যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি নিস্তব্ধভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। বীরেশ আমাকে প্রথমে তাহার বিবাহ-সংক্রান্ত দুই চারিটা কথা জানাইল, তারপর হেনাকে বলিল—"আমার বিয়েতে যাবে তো? আবার এই তো তোমারও বিয়ে আসছে। আমার বিয়েতে খেটে দাও, তবে তোমার বিয়েতে দ্বিগুণ খেটে শোধ দেব।" হেনা কোন কথা কহিল না, দেখিলাম তাহার হেঁট মাথাখানি আরও হেঁট হইয়া পড়িল। উজ্জ্বল জোৎস্নালোকে দেখিতে পাইলাম, তাহার ঠোঁট দুইটা ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাঁকিয়া যাইতেছে—ঠিক সেদিন হেনা চলিয়া যাইবার পর যেমন আমার ঠোঁট ক্ষণে ক্ষণে বাঁকিয়া গিয়াছিল। এক মুহূর্তে সব বুঝিতে পারিলাম। বুঝিবার যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকু বুঝিয়া লইলাম। আর আমার অহঙ্কারের যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকুও শেষ হইয়া গেল। স্পষ্ট বুঝিলাম হেনা কোনদিন আমাকে ভালবাসে নাই। আমি ভুল করিয়াছিলাম। সে বীরেশকে ভালবাসে। বুঝিলাম, সবই বুঝিলাম।

এও বুঝিলাম সেই মুহূর্তে আমি সেখানে অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয়। আমার সারা বুকটা হায় হায় করিয়া উঠিল। এত দিয়া আমি কিছুই পাই নাই। বহু লাভের আশায় হাত ভরিয়া দিয়া ভাবিয়াছিলাম, যাহা ফিরিয়া পাইব, তাহাতে আমার দুই হাত ছাপাইয়া যাইবে। কিন্তু ফিরিলাম শূন্য হাতে। এত দিয়া কেহ বোধ হয় কখনও এত হারায় নাই। আমি আস্তে আস্তে ছাদের দরজা পর্যন্ত আসিলাম; তাহারা কেহ আমাকে লক্ষ্যও করিল না। তাহাদের দৃষ্টির বাহিরে আসিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া গেলাম। বাহিরে অজস্র জ্যোৎস্নার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্ধকার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। বাহিরে সেদিন আমারই বেদনা যে জ্যোৎস্না হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল।

আমার কথাটি ফুরাইল। তবু একটু বাকী রহিল। তারপর কিছুদিন আমার কেমন কাটিল, তাহা শুনিয়া আর তোমার কাজ নাই। সে বেদনা প্রকাশ করা লজ্জার কথা সে থাক। তারপর হেনার বাবা ট্রান্সফার হইয়া গেলেন। হেনা যাইবার দিন প্রণাম করিতে আসিয়াছিল। তাহার স্বভাবমত ধীর পদে শান্তভাবে আমাকে সে প্রণাম করিল, আমিও শান্তকণ্ঠে তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম। সে চলিয়া গেল।

আমি ভাবিয়াছিলাম, সে আমার জীবন হইতে চলিয়া গেল চিরদিনের জন্য। তাহাকে ভালবাসিয়া দুঃখই পাইয়াছি, সে দুঃখ কবে শেষ হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। নূতন আনন্দ পাইয়াছি, নবতর বৃহত্তর প্রেম আসিয়া আমাকে জীবনের মধ্যে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া আমাকে ভালবাসিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি জীবনকে ভালবাসিয়াছি। তাহাকে কবে ভুলিয়া গিয়াছি।

কিন্তু বিধাতা বোধ হয় বড় রহস্যপ্রিয়। যাহা কবে শেষ হইয়া গিয়াছে ভাবিয়াছিলাম, দেখিলাম তাহা শেষ হয় নাই। তাই সেই সমাপ্ত দৃশ্যের যবনিকা উঠিল বার বৎসর পর এই কামরাখানায়—আজ হইতে এক বৎসর পূর্বে।

সেই কথাই তো বলিতেছিলাম। গাড়ি তখন খুব দ্রুততালে দুলিতে দুলিতে চলিয়াছে। হেনা বসিয়া ঢুলিতেছিল, ক্রমে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মা যেই ঘুমাইল, অমনি চতুর ছেলে উঠিয়া বসিল। মা ঘুমাইতেছে, মাঝখানের বেঞ্চের ভদ্রলোক বোধ হয় তাহার বাবা, তিনিও ঘুমাইতেছেন। যাত্রীরা অন্য সকলেও ঘুমাইতেছে। ছেলেটি চারিদিকে তাহার মত এই মধ্যরাত্রে কোন জাগ্রত ব্যক্তির সন্ধানে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেই আমাকে দেখিতে পাইল। আমার চোখে চোখ পড়িতেই তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিলাম। কিন্তু আসে না। হেনার ছেলে তো! ভাইপোদের জন্য সুটকেশে চকোলেট মজুত ছিল, তাহাই কতকগুলা বাহির করিলাম ঘুষ দিবার জন্য। এবার চকোলেট হাতে ইসারা করিতেই ফল ফলিল। খোকা নিঃশব্দে আমার কাছে আসিল। প্রথমেই কতকগুলো চকোলেট হাতে দিয়া তাহাকে কোলের কাছে বসাইয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লইলাম। হেনা গভীরভাবে ঘুমাইতেছে। জাগিবার কোনও লক্ষণ নাই। তখন ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার নাম কি বাবা?" খোকা আহার করিতে করিতেই উত্তর দিল—"নীরু, নীরেন!" বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা লাফাইয়া উঠিল। এ কি নাম! হেনার ছেলের এ নাম কে রাখিল? হেনা? না খোকার বাবা? যদি হেনা রাখিয়া থাকে, তবে কেন এ নাম রাখিল? কেন?

সে উত্তরও রহস্যপ্রিয় বিধাতা মিলাইয়া দিলেন। খোকা লোকটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র মানবটির ক্ষুদ্র হৃদয়টি দখল করা খুব সহজ কাজ নয়। খোকা আহার শেষ করিয়াই পলাইতে চায়। আবার ঘুষ দিয়া তাহাকে বসাইলাম। পাশের বেঞ্চে যিনি শুইয়াছিলেন, তিনিই খোকার বাবা। তিনি হঠাৎ আড়ামোড়া ভাঙিয়া উঠিয়া বসিয়া নিদ্রারক্ত চক্ষে আপনার পরিবারের কুশল দেখিয়া লইলেন। সবই ঠিক আছে। স্ত্রী ঘুমাইতেছেন, আর ছেলে আরামে পরস্বাহরণ করিয়া নির্বিকারভাবে ভোজন করিতেছে। ছেলেকে দেখিয়া তিনি একবার ছেলের দিকে চাহিয়া, একবার আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আপনার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে বুঝি? খবরদার বেশী আমল দেবেন না। মাথায় চেপে বসবে।" বলিয়া ছেলের দিকে সস্নেহে ও সগৌরবে চাহিলেন। তারপর আমার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নানান কথার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, এত নাম থাকতে ছেলের নাম নীরেন রাখলেন কেন?"

—"এ তো আশ্চর্য কথা মশাই; নাম রাখার কি আবার কোন বিশেষ কারণ থাকে?"

বুঝিলাম, ভদ্রলোক একটুকু উষ্ণ হইয়াছেন, তাই কথাটা ঘুরাইয়া বলিলাম—"এত ভাল ভাল নাম থাকতে এই নামটা পছন্দ করলেন কেন, তাই বলছি আর কি। এই তো কত ভালো ভালো নাম রয়েছে। 'অজয়', 'সঞ্জয়', 'চঞ্চল' ...."

এবার ফল ফলিল। ভদ্রলোক বলিলেন—তা' বলেছেন ঠিক। আমার তো তাই ইচ্ছা ছিল মশাই। কোথা হতে যত পচা নাম রাখা। আমি তো ঐ মৃণাল, কুনাল জাতীয় একটা নাম রাখতে চেয়েছিলাম নীরুর। তা আমার স্ত্রী দিলেন বাধা। তাঁরই একান্ত ইচ্ছায় ছেলের নাম রাখতে হ'ল নীরেন। বুঝছেন তো এসব ব্যাপারে ওঁদের ইচ্ছাটাই final."

বুঝিলাম।

ভদ্রলোক আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। একটা মিথ্যা নাম বলিলাম। তারপর তিনি বলিলেন—নীরুকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবার সময় ওর নামটা পালটে দেব। কি বলেন?"

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলাম।

তারপর হেনার ছেলে নীরুর সহিত আলাপ করিতে করিতে তাহার নামটাকে অক্ষয় করিবার ইচ্ছায় পেন্সিল বাহির করিলাম। হেনার ছেলের 'নীরু' নাম হয়ত কবে বাতিল হইয়া যাইবে। তাই হেনার দেওয়া তাহার ছেলের নামকে পেন্সিল ধরিয়া অক্ষয় করিয়া দিলাম। সেই ওই নাম।

তারপর আমি নীরুর কাছে, নীরুর বাবার কাছে বিদায় লইয়া নামিয়া গেলাম। ট্রেনটা স্টেসনে থামিল, নামিবার সময় দেখিলাম, হেনা ঘুমাইতে ঘুমাইতে নড়িয়া চড়িয়া পাশ ফিরিল।"

নীরেন থামিল। ট্রেনও ইতিমধ্যে তাহাদের গন্তব্যস্থানে আসিয়া গিয়াছে। অনিল ও সে উঠিল। তাহার চোখের স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটে নাই। সে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া লেখাটাকে চাঁচিয়া ছুলিয়া পরিষ্কার করিয়া দিল।

স্টেশনে নামিতে নামিতে অনিল জিজ্ঞাসা করিল—"ওটা কি হ'ল?"

নীরেন উত্তর দিল—"ও থেকে কোন লাভ নেই ভাই। কি হবে; ও মুছে যাওয়াই ভাল। ও সম্বন্ধে আমার কোন উৎসাহ নেই, তুই তো জানিস। ও পুরাণো জিনিস বাতিল করাই ভাল। কত নূতন আনন্দ-দুঃখ দিলে জীবনে আসছে এবং আসবে, তার হিসেব আছে?" তাহারা নামিয়া পড়িল।

বাঙলার অন্নসমস্যা

অধ্যাপক—শ্রীবরদা দত্তরায় এম এ

বাঙলাদেশের মোট লোকসংখ্যা ৬,২৪,৫৬০০০ (ছয় কোটী চব্বিশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার)। সরকারী হিসাবে বাঙলাদেশে সংবৎসরে মাথা পিছু চাউলের প্রয়োজন ৩৪৪ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড=সাত ছটাক)। সেই হিসাব মতে বাঙলাদেশে সংবৎসরে মোট চাউলের প্রয়োজন, ৯৫,৯৯,৪৫৮ টন অর্থাৎ প্রায় ৯৬ লক্ষ টন। তন্মধ্যে মুড়ী, চিঁড়া, খই ইত্যাদির জন্য কেবল ৬,৭৪০০০ টন ধান ধরা আছে. আবার রোগী, শিশু, নিষ্ঠাবতী বিধবা এবং এক বেলা অনাহারী ব্যক্তিদিগকেও পূর্ণাহারী বলিয়া ধরা আছে। কড়া ক্রান্তি করিয়া অঙ্ক কষিলে হয়ত এই হিসাব হইতে ২।১ লাখ টন চাউল বাদ যাইতে পারে কিংবা স্যার জন মীগের (Sir John Megaw) হিসাব মতে—

শতকরা ৩৫ জন পূর্ণাহারী
,, ২০ ,, অর্ধাহারী
" ৪৫ " অল্পাহারী

ধরিলে হয়ত আরও ৪।৫ লাখ টন চাউল কমিয়া যাইতে পারে, কিন্তু একথা সত্য যে বাঙলার এই অগণিত গণসংখ্যাকে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে দিলে গড়ে ৯৫ লাখ টন চাউলের প্রয়োজন।

বাঙলাদেশে চাউল উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে ৮২ লক্ষ টন। এই কথা বলিবার কারণ, ইং ১৯২৯—৩০ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত যে চাউল পাওয়া গিয়াছে, তাহার গড়পড়তা হিসাব ধরিলে দেখা যায় ঐ সময়ে বাঙলাদেশে প্রতি বৎসর গড়ে উৎপন্ন হইয়াছে, ৮৬,৮০,০০০ (ছিয়াসী লক্ষ আশী হাজার টন)। আবার ইং ১৯৩৬—৩৭ সাল হইতে ১৯৪০—৪১ সাল পর্যন্ত বাঙলাদেশে গড়ে উৎপন্ন হইয়াছে, ৮১,৮১০০০ (একাশী লক্ষ একাশী হাজার টন)। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইং ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে খাদ্য উৎপাদন সম্মেলনের (Food Production Conference) দেওয়া পরিমাণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বাঙলাদেশে যুদ্ধের পূর্বের প্রতি বৎসর গড়ে ১ কোটী ২ লক্ষ ১৭ হাজার টন চাউল পাওয়া যাইত। এই চাউলেও বাঙলার মোট চাহিদা মিটিত না, কাজেই যুদ্ধের পূর্বের বাঙলাদেশে গড়ে ২ লক্ষ টন চাউল বাহির হইতে আমদানী করিতে হইত প্রতি বৎসর।

পূর্বোক্ত খাদ্য উৎপাদন সম্মেলনের হিসাব ও সরকারী হিসাবে অনেক প্রভেদ দেখা গেলেও এক জায়গায় আসিয়া দুই হিসাবের মিল হইয়াছে। বাঙলায় চাউল উৎপাদনের পরিমাণ ৮২ লক্ষ টনই হউক আর ১ কোটী ২ লক্ষ টনই হউক, বাঙলাদেশে বাহির হইতে গড়ে ২ লক্ষ টন (আমদানী হইতে রপ্তানি বাদ দিয়া) চাউল আমদানী করিতে হইত অন্নাভাব মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর। কাজেই একথা সর্ববাদীসম্মত যে বাঙলাদেশে যে চাউল উৎপন্ন হয়, তাহাতে বাঙলার ক্ষুধা মিটে না। ফলে ক্ষুধার্ত বাঙলাকে প্রতি বৎসরই বিদেশ কিংবা অন্যান্য প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টন চাউল আমদানী করিতে হয়। অথচ বাঙলাদেশে যে পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হয়, তাহার উপর সামান্য পরিমাণ জমিতে ধান চাষ করিলে এবং উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ বাড়াইতে পারিলেই বাঙলাদেশের যে লোকসংখ্যা ইং ১৯৩১ সালে ছিল, তাহার দ্বিগুণ সংখ্যা (প্রায় সাড়ে দশ কোটী) লোকের অন্ন সমস্যার সমাধান হইতে পারে। (মিঃ পোর্টারঃ সেন্সাস রিপোর্ট ১৯৩১, Vol I, Part I P. 63—64)

অথচ একথা বোধ হয় আজ কাহারও অজানা নাই যে এদেশের জমিতে যা ফলন হয়, তাহা অন্যান্য যে কোন সভ্যদেশের ফলনের তুলনায় অর্ধেক এবং কোন কোন দেশের ফলনের তুলনায় এক চতুর্থাংশেরও কম। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে কোন রকম খাদ্য ছাড়া যেমন মানুষের জীবনী শক্তি দিনের পর দিন ক্ষীণ হইয়া আসে, তেমনি স্বাভাবিক খোরাকী না পাইলে জমিরও উৎপাদিকা শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়। অর্থনীতিতে ইহার নাম জমির ক্রম-হ্রাসমান-ফলন, বা Law of Diminishing Return. এই ক্রম হ্রাসমান ফলন সর্বদেশে সর্বকালেই প্রযোজ্য। কিন্তু অন্যান্য দেশে জমির এই ক্ষীয়মান শক্তিকে তাজা রাখিবার জন্য উন্নত ধরণের চাষ, সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আছে, যাহার দরুণ জমির ক্ষীয়মান শক্তিকে আরও শক্তিশালী করিয়া তোলা যায়। কিন্তু এদেশের কথা স্বতন্ত্র। ফলে এদেশের জমিতে ফলনের পরিমাণ দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়,—

১৯৩৬-৩৭ ইং সালে প্রতি একরে উৎপাদন ছিল ১২৯০ পাঃ

১৯৩৭-৩৮ ইং সালে প্রতি একরে উৎপাদন ছিল ১২৪৯ পাঃ

১৯৩৮-৩৯ ইং সালে প্রতি একরে উৎপাদন ছিল ১০২৯ পাঃ

১৯৪০-৪১ ইং সালে প্রতি একরে উৎপাদন ছিল ১০২০ পাঃ

এই ক্ষীয়মান শক্তিকে পুনঃ শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে জমিতে উপযুক্ত সার দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান কলেজের এক বক্তৃতায় ডাঃ এইচ কে সেন সেইজন্য জমিতে এমনিয়াম সালফেট (Ammonium Sulphate) দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং জমির ফলন প্রায় দ্বিগুণ হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। অন্য এক পণ্ডিত ব্যক্তি জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে গোবর দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত অর্থনৈতিক ইহাও বলিয়াছেন যে, জমিতে গোবর দিলে যে জমিতে পূর্বে প্রতি একরে ১৩৭৪ পাউণ্ড ফসল ও ২১৭৪ পাউণ্ড খড় উৎপন্ন হইত, সেই জমিতে যথাক্রমে ৩৫৫৬ পাউণ্ড ফসল ও ৪৭৭৯ পাউণ্ড খড় উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। গাছপালা পচাইয়াও "ইন্দোর-কম্পোস্ট" নামক এক প্রকার ভাল সার তৈয়ারী করা যায়। ইহা তৈয়ার করিতে কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। মাটী, পাতা ইত্যাদি আস্তাকুড়ের বহু জিনিস স্তরে স্তরে রাখিতে পারিলেই এই জাতীয় সার তৈয়ার হইতে পারে। মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর বিষ্ঠা দিয়াও ভাল সার তৈরী করা যায়। জাপানে এই সব বিষ্ঠা সার হিসাবে কাজে লাগান হয়, ফলে আগ্নেয়গিরির বুকে থাকিয়াও জাপানের ফলন ভারতের প্রতি একর ফলনের প্রায় তিন গুণ।

কিন্তু ভারতের বিশেষ করিয়া বাঙলার অন্নাভাবের নিদান শুধু সারেই নিবদ্ধ নহে। সারের সঙ্গে সঙ্গে বীজের কথাও আসে। এদেশে সাধারণত বীজ হিসাবে যেসব ধান ব্যবহৃত হয়, তাহা সাধারণত সুপক্ব, নীরোগ ও পুষ্ট ধান নহে। অধিকন্তু এই সব ধানের ফলনও খুব বেশী নহে। ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশে ভাল বীজ সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার জন্য চাষীদের সমবায় সমিতি আছে। ইহাদের কাজ বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন প্রকার ভাল বীজ সংগ্রহ করা এবং উচিত মূল্যে চাষীদিগের মধ্যে ঐ বীজ বিক্রয় করা। প্রত্যেক বীজ প্যাকেটের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বীজ সাধারণত প্রতি একরে কত

ফসল দিতে পারে, উল্লেখ থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ কোন্ সার দিলে ফসল বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার নির্দেশও প্যাকেটের সঙ্গে দেওয়া থাকে। চাষী সেই নির্দেশানুযায়ী তাহার ক্ষেতে বীজ বপন করে এবং প্রায় সব সময়ই ভাল ফসল পাইয়া থাকে। ভারতে এই জাতীয় সমবায় সমিতি নাই সত্য; কিন্তু সরকারী কৃষি গবেষণা বিভাগ প্রায় বিশ বৎসর গবেষণার পর ছত্রিশ প্রকার আউস ও আমন ধানের বীজের সন্ধান দিয়াছে, যাহার ফলন প্রচলিত বীজ অপেক্ষা অনেক বেশী। এই বীজ-ধানের মধ্যে আমন হিসাবে ইন্দ্রসাইল, দুধসার, লতি-সাইল, ভাসামাণিক, ২৩নং লালসাইল ইত্যাদি এবং আউস হিসাবে কথকতারা, সূর্যমুখী, দইরাণ, চারণক, ঢাকা নং ১৮ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বাঙলার চাষীর সত্যিকার উপকার করিতে হইলে সরকারই হউক, আর কোন দেশহিতব্রতী সংঘই হউক, এইখানেই শেষ পরিচ্ছেদ টানিলে চলিবে না। সুচিন্তিত পরিকল্পনা লইয়া বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাপ্রসূত কর্মধারা এদেশের কৃষির উপর প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে, উহা এদেশের মাটি ও আবহাওয়াতে কার্যকরী হইবে কি না। পৃথিবীতে এই প্রকার গভীর গবেষণাসম্ভূত কর্মসূচীর অভাব নাই এবং ভারতের দাস-মনোভাবসম্পন্ন অর্ধাশন-অনশনপ্রপীড়িত ব্যক্তিবৃন্দ ছাড়া সর্বদেশের সবলকায় স্বাধীন-চেতা মানুষই স্বাধীনভাবে যে বাঁচিতে চায়, তাহার প্রমাণ পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। রুশিয়া স্বাবলম্বী হইয়া বাঁচিবার জন্য পঞ্চম বার্ষিকী কল্পনা একবার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা তিন তিনবার পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা করিয়া বর্তমান স্বাচ্ছন্দ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জার্মানিও যুদ্ধের পূর্বে খাদ্য সরবরাহের পরিকল্পনা করিয়া সফলকাম হইয়াছে, তারপর তাহারা এই মহাযুদ্ধের মঙ্গলাচরণ করিয়াছে। এইভাবে ডাঃ উইলকক্সের (Dr. Wilcox) যুগান্তকারী পুস্তক, 'জাতিরা স্বাবলম্বী হইতে পারে' বা Nations can live at homeএর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডাঃ উইলকক্সের মতে উন্নতধরণের চাষাবাদ করিলে যে কোন জাতি নূতন রাজ্য জয় না করিয়াও ফসল উৎপাদন এত বেশী পরিমাণ করিতে পারে, যাহা দ্বারা যে কোন দেশের বর্তমান লোকসংখ্যা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। ডাঃ উইলকক্সের মতবাদ বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এইভাবে কালিফোর্নিয়া দেশে ডাঃ গ্যারিকে (Dr. Gericke)এর "ময়লা-হীন চাষ" বা "Dirtless Farming"এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নূতন ধরণের চাষাবাদ এখনও ব্যাপকভাবে গৃহীত না হইলেও আমেরিকার বহুদেশে ইহার পরীক্ষামূলক চাষ চলিয়াছে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইলে হয়ত ইহা কৃষিজগতে এমন এক নূতনত্বের সৃষ্টি করিবে, যাহা আঠারো ও উনিশ শতাব্দীতে বাষ্পীয় শক্তির উদ্ভাবনের আমলেও হয় নাই।

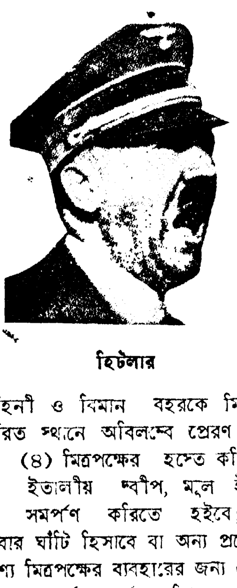
কিন্তু এদেশের অন্ন-সমস্যা এইখানেই শেষ নহে। বাঙলার কিংবা ভারতের অন্নাভাবের মূল কারণ কোন অন্নাভাবই নহে, অর্থাভাবও নহে। এদেশের চাষী ছয় মাস চাষাবাদ করে এবং ছয় মাস বসিয়া কাটায় এবং যে ছয় মাস তাহারা কাজ করে, সেই ছয় মাসও তাহারা অন্যান্য দেশের চাষীদের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া করিতে চায় না। না করিলেই নয়, তাই যেন তাহারা দয়া করিয়া ক্ষেতে যায়। নিতান্ত অবহেলার সহিত তাহারা চাষ করে, চোখ বুজিয়া কোন রকমে দু'মুঠো বীজ ক্ষেতে ছড়াইয়া দেয়,—তারপর তাহারা আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে অন্ধ-বিশ্বাসে। ফলে, এই দেশে প্রতি একরে যা ফসল হয়, তাহার তুলনা শুধু এদেশেই চলে, অন্যান্য স্বাবলম্বী স্বাধীন দেশের ফলনের সঙ্গে এদেশের জমির ফলনের তুলনা করিতে গেলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। যে ধানের ফলন ইতালিতে প্রতি একর ৪৫৯০ পাউন্ড, জাপানে ৩৫৫৮ পাঃ, মিশরে ৩৪৫০ পাঃ, আমেরিকাতে ২৩৯০ পাঃ, ফরমোসাতে ২৪১৯ পাঃ, এমন কি কোরিয়াতেও ১৯৪৯ পাঃ, তাহারই ফলন ভারতে প্রতি একরে ১০২০ পাউন্ড। অথচ ভারত নদীমাতৃক দেশ, ভারতের জমি স্বর্ণপ্রসূ বলিয়া বিখ্যাত। ভারতের আকাশ, ভারতের বাতাস জগতের যে কোন দেশের আকাশ ও বাতাস অপেক্ষা উদার বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই যে এদেশের জমিতে ভাল ফসল হয় না, তাহার কারণ কোন জমির ক্রম-ক্ষীয়মান শক্তিই (Diminishing return) নহে,—চাষীদেরও বটে। কয়েক বৎসর পূর্বে ধনোত্তর কৃষি-বিশেষজ্ঞ স্যার জন্ রাসেল (Sir John Russel) যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বিশেষ করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির কথা লইয়াই আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া যে ভারতীয় চাষীরা ভারতের এই নিকৃষ্ট ফসলের জন্য দায়ী নহে, তাহা নহে। আমাদের মতে, ভারতের এই ফলনের জন্য প্রধানত দায়ী ভারতের চাষী এবং তাহার চাষাবাদ। কারণ, আমাদের এখনও বিশ্বাস যে ভারতের চাষীরা যদি সত্যিকার দরদ দিয়া চাষাবাদ করিত তাহা হইলে হয়ত জমির ফলন অত কম হইতে পারিত না। কারণ, পাটের ক্ষেতের ফলন দেখিলে দেখা যায় যে এ দেশের অলস ও শামুক-পন্থী চাষীরাও ভাল ফসলের ব্যবস্থা করিতে পারে। পাট অর্থ-শস্য বলিয়া বিখ্যাত। যখনকার কথা বলা হইতেছে, তখন এক মণ ধানের দাম ছিল দেড় টাকা এবং এক মণ পাটের দাম ছিল বিশ টাকা। কাজেই তখন চাষীর সমস্ত মন এবং মনো-যোগ পড়িয়াছে ঐ পাট চাষের দিকে এবং ক্ষেতে ফলনও হইয়াছে যথেষ্ট। কাজেই আমরা বলিতে বাধ্য যে পতিত ও অকেজো জমি যত পাওয়া যায়, তাহা লইয়া মনোযোগের সহিত খাদ্যশস্যের চাষবাদ করিলে, অনুক্ষণ ক্ষেতের উপর একান্ত দৃষ্টি রাখিলে অবশ্য সুফল ফলিবে এবং এবম্প্রকার কৃষি যে আমাদের চাষী জানে না তাহা নহে। শুধু একটুখানি মনো-যোগের অভাব মাত্র।



ইতালির আত্মসমর্পণ ও বিশ্বপরিস্থিতি

শ্রীপণ্ডিত

দীর্ঘ দিন জার্মানির সহিত একযোগে যুদ্ধ চালনার পর ইতালি মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মুসোলিনীর ক্ষমতা হরণের পরে এমন একটা ব্যাপার অনেকেই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। গত ৩রা সেপ্টেম্বর জেনারেল আইসেনহাওয়ারের প্রতিনিধিগণ ও মার্শাল বাদোলিওর জনৈক প্রতিনিধি যে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন তদনুযায়ী (১) ইতালীয় বাহিনী অবিলম্বে সমস্ত বিরুদ্ধ কর্মতৎপরতা বন্ধ করিবে, (২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবার মত সমস্ত সুযোগসুবিধা হইতে জার্মানগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য ইতালি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে (৩) ইতালীয়



হিটলার

নৌবাহিনী ও বিমান বহরকে মিত্রপক্ষের নির্ধারিত স্থানে অবিলম্বে প্রেরণ করিতে হইবে, (৪) মিত্রপক্ষের হস্তে কর্সিকা ও সমস্ত ইতালীয় দ্বীপ, মূল ইতালীয় ভূখণ্ড সমর্পণ করিতে হইবে; যুদ্ধ চালাইবার ঘাঁটি হিসাবে বা অন্য প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষের ব্যবহারের জন্য এ সকল এলাকা সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে হইবে—।

চুক্তিটি যদিও ৩রা সেপ্টেম্বর সিসিলিতে বসিয়া স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, কিন্তু ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে উহা প্রকাশ পায় নাই। ইতালির মূলে ভূভাগে মিত্রপক্ষের অবতরণ পর্যন্ত এই চুক্তিটি গোপন রাখা হইয়াছিল। এ চুক্তির ভবিষ্যৎ ফলাফল যাহাই হউক না কেন, ইউরোপের তথাকথিত "দুর্ভেদ্য দুর্গে" মিত্রপক্ষ অতি অল্প আয়াসেই স্থান পাইলেন। মার্শাল বাদোলিও বলেন, আত্মরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়াতেই ইতালিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। তাঁহার এ উক্তিকে অস্বীকার করিবার কোনই হেতু নাই। কিন্তু সে সঙ্গে এ কথাও ঠিক—সামরিক এ বিপর্যয়ের পশ্চাতে ইতালির রাজনৈতিক বিপর্যয় অনেকটা কাজ করিয়াছে।

চুক্তি ঘোষিত হইবার অতি অল্প সময় পরেই ইতালীয় নৌবহরের এক বৃহৎ অংশ মাল্টায় বৃটিশ নৌবহরের হেফাজতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মিত্রশক্তির ইহা এক বৃহৎ লাভই বলিতে হইবে। ১০ই সেপ্টেম্বর হিটলার তাঁহার হেডকোয়ার্টার্স হইতে যে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি বলেন, "ইতালি যে আত্মসমর্পণ করিবে, তাহা পূর্বেই বুঝা গিয়াছিল। — সামরিক দিক হইতে ইতালির এক্সিস পক্ষ ত্যাগে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না—কেননা, আজ বহু মাস যাবৎ জার্মান সৈন্যরাই প্রধানত যুদ্ধ চালাইয়া আসিয়াছে।" শুধু অস্ত্র দ্বারাই যদি মানুষ যুদ্ধ করিত, তবে হয়ত নাৎসী নেতার এ উক্তিকে মানিয়া লওয়া সম্ভব হইত। কিন্তু মানুষের মনোবলই রণক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক হইয়া দাঁড়ায়। সেজন্য হিটলারের এ উক্তিকে গ্রহণ করা একান্তই অসম্ভব। হিটলারের ইউরোপীয় দুর্গ-প্রাচীরে ফাটল ধরিয়াছে—এ কথা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই।

হয়ত সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িতে দীর্ঘদিন সময়ের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু শেষ পরিণতি সম্পর্কে আজ সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। ইতালির আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই মিত্রবাহিনী সালের্নো, ব্রিন্দিসি, কাতানজারো প্রভৃতি স্থান ক্রমশ দখল করিয়াছে। জার্মান বাহিনীও অলস হইয়া বসিয়া নাই। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জার্মান বাহিনী রোমের চতুর্দিকে ৫০ কিলোমিটার স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। ইহা ছাড়া মিলান, তুরিন ও পাদুয়া তাহাদের দখলে আসিয়াছে। সমগ্র ব্রেনার গিরিবর্ত্ম আজ জার্মান হস্তগত। উত্তর ইতালির সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছেন, ফিল্ড মার্শাল রোমেল জেনারেল কেসেলরিং। জেনারেল রোমেল সমগ্র উত্তর ইতালি পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গের জার্মান রিপোর্টার বলেন, "যে কোন সময় ঝড় উঠিতে পারে। শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক, বিমান, তথা সমগ্র সমরশক্তিকে লৌহ-বেষ্টনীর সম্মুখীন হইতে হইবে।" প্রচার-কার্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, জার্মান বাহিনী পো নদীর বরাবরে যে আত্মরক্ষা ব্যূহ রচনা করিয়াছে, সেখানেই ইতিহাসের এক নিষ্ঠুরতম লড়াই হইবে। যে ইতালি আজ আত্মসমর্পণ করিয়া হয়ত নিরপেক্ষই থাকিতে চাহে, তাহারই বুকের উপর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমরশক্তিগুলি নিজেদের শক্তির পরিচয় দিবে। ইতিপূর্বে জার্মান হইতে প্রচারিত এক সংবাদে বলা হইয়াছিল, 'পো'-নদী রক্ষা ব্যূহের শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং শক্তিশালী যান্ত্রিক বাহিনী সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। কথাটা অবিশ্বাস্য নহে। কেননা, একবার 'পো' রক্ষা ব্যূহ চূর্ণ হইলে সমগ্র লম্বর্দি ও ভেনেতো বিদ্যুৎগতিতে মিত্রপক্ষের করায়ত্ত হইবে ও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বন্যার জলের



মুসোলিনী

মত ব্রেনার গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবে। কিন্তু সে সম্ভাবনার হয়ত এখনও কিছুটা বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে জার্মান বাহিনীকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা, উভয় কার্যেই নিযুক্ত হইতে হইবে। মিত্র ইতালি আজ প্রকাশ্যেই জার্মানদের বিরোধিতা করিতেছে। ইতালির প্রধান প্রধান শহরে ইতিমধ্যেই জার্মান ও ইতালীয়দের মধ্যে বড় বড় সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। মোট কথা, দুই শক্তিশালী যোদ্ধার পরাক্রমে অসহায় ইতালি আরও বিপন্ন বোধ করিবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পোপ এতদিন যে চেষ্টা করিয়াছেন, পূর্বোক্ত আশঙ্কাই তাহার হেতু। কিন্তু শক্তিহীনের আবেদন নিবেদন সমর-কর্তাদের কাছে নিষ্ফল। ইতালি কেবলমাত্র যুদ্ধই ত্যাগ করে নাই, মিত্রপক্ষের যুদ্ধ চালাইবার ঘাঁটি হিসাবে বা অন্য প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য কর্সিকা ও মূল ইতালীয় ভূখণ্ড সমর্পণ করা হইয়াছে। মোট কথা, বন্ধু ইতালি আজ জার্মানির প্রত্যক্ষ শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থাটা মিত্রপক্ষের অনুকূল সন্দেহ নাই।

ইতিমধ্যেই রোডস্ দ্বীপে জার্মান ও ইতালীয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। এই সংঘর্ষের মুখে দোদো-কেনিজের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই দুর্বল হইয়া উঠিবে এবং সে দুর্বলতার সুযোগে মিত্রপক্ষ বল্কান বা গ্রীসের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। রণ-পরিস্থিতিতে একটি সম্ভাবনা অপর সম্ভাবনাকে টানিয়া আনে।

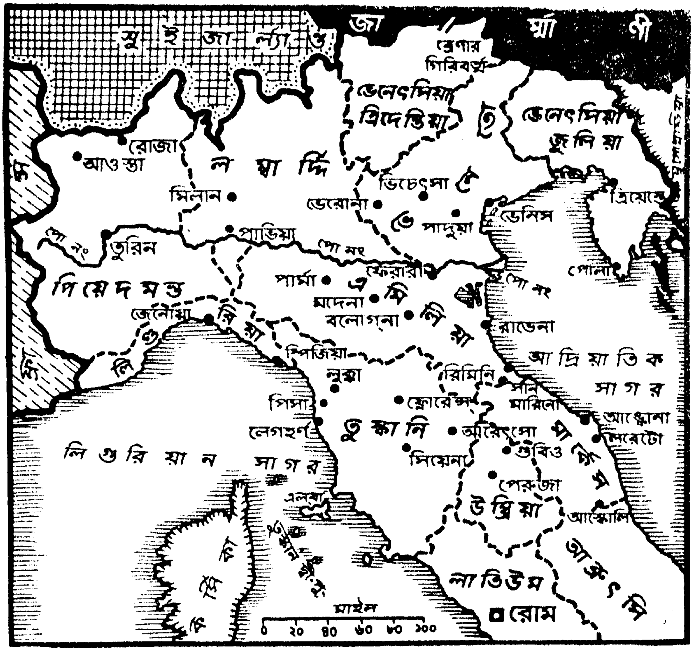
রাশিয়া যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবী জানাইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, অন্তত ২৫ ডিভিশন সৈন্যকে রুশ রণাঙ্গন হইতে সরাইয়া আনা প্রয়োজন হইবে, এরূপ ব্যাপক অভিযান জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে আরম্ভ করিতে হইবে। ব্যাপারটা হয়ত অদূরে ভবিষ্যতে আর অসম্ভব থাকিবে না। হেডকোয়ার্টার্স হইতে হিটলার যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, আসন্ন এ বিপদ সম্পর্কে তিনি সম্যকভাবেই সজাগ আছেন। তিনি বলেনঃ—"এক্ষণে সামরিক কৌশল হিসাবে কখন কখনও আমাদিগকে হয়ত কোন রণাঙ্গনে কিছু ছাড়িয়া দিতে বা বিশেষ রণাঙ্গন এড়াইয়া চলিতে বাধ্য হইতে হইবে। কিন্তু জার্মান জাতি যে লৌহ-বেষ্টনী গঠন করিয়াছে এবং আমাদের সৈন্যদের শৌর্য ও রক্তদানে যাহা রঙিগন হইতেছে, তাহা কখনও ভাঙিয়া পড়িবে না... সৈন্যগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহাদের স্বদেশও আজ রণাঙ্গনে পরিণত হইয়াছে।"

"কোন রণাঙ্গনে কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে"—স্বীকার করিলেও তাহা যে ইতালীয় রণাঙ্গন নহে, এ কথা অনায়াসেই বলা চলে। ইতালীয় রণাঙ্গন ছাড়িয়া দিবার অর্থ হইবে, মিত্রপক্ষকে জার্মানির একেবারে দ্বারদেশে ডাকিয়া আনা ও বার্লিন অভিমুখে তাহাদের যাত্রা পথ প্রশস্ত করিয়া তোলা। ইতালীয় রণাঙ্গনে বা 'পো' রক্ষা-ব্যূহের যুদ্ধই হয়ত জার্মানির শেষ যুদ্ধ নহে। বরং বল্কানে এবং পশ্চিম ইউরোপে বিভিন্নমুখী অভিযানের যে জার্মানিকে সম্মুখীন হইতে হইবে, নাৎসী রাষ্ট্রনায়কের বক্তৃতায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ইউরোপীয় দুর্গের যে অংশ আজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কেবলমাত্র উহার মধ্য দিয়াই মিত্রপক্ষ অগ্রসর হইবে, হিটলার তাহা মনে করেন না। কিন্তু ইতালীয় রণাঙ্গনে এক বৃহৎ নৃশংস লড়াইয়ের সম্ভাবনা তিনি স্বীকার করেন।

ইতিমধ্যে পূর্ব রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী আজভ সাগরের তীরবর্তী বন্দর নভোরোসিস্কে অবতরণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা নীপার নদীর মাত্র ৪০ মাইল দূর পর্যন্ত পেৌঁছিতেও সক্ষম হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, নীপার নদীই হিটলারের সর্বশেষ প্রাকৃতিক ব্যূহ। যদি নীপার নদী পর্যন্ত জার্মান বাহিনী হটিয়াও আসে—তথাপি নীপার নদীতেই সর্বশেষ লড়াইয়ের জন্য তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে নভোরোসিস্ক দখল হওয়ায় ক্রিমিয়ার জার্মান বাহিনী আজ বিপন্ন হইয়া উঠিল। কৃষ্ণসাগরীয় রুশ নৌবহর অতঃপর বল্কান ও ক্রিমিয়ায় জার্মান দুর্গশ্রেণীর উপর আঘাত হানিবার সুযোগ পাইবে। জার্মান সমর-সমালোচক লুডভিগ বলেন, জার্মান বাহিনী বর্তমানে battle of attrition বা "প্রতিপক্ষকে ক্ষয় করিয়া আনিবার" যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু জার্মান বাহিনী পূর্ব রণাঙ্গনে যেভাবে ব্যূহকে সংকুচিত করিয়া আনিতেছে, তাহাতে তাঁহার এ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয় না। হিটলার বলিয়াছেন, প্রয়োজন মত হয়ত "কোন রণাঙ্গনে কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে"—কিন্তু সে প্রয়োজনটা যে কেন দেখা দিল, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। জার্মানির ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে হিটলার অবহিত হইয়াছেন, তাঁহার বক্তৃতাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সকল সামরিক ও রাজনৈতিক সংকট দেখা যাইতেছে, পূর্ব রণাঙ্গনে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত জার্মানির পক্ষে তাহা মোটেই অনুকূল নহে। নরওয়ে, সুইডেন, ইতালি ও বল্কানের অবস্থা জার্মানির ভবিষ্যৎ বিপদেরই আভাস দিতেছে।

ইতালির আত্মসমর্পণের ফলে ইতালীয় ফ্যাসিস্ট নীতিরও কি অবসান ঘটিয়াছে—এ প্রশ্নটা স্বভাবতই উঠে। প্রয়োজনের খাতিরে মিত্রপক্ষ বাদোলিও ও ইমানুয়েলের সহিত চুক্তি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ইতালি হইতে ফ্যাসিজমের উচ্ছেদ হয় নাই এবং চুক্তিপত্রেও এমন কথা লেখা হয় নাই যে, ফ্যাসিজমকে উচ্ছেদ করিতে হইবে। অবশ্য, সামরিক দিক হইতে সমগ্র ইতালি দখলের পর হয়ত মিত্রপক্ষ এই কার্যে মন দিবেন। আপাতত 'বৃহত্তর শত্রু' জার্মানির বিরুদ্ধে যেটুকু সুবিধা করিয়া লওয়া যায়, জেনারেল আইসেনহাওয়ার সেদিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। সম্পূর্ণ নাৎসী কবল মুক্ত ইতালি অতঃপর কোন্ রাজনৈতিক দর্শনকে গ্রহণ করিবে, বর্তমান মুহূর্তে তাহা বলা সম্ভব নহে। ইতালিতে ফ্যাসিজমের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত—সেই সংগে ইমানুয়েল এবং বাদোলিওর ভবিষ্যৎও অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ফ্যাসিজম প্রথম আঘাত পাইয়াছে মুসোলিনীর পতনের কালে—দ্বিতীয় আঘাত পাইল, ইতালির আত্মসমর্পণ কালে। কিন্তু, ফ্যাসিজমের মৃত্যু হয় নাই। ইতালিতে ফ্যাসিজম এখনও বাঁচিয়া আছে এবং হয়ত আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিবে।

সিসিলিতে যখন মিত্রপক্ষের অভিযান



প্রায় শেষ পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে, তখন অকস্মাৎ কুইবেক হইতে ঘোষণা করা হইল, জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ব্যাপক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে এবং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন পূর্ব এশিয়া রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঘোষণা করা হইল, কেবলমাত্র আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের স্থলপথেই জাপ-অধিকৃত ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হইবে না। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ দ্বারা মালয়, সিঙ্গাপুর ও সুদূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যুগপৎ আঘাত হানা হইবে। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, এ পরিকল্পিত অভিযানের জন্য শক্তিশালী নৌবহর প্রয়োজন। জাপান প্রধানত নৌশক্তি বলিয়া নৌপথেই জাপানের বিরুদ্ধে আঘাত হানা প্রয়োজন। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে আক্রমণ চালাইয়া জাপানকে ঘায়েল করা বা স্থলপথে অভিযান চালাইয়া ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার অসম্ভব না হইলেও দুঃসাধ্য। কুইবেকে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে আক্রমণ চালাইয়া জাপানের মূল ভূখণ্ড পর্যন্ত অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা কার্যত বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

কুইবেক আলোচনার অব্যবহিত পরেই ইতালির আত্মসমর্পণ সংবাদে জাপানের উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল। ইহা যে বিশ্বযুদ্ধ এবং সুদূর ভূমধ্যসাগরীয় পরিস্থিতি যে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানেরও বিপদ সৃষ্টি করিতে পারে, জাপ সমরনায়ক বা রাষ্ট্রনেতাদের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না।

অবশ্য, ইতালির আত্মসমর্পণ সংবাদে, জাপ প্রচার বিভাগ হইতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলা হইল, ইতালির কার্যের ফলে ত্রিশক্তি চুক্তি অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলা হইল, ইতালির কার্যের ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতির কোনই পরিবর্তন হইবে না। ইহা যে নিতান্তই প্রচারকার্য, পরবর্তী ঘোষণাতেই তাহা প্রকাশ পাইল। ৯ই সেপ্টেম্বর টোকিও বেতারে বলা হইল, ইতালির আত্মসমর্পণের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, জাপ মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠকে তাহার সম্মুখীন হইবার পন্থা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

১২ই সেপ্টেম্বর জাপ নিউজ এজেন্সীর সামরিক ভাষ্যকার বলেন, "ভূমধ্যসাগরে ইতালীয় নৌবহরের আত্মসমর্পণের ফলে সেখানকার ইঙ্গ-মার্কিন নৌবহরকে অন্যত্র প্রেরণের সুবিধা হইয়াছে। উহাদিগকে প্রশান্ত মহাসাগর বা ভারত মহাসাগরে প্রেরণের আশঙ্কা রহিয়াছে।" সংবাদটি জাপানের পক্ষে মোটেই শুভ নহে। ইতিপূর্বে এক সংবাদে বলা হইয়াছে, আফ্রিকা সম্পূর্ণরূপে এক্সিস কবলমুক্ত হওয়ায় সেখানকার সৈন্যবাহিনীকে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রেরণ করা সম্ভব হইয়াছে। এই সৈন্য বাহিনীর সাহায্যকল্পে যদি ভূমধ্যসাগর হইতে ইঙ্গ-মার্কিন নৌবহর অগ্রসর হয়, তবে পূর্ব এশিয়ায় জাপানের সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, পূর্ব এশিয়ায় স্থল ও নৌবাহিনীর সম্মিলিত অভিযানের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সাফল্য মাউণ্টব্যাটেনের সহায়ক হইয়া দেখা দিল। ইতালির সহিত যুদ্ধবিরতির ৫ম সর্তে রহিয়াছে, মিত্রপক্ষের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ সামরিক প্রয়োজনে ইতালীয় বাণিজ্য জাহাজগুলি তলব করিতে পারিবেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যাইতে পারে, ইতালীয় বাণিজ্য জাহাজবহর মিত্রপক্ষের হাতে চলিয়া আসিল। অতঃপর সুদূর প্রাচ্যে উহাদের আবির্ভাব দেখিলেও বিস্মিত হইবার কোনই কারণ থাকিবে না। মোট কথা, ইতালির আত্মসমর্পণের গুরুত্বকে হাল্কা করিয়া দেখা অন্যায় হইবে। সমগ্র ভূমধ্যসাগরে এখন এক্সিসের কোনই অস্তিত্ব রহিল না। মাল্টা, জিব্রাল্টার, আলেকজান্দ্রিয়ার নৌবহর ও মার্কিন নৌবহর একযোগে প্রাচ্যে পাড়ি দিবার যে সুযোগ পাইল, ইতালি ও ইতালীয় নৌবহরের আত্মসমর্পণ ছাড়া কদাপি তাহা সম্ভব হইত না। ইতালির আত্মসমর্পণ তাই সম্ভাবনায় পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কেবলমাত্র ইউরোপীয় রণপরিস্থিতিই নহে—এশিয়া রণাঙ্গনেও উহার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

বেদুইন

গোবিন্দ চক্রবর্তী

তীক্ষ্ণ শ্বেত সাহারার একচ্ছত্র অধিপতি আমি বেদুইন—
সূর্যের কিরীট মাথে, পদতলে মূর্চ্ছায়িত বালুদের রাশি।
নিরাপদ ক্যারাভ্যান্ চকিতে লুণ্ঠন করি' হাসি সর্বনাশী—
উটের পিঠেতে চ'ড়ে রক্তলাল জীবনের কেটে যায় দিন।

কোন্ ম্যাপে রাঙা রঙ সহসা ফ্যাকাশে হলো কালের বর্ষায়—
সুমেরুর বনে বনে বসন্ত এলো নাকি ঃ জ্বলেছে অরোরা?
লাল ঝাণ্ডা পুড়ে যাবে? নাৎসীরই জয় হবে? এই কি রে ন্যায়?
ঃ ভুলেও ভাবি না কিছু যেহেতু অন্যায় দিয়ে পৃথিবীটা মোড়া!

অন্যায়ের ভগবান লাল সাগরের তীরে তাই আমি জাগি—
নৈয়ায়িক পরাভুক্ কতই না এসেছিলো মোরে শাসিবারে!
হো হো হো হো ঃ হাসি-ঝড়ে কোথায় পালালো তারা
নিশি-আঁধিয়ারে
—রাজারে শাসিতে আসে? ধূলি যার উড়ে যায় অশ্বখুরে লাগি!

দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রেম ঃ কিছু নাই, কিছু নাই ঃ আমি নির্মম—
দুরন্ত দুর্জয় আমি স্বেচ্ছাচারী বিধাতা নোতুন!
আমারে প্রণাম করে শূন্য হ'তে সূর্যকর, নীচে সাইমুন্—
অক্ষম ভয়ার্ত সেই বৃদ্ধ বিধাতার চেয়ে কিসে আমি কম্?

সুরা, সোফী আর মাংসে নিশীথ-শিবিরে মোর
বেহেস্ত্ যে নামে—
তার পরে লাল ভোরে আর কারো চিহ্ন নাই ঃ
শিবির ও তাহারা।
হিমেলী সাঁঝের রাতে হয়ত দু' ক্রোশ দূরে পেতে পারো সাড়া ঃ
সম্রাট্ বসিয়া আছে আর দু'টি নীল পরী ডাইনে ও বামে!

পুস্তক পরিচয়

বাঙলার ব্রত—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। বহু চিত্রে শোভিত। মূল্য আট আনা।

বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থরূপে অবনীন্দ্রনাথের "বাঙলার ব্রত" প্রকাশিত হইল। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে সুপ্রাচীন ব্রতোৎসবগুলির স্থান কোথায় এবং মূল্য কতখানি তাহা লেখক তত্ত্বজ্ঞের বিচার-বুদ্ধিদ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। শিল্পী এবং শিল্পানুরাগীদের কাছে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, কিন্তু বাঙালী জনসাধারণ বলিলে যাঁহাদের বুঝি তাঁহারা অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পী বলিয়াই জানেন, শিল্পসমালোচক হিসাবে তাঁহার আন্তর্দেশিক খ্যাতির সংবাদ অনেকেরই অগোচর। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়া বাঙালী পাঠক সাধারণ তাঁহার সেই পরিচয় লাভ করিবেন।

বাঙলাদেশে খাঁটি মেয়েলী ব্রতের সংখ্যা কম ছিল না, পল্লীগ্রামে আজও কিছু কিছু অনুষ্ঠিত হয়। স্মার্ত পণ্ডিতের হাত না পড়ায় এই ব্রতগুলি পুরাতন বাঙালী সমাজের কিছুটা সত্য পরিচয় আজ পর্যন্ত অবিকৃতভাবে বহন করিয়া আসিতেছে। এইসব ব্রতের তিনটি অংগ, অনুষ্ঠান, ছড়া ও আলপনা। এই তিনের মধ্য দিয়া একটা দেশের সমগ্র নারী-সমাজ কিভাবে আপন মনের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছিল, অবনীন্দ্রনাথ আলোচ্য গ্রন্থে তাহাই আমাদের জানিবার সুযোগ দিয়াছেন।

ব্রতানুষ্ঠানের সহিত পূজা-অর্চার কিছু যোগ আছে বটে; কিন্তু পূজা-অর্চাই মুখ্য নয়। "এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব। কতক চিত্রকলা, নাট্যকলা, গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া, মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা।" এই কারণেই এই সকল ব্রত প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের অমূল্য এবং অপরিহার্য উপাদান। কাব্য, নাটক, চিত্রকলাবিদ্যার মধ্যে যে তিনটি শ্রেষ্ঠ তাহাদের সহিত এই মেয়েলী ব্রতের সাক্ষাৎ যোগ আছে। এই তত্ত্বটি বিবৃত করিয়াই লেখক ক্ষান্ত হন নাই, ব্রতের ছড়া এবং আলপনা সহযোগে তাহা সরস ভাষায় সাধারণ পাঠককে বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

ছড়ার সহিত কাব্য সাহিত্যের এবং আলপনার সহিত চিত্রশিল্পের যোগ আছে বলিলে একেবারে দুর্বোধ্য মনে হয় না। কিন্তু নাটকের সহিত কাহার কি সম্বন্ধ? এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হইতে পারে। মাঘমণ্ডলের ব্রতে সে প্রশ্নের উত্তর অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। নাটকের মূল খুঁজিতে গিয়া যাঁহারা প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের দ্বারে ধর্না দিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে একবার মাঘমণ্ডলের ছড়াটি পড়িতে অনুরোধ করি। পড়িলে দেখিবেন পুরাতন মত পরিবর্তন এবং নূতন মত গঠনের উপযোগী বহু উপাদান এই ছড়ার মধ্যে আছে।

ছড়াগুলির জন্মকাল সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহার মর্ম এই যে, ভাবের দিক দিয়া ছড়াগুলি ঋগ্‌বেদের সমসাময়িক অথবা তাহারও পূর্ববর্তী। আর্যগণের ভারতে আসিবার পূর্ব হইতেই ভারতের আদিম অধিবাসীরা স্বাধীনভাবে যে ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিতে বর্তমান ব্রতগুলি তাহাদেরই রূপান্তর। আর ব্রতের সংগে সংগে ছড়ার উৎপত্তি, কাজেই আজিকার ছড়াগুলিও প্রাচীন ছড়ার ভাষান্তর মাত্র। অনেক ছড়া সম্বন্ধে একথা বলা চলিতে পারে বটে, কিন্তু কোন্ যুগের ছড়া কত শতাব্দীর দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আমাদের যুগবর্তী হইয়াছে, তাহা যদি চিন্তা করি তো জোর করিয়া বলিতে পারি না যে ইহারা কেহই স্পর্শদুষ্ট হয় নাই। বর্তমান গ্রন্থে সে রকম কোন ছড়া উদ্ধৃত করা হয় নাই, কিন্তু ব্রতীদের মুখে এখনও কিছু কিছু শোনা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেঁজুতির ছড়া হইতে দুই একটি অংশ তুলিয়া দিইঃ

"আরশি আরশি আরশি।
আমার স্বামী পড়ুক ফারসি॥"

অথবা

"গুয়া গাছ সুপারি গাছ মুঠিয়ে ধরে মাজা।
বাপ হয়েছে দিল্লীশ্বর ভাই হয়েছে রাজা॥"

"দরবার শোভা বেটা"র কামনাও কোন কোন ছড়ায় দেখা যায়। কয়েকটি ছড়ায় সপত্নী বিদ্বেষের যে নিদর্শন পাই তাহা হইতে স্বভাবতই অনুমান হয় যে সেগুলি কৌলীন্য-প্রথার প্রচলনকালে রচিত। যেমন,

"কুল গাছটি ঝাঁকিড়ি।
সতিন বেটা মাকড়ী॥"

অথবা

"সাত সতিনের সাত কৌটা
তার মাঝে আমার এক অব্‌ভরের কৌটা।
অব্‌ভরের কৌটা নাড়িচাড়ি
সাত সতিনকে পুড়িয়ে মারি॥"

এসব ছাড়া প্রাচীন হইলেও অতি প্রাচীন নয়। গ্রন্থকার হয়তো এগুলিকে "নানা মুনির আঁচড়" এবং "নানা জঞ্জাল" বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু যদি কেহ ঐ কারণে ইহাদের পরিত্যাজ্য বলিয়া স্বীকার না করেন তো তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না।

সারথী—সম্পাদক—শ্রীরুদ্রকান্ত দাস। কার্যালয়—২৭, ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা "সারথী"র আষাঢ় সংখ্যা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। সিনেমা ও সাহিত্যই হইল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। বর্তমানের এই দুর্দিনে একখানি পত্রিকা চালান কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সাংবাদিক মাত্রেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেইদিক হইতে 'সারথী'র কর্তৃপক্ষের উৎসাহ প্রশংসার বিষয়। আলোচ্য সংখ্যায় প্রভাতকিরণ বাবুর তৃতীয়বার ক্রয়ীর অভিষেক এবং সম্পাদকের 'গাঁয়ের মাটি' উপন্যাসখানি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। আমরা পত্রিকাখানির উন্নতি কামনা করি।

দক্ষিণায়ন (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—জীবেন বসু, ৭ বি বেলতলা রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

বাঙলাদেশের ছোট বড় বহু সাময়িক পত্রের পাতায় কাব্য-রসিক পাঠক সমাজ বিমলবাবুর কবিতার পরিচয় পেয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁর নির্বাচিত কতকগুলো কবিতা নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়েছে। বিমলবাবুর কবিতার সংগে যাদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, প্রাচীনকে কালোপযোগী করে প্রকাশ করবার এবং ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরে কাব্যের নতুন ইমারত গড়বার দক্ষতা তাঁর প্রচুর। আধুনিক কবিতার নামে যে সব কবিতা আজকাল প্রকাশিত হচ্ছে, ভাবে ও ভাষায় তার অনেকগুলি কোন্ জাতের বা দেশের তা নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। বিমলবাবুর কবিতা এই রকম কোন ধাঁধার মধ্যে ফেলে আমাদের নাজেহাল করে না, একালে এটাও কম লাভ নয়। বিষয়ানুসারে গুরুচালের কবিতা লেখাতেও যেমন তাঁর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, হালকা চালের কবিতাতেও তাঁর হাতে তেমনি চমৎকার খেলে। ছন্দের নানাপ্রকার আকার নিয়ে তিনি কারবার করেছেন, কিন্তু সর্বত্রই পাকা ব্যবসায়ী হাতের ছাপ তাতে ফুটে উঠেছে। শব্দসমৃদ্ধি তাঁর বিস্ময়কর, প্রয়োগের নিপুণতাও পদে পদেই মনকে খুশীতে ভরে তোলে। তাঁর বলিষ্ঠ ও পৌরুষমণ্ডিত প্রকাশভংগী বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। ব্যংগ ও শ্লেষের শানিত অস্ত্রের প্রয়োক্তা হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। শব্দ ও ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যই হয়তো দু'একটা কবিতায় প্রসাদগুণের অভাব অনুভব করেছি। কিন্তু তা এতই আকিঞ্চিৎকর যে, তা উল্লেখ না করলেও চলতো।...সংক্ষেপে, কোন রকম অত্যুক্তি না করেও বলা চলে, বিমলবাবুর কবিতাগুলির সর্বত্রই সরস কবিচিত্তের রূপ ধরা দেয় আর কাব্যরসিক মনেও সে সরসতার ছোঁয়াচ লাগে। নানা কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠকদের তাঁর কবিতার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা চলত। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য এবং আংশিক উদ্ধৃতিতে রসনাভূতির হানি ঘটবার আশংকা করে' আমরা তাতে বিরত হয়েছি। যাঁরা কবিতা ভালবাসেন তাঁদের আমরা এই বইখানা পড়বার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বইয়ের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল এবং সুরুচির পরিচায়ক।

খেলাধুলা

আন্তর্বিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশন পরিচালিত আন্তর্বিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্কটিশ চার্চ স্কুলের ছাত্রগণ বিভিন্ন বিভাগে সাফল্য লাভ করিয়া স্কুল চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিয়াছে। সারদাচরণ ইনস্টিটিউসনের ছাত্র অমর দাস সিনিয়ার বিভাগে, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসনের ছাত্র সমর সাহা ইন্টারমিডিয়েট বিভাগে ও স্কটিশ চার্চ স্কুলের ছাত্র অরূপ সাহা জুনিয়ার বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিয়াছে। প্রতিযোগিতায় উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে কোন ছাত্রকে দেখা যায় নাই। তবে কয়েকটি বিষয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। কোন নূতন রেকর্ড স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে উন্নততর নৈপুণ্য অধিকারের বিশেষ প্রচেষ্টা আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় হইতেছে যে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় যোগদানকারীর সংখ্যাও বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। কেন হ্রাস পাইল ইহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত। কারণ বাঙলার সন্তরণের ভবিষ্যত অনেকখানি স্কুলের ছাত্রদের উন্নতির উপরই নির্ভর করিতেছে। কিরূপে নির্ভর করে ইতিপূর্বে বহুবার বহু প্রবন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাহা প্রকাশ করিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তির আর আবশ্যকতা নাই। তরুণ বয়সের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করে যদি তরুণ বয়সে সেই শিক্ষার দৃঢ়মূল ধারণ করিবার ব্যবস্থা থাকে। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ইহার সহায়তা করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা। সকল স্কুলে সন্তরণ কৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা নাই অথবা এই বিষয় উৎসাহ দেওয়া হয় না। ইহা যোগদান-কারিগণের তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে আন্তর্বিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা থাকা উচিত নহে। যাহাতে সকল স্কুলে ইহার শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং যাহাতে সকল স্কুলে এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয় তাহার পথ উক্ত প্রতিযোগিতার পরিচালক-গণকেই করিতে হইবে। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার মধ্যেই তাঁহারা যদি নিজেদের কর্মক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখেন তবে এই বিষয় স্কুলের ছাত্রগণ যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন তাহাও নিম্নস্তরের হইবে ও যোগদানকারী দলের সংখ্যাও দিন দিন হ্রাস পাইবে।

বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন

বাঙালী ব্যায়ামবীরগণ মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়ে উৎসাহিত হন সেইদিকে বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের বিশেষ দৃষ্টি আছে। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র খুলিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া নাই। বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে বিভিন্ন মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতেছেন। দক্ষিণ কলিকাতায় শিক্ষা কেন্দ্র খুলিবার পরই বাঙালী বনাম গোরা সৈনিক দলের এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। এই প্রতি-যোগিতায় বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণ মাত্র এক পয়েণ্টে পরাজিত হন। নিয়মিত শিক্ষা লাভ করিলে বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণ বৈদেশিক মুষ্টি যোদ্ধাগণের সমকক্ষতা করিতে পারেন তাহাই এই প্রতিযোগিতায় প্রমাণিত হয়। সম্প্রতি উক্ত এসোসিয়ে-শনের পরিচালকগণ মধ্য কলিকাতা শিক্ষা কেন্দ্র কলেজ ওয়াই এম সি এতে আর একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় উত্তর কলি-কাতার শিক্ষা কেন্দ্রের মুষ্টি যোদ্ধাগণ ডকস্ ডিটাচমেণ্ট গোরা সৈনিকদলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ডকস ডিটাচমেন্ট দল ৯-৬ পয়েণ্টে জয়লাভ করিয়াছেন সত্য কিন্তু অল্প সময়ের শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণ যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। অদূর ভবিষ্যতে ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইবেন এবং মুষ্টিযুদ্ধ বিষয় বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি করিবেন তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মুষ্টিযুদ্ধ বিষয় বাঙালার সুনাম বৃদ্ধি পায় তাহার দিকেই যে কেবল এসো-সিয়েশনের পরিচালকগণের দৃষ্টি আছে তাহা নহে, দেশের বর্তমান দুর্দশার কথাও ইঁহাদের স্মরণ আছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বর্ধমানের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন ও বর্ধমান বন্যা সাহায্য সমিতির হস্তে দান করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এইরূপ সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া জানা গেল। নবগঠিত এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি যেরূপ কর্মব্যবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আমরা দৃঢ়তারই সহিত বলিতে পারি এই প্রতিষ্ঠানটি শীঘ্রই বাঙলার ক্রীড়াজগতে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবে!

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন পাতিয়ালায় যে নিখিল ভারত অনুষ্ঠান হইবে তাহাতে বাঙলার প্রতিনিধিগণকে প্রেরণ করিতে যে খরচ হইবে, তাহার সংগ্রহ কার্যে কিছুদিন বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বলা চলে না, তবে আশানুরূপ হয় নাই আই এফ এ যে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে মাত্র চারি সহস্রের কিছু বেশী টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অল্প টাকা সংগৃহীত হওয়ার জনাই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। সম্প্রতি তাঁহারা এক অফিসিয়াল বা স্পোর্টস পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগের উপযুক্ত কর্মীবৃন্দের যে তালিকা প্রকাশ করিয়া-ছেন, তাহা হইতেই ইহা অনুমান হয়। কারণ এই তালিকায় যে সকল লোককে যে যে বিভাগের উপযুক্ত বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই গত ৬।৭ বৎসর ধরিয়া অলিম্পিকের অধীনস্থ সকল স্পোর্টস অনুষ্ঠানেই ঐ সকল কার্যভার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং নূতন করিয়া ইঁহা দের নাম প্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না। এইরূপ প্রচারের দ্বারা এই সকল ব্যক্তিদের সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের নিকট কি হীন প্রতিপন্ন করা হইল না? এতদিন ইঁহারা জোর করিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কর্তৃত্ব করিয়াছেন—ইহা কি বলিবার ও ধারণা করিবার সুযোগ দেওয়া হইল না?

সাপ্তাহিক সংবাদ

৮ই সেপ্টেম্বর

ইতালি বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। নিউইয়র্ক বেতারে প্রচার করা হইয়াছে যে, ইতালি বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া জেনারেল আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করিয়াছেন। নিউইয়র্ক বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইতালির যুদ্ধ বিরতির প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ইতালীয় জনসাধারণের উদ্দেশে এক ইস্তাহারে মিত্ররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ বিরতির কথা উল্লেখ করিয়া মার্শাল বাদোলিও বলেন, অপর যে কেহই আক্রমণ করুক, ইতালি তাহা প্রতিরোধ করিবে। মার্শাল বাদোলিও বলেন, প্রতিপক্ষের অত্যধিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া এবং দেশের আর যাহাতে ক্ষতি হইতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইতালীয় গভর্নমেণ্ট জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে যুদ্ধ বিরতির জন্য অনুরোধ জানান। তাঁহাদের এ অনুরোধ মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইতালীয় সৈন্যেরা অতঃপর সর্বত্র ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করিবে।

মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, রুশ বাহিনী কর্তৃক স্ট্যালিনো অধিকৃত হইয়াছে। মস্কোর এক বিশেষ ঘোষণায় প্রকাশ, গ্রীষ্মকালীন অভিযানে ৪ লক্ষাধিক জার্মান সৈন্য নিহত হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ১৬৫ জন অনাহারে মৃতকল্প ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই দিন হাসপাতালে মোট ৩৬ জনের মৃত্যু ঘটে এবং পুলিশ স্কোয়াড রাস্তা হইতে ২৭টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করে।

পাবনার সংবাদে প্রকাশ, অনাহারের ফলে অদ্য পাবনায় ৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে তিনজন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জে ৫ জন লোক অনাহারে মারা গিয়াছে।

৯ই সেপ্টেম্বর

বেতারে প্রচার করা হইয়াছে যে, জার্মান সৈন্যগণ কর্তৃক উত্তর ও মধ্য ইতালি অধিকৃত হইয়াছে। স্ব স্ব ঘাঁটি দখল করিয়া থাকিতে মার্শাল কেসেলরিং ইতালিস্থ জার্মান সৈন্যদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন।

জাপ প্রচার বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইতালির কার্যের ফলে ত্রিশক্তি চুক্তি অমান্য করা হইয়াছে। এরূপ ঘটনার আশংকায় জাপান ইতিপূর্বেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ইতালির আত্মসমর্পণের ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতির কোনই পরিবর্তন হইবে না। জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত জাপানের যুদ্ধ চালাইবার সংকল্পও পুনরায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

১০ই সেপ্টেম্বর

জার্মান রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, রোমস্থ ইতালীয়ান সৈন্যাধ্যক্ষ রোমের চতুর্দিকের ৫০ মাইল ব্যাপী অঞ্চল জার্মানদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। জার্মান বাহিনী ভেটিকান শহর রক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছে। উত্তর ইতালিতে ফিল্ড মার্শাল রোমেল জার্মান সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, ইতালীয় নৌবহরের ২ খানি ক্রুজার, ২ খানি ডেস্ট্রয়ার ও ২ খানি বিমানবাহী পোত জিব্রাল্টারে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

বড়লাটের শাসন পরিষদের প্রাক্তন সদস্য স্যার জগদীশ প্রসাদ অদ্য বাঙলার প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিনের হস্তে প্রদত্ত একখানি স্মারকলিপিতে বলেন, "বাঙলায় যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, স্মরণীয়কালের মধ্যে এরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই।" সম্প্রতি ফরিদপুর জেলা পরিদর্শন করিবার সময় সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহার বর্ণনা-প্রসংগে স্যার জগদীশ বলেন, "ফরিদপুরে একটি লংগরখানায় আমি একজন লোককে কুকুরের ন্যায় খাদ্য লেহন করিয়া খাইতে দেখি।"

বর্ধমানের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য বর্ধমান শহরে ৪ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তি মারা গিয়াছে। কাঁথির সংবাদে প্রকাশ, সহরের রাস্তায় রাস্তায় অনাহারে মৃত্যু সংখ্যা ক্রমে অত্যধিক বাড়িয়া চলিয়াছে। গত আগস্ট মাসে কাঁথি শহরে ১২৭ জন লোক অনাহারে মারা গিয়াছে।

বরিশালের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য বরিশাল বাজারে চাউল মোটেই পাওয়া যায় নাই। গত ৮ই সেপ্টেম্বর একজন অনশনে মারা গিয়াছে।

১১ই সেপ্টেম্বর

হিটলার তাঁহার হেড কোয়ার্টার্স হইতে জার্মান জাতির উদ্দেশে এক বক্তৃতা করেন। গত মার্চ মাসের পর এই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। হের হিটলার বলেন যে, বাদোলিও গভর্নমেণ্ট ইতালির যুদ্ধ বিরতি প্রার্থনার অভিপ্রায়ের কথা জার্মানিকে জানান নাই। যেদিন যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সেদিনও মার্শাল বাদোলিও জার্মান দূতকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ইতালি কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না। হের হিটলার ইহাতে বলেন যে, নূতন এবং বিশেষ কার্যকরী পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা বিমান-আক্রমণভীতি নিবারণের আয়োজন চলিতেছে।

ইতালিতে মিত্র বাহিনী কর্তৃক সালের্নো বন্দর অধিকৃত হইয়াছে। জার্মান সৈন্যেরা মিলান, তুরিন ও পাদুয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।

নভরোসিস্ক বন্দরে রুশ সৈন্যদের অবতরণের কথা অদ্য জার্মান ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে।

আলজিয়ার্স হইতে মিত্রপক্ষের বেতারে বলা হইয়াছে যে, বহু জার্মান পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পঞ্চম বাহিনী ইতালির বিভিন্ন স্থানে নিজদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকাস্থিত মিত্রপক্ষের হেড কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এ পর্যন্ত ১৭ খানি ইতালীয় যুদ্ধ জাহাজ মাল্টায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চাঁদপুরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯শে আগস্ট হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে ৩৯ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তি স্থানীয় এলগিন হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ২৫শে জুলাই হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অতিরিক্ত হাসপাতালে ১৮৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত আগস্ট মাসে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা হইতে কুড়াইয়া প্রায় ১০০টি মৃতদেহের সৎকার করা হইয়াছে।

কলিকাতায় গত ২৫ দিনে (১৫ই আগস্ট হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) মোট ২৫৩৭ জন অনাহারে মৃতপ্রায় নরনারীকে বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৪৬১ জন পরে হাসপাতাল-গুলিতে মারা যায়। উক্ত কালের মধ্যে শব অপসরণকারী পুলিশ স্কোয়াড মোট ৪৭৬টি মৃতদেহ শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে অপসারণ করে।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত ৪ঠা হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৬৮ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়; তন্মধ্যে ৬ জন ভর্তির পরেই মারা যায় প্রত্যহই রাস্তায় মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে।

১২ই সেপ্টেম্বর

ইতালিতে মিত্রবাহিনী কর্তৃক ব্রিন্দিসি শহর ও পোতাশ্রয়, কাতানজারো, ইউফেমিয়া এবং লা মার্তিনো অধিকৃত হইয়াছে।

হিটলারের হেড কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, জার্মান প্যারাসুট সৈন্য গোয়েন্দা পুলিশ এবং সশস্ত্র এস এস দল অদ্য সিনর মুসোলিনীকে মুক্ত করিয়াছে। তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

রোম হইতে ইতালীয়ান গভর্নমেণ্ট স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া রাজা ইমানুয়েল ও মার্শাল বাদোলিও ঘোষণা করিয়াছেন।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে অনাহারে মৃতকল্প মোট ১২৮ জনকে ভর্তি করা হইয়াছে। এইদিন হাসপাতালসমূহে মোট ৩৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। শব অপসারণ-কারী পুলিশ স্কোয়াড শহরের রাস্তা হইতে ৩৬টি মৃতদেহ সরাইয়াছে তন্মধ্যে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ২৩ জন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কুমিল্লার সংবাদে প্রকাশ, সরকারের নিয়ন্ত্রিত দর ২৬৲ টাকা মূল্যে এখানকার বাজারে চাউল পাওয়া যাইতেছে না। বাজার হইতে চাউল উধাও হওয়ায় লোকে চাউল কিনিতে পাইতেছে না। কেবলমাত্র সরেস আতপ চাউল ৭০৲ টাকা মণ দরে পাওয়া যাইতেছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর

মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ব্রিয়ানস্ক রেলওয়ে জংসন অধিকৃত হইয়াছে।

মার্শাল চিয়াং কাইসেক চীনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা সালামাউয়া বিমান ঘাঁটি দখল করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

ইতালির ক্রটোন বন্দর মিত্রবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। সালের্নো রনাঙ্গনে তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে। সুইস রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, বলোগনা পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ইতালির সমগ্র এলাকা বর্তমানে রোমেলের আয়ত্তে রহিয়াছে।

দেশ

সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ৮ই আশ্বিন, ১৩৫০ সাল। Saturday, 25th September, 1943. [৪৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পূজার আয়োজন

সম্মুখেই মহালয়া এবং প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ, সুতরাং পূজা আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়; কিন্তু সমগ্র বাঙলায় আজ অন্নাভাবে হাহাকার। চিতা-ধূমে বাঙলার আকাশ আচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে। বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে পুত্রহারা জননী, পতি-হারা নারী, ভ্রাতৃহারা ভগিনীর রোদনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। বহুদিনের স্নেহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে নর-নারী এক মুষ্টি অন্নের উদ্দেশে আজ সংসার এবং সমাজ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু এমন দুর্দিন বাঙলায় আর কোন দিন আসে নাই। সমগ্র বাঙলা দেশের আজ সর্বনাশ - হইতে বসিয়াছে। ক্ষুধার অন্ন দিয়া বাঙলার গ্রাম অঞ্চলগুলি যদি এখনও রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না হয়, তবে বাঙলা দেশ যে শ্মশানে পরিণত হইবে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই ভাবিতেছি, বাঙালী আজ কাহার পূজা করিবে? ঘর যাহার ভাঙ্গিল, সংসার যাহার ধ্বংস হইল, সে আজ কাহাকে ঘরে আনিবে? অন্নহীন যে, সে কাহার অন্ন যোগাইবে? মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস এবং আড়ম্বর কি অনাহারজনিত এই হাহাকারের মধ্যে বেদনারই আবর্ত তুলিবে না? অন্যায়ে অর্জিত অর্থের ঔদ্ধত্য যদি কোথাও থাকে অশ্রুর উত্তাল তরঙ্গ কি তাহাকে আজও প্রশমিত করিবার উপযুক্ত আকার ধারণ করে নাই!

অকাল বোধনের কথা মুখেই শুনিয়াছি; আজ বাঙলা দেশে সত্যই অকাল-বোধনের সময় আসিয়াছে। বাঙালীর আজিকার পূজা আর গতানুগতিক পূজা নয়। বাঙালী চাহিয়া দেখ, অশ্রুভারে আকুলনয়না, দিগ্বসনা জননী ভিক্ষাপাত্র করে লইয়া তোমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তোমার সকল ক্ষুদ্র স্বার্থকে মাতৃ-বেদনায় নিগূঢ় করিয়া আজ জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রেরণায় নিয়োজিত কর। মাতৃপূজার এই মহালগ্নে সমস্ত বাচালতা বন্ধ হউক, শ্রদ্ধাযুক্ত হও। দেশব্যাপী এই মহাদুর্দিনে সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির পাপ-ব্যবসায় যেন তোমাকে প্রলুব্ধ না করে। সে পথে বাঁচিতে পারিবে না। জননী আজ সর্বস্ব বলি চাহিতেছেন। মহালয়ার সম্মুখে জাতির অতীত সেবকগণের স্মৃতিতে চিত্ত উদ্দীপ্ত করিয়া মায়ের পূজায় আত্মনিবেদন কর। বুভুক্ষুকে অন্নদানে অগ্রসর হও। আর্তকে কোলে তুলিয়া লও। মৃত্যুপথ যাত্রীকে মরণের মুখ হইতে রক্ষা কর। জড়ের পূজা পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যস্বরূপিণী জননীর পূজা সার্থক কর। এই মহাপরীক্ষার মধ্যে জগতের কাছে তোমার মনুষ্যত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ। তোমার মহাকবির বাণী বিস্মৃত হইও না—

'দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়
সেই ভীরু কাপুরুষ।'

কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিয়া উদার বীর্যে প্রতিষ্ঠিত হও।

আর কতদিন?

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বাঙলা দেশের খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে বিস্তর বাগযুদ্ধ হইয়া গেল। বাঙলার খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দী যথারীতি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন; কিন্তু ইহাতে সমস্যার কি যে সমাধান হইল, তাহা আমরা জানিলাম না; কিংবা ভবিষ্যতের জন্যও সরকারী কোন সুনিশ্চিত পরিকল্পনা এতদিন পরেও পরিষদীয় এই বিতর্কের অবসানে পাওয়া গেল না। খাদ্যসচিব তাঁহার বক্তৃতায় ধন্যবাদের পালা গাহিলেন। তিনি দিল্লীকে ধন্যবাদ দিলেন, পাঞ্জাবকে ধন্যবাদ দিলেন, বড়লাটের শাসন পরিষদের প্রতি স্তুতি নিবেদন জ্ঞাপন করিলেন। এই সঙ্গে বাঙলা দেশে অনাহারে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে,

তাহারাও খাদ্যসচিবের ধন্যবাদে বঞ্চিত হইল না; কিন্তু ধন্যবাদের এই ধ্বনির মধ্যেও বাঙলাজোড়া বুভুক্ষুর আর্তরোল কিছুই উপশমিত হইল না। কার্যতঃ খাদ্যসচিবের বিভাগ হইতে চাউলের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইল, ফলে বিপত্তিই বেশী বাড়িল। বাঙলার সর্বত্র চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। অন্নাভাবে মৃত্যুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইল এবং এখনও মৃত্যুপথযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। সে যাত্রাপথে বিরতির কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। তাই ভাবিতেছি, আর কতদিন এই-ভাবে চলিবে? শুধু ফাঁকা কথার প্রতিশ্রুতিতে নিরন্নের সান্ত্বনা কোথায়? যাঁহাদের অর্থের চিন্তা নাই, অন্নের অভাব নাই, তাঁহাদের এমন বিলাসে ক্ষুধিতের আশ্বাস কিছুই মিলে না। জাতি আজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, এইরূপ বচনবিলাসিতার লঘুচিত্ততার আর অবসর নাই। বাঙলার ঘরে যাহাতে খাদ্য আসে ইহাই প্রয়োজন। কাগজপত্রে দর বাঁধিয়া তর্জন-গর্জনের কোন মূল্য আমরা স্বীকার করি না। এই ব্রতের কি ফল আমরা দেখিয়া লইয়াছি। বর্তমানের প্রশ্ন শুধু কলিকাতা শহরের প্রশ্নই নয়—গ্রামগুলি আগে রক্ষা করিতে হইবে, নহিলে শহরের প্রাসাদে বসিয়া এবং বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস খাইয়া নিরাপদ জীবন যাপন করাও বেশী দিন সম্ভব হইবে না। এমন আরামের উপর আঘাত আসিয়া লাগিবেই। জাতি যদি ধ্বংস পায়, কেহ পরিত্রাণ পাইবে না। বাঙলার গ্রামগুলিকে বাঁচাইলে তবেই জাতি বাঁচিবে। সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা যদি এখনও না হয়, তবে স্বস্তিবোধ করা সম্ভব নয়। মানুষের হৃদয় যাহাদের আছে, তাহারা এ অবস্থায় স্বস্তি বোধ করিতে পারে না। সকল দিকে দুর্নীতি—এই আবহাওয়া দূর করিয়া মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এই কার্যে অগ্রসর হইবেন বাঙালী তাঁহাদিগকেই সমর্থন করিবে।

নূতন গভর্নরের কর্তব্য

স্যার টমাস রাদারফোর্ড গভর্নর হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করিবার পর বাঙলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সংস্কার সাধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মিঃ এইচ এম ই ষ্টিভেন্সকে খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার নিয়োগ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ষ্টিভেন্স সাহেব পাকা সিভিলিয়ান, যথেষ্ট ক্ষমতাই তাঁহার হাতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার এই নিয়োগে বাঙলার খাদ্যসমস্যার গ্লানিকর অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে কি না তাহা দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত আছি। ইহা ছাড়া, মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন এম খাঁ এতদিন বাঙলা দেশে গম কণ্ট্রোলার ছিলেন, তাঁহাকে বাঙলা দেশ হইতে সুদূর পাঞ্জাবে গম কিনিবার ভার দিয়া পাঠানো হইয়াছে; তাঁহার স্থলে শ্রীযুত অবনীভূষণ চাটুজ্যে বাঙলার গম কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন। গম এবং আটা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে পাঞ্জাবের মন্ত্রী সর্দার বলদেব সিং বাঙলা সরকারের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, ১৫ই আগস্ট হইতে বাঙলা দেশে পাঞ্জাব হইতে যে গম প্রেরিত হইয়াছে, শুধু তাহাতেই বাঙলা সরকার ২০ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। বাঙলার অর্থসচিব গমের ও আটার দর সম্বন্ধে একটা হিসাব ইতিপূর্বে দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পরেও সর্দার বলদেব সিংয়ের এই অভিযোগ। আমরা আশা করি চাটুজ্যে মহাশয় গম কণ্ট্রোলার হইবার পরে আটা ময়দার মূল্য-সমস্যা আর রহস্যাবৃত থাকিবে না এবং সরকারী নির্ধারিত দরে আটা ও ময়দা বাজারেও পাওয়া যাইবে। দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে, আজও তাহা পাওয়া যাইতেছে না। কলিকাতার ফ্লাওয়ার ডিলার্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে বন্দোবস্তক্রমে শহরের দুই শত দোকানে সরকারী দরে আটা ও ময়দা সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু সরবরাহ বজায় রাখিয়া এই ব্যবস্থা কতদিন এবং কতটা কার্যকর হইবে এবং সমস্যা সমাধানের পক্ষে এমন সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হইবে কিনা এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ যথেষ্ট আছে। সংবাদপত্রে দেখিতেছি, বাঙলার গভর্নর ইতিমধ্যে ২৪-পরগণার দুই শত মাইল পল্লীঅঞ্চল ভ্রমণ করিয়া তথাকার জনসাধারণের অবস্থা এবং সরকারী সাহায্য-কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, কলিকাতা কিংবা তন্নিকটবর্তী অঞ্চল দেখিয়া বাঙলা দেশের পল্লী অঞ্চলের অবস্থা প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করা যায় না। বাঙলার পথে ঘাটে কি অবস্থায় মানুষের মৃতদেহ পড়িয়া আছে এবং শৃগাল কুকুরে তাহা লইয়া টানাটানি করিতেছে, অন্নাভাবে কঙ্কালসার নরনারী কি ভাবে মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, সামান্য পরিমাণ চাউল সংগ্রহের জন্য কি কষ্ট লোককে ভোগ করিতে হইতেছে এবং দুর্দশার এই অবসরে পাপ-ব্যবসায় এবং দুর্নীতি কত রকমে প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বাঙলার অভ্যন্তরভাগে গমন করা প্রয়োজন। আমরা আশা করি, গভর্নর তাহা করিবেন এবং বাঙলার দুর্দশা নাটকীয়ভাবে অতিরঞ্জিত বলিয়া যাহারা সর্দারী ফলাইতেছেন, তিনি সেই শ্রেণীর শাসকদের উক্তির সমুচিত উত্তর প্রদান করিবেন। শুধু তাহাই নহে, বাঙলা দেশকে আজ যাঁহারা 'দুর্ভিক্ষ পীড়িত' অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহসী হইতেছেন না, আমরা আশা করি, বাঙলার নূতন গভর্নর বাঙলার দুর্গত অঞ্চলের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদিগকে দায়িত্ববোধে সমধিকভাবে প্রণোদিত করিবেন। এ যাবৎ কাল সরকারী বিভিন্ন ব্যবস্থার অবস্থা আমরা দেখিয়াছি এবং তাহা হইতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও অর্জন করিয়াছি। বহু দুঃখ, ব্যর্থতা এবং গ্লানি বাঙলার খাদ্যসমস্যার প্রশ্নে জড়িত রহিয়াছে, আর তাহার জের টানা চলিবে না। নূতন গভর্নর দৃঢ়তার সঙ্গে এই গ্লানিকর অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করুন, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

হিসাব ও কাজ

বাঙলা সরকার বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করেন নাই; কিন্তু দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হইলে যাহা করা হয়, তদপেক্ষা তাঁহারা আরও বেশী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রাজস্ব সচিব শ্রীযুত তারকনাথ মুখুজ্যে মহাশয় সরকারী সাহায্য-ব্যবস্থার দফাওয়ারী হিসাবের দ্বারা তাঁহার এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। বাঙলা সরকার দুর্গত অঞ্চলসমূহে কি কি সাহায্য-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি তাহার একটা লম্বা ফর্দ পরিষদে উপস্থিত করেন। ফর্দটি এইরূপ (১) গভর্নমেণ্ট আংশিক অর্থ-সাহায্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা; (২) দুর্গতদের মধ্যে কাপড়-চোপড় বিলি করা; (৩) শিশুদের জন্য খাদ্য ও রোগীদের জন্য পথ্য প্রভৃতি বিলি করা; (৪) গবাদি ক্রয়ের জন্য অর্থসাহায্য, তাঁতীদের জন্য তাঁত ও মাঝিমাল্লাদের জন্য নৌকা ও জালের ব্যবস্থাকল্পে অর্থসাহায্য করা। এই সঙ্গে তিনি এই সব বাবদে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহারও একটা হিসাব দিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, লম্বা ফর্দ দেখাইলেই কাজও বেশী হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। শিশুদের জন্য খাদ্য, তাঁতীর জন্য তাঁত, জেলের জন্য জাল, মাঝির জন্য নৌকা, বস্ত্রহীনের জন্য কাপড় এবং চোপড়; এই সব বাঙলা দেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে

কি পরিমাণ বিতরণ করা হইয়াছে এবং হইতেছে, মন্ত্রী মহোদয় তাহার হিসাব দিলে সরকারী দাতব্যের বহর আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ হইত; কারণ, আমরা খোলা চোখে এ পর্যন্ত এই সব ব্যবস্থার ফলোপধায়কতা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; সম্ভবত ঐগুলি প্রয়োজনের ব্যাপকতার অনুপাতে শুধু ব্যয়ের শিরোনামা গুণতির মধ্যেই পর্যবসিত হইয়াছে। আংশিক অর্থ-সাহায্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থার কার্যকারিতা যদি যথাযোগ্যই হইত, তবে বাঙলা দেশ জুড়িয়া আজ চাউল নাই, আটা নাই, এই চীৎকার শুনিতাম না। মফঃস্বলের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থার কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করা বাহুল্য; কারণ, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেই সে সম্বন্ধে প্রমাণ দিনের পর দিন সুস্পষ্ট হইতেছে। এই কলিকাতা শহরেই সরকারী যে কয়েকটি কন্ট্রোলের দোকান আছে, আটার মূল্য সের প্রতি ছয় আনা নির্ধারিত করিবার পর সেই সব দোকানের কোন কোনটিতে আটা সরবরাহ বন্ধ হইয়াছে। কোন তেল কিংবা লবণ কিছুই মিলে না। আধা রেশনিংয়ের ভিত্তিতে যে কার্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া সপ্তাহে এক সের চাউল মাত্র মিলিতেছে। কিন্তু এক সপ্তাহে এক সের চাউলে মানুষের জীবনধারণ করা সম্ভব হয় কি? মাল সরবরাহই করা যদি সম্ভব না হয়, তবে এমন ব্যবস্থার মূল্য কি থাকে? সরকারী ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্বন্ধে এমন অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়ই জনসাধারণের মনে আস্থার ভাব বৃদ্ধি পায় না। মোটের উপর, সব ব্যবস্থাই যেন দিনগত পাপক্ষয়ের ধারা ধরিয়া চলিতেছে। কোনটির মধ্যেই সুনির্দিষ্ট কার্যকর পরিকল্পনার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। এইরূপ মতিগতি লইয়া এত বড় একটা ব্যাপক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ফেমিনকোডে আর কি আছে, আমরা মন্ত্রীরা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী করিতেছি; মন্ত্রীদের মুখে এ ধরণের গালভরা কথায় আমরা কিছুই সান্ত্বনা পাইতেছি না। ফেমিনকোডে কি আছে আমরা জানি এবং মন্ত্রীরা কি করিতেছেন, তাহাও দেখিতে পাইতেছি। আমাদের বক্তব্য এই যে, বেশীর প্রয়োজন নাই; অন্তত ফেমিনকোডে যাহা আছে, তাহাই যাহাতে সুশৃঙ্খলিতভাবে কার্যে পরিণত হয়; সেজন্য তাঁহারা কৃপা করিয়া বাঙলা দেশ "দুর্ভিক্ষ পীড়িত" অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করুন।

বড়লোকের বড় ব্যাপার

শুনিতেছি, ভারত গভর্নমেণ্ট এবার ভারতের অন্ন-সমস্যার প্রতি সম্মিলিত শক্তির কর্ণধারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। কলিকাতার মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা কিছু দিন পূর্বে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের দৃষ্টি বাঙলার বর্তমান অন্ন সমস্যার দিকে আকৃষ্ট করিয়া তার করেন। চার্চিল সাহেবের এ পর্যন্ত সে তারের উত্তর দিবার মত অবসর ঘটে নাই; কিন্তু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট হইতে উত্তর আসিয়াছে। তিনি জানাইয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহারা অনবহিত নহেন; তবে জাহাজযোগে খাদ্যশস্য প্রেরণ ব্যবস্থা যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেকগুলি জটিল অবস্থার দরুণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে যেসব ব্রিটিশ ভারতের কর্মচারী আছেন তাঁহাদের বিবিধ প্রচেষ্টায় অবস্থা উন্নতির পথে সহায়ক হইবে বলিয়া প্রেসিডেণ্ট আশা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ ভারতের এই সব কর্মচারী বাঙলা দেশের খাদ্য সমস্যার দিকে নজর দিবার মত অবসর পাইবেন কিনা, এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। মার্কিন গভর্নমেণ্টের প্রচার বিভাগ হইতে প্রদত্ত সংবাদে এইসব কর্মচারীদের যিনি প্রধান ব্যক্তি সম্প্রতি তাঁহার কর্মতৎপরতা কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঐ সংবাদে প্রকাশ, সম্মিলিত শক্তিবর্গের পরিকল্পিত খাদ্য এবং কৃষি সম্বন্ধীয় কমিশনের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী বিশ্বজগতের সর্বত্র পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন এবং জীবনযাত্রার উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বিশ্ব-জগতের বড় ভাবনায় যাঁহারা এখন বিব্রত, তাঁহাদের পক্ষে কি বাঙলার গরীবদের ক্ষুদ্রতর সমস্যার সমাধানে কালব্যয় করা সম্ভব হইবে?

খাদ্য সম্মেলন

বর্তমান মাসে দিল্লীতে পুনরায় খাদ্য সম্মেলন হইবে। সম্মেলনের এই তৃতীয় অধিবেশন। বাঙলা দেশ বর্তমানে খাদ্য-সমস্যায় বিপন্ন, সুতরাং খাদ্য সম্মেলনের সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা আমাদের সমধিক আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইবার কথা; কিন্তু গত দুই দফা সম্মেলনের অভিজ্ঞতা তাহাদের সে আগ্রহ স্বভাবতই নিরস্ত করে। তবে শুনিতেছি, আগামী এই সম্মেলনে বাঙলা দেশের জরুরী অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে এবং ভারত সরকারের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব মহাশয় কিছু দিন পূর্বে বাঙলা দেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের সম্বন্ধে যে সব জোরালো কথা বলিয়াছেন, তাহা কার্যে পরিণত করার জন্য চেষ্টা হইবে। শুনিতেছি, প্রয়োজন বোধ করিলে এবার ভারত গভর্নমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র ভারতের খাদ্য সরবরাহ এবং বণ্টন নীতি নিজেদের হাতে গ্রহণ করিবেন। তাহার ফলে উদ্বৃত্ত প্রদেশসমূহের পক্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের আড়ালে থাকিয়া আর অভাবগ্রস্ত প্রদেশসমূহকে বঞ্চিত রাখা সম্ভব হইবে না। এ সব কথা শুনিতে ভাল; কিন্তু কার্যে কতটা পরিণত হয়, ইহাই প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল এই যে, বাহির হইতে খাদ্যশস্য প্রচুর আমদানী হইলেই চলিবে না। শুনিতেছি, পাঞ্জাবে এবার যেরূপ গম হইয়াছে, পৃথিবীর কোথায়ও সেরূপ প্রচুর ফসল হয় নাই। কলিকাতার বিশপ ভরসা দিয়াছেন যে, ভগবান পাঞ্জাবকে যে ফসল দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে বাঙলা দেশ রক্ষা পাইতে পারে; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, খাদ্যশস্য আমদানী হইলেই দুঃখ দূর হয় না; ইহা তো দৈনন্দিন জীবনে দেখিতেছি। সম্প্রতি সরকারী সূত্রে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দশ দিনে কলিকাতা শহরে ২৮ হাজার টন খাদ্যশস্য পৌঁছিয়াছে। ইহার মধ্যে দুই জাহাজ ভর্তি চাউলও আছে। সরকারী হিসাব অনুসারে রেলপথে প্রত্যহ ১৭৬০ টন খাদ্যশস্য আসিয়াছে; কিন্তু মফঃস্বলের কথা ছাড়িয়া দেওয়া গেল, কলিকাতাতেও খাদ্যশস্যের মূল্য এইরূপ ক্রমবর্ধমান সরবরাহের ফলে যেমন নামিয়া যাওয়া উচিত, তাহা যাইতেছে না। এই সব মাল কোথায় যায়? এ প্রশ্নের আজও সমাধান হইতেছে না; যত দিন পর্যন্ত বাহির হইতে আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার সর্বত্র খাদ্যশস্য বণ্টনের ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত না হইবে; ততদিন পর্যন্ত বাঙলার অন্ন-সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইবে না। সে অবস্থায় চোরা বাজারের দিন শেষ হইয়াছে, বাঙলার খাদ্যসচিব দম্ভভরে একথা বলিলেও অন্নের কাঙ্গাল বাঙালীকে চোরা বাজারের দিকেই কার্যকরভাবে দৈনন্দিন সমস্যা মিটাইবার জন্য তাকাইয়া থাকিতে হইবে। সরকারী নির্ধারিত দরে বাজারে চাউল মিলে না, দাইল মিলে না, চিনি মিলে না, তেল মিলে না, কয়লার সংস্থানও হয় না; দৈনন্দিন নানা অভাবে পীড়িতদিগকে থানা দেখাইয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই, সরকারী বিজ্ঞপ্তির দফাওয়ারী বিধানেও তাহাদের ক্ষুধাজনিত সমস্যার সমাধান হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

- শ্রীপ্রমথনাথ বিশী -

[৮]

পত্রিকা-প্রকাশ

আশ্রমে ছেলেদের অনেকগুলি হাতে-লেখা পত্রিকা ছিল। তাহারা নিজেরাই লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক—ছবিও নিজেরা আঁকিত। মাসের প্রথমে বাহির হইত। বড় ছেলেদের কাগজ ছিল শান্তি; ইহার প্রচ্ছদপটে লেখা থাকিত—

'এসো শান্তি বিধাতার কন্যা ললাটিকা
নিশাচর পিশাচের রক্ত দীপশিখা
করিয়া লজ্জিত।'

বড়দের আর একখানি পত্রিকা ছিল—'বীথিকা'। বীথিকা-গৃহের ছেলেরা ইহা প্রকাশ করিত। মাঝারি ছেলেদের দু'খানা কাগজ ছিল—প্রভাত ও বাগান। ছোট ছেলেদের কোন কাগজ ছিল না, আমি কয়েকজন উৎসাহী সঙ্গী জুটাইয়া 'শিশু' বলিয়া একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া ফেলিলাম।

পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হইলে ঘরে ঘরে পড়িবার জন্য দেওয়া হইত—আর শেষের দিকে লাইব্রেরীতে রাখিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। এই সব কাগজে অধ্যাপকদের রচনা আদায় করিয়া প্রকাশ করিতাম; আর রবীন্দ্রনাথের লেখার 'কপি-রাইট' তো আমাদের কাছে ছিল না, কাজেই যেটা খুসী প্রকাশিত হইত। এইসব কাগজ লইয়া ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল, কোন্ কাগজ ভালো হয়। কিন্তু বড়দের কাগজের সঙ্গে পারিব কেন?

তারপরে এক সময়ে দৈনিক কাগজ বাহির করিবার হুজুগ পড়িয়া গেল। একখানা লম্বা কাগজে নিজেদের মন্তব্য লিখিয়া আশ্রমের প্রকাশ্য স্থানে টানাইয়া দেওয়া হইত—সকলে পড়িত। ইহাতে সাহিত্যের চেয়ে সাংবাদিকতার আয়োজন বেশি ছিল। আশ্রমের দৈনন্দিন খবর ও তাহার সমালোচনা লিখিত হইত। সর্বভৌতিকর কাপ্তেনদের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য অনেক সময়ে থাকিত। যে সংখ্যায় Sedition কিছু তীব্র হইত তাহাতে কাহারো নাম থাকিত না। কিন্তু কাপ্তেনগোষ্ঠির গুপ্ত-সংবাদ রাখিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল—আসামী প্রায়ই অনাবিষ্কৃত থাকিত না—মাঝে মাঝে দণ্ডও পাইতে হইত। কিন্তু কাপ্তেনদেরও এই সব সমালোচনাকে ভয় করিয়া চলিতে হইত।

প্রথম ছাপার অক্ষরে কবে আমার লেখা বাহির হয় তাহা মনে নাই। বোধ করি 'মুকুল' নামে বালকদের কাগজে ধাঁধা'র উত্তরে নামটা প্রকাশিত হইয়াছিল। কাগজ আসিলে নামটার তলায় দাগ দিয়া রাখিলাম—এবং সকলের যাহাতে নজরে পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিলাম। বহু দর্শকের ঘাটা-ঘাটিতে কাগজখানা ছিঁড়িবার উপক্রম হইলে কাঁচি দিয়া নামটা কাটিয়া পুস্তকের মলাটে লাগাইয়া রাখিলাম। সেই অল্প বয়সেই নিজের নাম রক্ষা করিবার দিকে দৃষ্টি ছিল।

কিন্তু ইহা তো কেবল নাম মাত্র। রচনা নয়। অবশ্য এখন বুঝিয়াছি রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অংশ ওই সব-শেষের ছত্রটি। এই ছত্রটিকে বহন করিয়া আমার রচনা কলিকাতার ছাপা কাগজের উদ্দেশ্যে নিয়মিত প্রেরিত হইত। কিন্তু হায়, সম্পাদকগোষ্ঠির কি কঠিন প্রাণ! ছোট্ট একটি কবিতা প্রকাশ করিলে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইত না—আর একটি বালকের আধি ব্যাধি জরাপূর্ণ সংসারে বসিয়া স্বর্গের আনন্দ লাভ ঘটিত। দেখিতাম পাতার তলাতে অনেকটা করিয়া ফাঁক থাকিয়া যায়—সেখানে আমার কবিতাটা প্রকাশ করিলে তোমাদের তো কাগজ বেশি লাগিত না। ইতিমধ্যে সতীশের একটা কবিতা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইল। আমারই-বা হইবে না কেন? আমি প্রত্যেক ডাকে প্রবাসীর ব্যূহ লক্ষ্য করিয়া কাব্যবাণ নিক্ষেপ শুরু করিলাম। কিন্তু রামানন্দবাবু হইতে হীনতম বেয়ারাটা পর্যন্ত কেহ বিচলিত হইবার লক্ষণ দেখাইল না। এদিকে সতীশের কবিতা প্রকাশিত হওয়াতে তাহার খ্যাতি যেমন বাড়িল, আমার খ্যাতি তেমনি পড়িয়া গেল। মান অপমান সবই তো তুলনামূলক! তখন সম্পাদকদের নির্মম মনে হইত, এখন বুঝিতেছি সমবেদনায় তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ। একবার গোষ্ঠির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তোমার ধোপার হিসাব শুদ্ধ তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন।

ক্রমে কলিকাতার সম্পাদকদের আশা পরিত্যাগ করিয়া দূর মফঃস্বলের কাগজে লেখা পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম এবং হঠাৎ একবার মফঃস্বলীয় কোন সম্পাদকের অনবধানতার সুযোগে আমার লেখা প্রকাশিত হইয়া গেল। যেদিন ডাকে আমার নামে পত্রিকাখানা আসিল—সেদিন আমার জীবন-ক্যালেণ্ডারে লাল চিহ্নিত তারিখ। কাগজখানা লইয়া নিভৃত স্থানে গিয়া বসিলাম। দুর্ভিক্ষের আহারের মত এক নিঃশ্বাসে লেখাটি পড়িলাম—একবার, দুইবার করিয়া একশ বার পড়িলাম। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িলাম, আবার শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম অবধি পড়িলাম; তারপর স্তবকে স্তবকে পড়িলাম। রচনাটি যে শুধু মুখস্থ হইয়া গেল তাহা নয়, কোন্ লাইনে কোন্ শব্দটি আছে, কোন শব্দটির কি চেহারা সব চোখস্থ হইয়া গেল। আহা আর শেষতম ছত্রটিতে আমার নামটি সেকি নয়ন-ভুলানো মূর্তি! দেখিয়া আর তৃপ্তি হয় না। আমি নির্বাক হইয়া সেই নিভৃত স্থানে বৈঁচি গাছের পাশে নামটির দিকে তাকাইয়া নিষ্পন্দনেত্রে বসিয়া রহিলাম। বিদ্যাপতি ঠাকুরের সময়েও কি ছাপা অক্ষর ছিল? নতুবা ও পদটির তো কোন সার্থকতা দেখি না—'জনম অবধি হাম-রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' ইহাই প্রথম মুদ্রিত রচনা প্রকাশের আমার অভিজ্ঞতা।

কিন্তু একাকী বসিয়া দেখিলে তো চলিবে না—অনেক কৃত্য এখনো বাকি। সতীশের ভক্তদের দলের মধ্যে কাগজখানা সগৌরবে নিক্ষেপ করিলাম। ইন্দ্রও বোধ করি এমন অসংশয়িত চিত্তে দধীচির হাড়-পিটিয়া-গড়া বজ্র নিক্ষেপ করেন নাই। দ্বিতীয়বার যখন সেই কাগজে রচনা পাঠাইলাম—রচনা ফিরিয়া আসিল, সংক্ষিপ্ত হেতুবাদের উল্লেখ ছিল—কাগজ উঠিয়া গিয়াছে। দেখিলাম, দধীচির উপমাটা নিরর্থক হয় নাই। আমার প্রথম-রচনা প্রকাশ করিয়া কাগজের শেষ-সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা কি দধীচির আত্মত্যাগের চেয়ে কম! যাই হোক, সম্পাদকের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ছিল না—মনে মনে তাহার সদ্গতি প্রার্থনা করিলাম। আশা করি এই সুকৃতির জোরে ভূতপূর্ব সম্পাদক মফঃস্বলে আদালতের পেস্কার হইয়া দুর্লভ নরজন্ম সার্থক করিতেছেন।

এই সময়ে শান্তিনিকেতনে ছাপাখানা

স্থাপিত হইল। এ যেন ঠিক বাড়ির পাশেই স্বর্গের সিঁড়ি প্রতিষ্ঠা। এমন সুযোগ কোন্ সাহিত্যিক না গ্রহণ করিবে। বিভূতি গুপ্ত ও আমি মিলিয়া একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিয়া ফেলিলাম। নাম 'বুধবার'। বুধবার ছুটির দিন—সেই দিন কাগজখানা বাহির হইত। একখানা ফুল-স্কেপের দুই পৃষ্ঠে ছাপা—মূল্য দুই পয়সা। এখন বিক্রয়ের উপায় কি? আশ্রমে ঠিক করিয়া কাগজ স্টেশনে পাঠাইয়া দিয়া আশা-আশঙ্কায় দোল খাইতে লাগিলাম; ম্যানেজার তো একটা নূতন থলিই কিনিয়া ফেলিল। সন্ধ্যাবেলায় 'হকার' ফিরিয়া আসিল—দূর হইতে দেখিলাম, তাহার হাতে একখানাও কাগজ নাই। ম্যানেজার ততক্ষণে মানসাঙ্কে কত টাকা পাওয়া যাইবে কষিয়া দেখিয়াছে।

—কি হ'ল রে?

মিঠাইঅলাকে দিতে চেয়েছিলাম, সে নিল না। মুড়িঅলা ঠোঙা করবে বলে নিল। আমি অমূল্যকে থামাইয়া দিলাম। বাজারে আমাদের কাগজ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা রুচিকর হইবে না।

শশী হকার বুঝিল, বাবুদের মনের অবস্থা যে-কারণেই হোক সদয় নয়—সে সরিয়া পড়িল। ম্যানেজারের নূতন-কেনা থলিটা ক্ষুধিত সাপের মত টেবিলের উপর



কোপাই নদী

শিল্পী:—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

কিছু বিক্রয় হইত। কিন্তু তাহাতে কাগজের ভবিষ্যৎ তো উজ্জ্বল হইবার কথা নয়। শিশু বিভাগের অধ্যক্ষ ছিল—অমূল্য। সে এককালে আমার সহপাঠী ছিল। ম্যানেজার হিসাবে তাহার নাম ছাপিয়া দিলাম। সে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শিশু বিভাগের ছেলেদের পক্ষে কাগজ কেনা বাধ্যতামূলক বলিয়া প্রচার করিল। সে বলিল—বুধবারে ছেলেরা বাড়িতে চিঠি লেখে, চিঠির সঙ্গে কাগজখানা বাড়িতে পাঠাইবে, অভিভাবকেরা আশ্রমের সংবাদ পাইবেন। ইহাতে আমাদের আয় বাড়িল। কিন্তু আশা তরু কেবল অঙ্কুরিত হইয়াছে এখনো যে ফল-ধরা বাকি। স্থির করিলাম, বোলপুর স্টেশনে যাত্রীদের মধ্যে কাগজ বেচিতে হইবে। অন্য কাগজ স্টেশনে বিক্রীত হয়, আমাদেরই বা কেন না হইবে? লোক

শশী হকার বলিল—আজ্ঞে একখানাও কেউ নিলে না।

—বলিস্ কিরে?

—কাগজগুলো কই?

শশী হকার বসিয়া পড়িল। বেচারার দোষ নাই—সারাদিন গাড়ির সঙ্গে ছুটো ছুটি করিয়া সে একেবারে ক্লান্ত। গলাও ভাঙা দেখিতেছি—খুব 'হক' করিয়াছে। ওর দোষ নাই, লুপ লাইনের যাত্রীই বেরসিক।

ম্যানেজার শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—কাগজ কই?

শশী বলিল—আজ্ঞে সারাদিন খাওয়া হয়নি। সন্ধ্যাবেলা ওগুলো এক মুড়ি-অলাকে দিয়ে মুড়ি খেয়েছি।

ম্যানেজার বলিল—মুড়ি খেলি কেন?

শশী ভুল বুঝিয়া বলিল—আজ্ঞে, প্রথমে

পড়িয়া রহিল। বিভূতি গুপ্তের হঠাৎ প্রকৃতিপ্রীতি বাড়িয়া যাওয়াতে শাল গাছটার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। আমি কিন্তু এক নূতন শিক্ষা পাইলাম। যাঁহারা বলেন সাহিত্য মানুষের কোন কাজে লাগে না, তাঁহারা অবহিত হইতে পারেন। এই যে ক্ষুধিত লোকটা মুড়ি খাইল, সে কি সাহিত্যের জন্য নয়? অবশ্য মিঠাই পাইলে আরও ভাল হইত, কিন্তু জগতে মনের মত কয়টা জিনিস হয়? সাহিত্য যে ক্ষুধিতের ক্ষুধা দূর করিতে একেবারে অসমর্থ নয়—সেই অমূল্য শিক্ষা আমি এই উপলক্ষ্যে পাইলাম।

যাই হোক, বুধবার কাগজ নিয়মিত প্রকাশিত হইতে লাগিল—এই ব্যাপারে আশার পাত্রে টোল পড়িল কিন্তু একেবারে ভাঙিল না। যে-ঘটনায় আশার কলসী

চার খান হইয়া গেল—এবং লোকে সেই কলসীর কানা লইয়া সম্পাদকদের তাড়া করিল, তাহা কিছুকাল পরে ঘটিয়াছিল।

৭ই পৌষের উৎসবে যোগ দিবার জন্য কলিকাতা হইতে পাঁচ-সাত শত লোক আশ্রমে যাইত। সকালবেলা গুরুদেব মন্দিরে উপাসনা করেন। উপাসনার সঙ্গে অনেকগুলি গান হয়। আমরা স্থির করিলাম, এই গানগুলি বুধবারের উৎসব সংখ্যায় ছাপিয়া দেওয়া যাক্। দিনবাবুর কাছ হইতে গানগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড সংখ্যায় ছাপিয়া ফেলিলাম—একেবারে দুই হাজার ছাপা হইল। লোকে কিনিবে, আবার দু'এক কপি বন্ধুবান্ধবদের জন্যও কোন্ না লইয়া যাইবে। এবারে আর আশা ভঙ্গের ভয় নাই—বাঁধা গ্রাহক। এ লুপ লাইনের বেরসিক যাত্রী নয়, একেবারে কলিকাতার সমজদার ক্রেতা। সকালবেলাতেই সব কাগজ বিক্রি হইয়া গেল—ম্যানেজারের বহুকালের উপবাসী থলি ব্যাঙ-খাওয়া সাপের মত স্ফীতোদর হইয়া টেবিলের উপর বিরাজ করিতে লাগিল।

যথাকালে মন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হইল। একটার পরে একটা গান হইতেছে, কিন্তু এ যে সব নূতন গান! সকলে খস্ খস্ শব্দে পাতা ওলটায়, কিন্তু গান মেলে কই? সকলে আড় চোখে সম্পাদকদের দিকে ঘন ঘন তাকাইতে লাগিল। ব্যাপার কি? দিনুবাবুর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ যে নূতন গান! দিনুবাবু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—রবিদা কাল সন্ধ্যা বেলা সব গান বদলে দিয়েছেন। সর্বনাশ! তখন গুরুদেব বক্তৃতায় যে প্রেমের কথা বলিতেছিলেন বুঝিলাম আমাদের রক্ষা করিবার পক্ষে তাহাও যথেষ্ট নয়। তখন দুই সম্পাদক ও এক ম্যানেজার তিনজনে উপাসনা মন্দির ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িলাম। শ্রোতারা ক্ষণকালের জন্য আচার্যের দিক হইতে পলায়নপর আমাদের দিকে তাকাইল। তাহাদের চোখে মুখে যে ভাব ঝলকিয়া উঠিল তাহা আর যাই হোক প্রেম বা করুণা নয়। তাহারা নিশ্চিত বুঝিল, প্রতারকেরা তাহাদের জানিয়া শুনিয়া ঠকাইয়াছে। দু'চার আনা মিছে গেল বলিয়া তাহাদের দুঃখ ছিল না, কলিকাতার লোক হইয়া যে মেঠো ঠগের কাছে মাথা হেঁট করিতে হইল—ইহাতেই তাহারা বোধ করি অগৌরব অনুভব করিতেছিল। উপাসনা শেষ হইলে সেই নিগৃহীত উপাসকের দল প্রতারক তিনজনকে খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু আমাদের খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। আমরা ঘর বন্ধ করিয়া লেপ মুড়ি শুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলাম। সম্পাদকদের মুখ উদ্বেগে কালো, কিন্তু ম্যানেজারের মুখের ভাব অন্যরূপ। তাহার গোল গাল চেহারা আর বুকের উপরে সেই মোটা কালো থলি যেন, আহা, মৃগ-শিশুটিকে কোলে করিয়া স্বয়ং পূর্ণিমার চাঁদ সমুদ্রের উত্থিত তরঙ্গ বাহুর দিকে করুণ ধিক্কারে তাকাইয়া রহিয়াছে—প্রতারিত ভক্তদের অন্বেষণ-কোলাহল জোয়ারের গর্জনের মতই শ্রুত হইতেছিল বটে।

ইহার পরে 'বুধবার' আর বেশি দিন চলিল না—বন্ধ হইয়া গেল। যাইবার সময়ে স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ কিছু দেনা রাখিয়া গেল। অনুরূপ পরিণাম আশংকা করিয়া প্রেসের ম্যানেজারকে আমাদের পৃষ্ঠপোষক করিয়াছিলাম। কাজেই সে দেনা আর তেমন পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল না।

এই সাপ্তাহিক উপলক্ষেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাঁহার দু'একটি রচনাও ইহাতে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কয়টি নূতন গান 'বুধবারে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই কারণে রবীন্দ্র গ্রন্থান্বেষীদের এক সময়ে ইহা প্রয়োজন হইবে। তাঁহাদের গবেষণার প্রশ্রয়ের পথ রাখি নাই—এ কাগজ এখন সম্পূর্ণরূপে দুর্লভ।

আশ্রমে ছাপাখানা স্থাপিত হওয়াতে কর্তৃপক্ষ শান্তিনিকেতন নামে একখানা কাগজ বাহির করিলেন। ইহা প্রধানত প্রাক্তন ও অধুনাতনদের মধ্যে যোগ রাখিবার জন্যই প্রকাশিত হয়। প্রথমে ইহাতে গুরুদেবের মন্দিরের উপদেশ ও আশ্রম সংবাদ মাত্র প্রকাশ হইত। তারপরে ক্রমে ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি বদলাইতে আরম্ভ করিল। প্রথম সম্পাদক ছিলেন জগদানন্দবাবু, তারপরে আসিলেন শাস্ত্রী মহাশয়; ক্রমে সন্তোষ মজুমদার, বিভূতি গুপ্ত হইয়া কাগজের ভার আমার উপরে পড়িল। কিন্তু তখন নিজের নাম ছাপা দেখিবার মোহ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। আমার হাতে কাগজখানা তিন বছর ছিল, আমি ছাড়িয়া দিবার পরে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

আমার সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশ করিয়া যেটুকু স্থান থাকিত, সব সময়ে খুব যে অল্প থাকিত তা নয়, তা নিজের রচনা দিয়া ভরিয়া দিতাম। গবেষণামূলক রচনা বাহির হইতেছে না বলিয়া মাঝে মাঝে অভিযোগ আসিত; কিন্তু গবেষণা প্রকাশ করিবার মত আমার উদারতা ছিল না। যে সংখ্যায় গুরুদেবের লেখা পাওয়া যাইত না (এমন খুব বেশি নয়) আগাগোড়াই আমি লিখিতাম। কর্তৃপক্ষ আর কি করিবেন, দেখিতেন তাঁহাদের চেষ্টায় ও ব্যয়ে মুদ্রিত কাগজ অপর একজনের রসোদ্বেগ প্রকাশের বাহন হইয়া দাঁড়াইল। কর্তৃপক্ষ যাহাই ভাবুন—গ্রাহক সংখ্যা বাড়িল, ইহাই আমার স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি। বলা বাহুল্য ইহাতে আমার কোন কৃতিত্ব ছিল না—রবীন্দ্রনাথের লেখা যত তুচ্ছ কাগজেই বাহির হোক তাহার মূল্য না দিয়া উপায় নাই। আমি সাহস করিয়া গবেষকদের গুহা হইতে ইহাকে টানিয়া বাহির করিয়া রবীন্দ্রনাথের বাহন করিয়া দিয়াছিলাম। গবেষকদের গুহার সম্মুখে অনেক পত্রিকার প্রবেশ-পদচিহ্ন দেখা যায়—নির্গমন পদচিহ্ন ক্বচিৎ আছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গবেষণা আত্মার দৈন্য ঢাকিবার একটা সুনিপুণ কৌশল। এইসব রচনা মানুষের না করে জ্ঞানবৃদ্ধি না করে আনন্দবর্ধন। বর্জাইস, ব্র্যাকেট, তারকা-চিহ্ন, পাদটীকার টীকা, তস্য টীকা এবং দীর্ঘ নামের নামাবলী কত অজ্ঞতাকে না আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। পণ্ডিত ও রসিক মিলিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত গবেষণা আরম্ভ হইতেই পারে না। গবেষণা মানে—আলোর সন্ধান। এইসব অন্ধ, আত্মাদীন হতভাগ্যেরা আলো দেখিবে কোন্ নেত্রে!

ক্রমশ



বিদুষী ভার্য্যা

- শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় -

১২

আশ্বিন মাস। পূজার ছুটিতে নিশাকর বাড়ি আসিয়াছে।

দুর্গা পূজার পর একদিন দিবাকর তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছিল, এমন সময়ে নিশাকর এবং যূথিকা প্রবেশ করিয়া দুইখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

বইখানা টেবিলের উপর উল্টাইয়া রাখিয়া সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "কি মতলব তোমাদের? বনভোজন, সংগীত বৈঠক, নৌকা ভ্রমণ, না অন্য কিছু?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "অন্য কিছু।"

নিশাকর বলিল, "এ অন্য কিছু কিন্তু বেশ কিছু দাদা। এ আর চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার কথা নয়; এর মূলধন হবে আপাতত পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে দিবাকর বলিল, "পঞ্চাশ হাজার টাকা? পঞ্চাশ হাজার টাকায় কি হবে রে নিশা? ধানের কল, না চিনির কারখানা?"

নিশাকর বলিল, "বিদ্যের কারখানা। মনসাগাছায় মেয়েদের জন্যে স্কুল ত' দূরের কথা, একটা ভাল পাঠশালাও নেই। মনসাগাছার পরম সৌভাগ্যক্রমে বউদিদির মতো একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা মনসাগাছা জমিদার বাড়ির বড় বউ হওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি এ ত্রুটির প্রতিকার না করি তা হ'লে আমার মতে, সে আচরণের দ্বারা আমরা গভীরভাবে নিজেদের অপমানিতই করব!"

নিশাকরের কথা শুনিতে শুনিতে দিবাকরের মুখে কৌতুকের নিঃশব্দ হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "বাপ রে! তোর মুখে যে সাধু ভাষার খৈ ফুটছে! লিখে মুখস্থ ক'রে এসেছিস না-কি? কি চাস, সাদা বাঙলায় বল্ না?"

"সাদা বাঙলায়, আমরা একটা প্রথম শ্রেণীর উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় চাই। আর, তার জন্যে চাই, পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা।"

কথাটা দিবাকরের একেবারে অবিদিত ছিল না; কিছুকাল পূর্বে যূথিকা একদিন এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিল; এবং কথা হইয়াছিল, পূজার ছুটিতে নিশাকর আসিলে এ বিষয়ে আলোচনা হইবে।

দিবাকর বলিল, "বুঝলাম। কিন্তু এভাবে আমরা যদি মনসাগাছার ত্রুটির প্রতিকার করি, তা হ'লে আমরা নিজেদের সম্মানিত করব ত?"

নিশাকর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, না, তা হ'লে আমরা বউদিকেই সম্মানিত করব।"

এবার দিবাকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ কারবার কিন্তু তোমার পক্ষে মন্দ নয় যূথিকা। কেউ যদি অপমানিত হয় ত' সে আমরা; আর কেউ যদি সম্মানিত হয় ত' সে তুমি।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আমি যে এ কারবারে শুধু বখরাদার; লোকসানের ভয় নেই, কিন্তু লাভের ভাগ আছে।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া নিশাকর বলিল, "না, না, বউদিদি, শুধু বখরাদার কেন তুমি হবে? তুমি হচ্ছ খোদ আমার মালিক। সব টাকাটা তুমিই দেবে। আমরা দু ভায়ে শুধু টাকাটা তোমাকে যোগাব। পঁচিশ হাজারের অংক পড়বে দাদার অংশে, আর বাকি পঁচিশ হাজারের পড়বে আমার অংশে।"

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এই ছোট গ্রামে একটা মেয়ে স্কুলের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা কি হবে রে? পঞ্চাশ হাজার টাকায় যে একটা কলেজ হয়।"

নিশাকর বলিল, "এ স্কুল ত' প্রকৃতপক্ষে কলেজের সূত্রপাতই হবে। প্রথম যে মেয়েরা ম্যাট্রিক পাশ করবে, তাদের নিয়েই আমরা কলেজের প্রতিষ্ঠা করব।"

দিবাকর বলিল, "কলেজ যখন হবে তখনকার কথা তখন। এখন স্কুল করতে পঞ্চাশ হাজার টাকার কিসের দরকার শুনি?"

পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া নিশাকর বলিল, "রীতিমত স্কীম তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করা যাবে, উপস্থিত আমরা দুজনে মিলে এই খসড়াটা তৈরি করেছি।" দিবাকরের সম্মুখে কাগজখানা স্থাপিত করিয়া বলিল, "এটা তুমি সময়মত প'ড়ে দেখো। পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে চল্লিশ হাজার টাকা থাকবে রক্ষিত পুঁজি যার আয়ের সাহায্যে চালাতে হবে স্কুলের নিয়মিত খরচ। কারণ, ছাত্রীর সংখ্যা এমন কিছু হবে না যার মাইনে থেকে সব খরচ চলতে পারবে। বাকি দশ হাজার খরচ হবে লাইব্রেরী, আসবাবপত্র, স্কুলের বাড়ি, হোস্টেল আর চার পাঁচখানা পাল্কী তৈরি করতে।"

"অতগুলো পাল্কী কি হবে?"

নিশাকর বলিল, "কাছাকাছি দু-তিনখানা গ্রাম থেকে মেয়েরা পাল্কী ক'রে আসা-যাওয়া করবে; আর দূরের গ্রামের মেয়েরা থাকবে টিচারদের সঙ্গে হোস্টেলে। মোটামুটি এই হ'ল স্কুলের পরিকল্পনা। তারপর, পাঁচ-ছ বছর পরে যখন কলেজের পত্তন হবে তখন আবার নূতন উদ্যমে নূতন কল্পনা নিয়ে লাগা যাবে। সে কলেজের বউদিদি হবেন প্রিন্সিপাল, আমি হব লেক্‌চারার, আর তুমি হবে—"

নিশাকরকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া দিবাকর বলিল, "দফতরি। আমি হব দফতরি।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া নিশাকর বলিল, "বারে! তুমি দফতরী হবে কোন্ দুঃখে? তুমি হবে অধিনায়ক,—ডিরেক্টার। আমরা চালাব মেয়েদের, আর তুমি চালাবে আমাদের।"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে তোরা ভুল পথে চলবি। তার চেয়ে আমি দফতরিই হব"। তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি তোমার প্রিন্সিপালের খাস-কামরায় ব'সে দুবার বেল টিপে আমার নম্বরে আমাকে ডাক দেবে। আমি সাদা চাপকান প'রে কোমরে লাল-সবুজ রঙের পাকানো দড়া এঁটে বারান্দায় টুলে ব'সে ঝিমোতে ঝিমোতে টপ্ করে লাফিয়ে উঠে 'হুজুর' ব'লে সাড়া দিয়ে ছুটে তোমার ঘরে গিয়ে হাজির হব। তুমি কড়া চোখে আমার দিকে চেয়ে বলব, 'চার নম্বরের আলমারিতে তিনটে বই উল্টে পাল্টে রেখেছ কেন? খুঁজে বার করতে অসুবিধে হয় যে।' দু হাত কচলাতে কচলাতে আমি বলব, 'এখনি ঠিক ক'রে দিচ্ছি মেমসাহেব, কসুর মাফ করতে আজ্ঞা হয়।"

দেখা গেল, দিবাকরের কথা শুনিতে শুনিতে সহসা কোন্ মুহূর্তে যূথিকার মুখ হইতে পূর্বের উৎসাহ উদ্দীপনার দীপ্তি খানিকটা অন্তর্হিত হইয়াছে। ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল, "তা নয়। তুমি তোমার ডিরেক্টারের ঘরে ব'সে বেল টিপে দফতরিকে ডেকে বলবে, 'প্রিন্সিপালকে সেলাম দাও।' অসময়ে হঠাৎ তোমার ডাক

পেয়ে ভয়ে ভয়ে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তুমি আমার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলবে, 'দেখুন, আপনার কাজকর্মে আর তেমন সন্তুষ্ট হ'তে পারছিনে। আপনার চেয়ে যোগ্য লোক আমি পেয়েছি। আসচে মাস থেকে আর আমাদের আপনাকে প্রয়োজন হবে না।' তোমার হুকুম শুনে দুঃখে আর অপমানে মাথা হেঁট ক'রে আমি ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসব।"

নিশাকর বলিল, "তার আধ ঘণ্টার মধ্যে অগ্নিমূর্তি ধ'রে ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে ক্রুদ্ধ স্বরে আমি বলব, 'শুনুন ডিরেক্টার মশায়, যূথিকা ব্যানার্জির মতো সুযোগ্য প্রিন্সিপালকে অকারণে অযোগ্য ব'লে যেখানে অপমাণিত করা হয়, সে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি কোনো সংস্রব রাখতে চাইনে। যূথিকা ব্যানার্জির যখন ইচ্ছা হয় ইস্তফা দেবেন, আমি কিন্তু আমার ইস্তফাপত্র লিখে এনেছি, এই নিন! কাল থেকে এ কলেজের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।"

দিবাকর বলিল, "আমি ধীরে ধীরে টুপি লাগিয়ে, দেরাজে চাবি দিয়ে, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলব, 'যখন দেখছি আমার প্রতি আপনাদের এই রকম আস্থার অভাব, তখন আমিই আপনাদের ডিরেক্টরের পদে ইস্তফা দিয়ে চললাম। এর পরও যদি আমাকে আপনাদের প্রয়োজন ব'লে মনে করেন, তা হ'লে আপনাদের গৌরী সেনের পদে আমাকে নিযুক্ত করবেন। টাকার প্রয়োজন হ'লে স্মরণ করবেন আমাকে।'"

নিশাকর বলিল, "গৌরী সেনের পদে ত' তুমি আজ থেকেই নিযুক্ত হচ্ছ; ডিরেক্টারের পদ থেকেও তোমাকে ইস্তফা দিতে দেওয়া হবে না।"

"অর্থাৎ, আমাকে জরিমানাও দিতে হবে, কারাদণ্ডও ভোগ করতে হবে।" বলিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিল। তাহার পর সম্মুখ হইতে নিশাকরদের খসড়াখানা তুলিয়া দেখিয়া বলিল, "নাম করেছিস শুধু 'বালিকা বিদ্যালয়'? 'মনসাগাছা, কিম্বা অন্য কোনো কথার ওর সঙ্গে যোগ থাকবে না?"

নিশাকর বলিল, "নিশ্চয় থাকবে। শুধু 'বালিকা বিদ্যালয়', ন্যাড়া নাম, কখনো হয়? নামটা তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করার পর পুরোপুরি লেখা হবে। যদিও মনে মনে নাম আমি স্থির ক'রে ফেলেছি।"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দিবাকর বলিল, "চমৎকার ত! আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রেও স্থির করতে হবে, অথচ মনে মনে স্থির ক'রেও ফেলেছিস?"

"কিন্তু সে নাম যে তোমার নিশ্চয় পছন্দ হবে।"

"সর্বনাশ! সে কথাও মনে মনে জেনে রেখেছিস?" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "তোমার পছন্দ হয়েছে যূথিকা?"

যূথিকা হাসিয়া বলিল, "কি ক'রে হবে বল? ঠাকুরপো এখনও সে নাম আমাকে বলেননি।"

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কেন রে? নাম নিয়ে এত লুকোচুরি কিসের?"

নিশাকর বলিল, "তুমি ডিরেক্টার, তুমি শুনে মঞ্জুর-নামঞ্জুর করবে। তোমার আগে বউদিদিকে ব'লে কি হবে?"

"তা বেশ, আমাকেই বল্?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া নিশাকর বলিল, "যূথিকা বালিকা বিদ্যালয়।"

"যূথিকা বালিকা বিদ্যালয়?" সহাস্য-মুখে দিবাকর বলিল, "বেশ নাম রেখেছিস! খাসা নাম!"

বিস্ফারিত নেত্রে যূথিকা বলিল, "ও! এই জন্যেই তুমি কিছুতে আমাকে বলছিলে না!" তাহার পর প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, না, ঠাকুরপো ও নাম কিছুতেই হ'তে পারে না;—ও নাম হবার কোনো কারণই নেই।"

দৃপ্ত কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "কেন নেই, শুনি?"

যূথিকা বলিল, "তোমাদের বাড়িতে আমার আসার এ পর্যন্ত তিন মাসও হয়নি; এরই মধ্যে আমার নাম স্মরণীয় করতে যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে বল? তার চেয়ে, আমি নাম মনে মনে স্থির করেছি, সেই নাম খসড়ায় লিখে নাও।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিশাকর বলিল, "তুমি আবার কি নাম স্থির করেছ?"

যূথিকা কথা কহিবার পূর্বে দিবাকর সকৌতুকে বলিল, "বোধ হয় 'নিশাকর বালিকা বিদ্যালয়'।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া নিশাকর এবং যূথিকা উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

যূথিকা বলিল, "না, 'নিশাকর বালিকা বিদ্যালয়'ও নয়। আমার নাম হচ্ছে, 'যোগমায়া বালিকা বিদ্যালয়।'"

বিস্মিত কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "মার নামে?"

"হ্যাঁ, মার নামে। কেন, এ নাম পছন্দ হয় না তোমার?"

উৎসাহভঙ্গের স্তিমিত সুরে নিশাকর বলিল, "পছন্দ হয় না, তা বলিনে; তবে নারী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তোমার নাম যোগ হওয়ার বেশি সার্থকতা আছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। মার নামের স্মৃতিতে আমরা ত' অন্য কিছুও করতে পারি।"

যূথিকা বলিল, "কিন্তু ঠাকুরপো, স্মৃতিরক্ষা যে সব সময়ে দাবীর হিসেবেই করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। তা ছাড়া, পিসিমার মুখে শুনেছি, সন্ধ্যের পর পাড়ার গিন্নী-বান্নী বউ-ঝিদের নিয়ে মা নিয়মিত রামায়ণ মহাভারত পাঠ করতেন। সুতরাং মনসাগাছা স্ত্রী-শিক্ষা দানের দিক দিয়েও মার নামের দাবী ত কম নয়।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকরের দিকে চাহিয়া নিশাকর বলিল, "তুমি কি বল দাদা?

দিবাকর বলিল, "তোরা দুজনে একমত হ'তে পারছিসনে, তার মধ্যে আমি কি বলব?"

নিশাকর বলিল, "বা-রে! আজকের এ মীটিং-এর তুমি ত' প্রেসিডেন্ট। কাস্টিং ভোট ত' তোমার।"

দিবাকর বলিল, "তা যদি বলিস, তা হ'লে তোর বউদিদির দিকেই আমার ভোট।"

ঈষৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে নিশাকর বলিল, "তোমার ভোট ত' বউদিদির দিকে হবেই।" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি করি বল, তোমার জেদের কাছে হার স্বীকারই করলাম। কিন্তু পাঁচ ছ' বছর পরে যখন কলেজ হবে, তখন কারো কথা শুনব না, কলেজের নাম হবে 'যূথিকা গার্লস্ কলেজ।'"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে যূথিকা বলিল, "বেশ ত, তখন যদি এ জগতে কোথাও আমাকে খুঁজে না পাওয়া যায়, তা হ'লে ঐ নামই দিয়ো। কিন্তু, দোহাই তোমার, অসময়ে আমার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে বেঁচে থাকার লজ্জা আমাকে দিয়ো না।"

নিশাকর বলিল, "স্মৃতিরক্ষার পক্ষে বেঁচে থাকার সময় অসময়,—এ তোমার একটা কুসংস্কার!"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "কিন্তু কুসংস্কারকে কাটিয়ে ওঠাও ভারি কঠিন ঠাকুরপো।"

সপুলক আনন্দে দিবাকর স্ত্রী এবং সহোদরের কপট বিবাদ উপভোগ করিতে-ছিল; খসড়ার কাগজখানা যূথিকার হস্তে তুলিয়া দিয়া সে বলিল, "আজ কিন্তু এই পর্যন্তই। ঐ পূবদিকের বাগানে বকুল গাছের তলায় বেঞ্চে ব'সে যতক্ষণ ইচ্ছে তোমরা ঝগড়া করগে,—আপাতত আমি একটু পাঠে মন দিই।" বলিয়া টেবিলের উপর হইতে বইটা তুলিয়া লইল।

(শেষাংশ ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বটগাছের ইতিকথা

রেজাউল করীম এম এল, বি এল

সেবার আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহে রতনপুরের উপর দিয়া যে ঝড়টা বহিয়া গেল, তাহার প্রচণ্ড দাপটে সমগ্র গ্রামটা এক রকম উজাড় হইয়া গেল। প্রাচীন লোকেরা বলিল, গত পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যে এমন ভীষণ ঝড় এ অঞ্চলে হয় নাই। এই ঝড় সমগ্র গ্রামের উপর দিয়া যে বিপ্লবকাণ্ড বাধাইয়া দিল তাহার জের সামলাইতে গ্রামবাসীদের বেশী সময় লাগে নাই। কিন্তু এই ঝড় রতনপুরের পীর বংশের দুই শাখার মধ্যে যে বিপ্লব বাধাইয়া দিল কোথায় যে তাহার শেষ হইবে প্রথমে কেহ তাহা ভাবিতে পারে নাই। ভীষণতার দিক দিয়া বটে, স্থায়িত্বের দিক দিয়া বটে, এই বিপ্লব পীর পরিবারদের মজবুত ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিল। ঝড়ে ঘর বাড়ি ভাঙিয়া দিল, গাছপালা উলটাইয়া দিল, দুচারটা গরু বাছুরও নষ্ট করিল। কিছু দিনের মধ্যে কেহ সঞ্চিত ধন হইতে, কেহ ধার কর্জ করিয়া ঘর বাড়ি আবার মেরামত করিল। নূতন গরুবাছুর কিনিল। গাছপালাগুলিকে কাটিয়া ছাটিয়া জ্বালানি কাঠের ব্যবস্থা করিল। এবং কতক স্থানে নূতন গাছপালা লাগাইয়া গ্রামকে আবার সতেজ ও সবুজ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পীর পরিবারের মধ্যে যে বিপ্লব ও বিরোধ বাধিয়া গেল, তাহা ক্রমে কথাকাটাকাটি হইতে হাতাহাতি—হাতাহাতি হইতে লাঠালাঠি, লাঠালাঠি হইতে খুনোখুনী—এবং খুনোখুনী হইতে ফৌজদারী, দেওয়ানী ও হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াইয়া গেল। এই ধরণের গৃহবিবাদের শেষ পরিণতি যাহা হয় এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দুই পরিবার প্রথমে হইল ঋণজালে জড়িত—তারপর হইল সর্বস্বান্ত।

শুক্রবার সারাদিন ধরিয়া ঝিপ্‌ঝিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি হইতে লাগিল। চাষীরা মনে করিল বেশ ভালই হইল। আধমরা ধানগুলি এবার বাঁচিয়া যাইবে। সন্ধ্যার একটু পরেই বাতাস দেখা দিল। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। এবং রাত্রি দশ এগারটার মধ্যে তাহা ঝড় ও ঘূর্ণীবাত্যার আকার ধারণ করিয়া চারি দিকে প্রলয় নাচন শুরু করিয়া দিল। কি সে ঝড়! কি প্রচণ্ড তাহার শব্দ, কি দিগ্বিদারী তাহার ঝাপটা। মনে হইল, বুঝি পৃথিবী উলটাইয়া দিবে। ঝড় ও বৃষ্টি একই সঙ্গে সারা রাত হাত ধরাধরি করিয়া মাতামাতি করিয়া উষার প্রথম আভাষের সঙ্গে গ্রাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া গেল একটা বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের শ্মশানভূমি। সকালে উঠিয়া দেখা গেল গ্রামের অনেক কিছু ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকে তাহাতে তত আশ্চর্যান্বিত হয় নাই, যতটা হইয়াছে গ্রামের অতি প্রাচীন—অনুমান দুইশত বৎসরের দুইটি বট বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত হইতে দেখিয়া! কারণ তাহাদের ধারণা ছিল, এ আস্তানার গাছ পড়িবার নহে।

এই বটগাছ দুইটির খ্যাতি প্রতিপত্তি, শুধু ইহাদের প্রাচীনত্বের জন্য নহে,—ইহাদের পেছনে ছিল একটা ইতিহাস, একটা স্মৃতি একজন পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের কয়েক যুগ ব্যাপী সাধনার ছাপ। যখন রতনপুরের পীর পরিবারের প্রথম মহাপুরুষ শুভাগমন করেন, তখন তিনি এই বটগাছের নিকটে একটি ছোট বাড়িতে আশ্রয় লন। পরে এই দুইটি বটগাট স্বহস্তে রোপণ করিয়া ইহারই পার্শ্বে তাঁহার 'হিজরাখানা' (সাধনার ঘর) স্থাপন করেন। এইখানে তিনি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সাধনা করিতেন। আর যখন তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন, তখন দলে দলে লোক আসিয়া এই বটতলায় আশ্রয় লইত। কেহ গাছের নীচে মাটির ঘোড়া দিত, কেহ মিষ্টান্ন ছড়াইত। আবার কোন ভক্ত হিন্দু আসিয়া গাছে কাণ্ডে সিঁদুর পরাইয়া দিত এবং গোড়ায় দুধ ঢালিয়া দিত। উদার হৃদয় বড় হজরত সাহেব তাহাতে কোন বাধা দিতেন না। তিনি বলিতেন, যার যা ধর্মের বিধান সে সেইভাবে গুরুর সেবা করিবে। বটতলাটি এই ভাবে হিন্দু-মুসলমানের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। যিনি এই বটগাছ দুটির পত্তন করেন লোকে এখনও তাঁহাকে বড় হজরত বলিয়া মান্য করে। তাঁহার নামে "দোওয়া খয়রাত" করে। তাঁহার যে অন্য কোন নাম ছিল সে কথা লোকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল—হুসেন শাহ কেরমানী। কেরমান মুলুক হইতে আসিয়া তিনি এই দেশে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর এই বটতলার নিকট তাঁহার সমাধি হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে গাছতলায় সাধনা করিতে করিতে খোদার প্রেমে বিভোর হইয়া তিনি এইখানে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর সেই সাধনার স্থানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। সেই হইতে এই স্থানটি একটি মস্ত বড় আস্তানা হইয়া উঠিয়াছে। দেশদেশান্তর হইতে ভক্তরা আসিয়া এই বটতলার ধুলোবালি মাথায় দিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

এদেশে একটা প্রবাদ বচন আছে যে, মারোয়াড়ীরা বাঙলাদেশে লোটা কম্বল লইয়া আসে। আর কয়েক বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর লক্ষপতি হইয়া স্বদেশে চলিয়া যায়। বাঙলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলের নামজাদা পীর বংশের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ কোরআন শরীফ ও "জায়নামাজ" লইয়া এদেশে শুভাগমন করেন। কিন্তু পীরগীরির এমনি মহিমা যে দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ বিষয়-আশয়, জায়দাদ জমিদারী ইত্যাদি লাভ করিয়া কেহ লক্ষপতি, কেহ মস্ত বড় জমিদার, কেহ বড় বড় চাকুরে ও আমির হইয়া পড়েন। এবং যুগ যুগ ধরিয়া পূর্বপুরুষগণের কীর্তি ভাঙাইয়া পরম সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে থাকেন। তাঁহাদের সেই পীর বংশের সারল্য সে স্বল্পে তুষ্ট প্রবৃত্তি, সে সংসারে অনাসক্ত ভাব কিছুই থাকে না। যাহাকে বলে পাকা হিসাবী ও ঘোর সংসারী তাঁহারা তাহাই হইয়া পড়েন। কিন্তু আস্তানা, আখাড়া, নূরিদী ও দোওয়া তাবিজের দৌলতে তাহাদের দেশব্যাপী সুনামের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না। কথায় বলে বড় মাছের কাঁটাটাও ভাল। নামজাদা পীর বংশের খুদে পীরগণও সম্মান ও প্রতিপত্তিতে কাহারও অপেক্ষা কম নহেন।

রতনপুরের বড় হজরত কেরমানী সাহেব বাস্তবিকই সুফী ধরণের লোক ছিলেন। তিনি শুদ্ধ মাত্র "জায়নামাজ" ও কোরআন শরীফ সঙ্গে লইয়া এদেশে আসেন। তাঁহার সাধনার দৌলতে তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ এ অঞ্চলের নামকরা পীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। বড় হজরত সাহেব আজ দুইশত বৎসর হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই দীর্ঘ যুগে তাঁহার বংশের সারা গোষ্ঠির সংখ্যা পিতৃকুল, মাতৃকুল ও কন্যাকুল লইয়া দুইশতের কম হইবে না। বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলার মুসলমান প্রাচীন বংশের সহিত তাঁহাদের নানাভাবে নানা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এখন দেশের মধ্যে গণ্যমান্য লোক। তাঁহাদের এক শাখা বিশাল জমিদারীর অংশীদার হইয়াছেন। আর এক শাখা সরকারের অধীনে

চাকরীবাকরী করিয়া বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তৃতীয় শাখা জমিজমা চাষ আবাদ লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। এবং চতুর্থ শাখা পৈতৃক বৃত্তি পীরগীরি এখনও ছাড়েন নি। তাঁহাদের পৈতৃক যৎসামান্য সম্পত্তি ছিল, তাহা বিভাগ বণ্টন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা বিষয়-আশয়ের দিকে সেরূপ মন দেন নাই বলিয়া কোন দিনই আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারেন নাই। ফকীর বংশের লোক ফকীরী করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করেন। বহুদিন হইতে এই বংশের মধ্যে একটা নিয়ম হইয়া রহিয়াছে যে, যাহারা পীরমুরিদী করিবে, কেবল তাহারাই আস্তানার দখল পাইবে। অন্যদেরকে আস্তানার সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে। বর্তমানে আসগর আলি এই আস্তানায় গদীনসীন হইয়া দোওয়া তাবিজ লিখিয়া ও পীরমুরিদী করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে শিষ্যদের বাড়ি বেড়াইয়া সংসার গুজরান করিতেছেন। আসগর আলির পিতামহরা ছিলেন দুই ভাই। বড় ভাই সালামত আলির পৌত্র আসগর আলি। ছোট ভাই আজমত আলির পুত্র সন্তান না থাকায়, তাঁহার দৌহিত্র সুলেমান মিঞা এখন নানাজানের মোতা-মহের। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। সালামত আলি ও আজমত আলির মধ্যে আস্তানার অধিকার লইয়া বহু ঝগড়া বিবাদ হইয়া গিয়াছে। কৌলিক নিয়ম অনুসারে বড় ভাই গদীর মালিক হইতেছেন। কিন্তু তাহা হইলে ছোট ভায়ের সংসার চলে না। ছোট ভাই ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বটগাছ দুইটির অন্যটিতে বসিয়া তাবিজ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বড় ভায়ের আয় কমিয়া আসিল। এই লইয়া দুই ভায়ে ঝগড়াঝাঁটি কম হয় নাই। অবশেষে বংশের আর পাঁচজন আসিয়া পঞ্চায়েৎ বসাইয়া দুই ভায়ের মধ্যে একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন। তাহাতে স্থির হয় যে, বড় ভাই আস্তানায় বসিবেন। আস্তানা হইতে একটু দূরে একটি নিম গাছের সামনে যে ঘর ও বারান্দা পাড়িয়াছিল, সেখানে ছোট ভাই বসিবেন। যার কাছে যে শিষ্য ও নূতন মক্কেল আসে সে তাঁহারই নিকট তাবিজ ইত্যাদি লইবে। ইহাতে কেহ কোন বাধা দিতে পারিবে না। এই পঞ্চায়েৎ একটা বিষয়ে ভুল করিয়া গেলেন। তাঁহারা বিষয়সম্পত্তি গাছপালা ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির ভাগ বণ্টন করিলেন না। এই লইয়া পরে বহু ঝগড়া বিবাদ হইয়াছে। যাহা হোক শালিস অনুসারে বড় ভাই বটতলা দখল করিলেন আর ছোট ভাই নিমতলায় আসিয়া নূতন উদ্যমে পীরগীরি আরম্ভ করিলেন। এইভাবে কিছুদিন নির্ঝঞ্ঝাটে চলিল। উপস্থিত সালামত আলি ও আজমত আলি মারা গিয়াছেন। সালামত আলির পৌত্র আসগর আলি বটতলার গদী পাইয়াছেন। এবং আজমত আলির দৌহিত্র সুলেমান নিমতলার গদী জাঁকিয়া বসিয়াছেন। এইভাবে হয়ত তাঁহাদের আরও কিছু দিন চলিয়া যাইত। কিন্তু হঠাৎ আশ্বিনের ঝড় আসিয়া এক মহা বিপর্যয় ঘটাইয়া দিল।

(২)

ঝড়ের দুই দিন পর। নিমতলার হজরত সুলেমান মিঞা কতকগুলি বিদেশী রুগীর জন্য তাবিজ লিখিতে ব্যস্ত। ইহারা দূর দেশ হইতে আসিয়াছে। আর্থিক অবস্থা ভাল। কিন্তু বংশে চেরাগ দিবার জন্য ইহাদের কাহারও বাড়িতে সন্তানাদি বাঁচে না। কত তুক্‌তাক্‌, ঝাড়ফুঁক হইয়াছে। কত বৈদ্য হাকিম ও দৈবজ্ঞ দেখান হইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। রতনপুরের পীর সাহেবদের নাম শুনিয়া তাঁহাদের নিকট একটা ভাল তদ্‌বির ও তাবিজ লইবার জন্য আজ এই গ্রামে আসিয়াছে। তাহারা আসিয়াছিল বটতলার হজরতের সন্ধানে। কিন্তু নিমতলার হজরতের পৃষ্ঠপোষক মীর আলিনোওয়াজ ওরফে মীর সাহেব তাহাদেরকে পথে পাকড়াও করিয়া অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া এইখানেই লইয়া আসিয়াছেন। পথেই দেখা হইতে মীর সাহেব তাহাদের শুধাইলেন, "কোথায় যাওয়া হ'বে?" তাহাদের একজন বলিল, "বটতলার হজরতের নিকট তাবিজ আনতে।" মীর সাহেব—"ও! বেশ, চল আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি।" এই বলিয়া সে তাহাদেরকে নিমতলার নিকট লইয়া আসিল এবং বসিবার জন্য আসন বাড়াইয়া দিল। কিন্তু বড় নিম গাছ দেখিয়া তাহারা বলিল, "এ যে নিম গাছ! এত বটতলার আস্তানা নয়।" নিমতলার একটু নিকটে একটা ছোট বটগাছের চারা জন্মিয়াছিল। সেটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মীর সাহেব বলিলেন, "ঐ যে বটগাছ! ইনিই ত বটতলার হজরত সাহেব" তাহাদের আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাহারা সেইখানেই বসিয়া গেল; এবং হজরত সাহেবের নিকট নিজেদের বিবরণাদি বলিতে লাগিল।

বলাবাহুল্য বটতলার হজরত সাহেবও ঠিক এইভাবে দালাল নিযুক্ত করিয়া নিমতলার হজরতের লোক ভাঙাইয়া থাকেন। সেই উদ্দেশ্যে নিকটেই একটি ছোট নিম গাছের চারা লাগাইয়াছেন।

মক্কেলদের নিকট নগদ পাঁচ টাকা আদায় করিয়া হজরত সাহেব যথারীতি নানারকম তাবিজ দিলেন। কোনটা তাবিজ শুইবার ঘরের দরজার উপর লাগাইতে হইবে। কোনটা কোমরে বাঁধিতে হইবে, কোনটা জলে ভিজাইয়া সেই জল খাইতে হইবে। কয়েকটা শিশিতে তেল পড়িয়া দিলেন। খোদার নাম করিয়া এবং বড় পীর সাহেবকে স্মরণ করিয়া প্রত্যহ দুইবার সেই তেল মাখিতে হইবে। আর দিলেন কি একটা শিকড়। প্রত্যহ সকালে চল্লিশটি গোল মরিচের সহিত বাটিয়া খালি পেটে খাইতে হইবে। ইহাতেই তাহাদের ঘরে যথাসময়ে সন্তানের হাসি ফুটিয়া উঠিবে। তাহাদেরকে বিদায় দিবার সময় হজরত বলিলেন: "খোদা যদি তোমাদের ঘরে সন্তান দেন তবে এই আস্তানায় এক জোড়া কাল খাসি দিতে হইবে।" তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া খুশী মনে বাড়ি চলিয়া গেল।

লোকজন সব চলিয়া গিয়াছে। হজরত সাহেব একমনে কি একটা উর্দু কেতাবের পাতা উল্টাইতেছেন। এমন সময় আস্তে আস্তে মীর সাহেব আসিয়া বলিলেন "শুনেছেন কি! ওদিকের আস্তানার ও গাছ দুটো ঝড়ে পড়ে গেছে।"

"হাঁ শুনেছি বৈ কি!"

"দেখলাম বটতলার হজরত সাহেব লোকজন আনিয়ে গাছ দুটো কাটাবার বন্দোবস্ত করছেন। আচ্ছা, ও গাছে ত আপনারও ভাগ আছে। তবে উনি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞেস না করেই একাই কাটাবার ব্যবস্থা করছেন?

"বটেই ত! ও বটগাছ দুটোতে আমার অর্ধেক ভাগ আছে। গদী দুভাগ হয়েছে বলে কি ও গদীর গাছের অংশ থেকে বঞ্চিত হ'ব? তুমি এখনই যাও, ওঁকে বারণ করে দাও গে। ওঁকে বলবে ও গাছে আমারও অংশ আছে।"

মীর সাহেব যেন একটু চঞ্চল হইয়া বলিলেন, "হুজুর, আমাকে মাফ্ ক'রবেন। এসব আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপার, এতে আমাকে জড়াবেন না। আপনি বরং অন্য লোক দিয়ে বারণ করে দিন।"

বটতলার হজরতের নিকট খবর পহুঁছিতে বিলম্ব হইল না যে, নিমতলার হজরত তাঁর সাধের বটগাছ দুটোতে ভাগ বসাতে চান। তিনি ত রেগেই আগুন। এতবড় সাহস তার। এগুলো আমার বাপদাদার গাছ, এর উপর ওর কি অধিকার আছে? ওর বাপদাদার নিম গাছে আমি ত কোন দিন ভাগ বসাতে যাই নি।"

মীর সাহেব দৌড়ে এসে নিমতলায় খবর দিলেন, বটতলার হজরত কিছুতেই আপনাকে ও গাছের অংশ দিবেন না। ইহা নাকি তাঁর বাপদাদার মৌরুসী সম্পত্তি। এর ছায়া কাউকে, মাড়াইতে দিবেন না।

শুনিবামাত্র নিমতলার হজরত সাহেব চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন: "বাপ দাদার

জিনিস বললেই ত চলবে না। ওগুলো যে আমারও মা-নানার জিনিস। আমি তাঁদের ভাগ নিতে ছাড়ব কেন? গদী ভাগ হয়েছে, কিন্তু গাছ ত ভাগ হয় নি! এতদিন গাছ দুটো বেঁচে ছিল বলে গাছের ভাগ নেই নি। আজ কেন ভাগ নিতে ছাড়বো? সবগুলো উনি একা নিবার কে?"

বটতলার হজরতের নিকট হইতে উত্তর আসিতে বিলম্ব হইল না। "কে গাছ দুটোকে এতদিন ধ'রে ছেলের মত মানুষ করেছে? বছর বছর বর্ষার পর এক পাঁচ সাত টাকা খরচ করে গাছ দুটোর তলা বেঁধে দেওয়ায়? আমি এদের সেবা না করলে কোন দিন মরে যেত। এদের জন্য যা খরচ করেছি তার জন্য ত কোন দাবী নিমতলার নিকট চাইনি। এ গাছ আমার। গাছ দুটো পড়ে যাওয়াতে যদি কোন ক্ষতি হবে সে আমারই ক্ষতি। অন্য কেউ সে ক্ষতির ভাগী হবে না। যখন ক্ষতির ভাগ গ্রহণ করব, তখন লাভের অংশটাও আমারই প্রাপ্য।"

সঙ্গে সঙ্গে নিমতলার হজরতের নিকট হইতে উত্তর এল—গাছ দুটোর সেবা করেছেন, না চাকরী করেছেন। আর সেবা করলেই বা তাতে কি হয়েছে? সে ত গাছের জন্য নয়! তাঁর মুরিদ মক্কেল ঠিক রাখবার জন্য। আর খরচের কথা? কি এমন খরচ হয়েছে? তাও ত সে মক্কেলদের ঘাড় ভেঙে আদায় করা হয়েছে? দেশ বিদেশের কত মক্কেল আসে, তাদেরকে ধরেই ত কাজ সারান হয়! মিথ্যার জাহাজ কোথাকার! খরচ হয়েছে না হাতী হয়েছে। আমার এই নিমতলাকেও ত প্রতি বৎসর মেরামত করতে হয়। কি এমন খরচ হয়! আমরা পীরঘর। আমাদের আবার লোকজনের অভাব! আস্তানার গাছ মেরামত করতে পারলে কতলোক ধন্য হয়ে যাবে!

বটতলার হজরত জবাব দিলেন: "আর কি সে যুগ আছে যে লোকে বিনা মজুরীতে মুফতে আস্তানার জন্য খেটে দিবে। দেখুক না আমার হিসাবের খাতা! ঘরের ভিতর গিয়া একখানা খাতা বাহির করিয়া উপস্থিত। লোকদেরকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ গত বৎসরের হিসাব। ১৩ই ভাদ্র। বটগাছ মেরামতি খরচ ১০৮১০। আমি যাকে ছেলের মত মানুষ করেছি সে আমার না ত কার?"

নিমতলা হইতে জবাব আসিল। অমন খরচ সবাই লিখে রাখে। ওগুলো ত ভিনগাঁয়ের-মুরিদদের নিকট পয়সা আদায় করবার জন্য লেখা হয়ে থাকে। হুঁ আমার সাথে চালাকি। মনে নেই ওনার দাদা মরহুম একবার ঘর পুড়ে গিয়েছে বলে মফঃস্বলে গিয়ে টাকা আদায় করেছিলেন। মুরিদরা ধন্য হয়ে বহু টাকা তুলে দিয়েছিল। কিছুদিন পরে তাদের একজন গ্রামে এসে দেখে সব মিথ্যা। তখন কতকগুলি ছাই টাই দেখিয়ে বলা হয়েছিল যে, ঘর পোড়ার কথাটা নির্ভেজ সত্য ঘটনা। ও সব হিসাবের খাতা দেখিয়ে আমার সাথে চালাকি করা চলবে না। আর ছেলের মত মানুষ করেছেন তা কি হয়েছে। পরের জিনিষকে আদর যত্ন করলেই কি তা নিজের হয়ে যায়? ও গাছে আমার অংশ আছে। আমি কিছুতেই নিজের অংশ ছাড়বো না।

বটতলার হজরতও জাঁক করে বলে বসলেন: কার সাধ্য এর অংশ নিতে আসে? এই আমি গাছ কাটাতে আরম্ভ করলাম, যার সাধ্য থাকে এসে আমায় বাধা দিক। বলেই তিনি তাঁর লোকজনকে হুকুম দিলেন 'লাগাও'।

নিমতলার হজরতও আট দশজন লোক নিয়ে অন্য গাছটা কাটতে হুকুম দিলেন।

খট্ খট্ খট্ খট্—দুইটি বটগাছ হইতে কাঠ কাটার শব্দ উঠিতে লাগিল। বটতলার হজরত ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া তাঁর লোকজনকে হুকুম দিলেন—"লাগাও ওদের লোকদেরকে। এত বড় সাধ্য ওদের আমার গাছ কাটতে আসে। নিমতলার হজরত বসিয়া থাকিলেন না। তিনি হুকুম দিলেন "লাগাও।" দেখিতে দেখিতে দুই দলে মারামারি আরম্ভ হইল। আগে হইতেই লাঠিয়াল প্রস্তুত ছিল। তাহা কাঠ কাটিতে আসে নাই। আসিয়াছিল দাঙ্গা করিতে। দশ পনের মিনিটের মধ্যে দুজন লোক জখম হইয়া পড়িয়া গেল। তাদেরকে ঘায়েল হইতে দেখিয়া লোকজন কে কোথায় পলাইয়া গেল। বটতলা ও নিমতলার হজরতদ্বয় সেই সুযোগে নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় নিতে বিলম্ব করিলেন না।

লাঠালাঠির খবর শুনিয়া গ্রামের আর দশজন মাতব্বর লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণ দাঙ্গা থামিয়া গিয়াছে। লোক দুইটি সেইখানে পড়িয়া আছে। তাদেরকে ধরাধরি করিয়া ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। আলিম দফাদার গ্রামেই থাকে। সে এসে বলে দিল, "থানায় খবর দিতে চল্লাম। আপনারা সব ভায়ে ভায়ে মারামারি করবেন, আর মাঝ থেকে গরু ছাগলের মত মারা যাবে গ্রামের দরিদ্র লোকজন। আমি সহজে ছাড়ছি না। একেবারে দারোগাবাবুর নিকট গিয়া নিজেদের কাজের কৈফিয়ৎ দিন গা।" কিন্তু তাহাকে থানায় যাইতে হইল না। দুই পক্ষ হইতে ৫৲ করিয়া বক্শিস দিয়া সেদিনকার মত তাহাকে নিবৃত্ত করা গেল।

সেই দিন বৈকাল বেলায় গ্রামের দু'দশ জন মাতব্বর লোক বটতলা ও নিমতলার হজরতদেরকে মসজিদে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বয়সে প্রবীণ তিনি খুব ধমকাইয়া বলিলেন: তোমাদের কি জ্ঞান-গোচর নাই। সামান্য গাছের জন্য এত সব খুনোখুনির কি দরকার ছিল? আজ তোমাদের সব বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে হবে।" নিকটেই ছিল বটতলার হজরতের একজন খাস মুরিদ। সে দুঃখ করিয়া বলিল: "হায়রে কলিযুগ! একদিন দেখেছি, এই হজরতদের বাপদাদারা মধ্যস্থ হয়ে গ্রামের বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়ে দিতেন। আর আজ দেখছি কিনা, এঁদের ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার জন্য গ্রামের লোককে মধ্যস্থতা করতে আসতে হচ্ছে?" হজরতদ্বয়কে লক্ষ্য করে সে বল্লে, হুজুর, কেন আপনারা এ সব সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া করেন? এ আস্তানার গাছ। আপনারা এর অংশ নিয়েই বা কি করবেন? এ কি আপনারা ঘরের কাজে পোড়াতে পারবেন?" বটতলার হজরত বল্লেন: "এ গাছ আমার জন্য হারাম। ছেলে-পুলে নিয়ে বাস করি; আস্তানার কাঠ আর বাড়িতে জ্বালতে দিব না।" নিমতলার হজরতও বলে উঠলেন: "আমি কি নিজের ঘরে জ্বালাবার জন্য এ গাছের দাবী করছি! আমার অধিকার আছে তাই আমি দাবী করছি। আমি গাছের অংশ নিয়ে লোকজনকে বিলিয়ে দিব।"

তাঁদের কথা শুনে মুরিদটা বলতে ছাড়ল না: "যে জিনিস আপনারা নিজেরা ভোগ করবেন না, ত নিয়ে অনর্থক কেন ঝগড়া করেন। আমি বলি, এ গাছ কারুর নয়; এ গাছ আস্তানার। আস্তানার কাজে এ গাছ ব্যবহৃত হবে। গাছ দুটি বিক্রী করে আস্তানাটা মেরামত করা যাক। মেরামতের অভাবে আস্তানার অবস্থাটা দিন দিন শোচনীয় হয়ে পড়ছে।" এই প্রস্তাবে গ্রামের সকলেই সন্তুষ্ট হইল। তখনই গাছ দুইটির দাম ঠিক হইয়া গেল। গ্রামের পীর বংশের সৈয়দ ফজলে আলি নগদ ত্রিশ টাকা দিয়া গাছ দুইটি কিনিয়া লইলেন। স্থির হইল এই টাকা দিয়া সময়মত আস্তানাটা মেরামত করা হইবে। নিমতলা ও বটতলার হজরতদের মধ্যে কেহই ইহাতে অমত করিলেন না।

৩

আপাতত মনে হইল গোলমাল সব মিটিয়া গেল। কিন্তু বটগাছের জের এই খানেই শেষ হইল না। যে দুইজন লোক জখম হইয়াছিল, দশ বার দিন পরে তাহাদের একজন, কালু তার নাম, মারা গেল। ধামা চাপা দিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইল। উভয় পক্ষের প্রায় তিন শত টাকা খরচও হইল গেল। কিন্তু সি আই ডি'র হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গেল না। তাহারা গোপনে

গোপনে আসামী ধরিয়া ফেলিল। বহু টাকা ব্যয় করিয়া হজরতদ্বয় আসামীর তালিকা হইতে বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু দাঙ্গাকারীরা রেহাই পাইল না। তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইল। যথাসময়ে নিম্ন-কোর্ট হইতে মামলা দায়রা কোর্টে সোপর্দ হইল এবং বিচারান্তে প্রত্যেকের সশ্রম চারি বৎসর কারাদণ্ডের হুকুম হইল। দণ্ডের খবর শুনিয়া কালুর বাড়ির মেয়েরা কাঁদিয়া পড়িল হজরতদের দুয়ারে। "ওগো, আমাদের কি হবে গো! ও আপনাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। এখন ওর মেয়েছেলেকে রক্ষা করুন?" গ্রামবাসী বলিলঃ "তা ত বটেই। হাইকোর্টে আপীল করতে হবে।" কিন্তু হাইকোর্টে আপিলের জন্য টাকার দরকার। এত টাকা হজরতরা কোথায় পাইবেন? চক্ষু লজ্জার খাতিরেও টাকাটা যোগাড় না করিয়াও পারিলেন না। যদু পোদ্দার এ অঞ্চলের নামজাদা মহাজন। সে লোকের বিপদে আপদে টাকা ধার দিতে কখনও কার্পণ্য করে না। হজরত বংশের পশ্চিম মাঠের আয়মা জমির উপর তার বরাবরই লোভ ছিল। সুযোগ হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে উৎকৃষ্ট দশ বিঘা জমি বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার দিতে স্বীকৃত হইল। হজরতরা আর কি করিবেন? চাষের উৎকৃষ্ট জমিগুলি পোদ্দারের নিকট বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইলেন। পোদ্দারের টাকাতে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা হইল। কিন্তু বিশেষ ফল হইল না। মাত্র ছয় মাসের দণ্ড হ্রাস করা হইল। জমির এক টাকাও ঘরে আসিল না। কতক হাইকোর্টের খরচায় ব্যয় হইল। কতক কালুর পরিবারবর্গকে দিতে হইল। আর বাকী টাকা মোসাহেব ও তদবিরকারগণের পেটে গেল। বলা বাহুল্য, এই সুযোগে মীর সাহেবও একটা দাঁও মারিতে ছাড়েন নাই।

এত বিপদ ও মামলা মোকদ্দমার পরেও বটতলা ও নিমতলার হজরতদের মনের মিল হইল না। পূর্বপুরুষদের বহু সম্পত্তি তাঁহারা ইতিপূর্বে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। শেষ চিহ্নস্বরূপ যে কয় বিঘা জমি এখনও দখলে রহিয়াছিল সেগুলিও মহাজনের বাড়িতে বাঁধা পড়িল। হাওলাতী ধারের পরিমাণও কম নহে। ঘরে জিনিসপত্র নাই বলিলেই হয়। এ বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে মুরিদ মক্কেলের নিকট হইতে প্রচুর টাকা পাওয়া যায় না। যৎসামান্য যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই কোন রকমে সংসার চলে মাত্র। কষ্টের শেষ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহাদের আধ্যাত্মিক তেজ নষ্ট হইয়াছে? না তাহা মোটেই নয়। দুই হজরতের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ। খাওয়া-দাওয়া হারাম। যাওয়া আসার পথ রুদ্ধ।

গোবে কৈবর্ত আসিয়া নিমতলার হজরতের নিকট সংবাদ দিলঃ "হাট পুকুরের মাছ ধরান হবে। আপনার লোক পাঠিয়ে দেন।" এ সব কাজে মীর সাহেব তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। তিনি গিয়া সব দেখা শুনা করেন। দু'একটা ছোট-খাট মাছ তাহার ভাগ্যে জুটিয়া যায়। কৈবর্ত সংবাদ দিয়াই বটতলার দিকে চলিল। মীর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওদিকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?" গোবে বলিল, "বটতলার হজরতকে সংবাদ দিতে।" হজরত সাহেব শুনিয়া ত রাগিয়া আগুন হইয়া বলিলেন, "ও হাট পুকুরে ত বটতলাওয়ালার অংশ নাই। আজ চৌদ্দ বৎসর ধরে আমি উহার মাছ পেয়ে আসছি। ওঁকে কেন খবর দিতে যাবে?" গোবে বলিল, "কি জানি হুজুর, আপনাদের ব্যাপার বুঝা দায়। ওদিকে উনি আজ দু'দিন হল বলে গেছেন হাট পুকুরের মাছ ধরাবার সময় তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।" গোবে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল।

একঘণ্টা পরের কথা। হাটপুকুরের পাড়ে ৩০।৪০ জন লোক লাঠি লইয়া বচসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নিমতলার হজরত হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বলিয়া যাইতেছেন। "এ পুকুরে বটতলার হজরতদের কোন অংশ নাই। যে মাছ নিতে আসবে তার পা ভেঙেগ দিব।"

বটতলার হজরত উত্তর দিলেন ঃএ পুকুর আমার পূর্বপুরুষের, এতে আমার অর্ধেক অংশ আছে। আমি ইহার মাছের অংশ কিছুতেই ছাড়ব না। এতদিন মাছ নিই নাই বলে কি আজ তা ছেড়ে দিব?"

এবার আর দাঙ্গা হইল না। কেবল বচসা ও কথাকাটাকাটি সার হইল। গ্রামের মাতব্বরগণ পুকুরপাড়ে ছুটিয়া গেলেন। কি জানি, আবার একটা ফৌজদারী হইয়া যায়। দাঙ্গাটা তাঁহারাই বন্ধ করিয়া দিলেন। গোবে তাহার দলবল লইয়া মাছ ধরিল। কিন্তু সে মাছের অংশ হজরতদের কেহই পাইলেন না। অন্য লোকে লুটিয়া লইল। মীর সাহেবের বাড়ীতে সের পাঁচেকের একটা রুই মাছ হাজির হইল। ব্যাপারটা আদালতে গিয়া গড়াইল। মীর সাহেব নিমতলার হজরতের পক্ষ হইতে দেওয়ানী আদালতে একটা স্বত্বের মামলা রুজু করিলেন। দুই বৎসর মামলা চলিল। বটতলার হজরতের চারি আনা অংশ সাব্যস্ত হইল। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পুকুরের চারি আনা অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল।

গ্রামের উত্তর মাঠে হজরতদের একটা আমের বাগান ছিল। বটতলার হজরত বহু দিন যাবৎ বাগানের আম ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তিনি কয়েকটি নূতন চারা গাছও লাগাইয়াছেন। এবার বাগানে বিস্তর আম আসিয়াছে। অন্যান্য ছেলেদের মত মীর-সাহেবের ছেলেটা বাগানে গিয়াছিল আম কুড়াইতে। কিন্তু আগুনদার তাহার কাণ মলিয়া দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। মীর সাহেব ত রাগিয়া আগুন। বৈকাল বেলায় সে নিমতলার হজরতের নিকট গিয়া বলিলঃ "হুজুর ও বাগানে ও আমার অংশ আছে। আপনার নানজনেকে আমি আম পড়তে দেখেছি।" হজরত বলিলেন ঃ "হাঁ আছেই ত? উনি অন্যায় করে আমার অংশ দেন না।" মীর সাহেব বলিলেন ঃ "তবে এক কাজ করা যাক। এবার আর দাঙ্গা হাঙ্গামার দরকার নাই। বাগানের অংশের জন্য একেবারেই স্বত্বের মামলা রুজু করা যাক।" যেমন কথা তেমনি কাজ। স্বত্বের মামলা দায়ের করিবার সমস্ত ভার মীর সাহেব গ্রহণ করিলেন। মামলা দায়েরের কয়েক দিন পরে বটতলার হজরতের উপর ইনজাংশন জারী হইল, তিনি মামলার চরম নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাগানের আম লইতে পারিবেন না। বাগানের আম বাগানেই রহিয়া গেল। পাড়ার ছেলেরা যে যত পারিল আম লুটিয়া লইল। কিন্তু সে বৎসর হজরতদের কেহই আম ভোগ করিতে পাইলেন না।

* * *

আজ কয়েক দিন হইতে আসগর আলির একমাত্র মেয়ে লতিফা জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। প্রথমে কম্প দিয়া জ্বর আসে। ম্যালেরিয়া মনে করিয়া চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। রোগী দুইচার দিন বিনা ঔষধে পড়িয়াছিল, তারপর ডবল নিউমোনিয়া দেখা দিয়াছে। এখন টাইফয়েডে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতে একটাও পয়সা নাই যে ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ডাক্তার না দেখাইলেও নয়। মেয়েকে ত আর অবহেলায় ফেলিয়া রাখা যায় না। মেয়ে বিকারের ঘোরে বলিতে লাগিলঃ "আব্বা, কাঁচামিষ্টি গাছের আম" আব্বা আর কি করেন! হাট হইতে এক পয়সার কাঁচ আম কিনিয়া আনিয়া মেয়ের হাতে দিলেন। কিন্তু মেয়ে বাগানের সে আম চিনিত। হাটের এ টক আম দেখিয়া ফেলিয়া দিল। "আব্বা এ আম ভাল না, আমি এ আম চাইনা। সেই কাঁচামিষ্টি আম এনে দাও।" এই বলিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেনঃ "আগে ভাল হও! তারপর কত কাঁচমিষ্টি গাছের আম এনে দিব।" মা চোখে আঁচল দিয়ে পাশের ঘরে গিয়া

(শেষাংশ ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মলিন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

সেদিন ঘুম ভাঙিতে দেখিলাম পাশের বাড়িতে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছে। হৈচৈ, বচসা কলরবে পাশের বাড়িতে তুমুল উত্তেজনাময় পরিস্থিতি। পাড়ার ছেলেবুড়ো যুবক প্রৌঢ় একে একে বহুজন আসিয়া সমুপস্থিত—কোলাহলের কলরবে সবাই মুখর।

পাশের বাড়ির একতলার বাসিন্দা রামশরণবাবু শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোক—তাঁহার ঘরে এই অশান্তির প্রবাহ দেখিয়া খানিকটা বিস্ময়ান্বিত হইয়া উঠিলাম।

গৃহিণী আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—ওগো ওদের বাড়ি একবার যাও—ভদ্রলোকের ভারী বিপদ ঘটে গেছে।

আমি প্রশ্ন করিলাম ব্যাপার কী?

মলিনা পালিয়েছে কাল রাত্রির থেকে তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

—পালিয়েছে? কোথায় পালালো?

গৃহিণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন—যমের বাড়ি—না, যমের বাড়ি গেলেও ছিলো ভালো তাতে তবু কোন কলঙ্কের ছায়া নেই। ভদ্রলোকের মুখে একেবারে চূণ কালি মাখিয়ে দিলে গা! আহা, অমন মা বাপ তাদের মেয়ে হয়ে কিনা একেবারে বংশের মুখ ডুবিয়ে দিলে—আরও চার পাঁচটি আইবুড়ো মেয়ে ভদ্রলোকের—নিজের সর্বনাশ তো করলেই তারপর আবার মা বাপকে চিরকালের শাস্তি দিয়ে গেল।

রহস্যটা কিছুটা হৃদয়ংগম করিলাম। গৃহিণীর সহিত এ বিষয়ে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া পাশের বাড়ি গিয়া সমুপস্থিত হইলাম।

পরিমন্ডল তখন ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে।

বৃদ্ধেরা একবাক্যে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন—ঘোর কলি হে ভায়া, ঘোর কলি! শেখাও মেয়েদের লেখাপড়া, গান বাজনা—এখন বোঝ তার ঠেলাটা কত দূরে গড়ায়! বলি শাস্ত্রকাররা কী বোকা ছিলেন, না তাঁরা অন্ধ ছিলেন? দিব্যদৃষ্টিতে এই সব পরিণতি দেখেছিলেন, তাই না গৌরীদান প্রথা! এখন সব মেয়েদের ধিঙ্গী মেমসাব গড়ে তুলছেন—এ সব তো হতেই হবে—এতে আর আশ্চর্য হইবার আছে কী?

প্রৌঢ়ের দলের রক্তের তেজ কমিয়া আসিয়াছে—অদৃষ্টবাদের দোহাই দিয়া প্রসংগটা চাপা দিতেই চাহিতেছিলেন—ছেড়ে দিন মশাই ছেড়েদিন ওসব নোঙরা কথায় আর কাজ কী? যা হবার তা হয়ে গেছে। ও মেয়ের আর মুখ দর্শন করবেন না রামশরণবাবু। যে মেয়ে বংশের মুখ ডোবালে—বাপ মা ভাই বোন সমাজ সংসার কোন কিছুর দিকেই তাকালে না—কিসের আবার মায়া তার জন্যে? ও হতভাগিনীর পাপ মুখ মন থেকে মুছে ফেলে দিন।

আধ প্রৌঢ়েরা বলিতেছিলেন—না না, রামশরণবাবু কেস করুন আপনি—এখুনি পুলিশে খবর দিন! এ শুধু আপনার ব্যক্তিগত কলংক নয়—এ কলংক সারা পল্লীর, সারা সমাজের। এর শাস্তি শুধু তো অপরাধীর জন্যেই নয়—ভবিষ্যতে যাতে এ পাপ সংক্রামিত না হয়ে উঠতে পারে সমাজে তার দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে।

তরুণের দল বলিল ব্যাপারটা যে কুৎসিত তাতে কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু ধরুন তারা যদি বিয়ে থা করে সৎভাবে সংসারধর্ম প্রতিপালন করে, তাতে আর সমাজের ক্ষতিটা কী? বরঞ্চ এর ভালোর দিকই দেখা যায়। মেয়েটার বিয়ে থা হচ্ছিল না সংসারের কাছে মস্ত অপরাধিনী হয়েছিল সে তার বোঝা সংসার থেকে সরিয়ে নিয়েছে, নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করেছে—আপনারা এ নিয়ে আর মিথ্যে হাঙ্গামা করছেন কেন?

তরুণদের কথায় প্রবীণেরা রুখিয়া উঠিলেন—থামো থামো সব অকালপক্কের দল—ভারী সব সমাজতান্ত্রিক! বলি এত যদি মমত্ব বোধ, তবে বিয়ের ব্যাপারে সুবোধ বালকের মতন পিতৃভক্ত রামচন্দ্র হয়ে ওঠো কেন? বিনা পণে বিয়ে করতে তো কাউকে দেখি নে—ফুসলে মেয়ে বার করতে সব সাহসী বীরের দল খুব বুকের পাটা দেখাও।

রামশরণবাবু নির্বিকার—প্রচণ্ড আঘাতের বেদনায়, অপমানের সুতীব্র হলাহলে স্তব্ধ হইয়া গেছেন।

ভিতরে গৃহিণী তাঁহার বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছেন, আর পলাতক আসামীর প্রত অতি কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করিতেছেন—মেয়ে আমার সতীলক্ষ্মী গো—ওই হারামজাদার কুমতলবে আমার এমন সব্বনাশটা হয়ে গেল।

রামশরণবাবুকে কিছুই বলিবার ছিল না। পাড়ার হিতৈষী দলকে অনুনয় করিয়া বলিলাম—আপনারা দয়া করে এখন সব যান। ভদ্রলোকের এই বিপদে ওঁকে এখন খানিকটা একলা থাকতেই দিন। আপনাদের সামনে উনি আরও যেন লজ্জা পাচ্ছেন!

পাড়ার অপরাপর সকলের সহিত আমিও চলিয়া আসিলাম।

মলিনাকে আমি জানিতাম।

তাহার এই অন্তর্ধানের মূলে যে সকরুণ বেদনা এবং সামাজিক কুপ্রথার বিষ রহিয়াছে—যাহার দুঃসহ বেদনায় জর্জরিত হইয়া সে অন্ধের মতন পথভ্রান্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহার প্রতি সমবেদনাশীল দৃষ্টি দিবার ঔদার্য আমার ছিল। আমি দেখিয়াছি, মলিনার মলিন জীবনের লাঞ্ছনাময় ইতিহাস। মলিন বর্ণ কৃশ তনু মেয়েটি চোখে মুখে মালিন্যের রেখা, নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতার নিদারুণ অভিশাপের ফলে অতি সাধারণ কেরাণীজীবীর গৃহে এক পাল ছেলেপিলের মাঝে অকরুণ অবস্থায় লালিত পালিত হইয়াছে। বাপ পাশের বাড়ির নীচের ভাড়াটিয়া রামশরণবাবু মলিনার তের বৎসর বয়সের সংগে সংগেই পাত্র খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তের হইতে আজ বয়স প্রায় তেইশ হইল বাঙলাদেশে আজও উপযুক্ত পাত্র মেলে নাই।

মলিনা সংসারের বোঝা—মা, ভাই, আত্মীয়-স্বজনের চক্ষুশূল। ভূতের মতন পরিশ্রম করিয়া সংসারের দাসীবৃত্তির মাঝে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংগে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করে।

বহু পাত্র মলিনাকে দেখিতে আসিয়াছে—বর্ণ কালো, পিতা উপযুক্ত বর-পণ প্রদানে অসমর্থ, সুশিক্ষিতা নহে এবং সংগীত বিদ্যায় সুদক্ষতা অর্জন করে নাই—অতএব প্রতিবারেই অগ্নি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছে। দোষ সমস্তই তাহার পোড়া অদৃষ্টের। বাঙলা মাটির কুফল, অতএব মলিনার জীবন-কাহিনী মলিন।

মলিনা কুলত্যাগ করিয়াছে।

আজন্ম সংস্কারাচ্ছন্ন নীতিবান সংসারে চরম দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়াছে সে। কোথাকার কে এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবক বর্ণজাতি গোত্রের সহিত কোনকালে যাহার মিল হইবার কথা নয়, সেই লম্পট যুবক কয়েকদিন মাত্র গান শিখাইতে আসিয়াছিল মলিনাকে—তাহারই সহিত একদিন সন্ধ্যায় সে গৃহত্যাগ করে।

যাইবার সময় আঁকাবাঁকা অক্ষরে সে

তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়া গেছে—নিজের চরম অপমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে আজ তোমাদের অপমান করে গেলুম। তোমাদের সামাজিক উন্নত শির বহু অযোগ্যের পায়েই বার বার অবনত হয়েছে। আমার এ অপরাধে তার গুরুত্ব আরও অনেক বেড়ে যাবে জানি—কিন্তু তোমাদের গলার কাঁটা অন্তত নামলো এই ভেবেও আমি যথেষ্ট আত্ম-সান্ত্বনা লাভ করছি। যে ভাষায় আজ তোমাদের এই চিঠি লিখছি—সে ভাষা তোমাদের কাছ থেকে পাইনি। তোমাদের কাছে থাকলে কোনদিন পেতুম কিনা তাও সন্দেহ আছে। এ ভাষা শিক্ষা করেছি আমার জীবন-গুরুর কাছ থেকে—যিনি আজ আমাকে নতুন জীবনের দীক্ষা দিলেন। তোমাদের মেয়ে বলে শুধু নয়—বাঙলা দেশের কুরূপা হতভাগিনী বলে পারো যদি তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। ইতি—

কলংকিনী মলিনা।

চিঠিখানি গোপনে আমার হাতে দিয়া রামশরণবাবু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, সত্যিই তো রামশরণবাবু মেয়ের বিয়ের যে সমস্যা আমাদের এই পোড়া বাঙলাদেশে, সেখানে মেয়েরা যদি নিজেদের সমস্যার ভার নিজেরা নিতে পারে, তাতে আপনার আমার বাধা দেবার কী অধিকার আছে? মলিনার বিয়ের জন্যে বহুদিন ধরে অনেক চেষ্টাই করেছেন—নিজে তো লাঞ্ছিত হয়েছেনই তাকেও বহু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। আপনি তাকে ক্ষমা করুন—তাদের নব-জীবনযাত্রায় আপনারা আগে গিয়ে আশীর্বাদ করুন! আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি এর থেকে সুপাত্রে আপনি নিশ্চয়ই কন্যা সম্প্রদান করতে পারতেন না।

—আমি তাকে ক্ষমা করেছি সুবোধ-বাবু। আমি অনুপযুক্ত পিতা—মেয়ে বলে তাকে আমি যথেষ্ট অপমান করেছি—তার নারীত্বের কোন মর্যাদাই দিইনি। বাজারের পণ্যের মতন দিনের পর দিন তাকে নিয়ে সমাজের দরজায় দরজায় ফিরেছি—পাত্রপক্ষদের হাতে পায়ে ধরেছি। রঙ কালো—শিক্ষিতা নয়—ধনসম্পদে তার দেহের দোষত্রুটি ঢেকে দিতে পারিনি—এর জন্যে কত লাঞ্ছনাই না পেয়েছি। বাঙলা দেশের আধুনিক ছেলেদের 'আদর্শমত তাকে গড়ে তুলতে পারি নি—এ ত্রুটির সংশোধন সে নিজেই করেছে। গান না জানলে আজকাল বিয়ে হওয়া দায়, তাই নিরুপায় হয়ে ওই ছেলেটিকে সংগীত শিক্ষক রেখেছিলাম—তাও তাকে বেতন দেবার যোগ্যতা ছিল না। তার বিনিময়ে এ ঘটনা ঘটা আর আশ্চর্য কী? কিন্তু সংস্কার যে কী বালাই মশাই, মন থেকে কিছুতেই ধুয়ে মুছে ফেলতে পারছি নে। রামশরণবাবুর দুই চক্ষু বহিয়া পুনরায় অশ্রু বিন্দু গড়াইয়া পড়িল।

তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, এ আপনার দুর্বলতা—আজকাল অসবর্ণ বিয়ে এমন অনেক হচ্ছে। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে তো?

রামশরণবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, সিভিল ম্যারেজ করেছে। পরশু বৌভাত—আমাকে যাবার জন্যে বিশেষভাবে কাকুতি মিনতি জানিয়েছে।

—বেশতো যান না—এতে আবার কিন্তু করবার কী আছে?

—কী করে যাই বলুন? আরও চার পাঁচটে মেয়ে মাথায় মাথায় হয়ে রয়েছে—তাদের তো আবার বিয়ে-থা দিতে হবে? এইতেই দেখুন কী ক্ষতিটা আমার করে গেল। একে টাকা নেই, তায় মেয়েগুলো সব কুৎসিত!

আমি কহিলাম—সে ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতে ভাববেন। মেয়েদের সব উপযুক্ত শিক্ষা দিন।

কোথায় পাবো সে টাকা? এমনি সংসার অচল মশাই—এই দুর্মূল্যের বাজারে ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। রামশরণবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

আমি কহিলাম—পরশু বৌভাতে যদি যান, তবে আমায় খবর দেবেন। আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।

—আপনি যাবেন? আপনি এই অসামাজিক বিয়ে সমর্থন করবেন?

নিশ্চয়ই করবো—যাতে দেখছি সত্যি-কারের অন্যায় কিছুই নেই। এই জাত, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, এদের গণ্ডী দিয়েই তো সমাজকে এত সংকীর্ণ করে তোলা হয়েছে—আজকের এই আর্থিক অবনতির ফলে সামাজিক এই বিধিনিষেধের জন্যেই বাঙলা দেশে মধ্যবিত্ত পরিবারে বিয়ের সমস্যা এত প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রামশরণবাবু খুসি মনে বাড়ি ফিরিলেন।

তাঁহার অন্তর্ধানের পর গৃহিণী আসিয়া হাজির হইলেন। তীব্র ঝাঁঝালো কণ্ঠে কহিলেন, কিছুতেই এমন অলক্ষণে কাজে তুমি যেতে পারবে না। ছিঃ ছিঃ, এমন ঘেন্নার ব্যাপারে তুমি আবার সমর্থন করছো?

—কেন এতে দোষটা কোথায় দেখলে তুমি?

—দোষ নেই? জাত ধম্ম খুইয়ে সমাজের মুখে চুণ কালি দিয়ে বাপ মায়ের মাথা হেঁট করিয়ে এই কুৎসিত কাণ্ডটা যা করে বসলো ছুঁড়িটা, এ অপরাধের মার্জনা আছে?

—কিন্তু তোমাদের আদর্শ সমাজে গরীব বাপ মায়ের মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে সাধ্যাতীত ব্যাপার! তোমাদের ছেলেদের মত কিছু আচার বিচার আর আভিজাত্য এই বিয়ের ব্যাপারেই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতা লাভ করে পরাজয়ের মত কিছু কালিমা সব ঢেকে ফেলে দেয় বিয়ের আসরে। ওই কালো মেয়েটা তার বিড়ম্বিত জীবনে আর কী করতো পারতো?

—কী করতে পারতো সে ভাবনা তো মেয়ের নয় তার বাপ মা বর্তমান থাকতে, এতই যদি বোঝা হয়েছিল তাহলে তো কিছু করতে না পারলে মরতেও তো পারতো! এখন ওর বাপ মার কী অবস্থা বল তো—পাঁচ পাঁচটা মেয়ে—এই কলঙ্কের কাহিনী শুনে কে বাপু ও বাড়িতে ফের বিয়ে করতে যাবে? না বাপু, এ ব্যাপারে তোমার যাওয়া চলবে না। আমাদেরও তো মেয়ে রয়েছে—আর ডাগর ডোগরও হয়ে উঠেছে, সমাজে তাকে বিয়ে থা দিতে হবে। কাজ কী তোমার পরের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে?

গৃহিণীর কথায় আমার সংস্কার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। আমার মেয়ে বড় হইয়া উঠিতেছে, সমাজে তাহাকেও পাত্রস্থ করিতে হইবে। কুলশীল মান ইজ্জৎ বজায় রাখিয়া মলিনার জন্য আমার মাথা ব্যথার দরকার কী? বাঙলাদেশে শত শত মলিনা রহিয়াছে। মলিন জীবনধারার মাঝে নিত্যই তাহারা মরিতেছে। এক্ষেত্রে পাশের বাড়ির কুল-ত্যাগিনী মলিনার জীবনের ইতিবৃত্তের উপ-সংহারে সংস্কার এই বলিয়াই আত্মপ্রবঞ্চনা লাভ করিল—মলিনা তো মরিলেই পারিত।

বাউল ও বৈষ্ণব

অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী

'বিশ্বকোষ' সঙ্কলয়িতা বলেছেন যে বাউলেরা বৈষ্ণব। এই উক্তি যে অন্তত আংশিকভাবে ভ্রান্ত মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীন সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন,—"বাউলের মধ্যে এক-দল অবশ্য বৈষ্ণব আছে, তাই বলিয়া সকলেই বৈষ্ণব নয়। তাহারা যেমন বৈষ্ণব নয় তেমনি আবার মুসলমান সুফীও নহে। তাহারা সকলে বাউল।" অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ও বাউল ও বৈষ্ণবের এই ব্যবধান নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে "চর্যাপদের পর হইতে বাঙলা গীতি-কাব্য দুই ধারায় চলিয়া আসিয়াছে। এক ধারা অধ্যাত্ম ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক ছড়া ও গান, অপর ধারা পদাবলী।" বলা বাহুল্য, বাউল সাহিত্য এই দুইয়ের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত এবং দ্বিতীয় শ্রেণী বৈষ্ণব সাহিত্যের নামান্তর মাত্র। শ্রেণী বিভাগ যেভাবেই করা হোক না কেন, সুর, তাল ও বাইরের আকারের ব্যবধান বজায় থাকলেও, ভাবের দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রেই উভয়ের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। সেন মহাশয় বলেন,—"বাঙলার বাউল ও জিকির—খানিক বৈষ্ণব খানিক সুফী-ভাবে ইহারা অনুপ্রাণিত।"

বাউল ও বৈষ্ণব উভয় ধর্মমতাবলম্বীরই প্রধান অবলম্বন ভক্তি। ভক্তিতে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর—তাঁরা উভয়েই এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছে। কাজেই তাদের সাধন-ভজন প্রণালীও কতকাংশে অনুরূপ। বৈষ্ণবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যমান, বাউলের অধর-চাঁদও সেই ভক্তি-অর্ঘ্য পান। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—বৈষ্ণবের এই পঞ্চ রসের সাধনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, বাউলের পরমপ্রেমাস্পদকে পাওয়ার প্রণালীর সাথে তার বড় প্রভেদ নেই।

বাউল ও বৈষ্ণবের ব্যবধান যে খুব বেশি নয় বাঙলার বাউলকুলচূড়ামণি লালন ফকীরের বিভিন্নভাবের বহু গানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তিই যে সকল ধর্মের সার এবং ভক্তির দ্বারা অসম্ভবকেও যে সম্ভব করা যেতে পারে লালন তা জানেন। তিনি গেয়েছেন :

"সাধনে পাইব তোমায়, সে ক্ষমতা নেই হে আমার,
দয়াল নাম শুনিয়া আসা, দয়া কর কাঙ্গালে।
জগাই মাধাই পাপী ছিল, কাঁধা ফেলে গায় মারিল,
তাহে প্রভুর দয়া হ'ল, দয়া কর ঐ হালে।"

ভগবান ভক্তের অধীন। বৈষ্ণবের ন্যায় বাউলের কাছেও জাতিভেদ, ছুৎমার্গের কোন মূল্য নেই। উপরন্তু যে সমাজে এ জাতীয় সংস্কার স্থান পায় সে সমাজ বাউল বৈষ্ণবের সাধনার পথে অন্তরায়-স্বরূপ। লালন তাই কটাক্ষ করে বলেছেন :

"জগন্নাথে দেখরে যায়ে
চণ্ডালে এনে দেয় অন্ন, ব্রাহ্মণে তাই খায় চায়ে
ধন্য প্রভু জগন্নাথ, সে চেনে না জাত অজাত
ভক্তের অধীন সে
যত দুরাচারী কুলবিচারী
সে দূর করে দেয় খেদায়ে।"

বৈষ্ণবের যে পঞ্চ রসের সাধন, লালন-সাহিত্যে তার সুষ্ঠু প্রকাশ সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শান্তরস সাধনের ইঙ্গিত রয়েছে লালন ফকীরের একটি গানের নিম্নোদ্ধৃত অংশে :

"স্বরূপ রূপের রূপের ভেলা
ত্রিজগতে করছে খেলা,
যেজন দেখে সেরূপ, করিয়ে চুপ
রয় নিরালা।"

আর একস্থানে তিনি বলেছেন "টলে জীব অটল ঈশ্বর।" এ-উক্তিতেও শান্তরসের আভাস পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবের দাস্যরসবোধ লালনের ভক্তহৃদয়ের উপরে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভাষা বা প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে অবশ্য লালন বৈষ্ণব কবির সমস্তরের নয়, তবে যে ভাব বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলীর কাব্যের উৎস সেই ভাব-প্রণোদিত হয়েই লালনও তাঁর সঙ্গীত রচনা করেছেন। লালন গেয়েছেন :

"হতে চাও হুজুরের দাসী
মনে গোল তো পোরা রাশি রাশি
না জান সেবা সাধনা,
না জান প্রেম উপাসনা,
সদাহি দেখি ইতরপনা,
প্রভু রাজি হবে কিসি?
কেশ বেশে বেশ করলে কি হয়,
রসবোধ না যদি রয়,
রসবতী কে তারে কয়,
কেবল মুখে কাষ্ঠ হাসি।
কৃষ্ণপদে গোপী সুজন,
করেছিল দাস্য সেবন,
লালন বলে তাই কিরে মন
পারবি ছেড়ে সুখবিলাসী?"

সখ্য রসের প্রকাশও লালনের বহু সঙ্গীতে দেখতে পাওয়া যায়। লালন তাঁর অন্তরে পরমগুরু সাঁইকে সখা-রূপে পেয়েছেন, আর তাই একাধিক বার বলেছেন, "আমার সনে সাঁই আমার খেলা করে।"

ব্রজের গোপিনীগণের ন্যায় লালন মধুর রস আস্বাদন করেছিলেন এবং তিনি জানতেন "মানুষে হবে মাধুর্য ভজন।" লালন বলেন :

"সে ভাব সবাই কি জানে?
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর মনে।
গোপী বিনে জানে কেবা
শুদ্ধরস অমৃত সেবা,
গোপীর পাপপুণ্য জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ দরশনে।
গোপী-অনুগত যারা
ব্রজের সেভাব জানে তারা।"

"ও সে কথা কয়রে দেখা দেয় না" ইত্যাদি উক্তিতে মিশ্রিত বাৎসল্য ও সখ্য রস-সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভক্ত লালন অভিমান ভরে, আব্দারের সুরে এক স্থানে গেয়েছেন :

"পাপী যদি তুমি না তরাইবে,
অধম তারণ নাম কে নিবে,
জীবের দ্বারা কলঙ্ক হবে,
নামের ভরম যাবে তোমারি।"

অভিমানিনী শ্রীরাধাও তাঁর সখী ললিতা ও বিশাখাকে এই কথাই বলেছিলেন। তাঁর (শ্রীরাধার) মৃতদেহ ভেসে গিয়ে মথুরার ঘাটে পৌঁছলে শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক হবে, "তাঁর নামের জাহাজ ডুবে যাবে"। সাধক প্রবর কাঙ্গাল হরিনাথ ঠাকুরের স্বগ্রামবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুত রাধাবিনোদ সাহা তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন "লালনের 'আমি কি তোমার কেহই নই' পড়িতে পড়িতে বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির 'জগজন ছাড়া নই মুই' মনে পড়িয়া যায়।"

এই সাহাজীর মতে "বৈষ্ণব কবিরা যাহাকে 'ভাবিনী ভাবের দেহা' বলিয়াছেন, লালনের দেহ সম্বন্ধে ধারণাও তদনুরূপই ছিল"।

বৈষ্ণব কবির "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই ঘোষণারও লালন সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি করেছেনঃ

"এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ রতন।"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যেভাবে উন্মত্ত হয়ে কোটি কোটি নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছিলেন লালনের সে-ভাবের অনুভূতি অতি সহজ ও তার প্রকাশ অতি সুন্দর। লালন তাঁর অসংখ্য শিষ্য-শিষ্যাকে সে-ভাবের স্বাদ গ্রহণ করতে আহবান করে বলেছিলেনঃ

"আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা!
* * * * * * *
গোরা হাসে কান্দে ভাবের অন্ত নাই
ও সে আপনি মেতে জগৎ মাতায়।
* * * * * * *
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়,
গোরা তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায়,—
অধীন লালন বলে ভাবুক হলে
সে ভাব জানে তারা।"

মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সহচরদের আবির্ভাব ও অবদানও লালনের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর মুগ্ধ হৃদয় গেয়ে উঠেছেঃ

"তোরা কেউ যাসনে ও পাগলের কাছে,
তিন পাগলের হল মেলা নদে এসে
দেখতে যে যাবি পাগল
সেইত হবি পাগল, বুঝবি শেষে
* * * * * * *
পাগলের নামটি এমন
শুনিতে অধীন লালন হয় তরাসে,
চৈতে, নিতে, অদ্বৈ পাগল নাম ধরেছে।"

বৈষ্ণব ধর্মের সার গ্রহণ করতে লালন সদা সাগ্রহশীল ছিলেন সত্য, কিন্তু তাই বলে বৈষ্ণবের নাম নিয়ে অন্তঃসারশূন্য লোক-দেখান ধর্মাচরণকে প্রশ্রয় দিতে তিনি রাজি ছিলেন না এবং তার প্রতি অতি তীব্র কশাঘাত করতে কখনও কুণ্ঠিত হননি।

"কাজের বেলায় জয়াচারি, শুধুই থাকা প্রেমতলা,
বেশ করে বোষ্টমগিরি, রসটি নেই ফোল্টিভারি,
হরিনামের ঢুকঢুকনি, তিন গাছি রূপের মালা,
না জেনে সে প্রেমের ধর্ম্ম, হয়রে শুধু তানা নানা।"

লালনের কণ্ঠনিঃসৃত উপরোক্ত বিদ্রূপাত্মক অথচ তেজোগর্ভ উক্তি স্পষ্ট-ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, ধর্মের সাধন, প্রেমের সাধন বাহ্যারম্বরের অপেক্ষা রাখে না, তা অন্তরের বস্তু, আত্মার দ্বারাই সে রসোপলব্ধি সম্ভব। যে কোন ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

বটগাছের ইতিকথা

(২২৮ পৃষ্ঠার পর)

রতনপুরের আকাশে সূর্য্য আজও যথা সময়ে উঠে ও ডোবে! লোকজন সুখে দুঃখে দিনগুলি একরকম কাটিয়ে দেয়। অত বহু দিন হইল আস্তানার বটগাছ দুইটি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই আস্তানাটি মেরামত হইয়াছে। আস্তানায় বৃহস্পতি-বারে ও শুক্রবারে জনসমাগম হয়। সর্বত্র শান্তি বিরাজিত। কিন্তু বটগাছ দুইটির পতনের পর দুই হজরতের মধ্যে যে বিরোধের আগুন জ্বলিল তাহা আজিও নির্বাপিত হইল না। মনে হয় কেয়ামত পর্যন্ত সে আগুন ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকিবে।

হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেনঃ "হায়! গাছ ভরা আম থাকতে আমার বাছা একটা আম পেল না। আম-আম করে কেঁদে সারা হ'ল।"

লতিফার রোগ আরও বাড়িয়া উঠিল। আর তাহাকে ফেলিয়া রাখা যায় না। তাহার হাতের সোনার বালা দুইটি খুলিয়া ডাক্তার ডাকিবার ব্যবস্থা করা হইল কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। লতিফার অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাইতে লাগিল। এ অসুখ অবস্থাতেই বালা দুইটির কথা সে ভুলিল না। মাকে বলিলঃ "মা, আমার বালা কৈ?" মা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেনঃ "ওঘরে তুলে রেখেছি।" আব্বা বলিলেনঃ "মা তোমাকে ভাল বালা গড়িয়ে দিব।" কিন্তু প্রবোধবাক্যে মেয়ে ভুলিল না। সে বালার জন্য জিদ করিতে লাগিল। "আমি নূতন বালা চাই না, আমার ঐ বালাই আমাকে দাও! কিন্তু তাহাকে আর বালা পরিতে হইল না। বালার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিল। মা কাঁদিয়া মৃত মেয়ের বুকে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলেনঃ "হায়! হতভাগা বট-গাছের জন্য আমার এ সোনার সংসার শ্মশান হয়ে গেল।"

বিদুষী ভার্যা

(২২৪ পৃষ্ঠার পর)

খসড়াটা দিবাকরের দিকে আগাইয়া ধরিয়া যূথিকা বলিল, "এটা তোমার কাছেই থাক্ না?"

দিবাকর বলিল, "না, না, তোমাদের কাছেই থাক্, দরকার হ'লে চেয়ে নিলেই হবে। অন্যমনস্ক মানুষ, হঠাৎ কান চুলকে উঠলে হয়ত খসড়ার খানিকটা ছিঁড়ে নিয়েই পাকিয়ে ফেলব।"

যূথিকার হস্ত হইতে কাগজখানা লইয়া দিবাকরের সম্মুখে স্থাপন করিয়া নিশাকর বলিল, "তা হ'লে স্কুলের পুরো নামটা তুমি লিখে দাও।"

"তাতে অবশ্য আপত্তি নেই।" বলিয়া দিবাকর একটা কলম খুলিয়া 'বালিকা বিদ্যালয়ের' পূর্বে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিল 'যোগমায়া'। তখন সম্পূর্ণ নাম হইল 'যোগমায়া বালিকা বিদ্যালয়'। ক্রমশঃ

ইটালির আত্মসমর্পণ

শ্রীসুশীলকুমার বসু

মুসোলিনীর আকস্মিক পতনে ইটালির যে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, বিনাসর্তে তাহার আত্মসমর্পণ তাহারই পরিণতি। ইটালির আত্মসমর্পণ যুদ্ধের প্রথম দিকে ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের সহিত তুলনীয়। সমগ্র যুদ্ধের উপর এই উভয় ঘটনার প্রতিক্রিয়ার কথা ধরিলে বলা যায় যে, তৎকালীন অপ্রস্তুত ব্রিটেন ফ্রান্সের পতনে যেরূপ একক, অসহায় ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন—ইটালির পতনে জার্মানির তদ্রূপ অবস্থা ঘটে নাই। তবে সুপরিকল্পিত, সুপ্রস্তুত এবং শক্তিশালী নাৎসী সমরযন্ত্রের আঘাতে বিপর্যস্ত ব্রিটেন বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত সেদিন ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভাঙনের মুখে জার্মানির সম্মুখে সেই আশা ও ভবিষ্যৎ নাই।

একটি প্রশ্ন লোকের মনে উদিত হইতে পারে। সম্মিলিত পক্ষের আসন্ন অভিযানের সম্মুখে এত সহজে ইটালি ভাঙিয়া পড়িল কেন? ফ্রান্স জার্মানির বিপুল শক্তির সম্মুখে হয়ত মাথা নত না করিয়া পারে নাই। কিন্তু খাস ইটালিতে সম্মিলিত সৈন্য অবতরণ করিবার পূর্বেই ত প্রকৃতপক্ষে ইটালি আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহার অনেক পূর্ব হইতেই এই চেষ্টা চলিতেছিল বলিয়া প্রকাশ। অনুরূপ অবস্থায় ব্রিটেন আত্মরক্ষায় হতাশ হইয়া পড়ে নাই। বরং প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য সংগ্রাম করিতে সেদিন ব্রিটেনের জনসাধারণ প্রস্তুত হইতেছিল। সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের জনসাধারণ যে অনমনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহা ত চিরদিন পৃথিবীর মানুষকে স্বদেশ ও স্বাধিকার রক্ষার প্রেরণা যোগাইবে। ইটালি যে স্বদেশ রক্ষার জন্য এই প্রকার কোন চেষ্টা করিতে পারে নাই, তাহার মধ্যে ইটালির জনসাধারণের কোন চরিত্রগত দুর্বলতা বা অক্ষমতার পরিচয় নাই। ইহা ঘটনাস্রোতের স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র।

যে সকল দেশের জনসাধারণ দেশরক্ষায় অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই স্বদেশ ও স্বাধীনতা-রক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিয়াছেন। প্রিয় জন্মভূমিকে, প্রিয় আদর্শকে শত্রুর আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জীবন পণ করিয়া সংগ্রাম করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা ইহাই জানিয়াছেন যে, তাঁহারা অপরকে আঘাত করিতে বা অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন নাই। শত্রু আসিয়াছে তাঁহাদের দেশ অধিকার করিতে; দেশের সম্পদ হরণ করিতে, তাঁহাদের সর্বপ্রকার অধিকার পদানত করিতে, তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে। শত্রুর নিষ্ঠুর আচরণ, তাহার বর্বরোচিত নিষ্ঠুর অত্যাচার, ধ্বংস, হত্যা, লুণ্ঠন প্রতিদিন শত্রুকে বাধাদানের সঙ্কল্পতাকে দৃঢ় ও বর্ধিত করিতে থাকে।

কিন্তু যাহারা পররাজ্য অধিকার ও সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, পৃথিবীর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিবার আশা যাহাদের একমাত্র প্রেরণা, সহসা যদি তাহাদের আশা রুদ্ধ হয় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাহারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তবে কিসের জোরে তাহারা দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইবে। মুসোলিনী দ্বিতীয় রোমান সাম্রাজ্যের আশা দিয়া ইটালির জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়া আক্রমণ করিয়া এই কল্পিত রোমান্ সাম্রাজ্যের প্রথম ভিত্তি তিনি স্থাপন করেন। ভূলুণ্ঠিত ফ্রান্সকে আক্রমণ করিয়া এই সাম্রাজ্যের স্বপ্নকে সফল করিবার আশায় তিনি এই যুদ্ধে লিপ্ত হন।

জার্মানির বিজয়-অভিযান তখন অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে; দেশের পর দেশ ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাক্রমের কাছে মাথা নত করিয়াছে। এক্সিস পক্ষের সম্মুখে তখন বিপুল আশা ও সম্ভাবনা। সমগ্র পৃথিবী জয় করিবার দুর্নিবার লোভের মত্ততা তখন এক্সিস দেশসমূহের লোকের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত।

মুসোলিনীর দম্ভ ছিল, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার লোভ ছিল, কিন্তু ইটালির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথা তিনি জানিতেন না, এমন হইতে পারে না। তাই বিজয়ী জার্মানির পাশে দাঁড়াইয়া জয়ের ভাগ লইবার আশায় তিনি পরাজিত ফ্রান্সকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ক্রমে চাকা ঘুরিয়া গেল এবং ইটালির দুর্বলতার ফাঁকে এক্সিস পক্ষের পরাজয়ের সূত্রপাত হইল। যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাজয়ে আফ্রিকা হইতে ইটালি বিতাড়িত হইল, সাম্রাজ্যের স্বপ্ন চিরদিনের জন্য ভাঙিয়া গেল এবং খাস ইটালি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইল।

এই অবস্থায় মুসোলিনীর যাদুপ্রভাব অন্তর্হিত হইল এবং ইটালির জনসাধারণ শান্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল। আত্মরক্ষার জন্য তাহারা কোনদিন প্রস্তুত হয় নাই এবং আত্মরক্ষার যুদ্ধে শত্রুকে বাধা দিবার মত মনোভাব তাহারা অর্জন করিতে পারে নাই। জনসাধারণের এই শান্তির আগ্রহের চাপে মুসোলিনীর পতন ঘটে এবং তাহারই ফলে অবশেষে বদগলিও সরকারকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে।

ফ্যাসিস্ট দলের সহিত ইটালীয় সেনা-বাহিনীর যে পুরাতন বিরোধ ছিল, ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয়ের সময় সেই বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর সাহায্যেই ফ্যাসিস্ট গভর্ন-মেণ্টকে অপসারিত করা হইয়াছে। হিটলারও তাঁহার বক্তৃতায় এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বদগলিও কোনদিনই ফ্যাসিস্ট দলের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। যদিও তিনি পরে ফ্যাসিস্ট দলের সদস্য হইয়াছিলেন এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তবুও এই পুরাতন বিরোধের কথা তিনি কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই এবং ফ্যাসিস্টদিগের সংকটের সময় অসন্তুষ্ট সেনাদলের সাহায্যে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটাইয়াছেন। জার্মানিতে নৌবাহিনী ও নাৎসী দলের মধ্যে এই বিরোধের বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এখানেও সঙ্কটের সময় এই বিরোধ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। হিটলার তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, জার্মানিতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিবে বলিয়া যাঁহারা আশা করেন, তাঁহাদের সে আশা দুরাশা। ইহার মধ্যেও সেই শঙ্কার সুরই ধ্বনিত হইয়াছে।

ইটালির আত্মসমর্পণের গুরুত্ব দুই দিক হইতে বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, রাজনীতিক; দ্বিতীয়ত, সামরিক। ইটালির পতনের রাজনীতিক গুরুত্বকে অনেকটা অপরিসীম বলা যাইতে পারে। একদিকে ইহা এক্সিস দেশসমূহের অধিবাসীদের এবং সৈন্যদলের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার করিবে। তাহাদের পরাজয়ের দিন যে নিকটবর্তী—তাহাদের সকলকেই যে শীঘ্র অনুরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে—এ আশংকা সকলের মনেই দেখা দিবে। যে অক্ষকে কেন্দ্র করিয়া কল্পিত নববিধানের আশা আবর্তিত হইতেছিল, সে অক্ষ অকস্মাৎ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় সে আশাও চিরতরে লুপ্ত হইল। যে ইটালীয় ও জার্মান সৈন্যগণ এতদিন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য যুদ্ধ করিয়াছে, আজ তাহাদিগকে পরস্পর যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে হইবে। যাহারা পরস্পরকে বন্ধু মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, আজ অকস্মাৎ তাহাদের সে মনোভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে।

১৯৩৭ সালে রোম-বার্লিন অক্ষ গঠিত হয় এবং ইহা কখনই ভঙ্গ হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সেই অসম্ভব ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ত্রিশক্তি চুক্তি ব্যর্থ হইল।

যুদ্ধজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ না করিবার সে সদম্ভ ঘোষণা ১৯৪১ সালে করা হইয়াছিল, ১৯৪৩ সালে তাহা ধূলিসাৎ হইল। সৈন্যদলের উপর ইহাতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে, সমগ্র যুদ্ধের উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইবে।

এই সম্পর্কে আরও একটি রাজনীতিক প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্রীটের পতনের পর য়ুরোপের মূল ভূভাগে ব্রিটেনের এবং তাহার সহযোগী আমেরিকার প্রভাবাধীন কোন স্থান ছিল না। য়ুরোপের অন্য যে কোন দেশে সম্মিলিত পক্ষ আক্রমণ করিতেন, তথাকার জনসাধারণের সহায়তা তাঁহারা পাইতেন। কিন্তু তথায় কোন প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেণ্ট তাঁহারা পাইতেন না। বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার মধ্যে জনসাধারণের যে সহায়তা তাঁহারা পাইতেন, তাহাতে সামরিক লাভ হইলেও রাজনীতিক লাভ হয়ত বেশী কিছু হইত না। যুদ্ধের পর য়ুরোপে প্রাধান্য বিস্তার লইয়া কূটনীতিক প্রতিযোগিতা প্রায় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সকল অধিকৃত দেশের জনসাধারণ সোভিয়েট আদর্শে ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত, কাজেই সেদিক হইতে কোন অধিকৃত দেশের জনসাধারণ ব্রিটেন বা আমেরিকার পক্ষে নির্ভরযোগ্য নহে। কিন্তু ইটালিতে ইঁহারা নাকি গভর্নমেণ্ট ও ইটালীয় বাহিনী পাইয়াছেন। এই গভর্নমেণ্ট (অথবা ইত্যবসরে ইঁহাদের আওতায় যদি অন্য কোন গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়) এবং এই বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ইঁহাদের প্রভাবাধীন ও অনুরক্ত থাকিবে। ইটালির জনসাধারণের জার্মান ও ফ্যাসিস্টবিরোধী মনোভাবও এই গভর্নমেণ্টের সহায়তায় ইঁহারা কাজে লাগাইতে পারিবেন। সম্ভবত যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই স্পেন, পর্তুগাল ও ইটালি লইয়া ইঁহারা য়ুরোপে একটি ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবাধীন অঞ্চল গড়িয়া তুলিতে পারিবেন।

ইটালির আত্মসমর্পণের ফলে অন্য যে সকল প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হইল, যুদ্ধের ফলাফলের উপর তাহার প্রভাব কিছু পরিমাণে পরোক্ষ, কিন্তু ইহার জন্য সম্মিলিত পক্ষের যে সামরিক সুবিধা লাভ হইল, তাহার ফল প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জার্মানির রাশিয়া আক্রমণের সঙ্গেই য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্ন উঠিয়া পড়িয়াছে। যাহাতে রাশিয়ার ভার লাঘব হয় এবং জার্মানির পরাজয় দ্রুত ও নিশ্চিত হয়, তাহার জন্য সমগ্র পৃথিবীর জনগণ ও এমন কি, ব্রিটেন ও আমেরিকার অধিবাসিগণও ব্রিটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দিয়া আসিতেছিলেন। যে কারণেই হউক, দ্বিতীয় রণাঙ্গন এতদিন সৃষ্ট হয় নাই। সম্ভবত জাপানের কথা মনে করিয়া ব্রিটেন ও মার্কিন য়ুরোপে অধিক শক্তিক্ষয় করা বা বিশেষ কোন সামরিক ঝুঁকি লওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। জনগণ মাত্র যুদ্ধজয় ও ফ্যাসিবাদের ধ্বংসের কথা ভাবিয়াছেন, কিন্তু শাসকবর্গ যুদ্ধজয় ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রাধান্য রক্ষা এই উভয় কথাই ভাবিয়াছেন।

কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিকে এই কথা ভাবিবার অবসর পাইলেও, যুদ্ধের শেষের দিকে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাভবের পূর্বমুহূর্তে য়ুরোপে অভিযান চালাইতে না পারিলে যুদ্ধোত্তর য়ুরোপে প্রাধান্য রক্ষা সম্ভব হইবে না। পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানির পরাজয় আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং য়ুরোপে অবতরণও ব্রিটিশ ও মার্কিনের পক্ষে সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রপথে য়ুরোপের যে কোন স্থানে অবতরণের জন্য বিরাট সামরিক শক্তি নিয়োগ করিতে হইত এবং তাহাতে প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ ক্ষয়ও কতকটা অনিবার্য হইত। এমন কি ইটালি আত্মসমর্পণ না করিলে এবং জার্মানদের সহায়তায় বাধা দান করিলে ইটালিতে অবতরণও অপেক্ষাকৃত দুষ্কর হইত। বর্তমানে ইহারা ইটালিতে জার্মান বাহিনীর সম্মুখীন হইবার সুবিধা অনেক সহজে লাভ করিলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া বল্কান ও দক্ষিণ-পূর্ব হইতে ফ্রান্স আক্রমণ করিতে পারিবেন। এক্ষণে এক্সিস পক্ষের বিপর্যয়ে প্রত্যক্ষভাবে জার্মানিও বিপন্ন হইবে। এখান হইতে খাস জার্মানী এবং হাঙ্গেরী, রুমানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ায় বিমান আক্রমণের অনেক সুবিধা হইবে। রুশ রণাঙ্গনে জার্মানির পরাজয়ের মুহূর্তে সম্মিলিত পক্ষ সামরিক ও রাজনীতিক উভয়বিধ কারণে বল্কান অভিযানের প্রয়োজন অনুভব করিবেন। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য বল্কানে প্রভাব বিস্তারের রাজনীতিক গুরুত্ব এত অধিক যে, প্রায় যে কোন ঝুঁকি লইয়াই ব্রিটেন ও মার্কিনকে বল্কান অভিযান চালাইতে হইত। অবশ্য এতদসত্ত্বেও এখানে সোভিয়েট প্রভাব লুপ্ত হইবে কিনা এবং যুদ্ধান্তে এই অঞ্চলে সোভিয়েট অন্য কোন প্রভাবের অস্তিত্ব থাকিতে দিবে কিনা তাহা স্বতন্ত্র কথা। সে যাহা হউক, দক্ষিণ ইটালি হইতে আদ্রিয়াতিক সাগর অতিক্রম করিয়া বল্কানে আক্রমণ চালনা যে অপেক্ষাকৃত অনেক সহজসাধ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্মিলিত পক্ষ ঐ অভিযান কখন চালাইবেন, তাহা লালফৌজের সাফল্যের উপর কতকটা নির্ভর করিলেও এই সুবিধাজনক অবস্থানের সামরিক গুরুত্ব যে অপরিসীম তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। ইহাতে আরও অতিরিক্ত সুবিধা এই হইল যে, সংকল্পিত অভিযানে ইটালীয় বাহিনী ও জনগণের সহায়তা পাওয়া যাইবে। উত্তর ইটালি জার্মানির অধিকারে থাকিলেও দক্ষিণ ইটালির বিমানক্ষেত্র ও পোতাশ্রয়গুলি সম্মিলিত পক্ষের অধিকারে রহিয়াছে। এখান হইতে তাঁহারা য়ুরোপে দ্বিমুখী অভিযান চালাইতে পারিবেন।

ফ্রান্সের পতনের সময় ফরাসী নৌবহর জার্মানি হস্তগত করিতে পারে নাই। কিন্তু ইটালির শক্তিশালী নৌবহরকে অধিকাংশ সম্মিলিত পক্ষের হস্তগত হইয়াছে। জার্মানি নৌশক্তিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, এই অবস্থায় ইটালীয় নৌবহর হাত-ছাড়া হইয়া যাওয়ায় এবং বিপক্ষ দলে যোগদান করায় জার্মানি গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সম্মিলিত পক্ষের ইহাতে যে লাভ হইল তাহার ফলাফল সুদূর প্রাচ্য পর্যন্ত প্রসারিত হইবে।

কিন্তু, সম্মিলিত পক্ষের তদপেক্ষা অনেক অধিক লাভ এই হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগর বাধামুক্ত হইয়াছে। ইটালির নৌবহরকে পাহারা দিবার জন্য এবং সম্ভাবিত নৌ-যুদ্ধের জন্য যে নৌবহর নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছিল, বর্তমানে তাহা অন্যত্র ব্যবহৃত হইতে পারিবে। সম্ভবত সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে ইহার ফল শীঘ্রই অনুভূত হইবে। মাত্র স্থল সৈন্যের দ্বারা ব্রহ্ম হইতে জাপানকে বিতাড়িত করা যে সহজ হইবে না, তাহা অনেকটা প্রমাণিত হইয়াছে। অথচ, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে জাপানের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিবার মত নৌবহর এতদিন ছিল না। বর্তমানে ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে শক্তিশালী নৌবহর ভারত মহাসাগরে লইয়া আসা সম্ভব হইবে। অর্থাৎ ইটালির আত্মসমর্পণের ফলে সম্মিলিত পক্ষের যে সকল সামরিক সুবিধা হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা য়ুরোপে এবং সুদূর প্রাচ্যে একই সঙ্গে আক্রমণ চালাইতে পারিবেন।

য়ুরোপের বিভিন্ন অধিকৃত দেশে দেশ-দখলকারী সৈন্যদলের মধ্যে বহু সংখ্যক ইটালীয় সৈন্য এতদিন ছিল। এই সৈন্যদলের পরিবর্তে এখন জার্মান সৈন্যদল নিযুক্ত করিতে হইবে। জার্মান সৈন্যবাহিনীর উপর ইহাতেও গুরুতর চাপ পড়িবে।

রাজনীতিক ও সামরিক যেদিক দিয়াই বিচার করা যাক যুদ্ধের ফলাফলের উপর ইটালির আত্মসমর্পণের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রভাব যুদ্ধোত্তরকাল পর্যন্ত প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

মহর্ষি-রবীন্দ্র সংবাদ

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'পত্রধারা' ও তিন খণ্ড 'চিঠিপত্র' এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত অজস্র পত্রাবলী দিগন্ত-বিস্তীর্ণ রবীন্দ্র-পত্রসিন্ধুর বহু অবিদিত প্রান্ত উদ্ঘাটিত করেছে। তবু রবীন্দ্র-জীবনীকারদের প্রয়োজনীয় উপাদানে একটি প্রধান অঙ্গ আজো অনুদ্ঘাটিত রয়েছে এবং সেদিকে অন্বেষণ এখনো যথোচিত পরিমাণে হয়নি। সম্ভবত সে পথে আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনাও খুব কম।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুল্য ঋষিকল্প পিতার রবীন্দ্রনাথের তুল্য বিশ্ববিশ্রুত পুত্র—এই ধরণের মণি-কাঞ্চন যোগাযোগ ইতিহাসে সুদুর্লভ। বিরাটতম প্রতিভার এইরূপ চিত্তচমৎকারী পুরুষানুক্রম অনুসন্ধিৎসুদের অন্তরে চিরদিন অফুরান বিস্ময় উৎপাদন করবে। অথচ সেই পিতা-পুত্রের অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি ভাবী-যুগের কাছে সজীব রূপলাভ করতে পারত তাঁদের পারস্পরিক যে-পত্রালাপে তার চিহ্নমাত্র সংগ্রহ করা আজ কঠিন হয়েছে। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মহর্ষির কয়েকটি পত্রে বালক রবীন্দ্র-নাথের যে স্নেহপূর্ণ স্বল্পমাত্র উল্লেখ আছে, তাতে পিতা-পুত্রের নিবিড় আত্মীয়-বন্ধনের একটি মধুর ইঙ্গিতমাত্র পাই—সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা মহর্ষির মাত্র দুটি এবং মহর্ষিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্র পত্রের সন্ধান আমরা পেয়েছি ; নিম্নে সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হল। এ বিষয়ে আর কারো সন্ধানে কোনো নূতন পত্র থাকলে সত্বর সাধারণের গোচর করা সমীচীন হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহর্ষি-রবীন্দ্র পত্র-বিনিময় সর্বপ্রথম হয় ১৭৯০ শকের বৈশাখ থেকে ১৭৯২ শকের অগ্রহায়ণ-পৌষের মধ্যে কোনো তারিখে [১৮৬৮—১৮৭০], খুবই সম্ভব ১৭৯১ শকের চৈত্র থেকে ১৭৯২ শকের মধ্যে।

পিতাকে বালক বয়সে এই প্রথম পত্র লেখার উল্লেখ "জীবনস্মৃতি"র 'পিতৃদেব' পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ নিজেই করেছেন। বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫০, বৈশাখ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনা' প্রবন্ধে এই পত্র রচনার তারিখে হিসাবের বা আন্দাজের ভুল হয়েছে, বলা প্রয়োজন।

পত্রটি প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত মহর্ষির পত্রাবলী গ্রন্থ থেকে সংকলিত করা হল।

পত্র নং ১

প্রাণাধিক রবি—

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিয়াছ এবং লিখিয়াছ যে আমি "বারিস্টার হইব।" (১) তোমার এই কথার উপরে এবং শুভবুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া তোমাকে ইংলণ্ডে যাইতে অনুমতি দিলাম। তুমি সৎপথে থাকিয়া কৃতকার্য হইয়া দেশেতে যথাসময়ে ফিরিয়া আসিবে, এই আশা অবলম্বন করিয়া থাকিলাম। সত্যেন্দ্র পাঠাবস্থাতে যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন * টাকা করিয়া প্রতিমাসে পাইতেন। তোমার জন্য মাসে * এত টাকা করিয়া নির্ধারণ করিয়া দিলাম। ইহাতে যত পাউন্ড হয়, তাহাতেই তথাকার তোমার যাবদীয় খরচ নির্বাহ করিয়া লইবে। বারে প্রবেশের ফী এবং বার্ষিক চেম্বার ফী আবশ্যক মতে পাইবে। তুমি এবার ইংলণ্ডে গেলে প্রতি মাসে ন্যূনকল্পে একখানা করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে। তোমার থাকার জন্য ও পড়ার জন্য সেখানে যাইয়া যেমন যেমন ব্যবস্থা করিবে তাহার বিবরণ আমাকে লিখিবে। গতবারে (২) সত্যেন্দ্র তোমার সঙ্গে ছিলেন, এবার মনে করবে আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমার স্নেহ জানিবে। ইতি ৮ ভাদ্র ৫১। (৩)

পত্র দুটি ১৮০৮ শকের [১২৯৩ সাল] পৌষ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (পৃ ১৭৯) থেকে উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং ২

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য মহোদয় শ্রীচরণেষু। (৪)

আদি ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন নিকটস্থ হইয়াছে—এ উপলক্ষে 'সমাজ বাটীর' ত্রিতল গৃহে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহটি জীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া সমাজের অধ্যক্ষ ট্রস্টী মহাশয়েরা ইহাতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া আমাদিগকে সাবধান হইবার জন্য এক পত্র লিখিয়াছেন এবং আগামী ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উৎসব-কার্য অন্য কোন স্থান নির্ধারিত করিয়া তথায় উৎসব করিতে বলিয়াছেন। অতএব এক্ষণে আপনকার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের উক্ত কার্য সমাধা করিবার জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করিয়া দিয়া কৃতার্থ করুন।

সেবক—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়,
২৫ অগ্রহায়ণ,
ব্রাহ্মসম্বৎ. ৫৭, কলিকাতা।

---

(১) দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার প্রস্তাব উপলক্ষে লেখা। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রওনা হ'য়ে মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।
দ্রষ্টব্য—জীবনস্মৃতি গ্রন্থের "গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ" পরিচ্ছেদ।

(২) প্রথমবার বিলাতবাস। ১৮৭৮, সেপ্টেম্বর—১৮৮০ (?) মার্চ।
দ্রষ্টব্য—'জীবনস্মৃতি'র 'বিলাত' পরিচ্ছেদ।

(৩) ব্রাহ্ম সম্বৎ। ১২৩৬ সাল [১৮২৯-৩০] থেকে গণনা আরম্ভ।

(৪) পিতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই একটিমাত্র পত্র দেখেছি। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, এ-পত্র যে-ধরণের, তাতে আত্মীয় সম্বন্ধের রসটুকু পাবার সুযোগ নেই এবং আশাও করা যায় না।

পত্র নং ৩

স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আদি ব্রাহ্ম-সমাজ সম্পাদক
সমীপেষু।

তোমার ২৫ অগ্রহায়ণের পত্র আমি প্রাপ্ত হইলাম। আগামী ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপসনা কার্য্য সমাধা করিবার জন্য একটি স্থান নির্ণয় করিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছ। অতএব আমার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে তদুপযোগী স্থান নির্ধারণ করিয়া দিলাম। সেই স্থানে পবিত্র ব্রহ্মোপসনা সুসম্পন্ন হইয়া গেলে আমি আহ্লাদিত হইব। ইতি ২৬ অগ্রহায়ণ, ৫৭ ব্রাহ্ম-সম্বৎ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
প্রধান আচার্য।

সাহিত্য-সংবাদ

নাট্যরচনা প্রতিযোগিতা

'মধুমালঞ্চের' উদ্যোগে উদীয়মান লেখকদিগের জন্য একটি প্রগতিশীল গীতি-নাট্য রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইতেছে। শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য ২৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। রচনাটির বিচারে অভিনয়োপযোগিতা ও সংলাপ-মাধুর্য বিশেষভাবে গণ্য করা হইবে। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, '৪৩।

শ্রীঅমল ঘোষ হাজরা, ২৫সি, মোহনলাল স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

কার কান্না

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

নিশুতি রাতে ও কার বুকফাটা কান্না?
ফোঁপানি আসে তার
চাঁদহারা আকাশের কালো আঁধারে
বাদলা রাতের ঝড়ের হাহাকারের মত।
শত শতাব্দি ব্যাকুল হ'য়ে শোনে
ও কার বুক ফাটা কান্না।

সে কান্নায়
আকাশের লক্ষকোটি তারা
হাত দিয়ে ঢাকে চোখের জলে ভেজা মুখ,
সে কান্নার কলরোলে ঢাকা প'ড়ে যায়
চিরমন্দ্রিত সমুদ্রের অতন্দ্রিত কল্লোলধ্বনি,
দূরে বিস্তীর্ণ বালুকা বেলায়
খেলারত বাতাসের অট্টহাসি যায় থেমে,
বিশ্বভুবন স্তম্ভিত হ'য়ে শোনে
ও কার বুক ফাটা কান্না!

ভেসে আসে সেই কান্নায়
বিগত বিস্মৃত কত যুগের সঞ্চিত বেদনা,
আকুতিভরা ব্যর্থ প্রতীক্ষার বক্ষভেদী আর্তনাদ,
অনাগত প্রিয়তমের স্মৃতিসঞ্জীবিত দীর্ঘশ্বাস
বিরহবিশীর্ণা সুন্দরীর স্বর্ণতনুর ম্লান ছায়া।
ও কার বুক ফাটা কান্না!

গম্ভীরার অভ্যন্তরে কে ঐ কাঁদে?
উন্মাদের মত ওর ভ্রমময় চেষ্টা,
প্রলাপময় ওর অর্ধোচ্চারিত ভাষা,
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হয় ওর কলেবর,
ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয় বিকসিত কদম্বের মত,
শ্লথ হ'য়ে যায় ওর অঙ্গসন্ধি,
রোমকূপে হয় রক্তোদ্‌গম,
অশ্রুজড়িতকণ্ঠ হ'তে উঠে মর্মভেদী হাহাকার।
ও কার বুক ফাটা কান্না!

অর্গলিত দ্বার অতিক্রম ক'রে
ছুটে যায় কার ঐ উন্নত ঋজু তনু,
লুটিয়ে পড়ে দেবতা-দেউলের তোরণ তলে,
কার ঐ স্বর্ণ-শরীরের বর্ণ প্রভায়
পথের তমসা যায় ছুটে,
উন্মাদের মত কে ঐ করে আলিঙ্গন
তরঙ্গিত সমুদ্রের নীলজল?
ও কার বুক ফাটা কান্না!

চিকিৎসা বিজ্ঞানে বেতার

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

চক্ষের পলকে বহু দূর দেশ থেকে খবরাখবর আদানপ্রদান করা, এক জায়গা থেকে দেশ-দেশান্তরের লোককে গান-বাজনায় আপ্যায়িত করা, এই কি শুধু বেতারের কাজ? না, মোটেই তা নয়। বর্তমান সভ্যতার যুগে বেতারের প্রয়োগ দিন দিন এমনই বেড়ে চলেছে যে, এমন দিন হয়ত আসবে, যখন মানুষের প্রায় সব সুখ-সুবিধাই বেতারের সাহায্যে করিয়ে নেওয়া হবে। বেতার-বিজ্ঞানের কার্যকরী ক্ষমতা যে কতখানি, তার বিস্তৃত বিবরণী দু-এক পাতায় দেওয়া সম্ভব নয়। বেতার-বিজ্ঞানের জন্মের পর থেকে বৈদ্যুতিক জগতে এক কল্পনাতীত যুগান্তর এনে দিয়েছে। আলাদীনের প্রদীপ বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতই যেন এর ক্ষমতা রহস্যাবৃত।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বেতারের সাহায্যে দু-একটি সুবিধার কথা বলা যাক। বস্তুত অস্ত্রোপচার চিকিৎসায় বেতার-বিজ্ঞানের প্রয়োগ যে কত বেশী কার্যকরী হবে অদূর ভবিষ্যতের অনাগত দিনগুলিই তার প্রমাণ দেবে।

কিছুদিন আগেকার কথা। একরকম পক্ষাঘাত বা ইন্দ্রিয়বৈকল্য রোগের প্রায় সময়েই পরিণতি ছিল মৃত্যু। কমের উপর দিয়ে যেত ত রোগীরা হ'ত উন্মাদ। এক অস্ট্রিয়ান ডাক্তার এই সব রোগের চিকিৎসা করতে করতে দেখলেন কি এক অজ্ঞাত উপায়ে দু-একজন এই সব মারাত্মক রোগ থেকে দিব্যি সেরে উঠেছে। ডাক্তার চিন্তা করতে লাগলেন। রোগীরা সম্পূর্ণ নিরাময় হচ্ছে কি শুধু বরাতের জোরে? বৈজ্ঞানিক ডাক্তার—অদৃষ্টের কথা এত সহজে বিশ্বাস করবেন কেন? গভীর চিন্তা ও গবেষণা করে তিনি দেখলেন যে, যারা এই অসাধ্য ব্যাধির হাত থেকে এড়িয়ে এসেছেন, রোগ সারবার আগে তাদের সকলেরই জ্বর দেখা দিয়াছিল—আর এই শরীরের উত্তাপই যেন ওই মারাত্মক ব্যাধিকে শরীর থেকে তাড়িয়েছে। এইটাই ছিল ওই ডাক্তারের অনুমান আর এই নিয়েই তিনি আরও গভীর গবেষণা আরম্ভ করলেন। ডাক্তারের প্রশ্ন হল—নিজের ইচ্ছামত রোগীর শরীরে জ্বর আনা যায় কি করে, আর সেই জ্বরের বাড়া-কমাই বা কি করে নিজের আয়ত্তাধীনে রাখা যায়? আর এরই সমাধান করতে তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন। ডাক্তার ভাবলেন ম্যালেরিয়া মশার কামড়ে রোগীর শরীরে জ্বরের উৎপত্তি করা যায়। একটা রোগীর উপর তিনি করলেনও তাই! আশ্চর্য ও কল্পনাতীত ভাল ফলও তিনি পেলেন। কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগেরও পরে আবার চিকিৎসার দরকার এ রোগটাও যে আবার বড় বিপজ্জনক! ডাক্তার চিন্তায় পড়লেন। এই সময় বহু দূর দেশে এক বেতার গবেষণাগারে ছোট-ঢেউ (Short Wave) নিয়ে কাজ করতে করতে দু'-চারজন লক্ষ্য করলেন যে, ছোট ঢেউয়ের বেতারপ্রেরকযন্ত্র চালালে তাঁদের শরীরে কেমন এক অস্বস্তিকর উত্তাপ হয়। প্রথমে তাঁরা ভাবলেন, এ উত্তাপ বোধহয় তাদের উপরকার চামড়ার উত্তাপ, কিন্তু পরে দেখলেন, না, এত শুধু চামড়ার উত্তাপ নয়, এ যে একেবারে রক্তের উত্তাপ—সত্যিই তাঁদের "জ্বর" হয়েছে, এই ছোট-বেতার-ঢেউ তাঁদের গায়ে লাগার জন্য। কৃত্রিম "জ্বরের" ত তাহলে এই সবচেয়ে চমৎকার উপায়! বেতার-ঢেউয়ের শক্তি বাড়িয়ে-কমিয়ে শরীরের উত্তাপও ইচ্ছামত বাড়ান-কমান যাবে। সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োগ হ'ল ওই সব অচিকিৎস্য রোগে। অনেক মারাত্মক রোগেই এই 'কৃত্রিম জ্বরের' প্রয়োগে অত্যাশ্চর্য সুফল পাওয়া গেল। শত শত রুগী যেন পুনর্জীবন লাভ করলে!

আর একটি চিকিৎসাস্ত্রর কথা এবারে বলা যাক। বাড়িতে যে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে আলো জ্বালান ও 'ফ্যান' (Fan) চালান হয়, সে বৈদ্যুতিক-প্রবাহ যদি দিক-বিপরীত দিকগামী বা Alternating Current (A. C.) হয়, তার কম্পন হল সেকেণ্ডে সাধারণত ৫০ বার। এই 'A. C.' থেকে 'Shock খাওয়া মোটেই সুখদায়ক নয় বরং বড় বিপজ্জনক—সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে এক তীব্র বেদনা অনুভূত হয়, শরীরের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু নাড়া খেয়ে জানিয়ে দেয় 'আমরাও আছি!' কিন্তু বেতারে এত কম সংখ্যার কম্পনে কোন কাজ হয় না—কম্পনের সংখ্যা বাড়িয়ে সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ লক্ষ বার করা হয়। এই A. C.র কম্পন যখন সেকেণ্ডে ৫০০,০০০ থেকে ২০০০,০০০ বার করা হয়, তখন ফল পাওয়া যায় অন্য-আর এখন আসে না—যেখানে এই অতি আর এখন আসে না—সেখানে এই অতি দ্রুত কম্পমান A. C. প্রয়োগ করা হয়, সেখানে কেবলমাত্র খানিকটা উত্তাপের সৃষ্টি করে। এই উত্তাপের ফলে শরীরের স্থানীয় 'টিসুগুলি' (Tissus) অবশ হয়ে যায়, উত্তাপ বেশী হলে টিসুগুলি নষ্ট হয়েও যেতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তি অনুযায়ী এই উত্তাপের সৃষ্টি হয়—তাই এর সুযোগ নেওয়া হয় বেতারের অস্ত্রোপচারে। বেতারপ্রেরক যন্ত্রের মতই একটি যন্ত্র। প্রয়োজনমত কম্পন (Frequency) এই 'সার্কিট' থেকে উৎপাদন করান হয়। বেতার 'ভ্যালভ্' থেকে যোগ করা হয় একটা ধাতুফলক (Electrode), এটা রাখা হয় রোগীর কোন সুবিধামত জায়গায়, যেমন পিঠের কাছে, আর একটি ফলক (Electrode) থাকে ডাক্তারের হাতে। শেষোক্ত ফলকটি ইচ্ছামত এদিক-ওদিক নড়ান যায়, এমনি খানিকটা লম্বা তারের সঙ্গে এর যোগ করা থাকে, এ ছাড়া এই ফলকটিই হ'ল চিকিৎসা-শাস্ত্রে একটি অতি সূক্ষ্ম "ছুরি" বা সূচ। এই "বেতার ছুরির" গোটাকতক সুবিধা রয়েছে। এই সূচ অস্ত্রোপচারের জায়গায় নিয়ে গেলেই স্থানীয় টিসুগুলি হয়ে যায় অবশ, ইচ্ছা

করলে নষ্টও করে দেওয়া চলে। এর ফলে কোন 'আর্টারি' (Artery) কাটা না পড়লে রক্তপাতের সম্ভাবনা নেই। অস্ত্রোপচারের ফলে যে ঘা হয়, তাও শুকিয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। কতখানি বৈদ্যুতিক শক্তি রোগী সহ্য করতে পারে এবং কতখানিই বা তার শরীরের ওপর এই 'সূঁচ' দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এ সবই ডাক্তারের আয়ত্তাধীনে। মস্তিষ্কের ভেতর অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার এই "বেতার-ছুরি" দিয়ে করা হয়েছে এবং দেখা গেছে ভবিষ্যতে এর উৎকর্ষতা অস্ত্রোপচার চিকিৎসায় নূতন যুগ এনে দেবে।

'এমন অনেক সময় দরকার হয়, যখন শরীরের কোন বিশেষ জায়গা পুড়িয়ে দেবার জন্য গরম লৌহখণ্ডের দরকার হয়। এই উত্তাপ আয়ত্তাধীনে না থাকলে ব্যাপারটা কি বীভৎস, তা সহজেই অনুমেয়। এখানেও বেতারের বৈদ্যুতিক-প্রবাহের কম্পন বাড়িয়ে-কমিয়ে এই 'দহন' কার্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। বিভিন্ন 'অপারেশনের' উচিৎমত কম্পনটা জানাই গবেষণার কাজ, তারপর পরিমাপ-যন্ত্র দেখে উচিৎমত কম্পনের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ফলক দিয়ে অস্ত্রোপচার করা খুব বেশী কিছু একটা শক্ত কাজ নয়।

বেতার বিজ্ঞানের সাহায্যে অস্ত্রোপচার চিকিৎসার জন্য এমন চমৎকার এবং অদ্ভুত কার্যকরী "ছুরি" আবিষ্কৃত হয়েছে। মানুষের কষ্টের লাঘব করার ভার এখন চিকিৎসকদের—তাঁদেরই চিন্তার বিষয় কিভাবে উচিৎমত এই অস্ত্রের প্রয়োগ করা যায়।

সত্য তুমি আজি ভাগ্যহত

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বিষণ্ণভীতির মাঝে নির্যাতিত ভাবী-কথকেরা,
পাশবদ্ধ ভবিষ্য-প্রগতি।
তরুণ কর্মঠপ্রাণ নৈরাশ্যের দুঃখ দিয়ে ঘেরা,
জীবনের নাহি তার জ্যোতি।
পিঞ্জরিত ব্যর্থতার আস্ফালন অবরুদ্ধ দ্বারে,
শৃঙ্খলিত মহাশক্তি গুমরিছে ঘন অন্ধকারে।

পথ-কুক্কুরের সম লুব্ধ হিংসা ক্ষিপ্ত হয়ে সদা
ক্ষত করে চিত্ত অবিরাম।
হত্যার আবেগে চলে রুদ্র যুগ,—শোনে নাক' কথা,
সভ্যতার একি পরিণাম!
বিষাক্ত সর্পের মত মুহূর্তেরা ধরিয়াছে কায়া,
নির্জীব কুসুমকুঞ্জে প্রেতসম শীর্ণ পত্রছায়া।

দারিদ্র্যের তিক্ততম গ্লানিভরা বুভুক্ষিতপ্রাণ
নিত্য করে মনেরে বিব্রত,
অযুত শতাব্দী পরে ধরণীর প্রথম সন্তান!
সত্য তুমি আজি ভাগ্যহত।
মত্ত দানবের জয়-মুখরিত উটজ অঙ্গন,
লৌহের বলয় পরি' হারালে কি সোনার কঙ্কণ!

আনন্দ-সমাধিক্ষেত্রে ছেয়ে গেল ব্যথার কুসুম,
জীবধাত্রী ওগো জন্মভূমি!
মৃত্যু-নাটিকার গীতি চোখে চোখে জড়ায়েছে ঘুম
রত্নগর্ভা! সর্বহারা তুমি।
প্রাত্যহিক আন্দোলন উন্মাদের নির্বোধ প্রলাপ,
দুঃখ তব যাবে কিগো! বক্ষে তব চির অভিশাপ।

কঙ্কালময়ের জাগরণ

তারাকুমার ঘোষ

হে সন্ধ্যা তারকা
শেষ রাত্রে তব দ্যুতি,
অবিরাম জ্বলেছে আমায়।
উদ্ভিন্ন যৌবনে,
তার বাণী নিত্য আছে তোলা।
বিমাতা ধরণী ক্রোড়ে
প্রবাসী আত্মার পরিক্রম।
যৌবন চেনে না মোরে।
তরুণ দেবতা,
চাহি মোর আননের বিশীর্ণ কঙ্কাল,
চলে গেছে ম্লানমুখে বিষণ্ণ সন্ধ্যায়।
এ যৌবনে হে মোর দেবতা,
আমারে দিলে না ডাক তব নিমন্ত্রণে,
যে জানে না সংসারের চিন্তা-সঙ্কোচন
শোনে না ক্রন্দন বৃথা,
কুড়ায় না বার্ধক্যের কৃপার সঞ্চয়?
যে চাহে ঝাঁপাতে, সুন্দরেরে আনিতে বরিয়া
মালিন্যের পঙ্ককুণ্ড হ'তে!
ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল, সত্যেরে স্থাপিতে চায় শিবের মন্দিরে?
শৌর্য শোভে প্রতি রোমকূপে,
যার কাছে আত্মপরাজয়,
চিরদিন নতশির।
সে আসনে সতত প্রয়াসী
বিশ্বের ঐশ্বর্যরাশি লুটিতে আপনি।
আপনি সৌরভ যথা প্রস্ফুট কমলে,
প্রকাশি গগনে, জানায় আপন অধিকার
সেই মত স্বমহিমা জানিবারে দাও শক্তি মোরে
হে যৌবন তরুণ দেবতা!

সন্ধি-যুগের বাংলা সাহিত্য ও বাস্তবতার বিবর্তন

হরপ্রসাদ মিত্র

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক আলোচনায় দেখা যায় আলাওল থেকে ভারতচন্দ্রের কাল প্রায় শত বর্ষের ব্যবধান। 'পদ্মাবতী' একখানি অনুবাদ কাব্য। তথাপি তাঁর রুচির ঝোঁক কোন্ দিকে তা এই 'পদ্মাবতী' কাব্যেই ধরা পড়েছে। মূল গ্রন্থের ঈশ্বর সম্পর্কিত, আধ্যাত্মিকভাবহুল বর্ণনাগুলি তিনি নিষ্ঠাবান অনুবাদকের ধর্মানুসারে যথাযথ ভাবে ভাষান্তরিত করেছেন। কিন্তু যেখানেই সংসারের কাছের জিনিসের বর্ণনা তাঁর চোখে পড়েছে, সেখানেই অনুবাদে উচ্ছ্বসিত সম্মতির প্রকাশ দেখা গেছে। সেই সব লৌকিক দৃশ্যের চতুঃপার্শ্বে সপ্তদশ শতাব্দীর এই কবিচিত্ত উপমা অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার প্রয়োগের আতিশয্যে আপন অন্তরের চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছে। অবশ্য এই ধরণের ঘটনা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর চোখে পড়ে। তার কারণ দ্যুলোকের উচ্চাশা যত বড় সত্য-ই হোক না কেন, ভূলোকের স্পর্শ তার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব। কোনো কবির পক্ষেই পৃথিবী সম্বন্ধে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে থাকা সম্ভব নয়। অলৌকিক শক্তিতে আস্থা পোষণের অভ্যাস নতুন নয়, কিন্তু লৌকিকত্বের অতিক্রান্তি হিসেবেই অলৌকিকের পরিচয়। কোম্‌টের ত্রৈকালিক ধর্ম-ব্যাখ্যায় বলা হ'য়েছে জ্ঞানোন্মেষের প্রথম অধ্যায়ে এই ধরণের অলৌকিক শক্তির পদতলেই মানুষ মাথা নত করে। তাই ব'লে সেই শক্তি মানবধর্মচিহ্নমুক্ত নয়। বর্বরের ধর্মের বৈশিষ্ট্য তার নরাত্মারোপ-প্রবণতায়,—anthropomorphism-এ।

বাংলা সাহিত্যের যে অধ্যায়ে ভারতচন্দ্রের অবস্থান, ইতিহাসের কাল-নির্ণয়ে তাকে বলা হ'য়েছে যুগসন্ধি। এদেশে সাহিত্য-রসিকের মন তখন অনেকটা সাবালক হ'য়েছে। দেব-কান্তির পালেস্তারার ভিতর থেকে মানুষকে বের ক'রে এনে অমরত্ব আরোপের প্রয়াস তখন বহুদিনের অভ্যস্ত রীতি হিসাবে প্রচলিত, কিন্তু তার অন্তরের জোর কমে এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে,—ভারতচন্দ্রের রচনায় অথবা কবিগান জাতীয় কাব্যাভ্যাসে বাঙালির সংসারের বাস্তব পরিচয় ধর্মসম্পর্করহিত অবস্থায় অনেক বেশী পরিমাণে চোখে পড়ে। তবু ধর্মপরায়ণতা আমাদের সর্ববিধ বোধের তলদেশে কত দূরগামী মূল বিস্তারেই যে সক্ষম হয়েছে, তার প্রমাণ পাই যখন দেখি প্যারীচাঁদ মিত্রের পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের আকস্মিক আবির্ভাব, গতানুগতিক বাংলা ছন্দের ঐতিহ্যে সহসা মধুসূদন দত্তের হাতে অমিত্রাক্ষর প্রয়োগের প্রবর্তন অথবা রবীন্দ্র-যুগে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অপ্রত্যাশিত রূপান্তরীকরণও সম্ভব হ'লো, কিন্তু একমাত্র মানব-সংসারানুরাগ বা Secular interest নামক গুণটি এই সাহিত্যে সম্পূর্ণভাবে সঞ্চারিত ক'রতে পাঁচ ছয় শতাব্দীরও বেশি সময় লেগেছে। অবশ্য পূর্বোক্ত মনীষীত্রয়ের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হ'লেও চলবে না; কিন্তু প্রতিভা যত উদ্দীপ্তই হোক না কেন, স্বয়ম্ভু হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক একাধিক অদৃশ্যচর কারণের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের ফলেই এক একটি ভাব ও এক একটি যুগের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্যই ঘটে চলেছে। পূর্বোক্ত তিনটি আকস্মিক ঘটনাই এদেশে ইংরেজ আগমনের পরে ঘটেছে। সুতরাং ইংরেজ আগমন একটি বহুফলপ্রদ ঘটনা, সন্দেহ নেই। বৈদেশিক অত্যাচার অথবা প্রীতির প্রবাহ এর আগেও ত একাধিকবার এদের মাটি স্পর্শ করেছে। মোগল-পাঠানের নামাঙ্ক সমাজের সর্বাঙ্গে মুদ্রিত। পর্তুগীজ দস্যুর অত্যাচার অবিমিশ্র বৈদেশিক। 'হার্মাদের ডর' এবং বর্গীর হাঙ্গামা সাহিত্যের সুরক্ষিত দুর্গ-প্রকারের ভিতরে বড় বেশি প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু একেবারেই করেনি, এমন কথা বলা যায় না।

পশ্চিমের সুসমৃদ্ধ সাহিত্য ও সভ্যতা সমন্বয়ধর্মী বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষের মাটিতে শিকড় চালিয়েছে। কিন্তু নিতান্ত সাম্প্রতিক কালেও আমাদের সংস্কারে ধর্মাবিলেপ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়নি। প্রথিতযশা পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা সম্বলিত একখানি পুস্তকে এই সেদিনও প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যোগসাধন তত্ত্বের রূপক ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছু নয়।

ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সম-সাময়িক ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ৬ষ্ঠ দশকের শেষে তাঁর মৃত্যু হয়। রামমোহনের বেদান্ত-ব্যাখ্যা, বিদ্যা-সাগরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিপ্লবের হাওয়ায় তিনি মানুষ হ'য়েছেন। তথাপি সমসাময়িক সমাজের দোষ-ত্রুটির বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষপাতের সঙ্গে সঙ্গে, 'আধ্যাত্মিক কবিতা' শিরোনামায় অনীপ্সিত হাস্যরস বণ্টনে তিনি প্রসিদ্ধ। এই জাতীয় কবিদের মনোভাব আলোচনা প্রসঙ্গে ভ্রূণতত্ত্বে বর্ণিত ক্রমিক জাতিস্মরতার তুলনা কিন্তু সঙ্গত হবে না। ভ্রূণ সমাজ-নির্লিপ্ত। মাতৃগর্ভের অন্তরালে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা তার নিজস্ব সহজ ধর্ম। পক্ষান্তরে কবি সামাজিক জীব। সমষ্টিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিবিশেষের নির্লিপ্ত ভাব-বিলাস সাহিত্যে অসম্ভব। যে ব্যক্তি অধিকসংখ্যক পাঠককে পিছনে ফেলে অস্পৃশ্য দূরত্বে ধ্যানমগ্ন হন, তাঁর পক্ষে সংসারে উদাসীন দার্শনিকের গৌরব লাভ করা বরং সম্ভব হয়, কিন্তু সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ তাঁর ভাগ্যে নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মানুষের

মধ্যে দুটো দিক আছে, একদিকে সে স্বতন্ত্র আর একদিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা থাকে, সেটা অবাস্তব।" বস্তুত সাহিত্যিক সর্বদাই সমাজের শ্রেণী-বিশেষের প্রতিনিধি। নেপথ্যাভিনয়ের কোন দর্শক থাকে না।

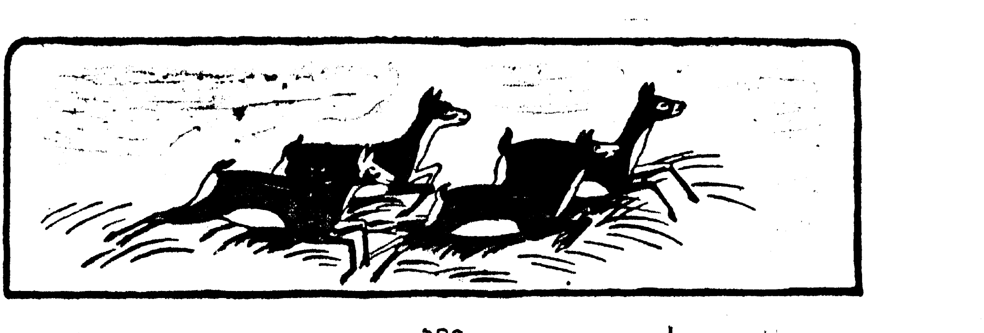
ঈশ্বর গুপ্তের ব্যর্থ অধ্যাত্মচিন্তা বাংলা কাব্যের গতানুগতিক ভাবসূত্রের ব্যক্তিগত পুনঃস্মরণ নয়। এই আধ্যাত্মিক বাচালতার দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-কেশবসেন-অধ্যুষিত বাংলা দেশে,—বস্তুতন্ত্রচালিত শিক্ষা-সভ্যতার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও পুরাতন আদর্শ এক সূর্যালোকবর্জিত অন্তরালে তার বিবর্ণ, ম্লান শাখাপত্রে জীবিত ছিল। কালের বিচারে গুপ্ত-কবি বঙ্কিম-দীনবন্ধুর প্রথম যৌবনের সাক্ষী ছিলেন, কর্মের বিচারে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের নব জাগরণের তিনি প্রথম বৈতালিক, কিন্তু মানসিক গঠনের আলোচনায় ভারতচন্দ্রেরই তিনি নিকট-তর আত্মীয়।

ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজ শাসিত বাংলা-দেশের অধিবাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু দীর্ঘকালের শ্যাওলার মতো তাঁর মনে প্রাচীন বাঙালী সংস্কারের ছোপ লেগেই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন একই পাত্রে জ্বাল দিয়েছে এবং সাহিত্যের পংক্তি-ভোজনে স্বদেশী-বিদেশীর তারতম্য রক্ষা করেনি, বরং বিদেশী সাহিত্যের পলান্ন ভক্ষণেই তার কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখা গেছে। ধর্মের গোড়ামির চেয়ে ধর্মহীনতার ধার্মিকতাতে তার অধিক অভিরুচি ছিল। সে নব্যবেদের প্রণেতা, কিন্তু এই প্রণয়ন ব্যাপারে প্রাচীনকে ভাঙবার উন্মত্ত উৎসাহ তার প্রতি পাদক্ষেপে স্থৈর্য হরণ ক'রেছে। ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃতি অন্য রকম। অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন অল্প শিক্ষিত, সুরসিক, সুচতুর, বাঙালী ভদ্রলোক ধীরে-সুস্থে একবার যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর হালচাল দেখে যেতে এসেছেন। ছন্দোবন্ধ রচনায় কবিওয়ালার অশিক্ষিতপটুত্ব এবং স্থূল পরিহাস-রসিকতা ঐতিহ্যসূত্রে তাঁর করায়ত্ত। জোয়ারের স্রোত যেমন ভাঁটার আবর্জনাও সবেগে বহন করে এগিয়ে চলে বাংলা সাহিত্যের সেই নব-জাগরণের দিনে অষ্টাদশ শতাব্দীর স্ব-কাল-পরিত্যক্ত এই শেষ প্রতিনিধিকেও নবোন্মেষিত আত্মস্বাতন্ত্র্য-বোধ অপ্রতিহত বেগে তেমনি সম্মুখ ভাগে আকর্ষণ করেছে। গুপ্ত-কবি এই নব-যৌবনের বিরোধী ছিলেন না। সাহিত্যের রাজপথে সমসাময়িক শক্তিমান অন্যান্য বাঙালী লেখকদের তুলনায় তিনি শুধু পেছিয়ে পড়েছিলেন।

বাস্তবতা-প্রীতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে অনতিস্ফুট-ভাবে প্রকাশিত হ'য়ে, বিশেষত পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলির মাধ্যমে উচ্চারিত হয়ে ক্রমশ অষ্টাদশ শতকের তথাকথিত মঙ্গলকাব্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই ধারার একনিষ্ঠ অনুসরণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সাধকের সার্থকতা।

কিন্তু ঊনবিংশ শতকের এই বাস্তবতাও ছোঁয়াছুঁইর বিচার বাঁচিয়ে চলেছে। বাস্তবতা একটি বহির্জাগতিক, অপরিবর্তনীয়, স্থাবর পদার্থ নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "যে সত্য আমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগার অপেক্ষা করে না, অস্তিত্ব ছাড়া যার অন্য কোনো মূল্যে নেই, সে হ'ল বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু যা কিছু আমাদের সুখ-দুঃখ বেদনার দ্বারা চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে সুপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে তাই বাস্তব। কোন্‌টা আমাদের অনুভূতিতে প্রবল করে সাড়া দেবে, আমাদের কাছে দেখা দেবে নিশ্চিত রূপ ধরে, সেটা নির্ভর করে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার, আমাদের স্বভাবের, আমাদের অবস্থার বিশেষত্বের উপরে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এদেশে নবাবী মসনদের প্রতিষ্ঠা যখন স্পষ্টই রাহুগ্রস্ত হ'য়েছে, তখন থেকে রাজশক্তিতে আমাদের আস্থাও প্রায় নিঃশেষ হ'য়েছে। তারপর আলিনগর, পলাশী, মীরজাফর, সিরাজদ্দৌলা, উমিচাঁদ, ক্লাইভ—কয়েকটি অবিস্মরণীয় নাম—নির্মম রাজনৈতিক দুর্যোগ-হিংসা বিদ্বেষের আবর্ত। পুরাতন রাজশক্তি নির্বাসিত হ'ল, কিন্তু নতুন বণিকরাজের গদি তখনো সুনিশ্চিত নয়। বাঙালীর মানসিক নভোমণ্ডলের অবস্থা এই সব বিচিত্র গ্রহ-নক্ষত্র-ধূমকেতুর পুচ্ছ তাড়নায় ঘন ঘন পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে। রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক আন্দোলনের এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতির সাহিত্যে বাস্তবতার বিবর্তন ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যালোকিত রাজপথের তোরণে প্রবেশ করবার আগে এই কথাটি আমাদের স্মরণ করা উচিত।



রঙ্গজগৎ

রাজা

পূর্ণিমা প্রোডাক্‌সন্সের চিত্র। কাহিনী ও পরিচালনাঃ কিশোর সাহু। প্রধান ভূমিকায় ঃ কিশোর সাহু ও প্রতিমা দাস-গুপ্তা।

চলচ্চিত্র বিজ্ঞাপনের দৌলতে জানা গিয়াছিল যে, কিশোর সাহু পরিচালিত 'রাজা' চিত্রখানি নাকি ভারতীয় চিত্র জগতে যুগান্তর আনবে কোন



'কিসমত' চিত্রে মমতাজ শান্তি। রক্সি-তে প্রদর্শিত হইতেছে।

সাহিত্যিকের জীবনী নিয়ে নাকি ভারতীয় চিত্র-জগতে এরূপ সার্থক চিত্র নির্মিত হয়নি। কিছুটা বিজ্ঞাপনের মোহে এবং কিছুটা কিশোর সাহুর পরিচালনার উপর বিশ্বাসের বশে, খুব বেশী আশা নিয়েই আমরা 'রাজা' দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, চিত্রখানি দেখে আমরা শুধু নৈরাশ্য-পীড়িতই হয়েছি।

'রাজা' চিত্রখানি নির্মাণের পিছনে কিশোর সাহুর হয়ত সাধু উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রধানত কাহিনী রচনার দৌর্বল্যের জন্যে ছবিখানি মনে কোন অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। 'রাজার' মারফৎ কিশোর সাহু তাঁর নিজের অবচেতন মনের গোপন ইচ্ছাকেই চিত্রে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন—এরূপ সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। 'রাজা' নামধেয় একজন সাহিত্যিক গল্পটির মূল নায়ক। বোধ হয় সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণার জন্যেই তিনি বস্তির মধ্যে আস্তানা গেড়েছিলেন—যদিও তার অর্থের অপ্রাচুর্য ছিল না। তাঁর মনে আরেকটি গোপন বেদনা ছিল—সেটা প্রেম-বিষয়ক ব্যর্থতা-সঞ্জাত। ক্রমে বস্তির একটি গোয়ালের মেয়ে তাঁর চিত্ত অধিকার করে নিল। তিনি সারাক্ষণ মদ এবং এই মেয়েটির সংগে প্রণয়-লীলা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। আর অবসর সময়ে খেয়াল খুশিতে সাহিত্য রচনা করতেন। তাঁর এক গুণগ্রাহী অধ্যাপক বন্ধু এগুলো কুড়িয়ে নিয়ে রাজা'র অজ্ঞাতসারে পুস্তকাকারে বের করতেন। রাজার বই সাহিত্য জগতে এক অভূতপূর্ব সাড়া নিয়ে এসেছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই বইয়ের দৌলতে তাঁর ভাগ্যে নোবেল পুরস্কারও জুটে গেল। তারপর পুরস্কার প্রাপ্তির পর এক অভিনন্দন সভায় রাজার মুখে রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী—আজ পশ্চিম আমায় সম্মান দেখিয়েছে বলেই তোমরা আমায় সম্মান করতে এসেছ! অতিরিক্ত মদ্যপান এবং এই সভার উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার ফলে রাজার অকাল মৃত্যু। গল্পের মাঝখানে অবশ্য মেয়রের মেয়ের সংগে একটা প্রেম কাহিনীও আছে। মোটামুটি এই হ'ল আখ্যান ভাগ। গল্পটি অতিমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং কাহিনীর মধ্যে অসংগতিও প্রচুর। একটি সাহিত্যিকের জীবন নিয়ে শুধু কল্পনা-বিলাস করা হয়েছে। নোবেল্ প্রাইজ প্রাপ্তির অবতারণা করা মোটেই যুক্তিসংগত হয়নি। তা ছাড়া যে সাহিত্যিক শেষ পর্যন্ত নোবেল প্রাইজ পেলেন তাঁর জীবনের সাধনা ও গুরুগম্ভীর দিকটা মোটেই দেখানো হয়নি—দেখানো হয়েছে শুধু তার মদ্য-প্রিয়তা ও প্রণয়-বিলাস। সাহিত্যিক বস্তি অঞ্চলে থাকেন, অথচ বস্তি-জীবনের যে রূপ আমরা ছবিতে দেখি সেটাও আদর্শবাদ-সঞ্জাত-বস্তি-জীবনের বাস্তব রূপের সন্ধান ছবিতে মেলে না। এই সব দুর্বলতার ফলে



ডি লুক্স পিকচার্সের 'ছদ্মবেশী' চিত্রে জহর গাংগুলী ও পদ্মা।

'রাজা' ছবিখানি হয়ত কিশোর সাহুর মনোবাঞ্ছার পরিপূরক হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় সমাজ-জীবনের কোন প্রতি-ফলনই আমরা তার মধ্যে দেখতে পাই না। কোন বৃহত্তর সামাজিক নির্দেশ না থাকায় চিত্রখানিকে অর্থবিহীন মনে হয়। নায়ক 'রাজা' ভূমিকায় কিশোর সাহু তাঁর স্বাভাবিক ছন্নছাড়া টাইপের অভিনয় করেছেন। অভিনয়ের প্রধান সম্মান বোধ হয় নায়িকার ভূমিকায় বাঙালী চিত্রাভিনেত্রী প্রতিমা দাশগুপ্তার প্রাপ্য। লীলা-চঞ্চল অভিনয়ে তিনি নায়িকার চরিত্রটিকে প্রাণবান করে

তুলেছেন—তবে চরিত্রটির পরিকল্পনার দোষে মাঝে মাঝে তাঁর অভিনয়ে অশ্লীলতার ইঙ্গিত আছে। সমগ্র কাহিনীটিতে বোধ হয় একমাত্র রাজার বন্ধু ডাঃ সিরাজুদ্দিনের চরিত্রটিই সুস্থ এবং সবল। এই চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন, তাঁর অভিনয় বেশ স্বাভাবিক এবং সংযত হয়েছে। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের অভিনয় চলনসই। ছবিখানির আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ ভাল। সংগীতাংশ মন্দ নয়।

কিস্‌মেৎ

বোম্বে টকিজের ছবি। কাহিনী ও পরিচালনা ঃ জ্ঞান মুখোপাধ্যায়; আলোকচিত্র ঃ পরিজ্ঞা; শব্দগ্রহণ ঃ বাটা; সংগীত পরিচালনা ঃ অনিল বিশ্বাস; প্রধান ভূমিকায় ঃ অশোককুমার, মমতাজ শান্তি, শাহ্‌ নওয়াজ, চন্দ্রপ্রভা, পিঠাওয়ালা, ভি এইচ দেশাই প্রভৃতি।

বোম্বে টকিজের ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এই যে নিছক আনন্দ পরিবেশন করে অর্থ সংগ্রহই তাঁদের চিত্রনির্মাণের মূল উদ্দেশ্য। ফলে এঁদের ছবি অবশ্যম্ভাবীরূপে মিলনান্তক হয়। প্রতি ছবির কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ঘটনা-বৈচিত্র্য অবশ্য থাকে—তবে শেষ পর্যন্ত নায়ক নায়িকার মিলন দেখিয়ে ছবি শেষ করা হয়। কিস্‌মেতে'রও মূল উদ্দেশ্য তাই। তবে এ ছবিতে কিঞ্চিৎ ঘটনা-বৈচিত্র্যের অবতারণা করা হয়েছে ঃ চিরাচরিত ত্রিকোণ সমস্যাও এ ছবিটিতে নেই। প্রধানত প্রেমই কাহিনীটির কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু হলেও, ঘটনা সংস্থাপনের কৌশলে ছবিটিতে, বিশেষ করে প্রথমার্ধে বেশ বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায় প্রথমার্ধই বেশী রস-ঘন।

নায়ক চরিত্রটি একটু ভিন্নরূপে পরিকল্পিত হওয়ায়, অশোককুমারকে এক নতুন ধরণের ভূমিকায় অভিনয় করতে



প্রতিমা ফিল্মসের 'পাপের পথে' চিত্রে খুনীর ভূমিকায় জীবন গাংগুলী

দেখা গেল। প্রেম ছবিটির প্রধান প্রেরণা হ'লেও অপরাধতত্ত্ব ছবিখানিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। নায়ক শেখর দুর্বৃত্ততায় শহরের সেরা গুণ্ডা ও পকেটমারের উপরও টেক্কা দিত। অথচ তার চরিত্রের এই অস্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতার যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। অশোককুমার এই চরিত্রটিতে সু-অভিনয় করেছেন বলা চলে—তবে কোন সময়ই তাঁকে দুর্বৃত্ত বলে মনে হয় না। টাকা চুরি, হার চুরি প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর হাতের অনেক কলাকৌশলই দর্শকরা দেখতে পান—তবে মুহূর্তের জন্যও তাঁকে দুর্বৃত্ত বলে মনে হয় না। নায়িকার ভূমিকায় সুন্দরী অভিনেত্রী মমতাজ শান্তি চিত্তাকর্ষক অভিনয় করেছেন। তাঁর কণ্ঠসংগীতগুলো ছবিখানির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। তবে তিনি একটি পঙ্গু চরিত্রে অভিনয় করেছেন—কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর চলাফেরা দেখে দর্শকদের মনে তাঁর পঙ্গুতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে। পুলিশ ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় শাহ্‌ নওয়াজ সুষ্ঠু সংযত অভিনয় করেছেন। একটি ছোট টাইপ চরিত্রে ভি এইচ দেশাইর অভিনয় হয়েছে অনবদ্য। নায়িকার বোনের ভূমিকায় নবাগতা অভিনেত্রী চন্দ্রপ্রভা—সুদর্শনা না হলেও সু-অভিনয় করেছেন। পিঠাওয়ালাকে যে-চরিত্র দেওয়া হয়েছে, তাতে অভিনয়ের অবকাশ নেই। অন্যান্য ভূমিকা চলনসই। ছবির শেষাংশে অ্যাকসিডেন্টের এত ছড়াছড়ি এবং অহেতুক মিলন এত বেশী যে, মাঝে মাঝে বিরক্তির উদ্রেক হয়। তবে যে উদ্দেশ্যে 'কিস্‌মেৎ' নির্মিত হয়েছে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলেই মনে হয়। অর্থাৎ দর্শক-সমাজের নিছক আনন্দের খোরাক 'কিস্‌মতের' মধ্যে অনেক আছে। সুরশিল্পী অনিল বিশ্বাস সুর-সংযোগে ও সুর-পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ উন্নত স্তরের।

আধুনিক

শ্রীমন্টুরাণী মিত্র

আদিম বর্বর সেই শোণিতের স্রোত,
ধমনীর অভ্যন্তরে ঢাকি প্রাণপণ;
উলঙ্গ নির্লজ্জ বৃত্তি করেছি নিরোধ,
সভ্যতার এনামেলে সু-মার্জিত মন।
গণিতের তালে হেঁটে চলিয়াছে দিন;
কপট প্রণয়ে বৃদ্ধি করেছি বান্ধব।
সুলভ রেশমে ঢাকি দীনতা মলিন,
সযত্নে সেজেছি আজ সু-সভ্য মানব ॥

অধুনা সংগ্রামে রত। হারালো কোথায়,
মদস্ফীত সভ্যতার পরিপাটি ভাঁজ।

হিংসার উন্মাদ বাণী বিশ্বেরে জানায়
আদিম অসভ্য দৈত্য মরে নাই আজ।

বিলুপ্ত দিনের সেই নগ্ন ইতিহাস,
বিপন্ন জীবনে আজ পেয়েছে প্রকাশ॥

খেলাধূলা

বাঙলার সন্তরণ

সন্তরণ বিষয়ে বাঙলা ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ১৯২৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্যন্ত যতবার নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বাঙলার সাঁতারুগণ ততবারই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। সন্তরণের কোন একটি বিষয়েই বাঙলার সাঁতারুগণকে ভারতের কোন অঞ্চলের কোন সাঁতারু পরাজিত করিতে পারেন নাই। ইহা খুবই আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। বাঙলার সাঁতারুগণ যাহাতে এই সম্মানজনক স্থানে চিরস্থায়ীভাবে থাকিতে পারেন, তাহার দিকে বাঙলার সন্তরণ বিষয়ের পরিচালকগণের সকল সময়েই দৃষ্টি থাকা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত তিন-চারি বৎসর হইতে বাঙলার সন্তরণ স্ট্যাণ্ডার্ড যেভাবে ধীরে ধীরে নিম্ন হইতে নিম্নতরের হইতেছে, তাহাতে সন্তরণ পরিচালকগণের এই বিষয় বিশেষ দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয় না। গত দুই বৎসর জাপানী বিমান আক্রমণের ফলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, সুতরাং এই দুই বৎসর বাঙলার সন্তরণ বিভাগটি ঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই বৎসর সন্তরণ মরসুমের আরম্ভ হইতে এই পর্যন্ত এইরূপ কোন ঘটনাই ঘটে নাই। অথচ এই বৎসর সন্তরণ বিভাগটি ঠিকমত কেন পরিচালিত হইল না, ইহা আমাদের বোধগম্য হয় না। এই বৎসরে বাঙলার সন্তরণ স্ট্যাণ্ডার্ড যে স্তরে পেঁৗছিয়াছে, তাহা খুব শোচনীয় না হইলেও পূর্বের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে, উৎসাহী সাঁতারুর অভাব বিশেষভাবেই দেখা দিয়াছে। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রতিযোগিতার তালিকা লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল, এক-একটি বিষয়ে মাত্র তিনজন চারিজন করিয়া সাঁতারু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। কোন বিষয়েই তীব্র প্রতিযোগিতা পরিদৃষ্ট হয় নাই। তীব্র প্রতিযোগিতার অভাব হওয়ার ফলাফলও নিম্নস্তরের হইয়াছে। অনেকে বলিবেন, "সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের ব্যবস্থার জন্যই এইরূপ হইয়াছে।" কিন্তু এই উক্তি আমরা বিশ্বাস করি না। অনুষ্ঠানটি যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহার জন্য সকল ব্যবস্থাই সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের পরিচালকগণ করিয়াছিলেন। যিনি এই অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনিই ইহা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করিবেন। বাঙলার সন্তরণের স্ট্যাণ্ডার্ড নিম্নস্তরের হওয়ার জন্য একটি ক্লাব কখনই দায়ী হইতে পারে না। সারা বাঙলার সন্তরণ বিষয়টি পরিচালনা করিবার ভার যাঁহারা লইয়াছেন, তাঁহারাই ইহার জন্য দায়ী। পরবর্তী নিখিল ভারত অনুষ্ঠানে বাঙলার সাঁতারুগণ যদি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ না করেন, উক্ত পরিচালকগণ কোনরূপেই রেহাই পাইবেন না।

ক্রিকেট লীগ

বেঙ্গল জিমখানার পরিচালকগণ পুনরায় "ক্রিকেট লীগ" প্রবর্তন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এই সংবাদ ইতিপূর্বেই আমরা প্রকাশিত করিয়াছি। এই সংবাদ প্রকাশ করিবার সময় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইহা কার্যকরী হইবে। কিন্তু সম্প্রতি এই লীগ সম্পর্কে যে সকল কথা আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, ইহা অনুষ্ঠিত হইলেও সাধারণ ক্রিকেট উৎসাহীদের আনন্দের খোরাক যোগাইবে না। স্পোর্টিং ইউনিয়ন, এরিয়ান্স, মোহনবাগান, কালীঘাট, ইস্টবেঙ্গল, পার্শী প্রভৃতি ছয়টি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট দল এই লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে না বলিয়া ইতিমধ্যেই উদ্যোক্তাদের জানাইয়া দিয়াছে। শোনা যাইতেছে, বেঙ্গল জিমখানার পরিচালকগণ নিজেদের জিদ বজায় রাখিবার জন্য জুনিয়ার দলসমূহ লইয়া এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রতিযোগিতা যদি অনুষ্ঠিত হয় ভালই। বহু উৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড়ই এই যোগদানকারী জুনিয়ার দলসমূহে খেলিবার সুযোগ পাইবেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম শ্রেণীর সকল দলকে যোগদান করিতে দেখিলেই আমরা বিশেষ সুখী হইব।

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এই বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে। তবে এই বৎসরেও গত বৎসরের ন্যায় একটি দল যোগদান করিবে না। গত বৎসর হিন্দু দল খেলায় যোগদান করে নাই। এই বৎসর রেস্ট দল যোগদান করিবে না। সম্প্রতি এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটির সভায় খেলার নিম্নরূপ তালিকা গঠিত হইয়াছেঃ—

মুসলীম বনাম পার্শী
(২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে নভেম্বর)
ইউরোপীয় বনাম হিন্দু
(২৯শে, ৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর) ফাইনাল ৩রা ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে।

বাঙলার দুঃস্থদের সাহায্যকল্পে ফুটবল খেলা

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর আই এফ এ বাঙলার দুঃস্থদের সাহায্যকল্পে একটি বিশেষ চ্যারিটি ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই খেলায় এই বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাবের সহিত আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। খেলা খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হয়। তবে সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা এই খেলায় সংগৃহীত হইয়াছে। অল্পসংখ্যক টাকা সংগৃহীত হওয়ার জন্য আই এফ এর কর্তৃপক্ষগণ যে দায়ী, ইহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা কেবল অসময়ে খেলার ব্যবস্থা করেন নাই, প্রবেশ মূল্যের হারও অতিরিক্ত বেশী করিয়াছিলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৪ই সেপ্টেম্বর

রুশ রণাংগনে জার্মনরা ব্রিয়ানস্ক শহর ত্যাগ করিয়াছে।

ইতালিতে মিত্রবাহিনী কর্তৃক কসেঞ্জা ও বারী অধিকৃত হইয়াছে।

জার্মান বেতারে প্রকাশ, মুসোলিনী কর্তৃক ইতালিতে ফ্যাসিস্ট গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুসোলিনী ফ্যাসিস্ট গভর্নমেণ্টের নূতন রাজধানী ক্রিমোনায় সিনর ফারিনাকির সহিত মিলিত হইয়াছেন।

বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশন আরম্ভ হয়। এইদিন বাঙলার অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী নূতন করিয়া পরিষদে বাঙলা গভর্নমেণ্টের চলতি বৎসরের (১৯৪৩-৪৪) বাজেট পেশ করেন। বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ হইতেছে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ১৯৮ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়; তন্মধ্যে ৪২ জনের মৃত্যু হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে ৩২টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয়; তন্মধ্যে ১৬ জনের অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ—১১ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ঢাকায় অনশনে ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং দুর্বলতাবশত আরও ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জ শহরে মোট ৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে বগুড়ায় মোট ২৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যশোহর, বরিশাল, ঘাটাল, মুন্সীগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে এই মর্মে টেলিগ্রাম পাইতেছেন যে, চাউল বাজারে আদৌ পাওয়া যাইতেছে না—লোকে অনশনে আছে।

বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাদ্যসচিব মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী বাঙলার খাদ্যসংকট সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন,—যদিও আউস ধান ও চাউল বাজারে উঠায় সংকটের কিছুটা অবসান হইয়াছে, তথাপি প্রদেশের বহু অঞ্চলেই এখনও অভাব ও সংকট, এমন কি, দুর্ভিক্ষের অবস্থা তীব্রভাবে বর্তমান। বিভিন্ন বণিক সমিতিগুলির পরামর্শ অনুসারে গভর্নমেণ্ট ধান চাউল ক্রয় করিয়া উহা বণ্টন করার নীতির মধ্য দিয়া যথাসম্ভব প্রকৃষ্ট পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন বটে; কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই যে, বাহির হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী ছাড়া তাঁহারা বর্তমান সংকটের অবসান করিতে সক্ষম নহেন।

বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদে বংগীয় ভবঘুরে বিল (১৯৪৩) গৃহীত হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ২০০ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়; তন্মধ্যে ৫৬ জনের মৃত্যু ঘটে। শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে ৩৯টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয়; তন্মধ্যে ২১ জনের অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ—গত সপ্তাহে টাঙ্গাইল শহরের রাস্তায় ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। সিরাজগঞ্জে আরও তিনজনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর

মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনী নভোরসিস্ক, নভগোরদ, সেভারস্কি, রোণী ও লোজাভয়া পুনরাধিকার করিয়াছে।

"ভারতরক্ষা বিধানাবলীর ২৬নং ধারা অনুসারে আটক ব্যক্তিগণের আটক রাখা সম্বন্ধে বাঙলা গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি কলিকাতা হাইকোর্ট এবং সম্প্রতি ফেডারেল কোর্ট আইন বিগর্হিত ও অযৌক্তিক বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও ঐ সব ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে বাঙলা গভর্নমেণ্টের অক্ষমতা" সম্বন্ধে আলোচনার্থ বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দল যে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ৬২—১১১ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ২০০ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়; তন্মধ্যে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে ৩০টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয়; তন্মধ্যে ১৭ জনের অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ—আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কুমিল্লার হাসপাতালে ১০১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। জলপাইগুড়িতে প্রত্যহ ৪।৫ জনের মৃত্যু হইতেছে। বগুড়ায় আরও ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। নওগাঁ (রাজসাহী) মহকুমার অন্তর্গত রাণীনগর থানার কয়েকটি গ্রামে গত কয়েক সপ্তাহে প্রায় তিনশতাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

১৭ই সেপ্টেম্বর

বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতির আলোচনাকালে অত্যধিক খাদ্যাভাবহেতু ও খাদ্যদ্রব্যাদির দুর্মূল্যতার ফলে বাঙলায় যে সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কাহিনী বিবৃত হয়।

মিত্রপক্ষের হেড কোয়ার্টার্স হইতে জানান হইয়াছে যে, অষ্টম আর্মি সালের্নো এলাকায় পঞ্চম আর্মির সহিত মিলিত হইয়াছে। পঞ্চম আর্মি সালের্নোর যুদ্ধ জয় করিয়াছে এবং উত্তর দিক দিয়া অষ্টম আর্মি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ফলে জার্মানরা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ ইতালির তিনটি প্রদেশ সমগ্রভাবেই এখন মিত্রপক্ষের অধিকারে আসিয়াছে।

নিউগিনিস্থ জাপ ঘাঁটি লায়ে দখল করা হইয়াছে বলিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরস্থ হেড কোয়ার্টার্স হইতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ১৪১ জন অনাহারে মৃতকল্প ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়; তন্মধ্যে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে ৪১টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয়; তন্মধ্যে ১৩টি মৃতদেহ অনশন ঘটিত।

অনাহারে মৃত্যু সংবাদ—বাঁকুড়ায় এ পর্যন্ত ৪৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জে তিনজন, পাবনায় তিনজন এবং জিয়াগঞ্জে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। আগস্ট মাসে নারায়ণগঞ্জের রাস্তায় ১৩৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, রুশ বাহিনী এক্ষণে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ হইতে ৪৫ মাইলেরও কম দূরে আছে এবং তাহারা এই নগর রক্ষাকারী জার্মান ব্যূহের একস্থানে কীলকাকারে প্রবেশ করিয়া উহা সম্প্রসারিত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ভিসি বেতারে বলা হইয়াছে যে, জার্মানরা ইতালির ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট সিয়ানোকে উদ্ধার করিয়াছে।

কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ১৯৫ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়; তন্মধ্যে ৫০ জনের মৃত্যু ঘটে।

অনাহারে মৃত্যু—মাদারীপুর শহরে এ পর্যন্ত অনাহারে পীড়িত ১০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত ১লা হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে রাস্তায় ১১২ জনের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জে এ পর্যন্ত ৫৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৯শে সেপ্টেম্বর

জার্মান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টোকিওর "আসাহি সিম্বুন" পত্রিকা হইতে এই সংবাদ উধৃত করিয়াছে,—"ভারত হইতে মিত্রপক্ষ কর্তৃক সত্বরই অভিযান আরম্ভ হইবে বলিয়া জাপানীরা অনুমান করিতেছে। বংগোপসাগরের উত্তর-পূর্ব দিকে উপকূল অঞ্চলে প্রতিপক্ষের রণতরীর পর্যবেক্ষণ কার্যকারিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।"

রুশ রণাংগনে লালফৌজ কর্তৃক পাভলোগ্রাদ, প্রিলুকি এবং ক্রাসনোগ্রাদ প্রভৃতি শহর অধিকৃত হইয়াছে।

লণ্ডনে খবর পৌঁছিয়াছে যে, জগদ্বিখ্যাত ফরাসী লেখক রোমাঁ রোলাঁকে নাৎসীরা ফ্রান্স হইতে এক জার্মান বন্দিশালায় স্থানান্তরিত করিয়াছে। অধুনা তাঁহার সোভিয়েট সমর্থক মনোভাব সর্বজন বিদিত।

আলজিয়ার্সের মিত্রপক্ষের রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, ইতালিয়ান বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জার্মান সৈন্যেরা সার্দিনিয়া হইতে কর্সিকায় চলিয়া গিয়াছে। নেপলস্ উপসাগরের নিকটস্থ ইশ্চিয়া দ্বীপ মিত্রপক্ষের নৌবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্রসিদা দ্বীপও আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ২৫০ জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয়; তন্মধ্যে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা হইতে ৪০টি মৃতদেহ অপসারিত হয়; তন্মধ্যে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ১৩।

২০শে সেপ্টেম্বর

কায়রো বেতারে বলা হইয়াছে যে, অষ্টম আর্মি নেপলস-এর সম্মুখবর্তী ঘাঁটিসমূহ দখল করিয়াছে—যে কোন মুহূর্তে নেপলস-এর যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে।

রুশ রণাংগনে লালফৌজ স্মোলেনস্কের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইয়েলনিয়া অভিমুখে এক অভিযান শুরু করিয়াছে। স্মোলেনস্কের ৩০ মাইল দূরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে।

পুস্তক পরিচয়

কুলার্ণবামৃতম্—শ্রীমদ ভৈরবানন্দ নিবেদিতম্। প্রকাশক—শ্রীমৎ পরানন্দ পরিব্রাজক ও শ্রীধ্যানানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রাপ্তিস্থান—কালিকাশ্রম, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। মূল্য দেড় টাকা।

তান্ত্রিক সাধনার প্রকরণ এবং তাহার মূলীভূত অধ্যাত্মদর্শন সম্বন্ধে আলোচনামূলক এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। কৌলোপনিষদের ভাষ্য এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া এতৎসহ .. টীকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে পুস্তকখানির গুরুত্ব বিবর্ধিত হইয়াছে। কৌলোপনিষৎ তন্ত্র সাধকের পক্ষে অত্যন্ত আদরের বস্তু; প্রকৃতপক্ষে এই উপনিষদের আশ্রয় না লইলে তন্ত্র সাধনের অন্তর্নিহিত সার্বভৌম তত্ত্বের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। গ্রন্থকার শাস্ত্রবিদ্, সুপণ্ডিত এবং সাধক পুরুষ; উপনিষদাংশের তাৎপর্য তিনি সরল ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অধ্যাত্ম রসপিপাসু ব্যক্তিমাত্রের নিকট এই পুস্তকের সমাদর হইবে সন্দেহ নাই।

মায়ের আলাপ—প্রথম খণ্ড। অনুবাদক—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত। ৭নং লাভলক প্লেস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—আর্য পাব্লিশিং হাউস, ৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সাধিকা শ্রীমার অধ্যাত্ম সাধনার অনেক নিগূঢ় রহস্য তাঁহার এই আলাপের ভিতর দিয়া প্রাঞ্জলভাবে এবং অতি মধুরতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। অধ্যাত্ম জীবন লাভে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিমাত্রেই এ পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

ঐশ্বর্য কাদম্বিনী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণীত। শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক অনুদিত। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মেলনী, আটপাড়া লেন, সিঁথি, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বেদান্ত সূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণের পরিচয় প্রদান করা সুধী-সমাজের নিকট অনাবশ্যক। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রণীত এই গ্রন্থ বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ্। অনুবাদক বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীল হরিদাস দাস মহাশয় এই লুপ্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব যাঁহারা উপলব্ধি করিতে চাহেন, এই গ্রন্থে তাঁহারা তৎসম্বন্ধে অপরিসীম সাহায্য লাভ করিবেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের সার এই গ্রন্থে সুমধুর ছন্দোবন্ধে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন গ্রন্থের সর্বত্র প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রভাত-রবি—অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম এ, প্রণীত; পৃষ্ঠা ৮০+২৫২। মূল্য আড়াই টাকা। প্রকাশক—বাণী বিতান, ৬৪-বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা।

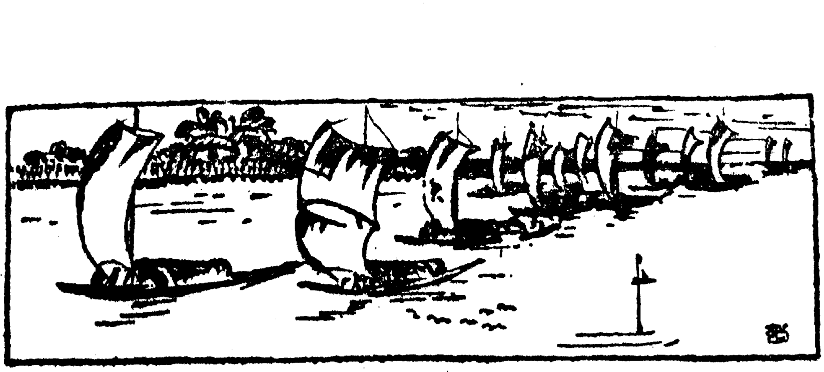
বিজনবাবু রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছেন। বাঙালী পাঠকসমাজে কবির সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়িয়াই চলিয়াছে, চলিবেও। সেদিকে এই গ্রন্থখানি যে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বিজনবাবুর সুযোগ হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য লাভ করিবার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরূপেও তিনি কবিগুরুর জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ও ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি যথার্থই বলিয়াছেন: "প্রারম্ভকে পরিত্যাগ করিয়া পরিণতির যে পরিচয় পাই তাহা খণ্ড পরিচয় মাত্র। মহামহীরুহের সম্পূর্ণ ইতিহাসের সূচনা তরুণাঙ্কুরের অনুদগত পত্রপুটের গোপন অন্তরালে। বর্তমান গ্রন্থের লেখক সেই অন্তরাল ভেদ করিয়া রহস্যালোকের রুদ্ধদ্বার অনেকটা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ......রবীন্দ্র-জীবনের যে অধ্যায় প্রভাত-রবির উপজীব্য তাহার আলোচনার পথ যেমন অস্পষ্ট তেমনই দুর্গম। বিলুপ্তপ্রায় অর্ধবিস্মৃত এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু তথ্যের পাথেয় সংকলন ও সমাবেশপূর্বক গ্রন্থকার ওই সংকটসংকুল পথ অতিক্রমের চেষ্টা করিয়াছেন।" বিজনবাবুর ভাষা সরল ও কবিত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরজীবনের যে ছবি তিনি আঁকিয়াছেন, তাহা উপাদেয় হইয়াছে একথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (অধ্যাপক)।

জটিলতা—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ। প্রকাশক—মিত্র ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

শ্রীযুক্ত সুমথনাথ ঘোষ রচিত 'জটিলতা' নামে দশটি গল্পের সংগ্রহ আমি পড়িয়াছি। গল্প ও উপন্যাস বেশী করিয়া পড়িবার অবসর পাই না, সব সময়ে প্রবৃত্তিও হয় না। উপরোধে পড়িয়া এই গল্প কয়টি পড়িয়া ফেলিয়াছি—কষ্ট করিয়া কর্তব্য সাধন করিবার জন্য পড়িয়াছি তাহা বলিব না, মোটের উপর পড়িতে ভালই লাগিয়াছিল বলিয়া পড়িয়াছি। গল্প কয়টির কথা-বস্তু খুব বড় বা জটিল নহে, বইখানির 'জটিলতা' নাম সার্থক হইয়াছে জটিল মনস্তত্ত্বের আলোচনায়। জীবনের অন্তস্তলের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাত যে রহস্য বিদ্যমান, ফ্রয়ডীয় মনস্তত্ত্ব যাহার উদ্ঘাটনে যত্নবান, তাহা অতি সহজ এবং সাবলীলভাবে সুমথনাথ গল্প কয়টিতে প্রকাশ করিয়াছেন, রহস্যের সমাধানের দিকে ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কতকগুলি গল্প একটি নারীকে লইয়া দুইটি পুরুষের মনের ঘাত-প্রতিঘাত, এই Eternal Triangle লইয়া রচিত। লেখকের বলিবার ভঙ্গী ভাল, ভাষা স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল, যদিও বস্তুতান্ত্রিকতার খাতিরে জীবনের যথাযথ প্রতিকৃতি দেখাইবার আকাঙ্ক্ষায় দুই এক ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর মুখে যে ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা আমার রুচির অনুসারী নহে; তবে আমি বাস্তবিকতার দিক হইতে আপত্তি করিব না, যদিও আমার মনে হয় এদিকে একটু সংযত হইলে বস্তুতন্ত্র সুমথবাবু আরও শক্তির পরিচয় দিতেন। মোটের উপরে, দৃষ্টিশক্তিতে, সততায়, সারল্যে ও লেখার সুন্দর ভঙ্গীতে গল্প কয়টি সুপাঠ্য হইয়াছে।

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।



দেশ

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ ৷ শনিবার, ২৯শে আশ্বিন, ১৩৫০ সাল। Saturday, 16th October, 1943 [৪৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজয়ার সম্ভাষণ

শারদীয়া মহাপূজার অবসানে আমরা আমাদের শত্রু মিত্র বন্ধু হিতৈষী গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলকে বিজয়ার সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। বাঙলায় আজ মহা দুর্দিন দেখা দিয়াছে, শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। চারিদিকে মহামৃত্যুর লীলা। চারিদিকে মানুষ মরিতেছে। গ্রামে গ্রামে মরিতেছে, গ্রামছাড়া গৃহহারার দল শহরের রাজপথে অসহায়-ভাবে মরিতেছে, শিশু ও নারীরা একমুঠা অন্নের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। এই মহাভয়, এই সংক্ষয়, ইহার মধ্যে কিসের জয় গাহিব, কোন বিজয়ের প্রীতি নিবেদন করিব? কিন্তু তবু স্মৃতি ভুলিতে পারি না। স্মৃতিই মানুষের প্রাণ। স্মৃতিই জাতির জীবন। বর্তমান এই ব্যাপক অভাবের মধ্যে ভাব পাইতে হইলে, কোন রকমেও বাঁচিতে হইলে অতীতের দিকেই তাকাইতে হয়। যে জাতির অতীত নাই, সে জাতির ভবিষ্যৎ কোথায়? কারণ ভাবই ভবিষ্যৎকে গড়ে এবং ভাব লাভ হয় চিত্তে অতীত স্মৃতির উদ্দীপনা সংযোগে। সুতরাং বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে অতীত একেবারে মিথ্যা নয়; অতীত অনস্যুত স্মৃতিই বর্তমানের স্থিতি এবং সেই শক্তিই অগ্রগতিরও মূলীভূত কারণ স্বরূপে কাজ করে। আজ আমরা মায়ের মূর্তি অনুধ্যান করিব। তিনি আজ কঙ্কাল মালিনী বেশে শরতের অরুণ আভাসে আমাদের আঙিনায় অশ্রুজলে ভাসিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেই অনুধ্যানে তাঁহার বর্তমান অবস্থার বেদনা অন্তরে উগ্ররূপে উপলব্ধি করিব। আমরা যে মা আমাদের অন্নপূর্ণা ছিলেন, মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী ছিলেন, তাঁহাকে আজ এমন ভিখারী সাজিতে হইল আমাদের কোন পাপে? বাঙালী জাতি তো ভিখারীর জাতি নয়, কাঙালের জাতি নয়। এই করিয়া থাকে। বিজয়ার স্মৃতির পট-বাঙলা দেশ একদিন স্বাধীন ছিল এবং বাঙালী বীর গৌরবে বিজয়ার উৎসব করিত। বাঙালী একদিন চতুরঙ্গ বাহিনী সাজাইয়া দিকে দিকে জয়যাত্রা করিত, বিজয়ার উৎসব রোলে বাঙলার আকাশ বাতাস মুখরিত হইত। আজ সেই বাঙালী পরাধীন, আজ তাহারা অসহায়, দুর্বল, অন্নমুষ্টির প্রত্যাশায় থাকিয়া উপেক্ষিত এবং অবজ্ঞাত। এ বেদনা আমাদিগকে আর কতদিন বহন করিতে হইবে? এখনও যদি আমরা জাতির দুঃখ কষ্ট এবং বেদনা সম্বন্ধে সচেতন না হই, তবে আমাদিগকে ধ্বংস পাইতে হইবে। বিজয়ার সম্ভাষণের ভিতর দিয়া জাতির বৃহত্তর বেদনা আমাদের মধ্যে সত্য হউক; আমাদের আলিঙ্গন একান্ত হউক। ধনী-নির্ধন, শত্রুমিত্র, উচ্চ-নীচ, সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া আমরা যেন সকলকে আত্মীয়স্বরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। অনাহারক্লিষ্ট দুর্গত স্বদেশবাসী ভাইবোনদের প্রাণ রক্ষার জন্য আমরা যেন সঙ্কল্পবদ্ধ হই এবং সেজন্য নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিতে পারি। পীড়িতের বেদনা আমাদের চিত্তে আবর্ত তুলিয়া আমাদের হস্ত সকলকে প্রীতিভরে সম্ভাষণ করিবার জন্য সম্প্রসারিত করুক।

খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে গভর্নর

বাঙলা দেশের অস্থায়ী গভর্নর স্যার টমাস রাদারফোর্ডের নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু আশা করিয়াছিলাম। আমরা মনে করিয়াছিলাম, তিনি বাঙলা দেশের বর্তমান সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাহার প্রতীকারের জন্য অবিলম্বে কার্যকর ব্যাপক পরিকল্পনা অবলম্বন করিবেন; কিন্তু তিনি গত ৮ই অক্টোবর বাঙলা দেশের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে যে বেতার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা নিরাশ হইয়াছি। তাঁহার বক্তৃতায় খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য কোন ব্যাপক পরিকল্পনা নাই; অধিকন্তু তিনি

এই খাদ্য সমস্যার দায়িত্ব দেশবাসীর উপরই আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গভর্নমেণ্ট যথেষ্টই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু গ্রাম এবং শহর উভয়ত্র দেশের একটা বিপুল সম্প্রদায় সঙ্গত মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা ব্যর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মজুতদার এবং লাভখোরদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াই গভর্নর একথা বলিয়াছেন বুঝা যায়; এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথমত বক্তব্য এই যে, দেশে খাদ্যশস্য সত্যই কতটা আছে, ইহা না বুঝিলে মজুতদার বা লাভখোরদের উপর দোষ চাপান চলে না। মজুত বিরোধী অভিযানের ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, গ্রামে কিংবা শহরে কোথাও খাদ্যশস্য বিশেষ কিছু মজুত নাই; দ্বিতীয়তঃ যদি কোন মজুতদার কিংবা লাভখোরের দল গ্রামে এবং শহরে থাকে, তাহাদিগকে দমন করা হইতেছে না কেন। যাহারা দেশের দুর্দশা লইয়া এইরূপ পাপ ব্যবসা করিতেছে, তাহাদিগকে দলন করিবার জন্য যতই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক না কেন, কেহই তাহাতে আপত্তি করিবে না কিংবা করিতেছেও না। পক্ষান্তরে আমরা ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে, বাঙলা দেশের সর্বত্র—যেখানে খাদ্যশস্য কিছু পাওয়া যাইতেছে, তাহা চোরা বাজারেরই মারফতে কিন্তু সরকারী নির্ধারিত মূল্যে বাঙলা দেশের কোথায়ও চাউল মিলিতেছে না। সরকারী আইনের কড়াকড়ি স্বত্ত্বেও চোরা বাজারের এ কারবার চলিতেছে কেমন করিয়া? মূল্য নির্ধারিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে এবং সরবরাহ করিবার জন্য যথেষ্ট খাদ্যশস্য না থাকিলে এমন অবস্থার সৃষ্টি না হইয়া পারে না। খাদ্যশস্য বাঙলার বাহির হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আসিতেছে এমন কথা আমরা শুনিতেছি; কিন্তু বাঙলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা উত্তরোত্তর ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। চাউল কোথাও মিলিতেছে না, সত্যকার এই যে অবস্থা ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় কি? বাঙলা দেশকে কেন দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল বলিয়া কেন ঘোষণা করা হয় না, গভর্নর তাঁহার বক্তৃতায় সে সম্বন্ধে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমত ফেমিনকোড অনুযায়ী খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে গভর্নমেণ্টের হাতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত থাকা প্রয়োজন, গভর্নমেণ্টের হাতে তাহা নাই, দ্বিতীয়ত টেস্ট রিলিফের কাজ, অর্থাৎ মজুরী দিয়া সাহায্য কার্য পরিচালনা করিতে হইলে যে সব কাজ আরম্ভ করা দরকার, বৎসরের এই সময়ে সে সব কাজ চালান সম্ভব নহে। গভর্নরের বিশ্বাস এই যে, কৃষকেরা যে আউস ধান পাইয়াছে, যদি তাহারা তাহা বাজারে ছাড়িত, তবে আমন ধান না পাওয়া পর্যন্ত সংকট কালটা কোন রকমে কাটিয়া যাইত; সুতরাং দোষ কৃষকদের। আমরা এইরূপ কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারি না, আমরা দেখিতেছি, দেশের সর্বত্র খাদ্যশস্যের অভাব এবং সে অভাবের প্রতিকার করাই সরকারের কর্তব্য। তাঁহারা যেভাবে পারেন, দেশের লোকের খাদ্যের সংস্থান করুন। ফেমিনকোডের বিধান অনুযায়ী দেশের লোকের খাদ্য সংস্থান করিবার মত মজুত শস্য সরকারের হাতে নাই, এমন কথা বলিয়া কোন গভর্নমেণ্টই তাঁহাদের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না; কিংবা খাদ্যের অভাবই যেখানে প্রধান প্রশ্ন, সেখানে দেশের লোকের খাদ্য সংস্থানের দায়িত্ব না লইয়াও ফেমিনকোডের বিধানের চেয়ে তাঁহারা বেশী সাহায্য ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহাদের এমন কথারও কোন মূল্য থাকে না। লোক-মৃত্যুর সম্বন্ধে গভর্নর বলিয়াছেন যে, গত তিন মাস হইতে, অনেক লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভিখারী শ্রেণীর লোক, ইহাদের অনেকের স্বাস্থ্য ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিতে ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এতদ্দ্বারা ইহাদের সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব কিছু লঘু হয় না। ভিখারী শ্রেণীর এত লোকও তো এমনভাবে ইতিঃপূর্বে মরে নাই; আজ মরিতেছে কেন? ইহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য যথাসময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই ইহাদের মৃত্যুর হার এমন ভীষণ আকার ধারণ করিত না। গভর্নর অবশ্য ইহার পর স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহার পর বেকার ভূমিহীন শ্রমিকের দল এবং তাহাদের সহায়হীন পরিবারবর্গ এই ভিখারীর দলে যোগ দিয়াছে। সুতরাং গভর্নরের এই উক্তি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, অবস্থা উন্নতির দিকে, না গিয়া অধিকতর শোচনীয় আকারই ধারণ করিয়াছে এবং গভর্নমেণ্ট হইতে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাবে যে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। গভর্নর তাঁহার বক্তৃতায় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিয়াছেন যে, সংবাদপত্রসমূহে যেভাবে গভর্নমেণ্টের কার্যের সমালোচনা করা হইতেছে, তাহাতে জনসাধারণের অবস্থা সংকটময় এবং গভর্নমেণ্টের কাজ কঠিন হয়। আমরা কিন্তু এমন অভিযোগের যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যেখানে জনসাধারণের ক্ষুধার জ্বালার প্রশ্ন, সেখানে ক্ষুধা প্রশমিত করিবার ব্যবস্থাই জনসাধারণের আস্থা লাভের একমাত্র উপায়; সংবাদপত্রসমূহ সরকারের নীতির সমালোচনা বন্ধ করিবার সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলেই লোকের ক্ষুধা মিটিবে না; পক্ষান্তরে সরকার যদি জনসাধারণের ক্ষুধার অন্ন যোগাইতে পারেন, তবে সংবাদপত্রের সমালোচনা তাহাদের সমর্থনমূলক আকার ধারণ করিবে। যদি তেমন ক্ষেত্রেও সংবাদপত্রে বিরুদ্ধ সমালোচনা চলে, তবে সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবে অভিযোগ করা চলে। বাঙলার সর্বত্র আজ অন্নাভাবে হাহাকার দেখা দিয়াছে; সরকার অন্নের সংস্থান করুন, তবেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনার কারণ থাকিবে না। সরকারী অ-ব্যবস্থা-কুব্যবস্থার সঙ্গত সমালোচনা করিবার অধিকার সংবাদপত্রের নিশ্চয়ই আছে।

শহর ও মফঃস্বল

সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কলিকাতায় রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। শহরে খাদ্য সমস্যার জটিলতা সমস্যা নয়। এক সের করিয়া ৪ শত দোকানে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থায় কিংবা সরকারী কণ্ট্রোলের দোকানে এ সমস্যার কিছুই সমাধান হয় নাই। এরূপ অবস্থায় রেশন ব্যবস্থার ফল কিরূপ দাঁড়ায় শহরবাসী তাহা দেখিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিবে। কিন্তু শহরের সমস্যাই একমাত্র সমস্যা নয়; কলিকাতা শহর বাঙলা দেশ নহে; গোটা বাঙলা দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য কি ব্যবস্থা হইতেছে, আমরা ইহা জানিবার জন্য অধিকতর আগ্রহান্বিত। বাঙলার সমস্ত অঞ্চল হইতে আমরা খাদ্য-সঙ্কটের যে সব সংবাদ পাইতেছি, তাহা নিদারুণ। গভর্নর সেদিন তাঁহার বক্তৃতায় শুধু ভূমিহীন শ্রমিকেরাই ভিখুকের দলে আসিয়া এতদিনে যোগদান করিয়াছে এমন কথা বলিয়াছেন; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ নিদারুণ বিপন্ন অবস্থায় পতিত। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকার হইতে এ পর্যন্ত ৪২৮৪টি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে এবং এই সব লঙ্গরখানায় ১,৩৪০,০০০ নর-নারী অন্ন পাইতেছে; কিন্তু বাঙলার বিপন্ন জনশ্রেণীর অনুপাতে সরকারী এই ব্যবস্থা অত্যন্তই যৎসামান্য। সরকার অবশ্য বলিতেছেন যে, তাঁহারা লঙ্গরখানাগুলির সংখ্যা ক্রমেই বাড়াইবেন; কিন্তু আমাদের মতে লঙ্গরখানা বাড়াইয়া এ সমস্যার সম্যক সমাধান করা সম্ভব হইবে না—বাঙলার

জেলায় জেলায় অবিলম্বে যাহাতে প্রচুর খাদ্যশস্য পৌঁছে, কর্তৃপক্ষের তেমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা অন্নাভাবে এবং অন্নাভাবজনিত নানা ব্যাধিতে বাঙলা দেশ ধ্বংস হইবে; বাঙালীর সমাজ-ব্যবস্থা এলাইয়া পড়িবে এবং বহুদিনের চেষ্টাতেও অবস্থার প্রতীকার করা সম্ভব হইবে না।

এবারের পূজার সাহিত্য

পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর দৈনিক ও সাময়িক পত্রের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং সাহিত্যের আসরে একটা নূতন সাড়া জাগিয়া উঠে। বর্তমান বৎসরে এই দুর্দিনেও বাঙালী মায়ের অঙ্গনে সাহিত্যের ডালি সাজাইয়া অর্ঘ্য যোগাইয়াছে এবং আশার কথা এই যে, এ বৎসরে মাতৃ-পূজার এই অর্ঘ্যে আমরা আন্তরিকতার অনুরাগ রঞ্জিত রক্তজবাদল দেখিয়াছি। দেশের প্রকৃত প্রাণধারার সঙ্গে এই দুর্যোগে বাঙলার কবি এবং সাহিত্যিকদের সমবেদনা সূত্রে সংযোগ প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। জনগণের সঙ্গে যোগের একটা গতি বাঙলার গদ্য সাহিত্যের ভিতর দিয়া কিছুদিন হইতে পরিলক্ষিত হইতেছিল; কিন্তু তাহা কতকটা পরোক্ষ ছিল; নাগরিক চিত্তের ব্যাপক পরিপ্রেক্ষার অভাবে দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্যের বেদনা ধনী ও নির্ধনের বৈষম্যের মূলীভূত নির্মমতাকে এমন করিয়া নগ্ন করিতে পারে নাই। বেদনা জাগিয়া ছিল; কিন্তু সে বেদনা প্রত্যক্ষতার প্রত্যয় প্রবাহের দ্বারা সর্বত্র তেমন পুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এ বৎসরের পূজার সাহিত্যে জনগণের অন্তরের বেদনায় নিজদিগকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া বাঙলা দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মায়ের চরণে যে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যে অন্তত কয়েকটি যে সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিবে, এমন কথা বলা চলে। বাঙলার এমন দুর্দিন অবশ্য দীর্ঘ দিন থাকিবে না; কিন্তু পরাধীন আমাদের একান্ত আশ্বস্তির কারণ সেখানে নাই; জনগণের সংবিদসূত্রে জাতির চিত্তকে জাগ্রত রাখাতেই প্রকৃত আশ্বস্তির কারণ রহিয়াছে এবং একমাত্র সাহিত্যিকের হাতেই যে সাধনা সার্থক করিবার শক্তি আছে।

বাঙলার সমস্যা

মুঙ্গের শহরে সম্প্রতি বিহার বাঙালী সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনের সভাপতি স্বরূপে শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বাঙলাদেশের বর্তমান দুর্দশার যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা সকলেরই মর্ম স্পর্শ করিবে। অন্তরের জ্বালা দিয়া তিনি কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার অন্তরের সেই জ্বালার আলোকে আমাদের বর্তমান দুর্দশার স্বরূপ উন্মুক্ত হইয়াছে। দাশ মহাশয় বলেন—

"বাঙলাদেশে অন্ন চাই। সেইজন্য অন্য প্রদেশের উদ্বৃত্ত খাদ্য বাঙলা দেশে পাঠানো প্রয়োজন। কিন্তু সেই খাদ্যও মুনাফাদারদের হাতে পড়িয়া অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। মুনাফাদারদিগকে সংযত রাখিবার জন্য এবং খাদ্যের ন্যায্য বণ্টনের জন্য দেশের লোকের সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। দেশের লোকের এই সমবেত প্রচেষ্টার জন্য চাই—দেশের নেতাদের মুক্তি এবং জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা। শুধু কয়েকটা টাকা সাহায্য করিলেই যেন আমরা আত্মপ্রসাদলাভ না করি। দরিদ্রের কাছে আমাদের ঋণ রহিয়াছে, তাহারাই আমাদের শিক্ষার, আমাদের সংস্কৃতির ব্যয়ভার বহন করিতেছে। আজ সেই ঋণ পরিশোধের দিন আসিয়াছে। আজ সত্যই আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি সকলই মিথ্যা মনে হইতেছে। সর্বনাশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আজ এ সকলকে মনে হইতেছে এক পলাতকী বৃত্তির, এক মানসিক বিলাসের চমকপ্রদ ফল। আর এইসব বিলাস লইয়া মত্ত থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে হইবে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে কার্যের মধ্য দিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আজ—

"বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে,
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।""

কর্তব্যের এই আহ্বান বাঙালী মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে কি?

অন্নসমস্যায় মহাত্মা গান্ধী

১৯৪২ সালে ২৫শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী 'প্রকৃত যুদ্ধ-প্রচেষ্টা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন। বর্তমানে দেশের সম্মুখে অন্ন-বস্ত্রের যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, মহাত্মাজী তাঁহার স্বাভাবিক দূরদৃষ্টি প্রভাবে তাহা উপলব্ধি করেন এবং সেই অবস্থার প্রতীকারের জন্য দেশবাসীকে প্রণোদিত করাই তাঁহার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রবন্ধে মহাত্মাজী বলেন—

"দেশে ইতিমধ্যেই অন্নবস্ত্রের অভাব দেখা দিয়াছে। যতই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে, ততই এই অভাব আরও বাড়িবে। বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ। এই অবস্থার আঘাত ধনী ব্যক্তিরা হয়ত এখন অনুভব করেন নাই বা কখন করিবেন না; কিন্তু দরিদ্রেরা উহা অনুভব করিতেছে। যাঁহারা দরিদ্রের ব্যথা নিজেদের বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের প্রয়োজন হ্রাস করা দরকার। বিত্তবান ব্যক্তিরা বহু খাদ্য অপচয় করেন এবং অত্যধিক খাদ্য গ্রহণ করেন। আহারের সময় শুধু একই প্রকারের খাদ্য ব্যবহার করা উচিত। সাধারণ গৃহস্থালীতে কোন প্রকার ভোজনকালে ডাল, চাপাটি, ঘি, দুধ, শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রভৃতি অনেক উপচার ব্যবহার করা হয়। আমার মতে ইহা অস্বাস্থ্যকর। যাঁহারা দুধ, ছানা, ডিম, মাংস গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ডাল খাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি ধনী ব্যক্তিরা ডাল ও তেলের ব্যবহার বন্ধ করেন, তবে দরিদ্রেরা তাহা অধিকতর পরিমাণে লাভ করিবে। দরিদ্র ব্যক্তিরা স্নেহজাতীয় কোন খাদ্যই সাধারণত পায় না। যে অন্ন ভক্ষণ করা হইবে উহা যেন ঝরঝরে হয়, কারণ ঝোল না মাখাইয়া খাইলে অর্ধেক অন্নেই উদর পূর্তি হয়। খাদ্যশস্য বিক্রেতাদের অত্যধিক লাভের লোভ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহারা দরিদ্রের খাদ্যের রক্ষক। এইরূপভাবে পরিচিত না থাকিলে দোকানপাট লুঠ হইবার আশঙ্কা ঘটিবে। গ্রামবাসীদিগকে খাদ্য সঞ্চয় করিবার উপদেশ দেওয়া এবং খাদ্যশস্যের চাষে উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। কলা, আলু ইত্যাদি সহজে উৎপন্ন হয় এবং প্রয়োজনের সময় এইগুলি প্রধান খাদ্যের অভাব পূরণ করিতে পারে।"

মহাত্মাজী বর্তমানে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ। তিনি যদি মুক্ত থাকিতেন, তবে বিপন্ন বাঙলার দুঃখ মোচনে তিনি তাঁহার শক্তি উৎসর্গ করিতেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নির্দেশিত ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ইহা বুঝিয়া আমরা দেশবাসীর নিকট সেগুলি উপস্থিত করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

- শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী -

[১০]

শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চের রীতিমত ইতিহাস লিখিলে দেখা যাইবে ইহার পরিণতি কম বিস্ময়কর নহে। প্রথম আমলে দেখিয়াছি নাটকে কেনা পোষাক ব্যবহৃত হইত। ক্রমে কেনা পোষাকের যুগ গিয়া এখানকার শিল্পিগণ পরিকল্পিত পোষাক ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পটভূমিকা ও যবনিকায় সত্যকার শিল্পীদের তুলির দাগ পড়িল। সাজপোষাকের আড়ম্বরের চেয়ে আলোর নিপুণ প্রয়োগের দিকে চোখ গেল। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে হার্মোনিয়ম দূরে হইয়া গিয়া বীণা, বাঁশী, এসরাজ দেখা দিল। এক কথায় অভিনয়ের সৌন্দর্যকলার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল। এই চেষ্টা সক্রিয় হইবার ফলেই ছেলেদের আর মেয়ে সাজানো সম্ভব হইল না। রবীন্দ্রনাথ ভদ্রসমাজে নৃত্য চালাইয়াছেন—কিন্তু এ কাজটিও এক দিনে হয় নাই। অনেক সামাজিক ও ব্যবহারিক বাধা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। শান্তিনিকেতন রঙ্গমঞ্চে ছেলেমেয়েরা প্রথম আমলে নাচিত না, অমনি ঘুরিয়া ফিরিয়া গান করিত। তারপরে নাচের নিম্নতম ধাপগুলি আরম্ভ হইল। শেষে বহুপরে রীতিমত নাচ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেলিয়া চলিতে হইয়াছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দেশের শিক্ষিত লোকের মত পরিবর্তন করিয়া ছাড়িয়াছেন।

বাঙলাদেশের আধুনিককালের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লিখিতে গেলে শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চকে বাদ দেওয়া চলিবে না। এ বিষয়ে দেশের রুচি যেটুকু ঘুরিয়াছে, তাহার মূলে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতাদের মধ্য দিয়াই কাজ করিয়া চলিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের দু' একটা নূতনত্বে যুগান্তর, বিপ্লব এই রকম ধুয়া কয়েক বছর আগে কলিকাতা শহরে উঠিয়াছিল, সে সবই শান্তিনিকেতনের রীতির ক্ষীণ অনুকরণ—সেইজন্য কলিকাতার ব্যাপারে আমরা নূতন কিছু দেখি নাই—বরঞ্চ পুরাতন রীতি লইয়া এত হৈচৈ দেখিয়া কলিকাতার ক্ষুদ্রতায় বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

খেলাধুলো

দিনুবাবু যেমন ছিলেন আমাদের উৎসবের অধিরাজ, সন্তোষবাবু ছিলেন তেমনি আমাদের খেলাধুলোর অধিনায়ক। এই উপলক্ষ্যে সন্তোষবাবুর পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

সন্তোষবাবু সাহিত্যিক 'শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। 'শ্রীশবাবু রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন। কাজেই সন্তোষবাবুদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহুদিন হইতে একটা স্নেহের পারিবারিক সম্বন্ধ যেন স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। বস্তুত, সন্তোষচন্দ্র ও রথীন্দ্রনাথ—ইঁহারা দুইজনেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদিম ছাত্র। এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পরে ইঁহারা দুইজনে একসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য যাত্রা করেন।

আমি যখন আশ্রমে যাই ঠিক তাহার কিছু পূর্বে তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। রথীন্দ্রনাথ তখন স্থায়ী ভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেন না কাজেই তাঁহার পরিচয় তখন মাঝে মাঝে পাইতাম মাত্র। কিন্তু সন্তোষবাবু ফিরিয়াই আশ্রমের কাজে যোগ দেন- তাঁহার সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু গোড়ার দিকে সন্তোষবাবুর চেয়ে তাঁহার জননীর পরিচয় আমরা বেশি পাইতাম। তাঁহারা তখন সপরিবারে দেহলী-ভবনে থাকিতেন—আমরা পাশের বাড়িতে থাকিতাম। রাত্রে প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িতাম—হয় তো খাওয়া হইত না, সন্তোষবাবুর মা আসিয়া আমাদের জাগাইয়া দিয়া নিজের বাড়িতে লইয়া গিয়া আহার করাইয়া দিতেন। এই মহীয়সী মহিলা স্বামী ও অনেকগুলি উপযুক্ত পুত্র কন্যার মৃত্যু কিরূপ ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করিয়াছিলেন—তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই রচনার প্রারম্ভে 'সবি' নামে যে সহপাঠীর উল্লেখ করিয়াছি, সে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ছিল। অল্পদিন আগে এই ধৈর্যের প্রতিমা নারীর মৃত্যু হইয়াছে। কেন জানি না, ইঁহাকে দেখিয়া আমার 'গোরার' আনন্দময়ীর কথা মনে পড়িত।

সন্তোষবাবুর চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল—অসাধারণ সৌজন্য ও ভদ্রতাজ্ঞান। মানুষের জীবন যখন অপেক্ষাকৃত ঢিমে তালে চলিত—ভদ্রতা তখন যেন সহজতর, অনায়াসতর লব্ধ ছিল। কিন্তু এখনকার দৌড় ধাপ, ব্যস্ততার যুগে সৌজন্য ও ভদ্রতা একান্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় সৌজন্য ও ভদ্রতাকে ভাবালুতা বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়—যেন ইহা চরিত্রের দুর্বলতারই লক্ষণ। সেইজন্যই এই ব্যস্ততার যুগে সৌজন্যের অভাব যেমন চোখে পড়ে, তেমনি কোথাও তাহার পরিচয় পাইলে, তাহা চোখেও পড়ে বেশি। একপ্রকার সৌজন্য আছে, যাহা দেখিলেই মনে হয়—ইহা সহজ নয়—সাময়িক কার্য উপলক্ষ্যে জোর করিয়া টানিয়া আনা; কিন্তু সন্তোষবাবুর চরিত্রে ইহা নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতই একান্ত সহজাত ছিল। দেখা হইবামাত্র দুটা মিষ্টি কথা, দুটা কুশল প্রশ্ন, কিছু না হোক হাসিয়া দুটা কথা বলা তাঁহার পক্ষে একান্ত অনায়াস ছিল—সেইজন্যই তিনি ছোট বড় সকলের হৃদয়কে অবিলম্বে নিজের দিকে টানিতে পারিতেন।

ইহা তাঁহার অন্তর্নিহিত সেবা ভাবেরই বিকাশমাত্র। এই সেবার ভাবটি সব চেয়ে বেশি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল—শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে। আমেরিকা হইতে ডিগ্রি লইয়া ফিরিয়া ইচ্ছা করিলে তিনি অনেক উচ্চপদ পাইতে পারিতেন, কিন্তু সে সব চেষ্টা মাত্র না করিয়া তিনি আশ্রমের কার্যে যোগ দিলেন। চাকুরি কথাটা তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করে না—কারণ নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের সঙ্গে সর্বতোভাবে মিশাইয়া দিয়া যে ব্রত গ্রহণ তাহাকে চাকুরি না বলাই উচিত। তাঁহার নির্দিষ্ট কাজ বলিয়া যেন কিছু ছিল না—আশ্রমের সব কাজই তাঁহার কাজ ছিল। ক্লাস পড়াইয়া যে-সময় হাতে থাকিত—তাহা আশ্রমের কোন না কোন কাজে ব্যয় করিতেন—এমন সকাল হইতে সন্ধ্যা; প্রয়োজন হইলে সন্ধ্যা হইতে সকাল—এমন বছরের পর বছর—মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত। বোধ করি বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়—কাজেই তাঁহার জীবনের এই অংশ আমার চোখের সামনেই অভিনীত হইয়া গিয়াছে। সন্তোষবাবুর পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া তাঁহার পরিবারের সকলের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল—তাঁহার বিবাহের উৎসব হইতে শ্মশানের শেষকৃত্যের আমি অন্যতম সাক্ষী।

যখন তিনি কলিকাতায় মৃত্যুশয্যায়—রোগের গুরুত্বের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মাতা ও ভগ্নীদের লইয়া আমি কলিকাতায় রওনা হই। সে রাত্রিও তিনি জীবিত ছিলেন। পর দিন ভোর বেলা মুসলমান-পাড়া লেনের বাড়ি হইতে তাঁহাদের লইয়া যখন ভবানীপুরের বাড়িতে পোঁছিলাম—হঠাৎ আমার নজরে পড়িল দোতালার বারান্দায় তাঁহার বোন নুটু মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আমাদের দেখিয়াও দেখিল না। সমস্তই বুঝিলাম। তাঁহার মাতার চোখে এক বিন্দু জল দেখি নাই। কেবল যখন এই হতভাগ্য পরিবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিল—তখন শূন্য বাড়ির সম্মুখে আসিয়া মাতার সমস্ত ধৈর্য ভাঙিয়া পড়িল—সে কি রোদন! তাঁহার প্রাণ ধারণের পক্ষে এই কান্নাটির প্রয়োজন ছিল।

সন্তোষবাবুর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য, বিশেষ তিনি আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন বলিয়া ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার মিলন সহজ ছিল। ছাত্ররা সহজেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিত—আর একবার বিশ্বাসের স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত হইয়া গেলে কোন বাধাই বাধা বলিয়া মনে হয় না। আশ্রমের সব কাজই তাঁহার কাজ ছিল—কিন্তু খেলাধুলো, sportsএর প্রতি বিশেষভাবে তাঁহার আন্তরিক টান ছিল।

শান্তিনিকেতনের ফুটবল টীম আমাদের সময়ে প্রায় অজেয় ছিল। ভালো খেলোয়াড়-দের প্রতি তাঁহার বিশেষ টান ছিল—আর খেলোয়াড়গণও তাঁহাকে বিশেষভাবে আপনার বলিয়া মনে করিত। ভালো খেলোয়াড়রা প্রায়ই ভাল পড়ুয়া হয় না। ফলে বছর শেষে তাহারা যখন ক্লাস প্রমোশন হইতে বঞ্চিত হইত—দিন কয়েক লজ্জা নিবারণের অজ্ঞাতবাসের জন্য তখন তাহারা সন্তোষ-বাবুর বাড়িতে আশ্রয় লইত—সেখানেই তাহাদের আহার ও নিদ্রা।

এখানকার ফুটবল দলের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া একটি কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাঙলা দেশের অধিকাংশ ইস্কুল-কলেজেই ভালো খেলোয়াড় সংগ্রহের চেষ্টা আছে—এবং নিজেদের Teamকে শক্তিশালী করিবার জন্য যে সব হীন কৌশলের সুযোগ তাহারা গ্রহণ করে তাহা যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লজ্জাকর—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তো দ্বিগুণ লজ্জার বিষয়। কিন্তু এদিকে কর্তৃপক্ষের কোন দৃষ্টি নাই—অনেক সময়েই তাঁহারা নিজেরাই হাতে-কলমে এই হীন কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকেন—এযেন অনেকটা প্রাচীন কালের জমিদারদের ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল ও গুণ্ডা পুষিবার অনুরূপ। শান্তিনিকেতনে আদৌ এপ্রথা প্রশ্রয় পায় নাই। এমনও হইয়াছে যে, Shield Final-এর খেলায় হার-জিতের আশঙ্কা যখন তুলাদণ্ডে তখনো জন দুই বিখ্যাত খেলোয়াড়কে, যাহারা দলে থাকিলে জয় অবশ্যম্ভাবী হইত, বিশেষ কোন অপরাধের জন্য খেলা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এবিষয়ে সন্তোষবাবুর মন অনমনীয় ছিল; ইহার একমাত্র কারণ ছাত্রদের তিনি খুব ভালবাসিতেন কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সুনামকে আরও অনেক বেশি ভালোবাসিতেন।

শান্তিনিকেতনের ফুটবল টীম প্রায় অজেয় ছিল বলিলেই চলে। কলিকাতা হইতে অনেক কলেজের ফুটবল টীম ওখানে খেলিতে যাইত, কোন দল যে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এমন মনে পড়ে না। একবার মোহনবাগানের একটা দল খেলিতে গিয়াছিল—তাহাদেরও হারিতে হইয়াছিল। আমাদের সময়ে আশ্রমের নাম-জাদা খেলোয়াড়দের মধ্যে গোরগোপাল ঘোষ, সরোজরঞ্জন, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সূর্য চক্রবর্তী, বীরেন সেন প্রভৃতি ছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই পরবর্তীকালে কলি-কাতার নামজাদা সব খেলোয়াড় দলে ভর্তি হইয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

আশ্রমের ফুটবল দল শিউড়ী, বর্ধমান, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, নলহাটী প্রভৃতি স্থানে প্রতিযোগিতা করিতে যাইত—জিতিয়া আসাই রীতি হইয়া যেন দাঁড়াইয়াছিল—ক্বচিৎ কখনো পরাজিত হইত। এইসব জায়গায় আমাদের দল খেলিতে গেলে সংবাদের জন্য আমরা উৎসুক হইয়া থাকিতাম। সন্ধ্যাবেলা ডাকঘরে গিয়া ভীড় করিতাম। তখন পোস্টমাস্টার ছিলেন যতীন বিশ্বাস নামে এক ভদ্রলোক। তিনি ডাকের কাজ ও তারের কাজ দুই-ই করিতেন—সেইজন্য আমরা তাঁহার নাম দিয়াছিলাম ডাক্তার। যতীনবাবুকে অনুরোধ করিতাম একবার তারে খবর লইতে খেলার ফলাফল কি হইল? তাঁহার উৎসাহও আমাদের চেয়ে কম ছিল না। তিনি প্রাইভেট খবর লইয়া বলিয়া দিতেন—আমাদের দল জিতিয়াছে—আমরা আনন্দিত হইয়া ফিরিয়া আসিতাম। শিউড়ী, রামপুরহাট হইতে শেষ রাত্রের গাড়িতে বিজয়ী দল ফিরিত। আমরা অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িতাম। হঠাৎ কখন্ এক সময়ে বিজয়ী দলের সম্মিলিত কণ্ঠের—'আমাদের শান্তি-নিকেতন—আমাদের সব হতে আপন' গান শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া যাইত। আমরা ছুটিয়া গিয়া বিজেতাদের ঘিরিয়া ধরিতাম—মশালের আলোতে রুপার প্রকাণ্ড শীল্ড-খানা অকাল সূর্যের মত ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিত। সেই রাত্রেই সকলে মিলিয়া গান গাহিয়া আশ্রম প্রদক্ষিণ হইত; নিদ্রাহানিতে কষ্টের কারণ ছিল না, কারণ পরের দিন অবধারিত ছুটি।

একবার পর পর তিনচারখানা শিল্ড জয় করিয়া আনা হইল, শেষে এমন হইল যে, বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ আর ছুটি দিতে চাহেন না। অথচ ছুটি পাইবার এমন উপলক্ষ্য ছাড়া তো কিছুতেই চলে না। এরকম স্থলে আমাদের আপীলের উচ্চতম আদালত ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু শেষরাতে তো তাঁহার ঘুম ভাঙানো চলেনা—অথচ খুব ভোরে ক্লাস আরম্ভ হয়—তার আগেই ছুটির কথা প্রচারিত হওয়া দরকার। কাজেই সাহসে ভর করিয়া রবীন্দ্রনাথের শয়ন গৃহের দ্বারে গিয়া ভালো মানুষটির মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। যাহা ভাবিয়া-ছিলাম তাহাই হইল—শয্যাত্যাগ করিয়াই আমাকে দেখিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপার কি? আমি সমস্ত সভয়ে নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন—বল গিয়ে যে আমি ছুটি দিতে বলেছি। অমনি আমার মুখের মাংসপেশীর মধ্যে উল্লাসকর পরি-বর্তন হইল—আমি এক দৌড়ে গিয়া সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়কে সমস্ত বলিলাম। আর কি, ছুটি হইয়া গেল।

খেলাধুলো আমার নিজের কোনদিন ভাল লাগিত না—অবশ্য ছুটিটা খুবই ভালো লাগিত। ফুটবল প্রভৃতি খেলা নাকি manly game—পুরুষোচিত খেলা। কিন্তু বাইশজন লোক একটা মৃতপশুর চর্ম-গোলককে উপলক্ষ্য করিয়া রেফারিকে মারিতে চেষ্টা করিতেছে—রেফারির কৃতিত্ব সেই মার বাঁচাইয়া যাওয়া—আর বাইশ হাজার দর্শক চানাচুর চিবাইতে চিবাইতে মাঝে মাঝে হাততালি দিতেছে—ইহার মধ্যে পৌরুষ কোথায় আমি আজও বুঝিতে পারি নাই। ইহার চেয়ে যে রোমান দর্শকদের সিংহের সঙ্গে মানুষের লড়াই অনেক বেশি পৌরুষোচিত। তাহাতে অন্তত পশুটা জীবন্ত ছিল।

খেলার সঙ্গে আর একটা বালাই ছিল ড্রিল শেখা! এ ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর নিরর্থক মনে হইত। সারিবন্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া হুকুম মাত্রে ডাইনে ঘোরা, বামে ঘোরা, পিছন ফিরিয়া চলা—ইহার অর্থ খুঁজিয়া পাইতাম না। তার মূঢ়ের মত সকলে একসঙ্গে তালে তালে পা ফেলার মত Philistine-উচিত জিনিস আর কিছু আছে কি না জানি না। লড়াই করিতে গেলে নাকি এ সবের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের সম্মুখে লড়াই-এর সুদূরতম সম্ভাবনাও ছিল না। বলা বাহুল্য, খেলা ও ড্রিল দুই-ই ফাঁকি দিতে ত্রুটি করিতাম না।

খেলা ও ড্রিল ছাড়া আর একটা ব্যাপার ছিল—মাঝে মাঝে sports হইত। উল্লম্ফন, দীর্ঘলম্ফ, সিধাছুট প্রভৃতি। সিউড়িতে শীতকালে একটা মেলা বসিত—তাহাতে একদিন এই সব প্রতিযোগিতা ছিল। বীরভূমের সমস্ত স্কুল যোগ দিত। আশ্রমের দলও যাইত। প্রথম প্রথম এমন হইত যে, সমস্তগুলি প্রাইজ আশ্রমের ছেলেরাই আনিত—অন্যদের কেবল ছোটাছুটিই সার। শেষে তাহারাও কৌশল কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইল—সব প্রাইজ আর আমাদের ছেলেরা আনিতে পারিত না; কিন্তু বরাবরই বেশির ভাগ প্রাইজ জিতিয়া লইয়া আসিয়াছে।

আশ্রম-পরিবার

আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই, ছাত্র, অধ্যাপক, অনুচর, পরিবার মিলিয়া তখন দেড়শতের বেশি অধিবাসী ছিল না। প্রতিষ্ঠানের আয়তনও ছোট ছিল, কয়েকখানা চালাঘর, গোটা দুই পাকাবাড়ি—এই মাত্র। আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও অধিবাসীর সংখ্যাল্পতার জন্য আশ্রমে তখন একটি পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। অন্য অনেক অভাব সত্ত্বেও এই ভাবটিই ইহার প্রধান ঐশ্বর্য ছিল। অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন খাপছাড়া একটি বস্তু। কিন্তু এই পরিবার-চৈতন্যের জন্য আশ্রমকে কখনো জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন খাপছাড়া বলিয়া মনে হয় নাই। ছাত্ররা নিজেদের পরিবার ত্যাগ করিয়া আসিত বটে, কিন্তু এই নূতন পরিবারভুক্ত হওয়াতে সে অভাব তেমন করিয়া অনুভব করিতে পারিত না। প্রথম প্রথম অল্পবয়স্ক ছাত্ররা এখানে আসিয়া পিতামাতা ভাইবোনদের জন্য কয়েকদিন কান্নাকাটি করিত বটে, কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে, কিছুকাল এখানে থাকিবার পরে অকস্মাৎ চলিয়া যাইবার সময়েও অনেকে তেমনি কাঁদিয়া চলিয়া যাইত। পারিবারিক মমত্বের স্পর্শ না পাইলে এমনটি ঘটিতে পারিত না।

তখনকার দিনের শান্তিনিকেতন বিশ্ববিখ্যাত ছিল না, বাঙলা দেশের সকলেও ইহার নাম জানিত না। মাঠের মধ্যে এই ক্ষুদ্র পল্লীর সহিত চারিদিকের গ্রামের আত্মীয়তা তখনো স্থাপিত হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠানের বিচিত্র ধরণের জীবনযাত্রাকে চারিদিকের লোকের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হইত, তাহারা ইহাকে যেন সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখিত। পুলিসও বড় সুনজরে দেখিত না। চারিদিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়াতে এখানকার অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যেন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখনকার দিনে অধ্যাপকদের অধিকাংশই ছাত্রদের সঙ্গে থাকিতেন, একত্র আহার ও খেলাধুলা করিতেন। একসঙ্গে বাস, আহার, খেলাধুলা পরস্পরের মধ্যে অভাবিত নৈকট্য প্রদান করিয়াছিল। বৈদ্যুতিক আলোর প্রবর্তন যুগের এই ক্ষুদ্র পল্লী সন্ধ্যা হইবামাত্র ঘন অন্ধকারে ডুবিয়া যাইত। তখন এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতে আমাদের গা ছম্‌ছম্‌ করিত। রান্নাঘরে যাইবার সময়ে আমরা সকলে একত্র আলো লইয়া যাইতাম—মাঝে মাঝে কাল্পনিক ভীতিতে সন্ত্রাসিত হইয়া ওঠা বিরল ছিল না।

এখনকার শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরা আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। শান্তিনিকেতন এখন বিশ্ববিখ্যাত সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান—বিদ্যুতের আলোতে পথঘাট আলোকিত; বহু শত অধিবাসীর কণ্ঠে রাত্রেও মুখর; চারিদিকের পল্লীর সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র স্থাপিত হইয়া ইহা দেশের অংশ-বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে—খাপছাড়া একটা পল্লীমাত্র আর নাই। ইহাতে পারিবারিক চৈতন্যের যেন কিছু শিথিলতা ঘটিয়াছে। সেজন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই—বয়স বাড়িলে, সঞ্চরণক্ষেত্রের পরিধি বাড়িলে এমনতরো ঘটিয়াই থাকে। কিন্তু আমাদের সময়কার ক্ষুদ্র পল্লীও যে হীনতর ছিল এমন বলি না। তখনকার শান্তিনিকেতনের এক রস ছিল, এখনকার শান্তিনিকেতনের অন্য রস। তবু প্রাচীনকালের অধিবাসীদের যেন সেই রসটাই বেশি ভালো লাগিত।

এই আত্মীয়তার জালে অনুচর, পরিচর এমন কি গাছপালাগুলি পর্যন্ত যেন ধরা পড়িয়াছিল। ইহাদের বাদ দিয়া তখনকার প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা চিন্তা করিতে পারি না—ইহাদের অনেকেই আশ্রমের বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথমে পাকশালার কথা ধরা যাক্‌। এখানকার পাচকেরা সকলেই রাঢ়ী ব্রাহ্মণ—হিন্দুস্থানী বা উড়িয়া নহে। ইহাদের আবার অধিকাংশের বাস বীরভূম বা বাঁকুড়াতে। পাকশালার প্রধান পাচক ছিল সতীশ গাঙ্গুলী। প্রৌঢ়, একহারা লম্বা চেহারা; বড় ভারিক্কি চাল, চিবাইয়া চিবাইয়া কথা বলিত। বড় ছেলেরা এমন কি অধ্যাপকরা পর্যন্ত তাহাকে 'আপনি' বলিত, 'গাঙ্গুলী মশাই' বলিত; আমাদের তো তাহার সঙ্গে কথা বলিতেই ভয় করিত।

আর একজন পাচক ছিল—চণ্ডীঠাকুর, বোধ করি চণ্ডিদাস কিছু হইবে। বেঁটে, ফর্সা, চুল ঈষৎ কোঁকড়া, বয়স গাঙ্গুলীর চেয়ে কিছু কম—উদরে প্রচুর মেদ সঞ্চিত হওয়াতে তাহার নাম পড়িয়াছিল চণ্ডীভুঁড়ি। তাহার সামনে অবশ্য বিশেষণটা ব্যবহার করিতাম না—কিন্তু সে জানিত। তাহার সঙ্গে কিছু আবদার চলিত। বরাদ্দের অতিরিক্ত কিছু চাহিলে সে গৌরব বোধ করিয়া খুশি হইত। বলিত,—কেনে বাবা, গাঙ্গুলীর কাছে চাও না কেনে? এখন বুঝি চণ্ডীভুঁড়িকে মনে পড়ে। সে বোধহয় মনে মনে গাঙ্গুলীর মর্যাদাকে ঈর্ষা করিত। আমার মুস্কিল হইয়াছিল এই যে, চণ্ডিদাস ঠাকুরে ও কবি চণ্ডিদাসে অভেদবুদ্ধি ঘটিয়া গিয়াছিল। অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত কবি চণ্ডিদাসের কথা মনে হইবামাত্র চণ্ডিঠাকুরের চেহারা মনে পড়িত। শান্তিনিকেতন হইতে সুরুল যাইবার পথে একটা আমগাছের গুঁড়ি স্ফীত হইয়া ভুঁড়ির মত হইয়াছিল—চণ্ডিঠাকুরের ভুঁড়ির সাদৃশ্যে সেই গাছটার নাম আমরা দিয়াছিলাম—চণ্ডিভুঁড়ি। গাছটা এখনো আছে—চণ্ডিঠাকুরের বোধ করি অনেকদিন মৃত্যু হইয়াছে।

এবারে রান্নাঘরের খাদ্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। রাঢ়ের কতকগুলি প্রিয়খাদ্য আছে, যেমন কলাইয়ের ডাল, পুঁইশাক, পোস্তর তরকারি, রুই মাছের টক। মাছ আমাদের নিষিদ্ধ বলিয়া শেষেরটার সাক্ষাৎ আমরা পাইতাম না; কিন্তু অপর তিনটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিত। এখন, আমরা অধিকাংশই বাঙলাদেশের অন্য অঞ্চলের লোক—আমাদের পক্ষে ওগুলি দুঃসহ ছিল, বিশেষ কলাইএর ডালটা তো অসহ্য ছিল। আপত্তি করিয়া বিশেষ ফল হইত না; কারণ, পাচকরা সকলেই রাঢ়ের লোক। পুঁইশাক ও পোস্ত অনেক চেষ্টায় অভ্যস্ত হইয়া গেল—কিন্তু কলাইএর ডালের সঙ্গে আমাদের রসনার আপোষ হইল না। তখন আমরা সকলে মিলিয়া একদিন ভাণ্ডার গৃহ চড়াও করিয়া উক্ত ডালের বস্তাটা সশরীরে সরাইয়া ফেলিলাম। বস্টন বন্দরেও নাকি এমনি করিয়া অবাধ্য জনতা চায়ের বাক্সের উপরে রাহাজানি করিয়াছিল! এ ঘটনা অবশ্য অনেকদিন পরের কথা—তখন আমেরিকান বিদ্রোহের গল্প পড়িয়াছি।

আশ্রমের বেতনভোগী নাপিত ছিল গুরুদাস; কিন্তু গুরুদাস নামটা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল, সকলেই তাহাকে আশ্বাস বলিয়া ডাকিত। এই অদ্ভুত নামের মূল কি জানি না। মাঝে মাঝে অনুরুদ্ধ হইয়া সে ইংরেজি বলিত, তখন ওই আশ্বাস শব্দটা ঘনঘন বলিত। বোধ করি তাহাতেই তাহার নাম আশ্বাস পড়িয়াছিল।

ক্রমশ

বিদুষী ভার্যা

- শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় -

১৪

পরদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া নিশাকরের শয়ন-কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যূথিকা দেখিল ইতি-পূর্বেই নিশাকর নিদ্রাভঙ্গের পর নামিয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া প্রথমেই ফুল-বাগানে প্রবেশ করার অভ্যাস নিশাকরের, এ কথা তাহার জানা ছিল। বাগানের এক নিভৃত অঞ্চল হইতে সে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। কয়েকটি পুরাতন গোলাপ গাছের অনাবশ্যক ডাল নিশাকর কাঁচি দিয়া কাটিতেছিল। নিকুঞ্জের ধারের পিছন দিকে উপস্থিত হইয়া যূথিকা বলিল, "সুপ্রভাত ভাই লক্ষ্মণ!"

কাঁচি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্মিত-মুখে নিশাকর বলিল, "সুপ্রভাত। কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে আমি সীতা ব'লে সম্বোধন করলাম না বউদিদি।"

সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "সীতা সম্বোধনের আমি যোগ্য তা অবশ্য বলছিনে; কিন্তু কেন করলে না, সে কথাও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

নিশাকর বলিল, "কারণ, আমি ইচ্ছে করিনে যে, সীতার মতো তুমি দুর্বল-চরিত্র হও। তা-ছাড়া আমার বিশ্বাস, সীতার চেয়ে তোমার চরিত্রবল অনেক বেশি। সুতরাং সীতা ব'লে সম্বোধন করলে একদিক দিয়ে তোমাকে খাটো করাই হয়।"

বিস্মিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "সীতাকে তুমি দুর্বলচরিত্র বলছ ঠাকুরপো!"

নিশাকর বলিল, "বলব না? নিজেকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ জেনেও স্বামীর অন্যায় আব্দারে যিনি নিজের নিষ্কলুষতার পরীক্ষা দিতে রাজি হয়েছিলেন, তিনি দুর্বলচরিত্র নন ত' কি?"

ঈষৎ উচ্ছ্বাসের সহিত যূথিকা বলিল, "না, না, ঠাকুরপো, একে তুমি দুর্বলচরিত্র বলছ কি করে? আমার ত সীতা চরিত্রের এই দিকটাই খুব চমৎকার লাগে। নিজের স্বাধীন মত স্বাধীন সত্তা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিবাদ করতে সামান্য স্ত্রীলোকেও পারে; কিন্তু স্বামীর ইচ্ছার মধ্যে নিজের সত্তাকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে দরকার চরিত্রের বল আর অবিচল ভালবাসা।"

কুঞ্চিত চক্ষে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর বলিল, "আর অচপল ভক্তি নয়?"

গত রাত্রের দিবাকরের সদয় ব্যবহারের স্মৃতিতে মনটা তখনও কৃতজ্ঞ হইয়াছিল; সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ, অচপল ভক্তিও।"

বিস্মিত কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "কি আশ্চর্য বউদিদি! তুমি না একজন উচ্চ-শিক্ষিত আধুনিক মেয়ে? পতিভক্তির এই সেকেলে পুরানো ভঙ্গীকে এমন অসংকোচে প্রশংসা করতে তুমি একটুও কুণ্ঠা বোধ করছ না?"

তেমনি স্মিত মুখে যূথিকা বলিল, "আমি ত' আধুনিক মেয়ে নই ঠাকুরপো, আমি আল্ট্রা-আধুনিক মেয়ে; তাই যে কথা আধুনিক মেয়েরা প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করে আমি তা অকুণ্ঠিতভাবে করি।"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিয়া নিশাকর বলিল, "না, না, বউদি, তুমি আমাকে বেশ একটু ভাবিয়ে তুললে! খুব বেশি পৌরাণিক হ'লে কিন্তু তোমার চলবে না। তোমার ঐ রামচন্দ্র পতিটির মধ্যে ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের অনেক কিছু দৃঢ়তা আর দুর্বলতা আছে। একথা নিশ্চয় জেনো, ও ভদ্রলোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে তোমাকে ফাইট্ দিতেই হবে, আর জয়ী হ'তেও হবে।"

যূথিকার মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "কাল রাত্রেই ত' ভদ্রলোকের সঙ্গে ফাইট্ দিয়েছি; জয়ীও হয়েছি।"

উল্লসিত হইয়া নিশাকর বলিল, "সাধু! সাধু! কিন্তু স্কুলের বিষয়েই ত' ফাইট?"

"তা নইলে আর কোন্ বিষয়ে।"

আগ্রহ সহকারে নিশাকর বলিল, "বল, বল, সমস্ত কথা খুলে বল!"

যূথিকা বলিল, "অনেকক্ষণ তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, কাজ শেষ কর। চা খাওয়ার পর বলব অখন।"

নিশাকর বলিল, "সে ধৈর্য থাকলে এতদিন অনেক কিছু করতে পারতাম। চল, ঐ বেঞ্চে ব'সে সব কথা শুনি।"

উভয়ে গিয়া বেঞ্চে উপবেশন করিল। সেতার ও এসরাজের ঐক্যতান বাদনের পরও গত রাত্রে দিবাকর এবং যূথিকার মধ্যে স্কুল পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। যূথিকা সংক্ষেপে সে সকল কথা নিশাকরকে শুনাইল।

খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "সাধে কি আমি সেদিন তোমাকে স্টিম্‌-লাঞ্চ আর দাদাকে গাধা বোট বলছিলাম। তুমি ত' একেবারে চটেই লাল!"

সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "চটিনি ঠাকুরপো, আপত্তি করেছিলাম। কারণ, আমি ত' জানি, তোমার স্টিম লাঞ্চ কতবার তোমার দাদার আগে আগে চলে, আর কতবার পিছনে পিছনে যায়।"

নিশাকর বলিল, "কিন্তু আমি চাই যে, স্টিম লাঞ্চ কখনো দাদার পিছনে পিছনে না যায়। হয় আগে আগে চলে, নয় পাশে পাশে। 'হে আর্য পুত্র, আপনার মত ছাড়া দাসীর আর দ্বিতীয় মত নেই'—"

এ কথা আর আধুনিক স্ত্রীর মুখে চলে না। 'তোমার গরবে গরবিনী'র যুগ গত হয়েছে।"

যূথিকা বলিল, "আচ্ছা, আসুক আগে ঊর্মিলা এ সংসারে, তারপর তার কানের মধ্যে এই মন্ত্রগুলো ঢুকিয়ে দোবো। তখন চোলো তাকে স্টিম লাঞ্চ্ ক'রে তার পিছনে পিছনে গাধা বোট হয়ে," বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিশাকর স্মিতমুখে বলিল, "স্টিম লাঞ্চের যোগ্যতা নিয়ে যদি ঊর্মিলা কখনো আসে, তা হলে তার পিছনে পিছনে চলার সৌভাগ্যকে তোমার আজকের আশীর্বাদের সুফল ব'লে মনে করব। কিন্তু শোনো বউদি, দাদার মতি-গতি যখন ফিরেছে, তখন ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলে স্কুল প্রতিষ্ঠা শেষ করে তারপর নিঃশ্বাস ফেলা।"

বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যূথিকা বলিল, "এ বিষয়ে তোমার সংগে আমি একমত।"

১৫

সেই দিনই বৈকালে কুলপুরোহিত বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থের তলব পড়িল উদ্বোধনের শুভদিন স্থির করিবার জন্য। পাঁজি দেখিয়া নানাপ্রকার বিচার বিবেচনা করিয়া বাণীকণ্ঠ স্থির করিলেন ১১ই পৌষ, ২৮শে ডিসেম্বর।

পরদিন সকাল বেলা দিবাকর, নিশাকর এবং যূথিকা অফিস ঘরে মিলিত হইয়া যথাবিধি শাসন-সংসদ, অর্থাৎ গভর্নিং বডি গঠিত করিল। সংসদের অধিনায়ক অর্থাৎ ডিরেক্টার হইল দিবাকর, যূথিকা হইল সেক্রেটারী, অর্থাৎ সম্পাদিকা এবং নিশাকর হইল সহযোগী সম্পাদক অর্থাৎ জয়েণ্ট সেক্রেটারী।

অল্প সময়,—মাস আড়াইয়ের মাত্র দুই চার দিন বেশি; ইহারই মধ্যে সকল ব্যবস্থা শেষ করিতে হইবে। স্থির হইল উপস্থিত বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র গৃহ নির্মিত না করিয়া জমিদার ভবন হইতে অল্প দূরে একই প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা যে একতলা পাকা বাড়ি আছে, প্রয়োজন মত পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত করিয়া আপাতত তাহাতেই কাজ চালাইতে হইবে। রাজসাহী হইতে পুরাতন কণ্ট্র্যাক্টর ও হেড মিস্ত্রি আসিয়া কাজ বুঝিয়া ইট বালি চুণ প্রভৃতি মাল-মসলার হিসাব করিয়া দিয়া গেল। কলিকাতার এক পরিচিত বড় কাঠের কারখানায় স্কুলের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপত্র ও পাঁচখানা পাল্কীর ফরমাস দেওয়া হইল। পাঠ্য-পুস্তক ও পঠন-সূচী প্রস্তুত হওয়ার পর কলিকাতা হইতে এক বিখ্যাত পুস্তকালয়ের কর্মচারী আসিয়া বাঙলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি মিলিয়া প্রায় এক হাজার টাকার মূল্যের পুস্তকের অর্ডার লইয়া গেল। কয়েকটা মুখ্য সংবাদপত্রে স্কুলের প্রধান এবং অপরাপর শিক্ষয়িত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। চতুর্দিকে নানাবিধ কর্মপরতার আলোড়ন জাগিয়া উঠিল।

গ্রামের কয়েকজন মহিলাকে লইয়া একটা কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত করিয়া যূথিকা প্রচারকার্য আরম্ভ করিয়া দিল। সে স্বয়ং পাল্কী চড়িয়া মনসা-গাছার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসিল, এবং নিকটবর্তী গ্রামসমূহে কার্যনির্বাহক সমিতির অপর সদস্যাদিগকে পাঠাইতে লাগিল। ফলে, বালিকারা উৎফুল্ল হইল, জননীরা সন্তুষ্ট হইল, বৃদ্ধারা পরিহাস করিল এবং অভিভাবকেরা বায়-বৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়া চিন্তিত হইল।

ছুটির শেষে কলিকাতায় ফিরিবার দিন নিশাকর বলিল, "খুব খুশি হ'য়ে চললাম বউদি, চমৎকার কাজ এগোচ্ছে। ২৮শে ডিসেম্বর ফিরে এসেও যদি এই রকম খুশি হই, তা হ'লে চাই-কি, সেক্রেটারীর পদ থেকে তোমাকে বরখাস্ত ক'রে জয়েণ্ট ডিরেক্টারের পদে বসিয়ে দিতে পারি।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া যূথিকা হাসিতে লাগিল।

দিবাকর বলিল, "তবু ভাল, জয়েণ্ট ডিরেক্টারের পদে! তা নইলে যূথিকাকে ডিরেক্টারের পদে বসিয়ে আমাকে ডিগ্রেড ক'রে সেক্রেটারীর পদে বসালেই গিয়েছিলেম আর কি! পাথরের ঠাকুর হ'য়ে তবু এক রকম চ'লে যাচ্ছে। পুরুত ঠাকুর হ'লে আর রক্ষে ছিল না!"

নিশাকর বলিল, "এ কথা আমি স্বীকার করিনে দাদা। ডিরেক্টারের কাজ তুমি যে রকম চালাচ্ছ তাতে তোমাকে—"

নিশাকরকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সহাস্য মুখে দিবাকর বলিল, "তাতে আমাকে শ্রীযুক্ত তথাস্তু বলাও চলে। যা কিছু তোরা দুজনেই ত' করিস, আমি শুধু করি তথাস্তু। এই বই ত' নয়।"

যূথিকা বলিল, "কিন্তু আমাদের সংগে মতের অমিল না হ'লে তথাস্তু করা ছাড়া উপায় কি আছে?"

দিবাকর বলিল, "তোমাদের সংগে মতের মিল না ক'রেও ত' উপায় নেই; না করলেই যে ভুল করব। কিন্তু সে কথা থাক্।" নিশাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কলকাতা গিয়েই সভাপতি স্থির ক'রে ফেলবি নিশা। নামজাদা লোক সভাপতি হ'লে সকলের উৎসাহ বাড়বে।"

যোগ্যতা অনুসারে ক্রমিক সংখ্যা দিয়া কয়েকজন সম্ভাবিত সভাপতির নামের তালিকা করা হইয়াছিল। নিশাকর বলিল, "বাঙলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ লোককে সভাপতি করব, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো। আমাদের লিস্টের এক দুই, তিনের নীচে যাবে না।"

"সুনীথদার সাহায্য নিস্।"

"নিশ্চয় নোব।"

কিন্তু সুনীথনাথের সাহায্য লইয়াও এক দুই তিনের মধ্যে ত দূরের কথা, লিস্টের কোনো সভাপতিই স্থির করা গেল না। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নিশাকর লিখিল, "বড়দিনের সময়ে কলকাতায় আর কলকাতার বাইরে এত সভাসমিতি যে, পছন্দ মত কোনো সভাপতিই পাওয়া গেল না। যা দু-একজন পাওয়া যেতে পারে তাদের চেয়ে সুনীথদাদা ভাল।"

যূথিকাকে নিশাকরের চিঠি দেখাইয়া বলিল, "কিন্তু সুনীথদাদা যত উপযুক্তই হোক, তবু গেঁয়ো যোগী, লোকে যথেষ্ট উৎসাহ পাবে না। তা হ'লে কি ঈস্টার পর্যন্ত পেছিয়ে দেওয়া যাবে?"

মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "না না

(শেষাংশ ২৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কিং কর্তব্যম্

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

আজকাল সংবাদপত্রের মারফত শোনা যাইতেছে যে, বর্তমান বিশ্বব্যাপী মহা সমরের পর ভারতবাসীরা নিজেদের মনঃপূত কনস্টিটিউসন অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার্থ নিয়মাবলী নিজেরাই রচনা করিতে পারিবে। একথা অবশ্য শাসক শ্রেণীর নিকট হইতে বহুদিন হইতেই শোনা যাইতেছে। কিন্তু তাহাদের মতে যেহেতু ভারতীয়েরা একমত হইতে পারে না, সেইজন্য স্বাধীনতাও তাহারা অর্জন করিতে পারিতেছে না।

ভারতীয় জীবনে দ্বন্দ্বভাব

আপাতদৃষ্টিতে এই তথ্য বড়ই শ্রুতি-মধুর ও বিচারসহ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কাহারা একমত হইতে পারিতেছে না তদ্বিষয়েও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সাধারণত বলা হইয়া থাকে, হিন্দু ও মুসলমানেরা একমত হইতে পারে না; হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে প্রাদেশিক, ভাষাগত ও জাতিভেদের প্রাচীর দ্বারা পরস্পর পৃথক ও স্বতন্ত্রাবস্থায় বাস করে। তাহাদের মধ্যে বারজাতির তের হাঁড়ী প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ভারতে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়ের লোক আছেন যাঁহাদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ পৃথক। এক কথায়, ইঁহারা রিসলী ও গ্রিয়ারসনের অভিমত পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে চাহেন যে, ভারতীয়দের জীবনে কোথাও এমন স্থান নাই যেখানে তাহারা জাতীয় ঐক্য প্রদর্শন করিতে পারে; ভারত কেবল কতগুলি লোকসমষ্টির যায়গা, তাহাদের "নেশন" (একজাতীয়তা) বিবর্তনের কোন মালমশলা নাই। Pax Britannica ই (ব্রিটেন প্রদত্ত শান্তি) একমাত্র স্থান যেখানে তাহারা একত্রিত হইতে পারে।

এগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের পুরাতন যুক্তি। তৎপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায় হঠাৎ দেখা গেল যে 'অ-মুসলমান'দের জাতিগুলিও আছে। আর ইহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য তদনুকূল নরতাত্ত্বিক প্রমাণও আবিষ্কার করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা Caste-Hindus এবং Suppressed or Depressed—Hindus or Schedule-Hindu Castes হিন্দুদের মধ্যে মূলজাতিগত (racial) বিভেদ দেখা গেল। এক্ষণে আবার শোনা যাইতেছে 'অত্যাচারিত' অর্থাৎ Oppressed Hindu-Castes নামে জাতিসমূহ আবিষ্কৃত হইয়েছে! তাহারা আবার কোন্ মূলজাতিগত লোক (racial element) তাহারও অনুসন্ধান অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরাই করিবেন, ইহাও সুনিশ্চিত।

এহেন ভারতে একজাতীয়তা ও সেই লোকদের স্বাধীনতা ভোগ কি প্রকারে সম্ভব? পুনঃ এহেন শতধা-বিচ্ছিন্ন জনতা (crowd) যাহার উপযুক্ত নাম না থাকায় 'অ-মুসলমান' নামকরণ করা হইয়াছে, তাহার হস্তে, একমাত্র একতাপ্রাপ্ত ও অবিভক্ত সংখ্যালঘু ও ধর্মে মুসলমান ভারতীয় লোক-সমষ্টির ভার কি প্রকারে দেওয়া যায়?

অবশ্য কাগজে এসব যুক্তি পড়িতে নেহাৎ মন্দ লাগে না এবং বেশ মুখরোচকও বটে। বিশেষত যখন এই সকল কথা লাটমুখো লোক দ্বারা সরকারী বা আধা-সরকারী কাগজপত্রে বা পুস্তকাদিতে প্রকাশিত হয় তখন তাহা অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়াই গৃহীত হয়! তাহার বিপক্ষে তর্ক করা অশাস্ত্রীয় ও পাপ বলিয়া গণ্য হয়, কারণ আর্ষেয় বাক্যে সন্দেহ করিলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হয়—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি', ইহা শাস্ত্রেরই বচন। উপস্থিতক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য, এই বিষয়ে আমাদের মনস্তত্ত্ব কি? এই সকল যুক্তির সত্যতা যাচাই করিয়া দেখা যাউক না কেন? পণ্ডিত ও সত্যকারের বৈজ্ঞানিকেরা এইসব বিষয়ে কি বলেন?

গোলাম মনোবৃত্তি

গোলামের মনোবৃত্তির রহস্য ভেদ করা কঠিন, তাহার যুক্তির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে না। এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার নানাদিক হইতেই চেষ্টা হইয়াছে। ফার্সী কবি সেখ সাদী বলেন, "বন্দা খোয়াইস নিস্ত, বন্দা হুকুম খাবিন রস্ত", অর্থাৎ গোলামের স্বকীয় ইচ্ছা বলিয়া কোন জিনিস নাই, তাহার নিকট মনিবের হুকুমই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত। সাধারণত গোলাম-মনোবৃত্তির ইহা একটি অতি সুন্দর বিশ্লেষণ। কিন্তু ভারতীয় সাধারণের, বিশেষত একশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুর মনস্তত্ত্বের পক্ষে এই ব্যাখ্যান খাটে না। সুতরাং ইহার ভিত্তি অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

অনেকদিন যাবত এইদেশে একটা কথা চলিত আছে, হিন্দুর শত্রু হিন্দু। একথা আজও সত্য। ভারতকে অণু-পরমাণুতে বিভক্ত করিয়া ধূলিসাৎ করিবার জন্য যে মস্তিষ্কের প্রয়োজন তাহা হিন্দু-ই তো যোগাইতেছে, হিন্দুকে বিকৃত ও বিভৎস আকারে চিত্রিত করিবার জন্য যে কলা প্রয়োজন তাহাও হিন্দুই যোগান দিতেছে। ইহার কারণ কি? প্রথম, একশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের অজ্ঞতা, দ্বিতীয়, অপর একশ্রেণীর লোকের 'অর্থ-চিন্তা চমৎকারা' প্রভৃতি সঞ্জাত কারণবশত মস্তিষ্ক ভাড়া দেওয়ার প্রবৃত্তি, তৃতীয় একদল লোকের শ্রেণীস্বার্থ।

বাল্যকাল হইতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে শোনা যাইতেছে, হিন্দুসমাজ শতধা-বিচ্ছিন্ন, আর মুসলমান সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ সমাজ ইত্যাদি। এই উক্তির সত্যতা কখনও নিরূপণ করা হয় নাই। ইহার পূর্বে সংস্কারকগণ বলিয়া গিয়াছেন, হিন্দুর জাতিভেদ আছে, সে পুতুল পূজা করে, পাঁঠা বলি দেয়, ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ভোজন

করায় ও তাহার কথায় ওঠে-বসে ইত্যাদি; অতএব তাহার উন্নতি কি-প্রকারে সম্ভব? সুতরাং, সেইজন্য হয় ইউরোপীয়দের ধর্ম গ্রহণ কর, না হয় তাহাদের সভ্যতা গ্রহণ করিয়া নিজেদের সংস্কার সাধন কর—এছাড়া আর অন্য উপায় নাই, 'নান্যপন্থা অয়নায়'।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এই ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ কি? ইউরোপীয় ধর্মের সহিত ভারতীয় ধর্মের তুলনামূলক অনুসন্ধান প্রভৃতি দ্বারা নিজেদের অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা আদৌ করা হয় নাই। সংস্কারকেরা বাস্তব কর্মের লোক, বলাও যেমন, কার্যকরাও তেমন; তাহারা কেহ কেহ ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করিয়া ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া 'বন্দ্য-ঘাটি' বংশোদ্ভব ব্যক্তি 'বন্দো' হইলেন (এই প্রকারে লেখক একজনকে 'ব্রাইস' নাম গ্রহণ করিতে শুনিয়াছেন) কেহ বা 'দত্ত' হইতে 'দুত' হইলেন (ইহার মধ্যে কেহ কেহ 'দুতন'ও হইয়াছেন), 'কালী' 'কলি' হইলেন। এতদ্বারা তাহারা হয় একটা নূতন ভারতীয় জাতি সৃষ্টি করিলেন, অথবা বর্ণ-সঙ্কর আধা-ভারতীয় এবং আধা-ইউরোপীয় সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। আবার কেহ কেহ মাঝামাঝি নূতন ধর্ম ও সমাজ সৃষ্টি করিলেন। শিক্ষিত বাকী সকলে নাম বদলাইলেন, 'বন্দ্য-ঘাটি' বোনার্জি হইলেন, চক্রবর্তী 'চাকেরবাটি', মিত্র 'মিটার' হইলেন, ঘোষ 'গস' হইলেন, বসু 'বোসি' হইলেন, ঠাকুর টাগোর হইলেন ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; আশা, সুরাহা যদি সেই দিক হইতেই হয়। কিন্তু যে-ইউরোপের দিকে তাঁহারা তাকাইয়া রহিলেন, সেই ইউরোপ যে দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়, এবং 'সনাতন ধারা' বলিয়া কিছু নাই তাহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন না! ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রথম নজীর দেখাইলেন রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু তিনি ইউরোপের ফরাসী বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং উহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর যেসব নেতৃবৃন্দ ইংলন্ড তথা ইউরোপ গমন করিয়াছেন তাঁহারা বেশীর-ভাগ ইংরেজ-শাসন সৃষ্ট মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক। কাজেই তাঁহাদের দৃষ্টি আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না; এইজন্য ইউরোপের গতিশীল (dynamic) শক্তির সহিত পরিচিত হইলেন না। এইযুগে ইংলন্ডের রাজ-কবি গর্ব ভরে বলিয়াছিলেন,

"Better fifty years of Europe than a cycle of cathay."

অর্থাৎ চীনের একটা কল্পপরিমিত কাল সময় অপেক্ষা ইউরোপের পঞ্চাশ বৎসর শ্রেয় এবং উহাতে মানবের উন্নতি সম্ভব, এই তথ্যই তাহারা পাঠ করিলেন এবং তাহাদের সন্ততিবর্গ অদ্যাপিও উহাই পাঠ করিতেছেন, কিন্তু তাহার অর্থ কয়জন উপলব্ধি করিতেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অনেক ভারতবাসী ইংলন্ডে গিয়াছেন। সেই সময় ম্যাট্‌সিনি, কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস্‌ লন্ডনে অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু আশ্চর্যের কথা কোন ভারতবাসীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ম্যাট্‌সিনির নাম ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন; তাঁহার 'Italia Uni'র (সংযুক্ত ইটালি) আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়া সংযুক্ত ভারত সংগঠনকল্পে "ইন্ডিয়া লীগ" স্থাপন করিলেন (তাঁহার আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তিনি ম্যাট্‌সিনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। তৎপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে লন্ডনে ক্রপট্‌কিন্‌, প্লেখানভ্‌, লেনিন প্রভৃতিও তথায় বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত কোন ভারতবাসীর আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কেবল প্যারিসে বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ক্রপট্‌কিনের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের আলাপ হইয়াছিল। স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যেরাই উক্ত সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই লন্ডনপ্রবাসী জনৈক চীনা বৈপ্লবিক যুবক রাজনীতিক কারণে হঠাৎ খ্যাতনামা হইয়া উঠেন—তিনি সুন-ইয়াৎ-সেন। তাঁহার সহিতও তৎকালে ভারতীয়দের সাক্ষাৎকারের কোন সংবাদ জানা যায় না। কেবল লেখকের মধ্যম ভ্রাতার (শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত) সহিত ব্রিটিশ মিউজিয়মে আকস্মিকভাবে তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বহু-পরে জাপান ও আমেরিকাপ্রবাসী জাতীয়তাবাদী ভারতীয়গণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। এই সকল কথা এখানে উল্লেখ করা হইল এই কারণে যে আমাদের দেশের যুবকগণ শিক্ষা-লাভার্থে অনেকদিন হইতেই বিদেশে গমন করিতেছেন, কিন্তু সেখান হইতে তাঁহারা কি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আনিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা স্বস্ব দেশকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন? তাঁহারা যদি যথার্থ জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই বিদেশে প্রবাস-জীবন যাপন করিতেন, তাহা হইলে এই সকল খ্যাতনামা বিদেশী লোকদের আদর্শ ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়া অনেকে লাভবান হইতে পারিতেন। তুলনামূলক বিচারপদ্ধতিতে অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা তাঁহারা দেশের সমস্যাগুলির বিচার করিতে পারিতেন এবং সমস্যার সমাধানের সুবিধাও করিতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহারা আগে ব্রিটেনে গিয়াছেন, তাঁহারা হয় আইন, সিভিল সার্ভিস্‌ অথবা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। ইংলন্ড ও ইউরোপের রাজনীতিতত্ত্বের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতিতত্ত্বের সহিত তাঁহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। তাঁহারা ইংরেজি ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার সহিত পরিচিত ছিলেন না। কাজেই ইংরেজি পাঠ্য পুস্তকেরই জাবর কাটিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মনীষাসম্পন্ন ছিলেন এবং রাজনীতিতে স্পৃহা ছিল, তাঁহারা জন্‌ ব্রাইট্‌, ব্রাডল কেইন্‌ প্রভৃতি পার্লামেন্টের সভ্যদের সহিত পরিচিত হইতেন। ইঁহারাও ভারত সম্পর্কে দুই একটা ভাল কথা মধ্যে মধ্যে বলিতেন; ইহাই ছিল উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র। এই যোগাযোগের ফলে ইংলন্ডের ম্যানচেস্টার দলের রাজনীতি (Manchester School of Politics) আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতাদের রাজনীতিক আদর্শ হয় এবং উহা এখনও আছে।

বুর্জোয়া দলের আদর্শ

এই আদর্শগুলি ব্যক্তিগত খামখেয়ালীর দ্বারা পরিচালিত হয় নাই, ইহার পশ্চাতে ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা আছে। ভারতে ইংরেজ সরকার কর্তৃক একটা মধ্যবিত্তশ্রেণী সৃষ্ট হয়। ইহারা ইংরেজ সাম্রাজ্যের কুক্ষি হইতে উত্থিত এবং ইংরেজ সভ্যতার ইতিহাস ব্যতীত অন্য সভ্যতার ইতিহাসের সহিত পরিচিত নয়। মেকলের ভবিষ্যদ্বাণী "ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিয়া গঙ্গাতীরের কৃষ্ণবর্ণ যুবকেরা আমাদের সেক্সপীয়র ও মিল্টন পড়িবে এবং আমাদের সভ্যতারই স্পর্ধা ও বড়াই করিবে" ইঁহারা সফল করিয়াছেন! তাঁহার এই আশা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। এইজন্য অন্য সভ্যতার কথা ভাবিতেই পারা যায় না, আজ নিজেদের অতীত বিস্মৃতপ্রায়, নিজেদের ইতিহাস হাস্যকৌতুকের গল্পে পরিণতপ্রায়। তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক বড় বাঙালীর কাছে বাঙালীর সম্পর্কে স্টুয়ার্ট ও মেকলে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সত্য। শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে পুরাতন ইউ-রোপীয় সংস্কৃতভাষাবিশারদগণ বেদ প্রভৃতি বিষয়ে যে তথ্য ও সংবাদ দিয়া

গিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সত্য...সরকারী ইউরোপীয়েরা ভারতীয় ঐতিহ্য, ভাষা, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব—এককথায় ভারতীয় কৃষ্টি সম্পর্কে যাহা বলিয়া গিয়াছেন বা এখনও এই দল হইতে যাহা বলা হইতেছে তাহাই একমাত্র অভ্রান্ত সত্য! ফলে ইহা বিশ্বাস করা হইয়া থাকে যে, বাহির হইতে শ্বেতবর্ণের 'আর্য' নামধারী ব্যক্তিরা আসিয়া প্রাচীন ভারতীয়দের জয় করে, আর বৈদিক জাতিসমূহ যে শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট ছিল না, তাহা শোনাও পাপ! উপস্থিত বড় বড় মনীষিগণ জার্মানি বা উত্তর ইউরোপ অথবা সাইবেরিয়া হইতে লালমুখ, নীলচক্ষু, কটা চুলবিশিষ্ট নর্ডিক (Nordic) জাতিকে বৈদিক জাতি বলিয়া ভারতে শুভাগমন করাইয়াছেন! বৈদিক লোকেরা নাকি এইরূপ চেহারার লোক ছিল—ইত্যাদি!

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদের বুদ্ধিশক্তির বিজয় সম্পূর্ণভাবেই হইয়াছে! মুসলমান শাসনকালে যাহা হয় নাই, এই যুগের শিক্ষায় তাহা হইয়াছে এবং তাহাও সম্পূর্ণভাবেই! সুতরাং এই শিক্ষার ফলে লোকের গোলামী মনোবৃত্তি পরিপুষ্টিই লাভ করিতেছে। তুলনামূলক শিক্ষা প্রাপ্তির অভাবেই উক্ত মনোবৃত্তি মনে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া আছে, বাল্যকাল হইতেই ইউরোপীয়দের দ্বারা ভারতীয় কৃষ্টির ব্যাখ্যা পুস্তকাদিতে পড়ান হইতে থাকে, কাজেই উহার একটা দাগ মনে পড়িয়াই গিয়াছে; তদুপরি বিজিত জাতির মনস্তত্ত্ব—বিজেতৃ জাতি মনিব বা প্রভু যাহা বলে তাহাই অভ্রান্ত ও একমাত্র সত্য-ও মনের উপর বিশেষভাবেই কার্যকরী হইয়াছে; মনিবের 'গোড়ে গোড়' দিলে অথবা গণ্ডায় এন্দা দিলে অন্ন-সমস্যার সমাধান হয়—এই সকল উপাদানের একত্র সমাবেশের ফলে গোলামী মনস্তত্ত্ব-এর সৃষ্টি হইয়াছে।

বিজ্ঞানে শ্রেণী-স্বার্থ

আজকালকার ইউরোপের চরমপন্থীরা বলেন, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতির পশ্চাতে শ্রেণীস্বার্থও বিদ্যমান থাকে। তাঁহারা বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া সভ্যতাকে কায়েমী করিবার জন্য বিজ্ঞানকেও বিকৃত করা হইয়াছে। বর্তমান শ্রমশিল্প সভ্যতার পশ্চাতে রহিয়াছে মূলধনীদের টাকা; ইহার জোরে তাঁহারা ধনতন্ত্রবাদীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু ধনতন্ত্রবাদের শোষণ-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকল্প-প্রয়াস চলিতেছে। কাজেই গণসাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করা প্রয়োজন; এইজন্য তাহাদিগেরই ইতিহাস হইতে দেখান প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যে, উক্ত অবস্থাই মানবের পক্ষে সনাতন ও শাশ্বত! এইজন্য বিজ্ঞানকে তাহাদের শ্রেণীস্বার্থে লাগান প্রয়োজন; আর সেই উদ্দেশ্যে বুভুক্ষু বৈজ্ঞানিকদিগের ভাড়া করা, পরিচালনা করা শক্ত নয়। কাজেও হইয়াছে তাহাই; মানবচিন্তার সকলক্ষেত্রে তাহাদের সেন্সরের কলম চালান হয়। সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপে উদ্ভূত হওয়ার পর তৎসঙ্গে তাহাকেও লাগান হইল। কাজেই নরতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদের কাজে লাগান হইল। ইহারই ফলে বিভিন্ন প্রকারের Race Theory (মূলজাতি সম্বন্ধে মতবাদ) বাহির হইল—'white man's burden' (শ্বেতকায় লোকের বোঝা), Control of the Tropics (গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলির শাসন), Race-Theory of the whitemen (শ্বেত জাতির শ্রেষ্ঠত্ব), Nordicism (নর্ডিক মতবাদ)। শেষোক্ত মতের অর্থ এই, জার্মানগণই একমাত্র নর্ডিক জাতি (নীলচক্ষু ও কটা চুলবিশিষ্ট মানব); সুতরাং তাহারাই একমাত্র আর্য এবং এইজন্যই তাহারা জগতের শাসকজাতি! বিজ্ঞানে স্বজাতীয়তা প্রেম দেখিয়া অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন! কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের উৎকট জাতীয়তাবাদীয় শক্তির সম্মুখে কেহই টিকিতে পারেন নাই! অনেকদিন আগেই 'জ্যান ফিনো' নামক ফরাসী সমালোচক বলিয়াছিলেন যে, 'আর্য' মতটা 'ইন্ডো-ইউরোপীয়' মতে পরিণত হয়, তাহাও আবার জার্মান মতে পরিণত হয়। ইহার অর্থ, বেদের 'আর্য' নামটি ম্যাক্সমূলার ইউরোপে প্রচলন করেন। তিনি ইহার অর্থ বেদের আর্যভাষা বুঝিয়াছেন। কিন্তু জার্মান-স্বজাতিপ্রেমিকতা ইহাকে নিজজাতির প্রতি প্রয়োগ করিয়া বলিল, জার্মানরাই একমাত্র "আর্য" এবং তাহারাই পৃথিবীশাসন করিবার পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত। তবে প্রাচীন ইতিহাসকে না উড়াইয়া দিয়া তাহারা বলিলেন, জার্মানেরা গ্রীসে যায় এবং পারস্য ও ভারতে গিয়া তথাকার 'আইরা' ও আর্য নামে পরিচিত হয়! ইহার চিহ্নস্বরূপ এই সকল দেশের দেবতাদের নীলচক্ষু ও কটা চুলবিশিষ্ট ছিল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন (এই অপব্যাখ্যা সম্বন্ধে ইটালীয় নরতাত্ত্বিক সার্জির "the Mediteranean Race" দ্রষ্টব্য)।

এক্ষণে কথা এই, নর্ডিক মতবাদের পশ্চাতে যে-বৈজ্ঞানিক সত্য বা সাম্রাজ্যবাদীয় স্বার্থই থাকুক না কেন, ভারতীয়গণ সেই তালে নাচিবে কেন? এই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথমে নিজেদের সম্বন্ধে প্রায় পরিপূর্ণ অজ্ঞতা, তজ্জন্য শাসকশ্রেণী বা ইউরোপীয়েরা যাহা বলে তাহাই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত, শ্রেণীস্বার্থ। অনেক ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি নর্ডিক মতবাদে ভারতে ব্রাহ্মণ বর্ণের স্বার্থ ও ভূ-দেবত্ব সংরক্ষণের শেষ খুঁটি বলিয়া মনে করেন, অথচ এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, জার্মানিতে নর্ডিক মতবাদের পরিণতি দেখিয়া ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লেখকেরা এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ইহা নির্জলা সাম্রাজ্যবাদীয় মত এবং একটা দলবিশেষের রাজনীতিক ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে (Haddon and Huxley, "We Europeans"; Childe, "The Aryans" দ্রষ্টব্য)।

এই সকল আলোচনা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোলামী মনস্তত্ত্ব নানাপ্রকারে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমাদের শ্রেণীগত স্বার্থও লুক্কায়িত আছে। এই স্বার্থ জাতীয়তাবাদ, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে নানাপ্রকারে অন্তর্নিহিত আছে। এইজন্যই এদেশের নবোত্থিত বুর্জোয়াশ্রেণী ইংলণ্ডে গিয়া ইংরেজ বুর্জোয়া জীবনেরই অনুধ্যান করিয়াছেন; স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া "ইঙ্গ-বঙ্গ" (এই অনুষ্ঠান কেবল বাঙলায়ই সীমাবদ্ধ নাই) হইয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাজনীতিতে যোগদান করেন, তাঁহারা ম্যাঞ্চেস্টার স্কুলের মতেরই জাবর কাটিয়াছেন! দেশবাসীর উপর বিদেশীয়ের cultural conquest (কৃষ্টির জয়) কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কংগ্রেসের 'নেহরু রিপোর্টে'র উপর লণ্ডনের New Statesman নামক সংবাদপত্রের অভিমতেই প্রকাশ পায়। এই রিপোর্টের সমালোচনায় বলা হইয়াছিল যে, ইহা English constitution-এরই নকলমাত্র!

আমেরিকায় পূর্বে একটা পরিহাস-বাক্য প্রচলিত ছিল—একজন আমেরিকান মরিলে সে প্যারিসে যায়, প্যারিস তাহার স্বর্গ! সেইরূপ শিক্ষিত ভারতবাসী মরিলে সে কোথায় যায়—নিশ্চয়ই লণ্ডন তাঁহার পক্ষে স্বর্গ!

ভারতীয় বুর্জোয়া স্বার্থ

ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থ হইল ভারতকে দ্বিতীয় ইংলণ্ড করা, অর্থাৎ ভারতীয় জীবনের সর্ববিষয়ে ইংরেজ বুর্জোয়াদের নকল করা। ক্রমে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিক জ্ঞানসঞ্চার হইল। তাঁহারা ইংরেজের দ্বারে দ্বারে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমাদের কিছু সুবিধা (privilege) দাও"। কংগ্রেস ইতিহাসের প্রথমযুগের কর্ম ছিল বৎসরান্তে একবার সমবেত হইয়া কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ডের জনমত স্বপক্ষে আনয়ন

করা। এইজন্য মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরিত হইত। অতঃপর ক্রমবিকাশের ধারায় দ্বন্দ্বভাবের ধারানুযায়ী কংগ্রেসের মধ্যে গরম দলের অভ্যুদয় হইল। এই সময়ের মনোভাব ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আবেদন আর নিবেদনের থালা, বহে বহে নতশির।" এই ধুয়া ধরিয়া তিনি গাহিলেন, "যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে হে মোর স্বদেশ, মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে পরি তার বেশ!" এসব গান তখনকার বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তর্গত নূতনদলের মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক। তখন মধ্যবিত্তশ্রেণী সর্বত্র উদ্ভূত হইয়াছে এবং স্বাবলম্বীও হইয়াছে, ভারত শ্রমশিল্পের (industry) প্রথম স্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে; তাই "হাঁটি হাঁটি পায় পায়" করিয়া সরকারী বাঁধন-দড়ির (apron-string) সাহায্য আর প্রয়োজন নাই। সেইজন্য "স্বাবলম্বন" হইল নূতন দলের মূলমন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ এই মন্ত্রকে সমূর্ত করিবার জন্য "স্বদেশী-সমাজ" রূপ Parallel Government (সরকারী শাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী শাসন) স্থাপন করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে বলিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি আরমেনীয় জাতীয়তাবাদীদের রুশ গভর্নমেন্টের বিপক্ষে উক্ত প্রকারের আড়াআড়ি শাসন প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিলেন। ইতিমধ্যে ভারতে স্বাধীনতাকামী একটি দলেরও উদ্ভব হয় ইহার আদর্শ ছিল 'পূর্ণ স্বাধীনতা।' তাঁহাদের বাঙলা মুখপত্র হইল—'যুগান্তর পত্রিকা'। এই পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ এক প্রবন্ধে অস্ট্রিয়ার ফ্রেডারিক লিস্টের উৎকট জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিক ব্যবস্থা (Economic Nationalism) অবলম্বন করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, এই উপায়ে "সোনার শিকল কাট"।

আজকাল এইসব আন্দোলন ও মন্তব্য শিক্ষিত লোকের নিকট অতি অদ্ভুত ও সাধারণ জিনিস বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু তৎকালে ইহাই ছিল ঘোর বৈপ্লবিক ধ্বনি! পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাই পূর্বের যুগের নবোত্থিত বুর্জোয়া শ্রেণীর মানসিক অবস্থা।

ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের ঢেউ বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর দিয়া ইহার পূর্বে চলিয়া গিয়াছে; একদলের কাছে লণ্ডনই স্বর্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহারই ফলে 'ইঙ্গ-বঙ্গ' সমাজ সৃষ্ট হয়, আর এই সমাজের অনেকেই রাজনীতিক নেতৃত্ব করিতেন। অবশ্য তাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে পিম, হ্যামডেন প্রভৃতির জীবনী হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু উক্ত ইংরেজ নেতাদের কার্যের পশ্চাতে তাঁহাদের যে শ্রেণীগত কঠোর সাধনা ছিল, সেই বিষয়ে তাঁহারা সচেতন ছিলেন না। কংগ্রেস প্যাণ্ডেল ও আইনসভাকে তাঁহারা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট মনে করিতেন এবং কবডেন, ব্রাইট ও গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতার সুর ও স্বরের অনুকরণে তাঁহারা ভাবিতেন যে, জাতীয় পুনরুত্থান সংঘটন করিলেন। এহেন কংগ্রেসকেই গান্ধীজী বলিয়াছেন, তাহারা একটা glorious debating house (বড় তর্কের স্থান) সৃষ্টি করিয়াছিল মাত্র। যাহাহউক, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের ধারায় তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং নিজ নিজ জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই নমস্য।

চরমপন্থার আদর্শ

চরমপন্থীয় বুর্জোয়াদের আদর্শ হইল—'স্বায়ত্তশাসন' (Autonomy) এবং স্বাধীনতাকামীর দল বলিলেন, পূর্ণ স্বাধীনতাই কাম্য। এই সময় ভারতের 'অতি-বৃদ্ধ' দাদাভাই নৌরজী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের অধিবেশনে ঘোষণা করিলেন, "Swaraj is our birth-right" (স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার)। ক্রমশ এই মত সর্বত্র প্রচারিত হইল যে, 'স্বরাজ' বা 'স্বাতন্ত্র্যই' হইতেছে ভারতের জাতীয়তাবাদের আদর্শ।

এইস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, এই মতভেদের কচকচি এবং আদর্শের তারতম্যের পাল্লা দেওয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেই হইতেছিল। তখনও ভারতীয় রাজনীতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বাহিরে প্রসারলাভ করে নাই; তবে অভিজাতশ্রেণী পশ্চাতে থাকিয়া বুর্জোয়াদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। জগতের সর্বত্রই বুর্জোয়াশ্রেণী মনে করে যে, তাহারা জনসাধারণের প্রতিনিধি। ভারতের বুর্জোয়া নেতারাও তদ্রূপ বলিতেন। কিন্তু সমাজ যে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত, সেই সকাল শ্রেণীর স্বার্থও বিভক্ত; সুতরাং একশ্রেণীর উদ্দীপনা অন্য শ্রেণীকে প্রভাবান্বিত করে না। ইহা জাতীয়তাবাদীদের মস্তিষ্কে কখনও প্রবেশ করে না। কিন্তু জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হইতেছে 'Racialism' (মূলজাতির প্রতি প্রেম)—ইহার অর্থ 'জাতিত্ব' বোধ উদ্দীপিত করা। আগে মূল জাতিটা বাঁচুক, তৎপর শ্রেণীসমূহের স্বার্থের কথা বিবেচনা করা যাইবে—ইহা হইতেছে উক্ত আদর্শের মূল কথা। অবশ্য Racialism বা জাতিত্ব আজও সকল জায়গায় কার্যকরী হইতেছে, ইহার এখনও প্রভাব কমিয়া যায় নাই। কিন্তু জাতিত্ববোধ ও শ্রেণীস্বার্থবোধ—সবই আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। 'মনস্তত্ত্ব' বিজ্ঞানের একটি অংশ হইতেছে—Theory of Cognition, অর্থাৎ জিনিসকে বুঝা। বেদান্তের 'আত্মানাং বিদ্ধি' তত্ত্ব ইহারই অন্তর্গত। যতক্ষণ মানবের আত্মচৈতন্য না হয়, ততক্ষণ সে নিজের বিষয়ে সচেতন হয় না; সেইরূপ একটা শ্রেণী নিজের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত না হইলে তাহার শ্রেণী-চেতনা (Class-Consciousness) হয় না। জাতিত্ব সম্পর্কেও তদ্রূপ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতে প্রাচীনকাল হইতে জাতিত্ববোধ (Race Consciousness) কখনও উদ্বুদ্ধ করা হয় নাই। ভারতও অখণ্ড একজাতীয়তা (Nationality) গঠন করিতে পারে নাই। প্রাচীন নেতারা তাহাদের ধর্মগত সাম্প্রদায়িক বোধ ও বর্ণবোধ (Caste-Consciousness) কেবল উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন; অবশ্য ইহার পশ্চাতে ছিল শাসক-শ্রেণীর শোষণ নীতি। পুরোহিততন্ত্র শাসকদের সহিত মিলিত হইয়া লোকদের তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, কেবল তাহাদের ধর্মজ্ঞান প্রদান করা হইত। এই-জন্য ভারতীয়েরা প্রথমত রাজনীতিক জীব না হইয়া ধর্মান্ধ জীবরূপে বিবর্তিত হইয়াছে।

মুসলমান শাসনের যুগে উত্তর ভারতে উভয় সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের ফলে ধর্মগত প্রভেদ দ্বারা একই জাতি পৃথক ও ভিন্ন হইয়া গেল। যখন একই রাজপুত, আহির, জাঠ, গুজার জাতিসমূহের একাংশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইয়া গেল, তখন এক-জাতিত্ববোধের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক পার্থক্যবোধ তাহাদের মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত করা হইল! ফলে লোক আগে হিন্দু বা মুসলমান—পরে সে রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি বলিয়া নিজেকে মনে করিতে লাগিল, আর ভারতীয় একজাতিত্ববোধ বরাবরই ধোঁয়াটে রকমের ছিল। এই কলহে তাহা আরও ধোঁয়াটে হইয়া দৃষ্টির অন্তরাল হইয়া যায়। এই অবস্থা আজও চলিতেছে! অবশ্য গুপ্ত ও অন্যান্য সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে প্রাচীনকালে এক'জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ধর্ম ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহারই ফলে আজ লালমুখ কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ ও দক্ষিণের কালমুখ ব্রাহ্মণ একই গোত্রের, অতএব একবংশের বলিয়া নিজেকে মনে করে। কিন্তু এক জাতিত্ববোধের অভাবে কাশ্মিরী ও দ্রাবিড়ী পৃথক জাতীয় লোক বলিয়া পরস্পরের সহিত সামাজিক আদানপ্রদান করে না।

সামাজিক চিত্রপটকে পশ্চাতে রাখিয়া ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে। তবে ইংরেজী শিক্ষা এবং কেন্দ্রীভূত ইংরেজি শাসনের ফলে সকলেই "ভারতীয়" এই বোধটা উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা কিন্তু এখনও কৃষ্টির ভিতরই গণ্ডীভূত হইয়া আছে। সামাজিক জীবনে এখনও তাহা কার্যকরী হয় নাই।

গান্ধী আন্দোলন

এই প্রকারের রাজনীতিক পরিস্থিতির মধ্যে বিগত মহাযুদ্ধের পর গান্ধীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯২১ খৃঃ অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যে-কর্মপদ্ধতি প্রদান করিলেন, তাহাতে পুরাতন বুর্জোয়া নেতাদের কংগ্রেসে থাকা সম্ভব হইল না। তাঁহারা 'মণ্টেগু সংস্কার' গ্রহণ করিয়া জাতীয় আন্দোলন হইতে নিজেদের অপসৃত করিলেন। গান্ধীজীর দল কংগ্রেস দখল করিল। তিনি যে কর্মপদ্ধতি প্রদান করিলেন, তাহা এদেশে নূতন ও বৈপ্লবিক বলিয়া ধার্য হইলেও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যত অপ্রচলিত উদ্ভট এবং পুরাতন ইউরোপীয় ন্যাশন্যালিস্ট ও সংস্কারকদের মত ও পদ্ধতি হিন্দু আকারে ভারতে গান্ধীবাদ নামে প্রচলিত হয়।

হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা প্রচেষ্টা পরাজিত হইলে ডিক (Deak) নামে এক হাঙ্গেরীয় স্বদেশপ্রেমিক অসহযোগ পদ্ধতি সেই দেশে প্রবর্তন করেন। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্তীকালের কথা। ইহার বহুপরে আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আয়র্লণ্ডে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ইহার নামকরণ হয় 'Sein Fein', অর্থাৎ স্বাবলম্বন। এতদুভয়ের পশ্চাতে থাকে লিস্টের Economic Nationalism (অর্থনীতিক জাতীয়তাবাদ)। এই আন্দোলন জীবনের সর্বক্ষেত্র হইতে বিদেশী প্রভাব অপসারিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। ইহাও গান্ধীবাদে গৃহীত হয়। তৎপর আমেরিকার 'Singletax' মতের প্রবর্তক হেনরী জর্জের কুটীরশিল্পের পুনঃপ্রচলন করিবার মতটি—যাহা ইংলণ্ডের খৃষ্টিয়ান-সোস্যালিস্ট রাসকিন, কিংসলি প্রমুখ নেতারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও ভারতীয় গান্ধীবাদের রথে সংযোজিত হইল। শেষে রুশিয়ার ধর্ম-অ্যানার্কিস্ট টলস্টয়ের অহিংসা মতবাদকে এই মতের প্রাণশক্তি-রূপে প্রতিষ্ঠা করা হইল। তৎপর আসে ফরাসী সিণ্ডিক্যালিস্ট (আনার্কিস্ট) দলের Passive Resistance পদ্ধতি। এই সকল পদ্ধতিকে হিন্দুধর্মের আবরণে ভারতে 'অহিংস-অসহযোগ' নামে প্রবর্তন করা হয়। লোকেও সনাতন বৈদিক ধারার ভিত্তিতে ভারত স্বাধীন করিবার এই প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল (বরিশালের প্রাদেশিক কনফারেন্সে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য; তিনি বলিয়াছিলেন, বেদান্তের উপর এখন ভারতীয় রাজনীতি স্থাপিত হইয়াছে।

ইউরোপের পরিত্যক্ত ঐসব মতবাদ ভারতে প্রচলন করাতেই যেন কেহ মনে না করেন যে, ভারতে যথার্থ গণ-আন্দোলন হইয়াছে। পাতি-বুর্জোয়া মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি এবং কাল্পনিক সোস্যালিস্টদের মত ও পদ্ধতি ভারতে প্রচলিত হওয়ায় কেহ যেন মনে না করেন যে, ভারতে গণ-শ্রেণীর জাগৃতির উদ্বোধন করা হইয়াছে। বরং এই পুরাতন কর্মপন্থা দ্বারা তাহাদের আরও সুষুপ্ত করা হইয়াছে। বিগত মহাসমরের পরে জগতের সর্বত্রই গণ-জাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল। বরং রুশিয়ায় শ্রমিক ও কৃষকশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জগতের মূক গণশ্রেণীর মুখে ভাষা আসে, সর্বত্রই চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—এবং ভারতেও সেই বন্যার ঢেউ আসিয়া লাগে। কিন্তু গান্ধী-আন্দোলনে সেই বন্যার স্রোতের মোড় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ধর্মের হুজুগে ও চরকা (এই শব্দটি মূলত ফার্সী; 'চরখহ্'!) আন্দোলন দ্বারা ম্যাঞ্চেস্টারের প্রস্তুত দ্রব্যাদির বর্জন ও বিতাড়ন এবং অসহযোগ দ্বারা ইংরেজ বুর্জোয়াতন্ত্রের অর্থনীতিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা আর তদ্দ্বারা রাজনীতিক প্রভাবশূন্য বাকো, বিশেষত এই ধর্মান্ধ দেশে মহাত্মা মৌলানা, স্বামী, ব্রহ্মচারীদের রাজনীতিক্ষেত্রে অবতরণ করাইয়া এবং ধর্মের ছেঁদো (বাকচাতুরীময়, কপট) বুলি আওড়াইয়া গণ-সাধারণকে বুর্জোয়াতন্ত্রের রথে পুনর্যোজিত করা হইল। ১৯২১ খৃঃ বাঙলা সরকারের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে যে রিপোর্ট বাহির হয়, তাহাতেই স্বীকৃত হয় যে, এক বৎসরে বাঙলায় ৪৪টি ধর্মঘট হয় এবং বাঙলায় শ্রমিক স্বীয় গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছে (Labour has come to it's own), অর্থাৎ তাহার শ্রেণী-চৈতন্য জাগ্রত হইয়াছে।

গণ-শ্রেণীর উত্থান যে বুর্জোয়াশ্রেণী ভাল চক্ষে দেখেন নাই এবং তজ্জন্য মিলমালিক ও মূলধনীর দল 'চরকা-আন্দোলন ও গান্ধীবাদে'র পশ্চাতে থাকিয়া শ্রেণীস্বার্থ বাঁচাইবার চেষ্টা করেন, তাহা বুর্জোয়া নেতারা অস্বীকার করেন নাই। ১৯২৩ খৃঃ চট্টগ্রাম কনফারেন্সে পরলোকগত যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে, রুশ বিপ্লবের পর গণ-জাগরণের যে-বন্যা ভারতে আসে, মহাত্মাজী তাহার মোড় ফিরাইয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, এই পাতি-বুর্জোয়া আন্দোলন আসলে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন; শুধু পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তবে এই আন্দোলনের দান এই যে, নানা প্রকারের ধর্মের ও অর্থনীতিক উদ্ভট মত ভারতীয় কংগ্রেসে ঢুকাইয়া রাজনীতিকে ঘোলাটে করিয়া রাখিয়াছে।

গণ-আন্দোলন

জাতীয়তাবাদীরা গণ-আন্দোলন চাহেন নাই এবং যেখানে সুযোগ পাইয়াছেন, সেখানেই উহার প্রতিবন্ধকতা করিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্য গণ-শ্রেণীদের (masses) চাহেন, কিন্তু সেটা অন্যপ্রকারে; তাহারা গণসমূহকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের রথে বাঁধিয়া নিজেদের কার্য উদ্ধার করিয়া লইতে চাহেন। এইজন্য তাঁহারা চাহেন Class-Collaboration (শ্রেণী-সহযোগ) অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণী সহযোগিতা করিয়া কার্য করিবে। কথাটা কিন্তু শুনিতে বেশ মনোরম ও শ্রুতিসুখকর, কিন্তু সবল ও শিক্ষিতের সহিত দুর্বল ও অশিক্ষিতের সমানভাবে সহযোগিতা কি প্রকারে সম্ভবে? যেখানে পরস্পরের স্বার্থের প্রতিনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, সেখানে সহযোগ কি প্রকারে হয়? বস্তুত উহা আসলে Class-domination, অর্থাৎ একশ্রেণীর ঘাড়ে আর এক শ্রেণীর চড়াতে পর্যবসিত হয়। ইউরোপে ইহাকেই "ফাসিস্ট" মতবাদ বলা হয়। এই মত বিগত মহাযুদ্ধের পর যখন সর্বত্র শ্রমিক চাঞ্চল্য দেখা দিল, ১৯২৫ সালে যখন পূর্ব ইউরোপে 'সবুজ বিপ্লব' (Green Revolution) হইতে লাগিল, অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপের কৃষকেরা জমিদারের জমি দখল করিতে লাগিল ইত্যাদি, তখন ইউরোপের ধনিকশ্রেণী বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া পড়ে এবং এই সময়েই ফাসিস্ট মতবাদ উদ্ভূত হয়। ধনীশ্রেণী নানা উপায়ে গণ-আন্দোলনগুলিকে দমিত করিয়া শাসনযন্ত্র দখল করে এবং আইন জাহির করিল যে, ধনী তাহার ধন নিয়োজিত করিয়া কারখানাদি স্থাপন করুক আর শ্রমিক দল তথায় খাটিয়া স্বীয় জীবিকা অর্জন করুক। ধর্মঘট, অসহযোগ প্রভৃতি দ্বারা কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে উহা আইনত দণ্ডনীয় হইবে। যদি তাহার কোন অভিযোগ থাকে, তবে তাহা সালিশী বোর্ডে (Arbitration Board) উপস্থিত করা হউক। আর এই দ্বন্দ্বের শেষ বিচার সরকারের হাতে। এতদ্দ্বারা বিগত পঞ্চাশ-

ষাট বৎসর ধরিয়া শ্রমিকের হাতে 'অসহযোগ' রূপে একমাত্র যে শেষ অস্ত্রটি ছিল তাহাও কাড়িয়া নেওয়া হইল। শ্রমিকের কোন অভিযোগের সুরাহা হওয়ার উপায় বন্ধ হইয়া যায়। এখন গভর্নমেণ্ট মূলধনীদের করায়ত্ত, সুতরাং তাহার কথা শুনে কে? জার্মানিতে নাৎসীবাদ আরও ভীষণাকার ধারণ করে! সমগ্র দেশের কল্যাণের নামে Totalitarian State গঠিত হয়; সমাজের সকলকেই একযোগে দেশের কার্য করিতে হইবে, দেশ বড় হইলে দেশেরও সমগ্র লোক বড় হইবে ইত্যাদি। কিন্তু আসলে শ্রেণী সহযোগিতার নামে একটি শ্রেণী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়; ডেমোক্রাটিক শাসনপ্রণালী স্থগিত করা হয়। এ-দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব অন্যান্য দেশের সমশ্রেণীরই অনুরূপ। এইজনাই ফাসিস্টবাদ, নাৎসীবাদ প্রভৃতির এত সুখ্যাতি এই দেশের বুর্জোয়াদের নিকট শোনা যাইত।

কিন্তু নেতাদের মত ও প্রচেষ্টা যাহাই হউক, ক্রমে শ্রমিক, কংগ্রেস, কিষাণসভা প্রভৃতি ভারতের সর্বত্র স্থাপিত হইতে লাগিল। অবশ্য বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ও পুরাতন পন্থার মডারেটগণ এইসব আন্দোলনকে স্বীয় কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে তাহারা সফলকাম হন নাই। শ্রমিক আন্দোলন অনেক ঝগড়া কলহের পরও সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া নেতৃত্ব হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই বটে, তবু 'শ্রেণী-চৈতনা' তাহাদের সকল দলের শ্রমিকের মধ্যেই উদ্ভূত করা রহিয়াছে। 'স্বরাজ' অর্থ শ্রমিকরাজ—ইহা সকল দলেই স্বীকৃত হয় ইত্যাদি। আর কৃষক আন্দোলন কংগ্রেস-পন্থীয় গরমদলের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। সোস্যালিস্ট আদর্শানুযায়ী রাষ্ট্র কৃষকের আদর্শ, একথা প্রথম হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি ইহাও এখানে উল্লেখ করিতে বাধ্য যে, বিহার প্রদেশে কংগ্রেসের বুর্জোয়াশ্রেণী কৃষকসভার অনুসৃত আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন খাড়া করিয়া, এই সর্বব্যাপী আন্দোলনকে ব্যাহত করিতে চেষ্টা করেন; বাঙলায় নানা উপায়ে সেই কর্ম করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আজ কৃষক আন্দোলন গোঁড়া কংগ্রেসপন্থীদের হাতে নাই; যাঁহারা ইহার মধ্যে ছিলেন তাঁহারা নিজেদের অপসৃত করিয়াছেন। আজ ভারতীয় কৃষক আন্দোলন বেশীর ভাগ যায়গায়ই সাম্যবাদীর হস্তে।

কংগ্রেস মনস্তত্ত্ব

জাতীয় কংগ্রেস আজ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখপাত্ররূপে স্থাপিত। আজ পর্যন্ত ইহা ঐ শ্রেণীর দ্বারাই অধ্যুষিত। পুরাতন মতের ও পথের নেতৃবৃন্দের সহিত ইহার বর্তমান নেতাদের কর্মপন্থা এবং আদর্শ পৃথক থাকিলেও, আসলে ইহা বুর্জোয়া আদর্শেই প্রভাবিত। আজ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ণস্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু একমাত্র জাতীয় কংগ্রেসই এই উদ্দেশ্যে সাধনা করে। কাজেই কংগ্রেসের মত ও পথকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেস সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান হইলেও, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়াতন্ত্র অধ্যুষিত। কাজেই ইহার আদর্শ বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদ। এইজন্য ধনিকতন্ত্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠান যাইতে পারে না। ইহার প্রকট প্রমাণ কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত 'মৌলিক অধিকার'-সমূহের সর্তগুলি বিশ্লেষণ করিলেই ধরা পড়িবে যে, ইহার সহিত ফাসিস্ট পদ্ধতির কোন প্রভেদ বা পার্থক্য নাই, বিশেষত শ্রমিক ও মূল শ্রমশিল্প সম্পর্কিত সর্তসমূহ সম্পূর্ণ ফাসিস্ট-পদ্ধতি অনুসারী। এতদ্ব্যতীত কংগ্রেস আজ পর্যন্ত গণশ্রেণী-সমূহের সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করিয়া থাকেন, তাহাদের বাস্তব দুঃখ কষ্ট যাহাই থাকুক না কেন, কংগ্রেসের নামে বা নেতাদের নামে তাহারা দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া স্বাধীনতার সাধনায় প্রমত্ত হইবে। কিন্তু বুর্জোয়াগণ আজ পর্যন্ত একবার বিচার করিয়া দেখিলেন না যে, গণ-সমূহকে যে আহ্বান করা হইতেছে তাহা দেশমাতৃকার বেদীতে আত্মবলিদানের নিমিত্ত, না উক্ত নামে শ্রেণীস্বার্থে তাহারা আহুতি প্রদত্ত হইবে। গণসাধারণ যে সর্বত্র বিশেষভাবে সাড়া দেয় না তাহাই প্রমাণ যে, তাহাদের মনে কি ভাব জাগরিত হইতেছে।

বুর্জোয়া নেতারা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না যে, ভারতীয় জাতীয়-আন্দোলন ১৯২১ সালের যায়গায় পড়িয়া রহে নাই, এই আন্দোলনের রঙ্গমঞ্চ আর তাহাদের একাধিপত্যে নাই, আরও অন্যান্য আদর্শের ও শ্রেণীর নেতারা উত্থিত হইয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগও কম নয় এবং তাঁহাদের অনুগামী লোকসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

সাম্যবাদী আন্দোলন

অনেকদিন হইতে শ্রমিক-আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়া ভারতে সাম্যবাদীয় মত প্রচারিত হইতেছে। ইহাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার জন্য নানাদিক হইতে যতই চেষ্টা করা হইতেছে, ততই ইহা অধিক শক্তিশালী ও প্রসার লাভ করিতেছে। এই আন্দোলন নিজের সম্প্রদায়ের অনেক শহীদ সৃষ্টি করিয়াছে। স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তের একটা লম্বা ফিরিস্তিও রচনা করিয়াছে। এই আন্দোলন যে ভুয়া নয় তাহা দেখা যায় তাহাদের কর্মীদের অদম্য উৎসাহ, কর্মনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগে। এই আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় আছে তন্মধ্যে একটি সুবৃহৎ আকার ধারণ করিতেছে।

সাম্যবাদী আন্দোলনকে ব্যাহত করিবার জন্য নানা প্রচেষ্টা চলিয়াছে। একটি দল উত্থিত হইয়াছে, তাঁহারা কার্ল মার্ক্সের দোহাই দেন বটে, কিন্তু কার্যত গান্ধীবাদী দলের রথে সংযুক্ত। একবার এক সভায় এই দলের এক নেতাকে তাঁহাদের দলের অদ্ভুত নাম করণের সম্পর্কে লেখক প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে নেতাটি বলেন, তাঁহারা মার্ক্সসবাদী এবং এই দলের সৃষ্টি হইয়াছে "To fight the "communists and the reactionaries of the Congress" কিন্তু এই সকল বিষয়ে তাঁহারা কতটা কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা বাহির হইতে যতটা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, তাহাদের মার্ক্সবাদ খুব প্রবল নয়।

এই সঙ্গে ওঠে কম্যুনিস্ট মতাবলম্বীদের কথা। আজকাল প্রায় সকলেই নিজেকে মার্ক্সের সোস্যালিজম-এ আস্থাবান বলিয়া জাহির করেন। তবে যাঁহারা একটা বিশিষ্ট মার্ক্সীয় কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং কম্যুনিস্ট তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহারাই কম্যুনিস্ট পদবাচ্য। আসলে সোস্যালিজম্ ও কম্যুনিজম্ এক জিনিস। বিগত মহা-সমরের পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লেনিন 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' সংগঠন করিলেন এবং স্বীয় দলের জন্য সোস্যালিস্টদের পুরাতন নাম "কম্যুনিস্ট" নামটি গ্রহণ করিলেন। অবশ্য কার্যপদ্ধতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রভেদ সৃষ্ট হইল, 'সোস্যালিস্ট' নামধারী মার্ক্সবাদীগণ পার্লামেণ্ট পদ্ধতি দ্বারা 'শ্রমিকরাজ' আনয়নেচ্ছুক; পক্ষান্তরে "কম্যুনিস্ট" নামধারীরা বিপ্লব দ্বারা উহার প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী।

মতের বিভিন্নতার জন্য সোভিয়েট রুশ ব্যতীত আর সকল দেশেই কম্যুনিস্টরা নির্যাতিত এবং অনেক দেশে এই আন্দোলন বে-আইনী বলিয়া বিঘোষিত ও বিবেচিত। কিন্তু স্টালিনের নেতৃত্বে রুশিয়ায় যখন "Socialism in one country" (সোস্যালিজম্ এক দেশেই আগে প্রতিষ্ঠিত হউক, পরে বিশ্ব-বিপ্লব দেখা যাইবে) মতটি ট্রট্স্কীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রাধান্য-লাভ করে, তখন হইতে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের খুব মাখামাখি বড় কম হইতে আরম্ভ হয়। এই মহাসমিতির দপ্তরখানা মস্কোতেই থাকিত; কারণ অন্য কোন দেশ দপ্তরের

বাৎসরিক অধিবেশন হইতে দেয় নাই বা কেন্দ্রেখানার অফিস স্থাপিত হইতে দেয় নাই। এবং বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া নাকি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বাৎসরিক অধিবেশনই হয় নাই। অবশেষে আমেরিকার নিউ ইয়র্কে একবার অধিবেশন আহ্বান করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বটে কিন্তু আমেরিকান গভর্নমেণ্ট তজ্জন্য অনুমতি প্রদান করেন নাই। বিগত বৎসরে কানাডার পর সংযুক্ত রাষ্ট্র (United States) কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন। সম্প্রতি মস্কো হইতে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক নিজেই দল ভাঙিয়া দিয়াছে। এইজন্য আজ কম্যুনিষ্ট বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক আর নাই, এখন বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি সোস্যালিষ্টদের ন্যায় দেশগত দল। দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে দিয়েই তাহাদের কর্ম করিতে হইবে।

কম্যুনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তৎসম্বন্ধে কাহারও পক্ষে সঠিক কিছু বলা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা ঠিক যে, কম্যুনিষ্ট আন্দোলন এশিয়ায় প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। এশিয়ার কোনগত বর্বরাবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে খামিরের (Leaven) কার্য করিতেছে "Bolshevism." ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ সমগ্র ইউরোপ প্লাবিত করিয়া যেমন বর্তমান ইউরোপ সৃষ্টি করে, বোলচেভিক ও বিপ্লব (Bolshevic Revolution) তদ্রূপ ইউরোপ এবং এশিয়ায় কার্য করিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন বলিয়াছিলেন, ইউরোপে খৃষ্টধর্মের প্রচারের পর 'বোলচেভিক' মতের ন্যায় প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি ("Spiritual force") ইউরোপে আর আসে নাই। এশিয়ায়ও বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ঐশ্লামিক বন্যার পর এত বড় প্রবল শক্তিশালী প্রবাহ আর আসে নাই, বরং ইহাদের অপেক্ষাও সর্ব প্রকারে মুক্ত এবং কৃষ্টিতে উন্নততর মানব এই আন্দোলন সৃষ্টি করিতেছে। সাইবেরিয়ার অসভ্য বর্বর জাতিগুলি, তুর্কিস্থানের অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ মুসলমান, মঙ্গোলিয়ার অজ্ঞ বৌদ্ধ বুরিয়াট ও মঙ্গোল, সকলেই এক নূতন আলোক পাইয়া নূতন মানবরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। আজ বুরিয়াট সোভিয়েট রিপাব্লিকের পরিচালিকা একজন মহিলা—টিসডেনোভা (Tysdenova)। তিনি পূর্বে গোয়ালিনী ছিলেন (Soviet Union News; Vol. II, No. 8, Aug. '43 P. 25 দ্রষ্টব্য)। আর বোখারার সোভিয়েট স্থাপনের অগ্রণী ছিলেন—মামুদ। এখন শ্রমিক চীনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, সেখানকার কম্যুনিষ্টরা চীনের একাংশ শাসন করে এবং আজ ন্যাশন্যালিষ্টদের সহিত সম্মিলিত হইয়া জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে (এদের সম্পর্কে Edgar Snow-র "Scorched Earth" দ্রষ্টব্য); পুনঃ সিংকিয়াং বা পুরাতন চীন-তুর্কিস্থান আজ এক নূতন শাসনাধীনে নূতনভাবে গড়িয়া উঠিতেছে (এডগার স্নো দ্রষ্টব্য)।

এই ভাব-তরঙ্গের ধাক্কা ইরাণ, তুর্কী, আফগানিস্থান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লাগিয়াছে। যেখানে রাজশক্তি সহায় হইতেছে বা কম্যুনিষ্টরা রাজশক্তি করায়ত্ত করিয়াছে, সেখানে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়া নূতন শিক্ষার আলোকে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে। আজ আফগানিস্থানে প্রত্যেকটি চায়ের দোকানে প্রত্যেক যুবকের মুখে মামুদ ও আমিনার গল্প শোনা যাইতেছে (রামনাথ বিশ্বাস—'আফগানিস্থান ভ্রমণ')। সামাজিক অত্যাচারে জর্জরিত ও দরিদ্র মামুদ রুশ সোভিয়েটে শ্রমিকের কার্য করে এবং বোখারায় সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা করিয়া সামাজিক অত্যাচার ও আমিনার অপমৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। আজ বালখের তাজিক, উজবেগ ও তুর্কি তরুণেরা ভারতে pioneer আন্দোলন নাই বলিয়া মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নজীর নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যুবকেরা বলে যে, পুরোহিতেরা আজ দোজখে (নরক) গিয়াছে; কারণ তাহারা আর লোক ঠকাইতে পারে না (পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নের "সোভিয়েট ভূমি" দ্রষ্টব্য)।

এসিয়ায় সর্বত্রই যুবকদের মধ্যে এক নবজাগরণ আসিয়াছে। ফুঙ্গি, ভিক্ষু, মোল্লা প্রভৃতি আর তাহাদের মনের খোরাক জোগাইতে পারিতেছে না। তাহা হইলে ইহা কি খুব বিস্ময়ের বিষয় যে, ভারতে এইজন্যই বোলচেভিক মতবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও শক্তিশালী হইবে?

লোকে বলে, ভারত কম্যুনিষ্টের সংখ্যা বড় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহাতে আশ্চর্যের কথাই বা কি আছে? শিক্ষিতদের মধ্যে পুরোহিত ঠাকুরদের প্রাধান্য রামমোহন রায়ের সময় হইতেই যাইতে বসিয়াছে। তুক্‌তাক্ ও স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা কেহ আর ব্যাধি আরোগ্য করে না। একশত বৎসর ধরিয়া লোক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইতেছে এবং ভারত শ্রমশিল্পের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবেশোন্মুখী (হুইটলি কমিশন রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, রাষ্ট্র-বিপ্লব প্রচেষ্টা, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি নানা প্রকারের আন্দোলন আসিয়াছে ও গিয়াছে। উপস্থিত অনেকেই ধারণা করিতেছেন যে, আমূল পরিবর্তন না হইলে ভারতের সমাজের পুনরুত্থান সম্ভব নহে। তৎপর গান্ধীবাদ কিছুকাল একদলকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা এক প্রকারের ধর্মরূপেই পর্যবসিত হইয়াছে—তাহা শিক্ষিত তরুণদের আর আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। কাজেই এখন বড় প্রশ্ন, তরুণদের চিন্তার খোরাক আর কে যোগাইবে?

কংগ্রেসী আদর্শ

ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, ফ্যাসিস্টবাদের ন্যায় ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের আদর্শই কংগ্রেসের আদর্শ। অবশ্য সকল দেশেই বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীদের ইহাই হইতেছে আদর্শ। কিন্তু ইহার মধ্যে গান্ধীবাদের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে—ইহা "রাম-রাজত্ব" চায়। গান্ধীভক্তেরা মন্ত্রের ন্যায় "রঘুপতি রাঘব" শ্লোক আওড়ান এবং কোন আন্দোলনের সময়ে এইটিই তাঁহাদের 'ধ্বনি'। 'রামরাজ' অর্থ রামের ন্যায় রাজা। ইহা তো সেই সুদূর অতীতের গল্পের কথা। কিন্তু বর্তমানে রামরাজত্ব লোকের কি মহৎ উপকারে আসিবে? লোকে যখন রামরাজত্বের কথা বলে, তখন উহার ভিতরকার অর্থ কি উপলব্ধি করেন? রাম বড় ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণদের অভিযোগক্রমে শম্বুক নামক এক নিরপরাধ উগ্রতপা শূদ্র তাপসের শিরচ্ছেদ করেন!...অপরাধ, তিনি শূদ্র হইয়াও তপস্যা করিতেছিলেন!!

প্রাচীনকালের Serf Empire-এর (গোলামের রাজ্য) মধ্যে একপ্রকারের কাণ্ড চলিতে পারিত, কিন্তু এইযুগে এরূপ কর্ম একেবারে অচল। বর্ণাশ্রমীয় রাষ্ট্র হিন্দুদের অতীতে বাঁচাইতে পারে নাই এবং বর্তমানে ভারতের লোক (দুই একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছাড়া) একপ্রকারের রাষ্ট্রের আদৌ অনুরাগী নহে। একবার জনৈক গান্ধীভক্তের সহিত লেখকের এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, ইহার অর্থ গান্ধীজী Paternal system of Government বোঝেন। প্রত্যুত্তরে লেখক বলিলেন, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই প্রকারের শাসন বা benevolent despotism প্রভৃতির আর স্থান নাই। পুনঃ বাঙলার শ্রেষ্ঠ গান্ধীভক্তের সহিতও লেখকের এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। তিনিও বলিয়াছিলেন, "আপনি ঐ কথার উক্ত অর্থ নেন কেন?"

কিন্তু উপায় কি? দলগত ধ্বনি (slogan) দ্বারাই দলের আদর্শের অর্থ সাধারণের নিকট বোধগম্য হয়। যদি ইহার প্রতিকল্পে শূদ্রেরা Dictatorship of the Proletariat (শ্রমিক আধিপত্য বা শাসন) প্রতিষ্ঠা চায় এবং সম্প্রদায় বিশেষ Theocratic (দেবরাষ্ট্রীয় বা ধর্মরাষ্ট্রীয়) পাকিস্থান চায়, তাহা হইলে কি তাহাদের দোষ দেওয়া যায়?

এখানে এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করার হেতু এই যে, যে-কংগ্রেসের নেতারা ভারতে স্বাধীনতা আনয়নের জন্য বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের আদর্শ সম্পর্কে একটা বড় ধোঁয়াটে অস্পষ্ট ধারণা রহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের খোরাক যোগাইতে পারিতেছেন না। কাজেই চিন্তাশীল যুবক অন্য কোন বিষয় হইতে উহা আহরণের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

সাম্যবাদী দর্শন

মার্ক্সবাদ যুবকদের মনের খোরাক যোগাইতেছে। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ (Dialectics) আজ বৈজ্ঞানিক ও উদার খৃষ্টান সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে (McKieffertএর পুস্তক দ্রষ্টব্য); বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনও উহা গ্রহণ করিয়াছে। সকল সভ্যদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক্সবাদের ভুল ধরিবার অপচেষ্টা হইতেছে এবং সমালোচনাও হইতেছে। তথাপি মার্ক্সীয় দল ও আন্দোলন ক্রমশ প্রসারলাভ করিতেছে। ইহা কেবল কতকগুলি শুষ্ক মতের (dogma) দোহাই দিয়াই প্রসারলাভ করে না; ইহা মনের খোরাকও যোগায়। এইজন্যই ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে। দর্শনের দিক হইতে মার্ক্সবাদিগণ বলেন, যখন কেহ জিজ্ঞাসা করে, আমাদের দার্শনিক কে? তখন জবাব দেওয়া হয়—বর্তমান ইউরোপের তিনজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আমাদের দার্শনিক; যথা স্পিনোজা, কাণ্ট ও হেগেল Kienthal—Marxische Lehre দ্রষ্টব্য)। এই সঙ্গে ফয়ারবাকের নামও আসে; ইনিও মার্ক্সবাদকে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন।

এইগুলি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ তাঁহাদের সামাজিক ও অর্থ-নীতিক দর্শন লিখিয়াছিলেন। অতঃপর ইউরোপে আরও সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতি-বিশারদ মার্ক্সীয় আন্দোলন মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছেন। এই দেশ তাঁহাদের নামের সহিত পরিচিত নহে। তাঁহারা মানবজীবনকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া নিজেদের প্রতি-পাদ্য বিষয়ের মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন।

কিন্তু এদেশে জাতীয়তাবাদ কি করিয়াছে? কেবল ভাবপ্রবণতা, উচ্ছ্বাস এবং গুরুবাদ!

ফরাসী বিপ্লব ওরুশ-বিপ্লবের পূর্বে ঐ সকল দেশে যে সকল মণীষীর উদ্ভব হইয়াছিল, যে প্রখর চিন্তাস্রোত-তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল এদেশে তাহা কোথায়? চিন্তার খোরাক তুলসীদাসের রামায়ণ বা শিবাজীর জীবনী অথবা টলষ্টয়ের জীবনী হইতে আর সংগ্রহ না করিয়া লোকে অন্যত্র অন্বেষণ ও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্যের কথা কি আছে?

নূতন প্রভাব

আজ ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে সর্ববিভাগে যুবকদের মধ্যে একটা নূতন ভাবের স্পন্দন দেখা যাইতেছে। আজ সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতিতত্ত্ব, ইতিহাস, ললিতকলা, দর্শন-শাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনার মধ্যে এই নূতন-ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আজকাল-কার যুবক ও নূতনভাবে দীক্ষিত লেখকেরা ভারতীয় কৃষ্টির সর্ববিষয়েই অনুসন্ধান করিয়া নূতন দৃষ্টিকোণ ও আলোকে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। অবশ্য ইহার বিপক্ষে খ্যাতনামা লেখকেরা নিজেদের গোঁড়ামী বজায় রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নূতন যখন আসিয়াছে এবং সেই আলোকে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি উদ্ভাসিত হইতেছেন, তখন ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা শুধুই বৃথা। প্রাচীনপন্থীদের শ্রেণীস্বার্থ সঞ্জাত ভারতীয় কৃষ্টির ব্যাখ্যার ভুল যদি নূতনেরা ধরাইয়া দেয়, তাহাতে কি ভারতীয় কৃষ্টির চর্চার ক্ষেত্রে ক্ষতি হইবে, না উহা আরও শক্তিশালী হইবে?

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গুটিকতক ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় সংস্কৃত পুস্তক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুবাদ করিয়া বলিয়া বসিলেন, ইহাই হিন্দুদের ধর্ম এবং ভারতীয় সভ্যতা। আর তাহা পাঠ করিয়াই এদেশের লোকেরা তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে, ইহার প্রতিবাদে ও বিপক্ষে কোন কথা বলিলে তাহা পাপ এবং মস্কোর 'বোলশেভিজম্' বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু আজ ভারতীয় কৃষ্টির অনুসন্ধান এই ক্ষেত্রে নূতন আলোকসম্পাত করিতেছে। আজ হিন্দুর ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রের জ্ঞান কেবল কয়েকখানি ব্রাহ্মণ্যবাদীয় স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে আবদ্ধ নয়। আজ ভারতের পুরাতন ইতিহাসের সংবাদ মার্স-ম্যান, এলফিনষ্টোন প্রভৃতির মধ্যেও আবদ্ধ নাই. আজ বাঙলার অতীতের সংবাদ মিন-হাজের 'তাবাকাতি নাসিরি', স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস, মেকলের গালাগালির মধ্যেও নিবদ্ধ নয়। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা এই পুরাতন গণ্ডীর বাহিরে যাইতে চাহেন না। নূতন আলোক ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া কেহ কিছু বলিলে তাহা 'মস্কো-বোলশে ভিজম্' বলিয়া অপবাদ দিবার চেষ্টা করা হয়। একবার কোন এক সভার সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বড় অধ্যাপক লেখককে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন, "উনিত চিরকালই উল্টা রথে চড়েন।" বক্তৃতার পর লেখক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "পরিনির্বাণ সূত্তে", লিখিত আছে যে, বুদ্ধের মৃতশরীর সম্পূর্ণরূপে দাহ করা হয় নাই, কঙ্কালটি উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহার অর্থ কি? অধ্যাপক মহাশয় ভারতীয় কৃষ্টির একটি বিভাগের বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাত; সেইজন্যই তাঁহাকে উক্ত প্রশ্ন করা হইয়াছিল। এই শব দাহ সম্পর্কে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এলিয়ট স্মিথ বলিয়াছেন, ইহা প্রাচীন ভারতের এক প্রকারের 'মুমী' করা (mummification) পদ্ধতি (Diffusion of culture দ্রষ্টব্য)। এই সমস্যাটির সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হওয়ার জন্যই উক্ত প্রশ্ন করা হইয়াছিল। অধ্যাপক মহাশয় দুই হাত তুলিয়া দশটি অঙ্গুলি ফাঁক করিয়া নাড়িয়া বলিলেন, "ভাল দেখতে লাগবে বলিয়াই করা হইয়াছিল।" অধ্যাপক মহাশয়ের যদি ঋগ্বেদের শবদাহ বিষয়ে সূক্ত, গৃহ্যসূত্র, অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে মৃতদেহের সৎকার বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুদের কি ব্যবস্থা ছিল তাহা জানা থাকিত তাহা হইলে তিনি এই অদ্ভুত উত্তর দিতেন না। অবশ্য কেহ বলিবেন না যে, এইসব পুস্তক মস্কোতে লিখিত হইয়াছে। সুধীগণ বিচার করিবেন, কে উল্টা রথে চড়েন।

ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থও শিক্ষার মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়া আছে। সেইজন্য আজ ভারতের সর্বত্র প্রাচীন পুস্তকগুলির উল্টা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। সর্বই বর্তমানের সামাজিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া সংস্কৃত পুস্তকগুলির অনুবাদ প্রকাশ করা হইতেছে। এমন কি যেসব শ্লোক বর্তমান অবস্থার পরিপন্থী বলিয়া প্রতীত হয়, সেগুলি বঙ্গানুবাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমান বাঙালীর ইতিহাসে পঠিত হয় যে রামমোহন রায় বেদ হইতে রঘুনন্দন উদ্ধৃত "সতীদাহ" সম্পর্কে শ্লোকটি জাল করা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজও তাহাই সংঘটিত হইতেছে। যেসব সংস্কৃত পুঁথি মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে প্রয়োজন মত শ্লোক গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে বাহিরের নানা ব্যাপার ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এইপ্রকার

কারণবশতই আজকাল ঋগ্বেদে "ওঁ" শব্দ এবং "স্বস্তিক" চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজও সংস্কৃত পুস্তকসমূহের বিকৃত ও বিপরীত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। এইসব পণ্ডিতদের মনস্তত্ত্ব এখনও প্রাচীন স্মৃতিকার গৌতম ও মনুর যুগেই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের হয়ত ধারণা, দেশের লোক সবই মূর্খের দল; তাঁহারা খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ যাহা বলিলেন দেশের লোকও তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য, অন্যথায় 'মস্কো-বোলশেভিজমে'র অপবাদ রটিত হইবে। কিন্তু প্রাচীন "ভুমি সে ক্যাবল প্রভু" গল্পের আগন্তুকের ন্যায় ভুল ধরাইবার জন্য বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিরও আবির্ভাব হইয়াছে।

চর্চার ক্ষেত্রে যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। রাজনীতি আন্দোলনও পঙ্কিল অবস্থায় পড়িয়া আছে। একদিকে নানা উদ্ভট প্রথাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কার্যকরী পদ্ধতি বলিয়া জাহির করা হইয়াছে, টলস্টয়ের অহিংসাবাদ ভাবপ্রবণতায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' ধর্মবিশেষের আদর্শ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এক কথায়, নদীর স্রোতের বেগ যেমন প্রতিহত স্থানে পঙ্কিলাবস্থা সৃজন করে, এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রের জাতীয় আন্দোলনও তদ্রূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের মুখপাত্র জাতীয় কংগ্রেস এখন অনেকের 'এ্যাডভেঞ্চার' করিবার রঙ্গমঞ্চ হইয়াছে। ইহা দৃষ্ট হয় যে, যাঁহার অর্থ হইয়াছে তাহার নাম জাহির করিবার জন্য এবং নাম ও পদলাভ হেতু যেসব সুখসুবিধা উদ্ভব হয়, তাহা লাভ করিবার জন্য তিনি কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চে নানাবিধ লীলা করেন এবং দেশভক্তির মালা গলায় পরেন, পরে কার্য হাসিল হইয়া গেলে বা অধিকতর সুবিধা আদায় করিবার জন্য নিতান্ত নির্লজ্জভাবে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া গভর্নমেণ্টের কোলে বসিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন! সকলেই জানে, ধনী না হইতে পারিলে কংগ্রেস মন্দিরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না বা তাহার কথায় কর্ণপাত করা হয় না। অবশ্য কংগ্রেসের বেশীর ভাগ' লোক গরীব একথা সত্য, কিন্তু তাহারা তাঁবেদার মাত্র, ভারবাহী লোক মাত্র। এবম্প্রকারের ধনী লোক প্রয়োজন হইলে কংগ্রেসে দেশভক্তির চরম দেখান এবং অন্যান্য প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইয়া বা গভর্নমেণ্টের বিশ্বাসী হইয়া অন্য সুর গাহেন। এই দেশের অনেক বড় বড় রাজনীতিকই এই প্রকারের। পুরাতন কংগ্রেসের বড় নেতা এবং উপস্থিত সময়ের সাম্প্রদায়িক কায়েদ-ই-আজম আর হালের Forward Block-এর অন্যান্য অনেক নেতৃবৃন্দের সম্পর্কেই এই একই কথা। জাতীয় কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের নৈষ্ঠিক কর্মীর স্থান বড় নিম্নে, ওই তল্পিদারী (মোটবাহক) পর্যন্ত তাহার দৌড়, কিন্তু সুবিধাবাদী বুর্জোয়ার স্থান শীর্ষদেশে। ফল হইয়াছে, যে-প্রতিষ্ঠানের নামের অনুকরণে ভারতীয় কংগ্রেসের নামকরণ হয়, সেই প্রতিষ্ঠানের অগ্রণী তরুণ সভ্য প্যাট্রিক হেনরীর ন্যায় ভারতীয় কংগ্রেসে কোন অগ্রণী নাই যিনি বলেন, "Give me liberty or give me death." তদ্রূপ সেই কংগ্রেসের যুবক নেতা টমাস্ জেফারসনের Declaration of Rights লিখিবার সময় লিপিবদ্ধ বাণী "All men have equal rights in respects of life, liberty and in pursuit of happiness" প্রতিধ্বনি করিবার মত কয়জন লোক ভারতীয় কংগ্রেসে আছেন? ইহা সত্য যে, ভারতীয় কংগ্রেসের Declaration of Rights-এর মধ্যে এই পদটি ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ আমেরিকার বিপ্লবের পর হইতে পৃথিবীর সকল দেশের এই প্রকারের ঘোষণাপত্রে ওই পদটি অনুকৃত হয়। ভারতে ইহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কর্তৃকই কংগ্রেসের ঘোষণাপত্রে প্রবেশ করান হইয়াছে। তিনি এবং তাঁহার ন্যায় অনন্যসাধারণ কর্মী ও নির্ভীক ত্যাগীর জন্যই আজও কংগ্রেস জনসাধারণের প্রিয়, জনসাধারণও উহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। কিন্তু অনেকেই সুবিধাবাদী এবং সুযোগ পাইলে রাজপাদোপজীবী। এইজন্যই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে সেই তেজ নাই যে অমিততেজ ইতালি ও আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে ম্যাট্‌সিনি ও প্যাট্রিক হেনরী প্রভৃতি লেনিনের বোলশেভিক দলের মধ্যে ছিল এবং ইহাও জোর করিয়া বলা যায়, স্বদেশীযুগের স্বাধীনতাকামীদের যে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠভাব ছিল তাহা বেশীরভাগ কংগ্রেস সভ্যদের মধ্যেই আজ নাই। ইহার কারণ কি? সেই দেশ, সেই জাতি, সেই আদর্শ আর সেই সাধনা রহিয়াছে কিন্তু বাতাবরণ পরিবর্তিত হইয়াছে; আজ কংগ্রেসের কর্ম কেবল নেতা ও উপদলীয় চক্রান্ত ও ব্যক্তিগত কলহে পর্যবসিত হইয়াছে, জাতীয় আন্দোলনে থাকা আর অপরের বৃথা কলহে স্বীয় জীবন অতিবাহিত করা একই কথা হইয়াছে। আজ কংগ্রেসে নেতৃত্বের মোহ ও নানা প্রকারের কায়েমী স্বার্থ (vested interests) সৃষ্টি হইয়াছে; তজ্জনাই এই কলহ ও বিবাদ হইতেছে। এইজনাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তাহার গন্তব্যস্থলের পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

উপস্থিত প্রয়োজন

এক্ষণে কথা, উপস্থিত কর্তব্য কি? অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে বক্তব্য যে জাতীয় কংগ্রেসকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। কংগ্রেসের নূতন পর্যায় আরম্ভ করা প্রয়োজন। গণশ্রেণীসমূহ ও নূতনাদর্শের একনিষ্ঠ সাধক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ লইয়া কংগ্রেসে প্রবেশ করিলে কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত হইবে।

পঞ্চদশীর "তাবৎ গর্জন্তি বিপিনে জম্বুকা যাবৎ ন গর্জতি বেদান্তকেশরী" কথা সত্য হইবে যতদিন না শিক্ষাপ্রাপ্ত গণশ্রেণীসমূহ আত্মজ্ঞান ও চৈতন্য লাভ করিবে ও রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেদের প্রকট করিবে এবং ততদিন সুবিধাবাদী ও আত্ম-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসীদের খামখেয়ালী ও প্রাধান্য থাকিবেই। চৈতন্যপ্রাপ্ত গণসমূহ রাজনীতির কর্ণধার হইলে চুক্তির ভিত্তিতে ভাষা সৃষ্টি ও একজাতীয়তা লাভ, স্বাধীনতা অর্জন করা প্রভৃতি উদ্ভট তথ্যসমূহ অন্তর্ধান করিবে, ভারত নিজের স্বরূপ জানিতে পারিবে। ইতিহাস পাঠে ইহাই স্পষ্ট চক্ষে ধরা পড়ে যে, মহাপদ্ম-নন্দ হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত অনেক যুগ প্রবর্তক রাজ-চক্রবর্তী অতি নিম্নস্তরের বা জাতির লোক ছিলেন—ইহার মধ্যে কয়েকজন রাজা আবার জারজ ছিলেন। নিম্নশ্রেণী হইতে একটি কুল (Clan) একজন শক্তিমান পুরুষের নেতৃত্বে উত্থিত হইয়াছে ও রাজত্ব এবং সুবিধানুসারে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। অবশ্য চন্দ্রবংশীয় বা সূর্যবংশীয়, ইরাণী, তুরাণী বা সৈয়দ অভিজাত বংশোদ্ভবের গল্প চাটুকারেরা সৃষ্টি করিয়াছে (গুপ্ত ও পাল সম্রাটদের বংশের উৎপত্তি ও তাহাদের জাতির কথা আজও অজ্ঞাত রহিয়াছে। গুপ্তদের গোত্র আর্ষেয় নয়)। ভারতের কৃষ্টির মূলে আছে গণশ্রেণীসমূহ, বেদের "শূদ্রারাইয়াউ" (শূদ্র ও বৈশ্য), অর্থাৎ কায়িক শ্রমজীবী ও কৃষকের দল। তৎপর অনেক সংস্কারকামী ধর্মপ্রচারক ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ নিম্নবর্ণের লোক ছিলেন। এমন কি, আলোয়ার মহাপুরুষদের মধ্যেও অস্পৃশ্যজাতীয় লোকও ছিলেন। এইজন্যই ইতিহাস স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পদদলিত শূদ্র বা গণশ্রেণীসমূহই ভারতের ভবিষ্যৎ ভরসা ও আশাস্থল। ভারতের শক্তির উৎসই সেইখানে। সুতরাং শূদ্রের পুনরুত্থানে ভারত পুনর্জীবন লাভ করিবে।

ততঃ কিম্

এক্ষণে কথা, এই সকল বিশ্লেষণের পর কি করা কর্তব্য। জ্ঞানানুসারে দুই এক কথায় বর্তমান পরিস্থিতির কথা বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে মাত্র। পূর্বে দেশের জন্য যাঁহারা যে-সাধনা করিয়াছেন, তাহা ভারতের সামাজিক-রাজনীতিক বিবর্তনের অন্তর্গত। তাঁহাদের কর্ম ও সাধনার জন্য তাঁহারা দেশের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ও নমস্য। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র-শরীর স্থানুবৎ এক যায়গায় অবস্থিত থাকিতে পারে না; সমাজ ও রাষ্ট্রকে গতিশীল হইতেই হইবে, নচেৎ মৃত্যু অনিবার্য। এইজন্য জাতীয় জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ করা প্রয়োজন।

এক্ষণে চাই একদল প্রখর মৌলিক গবেষকের দল যাঁহারা ভারতীয় কৃষ্টির সকল দিকেই মৌলিক ও তুলনামূলক পাঠ ও বিচার এবং গবেষণার দ্বারা জাতির সাধনার সত্য তথ্য আবিষ্কার করিবেন। চাই ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালের Encyclopaedists দলের ন্যায় মৌলিক চিন্তাশীল ভাবুক, চাই রুশ-বিপ্লবের পূর্ব যুগের ন্যায় মৌলিক অনুসন্ধানকারী ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ্ যাঁহারা দেশের এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের যথার্থ তথ্য লোকের সম্মুখে ধরিয়া দিবেন। জাতির জীবনের অতীতের গতি না বুঝিতে পারিলে, বর্তমানের পরিস্থিতির কার্যকারণ বোধগম্য হইবে না এবং তজ্জন্য ভবিষ্যতের পথের সন্ধানও পরিষ্কাররূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। এই সকল কারণবশত চাই চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লব ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন কর্মীদল। কর্মফল, প্রাক্তন পূর্বজন্ম, নিয়তি, কিসমত প্রভৃতি মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া উহার গোলক ধাঁধায় আবদ্ধ হইয়া লোক মাটির মানুষ হইয়া পড়িয়াছে। যেদিন পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ জাবালা ব্রাহ্মণ উদ্দালককে কর্মফল ও পূর্বজন্মরূপে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ) ও তাহার প্রশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলার গণ-তান্ত্রিক বিদেহ জাতির সভায় এই মত প্রচার করেন এবং সাফল্য ব্রাহ্মণের মস্তকচ্যুত করান আর গার্গীকে ধমকাইয়া বসাইয়া দেন, সেইদিন ক্ষত্রিয়-রাজা প্রবাহন ও তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যের দল কি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয় জাতির পদে কি নিগড় তাঁহারা পরাইতেছেন। (এই বিষয়ে মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন কৃত "বোল্গাসে গঙ্গা" গল্পের পুস্তকে 'প্রবাহন' শীর্ষক গল্পটি দ্রষ্টব্য! যেদিন রাজারা ও তাঁহাদের পুরোহিতেরা প্রজাদের শোষণ ও দমন করিয়া রাখিবার জন্য এইসব অ-বৈদিক মত প্রচার করেন, সেইদিন তাঁহারা কি জানিতেন যে, ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে তাঁহাদেরই বংশধরগণের কি দুর্গতি ভবিষ্যতের গর্ভে সঞ্চিত হইয়া রহিল? স্বল্পায়াসে সিন্ধুবিজয় (চাকনামা দ্রষ্টব্য) ও বঙ্গবিজয় (তাবাকাতি নাসিরি) কি এই বিশ্বাসের ফলেই সম্ভব হয় নাই? ভারতবাসীর মনের জড়তা ও পুন পুন বৈদেশিক শাসনাধীন হওয়া কি এই বিশ্বাসেরই ফল নয়? দার্শনিক হেগেল বলিয়াছেন,—"হিন্দুর মনে দ্বন্দ্বভাব (Anti-thesis) নাই, ভারত কখনও রাজনীতিক বিপ্লব সাধন করে নাই" (History of Philosophy দ্রষ্টব্য)। এই সিদ্ধান্ত কি একেবারে উড়াইয়া দিবার বস্তু, এই বিষয়ের সত্যতার অনুসন্ধান করা কি একান্ত প্রয়োজন নয়?

এই সকল বিবিধ কারণবশত এদেশের জাতীয় জীবনে নূতন আলোকপ্রাপ্ত কর্মীর দল প্রয়োজন, নূতন মৌলিক গবেষকের প্রয়োজন, যাঁহারা ইঁহাদের চিন্তার খোরাক যোগাইবেন, নূতন নেতার প্রয়োজন যিনি আমাদের বাবিলনীয় গোলামিত্ব হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবেন। "The young men dream dreams and old men see visions, বাইবেলের এই উক্তি ভারতে সফল হউক!*

[*এই প্রবন্ধে কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহার সহিত আমরা একমত নহি। কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা সম্পাদকীয় মন্তব্যে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক]

বিদূষী ভার্যা

(২৮৫ পৃষ্ঠার পর)

অত পেছিয়ে দিলে লোকে আরও বেশি উৎসাহ হারাবে। তুমি রাজসাহী গিয়ে দেখে শুনে একজন সভাপতি স্থির ক'রে এসো। কলকাতার প্রত্যাশায় এখানকার স্থানীয় লোককে এত উপেক্ষা করার কোন দরকার নেই।"

শেষ পর্যন্ত সেই পরামর্শই স্থির হইল। পরদিনই রাজসাহী রওনা হইয়া দিন তিনেকে মধ্যে সভাপতি স্থির করিয়া দিবাকর প্রসন্নচিত্তে মনসাগাছায় ফিরিয়া আসিল।

দিবাকরের মুখে সভাপতির নাম শুনিয়া সকৌতূহলে যূথিকা বলিল, "সি. ফরেস্টার? ফরেস্টার কে?"

দিবাকর বলিল, "রাজসাহীর নতুন কালেক্টার। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে ফরেস্টকে খুশি রাখবার জন্যে আমাদের স্টেটের সিনিয়ার উকিল ভবতোষ মিত্র ফরেস্টারের দিকেই ঝোঁক দিলেন। কিন্তু তা হোক, দিব্যি ভদ্রলোক ফরেস্টার, আর সত্যিকার পণ্ডিত মানুষ। কেমব্রিজের এম-এ,—স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে খুব উৎসাহী। কেন, তোমার ভাল লাগছে না যূথিকা?"

যূথিকা বলিল, "ভাল লাগবে না কেন, ভালই লাগছে। তবে ইংরেজ সভাপতি, সভার অধিকাংশ কাজ ইংরেজিতে করতে হবে, এই যা।"

দিবাকর বলিল, "তাতে আর ক্ষতি কি? আমাদের পক্ষে ভবতোষবাবু থাকবেন, সুনীথদা থাকবে, তুমি আছ,—কাজের কোনো অসুবিধে হবে না। স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন মিসেস ফরেস্টার। যেমন দেখতে সুন্দরী, তেমনি অমায়িক মানুষ। ভবতোষবাবুর মুখে তোমার কথা শুনে আমাকে কত কন্‌গ্র্যাচুলেট্ করলেন। সত্যি যূথিকা, তুমি যে আমার জীবনের মধ্যে কতখানি গৌরব এনেছ তা সব সময়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে!" বলিয়া দিবাকর পরম পরিতোষের সহিত যূথিকার স্কন্ধে তাহার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করল।

ইতস্তত চাহিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর হস্ত নামাইয়া দিয়া যূথিকা স্মিতমুখে বলিল, "যখন বুঝতে পার না, তখনই ঠিক বোঝো। একান্তই যদি কোনো গৌরব এনে থাকি ত' এই অগৌরবের জিনিসকে স্বীকার ক'রে নেবার গৌরবই এনেছি। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক, ভোলা তোমার চা আর খাবারের উদ্যুগ করছে, গোসলখানা থেকে মুখ-হাত-পা ধুয়ে এস।"

সাদরে যূথিকার নাসিকাগ্র ঈষৎ নাড়িয়া দিয়া হাসিমুখে দিবাকর প্রস্থান করল।

ক্রমশ

"কপালে নাইকো ঘি"

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী



বন্ধুবর দুইখানা সিনেমার টিকিট দিয়া গেল।

সৌখিন লোক, পয়সা আছে, "প্রথম রজনী"র জন্য প্রথম শ্রেণীর দুইখানা টিকিট আগেভাগে কিনিয়া রাখিয়াছিল সস্ত্রীক যাইবে বলিয়া।

বলিল—চট্ করে তৈরি হয়ে নে, কেন নষ্ট হবে টিকিট দুখানা? ভেবেছিলাম—শনিবারে সন্ধ্যাটা কাটবে ভালো—অনেকদিন ধরে অ্যাড্‌ভার্টাইজ্ করছে বইটার।

—গেলি না যে? তোর নিজের কি হল?

—অদৃষ্ট! এইমাত্র খবর এল দিদিমা মরো মরো', রাত টেঁকে না।

—সে কি রে? এই যে সেদিন দিদিমার শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম?

—আরে, সে তো আমার দিদিমা। এ হচ্ছে গিন্নির। আমার দিদিমা হ'লে প্রোগ্রাম চেঞ্জ হ'ত কি না সন্দেহ। যাক্, এখন চললাম বরানগরে, রাতের মধ্যে বুড়ি যদি টেঁসে বসে থাকে, তাহ'লে অনেক ভোগান্তি আছে কপালে, গিন্নি ঢাকাই শাড়ি পরেছিলেন বদলে মিলের সাড়ি পরবেন, সেই ফাঁকে ছুটে এলাম। তোরা দু'জনে দেখে আয় তাতেই আমার আত্মার সদ্‌গতি হবে। টু-সিটারখানা লইয়া মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আছে বেশ। এই পেট্রল কণ্ট্রোলের বাজারেও। ছেলের গায়ে টিকা দেওয়ার মত গাড়ির গায়ে এ আর পি দাগিয়া দিয়া নির্ভয়ে সারা কলিকাতা চষিয়া বেড়াইতেছে।

যাক্, যথালাভ। একেই তো গৃহিণী ছবির নামে পাগল, তা'ছাড়া এ ছবিখানায় নাকি চিত্র-আকাশের সবগুলি তারকার একত্রে উদয়। কাজেই, শুনিলে যে এখনি আনন্দে লাফাইয়া উঠিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। আমারও শনিবারের সন্ধ্যাটা—মন্দ যাইবে না। আজকাল তো ছুটির দিনগুলো কোথা দিয়া কাটিয়া যায় টেরই পাই না। সময় পাইলেই চাল চিনি আটা কয়লার মত দুর্লভ বস্তুর সন্ধান করিতে হন্যে হইয়া বেড়াইতে হয়।

কিন্তু থাক, ও-সব কথা তুলিয়া কাজ নাই, তুলিলে ফুরাইবে না, দুঃখের সমুদ্র উথলাইয়া উঠিবে। তা'ছাড়া—দুঃখ নিবেদন করি কাহাকে? এখন সকলেই "ভাঁড়ে জল" খাইতেছেন। গৃহিণী অবশ্য বলেন,—'জগত-সুদ্ধ লোক সমস্তই ঠিক পাচ্ছে, তুমিই কিছু পাও না? আশ্চর্য্য।' যাক, তিনি তো অনেক কিছুই বলেন, আপাতত কি বলিবেন, তাহাই আন্দাজ করিতে করিতে উৎফুল্লচিত্তে ভাঁড়ার ঘরে উঁকি দিতে গেলাম। নাই—অসময়ে ঘরে তালাবন্ধ। তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া দেখি—বেশভূষার উদ্যোগে ব্যাপৃত। আন্দাজ করিলাম, বৈঠকখানার জানালায় চোখ-কান পাতাই ছিল।

শান্তিপুরে সাড়ির পাট খুলিতেছেন। স্বস্তিবোধ করিলাম, কারণ সময় খুব বেশি নাই। 'পিঠ চাপড়ানোগোছ' হাসি হাসিয়া বলিলাম,—এই যে তৈরি হয়ে নিয়েছ? গুড্, চলো নিখরচায় আমোদ করে আসা যাক্ একদিন। "শেষের দাবী" প্রথম দিনেই দেখা যাবে।

—কি বলছো বাজে বাজে? 'নিখরচার আমোদ' আবার কি জিনিস?

—কেন, জানো না তুমি? নির্মল টিকিট দু'খানা দিয়ে গেল দেখনি?

—তোমার কি ধারণা আমি চব্বিশ ঘণ্টা তোমার বৈঠকখানা ঘর চৌকি দিচ্ছি? খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যেন। বলি, বন্ধুর হঠাৎ সখ উথলে উঠল যে? দু'চার বস্তা কয়লা যোগাড় হয়েছে বুঝি?

—হ'তে পারে। কিন্তু তোমার তাহলে এসব জরিপাড় সাড়িটাড়ির অর্থ?

হরিবাবুর বাড়ি সিন্নি হবে। মাসিমা নিজে এসে বলে গেছেন।

করুণভাবে শুধাই—তাহলে?

কি বলবো বল? স্বর নিষ্করুণ নিস্পৃহ।

—ফেলা যাবে টিকিটদুটো? আমি আরো করুণ হইবার চেষ্টা করি।

—উপায় কি। সত্যনারায়ণ ফেলে বায়োস্কোপ? পাপে ডুববো নাকি? বন্ধু আর দিন পেলেন না।

সাড়িখানি গুছাইয়া পরিলেন, চুলে—বোধ করি এই তৃতীয়বার চিরুণী চালাইলেন, মুখে হেজলিন, কপালে টিপ প্রভৃতি যেখানে যা সাজে মানাইয়া লইয়া, পরিত্যক্ত সাড়ির আঁচল হইতে চাবির রিং খুলিয়া লইয়া পরিহিত সাড়ির আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে অমায়িকভাবে বললেন—তা তুমি অমন মন খারাপ করে বসে পড়লে কেন? যাবে তো যাওনা? একলা যেতে নেই কি? (অন্যসময় অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত মতই ব্যক্ত করেন) ভালই তো হ'ল—আমি বাড়ি থাকব না, একলাটি বসে থাকার চেয়ে দেখেই এসো বরং।

দয়াময়ী!

থাক, মনের কথা প্রকাশ করা বর্বরতা: ভদ্রতা করিয়া বলি—তুমি সঙ্গে না থাকলে দেখে সুখ কি? আলুনি তরকারির মত বিস্বাদ।

—আহা, কথার ভট্‌চায্। যাবে তো যেও, না যাও তো সময়ে খেয়ে নিয়ো—ঠাকুরকে বসিয়ে রেখো না।

—আর তুমি?

—আমি ওখান থেকেই খেয়ে আসবো, মাসিমা কি ছাড়বেন? আজ নতুন জামাই আসবে যে—লিলির বর, সবাই মিলে আমোদ-আহ্লাদ করবার জন্যেই মাসিমা অত করে বলে গেলেন আরো।

অর্থাৎ, একমাত্র "সত্যনারায়ণের আকর্ষণ

নয়? এবং তিনি নিজেও যে একটি সুচতুরা, সুরসিকা এবং সুগায়িকা, সে সম্বন্ধে 'মাসিমা'র চাইতে তাঁহার জ্ঞান কিছু কম নয়। 'আত্মজ্ঞান' আর কি!

তবু শেষ চেষ্টার মত (সত্য কথা বলিতে কি, আমার অসাক্ষাতে তিনি যে অন্যের সামনে গুণপনা ব্যক্ত করিবেন, সেটা আমার তেমন ভালো লাগে না) বলি—পরের বর নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করার দরকার কি? নিজেরটি নিয়ে—

উত্তরের পরিবর্তে একটি কুটিল কটাক্ষ ও সদর্পে প্রস্থান।



—'আমাকে টানিয়া তুলিল'

প্রথমটা আসিল অবসাদ 'দূর ছাই থাকগে' ভাব। ঠাকুরকে ও চাকরকে ডাকিয়া টিকিট দুইখানা দিলে কেমন হয়? কিন্তু পৌরুষাভিমান জাগিয়া উঠিল। কেন? তিনি অপর পাঁচজনকে লইয়া আমোদ করিতে পারেন, আমি পারি না? সৌজন্য দেখাইয়া দেখাইয়া উঁহাদের অভ্যাসগুলা আমরাই বদ্ করিয়া তুলিয়াছি। মনে করেন —আমাদের যেন 'মরিবার একটা চুলা'ও নাই কোথাও।—নাঃ, দেখাইয়া দিব আমোদ করিতে আমরাও জানি।

সাইকেলখানা লইয়া ছুটিলাম বন্ধু অবনীর বাড়ি, অবনীর স্ত্রী সুন্দরী বলিয়া গৃহিণীর তাহার উপর বরাবর বিদ্বেষ। হয়তো সেইজন্যই তাহার কথা আগে মনে পড়িল। আর একখানা টিকিটের দাম লাগে লাগুক। সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করিব অবনীকে, ট্যাক্সি ভাড়া দিয়া লইয়া যাইব, চা আইস-ক্রীম্, পটাটোচীপস্, ডালমুট, ম্যাগ্নোলিয়া — সিনেমা দেখিতে গেলেই ছবির সঙ্গে সঙ্গে যে যে বস্তুগুলি গলাধঃকরণ করা বিধি, সবগুলি কিনিয়া দিব। এবং এই তুচ্ছ জিনিসগুলি, অবনীর বৌ কিরূপ বালিকা-সুলভ আনন্দে ভক্ষণ করিয়াছে, গৃহিণীর কাছে তাহা অলঙ্কারাদি সহ গল্প করিব।

কিন্তু সাধে বাদ সাধিলেন ভগবান।

অবনী বলিল—ভাগ্যে নেই ভায়া, পাঁচ-দিন ধরে চেষ্টা করছি টিকিটের জন্যে, পাই নি, গিন্নি মুখনাড়া দিচ্ছিল, ফার্স্ট নাইটে দেখতে হবে এই ওর একটা বাতিক। কিন্তু কপালের গেরো, ছেলেটা এই মাত্র সিঁড়ি থেকে পড়ে কপাল ফাটিয়েছে, যাচ্ছি আইডিন আর তুলো আনতে; বাড়িতে আছে সবই, দরকারের সময় তো পাওয়া যায় না। তুমি একেবারে লাস্ট মোমেন্টে এলে—আগে জানা থাকলেও বা—

যেন আগে জানা থাকিলে ছেলে কপাল ফাটাইতে কুণ্ঠা বোধ করিত। মনে মনে অবনীর খাঁদা নাকে একটা ঘুসি বসাইয়া ছুটিলাম নিখিলেশের বাড়ি, সৌন্দর্যের বালাই না থাকিলেও বিদুষী বলিয়া খ্যাতি আছে নিখিলেশের বৌএর। মনের পাপ গোপন করিব না।—গৃহিণী এই 'পাশকরা' মেয়েটিকে দু চক্ষের বিষ দেখিলেও আমি আলাপ আলোচনা করিয়া সুখ পাই।

প্রস্তাব শুনিয়া নিখিলেশ বিনয়ে গলিয়া গিয়া বলিল—আনন্দের সঙ্গে রাজী ছিলাম ভাই, কিন্তু হ'ল না। বৌএর ফিট্ হয়েছে—

—ফিট্? হঠাৎ?

—হঠাৎ ঠিক নয়, হয় মাঝে মাঝে, বিকেলে মার সঙ্গে বুঝি কি কথা কাটা-কাটি হয়েছিল, তারই এফেক্ট আর কি—মারও আছে অবুঝপণা।—

—গোল্লায় যাও—বলিয়া সবেগে ছুটিলাম শশাঙ্কর বাসায়।

না রূপ না বিদ্যা কিছুরই বালাই নাই, নেহাৎ গেরস্থালি মেয়ে শশাঙ্কর বৌ সঙ্গিনী হিসাবে খুব যে চিত্তাকর্ষক তাহা নয়, কিন্তু ঝোঁক চাপিয়াছে যখন? হায় আমার ভাগ্যে আজ পোড়া শোল মাছও জলে ঝাঁপ দিল। শশাঙ্ক মাথা চুলকাইয়া বলিল —ভারী আহ্লাদ হ'ত ভাই যেতে পারলে—কিন্তু বড্ড অদিনে এলে—

—অদিন তোমার নয়, আমার। কিন্তু কারণটা?

—শিবপুর থেকে বৌদির বাপের বাড়ির মেয়েরা এসেছেন বেড়াতে, তাঁদের সামনে দিয়ে নিজের বৌটি নিয়ে—সে কি হয়?

—নিজের বৌ বলেই তো ভরসা হে, পরের বৌ নিয়ে বেরোবার সখ করলেই বরঞ্চ বিপদ। যাক্ বলি দাদার স্ত্রী—বৌদি তো আছেন বাড়ি?

তা অবশ্য আছেন, কিন্তু তিনি তো গল্পেই মসগুল্, অতিথি সংকার বলে জিনিস আছে তো একটা? একটু ত্রুটি হ'লে পরে অনেক কথা উঠবে। বুঝতেই পারছো বাঙালীর সংসারের ব্যাপার—তাছাড়া—বাড়িতে কোনও রকম কথা সৃষ্টি হবার সুযোগ আমি দিই না।

—নিপাত যাও—বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলাম কমলাক্ষর বাসায়।

শশাঙ্ক ডাকিয়া বলিল—তোমার টাইম তো হয়ে গেল মনে হচ্ছে, আমার আবার ঘড়িটা ক'দিন—

কথায় কান দিলাম না। একটু আরম্ভ হয় হোক, সেই যুদ্ধের ছবি আর একঘেয়ে বক্তৃতাগুলো শেষ হইলেই মঙ্গল। কমলাক্ষ 'দি বেস্টম্যান' সঙ্গী হিসাবে। পসারহীন উকিল, বিবাহ করে নাই, কাজেই তাহার 'বাটপাড়ের' ভয় নাই। গেঞ্জির উপর পাঞ্জাবীটা চড়াইবার ওয়াস্তা। ভাবনা শুধু বাসায় আছে কিনা।

বাসায় ছিল, আমার কাতরোক্তি শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল। চাকরকে ডাকিয়া সাইকেলখানা তুলিবার হুকুম দিয়া, নিজে আমাকে টানিয়া তুলিল। —ব্যাপার কি? এরকম দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে আসবার হেতু? বুড়ো বয়সে পড়ে ঠ্যাং ভাঙলি? খুব লেগেছে না কি?

নেহাৎ কমও নয়। এসেছিলাম— তোকে ধরে নিয়ে যেতে, দোরের এসে আছাড় খেলাম, বাড়ির সামনে এরকম রোয়াক রাখা খুব অন্যায়।

বাস্তবিক অন্যায়, খুবই অন্যায়, গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় কমলাক্ষ কালই ভাঙিয়ে ফেলবো রোয়াকটা কিন্তু হঠাৎ এ গরিবের ওপর নেকনজর কেন? গিন্নি বাপের বাড়ি? নাকি গৃহ বিচ্ছেদ?

থাক ভাই সে সব দুঃখের কথা, এখন রিক্স ডেকে দাও একটা।

গৃহিণী ফিরিলেন অনেক রাত্রে, ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন—এত গরমে চাদর গায়ে শুয়েছ যে—শরীর ভাল তো?

উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিলাম—তোমার এত দেরী?

—আর বলো কেন? সেই যে বলে না—'বিধি যখন মাপান উপরো উপরি চাপান' আমার হ'ল তাই। গিয়ে দেখি সেখানেও বায়োস্কোপের টিকিট কেনা। নতুন জামাই সবাইকে দেখাবে, গাড়ি দাঁড়িয়ে—বললাম যাবো না, ছাড়লে না কিছুতে।

অর্থাৎ তিনি যখন সিনেমা গৃহ আলো করিয়া নিজের এবং অন্যের আনন্দ বর্ধন করিতেছিলেন—আমি, তখন দুইখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট পকেটে ভরিয়া লোকের দোরে দোরে 'হত্যা' দিতেছি।

দৃষ্টিশরে বিদ্ধ করিয়া বলি—আর তোমার সাধের সিন্নি? ভক্তিভাজন 'বাবা সত্যনারায়ণ'? তাঁর কি গতি হ'ল?



'তা তুমি অমন মন খারাপ ক'রে—'

আহা কথার কি ছিরি? ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা। মাসীমা তো আর বায়োস্কোপ দেখতে যান নি? পুরুত ঠাকুরও না। আমরা ফিরে এসে প্রণাম করে প্রসাদ খেলাম। তারপর খাওয়া দাওয়া আমোদ আহ্লাদ হৈ হৈ কাণ্ড। সতু ঠাকুরপো আড়ি পাতবে বলে ছাদ থেকে দড়ির মই ঝুলিয়ে রেখেছে জানলার পাশে। তাই আবার মেসোমশাইয়ের চোখে পড়েছে সে যে কি মজা কি বলবো তোমায়।

'আহ্লাদে আটখানা'র জীবন্ত ছবিখানি।

কিছুই বাদ গেল না। 'হৈ হৈ রৈ রৈ খাওয়া দাওয়া আমোদ আহ্লাদ' সবই বজায় থাকিল, উপরন্তু প্রসাদ। অচলা ভক্তির অসীম মহিমা। জয় সত্যনারাণ।

আর আমি? নরকের কীট, ভক্তিও নাই, মুক্তিও নাই। হায় প্রতিশোধ।

গৃহিণী বেশভূষা বদলাইয়া জর্দার কৌটাটি হাতে খাটের এক পাশে বসিয়া কহিলেন—তারপর তুমি? গিয়েছিলে নাকি?

—হুঁ। বলিয়া কষ্টে পাশ ফিরি।

—গিয়েছিলে? বেশ করেছ। আমি ভাবছিলাম—হয়তো সেই থেকে শুয়ে আছো। যে কুড়ে মানিষ। কেমন দেখলে? বেশ হয়েছে না?

—হুঁ। বলিয়া চাদরখানা টানিয়া চুণে হলুদ লাগানো পাটা ভাল করিয়া ঢাকা দিই।

ধ্বংস ও সৃষ্টি

শ্রীঅণিমা মজুমদার

রবিবার দিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙিয়াই শুনিলাম মহা কলরব। আমার স্ত্রী নয়-বৎসরের মেয়েটিকে শাসন করিতেছেন। তাহার অপরাধ সে ভাঁড়ার হইতে একমুঠা চাউল লইয়া তাহার ছোট বোনের পুতুল খেলার রান্নার যোগাড় করিতেছিল; মেয়েটিকে যে সকল তত্ত্বকথা তিনি শুনাইতেছিলেন, দেশের লোকের দুর্দশার কাহিনী ইত্যাদি, সেদিকে তাহার মন ছিল না; সে করুণ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে ও একবার তাহাদের খেলার আয়োজনের দিকে দেখিতেছিল। বড় কষ্ট হইল। ইচ্ছা হইল, তাহাকে ডাকিয়া দুইটা মিষ্টি কথা বলিয়া আদর করি—কিন্তু তাহাতে তাহার মাতার ক্রোধ বৃদ্ধি হইবে এবং তাহার পক্ষেও কল্যাণকর হইবে না; সুতরাং দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সে স্থল হইতে চলিয়া গেলাম। ঘরে আসিয়া চায়ের কাপ মুখে ধরিয়া কাগজ পড়িতে লাগিলাম। চতুর্দিকে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ। রাস্তায় চারিদিক হইতে আর্তকণ্ঠের করুণ বিলাপ "মাগো! মাগো!" কানে আসিতে লাগিল। রবিবার ছুটির দিনে নির্লিপ্ত মনে তৃপ্তিভরে এক পেয়ালা চা পান করিতাম। আজ তাহাও যেন বিস্বাদ ঠেকিতে লাগিল। রান্নাঘরে আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর তখনও সমানে ধ্বনিত হইতেছে। "চাল নিয়ে খেলা! লোকে না খেতে পেয়ে কুকুরের মত মরছে" ইত্যাদি। কাগজ রাখিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। কী আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে রমার! এক বৎসরে অনেক বিষয়েরই পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু রমার পরিবর্তন যেন অস্বাভাবিক!

আমার স্ত্রীর নাম ছিল রমা। সত্যই সে রমা ছিল আমার ঘরে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিল সে আমার সকল কাজের সহায়! আমার গৃহ শান্তিপূর্ণ আনন্দে ভরিয়া রাখিয়াছিল। বার বৎসর বিবাহিত জীবনে কখনও তাহার ম্লান মুখ দেখি নাই। অক্লান্ত পরিশ্রম করিত সে; সেবা দিয়া সে ঘিরিয়া রাখিত আমায়। কোনও দিন তাহার মুখে কোনও বিরক্তি বা ক্ষোভের চিহ্ন দেখি নাই; অফুরন্ত আনন্দের ও উৎসাহের মূর্তিমতী প্রতীক ছিল সে!

তিন পুরুষ ধরিয়া এক বিলাতী মার্চেণ্ট অফিসে কেরাণীগিরি করিতেছি আমরা! ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর বাবা এবং বাবার মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া আমি সেই গদীতেই আসীন হইয়াছি। ধনীর কন্যা রমা। বিবাহের সময় ৬০৲ টাকা মাহিনার গ্রাজুয়েট পাত্র আমি, কোনও অংশেই তাহার অযোগ্য বিবেচিত হই নাই। আমার বিবাহের পর শাশুড়ী ঠাকরুণের মৃত্যুর পর যখন শ্বশুর মহাশয় পুনরায় দার পরিগ্রহ করিলেন, অভিমানে সে আর পিত্রালয়ে যায় নাই। আত্মীয়স্বজন অধিকাংশই তাহার ধনী! পাছে তাহারা আমার হীন অবস্থার জন্য আমাকে অনাদর করে, সেই ভয়ে সে কোথাও যাইত না। এরূপ গর্বিনী ও আত্মাভিমানিনী ছিল সে। তাহার একমাত্র চিন্তা ছিল আমার এই দরিদ্রের সংসার। তাহাই সে আলো করিয়া রাখিয়াছিল। স্বহস্তে সকল কার্য করিয়া ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো সব তদারক করিয়াও তাহার অবসরের অভাব হইত না। সেই অবসরকাল আমরা কত আনন্দে কাটাইতাম! আমার জীবনের আনন্দময়ী সঙ্গিনী ছিল সে।

পূর্বে রবিবার দিন সে কোনও প্রকারেই আমাকে বিরক্ত হইতে দিত না। রবিবার ছিল বাড়িতে বিশেষ দিন। সেদিন নিজের গৃহে আমি রাজার হালে থাকিতাম। সেদিন সে এত শান্তি ও তৃপ্তিতে আমার চিত্ত ভরিয়া রাখিত যে, আমার সমস্ত সপ্তাহের 'কেরাণী-জীবনের' গ্লানি মুছিয়া যাইত। বন্ধুবান্ধবেরা শুনিতাম রবিবার চিত্ত-বিনোদনের জন্য সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদি অন্যান্য আমোদে অবসর কাটাইত, কিন্তু আমার গৃহেই এত শান্তি এত আনন্দ ছিল যে, সে বাসনাও কখনও হইত না। রমাকে লইয়া যাইতে চাহিলেও সে রাজি হইত না। সে বলিত, গৃহেই সে পরম আনন্দে থাকে। মনে ভাবিতাম কমলা আমাকে ধনে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু এই যে সদাপ্রফুল্ল কমলটি তিনি আমাকে দান করিয়াছেন, তাহাতেই আমি ধন্য!

তিন সন্তানের জননী রমা। কিন্তু জীবনে উৎসাহ ও স্ফূর্তি তাহার ধরিত না। সেই সদানন্দময়ী চিরপ্রসন্ন রমার কি পরিবর্তন! যাহার ম্লান মুখ কখনও কেহ দেখে নাই, কটুবাক্য যাহার মুখে কেহ কখনও শুনে নাই, সেই রমা কারণে-অকারণে আজকাল বিরক্ত হয়। তাহার মেজাজ আজকাল বুঝা কঠিন। কারণ আমি যে একেবারেই বুঝি না বা জানি না, তাহা নহে, কিন্তু প্রতিকারের উপায় নাই। শুধু চুপ করিয়া বসিয়া ভাবি। আজ এক বৎসর হইল সকল প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমার যাহা আয় তাহাতে পূর্বে রমার সুগৃহিণীপনার গুণে একরকম করিয়া সংসার চলিত; কিন্তু এখন ক্রমে সংসার অচল হইয়া উঠিতেছে। পূর্বে আমি এ সকল বিষয়ে চিন্তা করিলে রমা হাসিমুখে আমায় সান্ত্বনা দিত। সংসারের সকল ভার সে নিজের স্কন্ধে লইয়াছিল। আমি শুধু টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিতাম। তাহার দৃঢ় অন্তকরণ সহজে বিচলিত হইত না। হাসিমুখে সকল কষ্টই সে স্বীকার করিত। সাংসারিক কোনও বিষয়ে আমাকে চিন্তা করিতে দিত না। তাহার খাওয়া-পরা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলিলে গ্রাহ্যও করিত না। আমি অফিসে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটিয়া আসি, আমার এসব চিন্তার প্রয়োজন নাই, ইহাই ছিল তাহার যুক্তি। বার বৎসর যাবৎ ক্রমে ক্রমে সকল ভাবনা, সকল ভার তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া আমি একেবারেই অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। চেষ্টা করিলেও কোনও ভার লইতে আমি এখন পারি না।

কিছুদিন পূর্বে একদিন সকালে বাহির হইবার সময় দেখিলাম ছেলে ও মেয়ে মলিন মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরে তোরা স্কুলে যাবি না?"

উত্তর দিল রমা। "না! ওদের স্কুল ছাড়িয়েই দিলাম। নিজে ত সারা দুপুর ঘুমিয়েই কাটাই। লেখাপড়া সব ভুলে যাচ্ছে। ওদের আমিই পড়াব বাড়িতে।" রমা ম্যাট্রিক পাশ ছিল; তার বিদ্যানুরাগও যথেষ্ট ছিল। ছেলেমেয়েদের পড়াইবার যোগ্যতা পূর্বেও তাহার ছিল। হাসিচ্ছলে কথাটা বলিলেও বুঝিলাম, কেন সে স্কুল ছাড়াইয়াছে। অর্থের অভাব! উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া আমিও তাহাদের উৎসাহই দিলাম! "সত্যিই ত'! তোদের মার মতন কি আর স্কুলের টীচাররা পড়াবেন? ভালই হবে বাড়িতে পড়া। আমিও তোদের পড়া দেখব; দেখিস কত এগিয়ে যাবি।" তাহারা কি বুঝিল জানি না—নিজের কাজে চলিয়া গেলাম।

এক ছুটির দিনে আবিষ্কার করিলাম, ঠিকা ঝিটিকেও রমা বিদায় দিয়াছে। জানি অনুযোগ বৃথা, তথাপি ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "রমা! এত খাটুনি তোমার সহ্য হবে না।" সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল সে কথা। স্বাস্থ্যের পক্ষে মেয়েদের সংসারের যাবতীয় কার্য স্বহস্তে করা ভাল। তাছাড়া

ছেলেমেয়েরা বাড়িতে থাকিয়া তাহাকে কত সাহায্য করে ইত্যাদি, এই সব যুক্তি দিয়া দেখাইল যে, তাহার পরিশ্রম পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। তাহার সহিত যুক্তিতর্ক বৃথা। আমার বেলায় তাহার শাসন পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকিবে। আমার কোনও ক্লেশ, কোনও অযত্ন সে হইতে দিবে না, কিন্তু নিজে সে কাহারও শাসন মানিবে না।

রমার স্বাস্থ্য ছিল ভাল। কিছুদিন বেশ সুশৃঙ্খলায় সকল কার্যই চলিল। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রম করে সে। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা দেখিলাম উন্নতিই লাভ করিয়াছে তাহার তত্ত্বাবধানে। আমি দিনের অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকি। সস্তায় বাড়িভাড়া পাওয়া যায়, সেইজন্য থাকি বহু দূরে বেহালা অঞ্চলে। যাতায়াতে বহু সময় যায়। সপ্তাহের মধ্যে ছয়টা দিন এক ধরাবাঁধা নিয়মে কাটে। রমাও সমস্ত দিন এক বিশ্রামহীন কর্মজীবন লইয়া কাটায়। আজকাল মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি যে, হাস্যময়ী রমার মুখে দু-একটি, দুশ্চিন্তার রেখা পড়িয়াছে। সে অক্লান্ত অফুরন্ত উৎসাহপূর্ণ বদনে যেন একটু ক্লান্তির আভাস দেখা যায়। সে সতেজ স্নিগ্ধকোমল কণ্ঠস্বরে যেন একটু হতাশার সুর কানে বাজে। আমি ইহা দেখিয়া চিন্তাকুল হই। আমি গৃহে ফিরিলে সে আমাকে লইয়াই ব্যস্ত। আমাকে সে অনাবিল শান্তিধারায় ঘিরিয়া রাখে। আমার চিন্তিত মুখ দেখিলে অধীর হয় এবং দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের ক্লান্তি ঝাড়িয়া ফেলে। তবে আমার চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে না। বুঝিতে পারি, সে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। সে যেন আর পারে না। দেহের শক্তি তাহার হ্রাস হইতেছে, যাহা করে শুধু মনের জোরে। সকল জিনিসেরই ক্ষয় আছে। রমার এই অটুট স্বাস্থ্যেও ঘুণ ধরিয়াছে। সে স্বীকার করে না, তবে আমি বুঝি। সেই সদা-প্রফুল্লময়ী নারী আজকাল সদা বিরক্ত। ছেলেমেয়েদের সে উচ্চকণ্ঠে কখনও ডাকিত না, তাহারা আজকাল তাহাকে ভয় পায়। আমাকেও সে কখনও কখনও রূঢ় বাক্য বলিয়া ফেলে। নিজেকে সংযত করিতে পারে না। পরমুহূর্তে তাহার অশ্রুসজল অনুতপ্ত মুখখানি করুণ হইয়া উঠে। অসহায় আমি কোনও প্রকারেই তাহার কষ্ট লাঘব করিতে পারি না। কত বন্ধু আমার যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা করিয়া চক্ষের সামনে ধনী হইয়া গেল,—আর আমার এই তিন-পুরুষের কেরাণী-জীবন লৌহ শৃঙ্খলের ন্যায় চতুর্দিক হইতে আমাকে বেড়িয়া রহিয়াছে। ইহা হইতে উদ্ধারের কথা ভাবিবার শক্তিও আর নাই। নিজের অসহায়তায় নিজেকে ধিক্কার দিই শুধু। যুদ্ধের প্রারম্ভে মাহিনা বাড়িয়া গেল, দিনকতক স্বচ্ছলতার মুখও দেখিলাম। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই চল্লিশ টাকার উপরে মণও চাউল কিনিতে হইতে পারে। সংসারের কোনও কথা জানিও না ভাবিও নাই। রমাই চিরকাল ভাবিয়াছে। এখন আর সে পারে না। তাহার স্বাস্থ্য ভাঙিগয়া গিয়াছে। অল্পেতেই সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। যতদিন শক্তি ছিল সে নিজে অর্ধভুক্ত থাকিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গোপনে নিজের অলঙ্কার বেচিয়া আমাকে সকল ভাবনা হইতে রেহাই দিয়াছে। তাহার ফলে আজও আমার স্বাস্থ্য অটুট আছে। ছেলেমেয়েরাও সুস্থ আছে, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে। নিজে কত ত্যাগ স্বীকার প্রতি পলে পলে সে করিয়াছে তাহা কে জানিবে? বাঙলার ঘরে ঘরে নারীগণ প্রতিদিন নীরবে কত ত্যাগ স্বীকার করে, তাহা ত কোনও উজ্জ্বল অক্ষরে লিখা হয় না। কে তাহার খোঁজ রাখে? আমারই মত দুই একজন হতভাগ্যের তাহা জানিবার সুযোগ হয়।

আজ সকালে রমা কন্যার চাউল লইয়া খেলা দেখিয়া চটিয়া গেল, কিন্তু সে নিজেই কতদিন ছেলেমেয়েদের লইয়া তাহাদের সহিত রান্নার খেলা করিয়াছে। আমি তাহা লইয়া কত কৌতুক করিয়াছি।

বাহিরে রাস্তার সামনে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইয়া রমার এই পরিবর্তনের কথাই ভাবিতেছি, দেখি পঙ্গপালের মত কঙ্কালসার নারী-শিশু-বৃদ্ধা, সকল বয়সের আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাথে বসিয়া আছে। সম্মুখে ধনীর গৃহে আজ অন্ন বিতরণ হইতেছে। কলিকাতার রাস্তার পথে ঘাটে ভিক্ষুক ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই অঞ্চলে এ দৃশ্য এই প্রথম। ইহারা অধিকাংশই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে অন্নের অভাবে। 'অন্নের অভাব' কথাটা শুনিলে আশ্চর্য লাগে। পূর্ব-বাঙলার লোক আমি, বাল্যকালে গ্রামে কাটাইয়াছি। ক্ষেতের পর ক্ষেত শুধু ধানের ঢেউ আজও চোখে ভাসে। সেই ধান কাটিয়া উঠানে স্তূপীকৃত করা হইত। তাহার পর সেই ধান হইতে চাউল, মুড়ি, চিড়া অপর্যাপ্ত থাকিত ঘরে ঘরে। পিতা কলিকাতায় থাকিতেন। গ্রামে আমাদের বাড়িতে কত অতিথি অভ্যাগত খাইত তিন বেলা ভাত; কোনও ভিক্ষুক কখনও ফিরিয়া যাইত না। সেই গ্রামে এখন অন্নাভাব। অন্নাভাবে লোক মরিতেছে। ইহাও সম্ভব? এই দরিদ্র নরনারীদের অন্নের জন্য হাহাকার দেখিতে দেখিতে কোন সুদূর পল্লীগ্রামে বাল্যকালের অপর্যাপ্ত অন্নের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, পিছনে ফিরিয়া দেখি, অশ্রুমুখী রমা নিশ্চল পাষাণ মূর্তির ন্যায় বিহ্বল দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখিতেছে। কলিকাতার ভিক্ষুকের কথা সে শুনিয়াছে, চক্ষে দেখে নাই। চক্ষের সামনে দারিদ্র্যের এই বিভীষিকা তাহাকে মুহ্যমান করিল। ইহারই মধ্যে ভিক্ষুকদের কলরবে শুনিলাম একটি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে ও একটি শিশু ফুটপাথেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। একটি বালিকা ইহারই মধ্যে গাহিতেছে, "ভাবনা কি, মা! মুখ দিয়েছেন যিনি, অন্ন দিবেন তিনি।" কি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ!

পিছনের বারাণ্ডায় গিয়া দেখি ছেলে ও মেয়ে মাদুর বিছাইয়া পড়িতে বসিয়াছে। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা বাঙলা দেশ ভারতবর্ষের granary মানে কি?" তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে যাইব এমন সময় প্রাঙ্গণে চারি পাঁচটি নারী আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, "মাগো! চারটি ভাত দেও মা। তিনদিন খেতে পাই নি।" মেয়ে দেখিলাম ভূগোলে পড়িতেছে বাঙলার উর্বরতার কথা, ধানের প্রাচুর্যের কথা। কাগজ খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম বাঙলায় জিলায় জিলায় চাউলের অভাবের কথা। কাগজ রাখিয়া ছোট মেয়েটিকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, একটি গান গাহিতে। সে আধ আধ ভাষায় মধুর কণ্ঠে গাহিল, "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা"—তাহার সংগীতের ফাঁকে ফাঁকে আকুল কণ্ঠে অন্নের জন্য আবেদন আসিয়া কানে পেঁছিতে লাগিল।

রবিবারের স্নিগ্ধ অবসর আর উপভোগ্য নাই। আজ সকাল হইতে রমার মুখের দিকে চাহিয়া কি এক অজানা আশঙ্কায় আমার চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছে। উঠিয়া তাহার নিকট গেলাম। দেখি রমা শুইয়া আছে। অসময়ে শুইয়া থাকিতে তাহাকে দেখি নাই কখনও। কাঙালীদিগের দৈন্যের বিভীষিকাময় দৃশ্য তাহাকে অবসাদ-গ্রস্ত করিয়াছে। আজকাল সে সহজেই অবসন্ন হয়। এই দৃশ্য তাহাকে ত আকুল করিবেই। বাহিরের বিভীষিকাময় দৃশ্য ও সর্বোপরি রমার চিন্তা আমার চিত্ত ভারাক্রান্ত করিল। কি হইয়াছে তাহার, দেহ তাহার শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সে উৎসাহ নাই, সে প্রফুল্লতা নাই। সদাই ক্লান্ত ও বিরক্ত। ছেলেমেয়েরা তাহাকে ভয় পায়। সারাদিন মনের মধ্যে নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ লইয়া কাটাইলাম।

চতুর্দিকে নিরাশার দৃশ্য, ইহার মধ্যে গৃহে রমা অসুস্থ। ইহার মধ্যেও দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছেই। কিভাবে কাটিতেছে জানি না। কলিকাতার রাস্তায় অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভিক্ষুকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বে পথে ঘাটে বুভুক্ষু নারীর ব্যাকুল

কণ্ঠস্বর ও কঙ্কালসার শিশুশ্রেণীর মূক আবেদনে বিচলিত হইতাম। দৈনিক দুই চারি পয়সা ভিক্ষাও দিতাম, অফিস যাতায়াতের পথে। এখন ক্রমশঃই সে দৃশ্যও সহিয়া যাইতেছে।

আজ অফিস হইতে শীঘ্র ফিরিলাম। রমার অসুখ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমার এক বন্ধু ডাক্তার বিলাত হইতে বড় পাশ করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পুরাতন বন্ধুত্ব জাগাইয়া তুলিলাম। পয়সা খরচ করিয়া ডাক্তার দেখাইবার সংগতি আমার নাই। বন্ধু রমাকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া অনেক কথাই বলিলেন দুইটি কথায়। বিশ্রাম ও ভাল খাওয়া চাই। তিনি কাগজে লিখিয়াও দিলেন কি খাইতে হইবে। মাছ, মাংস, দুধ, দই, ফল, মাখন ইত্যাদি; চেইঞ্জে গেলে আরও ভাল হয়। দুই চারিটি দামী বিলাতী বলকারক ঔষধের নাম লিখিয়া দিলেন। ডাক্তার চলিয়া গেলে রমা হাসিল। তাহার ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন মিষ্টি হাসিটি ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার হাসি দেখিয়া অতিদুঃখে আমারও হাসি আসিল। কি পরিহাস অদৃষ্টের! বিশ্রাম সুখাদ্য ও চেইঞ্জ—এই তিনটাই আমার পক্ষে যোগান যেন কতই সহজ!

আমি অধিকাংশ সময়ই বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত চিত্তে থাকি। রমা কিন্তু ব্যাধি বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমেই প্রফুল্ল হইতে লাগিল। আমাকে সে সকল সময়ই সান্ত্বনা দেয়, বলে নবীন ডাক্তার তাহার রোগ ধরিতেই পারে নাই। তাহার কিছুই হয় নাই। সে একটু সাবধানে থাকিলেই সারিয়া উঠিবে, তাহার আশার ছোঁয়াচ আমারও লাগে। আমার অসহায় মন সেই ক্ষীণ আশাটুকুই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহে। বুঝি বা ডাক্তারেরই ভুল। হয়ত দুদিন পরই সে সারিয়া উঠিবে।

* * * *

ইহার পরের কথা সংক্ষিপ্ত। রমা এক-মাসের মধ্যেই আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কোনও কষ্ট সে আমাকে দেয় নাই। যতদিন পারিয়াছে সে নিজে সর্বপ্রকার ক্লেশ হইতে আমাদের দূরে রাখিয়াছে। যখন শয্যা লইয়াছে, তখনও তাহার মন থাকিত আমাদের আরামের চিন্তায় ভর-পুর। রুগ্ন-শয্যায়ও সে নিজের কথা কখনও বলিত না, ভাবিত না। স্নিগ্ধ মধুর হাসিটি সর্বদাই মুখে লাগিয়া থাকিত। আমার চোখের সামনে তিলে তিলে যে ফুলটি অকালে শুকাইয়া গেল, কে জানিত তাহার কথা। শুধু জানিতাম আমি—তিলে তিলে কত ধৈর্য ও কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিজেকে ক্ষয় করিয়াছিল।

[illegible] চলিয়া গেলে সমস্ত জগৎ আমার নিকট শূন্য মনে হইল। কোথা দিয়া দিন কাটিয়া যাইত, কিভাবে কাটিত জানি না। পনর দিনের ছুটি পাইয়াছিলাম। এই পনর দিন এক বিরাট শূন্যতার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। মনে ভাবিতাম আর কোনই প্রয়োজন নাই জীবনের। প্রতিবেশীরা প্রথম প্রথম আমার ও পুত্র-কন্যাদের ভার লইয়াছিল। পনর দিন চলিয়া গেলে তাহাদেরই একজন আমাকে জোর করিয়া অফিসে পাঠাইয়া দিল।

সমস্তদিন কাজ করিয়া বৈকালে গৃহে ফিরিবার পথে দেখিলাম এই পনর দিনে কলিকাতার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ভিক্ষুকের দল এখন আর সেরূপ পথে-ঘাটে ছড়াইয়া নাই। স্থানে স্থানে অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। নানাবয়সের পুরুষ নারীগণ অকাতরে দরিদ্র নরনারীর সেবার ভার লইয়াছেন। দেখিলাম বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীগণ দলে দলে এই সকল দরিদ্রদের খাওয়াইতেছে। এই সকল কিশোর-কিশোরীর সেবাপরায়ণ মূর্তি দেখিয়া আমার এই ভারাক্রান্ত বিষাদগ্রস্ত চিত্ত ভরিয়া উঠিল। এত বিষাদ এত গ্লানির ভিতরও যেন দূরে একটু জ্যোতির রেখা দেখা যাইতেছে। এই সকল কিশোর-কিশোরী যুবক যুবতীগণ ইহারাই ভবিষ্যৎ জাতি সংগঠন করিবে। এই বিপদ আসিয়া ইহাদের কর্তব্যনিষ্ঠা জাগাইয়া তুলিয়াছে। কিরূপে আজ অনায়াসে ইহারা এই গুরু দায়িত্বের ভার লইয়াছে। তবে বুঝি এই হতভাগ্য জাতির এখনও আশা আছে। এখনও হয়ত এ জাতি বাঁচিবে। এই সকল কিশোর-কিশোরীর সেবাপরায়ণ মূর্তি আমার চিত্তে যে আশার আলোক জাগাইয়াছিল, গৃহের নিকটবর্তী হইতে তাহা চলিয়া গেল। বিরাট শূন্যতা আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। আজ এই প্রথম রমাশূন্য গৃহে ফিরিতেছি অফিসের পর। পা আর আমার চলে না। আমি ফিরিবার পূর্বে সে পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। দ্বারে পৌঁছিবার পূর্বেই সে হাসামুখে দরজার প্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিত। আজ সেই গৃহদ্বারে কেহ থাকিবে না আমার জন্য ব্যাকুল নেত্রে অপেক্ষা করিয়া। কেহ আসিবে না সেবা-পূর্ণ হস্তে আমার ক্লেশ অপনয়ন করিতে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে কোন সময় গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম জানি না। দেখি দ্বার খোলা এবং দ্বার-প্রান্তে আমার দশ বৎসরের কন্যা ব্যাকুল-দৃষ্টিতে আমার পথ চাহিয়া রহিয়াছে। আমি চমকাইয়া গেলাম। সে তাহার মার একখানি শাড়ি কোমরে জড়াইয়া পড়িয়াছে। ঠিক তাহার মা যেভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই হাসিমাখা-মুখ! প্রশান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি! স্তব্ধ হইয়া গেলাম। আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সে ঠিক তাহার মায়ের মতন গ্রীবাভঙ্গি করিয়া শাসনের সুরে বলিল, "যাও দেরী কর না মুখ ধুয়ে এসো।" আমি বিস্মিত মুগ্ধদৃষ্টিতে ঘরে ঢুকিয়া দেখি যেভাবে রমা পরিপাটি করিয়া ঘর সাজাইয়া আমার সব কিছু গুছাইয়া রাখিত সব সেইরূপ আছে। আমি হাত মুখ ধুইয়া আসিলে সে একখানি প্লেটে আমার খাবার আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া তার মায়ের স্থানটিতে বসিয়া আমাকে বাতাস করিতে লাগিল। আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। কবে যে এই দশ বৎসরের বালিকা নীরবে তাহার মায়ের শয্যাপার্শ্বে সকল কাজ শিখিয়া রাখিয়াছে আমি জানিও নাই। আমি শুধু ভাবিয়াই আকুল হইয়াছি কি হইবে ভাবিয়া। আমার বিহ্বলভাব দেখিয়া সে আমায় বলিল, "খাও বাবা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।" ঠিক তাহার মায়ের মতন স্নেহপূর্ণ অনুযোগের সুর। খাওয়া হইয়া গেলে সে আমার পার্শ্বে বসিয়া নানাভাবে আমাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার অপটু হস্তের সেবা দ্বারা আমার ক্লান্তি ও বিষাদ দূর করিবার কত চেষ্টাই এই ক্ষুদ্র বালিকা করিতেছে। আমি তাহাকে কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা পারবি তুই একা সব কাজ করতে?" সে তাহার মাথাভরা ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া মধুমাখা কণ্ঠে উত্তর দিল, "কিছু ভেবো না বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।" বালিকার কোমল কণ্ঠের এই আশার বাণী আমাকে চঞ্চল করিল। সত্যই ত! সব ঠিক হইয়া যাইবে! আজই ত রাস্তায় বুভুক্ষু নরনারীর সেবার ভার বালকবালিকারা লইয়াছে দেখিয়া আমিও এই কথাই ভাবিয়াছি! আমরা শুধু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হই; কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি গড়িয়া উঠে, কে তাহার খবর রাখে? বাঙলার দুর্দশায় সারা ভারতবর্ষ হইতে যে সাহায্য আসিতেছে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টায়—এই উদাম কোথায় ছিল? আমরা এই বিপদ না আসিলে তাহা জানিতে পারিতাম না। এই যে নবশক্তি জাগ্রত হইতেছে অগণিত নরনারীর সেবায় উন্মুখ; তাহা কোথায় ছিল?

আমার গৃহেই সারা বাঙলার রূপ আমি দেখিতে পাইলাম। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে অকালে রমা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছে, তাহারই প্রতিমূর্তি! তাহারই সেবাপরায়ণ লক্ষ্মী মূর্তি এই ক্ষুদ্র

বালিকাতে। কে বলিবে ছয় মাস পূর্বে এই বালিকাই পুতুল খেলার জন্য চাউল লইতে গিয়া শাসিত হইয়াছিল। আমার কন্যার বালিকা কণ্ঠের আশার বাণীতে পাইলাম আমি ভবিষ্যতে সমগ্র জাতির প্রতি আশার বাণী! আজ বাঙলার এই দুর্দশার অন্তরালেও ক্ষীণ আশার আলোকপাত করিতেছে দেশের কিশোরকিশোরীগণ তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ সেবাপরায়ণতা দ্বারা।

হঠাৎ শঙ্খধ্বনিতে আমার চিন্তার ধারা টুটিয়া গেল। দেখিলাম আমার দশ বৎসরের বালিকা কন্যা এক হস্তে ধূপ লইয়, তার মায়ের লক্ষ্মীর আসনে প্রদীপ জ্বালিয়া ভক্তি ভরে প্রণাম করিতেছে আর বড় ছেলে শঙ্খ বাজাইতেছে।

বিধাতার উপর অভিযোগের আমার সীমা ছিল না আমার দুর্ভাগ্যের জন্য। আজ দেখিলাম কত ক্ষুদ্র আমি! কি শক্তি আছে তাঁহার মহিমা বুঝিবার। এক হস্তে তিনি লইয়াছেন ধ্বংসের ভার—সেই বিভীষিকাই আমাদের আচ্ছন্ন করে। অপর হস্তে যে সংগঠনের ভার লইয়াছেন সে আমাদের মোহগ্রস্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। আমার বালিকা কন্যার সেবারতা লক্ষ্মী মূর্তির ভিতর আমি দেখিতে পাইলাম সমগ্র দেশের সেবারতা লক্ষ্মীময়ী বালিকা মূর্তি সকল। পুত্রের হস্তের শঙ্খধ্বনিতে শুনিতে পাইলাম সমগ্র দেশের কিশোরগণের জাগ্রত হৃদয়ের সাড়া। আজ ইহারা যেমন আমার আঁধার গৃহে প্রদীপ জ্বালিল সেইরূপ দেশের কিশোরকিশোরীগণও এই নিদারুণ নৈরাশ্যপূর্ণ দারিদ্র্যের অন্ধকার ঘুচাইয়া নবশক্তির আলোক জ্বালাইবে। অজ্ঞান আমরা! রুদ্রেশ্বরের সংহার মূর্তি দেখিয়া বিহ্বল হই। অন্তরালে সৃষ্টিকর্তার কল্যাণময় গঠনমূর্তি দেখিতে পাই না। ক্ষুদ্র শক্তি আমাদের! কি বুঝব বিধাতার লীলা।

আজ বহুদিন পর আমার প্রণামরতা পুত্র-কন্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পরম ভক্তিভরে যুক্ত-করে ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রণাম করিলাম।

অন্ন-দাতা

অমিয় চক্রবর্তী

পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন—
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য?
বেচাকেনা আর লাভের খাতায়
এখানে জমানো রক্তপণ্য—
যারা দান দেয় তারা মুনফায়
সাধুতার সুদ কষে তবে হয় দাতা,
নয়তো তারাও রাষ্ট্রচাকায় পিষ্ট, দরদী নাগরঃ
তাদের দেওয়ায় ফলাবে না ধান শান-বাঁধা কলকাতা।

আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙবার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।
গ্রামে যাও, গ্রামে যাও,
এক লাখ হয়ে মাঠে নদী ধারে
অন্ন বাঁচাও, পরে সারে সারে
চাবেনা অন্ন, আনবে অন্ন ভেঙে এ দৈত্যপুরী,
তোমরা অন্নদাতা।
জয় করো এই শান-বাঁধা কলকাতা॥

শহরতলী

শ্রীসমরজিৎ বসু

শহরতলীতে কাঁদিয়া যারা ঘুমাল
তোমরা কভু কি তাদের বেসেছ ভাল?
পাঁজরাগুলিতে রক্ত চোষার দাগ
তোমরা কখনো নিয়েছ সমান ভাগ?
সভ্য আকাশ এখন দেখোনি চেয়ে,
মৃত্যু আঁধারে ধরণী গিয়েছে ছেয়ে।
অশ্রু-সিক্ত রজনী হয়েছে ভারী,
রিক্ত মনের বেদনা জোগান তারি।
এই ত সময় ঘোমটা দিয়েছি খুলে,
বন্ধু তোমরা হাতুড়ি লইও তুলে।

ইতিহাস

শ্রীবিজনকুমার সেনগুপ্ত

আমাদের প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর ইস্কুল জীবনের কথা মনে আছে। ইতিহাস তখন আমাদের মনে বিভীষিকা জন্মাত। মাস্টার মশায়েরা ঠিক করে দিতেন কাল অমুক দু'পাতা পড়া। আর বাড়িতে এসে প্রাণপণে আমাদের তা মুখস্থ করতে হ'ত। ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধ কত সনে হয়েছিল, রিজিয়া কত সনে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং কত বছর রাজত্ব করেছিলেন, ঔরংগজেবের ভাইদের নাম কি, ডালহৌসী গভর্নর-জেনারেল থাকাকালে ভরতের কোন্ কোন্ দিকে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল,—এই সব মুখস্থ করতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে আসত। পথে চলতে চলতে মনে মনে আউড়ে নিতাম তারিখগুলো ঠিক মনে আছে কি না। এইরূপ নাম আর তারিখের কণ্টকাকীর্ণ পথে আমাদের ইতিহাস পাঠে অগ্রসর হতে হতো। কাজেই দূর থেকেও ওবিষয়ের পাঠ্যপুস্তক দেখলে মনে হতো "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"। এখনও যে ইস্কুলে সে পাঠ-ধারার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে তা মনে হয় না। ইতিহাসের কঠিন বর্ম ভেদ করে কোথায় যে তার রসের উৎস তার খোঁজ এখনও তরুণ ছাত্রেরা বিশেষ পায় কিনা সন্দেহ। সে যাক্—আসলে ইতিহাস বিষয়টা অত নীরস নয়, অবশ্যি যদি তা ঠিক করে পড়া যায়। তা নাম-তারিখের বোঝাই শুধু নয়, যা স্মৃতিকে কেবল ভারাক্রান্ত করে রাখে, চিন্তা ও কল্পনাশক্তিকে পিষে মেরে ফেলতে চায়। বিখ্যাত ইতিহাস-তাত্ত্বিক হার্নস বলেন যে, ইতিহাস হচ্ছে "simply a mode of enquiry!" সব দিক দেখতে গেলে সংজ্ঞাটা ভালোই মনে হয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন আসে, enquiry কিসের ? জবাবে বলা যায়, কোন একটা বিশেষ যুগে বিশেষ জাতির জীবনের। তবে কি সে সময়ে সে জাতির জীবনে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তার সত্যাসত্য নির্ধারণই ইতিহাসের কাজ ? অবিশ্যি তাই, কিন্তু এতেই ইতিহাসের কর্তব্য শেষ না। ঘটনার অন্তরালে যে সব ধারা [illegible] জীবনকে প্রভাবিত গোড়ায় না পৌঁছা পর্যন্ত ইতিহাসের কাজ সুসম্পন্ন হয় না। এজন্যই বর্তমান জগতের অন্যতম চিন্তানায়ক ইতালীয় দার্শনিক বেনদেত্তো ক্রোচে বলেছেন, "All true historians are willy-nilly Philosophers."

এ পর্যন্ত বলা হলো যে, কোন বিশেষ যুগে কোন জাতির জীবনে তথ্যানুসন্ধান এবং সেই তথ্যসমূহের মূলীভূত কারণ নির্দেশই ইতিহাসের কাজ। কিন্তু কারণগুলি একরূপ হলেই কি ইতিহাসের ধারাও কি একরূপই হবে ? "History repeats itself" এ কথা কি সত্য ? একটু ঘুরিয়ে এই প্রশ্ন করা যেতে পারে, ইতিহাসকে কি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় ? একদল পণ্ডিত আছেন, যাঁরা বলেন করা যায়, আবার অনেকে বলেন, না। জগতে অনেক কিছু বড় প্রশ্নের মত এরও চরম উত্তর আজ পর্যন্ত মেলে নি, কোন দিন মিলবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে ? জাতির জীবন ছেড়ে ব্যক্তির জীবনেই আসা যাক্। দুজন লোকের জীবনের গতি হয়ত মোটামুটি একই রকম, কিন্তু পরিণতি হলো সম্পূর্ণ আলাদা। জীবনে মর্মান্তিক দুঃখ পেয়ে কেউ আত্মহত্যা করে, আবার কেউ সন্ন্যাসী হয়। কেন ? যাঁরা জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের এলাকায় আনতে চান, তাঁরা বলবেন, শুধু সমীপবর্তী আশু কারণগুলি দেখলেই চলবে না, তারও পেছনে গিয়ে ভালো করে খুঁজতে হবে। সে খোঁজার ফলেও যখন সম্পূর্ণ সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় না, তখন বাধ্য হয়েই তাঁদের বলতে হয়, বিজ্ঞানও এখনও পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে নি, তা যখন করবে, তখন সব কিছুরই হদিস মিলবে। তখন সব জ্ঞানকেই বিজ্ঞানের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। সেদিন না আসা পর্যন্ত ইতিহাসকেও একান্তভাবে বিজ্ঞানের অনুবর্তী বলে মেনে নেওয়া কঠিন।

এখানে পূর্বোক্ত বিষয়টা উল্লেখ করার একটা কারণ আছে। বিশেষ কোন "থিওরীর" সাহায্যে একটা জাতির জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করবার বলা হয়, তার সাহায্যে অতীতেরও যেমন ব্যাখ্যা চলে, ভবিষ্যতেরও তেমনি অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ মিলে। বৈজ্ঞানিক বিধির মত তার কার্যকারিতা অমোঘ, অকাট্য, অলঙ্ঘনীয়। এই দাবী কতটা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই সংক্ষেপে এখানে বিচার্য।

বিগত শতাব্দীতে Great men theory'র সাহায্যে কোন একটা জাতির ইতিহাসকে বুঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা বিশেষভাবে করা হয়েছিল। এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে কার্লাইলকে ধরা যেতে পারে। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস হচ্ছে দান্তন, রবসপীয়র প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিশালী মহাপুরুষের জীবন-ইতিহাস। সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডের বিপ্লব-কাহিনী, ক্রমওয়েলের জীবন-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি যদি রুশ-বিপ্লবের ইতিহাস লেখার সুযোগ পেতেন, তবে হয়ত লিখতেন যে, তা লেনিন, স্ট্যালিন এবং ট্রটস্কীর জীবনেরই রূপান্তর মাত্র। মহাপুরুষেরা একটা জাতির জীবনকে যুগে যুগে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, একথা অনেকাংশে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য বলে স্বীকার করা কঠিন। পূর্বোক্ত মতের সঙ্গে গীতার 'সম্ভবামি যুগে যুগে' এই মতের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু গীতায় আবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জাতীয় জীবনে বিশেষ অবস্থাতেই মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হয়। 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি' ইত্যাদি। কাজেই দেখা যায় যে, ইতিহাস রচনায় মহাপুরুষের দান অর্ধেক, আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব বাকী অর্ধেক। একথা কার্লাইল প্রমুখ ঐতিহাসিকেরাও যে একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন, তা নয়। কিন্তু তাঁরা পূর্বোক্ত কারণকেই মুখ্য, এবং পরবর্তী কারণকে গৌণভাবে স্বীকার করেছিলেন মাত্র। অর্থাৎ তাঁরা জোর দিয়েছেন প্রথমটার উপরেই, পরের বিষয়টিকে করেছেন তারই শুধু আনুষঙ্গিক। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিচারকের কাছে এখানেই আপত্তি হ'বার কথা। বহু

ক্ষিপ্ত হয়ে না উঠত, তবে কি শুধু দান্তন, রবেসপীয়রই বিপ্লব ঘটাতে পারতেন? সেইরূপ সপ্তদশ শতকের ইংলন্ডেও যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না হত, তবে কি শুধু ক্রমওয়েলই কিছু করতে পারতেন? সুতরাং, এই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, শুধু একটি মাত্র 'থিওরীর' সাহায্যে একটা সমগ্র জাতির ইতিহাসকে বুঝতে অথবা বোঝাতে যাওয়া নিতান্ত ভুল।

আধুনিক জগতে ইতিহাস সম্বন্ধে যে মত দুটি বিশেষ প্রবল এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে কার্ল মার্ক্স প্রবর্তিত শ্রেণী-বিরোধের 'থিওরী' আর বর্তমান জার্মানীতে প্রচলিত জাতি-কেন্দ্রিক (racial) 'থিওরী'। এই দুটি মতই এই সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচ্য। কার্ল মার্ক্স তাঁর এই 'থিওরীর' মূলসূত্র যে দার্শনিকপ্রবর হেগেল থেকে নিয়েছিলেন তা সুবিদিত। হেগেলই প্রথম বলেছিলেন যে, দুই বিরুদ্ধ-শক্তির সংঘাতের ফলে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয় এবং এইরূপে সংঘাতের ফলেই মানবেতিহাস উন্নতির স্তরে স্তরে এগিয়ে চলে। কিন্তু তিনি সব কিছু মানবীয় ব্যাপারের জন্য দায়ী করেছিলেন এক লোকাতীত শক্তিকে। কাজেই তাঁর মতে অবস্থার সংঘাত, নতুন অবস্থার উদ্ভব,—সব কিছু শেষ পর্যন্ত সেই অলৌকিক শক্তির ইঙ্গিতেই হচ্ছে। সেখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছে বলে কোন জিনিষ নেই। এই বিশ্বাসের বশবর্তী ছিলেন বলেই তাঁকে Prussian Absolutism সমর্থন করতে হয়েছিল। সংঘাতের ফলে মানুষ এগিয়ে চলেছে, হেগেলের এই মতাংশটুকু মার্ক্স তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর লোকাতীতকে বরখাস্ত করে সে জায়গায় স্থাপন করেছিলেন বাস্তব-জীবন, যা যুগে যুগে অর্থনৈতিক কারণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। কাজেই মার্ক্সের ইতিহাস হল অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস।

এই সম্পর্কে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষ তথা জাতির জীবন শুধু অর্থ-নৈতিক কারণেই নিয়ন্ত্রিত হয় কিনা। এই সম্বন্ধে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংশয় থাকা স্বাভাবিক। অবিশ্যি এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, মানুষের জীবন মূলত জৈব এবং যাকে আমরা উচ্চতর জীবন বলে আখ্যা দিই, তাও গড়ে ওঠে জৈব দাবীর পরিপূরণের উপরেই। কোন বিশেষ যুগের সাহিত্য ও কলা-সৃষ্টিও যে অর্থনৈতিক আবেষ্টনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাও অনেকটা সত্যি। তবুও শুধু অর্থনীতিই যে জীবনের সব কিছু অলি-গলি এবং গহ্বরে আলোক-সম্পাত করতে পারে একথা মেনে নিতে হলে যুক্তি এবং তথ্যের প্রতি অবিচারই করতে হয়। রাজার ছেলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হন কেন? জাতির জীবনে মাঝে মাঝে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় কেন। তাঁদের প্রভাব কি সেই জাতির জীবনে কম? জীব-তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব আরো কত কিছু তত্ত্বের সাহায্য নিয়েও এই প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর মিলে না, শেষে গিয়ে পড়তে হয় যাকে বার্টাণ্ড রাসেল বলেছেন historical mysticism-এর রাজ্যে। কিন্তু 'মিসর্টিসিজম' আর বিজ্ঞানের বিরোধ চিরন্তন একথা সকলেরই জানা আছে। সুতরাং তা মেনে নেওয়া দুস্কর হয়ে ওঠে। এই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সেলিগম্যান প্রমুখ মার্ক্সের কয়েকজন টীকাকার একটা পথ বের করেছেন। তাঁরা অর্থনৈতিক কথাটা ব্যবহার না করে তার স্থানে 'বাস্তব' কথা বসিয়েছেন। অর্থাৎ, ইতিহাসের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হয় বাস্তব কারণ দ্বারা। তাঁদের মত অনুসারে এই নাকি ছিল মার্ক্সের আসল বলার কথা, যদিও তাঁর শব্দ-প্রয়োগটা একটু সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যাখ্যা অনুসারে মার্ক্সের মতের যৌক্তিকতা বোঝা অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা কতটা যুক্তিযুক্ত সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। 'বাস্তব' কথাটার প্রসার অনেক দূর পর্যন্ত, শুধু অলৌকিক জিনিষগুলিই এর এলাকা থেকে বাদ যেতে পারে। দুনিয়ার ব্যাপারে অলৌকিক-প্রভাব কার্যকরী হয় কিনা, এবং হলেও কতটুকু হয়, তা ঠিকভাবে আজও নির্ধারিত হয়নি। সুতরাং তা নিয়ে সাধারণ লোকের মাথা না ঘামানোই ভাল।

এখন বাকী রইল বর্তমান জার্মানীতে প্রচলিত জাতি-কেন্দ্রিক 'থিওরীর' কথা। জার্মানেরা যে বিশুদ্ধ আর্য এই মতবাদ বিগত শতাব্দীতে সেই দেশে কয়েকজন পণ্ডিত দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। তারপরে গোবিনো, টুর্গো প্রভৃতি জাতীয় বৈশিষ্ট্যবাদী ঐতিহাসিকদের প্রচার দ্বারা এই মত আরও পরিপুষ্ট হয়ে আধুনিক জার্মানদের মনে স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই মত বিজ্ঞানসম্মত বলেও জোর গলায় অহরহ দাবী জানান হচ্ছে। এর অজুহাতে কত যে বীভৎস কাণ্ড জার্মানীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নতুন করে তার আর বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

একটা প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে মানবেতিহাসে এত যুগ-যুগান্ত পরে, প্রতি দেশে বিভিন্ন জনপ্রবাহের আগমন নিষ্ক্রমণ সত্ত্বেও, কোন জাতি রক্তের বিশুদ্ধতা নিয়ে গর্ব করতে পারে? আর সে গর্ব কি গোঁড়ামিরই নামান্তর নয়? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে' বহু ধারা এসে মিশেছে। কম হোক, বেশী হোক, একথা কি আধুনিক জগতের সকল জাতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়? জাতি-কেন্দ্রিক মতের সম্পূর্ণ ভিত্তিই যে নিছক কল্পনামূলক বৈজ্ঞানিক জুলিয়াস হাক্সলী তাঁর 'উই ইয়োরোপীয়ানস' নামক পুস্তকে তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তার থেকে এই সিদ্ধান্তই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একটা জাতির জীবন এবং তার ইতিহাসের পেছনে অনেক কিছুর প্রভাবই বিদ্যমান থাকে। অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, জাতির ঐতিহ্য, মহাপুরুষের প্রভাব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এমন কি দেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি পর্যন্ত উপেক্ষণীয় নয়। প্রভাবের তারতম্য অবিশ্যি আছে, কিন্তু তাই বলে কোন একটি কারণকেই সর্বস্ব বলে মেনে নিলে ইতিহাসকে বিকৃতই করা হয়। আর এ কথা নত করে বলার প্রয়োজন নেই যে, জ্ঞান অজ্ঞতা থেকেও ঢের বেশী

খেলাধূলা

জাতীয় খেলা-ধূলার স্থান

বহু বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদীরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় "বাঙলা দেশে জাতীয় খেলাধূলার স্থান নাই। যাঁহারা এই সকল খেলাধূলার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টায় আছেন তাঁহাদেরও সকল শ্রম ও অর্থব্যয় বৃথা হইবে।" যে সকল ক্রীড়ামোদী বৈদেশিক চাকচিক্যময় খেলাধূলায় মত্ত এবং সকল খেলাধূলার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান রাখেন না, তাঁহারাই এই উক্তি সমর্থন করিবেন। কিন্তু আমরা, যাহাদের দেশের সকল খেলাধূলার খবর রাখিতে হয় এবং সকল খেলাধূলার ভালমন্দ বিচার করিতে হয় তাহাদের পক্ষে ইহা মানিয়া লওয়া খুবই কঠিন। তাহা ছাড়া মাত্র দুই তিন বৎসরের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘ যখন বাঙলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন জাতীয় খেলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইতেছেন তখন আমরা কিরূপেই বা ক্রীড়ামোদিগণের উক্ত মন্তব্য সমর্থন করিতে পারি? মন্তব্যকারিগণ ইহার উত্তরে বলিবেন, "জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ মাত্র তিন চারিটি জেলায় কয়েকটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঐ সকল প্রতিযোগিতার সংখ্যা অন্যান্য বৈদেশিক খেলাধূলার প্রচলিত প্রতিযোগিতার সংখ্যার তুলনায় কিছুই নহে। দুই এক বৎসর চলিবার পর ঐ সকল প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব লোপ পাইবে।" প্রতিযোগিতার সংখ্যার উপর কোন খেলাধূলার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। যে কোন খেলাই চিরস্থায়ী হইতে পারে যদি তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দৈহিক ও মানসিক উন্নতির উপায় ও আনন্দদানের ব্যবস্থা থাকে। বাঙলার জাতীয় খেলাধূলাসমূহের মধ্যেও যে এই সকলের অভাব নাই ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি। এই প্রসঙ্গে ১৯৩৬ সালের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতের হনুমান ব্যায়াম-মণ্ডলীর সভ্যগণ জাতীয় কপাটি খেলার কৌশল প্রদর্শন করিলে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের ক্রীড়া বিশেজ্ঞগণ কি উক্তি কয়িছিলেন তাহাই স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। এই সকল বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্র লিং ফিজিক্যাল কালচার ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর বা পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। তিনি কপাটি খেলা দেখিয়া বলিয়াছিলেন "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খেলাধূলাসমূহের মধ্যে ইহার স্থান হওয়া উচিত।" দুর্ভাগ্য ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙলার যে, সেই দেশের বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করিতে পারেন, "জাতীয় খেলাধূলার স্থান নাই। বৈদেশিক প্রত্যেক খেলাধূলার গুণাবলীর সহিত যদি জাতীয় প্রত্যেক খেলাধূলার গুণাবলীর আলোচনা করা যায় তবে দেখা যাইবে জাতীয় খেলাধূলা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। জাতীয় খেলাধূলার প্রসারের একমাত্র অন্তরায় হইতেছে খেলাধূলার প্রচলিত নিয়মাবলী। এই সকল নিয়মাবলী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া বর্তমান সময়োপযোগী যদি করা হয় তবে আমরা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি কলিকাতার মাঠে একটি বিশিষ্ট ফুটবল খেলা দেখিতে যেরূপ লোক সমাগম হয় এই সকল জাতীয় খেলাধূলা দেখিবার সময়ও সেইরূপ জনসমাগম হইবে। জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘের পরিচালকগণ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এইদিকেই দৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহারা সকল খেলাধূলার পূর্ব প্রচলিত নিয়মকানুন পরিবর্তন করিয়া বর্তমান সময়োপযোগী করিবার চেষ্টায় আছেন। এইরূপ প্রচেষ্টা করিবার ফলে তাঁহাদের অনেক সময়েই বহু আপত্তি ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা ইহাতে বিচলিত হন নাই। বৈদেশিক প্রত্যেক খেলাধূলার আইনকানুন বিশদভাবে আলোচনা করিয়া ঐরূপ সকল আইনকানুন জাতীয় বিভিন্ন খেলাধূলা পরিচালনার সময় গ্রহণ করা সম্ভব কি না, ইহা লইয়াও তাঁহারা গবেষণা করিতেছেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা পরিচালনের সময়েও তাঁহারা আলোচিত আইনকানুন অনুসরণ করিয়া তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তাঁহারা আন্তরিকভাবেই জাতীয় খেলাধূলার উন্নতি কামনা করেন। বড় বড় শহর হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম হইতে যদি আহ্বান আসে, জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘের পরিচালকগণ ঐ আহ্বান উপেক্ষা করেন না। যানবাহনাদির সুবিধা না থাকিলে দীর্ঘ পথ পদব্রজে যাইতেও তাঁহাদের নিকট হইতে আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ আন্তরিকতা আছে বলিয়াই বোধ হয় গত দুই বৎসরের মধ্যে ইঁহারা বাঙলার দশটি জেলায় দশটি জেলা-সঙ্ঘ গঠনে সমর্থ হইয়াছেন এবং এই সকল সঙ্ঘের অধীনে বর্তমানে চল্লিশটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঙলার বিভিন্ন শহর ও গ্রাম হইতে দুইশতের অধিক ক্লাব বা সঙ্ঘ উক্ত জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাই যখন জাতীয় খেলাধূলার প্রকৃত অবস্থা, তখন ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবার কি কারণ আছে?

সাপ্তাহিক সংবাদ

৩০শে সেপ্টেম্বর

ভারতের প্রবীণ ও খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বৎসরাধিককাল যাবৎ বার্ধক্যজনিত রোগাদিতে প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এই বৎসরই তাঁহার ৭৯তম জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বাঙলা "প্রবাসী" এবং ইংরেজী "মডার্ণ রিভিউ" মাসিক পত্রিকা দুইটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলা তথা ভারতবর্ষ শুধু একজন প্রবীণ নির্ভীক সাংবাদিকই নহে, পরন্তু একজন দরদী সমাজ সেবক, উদারচেতা রাজনীতিক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীকে হারাইল।

অদ্য কলিকাতায় বিভিন্ন হাসপাতালে ৬৮জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, লালফৌজ নীপারের বাম তীরে দৃঢ় জার্মান ঘাঁটি ক্রেমেনচুগ দখল করিয়াছে। রুশ বাহিনী কর্তৃক কিয়েভ ও স্মলেনস্কের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রেলজংসন গোমেল অধিকার আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

১লা অক্টোবর

উত্তর আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেডকোয়ার্টার্স হইতে জানান হইয়াছে যে, মিত্রবাহিনী নেপলস-এ প্রবেশ করিয়াছে। নিউইয়র্ক বেতারে নেপলস অধিকারের কথা সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় হেডকোয়ার্টার্স হইতে সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, জার্মাণগণ নেপলস্ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, দুইশত মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে জার্মানদের মধ্যব্যূহ চূর্ণ করিয়া পোল্যাণ্ড এবং বল্টিক এলাকার প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য অদ্য লালফৌজ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শক্তি সংহত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৭০জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

২রা অক্টোবর

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে হায়দরাবাদে (সিন্ধু) এক অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পর্কে ২৯জন তরুণীসহ ৫৮জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৭২জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৩রা অক্টোবর

আজ বার্লিনের এক ইস্তাহারে জার্মানদের তামান উপদ্বীপ পরিত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরস্থ মিত্রপক্ষের হেডকোয়ার্টার্স হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, নিউগিনি দ্বীপস্থ সুদৃঢ় জাপ ঘাঁটি ফিনসাফেন মিত্রপক্ষ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৯২জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৪ঠা অক্টোবর

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে চীফ ইঞ্জিনীয়ার পদে আরও ৫ বৎসরের জন্য ডাঃ বি এন দে'র পুনর্নিয়োগ তৃতীয়বার সমর্থন করিয়া এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করার জন্য বঙ্গীয় সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। ডাঃ দে'র বর্তমান কার্যকাল আগামী ১৪ই অক্টোবর শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা ঐ দিনের মধ্যে যদি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উপরোক্ত অনুমোদন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কর্পোরেশন ডাঃ দে'র কার্যকাল শেষ হইলে তাঁহাকে আরও পাঁচ বৎসরের জন্য স্পেশ্যাল অফিসার পদে নিয়োগ করারও সিদ্ধান্ত করেন।

মিত্রপক্ষীয় হেডকোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইতালির আদ্রিয়াতিক উপকূলবর্তী তারমলিতে অষ্টম আর্মির নূতন সৈন্যদল অবতরণ করিয়াছে। পঞ্চম আর্মি কর্তৃক ভ্যালেন্তা অধিকৃত হইয়াছে। ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, ইতালির বেলজানো, ত্রেন্তো ও বেলুনো প্রদেশ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সোভিয়েট ইস্তাহারে হোয়াইট রাশিয়ায় ফন ক্লুগের "পিতৃভূমি রক্ষাব্যূহের" অভ্যন্তরভাগে রুশ বাহিনীর নূতন অগ্রগতির সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। জার্মানগণ হোয়াইট রাশিয়ায় রুশ অভিযানপথে প্রচণ্ডভাবে বাধাদান করিতেছে।

বিহারের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে স্বাস্থ্যের জন্য হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৯জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৫ই অক্টোবর

চট্গ্রামের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গত জুন মাসে চট্গ্রামে যে রিলিফ হাসপাতাল খোলা হইয়াছে, তাহাতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১৬৯২জন পীড়িত নিরন্ন ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়; তন্মধ্যে ২৬৯জন মারা গিয়াছে। পল্লী অঞ্চলেও অনশনের ফলে মৃত্যু সংখ্যা খুবই বেশী। সদর মহকুমার ৬৩টি গ্রামে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অনশনের ফলে মোট ১০৬২জন মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া খ্যাত কুতুবদিয়া দ্বীপে গত জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে গড়ে মৃত্যুহার প্রতি মাসে ৫০০।

অদ্য কলিকতার বিভিন্ন হাসপাতালে ৬৬জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৬ই অক্টোবর

কায়রো রেডিওতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রোমের সম্মুখে জার্মানদের প্রথম আত্মরক্ষা ব্যূহটি বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। জার্মান ওভারসীজ রেডিও জানাইয়াছে যে, খোলা শহর রোম হইতে ইতালীয় মন্ত্রিগণের উত্তর ইতালিতে এক স্থানে চলিয়া যাওয়ার সংবাদ সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

মালয়ের চারিজন অসামরিক ভারতীয় অধিবাসী সম্প্রতি জাপানীগণ কর্তৃক ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল। শত্রুপক্ষীয় চর অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এই আদেশ কার্যে পরিণত করা হইয়াছে।

লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, বিহারের কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক নেতা শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণকে পাঞ্জাবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার গ্রেপ্তারের বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। স্মরণ থাকিতে পারে যে, তাঁহার গ্রেপ্তরের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পুরস্কার ছাড়াও বিহার গভর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

অদ্য কলিকাতা শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৩জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৭ই অক্টোবর

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রণাঙ্গনের সর্বোচ্চ অধিনায়ক লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন অল্পসংখ্যক সহকারীসহ আজ নয়াদিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

অদ্য কলিকাতা সহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৮জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৮ই অক্টোবর

রুশ সৈন্যেরা কালিনিন ফ্রণ্টে প্রতিপক্ষের যানবাহন কেন্দ্র ও প্রতিরোধ ঘাঁটি নেভেল পুনরধিকার করিয়াছে।

আলজিয়ার্স রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, মিত্রপক্ষ কর্তৃক কাপুয়া অধিকৃত হইয়াছে। পঞ্চম আর্মির অগ্রবর্তী সৈন্যগণ এখন রোম হইতে মাত্র ৯০ মাইল দূরে আছে।

ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য "সোসিয়াল ডেমোক্রাটেন" পত্রে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, জার্মানী রাশিয়া সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিল, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এই পাল্টা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জার্মানীকে তৎকর্তৃক অধিকৃত সমস্ত দেশ ছাড়িয়া যাইতে এবং হিটলারকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

অদ্য কলিকাতা শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ৫৯জন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৯ই অক্টোবর

বোম্বাইয়ের এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, গত সপ্তাহে বোম্বাই শহরে বাঙলা হইতে কতক নিরাশ্রয় ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে। এই সকল নিরাশ্রয় ব্যক্তির বোম্বাই প্রদেশে আগমনের বিরুদ্ধে বোম্বাই সরকার দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

মার্শাল স্ট্যালিন অদ্য কর্ণেল জেনারেল পেট্রভের প্রতি তাঁহার আদেশে বলিয়াছেন যে, জার্মানগণ সম্পূর্ণভাবে তামান ছাড়িয়া গিয়াছে। জার্মান নিউজ এজেন্সী কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে যে, কুবানের শেষ জার্মান সৈন্যদল ক্রিমিয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

১০ই অক্টোবর

আমেদাবাদে দশহরা শোভাযাত্রা সম্পর্কে এক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। ফলে পাঁচজন নিহত ও ২৮জন আহত হইয়াছে। শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে এবং ১৮৯জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মস্কোর ইস্তহারে দোব্রুজ শহর ও কয়েকটি জনপদ দখলের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। নীপার তীরে জার্মান ব্যূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সোভিয়েট এলাকায় জার্মান বহিনীকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য লালফৌজ এক বিরাট আক্রমণ সুরু করিয়াছে। ইতিহাসে এত বড় আক্রমণ আর কখনও হয় নাই।

'দেশ'-এর নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

'দেশ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর টাকা	এক সংখ্যার জন্য টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪৫	৫৫,
অর্ধ পৃষ্ঠা	২৪,	২৮
প্রতি ইঞ্চি	২৷৷৹	৩,

বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের কপি সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে 'আনন্দবাজার কার্যালয়ে' পৌঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে 'দেশ' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

(১) সাপ্তাহিক 'দেশ' প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১০ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫, টাকা। (খ) ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১৫ টাকা; ষাণ্মাসিক ৭৷৷৹ টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পৌঁছায়, ততদিন পর্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনি-অর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফঃস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতি খণ্ড 'দেশ' নগদ ৵৹ তিন আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে 'দেশ' কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নূতন নিয়ম

পাঠক গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে যদি তাহা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখাটি অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এক মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ" ১নং বর্মণ স্ট্রীট কলিকাতা।